আবুল ফজল, আবদুল হক, আহমদ শরীফ ও আহমদ ছফার প্রবন্ধ : সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যভাবনা

(পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ)

এ.কে.এম. মাহবুবুল হক

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

জুন, ২০১৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২০০১ সালে প্রফেসর ড. সৈয়দ আকরম হোসেনের উৎসাহে আমি প্রবন্ধ নিয়ে পিএইচ.ডি. গবেষণায় আগ্রহী হই। চাকুরিসূত্রে বগুড়া থেকে মুন্সীগঞ্জ বদলি হয়ে আসার পর সম্ভবত ২০০৪-০৫ সাল থেকে আমি প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষের পরামর্শে ও প্রযত্নে প্রাথমিক প্রস্তুতি নিতে থাকি। বিষয়, শিরোনাম ইত্যাদি প্রায় চূড়ান্ত করেও বারবার পিছিয়ে যেতে হয়েছে কিছুটা পেশাগত জটিলতায়, কিছুটা আন্তর্তাগিদের অভাবে। অবশেষে বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ২০১০ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. গবেষণার জন্য নিবন্ধিত হই। গবেষণায় যোগদান করি ২০১১ সালের ডিসেম্বরে। গবেষণা চলাকালে গবেষণার বিভিন্ন দিক ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে আমি বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে উৎসাহ ও পরামর্শ পেয়েছি, তাঁদের সবাইকে এই গবেষণার সমাপ্তি-লগ্নে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষত আহমদ ছফার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আহমদ শরীফের সংগঠন স্বদেশ চিন্তা সংঘের কর্ণধার খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক ও গবেষক প্রফেসর ড. আবুল কাসেম ফজলুল হক-এর পরামর্শ ও মতামত ছিল আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র শ্রদ্ধা রইল। বাংলা একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ যে আন্তরিকতা নিয়ে পিএইচ.ডি.-তে আমার ভর্তির বাধা দূর করতে সহযোগিতা করেছেন তা ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতায় শেষ হয় না। তাছাড়া গবেষণার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেই প্রফেসর ড. সৈয়দ আজিজুল হক এবং প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলামের কক্ষে আলাপচারিতায় তাঁদের সহৃদয় উৎসাহ এবং তাগাদা লাভ করেছি যা আমার জন্য ছিল আনন্দময়, তাঁদেরকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন এবং প্রিয়জন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান খান গবেষণার শেষদিকে অমূল্য পরামর্শ দিয়ে আমাকে উদ্দীপ্ত করেছেন, তাঁর প্রতি রইল আমার অশেষ শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা। বাংলা বিভাগের অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, বিশেষত সাইদুর রহমানের স্বভাবজাত সহযোগিতার মনোভাব সেই ছাত্রজীবন থেকে আজও অমলিন, তাঁকে বিশেষ শুভেচ্ছা।

এই গবেষণা চলাকালে, ২০১২ সালে আমি দীর্ঘ প্রায় এক যুগের সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করি। নতুন কর্মস্থলে সহকর্মীদের আন্তরিকতা, পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব আমার গবেষণার কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। আমার চাকুরি জীবনের সাথে গবেষণা-কর্মের সেই টানাপোড়েনের দিনে তাঁরা সবাই যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তা বিশেষ ধন্যবাদ-যোগ্য। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. মীজানুর রহমান আমাকে শিক্ষা ছুটির অনুমোদন দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, সেই সুবাদে তাঁর অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউ.জি.সি.)-এর পিএইচ.ডি. ফেলো হিসেবে গবেষণায় যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুকাল পরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের কারণে ইউজিসি ফেলোশিপ বাতিল হওয়ার উপক্রম হলে আমার আবেদনের পরিপেক্ষিতে এবং কতিপয় শর্তে ফেলোশিপ বহাল রাখা হয়। সেজন্য ইউজিসি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। বিশেষভাবে ধন্যবাদ ইউজিসির গণযোগাযোগ শাখার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ও অগ্রজ কবি শামসুল আরেফীন-কে তাঁর আন্তরিকতা ও উৎসাহের জন্য।

এই গবেষণায় আমি ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, জাতীয় আর্কাইভ ও গণগ্রন্থাগার, জগন্নাথ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং বিক্রমপুর বঙ্গীয় গ্রন্থ জাদুঘর। এসব গ্রন্থাগার-পাঠাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমার প্রাক্তন সহকর্মী প্রফেসর মো. শাহজাহান মিয়ার ব্যক্তিগত বিপুল সংগ্রহ অকাতরে ব্যবহার করার অনুমতি আমার সবসময়ই ছিল, এই সুযোগে তাঁকে অনেকদিনের জমানো কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেয়া গেল।

আমার গবেষণা কর্মের বন্ধুর যাত্রাপথে বারবার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমদিকের প্রতিবন্ধকগুলো ছিল রীতিমত পর্বতপ্রতিম– যেহেতু পথ ছিল অজানা, প্রস্তুতিও ছিল স্বল্প। সেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রমের সময় অনুপ্রেরণার আদর্শ হয়েছিলেন আমার পরমাত্মীয় বর্তমানে অতিরিক্ত-সচিব মো.শাহ্আলম। তাঁর মেধাবী উপস্থিতি ও উপদেশ সবসময়ই আমার পাথেয় ছিল। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক সকল কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদের উর্ধ্বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী গবেষণায় যোগদানের জন্য চাকুরি থেকে ছুটি গ্রহণ বাধ্যতামূলক বিধায় আমাকে মন্ত্রণালয় থেকে ছুটির অনুমোদন পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও এক বৎসর। তন্মধ্যে ইউজিসির পিএইচ.ডি. ফেলোশিপের আবেদনও অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। বারবার মন্ত্রণালয়ের গেটপাস সংগ্রহ-চিন্তা, সরকারি দপ্তরের ভয়াবহ ফাইল-জট, ফাইল আসা-যাওয়ার ইঁদুর-দৌড় খেলা এবং অনুমোদন পাওয়া-না-পাওয়ার অনিশ্চয়তা-উৎকণ্ঠার সেই কঠিন সময়ে আমাকে নির্ভরতা, উৎসাহ এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতা দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে আমার দুই অগ্রজ বর্তমানে সেসিপ-এর উপ-পরিচালক অধ্যাপক ড. শামসুন্নাহার এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো. মফিদুর রহমান (মিহির মুসাকী)। তাঁদের প্রতি আমার বন্ধুত্বমিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই, এই সুযোগে অশেষ কৃতজ্ঞতাও যুক্ত হল।

আমার পরিবারের সকল সদস্য, বিশেষত জনক-জননী এবং আমার সহধর্মিণীর প্রেরণা, আমাকে সাংসারিক জটিলতামুক্ত রাখতে তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস আমার গবেষণার চূড়ান্ত ফললাভে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল; দীর্ঘদিনের বন্ধুজুটি ড. সেলিম মোজাহার ও শাহানা শিউলি পরিবারের সদস্যের মত আমাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন, এই আত্মীয়-পরিজনদেরকে ধন্যবাদ দেয়ার গুরুত্ব সম্পর্কের চেয়ে বড় নয়।

সর্বোপরি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত নন্দিত গবেষক প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর সার্বক্ষণিক পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা এই গবেষণার সাফল্য সন্ধানের মূল কারিকা। গুরুপত্নী ড. শিপ্রা সরকার বিভিন্ন সময়ে কাজের অগ্রগতির খোঁজখবর নিয়ে এবং আতিথেয়তা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। উভয়ের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রইল।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

১.

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির চিন্তা-চেতনায় ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রেনেসাঁর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রাথমিক উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা এবং অনুকৃতি-বিকৃতি কাটিয়ে স্বস্থ হতে সময় লেগেছিল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।[১] হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭), রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৫-১৮৭৩) হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) পর্যন্ত পৌঁছতে প্রয়োজন হয়েছিল ব্রিটিশ কর্তৃক ভূমি ও করব্যাবস্থার আমূল সংস্কার, শিক্ষাসংস্কারের সূচনা হিসেবে বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি ও বিকাশসাধন এবং *সংবাদ প্রভাকর* (১৮৩১), *তত্ত্ববোধিনী* (১৮৪৩) প্রভৃতি সংবাদপত্রের যুগান্তকারী ভূমিকা। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ইয়োরোপের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে নীতি-নৈতিকতা-বর্জিত মধ্যস্বত্বভোগী যে-শ্রেণি আর্থিকভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও মননশীলতায় বিকশিত হওয়ার সময় ছিল ঊনবিংশ শতাব্দী। শতাব্দীর প্রথম দিকেই বাংলার গ্রামভিত্তিক সনাতন সমাজব্যবস্থা ভেঙে শহরমুখি হতে থাকে। বিশেষত ১৮৩৫ সালের পর প্রশাসন ও সরকার পরিচালনার ভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি হওয়ায় সেই নতুন বিত্তশালী গোষ্ঠীর পক্ষে একটি ক্ষয়িষ্ণু আধা-সামন্ত সমাজের নেতৃবর্গকে হঠিয়ে তা অধিকার করা সহজতর হয়। একদিকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং অন্যদিকে কোম্পানির ব্যবসা-বণিজ্যের মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে বিপুল আয়ের ব্যবস্থা দুই-ই ছিল তাদের আয়ত্তে। এভাবে মুর্শিদাবাদ, লখ্নৌ, দিল্লীর জৌলুস-আভিজাত্য ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে ঔজ্জ্বল্য বাড়তে থাকে কলকাতা, মাদ্রাজের। কিন্তু কলকাতাকেন্দ্রিক এই প্রফুল্ল জনগোষ্ঠীর প্রায় সবাই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং দেশজ মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল এই আর্থ-সামাজিক ও বৌদ্ধিক জাগরণ থেকে বহু দূরে, প্রান্তবর্তী অবস্থানে। বাংলার হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অসম বিকাশের এই ধারাই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমে হিন্দু সাম্প্রদায়িক পরে মুসলিম সাম্প্রদায়িক জাতিত্বচেতনার ভিত্তি স্থাপন করে।

১.১

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বস্থ ও সুস্থিত বাঙালি মধ্যবিত্তের চিন্তাচেতনায় প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষা, যুক্তিবাদ, উদার মানবতাবোধ, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতা-প্রীতি, যা রেনেসাঁ নামে পরিচিত, তা-ই ইয়োরোপীয় জাতীয়তার আদলে জন্ম দিয়েছিল স্বধর্মীয় স্বাজাত্যবোধের। প্রকৃতপক্ষে এটি রেনেসাঁস নয়, ‘পড়ে-পাওয়া’ প্রতীচ্য চিন্তাচেতনার অভিঘাতে ‘নিদ্রাভঙ্গ মাত্র’।[২] বর্ণ হিন্দুর এই স্বধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ প্রথম দিকে রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনারি কেন্দ্রিক খ্রিস্টান ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করার মানসে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু স্বল্পকালের ব্যবধানে শিক্ষা-সংস্কারের মাধ্যমে প্রতীচ্য ধারার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্তি সমাজের অভিজাত অংশে নবচেতনার বার্তাবাহক রূপে বিস্তার লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে চিন্তা-চেতনায় মুক্তবুদ্ধির উদ্‌গাতা ডিরোজিও-ই বাংলার চিত্তলোকে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন– রামমোহন-সৃষ্ট আধুনিকতার যাত্রাপথকে তিনিই প্রথম কণ্টকমুক্ত করেছেন। রামমোহন সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালির মানসলোকে নবজাগরণের প্রথম আলোকপাত করলেও .‘সে অর্থে প্রভাব সঞ্চারে সমর্থ হননি। সেক্ষেত্রে ডিরোজিওর সাফল্য কিংবদন্তীপ্রতিম’ (বিশ্বজিৎ,

Dhaka University Institutional Repository

২০১০:১২১)। তাঁর শিক্ষা ও উচ্চারিত বাণীর অভিঘাতে শহুরে, শিক্ষিত-তরুণচিত্তে যুক্তিহীন প্রথা-কুসংস্কার-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে জিজ্ঞাসা-বিতর্ক-বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রবল স্রোত কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু সমাজের বিশ্বাস-সংস্কারের সনাতন ধারাকে প্লাবিত করেছিল। ইয়ংবেঙ্গল নামে নন্দিত ও নিন্দিত এই তরুণদল ছিল কোঁৎ-মিল-বেন্থাম-স্মিথের ভক্ত, যুক্তিহীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-প্রথার কঠোর সমালোচক এবং সক্রিয় বিরোধিতাকারী। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইয়ংবেঙ্গল ও তাঁদের অনুসারীদের সাময়িক উপপ্লব স্তিমিত হলে আবার প্রথাগত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চর্চা নতুন রূপে গতি পায়। সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত সেই পুনঃস্থাপিত ধর্মীয় চেতনা যুক্তি ও নবব্যাখ্যায় পরিশীলিত হয়ে নতুন রূপে উপস্থাপিত হয়েছিল প্রথমে কোঁৎ-এর সেবাধর্ম প্রভাবিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের (১৮৩৬-১৮৮৬) দ্বারা পরবর্তীকালে তাঁর অধ্যাত্মবাদী শিষ্য আর্যহিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনকামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) প্রয়াসে। এ-সময় *হিন্দু পাইওনিয়র* (১৮৪২), *বেঙ্গল স্পেক্টেটর* (১৮৪২) প্রভৃতি পত্রিকা এবং এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন (১৮২৮), জ্ঞানোপার্জিকা সভা প্রভৃতি সংগঠন যুক্তি-বুদ্ধিশাসিত প্রগতিবাদী ধারাটিকে সচল রেখেছিল। অন্যদিকে সরকারের সাথে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল জমিদার সভা (১৮৩৭), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৩৯), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি মধ্যস্থতাকারী সংগঠন। উল্লেখ্য এসব সভা-সমিতি, সংগঠন, পত্র-পত্রিকা একযোগে হিন্দু স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধনে সহায়ক হয়েছিল।

১.২

১৮৫৭ সালের 'মহাবিদ্রোহ' হিন্দু-মুসলিম যৌথ-বিপ্লব[৩] হলেও রাজশক্তির রোষানলে পতিত হয় মুসলিম জনগোষ্ঠী। সিপাহী বিদ্রোহ হিন্দুদেরকেও স্বধর্মী জাতীয়তা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন করে তোলে। আধুনিক চিন্তা-প্রবুদ্ধ বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মপ্রসারণ উপলব্ধির শুরু এর পর থেকেই। ১৮৬৭ সালে শিবাজী প্রবর্তিত হিন্দু মেলা'র মধ্য দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম-সাম্প্রদায়িক জাগরণ ও স্বাদেশিকতার উদ্বোধন ঘটে। এরপর গো-রক্ষিণী সভা (১৮৮২), শিবাজী উৎসব (১৮৯৫), অনুশীলন সভা, সঞ্জিবনী সভা, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রবর্তিত গণপতিপূজা (১৮৯৫) ইত্যাদি উগ্র হিন্দুত্বগর্বী সভা-সমিতি-সংঘ এই মনোভাবকে সাম্প্রদায়িক জাতিত্বচেতনার চূড়ান্ত রূপ দেয়। একপর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তা ও হিন্দু জাতিত্ব অভিন্নার্থক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, (ক) ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওয়াহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলনের প্রভাব, (খ) ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ইন্ধনদাতা ও পৃষ্ঠপোষক অভিযোগে বৃটিশ রাজশক্তির চোখে অবিশ্বাস-সন্দেহে নিপতিত হওয়া এবং (গ) ১৮৩৫ সালের পর থেকে সরকারি আইন-বিচার-প্রশাসনে ইংরেজির ব্যবহার চালু হলে এসব পেশা থেকে ক্রমেই অযোগ্য হয়ে পড়ায় আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে মুসলমানদের তখন ঘোরতর দুর্দিন। ওয়াহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলনের ব্যর্থতার পর উত্তর-ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৮৯) কলকাতায় সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭), পণ্ডিত রিয়াজ-অল-দীন আহমদ মাশহাদী (১৮১৯-১৯১৯) বাংলায় সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮), সৈয়দ আমীর হোসেন, নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)-সহ কয়েকজন অবাঙালি মুসলমানের প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজে নতুনভাবে প্রাণের সঞ্চার হয়। এঁদের মধ্যে একমাত্র নওয়াব আবদুল লতিফ-ই বাংলাভাষা-জানা অবাঙালি মুসলমান। তাঁদের প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসকদের আস্থা অর্জন করে প্রশাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানের চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্যর সুবিধা গ্রহণ, বাঙালি মুসলমানকে পাশ্চাত্য জ্ঞানধারায় দীক্ষিত করা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ইসলামি আন্দোলন-ঐতিহ্য-সমৃদ্ধির সাথে পরিচিতির মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয়স্বাতন্ত্র্য জাগ্রত করা। বাঙালি মুসলমানের অগ্রসর একটি অংশ দীর্ঘদিনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ব্রিটিশতোষণনীতি অবলম্বনে ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে সর্বাত্মক প্রয়াসী হলেও শিক্ষার কোনোরূপ ঐতিহ্য না-থাকায়, আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য এবং ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকায় সাধারণ দেশজ বাঙালি মুসলিম পরিবারে তখনও ইংরেজি শিক্ষা তো নয়ই বাংলায় শিক্ষার প্রচলনও সম্ভব হয়নি। আরবি শিক্ষার ঐতিহ্যও ছিল খুব সীমিত। সারাদেশের দেশজ মুসলমান ফরায়েজি-ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাবে তখনও 'পাকা

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান' হওয়ার অধ্যবসায়ে নিয়োজিত। এতসব আলোড়নেও নির্বিকার নির্জীব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের এই ঘোর কাটতে সময় লেগেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষাবধি।

১.৩

বাঙালি মুসলমানের ধর্ম-সামাজিক জীবনের অন্তঃগভীরে নাড়া ও সাড়া দেয়া সর্বাত্মক দুটি আন্দোলনের নাম ওয়াহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলন। আরবের মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (১৭০২-১৭৯১) প্রবর্তিত ওয়াহাবি মতবাদ প্রভাবিত হয়ে ভারতবর্ষে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (১৭৮৬-১৮৩১) যে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন তা 'ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে পরিচিত হলেও এটি ছিল আসলে 'তরিকা-ই-মুহম্মদীয়া' আন্দোলন। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল সকল প্রকার কুসংস্কার ও অনৈসলামিক ভাবধারা থেকে মুক্তি দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদেরকে ইসলামের আদি বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাঁর নিযুক্ত শিষ্য বিলায়েত আলী, ইনায়েত আলী ও জয়নাল আবেদীনের কর্মস্থল ছিল বাংলাদেশ। তাঁরা সারা বাংলাদেশ ঘুরে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন মৌলভী নিসার আলী ওরফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩২)। অন্যদিকে হাজী শরীয়তউল্লাহ্ (১৭৬৪-১৮৪০) ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার (১৮১৯-১৮৮২) ফরায়েজি আন্দোলন বাংলাদেশে লৌকিক ইসলাম সংস্কারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষকে দার-উল-হর্‌ব ঘোষণা করা, ইমাম হাসানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে মুহররম পালন না-করা, পীর-মুরিদ ও মৃতব্যক্তিকে শ্রদ্ধানুষ্ঠান বর্জন, কুরআন বহির্ভূত সকল আচার-অনুষ্ঠান বর্জন এই আন্দোলনের অংশ ছিল।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওয়াহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের রাজনৈতিক অবসান ঘটলেও চল্লিশ বৎসর ধরে চলা এই ধর্মীয় 'পিউরিটান' আন্দোলন বাঙালি মুসলমান সমাজে গভীর ও সদূরপ্রসারী ছাপ রেখেছিল। মুসলিম সমাজে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা বিস্তৃত না হয়ে মৌলবাদী চিন্তাধারা দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাবে। ড. পঞ্চানন সাহা কয়েকটি উল্লেখের[৪] সাহায্যে এই আন্দোলনের 'পিউরিটান' চরিত্রের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন– দীর্ঘকালের সুফী ঐতিহ্য যে সমস্ত হিন্দু উৎসবে ধর্মান্তরপূর্ব সামাজিক প্রথা স্বীকার করে লৌকিক ইসলামের ভিত্তি গড়েছিল ওয়াহাবি ও ফরায়েজিরা সে-সমস্ত প্রাচীন প্রথাকে ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণা করে। এই মনোভাবের প্রকাশ তিতুমীরের এক চিঠি[৫] থেকেও উদ্ধার করা যায়–

> একমাত্র ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্মই জগতে শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। ইসলামী ধরনের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট করা, ঈদুল আজহার কোরবানি করা ও আকীকা কোরবানি করা, মুসলমানদিগের উপর আল্লাহর উপাসনা করাও আল্লাহর হুকুম।

ওয়াহাবি আন্দোলনের সামন্তবিরোধী চরিত্র থাকলেও এই আন্দোলনই প্রথম বাংলা ভাষা ও বাঙালির দেশজ কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামবিরোধী পৌত্তলিকতার ছাপ আবিষ্কার করে, দেশজ রীতির মিলিত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং আরবীয় রীতিনীতির দিকে বাঙালি মুসলমানদের আকৃষ্ট করে। ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে বাঙালির পোষাক ধুতি-চাদর ইসলাম বিরোধী বলে বিবেচনা করা হতে লাগল, বাঙালির সম্বোধন ও সম্পর্ক-বাচক বিভিন্ন শব্দও ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণা করা হল, বাংলার নববর্ষ, শারদ নবান্ন, পৌষ পার্বণ প্রভৃতি জাতীয় উৎসব– হিন্দুধর্মীয় উৎসব হিসাবে চিহ্নিত ও বর্জিত হয় এবং বাঙালির সমাজজীবনের সাথে সম্পর্কহীন শুষ্ক আচার-পরায়ণতাকে শরীয়ত রক্ষা ও শুদ্ধির ছাপ মেরে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করা হয়। মুসলমান সমাজে প্রগতি, মুক্তচিন্তা ও পরিবর্তন-বিরোধী মানসিকতা গড়ে ওঠে এই আন্দোলনের ফলে। তবে একথা মানতে হয় যে, বাংলার মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় শিকড়বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক-মানস গড়ে তোলায় এবং রাজনীতি ও ধর্মের সংযোগ স্থাপনে ওয়াহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ওয়াহাবি-ফরায়েজি

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা বাংলার নিভৃত গ্রামে-গঞ্জে ধর্মীয় বিশুদ্ধতাবাদী আচারসর্বস্ব সংস্কারই শুধু নিয়ে যায়নি, ব্রিটিশ-বিরোধিতার আবরণে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাবও সাধারণ মুসলমানের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ায় হতাশা-নিমজ্জিত মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কারের পথ ধরে জাগরণ সৃষ্টির চেষ্টা চলে এসময়। একই সাথে ধর্ম-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করায় এই দুই আন্দোলন বহুমুখি ও জটিল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এর ফলাফল থেকে ধারণা করা যায়, এটি একই সাথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সাধারণ মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাঁদের মধ্যে সমন্বয় ও একতা স্থাপনে সক্ষম হয়। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের চিত্তজগতে ইসলামের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন ও দেশ-বহির্ভূত আত্মপরিচয় তথা জাতিত্বচেতনার বিস্তার সহজ ও সর্বগ্রাসী হয়েছিল। অবশ্য মুসলমানদের এ-রকম আত্মসচেতনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগরণে আরও কয়েকটি ঘটনা ও সূত্র প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল। যেমন– ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে জনগণনার প্রকাশিত ফলে পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা ও জাতিত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন, ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ স্টেটের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বীর ফারসি ভাষায় লিখিত 'হাকিকত-ই মুসলমান-ই-বাঙ্গালা' (The Origin of the Muhammadans of Bengal)। গ্রন্থে বাঙালি মুসলমানের পূর্বপুরুষ আরব-ইরান-তুরস্ক-আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে আগত এবং কোনোস্তরের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত নয় বলে মত প্রকাশ, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম হান্টার রচিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স' গ্রন্থে বাঙালি মুসলমানের দুর্ভোগ-দুর্দশার কারণ বর্ণনা করে সহমর্মিতার আশ্বাস-বাণী ইত্যাদি। তাছাড়া রেভারেন্ড জেম্স লঙ ১৮৫২ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তা নওয়াব আবদুল লতিফের সাথে 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন'-এর কাজকর্মে ব্যবহার করেন। এসব বিবরণ-পুস্তক-প্রচার থেকেও বাঙালি মুসলমানের মনোজগতে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ তীব্র হয়। ফলে শতাব্দীর শেষদিকে বাঙালি মুসলমান পরিচালিত কয়েকটি সংবাদপত্র সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও জাগরণশক্তি প্রকাশের তাড়না ও প্রেরণায় হিন্দুরচিত সাহিত্যে মুসলমানের নগণ্য অবস্থান চিহ্নিত করতে থাকে। প্রায় পুরো ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাঙালির জ্ঞানজগত বা সৃষ্টিশীলতার কোথাও মুসলমান প্রতিবেশিকে উদ্বুদ্ধ না-করার এমনকি বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতিত্বচেতনাকে হিন্দু-সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার কারণে মুসলমান-পরিচলিত সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিবাদ, ক্ষোভ, হতাশাা ও স্বাতন্ত্র্যসূচক ভাষ্য বাড়তে থাকে। আবার সীমিত পরিসরে হলেও সৃষ্টিশীল গদ্যে সাহিত্য রচনার প্রয়াসও চলতে থাকে একই সময়। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) সম্পাদিত *আজীজন নেহার* (১৮৭৪), আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০) সম্পাদিত *আহমদী* (১৮৮৬), শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত প্রথমে *মিহির (১৮৯২)* পরে পণ্ডিত রিয়াজ-অল-দীন আহমদ মাশহাদী ও মোজাম্মেল হক সহযোগে *মিহির ও সুধাকর* (১৮৯৫), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত *ইসলাম প্রচারক* (১৮৯১), রওসন আলী চৌধুরী সম্পাদিত *কোহিনুর* (১৮৯৮) ইত্যাদি পত্রিকা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙালি মুসলমানের ধর্মবোধ শানিত করে স্বাতন্ত্র্যচিন্তাকে প্রবল করতে অনেকাংশেই সফল হয়। এসব পত্রিকার কোনোটি ব্রিটিশ রাজশক্তির সাফল্য কামনায় পঞ্চমুখ, কোনোটি আবার হিন্দু-মুসলমান মিলন-সম্প্রীতির ধারক। কোনোটি তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত– কোনোটি উদার। স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ প্রকাশিত লেখাই ছিল স্বধর্মের কল্যাণ ও কীর্তির স্থূল বর্ণনা অথবা ধর্মের শরা-শরীয়ত-ভিত্তিক জীবনযাপন প্রণালীর ব্যাখ্যা। *মিহির ও সুধারক*-বাদে সাহিত্য-প্রয়াস সেক্ষেত্রে ছিল দুর্লক্ষ্য। কেউ হয়ত বাংলায় পত্রিকা সম্পাদনা করেও বাংলায় লেখাকে গর্হিত জ্ঞান করতেন, আবার কেউ পরম যত্নে বাংলায় লিখে সাহিত্যিক গদ্যচর্চায় বাঙালি মুসলমানের পথিকৃৎ হয়ে আছেন। কিন্তু 'সমাজের ব্যাপক সংখ্যক লোককে উন্নয়নের অংশীদার করতে হলে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে একটি পরিবর্তিত প্রগতিশীল অথবা বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির দরকার সে বিষয়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও সাহিত্যিকেরা সজাগ হননি' (ইসরাইল, ২০০৫:৩০)। বিংশ শতাব্দীতে সৃষ্টিশীল গদ্যে নতুন লেখকের নতুন দৃষ্টিপাতের প্রতিফলন পাওয়া যায় কয়েকটি পত্রিকার বিভিন্ন লেখায়। এ-কালের পথরেখা নির্মাণ করেছিলেন যাঁরা তাঁদের প্রয়াস ও সাফল্য সম্পর্কে আজহার ইসলামের মন্তব্য যথার্থ–

Dhaka University Institutional Repository

> দেশ, জাতি এবং ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত মুসলিম-রচিত যেসব প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, তাতে সম্পাদক ও লেখকদের বক্তব্যে নতুন কালের ভাব বৈশিষ্ট্যের চমৎকার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। যে দেশাত্মবোধ ও মাতৃভাষাপ্রীতির প্রকাশকে আধুনিকতার লক্ষণ বলে আমরা বিবেচনা করি, মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের উগ্র প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও মুসলমান লেখকদের বিভিন্ন প্রবন্ধে তার নিদর্শন বেশ উজ্জ্বলভাবেই ধরা পড়ে। যে পুরোনো শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যবোধের মধ্যে মুসলিম মানস একদা আটকে পড়েছিলো, তার থেকে মুক্ত হয়ে সেই মানস ক্রমে নতুন কালের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যধারণার প্রতি ঝুঁকে পড়ে; ফলত আধুনিক বাংলা সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে তাঁরা সাদরে আমন্ত্রিত হয়। (আজহার, ১৯৯৯:২৭)

এই ধারার সম্পাদক-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেখ ফজলল করিমের *বাসনা* (১৯০৮), সৈয়দ এমদাদ আলীর *নবনূর* (১৯০৩) আঞ্জুমানে ওলামায়ে-বাঙ্গালার সচিত্র মাসিক *আল-এসলাম* (১৯১৫), মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর মাসিক *মোহাম্মদী* (১৯০৩), মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের *সওগাত* (১৩২৫ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বধর্মী-স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বিকশিত জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ ও মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ, মুসলমানের নৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রভৃতির ভিত্তিতে সার্বিকভাবে মুসলমান সমাজ-বিকাশ ও সৃষ্টিশীলতার চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল বর্ণিত পত্রিকার সম্পাদক-লেখক-কর্মীবৃন্দ। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর মত শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানও কতকগুলি সাংগঠনিক উদ্যোগে সাড়া দিয়ে সংঘ শক্তির পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হতে চেয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কলকাতায় গড়ে ওঠে 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৬৩), 'ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৭) ঢাকায় 'সমাজ সম্মিলনী'(১৮৭৯), 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'(১৮৮৩)। উত্তরোত্তর প্রগতি ও আধুনিক চিন্তাধারার এই পথ অনুসরণ করেই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'(১৯২৬), দানা বেঁধেছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন, আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল *শিখা* (১৯২৭) পত্রিকার।

১.৪

বাঙালি মুসলমানের সীমানাহীন দেশ-বহির্ভূত জাতিত্ব ও তুর্কি-মুঘল জ্ঞাতিত্ব-ভ্রান্তি তাঁর মানসলোকে যে শিকড়বিহীন আগন্তুকতার সৃষ্টি করেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরায়েজি-ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্যর্থতা, সেই মানসশূন্যতা থেকে আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে আপাত মুক্তির পথ নির্দেশ দিলেও জাগতিক-বৈষয়িক সকল ক্ষেত্রে হিন্দুর তুলনায় পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজের সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আত্মস্থ হতে সময় লেগেছিল শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেরও অন্তত তিন দশক বাঙালি মুসলমানের অতীত রোমন্থন ও আত্মশুদ্ধির কাল; কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে বাঙালি মুসলমানের বন্ধ্যা সময়, অবসন্ন কাল। এই অবক্ষয়ের চিহ্ন বুকে নিয়ে অক্ষয় হয়ে আছে এসময়ের কবিওয়ালাদের দোভাষী বা মিশ্র পুথি, পাঁচালি ইত্যাদি সাহিত্যপ্রয়াস। পুথি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের ঐতিহাসিক বঞ্চনা ও অচরিতার্থতার প্রকাশ ঘটেছিল এমন বক্তব্যের পাশাপাশি এই উপলব্ধিও গুরুত্বপূর্ণ যে, এই প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতার আশেপাশের নিম্নশ্রেণি বা পেশাজীবী মুসলমানদের মধ্যে যাদের অধিকাংশেরই মাতৃভাষা বাংলা ছিল না– ছিল উত্তরভারতীয় তথা হিন্দুস্তানী; যা ১৮৬৭ সালের পর হরফ-বিচ্ছেদে নাম নেয় 'উর্দু' ও 'হিন্দি'। রেভারেন্ড জেম্স লঙ-ই প্রথম এই মিশ্রভাষা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে এক বিবরণে 'মাঝি ও অন্যান্য সাধারণ মুসলমানের ভাষা' হিসেবে এর নাম 'মুসলমানি বাংলা' উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, 'মুসলমান ছাত্রের বাংলা ভাষায় দখলও কম, আর ইংরেজি উচ্চারণ ও রচনা নিম্নমানের আবার আরবি-ফারসির জন্য তার গর্ববোধও অপার। তাই বাংলাভাষা যখন বাঙালির জাতীয় ভাষারূপে বিকশিত হয় এবং ফারসিকে স্থানচ্যুত করতে থাকে, তখন শিক্ষিত মুসলমানেরা তা সহজে মেনে নিতে পারেননি' (অমলেন্দু, ২০১১:৯০)। জেম্স লঙের মন্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, পুথির মধ্য দিয়ে মনোজগতে

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি অভিলাষী বাঙালি মুসলমান নিজেদের অলক্ষ্যেই বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও অবহেলার ছাপ উৎকীর্ণ করেছিল। ইতিহাসের এই দায় বাঙালি মুসলমানকেই রক্ত দিয়ে মিটাতে হয়েছিল ১৯৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দকে মনে করা হয় মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যে নবযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৯:৩২৩)। ১৮৭২ সালে জনগণনার ফল বাংলায় মুসলমানের প্রবর্ধিত সংখ্যাশক্তি নির্দেশ করলে তা দ্রুত সমষ্টির মনোজগতে উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। প্রায় একই সময় ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতি সংস্কার[৬] এবং মুসলমান সমাজে কতিপয় ধর্মীয় সংস্কার কার্যক্রম গৃহীত হলে[৭] নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের বাঙালি হিন্দু সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। মূলত অর্থনৈতিক মুক্তি, নিদেনপক্ষে অবস্থান্তরের আশায় গ্রামে-গঞ্জে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের চাকুরিতে নিয়োগ-পদ-পদবী লাভের স্পৃহা পল্লবিত হতে থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৮৫৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা চালুর পূর্বে মাত্র দুজন মুসলিম ছাত্র জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন আর ১৮৫৬ সালে সাতজন, ১৮৫৬-৫৭ বৎসরে ১৫৮ জন ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু চাকুরি ক্ষেত্রে চিত্রটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৮৮১ সালে কলকাতার বাঙালিদের মধ্যে স্কুল-কলেজ, প্রশাসন ও আদালতে চাকুরিরত হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২২৮৭ আর মুসলমান ছিল ৬২০ জন বা শতকরা ২২ জন অথচ ১৮৯৬ সালে সেই হার ছিল শতকরা ১ ভাগেরও কম। অথচ একই সময়ে মুসলমানের যে-কোন মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের হার বাড়ছিল। এর কারণ প্রোথিত ছিল 'মহাবিদ্রোহ' নামে ইতিহাসখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফলের মধ্যে যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে শিক্ষা-চাকুরিসহ ভাগ্যোন্নয়নের নানাবিধ প্রয়োজনে কলকাতায় পূর্ববঙ্গের মুসলমানের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধি সত্ত্বেও চাকুরি ক্ষেত্রে সুযোগ ক্রমেই সীমিত হয়ে আসা অথবা হিন্দুর তুলনায় অবনমিত সুযোগ পাওয়া বা না-পাওয়ায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ক্রমেই বাড়তে থাকে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই বৈষম্যের কারণ শুধু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বৈষম্য নয়, ইংরেজ শাসকদের পক্ষপাতমূলক আচরণের ফল।

কিন্তু ততদিনে বাঙালি হিন্দুর চিত্তবৃত্তিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে স্বধর্মী-স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে, নবজাগ্রত হিন্দুচেতনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* উপন্যাসের প্রভাবে ততদিনে দৈশিক, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ অভিন্ন হয়ে উঠেছে। জাতিত্বভাবনা ও জাতীয়তা, ইতিহাসচেতনা, ধর্মীয় সংস্কারচিন্তা, সাহিত্য শিল্পচর্চা তথা বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের মাধ্যমে রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠা বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের অগ্রসরমানতা প্রতিরোধ করতে ব্রিটিশ ভেদনীতির ফলস্বরূপ ১৯০৫ সালে অখণ্ড বাংলাকে দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশে ভাগ করে 'বঙ্গভঙ্গ' ঘোষিত হয়।[৮] প্রবুদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানে শ্রেণির নেতৃত্বে এর পক্ষ-বিপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গকে মুসলমান সমাজের আত্মোন্নয়নের সুযোগ ভেবে সমর্থন দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে দুই সম্প্রদায়ের সংঘাতে এবং পূর্ব বাংলার মুসলমাদের একত্রে-না-থাকার ইচ্ছায় বেদনাহত হন। যদিও ঢাকার নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ্-সহ পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের একাংশ ছিল বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কিন্তু সাধারণভাবে এর প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। একথা অনস্বীকার্য যে, মুসলমানের উন্নতির প্রলোভন ও সুযোগকে অখণ্ড বাঙালি-জাতিত্বের স্বার্থে বিসর্জন দিয়েছিলেন অনেকেই। শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুর পরবর্তী কর্মপন্থা অনেকটাই স্থির হয়ে যায় এসময়। তবে এই আন্দোলনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিঘাত ছিল সুদূরপসারী ও গভীর। বিকশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি, হিন্দু অথবা মুসলিম নির্বিশেষে, প্রথমবারের মত দৈশিক-ভাষিক-সাংস্কৃতিক জাতিত্বচেতনার সংস্পর্শে আসে। কিছু সংকীর্ণ স্বার্থান্ধতা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় অভূতপূর্ব স্বাদেশিকতার উদ্বোধন। তবে স্বদেশি আন্দোলনকে অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন করতে না-পারার সব দায় চিন্তায়-কর্মে অগ্রসর হিন্দু সমাজের ওপর দিয়ে বাঙালি মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতাবোধ এসময় আরেক দফা স্বাতন্ত্র্যকামী হয়ে ওঠে, নেতৃত্বও এই আন্দোলনের সেক্যুলার রূপ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাস-সন্দেহ ও স্বার্থচিন্তা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের আতসি কাঁচে বিবর্ধিত হলে ১৯০৭ সালে ইতিহাসে প্রথমবারের মত সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রক্তে রঞ্জিত হয় বাঙালি জাতি।[১০] তারপর ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক দূরত্বের অভিঘাতে আরও অনেকবার এই ঘটনা ঘটেছিল; বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন পদক্ষেপই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ রহিত করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গের উত্তেজনার আঁচ সাম্প্রদায়িকতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়ে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের মন-মানসিকতায় সৃষ্টি করেছিল স্থায়ী দূরত্ব। সুচতুর ঔপনিবেশিক শক্তি স্বদেশি আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক দ্বিধা-দ্বৈরথ পর্যবেক্ষণ করে দুই সম্প্রদায়ের বিভেদকে কাজে লাগায় শোষণ দীর্ঘায়িত করতে।[১১] ১৯০৬ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকায় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠিত হয় বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে। প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ স্থগিত করা হলে পূর্ববঙ্গ-আসামের মুসলমানগণ আশাহত হন। কারণ বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সমাজে লক্ষ্যণীয় আর্থিক-শৈক্ষিক-প্রাতিবেশিক অগ্রগতি সূচিত হয়েছিল। 'বঙ্গভঙ্গ রদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্যের কারণে বাংলাদেশের মুলমানগণ তাদের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচলিত হয়ে পড়ে' (খোন্দকার, ১৯৮৪:৪৭) এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নতুন পর্যায় শুরু এরপর থেকে।

১.৫

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সামাজিক উপপ্লবে-সংগ্রামে-দ্রোহী-চেতনায় সৃষ্টিশীলতার বহুবর্ণিল রূপ ধরা পড়েছে বারবার– কবীর-দাদু-চৈতন্যের ভাববিপ্লবে, প্রচ্ছন্ন বাউল সাধনায়, সত্যের পুথি-পাঁচালিতে মৃত্তিকালগ্ন দ্রোহী বাঙালির মানসমুক্তির আকাঙ্ক্ষা শোনা যায়। একইভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের চিত্তজগতে সাহিত্য-শিল্পের প্রতি মানসিক নৈকট্য ও আকর্ষণ গাঢ়তর হয়। সমাজে শিক্ষার প্রসার শুধু শিক্ষিত মানুষই তৈরি করে না, শিক্ষিত শ্রেণির মননে সৃষ্টি করে সুকুমারচিন্তা ও সৃজনাকাঙ্ক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে এই শ্রেণি চায় সমাজ-মানসে নেতৃত্ব ও অমরত্বের আসন। তাই ১৮৭০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে প্রায় চল্লিশ জন মুসলমান সাহিত্যিকের নাম জানা যায় যাঁরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্বসমাজ-স্বজাতির কল্যাণাকাঙ্ক্ষায় সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।[১২] তাছাড়া বাঙালি মুসলমান মানসে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল কয়েকজন ধর্মীয় মনীষী-সংস্কারকের লেখা গ্রন্থ বা রচনা। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই শিক্ষিত তরুণ বাঙালি মুসলমানের মনোজগতে যাঁদের লেখা প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁদের মধ্যে কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫২), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৭০-১৯৬৮), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০), নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৫), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯), মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১) প্রমুখের নাম করা যেতে। বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের তরঙ্গকে হয়তো তারা সম্পূর্ণ আত্মস্থ করতে পারেননি কিন্তু সাহিত্যে বিস্ময়করভাবে একটি উদার মানবিক চেতনার ধারা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের চিন্তার ক্ষেত্রে প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা, ঐতিহ্যপ্রীতি ও আদর্শানুরাগ এবং বাঙালি মুসলমান সমাজের পরিচয়-স্বাতন্ত্র্য। কিছু ক্ষেত্রে সাহিত্যকর্ম অবলম্বনেও এসব বক্তব্য রূপায়িত হয়েছে এবং অল্প ক্ষেত্রেই তা সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যয়ে পরিণতি লাভ করেছে। মূলত বাস্তব জীবনের রূপায়ণ ও শিল্প-সৌন্দর্য নির্মাণের চেয়ে আদর্শ ও তত্ত্বপ্রচারই তাঁদের রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই সাহিত্যিক-সংস্কারক-নেতৃত্বের মধ্যেও প্রবহমান ছিল রক্ষণশীলতা-প্রগতিশীলতার পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মাত্রা ও প্রকার।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬৯ সালে মীর মশাররফ হোসেনের(১৮৪৮-১৯১১) *রত্নবতী* প্রকাশিত হলে *ক্যালকাটা রিভিউ* পত্রিকার সমালোচক এমন গুণহীন লেখার কেবল সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি; এমনকি লেখার সামান্য সাহিত্যগুণের কৃতিত্বও লেখককে না দিয়ে সেই লেখক মুসলমান না-কি ছদ্মনামে কোন হিন্দু এমন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন[১৩]। কিন্তু কয়েক দশকের ব্যবধানে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যসাধনা ও কৃতি এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, ১৯২২ সালে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) নাম নিয়ে এমন সন্দেহ পোষণ তো দূরের থাক তাঁর কবিখ্যাতি ও সৃষ্টিকর্মের প্রাচুর্যে ঋদ্ধ হয় বাঙালি সমাজ। বাঙালি মুসলমানের চিন্তাজগতে আত্মানুসন্ধানের যে পালাবদল চলছিল তার ক্রমোৎকর্ষের প্রতীক এই দুই প্রান্ত।

এ পর্যন্ত আলোচিত বাঙালির চিন্তাচেতনার ধারাকে কোন কোন ঐতিহাসিক[১৪] তিনটি ধারায় চিহ্নিত করেছেন। ধারাগুলি হল–

এক. রক্ষণশীল ধারা: ঐতিহ্যিক বা গতানুগতিক ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন বা সংস্কারের ঘোর বিরোধী। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমাজচিন্তায় এই রক্ষণশীল ধারা পরিলক্ষিত হয়। তবে রক্ষণশীল হিন্দু এবং রক্ষণশীল মুসলমানের প্রকৃতিগত পার্থক্য যথেষ্ট। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ধর্মীয় মনোভাবে নমনীয়তা ও সামঞ্জস্যবিধানের দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের ফলে রক্ষণশীল হিন্দুদেরও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবমুখী। দুই সম্প্রদায়েরই এই ধারার লোকই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ ।

দুই. সংস্কারপন্থী রক্ষণশীল ধারা: কিছুটা উদার মানসিকতার যারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলেও স্বধর্মীয় রক্ষণশীলতাকে অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে, এবং কোনোভাবেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে আপোষে রাজি নন। হিন্দু সমাজে রাধাকান্ত দেব, রামমোহন রায়; মুসলিম সমাজে সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী এই ধারার প্রতিভূ।

তিন. যুক্তিবাদী আমূল সংস্কারপন্থী ধারা: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি রেনেসাঁর বাহক, ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যগণ এই ধারাভুক্ত। তাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮), আব্দুর রহিম (আনু. ১৭৮৫-১৮৫৩) এবং দেলোয়ার হোসেন আহমদ-এর (১৮৪০-১৯১৩) নাম উল্লেখ করা যায়। আবদুর রহীমের প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্-আল-ওবায়দীর (১৮৩৪-১৮৮৫) পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা কলেজের উদ্যোগী ছাত্রদের সহযোগিতায় ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকার প্রথম মুসলিম সংগঠন 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (বা Dhaka Mohammedan Friends Association)। এই চেতনার স্ফুলিঙ্গ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' পর্যন্ত বাহিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের জ্ঞান ও চিন্তা-জগতে প্রকৃত রেনেসাঁর বিদ্যুচ্চমক আভাসিত হয়েছিল দুজন কৃতবিদ্য সংস্কারকের প্রয়াসে। যদিও তা ছিল সীমিত এবং মৃদু আন্দোলন মাত্র তথাপি বাঙালি মুসলমানের আত্মবোধ অন্বেষণের ইতিহাসে এঁদের উদ্যোগ তাৎপর্যে ও গুরুত্বে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৮১০ সালে উত্তরভারত থেকে কলকাতায় অভিবাসী আব্দুর রহিম এবং হুগলির দেলওয়ার হোসেন আহমদ– প্রকৃত অর্থে তারাই মুসলিম সমাজে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁর ভাবাদর্শ উদ্বুদ্ধ, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনচিন্তা-ঋদ্ধ ও ইসলামের যুক্তিবাদী মুতাযিলা মতবাদের উত্তরসুরী বৈপ্লবিক চিন্তার অগ্রনায়ক। অবশ্য সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর (১৮৩৯-১৮৯৭) প্যান-ইসলামিবাদী চিন্তা, নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর সংস্কারমুক্ত উদার চিন্তাও বাঙালি মুসলিম তরুণদের নবোত্থিত ধর্মীয়চেতনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল সে-তুলনায় বরং উল্লিখিত দুজনের প্রভাব ছিল সামান্যই তথাপি আব্দুর রহিম-দেলওয়ার হোসেনের চিন্তার মধ্যে ছিল গতানুগতিক সংস্কারচিন্তার চেয়ে অধিকতর বৈপ্লবিক উপাদান। উভয়েই ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠিত কিছু বিধানের বিরোধিতা ও পরিবর্তন সাধনের

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করেছিলেন।[১৫] উভয়েই মুসলমানের সামাজিক বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বনাগরিক হওয়ার সাধনাকে আবশ্যক মনে করেছিলেন। কিন্তু তাদের লেখার মাধ্যম ছিল ইংরেজি বা ফারসি, তাই বাঙালি মুসলমানের চিন্তাজগতে তাঁরা স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারেননি। আব্দুর রহিম ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদের (১৮১৭-১৮৮৯) সহপাঠী, কলকাতায় হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র (১৮০৯-১৮৩১) সমসাময়িক, সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী। তিনি রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) অনুরোধে রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) ফারসিতে লেখা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিখ্যাত গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাতুল মুত্তয়াহ্‌হিদিন' (একেশ্বরবাদীদের জন্য উপহার) এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। এই সূত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন আমরা জানতে পারি আব্দুর রহিমের ছাত্র ও ভাবশিষ্য প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ পণ্ডিত ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী (১৮৩২-১৮৮৫) ছিলেন ঢাকার প্রথম মুসলিম সংগঠন 'সমাজ সম্মিলনী'র (১৮৭৯) প্রতিষ্ঠাতা এবং ঢাকা কলেজের ছাত্রদের দ্বারা গঠিত 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র (১৮৮৩) উদ্যোক্তা যাঁরা নারী-শিক্ষার পক্ষে ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।[১৬] প্রায় চার দশক পরেও দেখা যায় মুসলিম নারী-সমাজের মুক্তির আন্দোলন সেই পর্দা-প্রথার বিরুদ্ধেই। প্রায় একই আদলে গড়ে ওঠা মুসলিম হলের 'পর্দা-বিরোধী সংঘের' উল্লেখ এক্ষেত্রে তাই প্রাসঙ্গিক কেননা এই সংঘের সদস্য ছিলেন পরবর্তীকালে ঢাকার প্রগতিশীল তরুণদের চিন্তাজগতের আলোকবর্তিকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর সংগঠকবৃন্দ। অর্থাৎ 'মুসলমান সমাজে চিন্তার ক্ষেত্রে আব্দুর রহিম এবং দেলোয়ার হোসেন আহমদ যে যুক্তিবাদী ধারার প্রবর্তন করেছিলেন নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তা একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। তার একটি ক্ষীণ ধারা বিশ শতকের প্রথম দিকে সঞ্জীবিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে' (সালাহ্‌উদ্দিন, ২০০৪:৪৭)।

বাঙালির জাতীয় জীবনে বিংশ শতাব্দীর শুরু বঙ্গভঙ্গ ও খেলাফত আন্দোলনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে; তারপরই দ্বিতীয় দশকে গান্ধির অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দেয়। উত্তর-ভারতের রাজনীতির নিউক্লিয়াস কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বকে দ্বিজাতিতত্ত্বের দিকে ধাবিত করে। বাঙালি হিন্দু-মুসলিম বিভাজিত সত্তা মৃদু আপত্তি ও কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ নিয়ে ১৯৪৭ সালে প্যাকিস্তান ও ভারতের মানচিত্রে খণ্ডিত হয়ে যায়। বাঙালির চিন্তাজগতের যে তিনটি ধারার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে তার সাথে আরও তিনটি ধারা পরীক্ষা করে দেখা যায় অন্তঃস্রোতে ঐক্যের ইতিহাস ছিল আগেও শুধু ছিল না শিক্ষিত-প্রবুদ্ধ শ্রেণির স্বার্থহীন নেতৃত্ব। সমালোচকের[১৭] মতে, এই তিনটি ধারাও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালির রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারায় প্রবহমান ছিল। ধারাগুলি হল–

এক. কৃষক ও উপজাতীয় বিদ্রোহের ধারা, যা অষ্টাদশ শতক থেকেই চলছিল।

দুই. রামমোহন থেকে শুরু করে শিক্ষিত হিন্দু-ব্রাহ্ম মধ্যবিত্ত পরিচালিত ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী ধারা।

তিন. মুসলিম সমাজের উন্নয়নের জন্য ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং শিক্ষিত মুসলমানদের পরিচালিত প্রাগ্রসর আন্দোলনের ধারা।

এই তিনটি ধারার মিলিত স্রোত একবারই, নীল বিদ্রোহের (১৮৫৯-১৮৬০) সময়, বাঙালির প্রকৃত একাত্মতা গড়ে তুলেছিল। যখন জমিদার-মধ্যবিত্ত-কৃষক-শ্রমজীবী সবাই একই কাতারে শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। এছাড়া আর কখনও আমরা বাঙালির তিনটি চিন্তাস্রোতকে অথবা জাতীয়চেতনাকে একধারায় প্রবাহিত হতে দেখি না। তবে 'ব্যর্থ হলেও প্রতিবাদী কণ্ঠ ও বিদ্রোহ গাঁয়ে-গঞ্জে ছিলই সবসময়' (শরীফ, ২০১২:১৪৯)। আসলে সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের পথ অনুসরণ করলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ উদ্বোধন বা উন্মেষের কোন নিরঙ্কুশ ঘটনা-আন্দোলন-পর্ব-কাল বা পর্যায়কে চিহ্নিত করা যায় না। মধ্যযুগ পর্যন্ত তো নয়ই, যাকে জাতীয়তাবাদ বলা হয় সেই বিবেচনায় আধুনিক কালেও নয়। বলা যায় মধ্যযুগ পর্যন্ত গঙ্গা-ভাগিরথী-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলের

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর মানসজগতে যা ছিল গোত্র-চেতনা, তা-ই ইংরেজ যুগে এসে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে প্রথমে হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাগরণের উন্মেষ ঘটায়, যাকে আমরা খণ্ডিত বা সীমিত অর্থে জাতীয়তাবাদের লক্ষণাক্রান্ত বলতে পারি। পরবর্তীকালে তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ায় অবধারিত ছিল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা এবং তা-ই ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে– চলেছিল বিংশ শতাব্দীতে ভারত-পাকিস্তানে বিভাজিত হওয়া পর্যন্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' আন্দোলন ছিল ধর্মচেতনার সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবধারার মিশ্রণ। ভারতীয় জাতীয়তার চিন্তাধারাও ধর্মীয় ভাবধারা থেকেই জন্মলাভ করেছিল। বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার প্রতিক্রিয়াজাত। কেবল ১৯৭১ এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির জাতীয়তাবোধ ধর্মভিত্তিক ছিল না, ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে শাসক-শাসিতের অনিবার্য লড়াই।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

---

[১] ১৮১৫ সালে রামমোহন রায়ের কলকাতায় বসবাস শুরুর পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহের চূড়ান্ত অবসান পর্যন্ত। বিস্তারিত– আহমদ শরীফ (২০১২:১৫০)

[২] 'কোম্পানি আমলে ও ভিক্টোরিয়া শাসনে বাঙালী' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁ বলে কথিত জাগরণকে 'পড়ে-পাওয়া সমকালীন য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনার স্বরূপ কিংবা তাৎপর্য' আয়ত্ত না হওয়া এবং 'রেনেসাঁস নয়- য়ুরোপীয় চিন্তার অভিঘাতে নিদ্রাভঙ্গ মাত্র। মধ্যযুগের অবসান ঘোষিত হল মাত্র।' –মর্মে উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত– আহমদ শরীফ (২০১২:১৫৪)।

[৩] 'বিদ্রোহ' ও 'বিপ্লব' শব্দ দুটিকে হাল আমলে যথাক্রমে শাসক ও শাসিতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়ে থাকে।

[৪] সর্ব-সাধারণের স্তরে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রচারণার ধরন সম্পর্কে আলোচনায় অমলেন্দু দে, আবদুল গফ্ফার চৌধুরী, ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ গবেষকের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন ড. পঞ্চানন সাহা । এই অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য তদীয় উদ্ধৃতির সারমর্ম। বিস্তারিত– ড. পঞ্চানন সাহা (২০১১:১২০-১৫৮) , আরও দেখুন– অমলেন্দু দে (২০১১:৫৬-৫৯), আনিসুজ্জামান (১৯৯৯:৫৪-৫৫)।

[৫] উদ্ধৃত– পঞ্চানন সাহা (২০১১:১৩৬)।

[৬] মুসলমানদের শিক্ষা সম্প্রসারণে ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক '১৮৭১ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে যে-কটি সরকারি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার সবকটিতেই মুসলমান সমাজে শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়েছিল। এর ফলেই ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং সেখানে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। মাতৃভাষা এবং আরবি-ফারসি শিক্ষা এর কোনদিকেই কম জোর দেওয়া হল না।' (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৯:৮৪)

[৭] যেমন- ইংরেজি শিক্ষা বা ব্রিটিশকে সাহায্য করা ইসলাম বিরোধী নয়, অথবা ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ 'দার-উল-ইসলাম' ইত্যাদি। বিস্তারিত- আনিসজ্জামান (১৯৯৯:৮২)।

[৮] ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আদেশ জারি হয়। পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি প্রদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় অপর প্রদেশ ।

[৯৯] কোনো কোনো বিশ্লেষক মনে করেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে 'হিন্দু সংস্কারের বাড়াবাড়িতে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রতিক্রিয়া যা ব্রিটিশদের দৃষ্টি এড়ায়নি'। এর মুসলিম লীগের জন্ম এবং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা এই সন্দেহকে গাঢ়তর করে। বিস্তারিত– মিহির আচার্য (১৯৭৭:২৫-২৬)

[১০] সুরঞ্জন দাসের উদ্ধৃতিতে রঘুনাথ ভট্টাচার্য (১৪১০:৪৯) জানিয়েছেন ১৯০৭ সালে ময়ময়সিংহে প্রথম হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তবে খোন্দকার সিরাজুল হক (১৯৮৪:৪২) জানিয়েছেন ময়মনসিংহের দাঙ্গা সংঘটিত হয় এপ্রিলে; প্রথম দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল ১৯০৭ সালের মার্চে, কুমিল্লায় নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌র আগমনকে কেন্দ্র করে। একই বছর মার্চে ত্রিপুরা জেলার মোগ্‌রায় একটি দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

[১১] এসময় ব্রিটিশ সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ নেয় যাতে হিন্দুকে দমন করার জন্য মুসলমানকে ব্যবহার করা হয়েছিল, যেমন– আদালতে হিন্দুর বিরুদ্ধে কোন মুসলমান অভিযোগ দিলেই শাস্তি হবে। তাছাড়া ব্রিটিশের মুসলমান-তোষণনীতির ফলেও দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সন্দেহ বাড়তে থাকে। বিস্তারিত দেখুন– ইসরাইল খান (২০০৫:৩৫-৩৭) ও মিহির আচার্য (১৯৭৭:২৫-২৬)।

[১২] বিস্তারিত– আনিসুজ্জামান (১৯৯১:৪৪)।

[১৩] বিস্তারিত– আনিসুজ্জামান (১৯৯১:৪৩)।

[১৪] ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষপাদে বাঙালি সমাজমানসে তিনটি প্রধান ধারা চিহ্নিত করেন ড. সালাহ্‌উদ্দীন আহমেদ। বিস্তারিত– সালাহউদ্দিন আহমদ (১৯৯৯:১৩-১৫)।

[১৫] বিস্তারিত– সালাহ্‌উদ্দিন (১৯৯৯:১৬-২০)।

[১৬] ওয়াকিল আহমদ (২০০১:১৯)।

[১৭] বিস্তারিত– অমলেন্দু দে (২০১১:১২১)।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফজল, আবদুল হক, আহমদ শরীফ ও আহমদ ছফার প্রবন্ধ : সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যভাবনা

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার	:	i
প্রস্তাবনা	:	iii
অবতরণিকা	:	১
প্রথম অধ্যায়	: আবুল ফজল	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	: আবদুল হক	৫৭
তৃতীয় অধ্যায়	: আহমদ শরীফ	৯৫
চতুর্থ অধ্যায়	: আহমদ ছফা	২২৫
উপসংহার	:	৩৫৯
গ্রন্থপঞ্জি	:	i — x

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

প্রবন্ধ সাহিত্য, গবেষণামূলক বা মননশীল যে বৈশিষ্ট্যেরই হোক না কেন, একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, চিন্তা ও মননশীলতার ভাষারূপ। লেখকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্ব ও সমাজবোধের প্রতিফলন ঘটে প্রবন্ধে। তাই মননশীল প্রাবন্ধিকের মনীষা ও চিন্তনপ্রণালীর সূত্র ধরে উপনীত হওয়া যায় জাতির সামগ্রিক অর্জন ও সম্ভাবনার সমীকরণে। রাষ্ট্রের উপরিকাঠামো ও অন্তর্কাঠামোর দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রতিক্রিয়া প্রবন্ধে বিধৃত হয় যৌক্তিক শৃঙ্খলা ও বৈজ্ঞানিক অভিনিবেশ সহযোগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে বৈপ্লবিক প্রেক্ষাপটে বাংলা প্রবন্ধের যাত্রা সূচিত হয়েছিল তা কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালি মধ্যশ্রেণির 'রেনেসাঁ' নামে পরিচিত। ধর্ম-শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজ সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা ও সম্মিলনে জাতীয় জাগরণ ঘটেছিল এ সময়। রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) জ্ঞানপিপাসা যুক্তিবাদ ও স্বাধীনতাপ্রীতি, ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১) মুক্তচিন্তা, অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) বিজ্ঞানচেতনা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) মানবপ্রেম বাঙালির মনন অন্বেষায় দিয়েছিল পথনির্দেশনা। কিন্তু সমাজ-সংস্কারের মূলে সনাতন হিন্দু ধর্মের আচার ব্যবস্থার যে সংস্কারে তারা ব্রতী হয়েছিলেন বাঙালি মুসলমানের সম্পৃক্ততা তাতে সামান্যই। উপমহাদেশের জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক আবর্তের পরিধিপ্রান্তে অবস্থান করা এবং ক্ষমতার পালাবদলের কেন্দ্রাতিগ দূরত্বে থাকা বাঙালি মুসলমান আত্মবোধশাসিত সামষ্টিক চেতনায় সংগঠিত হতে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে, পাশ্চাত্যের জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাচেতনায় সঞ্চরণের মাধ্যমে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বাঙালি মুসলমানের এই উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি সূচিত হয় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯২৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজসংস্কার, স্বাজাত্যবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের বিলম্বিত অভিঘাত স্পর্শ করে পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণিকে এবং সৃষ্টি হয় এক অভূতপূর্ব জাগরণের। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রয়োজন ও লক্ষ্য নিয়ে প্রবন্ধ রচিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল একই বিবেচনা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলমানের প্রবন্ধচর্চায় লক্ষ করা যায়। ইসলাম এ সময়ের প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়নি। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা ধর্মীয় বিবেচনায় ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত আলাদা রাষ্ট্র হয়ে যাবার পর পূর্ববাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ প্রায় সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও ক্ষমতা ব্যবহার করে ইসলামিকরণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এসময়ের কোন কোন প্রাবন্ধিকের কাছে ইসলাম এবং মুসলিম-সাহিত্য ছিল প্রিয় বিষয়। অন্যদিকে 'আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজ' ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত আত্মপরিচয় অন্বেষণের দ্বিধা-দ্বৈরথে দোদুল্যমান, ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জনের বিতর্কে মীমাংসাসন্ধানী। এ সময়ের প্রবন্ধচর্চায় সক্রিয় ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯), এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১),আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২),আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭), মুহম্মদ আব্দুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) প্রমুখ প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক। তাদের মধ্যে অনেকে '৪৭-পূর্ব কাল থেকেই প্রাবন্ধিক হিসেবে সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত।

তবে অচিরেই ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির সাথে পাকিস্তানি মূল্যবোধের অনিবার্য বিরোধের প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, রেনেসাঁ, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি বিষয় প্রবন্ধে গুরুত্ব পেতে শুরু করলো। প্রান্তিক মানুষের স্তরে এই সামাজিক অস্থিরতার ঢেউ পৌঁছে যায় বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের

Dhaka University Institutional Repository

অভিঘাতে। পূর্ব বাংলার তথা বাংলাদেশের বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট এবং জাতিসত্তা ও ঐতিহ্য-জিজ্ঞাসা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় বাঙালিদের ছিল না। এই সংকট থেকে উত্তরণে রক্তক্ষয় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল কিন্তু এর দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণের প্রয়াস পাঁচ-ছয়ের দশকে বাংলাদেশের প্রবন্ধ চর্চায় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এ সময়ের প্রবন্ধ চর্চায় যারা মনোনিবেশ করেন তাদের মধ্যে আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯), নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬-), আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-), আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (১৯৪০-), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৪৪-), শামসুজ্জামান খান (১৯৪৪-), আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৪৪-), হায়াৎ মামুদ (১৯৪৬-), হুমায়ূন আজাদ (১৯৪৭-২০০৫) উল্লেখযোগ্য। সুদীর্ঘ সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার উত্তরাধিকার নিয়েই বাংলাদেশের প্রবন্ধ স্বাধীনতা-উত্তরকালের সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করে। কিন্তু এই অস্থিরতা প্রশমিত হয়নি, নতুন মাত্রা লাভ করেছে মাত্র। একটি অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন বারবার নিষ্পেষিত হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতায়, সামরিকজান্তার যাঁতাকলে নতুবা সুবিধাবাদী আমলা ও মধ্যস্বত্বভোগীর সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নে। ফলে আত্মপরিচয়ের সংকটকে অতিক্রম করলেও বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ক্রমশ পতিত হয় গভীর হতাশায় নতুবা আত্মপরায়ণ উন্নাসিকতায়। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জ্ঞানচর্চা বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যে নানামুখী প্রবণতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর প্রবন্ধচর্চা তাই নতুন জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে ও বিচিত্র বিষয়সম্ভারে ক্রমশ ঋদ্ধ হচ্ছে।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭), আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) ও আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) বর্ণিত প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন কালপর্বে প্রবন্ধ চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। বাঙালির, বিশেষত বাঙালি মুসলমানের, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও দার্শনিক বোধ বিনির্মাণে তারা প্রতিনিধিস্থানীয়। তন্মধ্যে আবুল ফজলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'বিচিত্র কথা' প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে এবং আহমদ ছফার সর্বশেষ প্রবন্ধগ্রন্থ 'আমার কথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে। অর্থাৎ প্রায় ছয় দশক কালব্যাপী বাঙালির চিন্তা-চেতনা, মননশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার গদ্যরূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে আবুল ফজল, আবদুল হক, আহমদ শরীফ ও আহমদ ছফার প্রবন্ধে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম সংগঠক আবুল ফজল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙালি মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতাকে অতিক্রমের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে বিশেষত প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের সামাজিক রূপ-বৈশিষ্ট্য, বাঙালি মুসলিম সমাজের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। আবদুল হক একজন সমাজ ও রাজনীতি সচেতন সাহিত্যিকই শুধু নন, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' আন্দোলন ও বাঙালির জাতীয়তাবোধ উজ্জীবনের অন্যতম চিন্তাবিদ তিনি। অনেকটা নিভৃতে, আত্মমগ্ন শিল্পীর নিবিষ্টতায়, তিনি সমাজ-রাষ্ট্র-ভাষা-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সুগভীর চিন্তা ও উপলব্ধির চর্চা করেছেন প্রবন্ধগুলোতে। আহমদ শরীফ মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের অন্যতম গবেষক হিসেবে সুখ্যাত হলেও রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তায়ও তিনি স্বকালে ছিলেন প্রতিনিধিস্থানীয়। তার বিপুল সৃষ্টিকর্মের সবটাই গবেষণামূলক বা মননশীল প্রবন্ধ রচনার সম্ভার যা বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যকে বিষয়-বৈচিত্র্য ও দার্শনিক গভীরতা দিয়েছে। আহমদ ছফা বিশ শতকের ছয়ের দশকে উপন্যাসের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও ক্রমশ প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক অগ্রযাত্রার একজন তীক্ষ্ণধী পর্যবেক্ষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। নির্বাচিত চারজন প্রাবন্ধিকের সাহিত্যচর্চা ভিন্ন ভিন্ন কালপর্বে হলেও সাহিত্যে সমাজের রূপ-রূপায়ণ, সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া ও প্রবণতা বিচারকে প্রাধান্য দিয়েছেন প্রত্যেকেই। চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্য নিয়েও এক অভিন্ন চেতনার ঐক্যে সংগ্রথিত এই চার প্রাবন্ধিক। বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যচিন্তার

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক গতিধারা অনুসরণ করে তাকে জাতীয়তাবোধে বিনির্মাণের তাঁরা অগ্রপথিক। ফলে তাদের প্রবন্ধে অর্ধশতাব্দীর অধিক কালব্যাপী বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা-সমাজ-সাহিত্য ও সামষ্টিক চেতনার নিবিড় ভাষ্য পাওয়া যায়।

অভিসন্দর্ভে আবুল ফজল, আবদুল হক, আহমদ শরীফ ও আহমদ ছফার প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ প্রযোজ্য তথ্য ও তত্ত্বসহযোগে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করে তাঁদের চিন্তাসূত্র সংশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত প্রাধান্য দেয়া হয়েছে মননশীল প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা রচনাগুলোকে এবং অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক নয় বিবেচনায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে লিখিত গবেষণাকর্মগুলোকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে মীমাংসিত, সাময়িক বা সামাজিক চলতি-বিতর্কের প্রয়োজনে লিখিত প্রবন্ধসমূহকে নির্বাচনের ব্যাপারে সমসাময়িক দৈশিক-বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং বর্তমানে তার প্রাসঙ্গিকতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষকের স্বাধীনচিন্তা ও নির্বাচনকে মান্যতা দিতে হয়েছে। অধ্যায় বিভাজনে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি না রাখা হলেও শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেক প্রাবন্ধিকের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিভাবনা ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজ-অন্তর্গত বিষয় হিসেবে সামাজিক জীবন-পরিবেশ পরিবর্তনধারা, পেশা-জীবিকা-শিক্ষা, নারীর সামাজিক অবস্থান, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। সংস্কৃতি-ভুক্ত বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে ঐতিহ্য, ভাষা, ধর্ম, জাতীয়তা, রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতির রূপ-রূপান্তর। সাহিত্যের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তত্ত্বগত আলোচনা, সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যকর্ম মূল্যায়ন ইত্যাদিকে। অভিসন্দর্ভে সংখ্যাসূচক পর্ববিভাগ প্রায়ক্ষেত্রেই উল্লেখিত বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : আবুল ফজল

১. সমাজভাবনা

১৯২৫ সালে কলকাতায় 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সাহিত্যান্দোলন বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত মানবের অস্থির-অনিকেত-বিকলিত মনোজগতের দিকে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য করে। কবিতার মাধ্যমে পোড়োজমির দিকে এই দৃষ্টিপাতকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পালাবদল মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধোত্তর তারুণ্যে প্রথম চাঞ্চল্য ও উজ্জীবনী মন্ত্র ছড়িয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম; *কল্লোল* প্রকাশিত হওয়ারও আট মাস আগে, *ধূমকেতু* (১৯২২) পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে।[১] শুধু তাই নয়, আধুনিকতার আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছিল *বাঁধনহারা* (১৯২০) নামে বন্ধনমুক্তিতে এবং *মোসলেম ভারত* পত্রিকায়[২] 'কামাল পাশা' (১৯২১) ও 'বিদ্রোহী' (১৯২২) কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে– তাও *কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-পরিচয়* প্রকাশের অনেক আগেই। সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র না হলেও ঢাকার তরুণ মুসলিম সাহিত্যসেবীদের কাছে এই যুগান্তর-লক্ষণ অগোচর বা অনাস্বাদিত ছিল না। ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি আব্দুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৭)-সহ কতিপয় ছাত্রের উদ্যোগে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল হুসেনের (১৮৯৭-১৯১৮) পৃষ্ঠপোষকতায় 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজের তরুণ কর্মী হিসেবে প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিলেন আবুল ফজল[৩] (১৯০৩-১৯৮৩)। '*শিখা*' (১৯২৭) এই সংগঠনেরই মুখপত্র যার আপ্তবাক্য 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। তাদের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজকে সর্বপ্রকার অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা। কিন্তু সাহিত্যবোধ ও সমাজচেতনা গোষ্ঠীর জন্য নয়, বৃহত্তর মানব সমাজের জন্য। আবুল ফজলও 'শিখার' হয়েও তাঁর সময়ের প্রগতিশীল শিক্ষিত বাঙালি মানসের প্রতিভূ, মানবতাবোধ ও বিশ্বজনীনতায় ব্যাপ্ত। বর্ণিত প্রেক্ষাপটের ধারাবাহিকতায় বাঙালি মুসলমানের চিন্তাজগতে রেনেসাঁস্নাত আধুনিক যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার উত্তরসাধক হিসেবে আবুল ফজলের অবস্থান চিহ্নিত করে তাঁর প্রবন্ধসমূহ মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

আবুল ফজলের মানসজগতে তাঁর পিতা মাওলানা ফজলুর রহমানের স্বধর্মপ্রাণ ঋষিমূর্তি, উদারতা এবং বিশেষত সত্যনিষ্ঠার বিপুল প্রভাব গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য। সেই সঙ্গে আরেক বিপরীতস্রোতে, চিন্তা-আদর্শ ও মনোজগতের নিবিড় বন্ধু সহপাঠী দিদারুল আলমের (১৯০৩-১৯২৯) প্রেরণা ও সৃজনশীলতার সান্নিধ্যও আবুল ফজলের মানসনির্মিতিতে রেখেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পিতার সত্যনিষ্ঠা ও উদারতা, দিদারুলের সমাজ-সাহিত্যপ্রীতি এবং পরবর্তীকালে 'শিখা' গোষ্ঠীর সমাজবোধ যুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে এক নির্ভীক, নিরলস সাহিত্যকর্মী আবুল ফজলকে। আমৃত্যু তাঁর সকল চিন্তায় দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'বুদ্ধিরমুক্তি আন্দোলন', উদার জ্ঞানচর্চা ও সমাজের অসঙ্গতি উৎপাটনের অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর অনুবাদ, গল্প, নাটিকা, উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বাঙালি মুসলমান সমাজের কথাই নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তবে প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নধর্মী রচনায় আবুল ফজল মনোনিবেশ করেছিলেন, যার অধিকাংশই সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত বা পঠিত। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর থাকলেও প্রবন্ধে তা আলোচনা বা ব্যবচ্ছেদ আবুল ফজলের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণবাঞ্ছায় যেকোন পরিস্থিতিতে প্রকৃত সত্য উচ্চারণের প্রয়োজনে আবুল ফজল কখনও নির্বিকার বা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না বলেই তাঁর সময়ের সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ ও জনহিতৈষী বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রায়মহলেই মান্য। দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের জয়, ব্রিটিশ উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষ থেকে ঔপনিবেশিক শক্তির বিদায় ও দেশ-ভাগের বিয়োগান্ত অধ্যায়ের মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টি, পরপরই ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তায় অনুপ্রাণিত বাঙালির রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়– সবই আবুল ফজলের সজ্ঞান জীবনপরিসরে একের পর

Dhaka University Institutional Repository

এক ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ ঘটনা। তাঁর মানসগঠনে এসবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগসাজশ থাকাই স্বাভাবিক। তাঁর নিজের কথায় এর সমর্থন পাই–

> অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটেছে বার বার। রাজনীতির প্রভাব এত সর্বব্যাপক যে, লেখকদের পক্ষেও নির্লিপ্ত বা উদাসীন থাকা আদৌ সম্ভব নয় এ যুগে। সব পরিবর্তন লেখকদের জন্য সব সময় শুভ আর সুসহ হয়েছে তা বলা যায় না। তবু সব অবস্থায় এ লেখক নিজের কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে। কারণ আমার বিশ্বাস, 'নীরব কবি' যেমন কবি নয়, তেমনি 'নীরব লেখক'ও লেখক নয়। তথাকথিত 'নীরব জ্ঞানী'কেও জ্ঞানী বলে মানতে আমি নারাজ। কারণ প্রকারান্তরে তা এক রকম সমাজ ঔদাসিন্যই। লেখককে প্রকাশ করতেই হয় ঐ ছাড়া তাঁর পক্ষে লেখক হওয়া বা লেখক থাকা সম্ভব নয়। তিনি সমাজের সন্তান, সমাজের অঙ্গ। (ফজল, ১৩৮২:প্রারম্ভিক)

প্রবন্ধকার আবুল ফজল শুরুতে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হিসেবে সাহিত্যের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাপকতর প্রসঙ্গ তাঁর আলোচনায় ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মননশীলতার চর্চা প্রকাশিত হয়েছে *বিচিত্র-কথা* (১৯৪০), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা* (১৯৬১), *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন* (১৯৬৫), *সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র* (১৯৬৮), *মানবতন্ত্র* (১৯৭২), *সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৪), *শুভবুদ্ধি* (১৯৭৪), *একুশ মানে মাথা নত না করা*(১৯৭৮), *সমকালীন চিন্তা* (১৯৭০), *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ* (১৯৭৯), *সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলি* (১৯৮০) এবং *নির্বাচিত প্রবন্ধ-সংকলন* (১৯৮১)-এর বিভিন্ন প্রবন্ধে। উদারনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আবুল ফজলের ভাববাদী, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী শিল্পীমানসের পরিচয় বিধৃত আছে এসব রচনায়।

১.১

আবুল ফজলের সমাজ-ভাবনা মূলত বাঙালি মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে এবং মুখ্যত তা প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্যালোচনার সুবাদে অথবা সামাজিক ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। সমাজের গতিশীলতা, জাড্যতা, কুসংস্কার, গলদ-অব্যবস্থা, রীতি-নীতি-আইন ইত্যাদি বিষয়ে আবুল ফজলের চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। রচনাবলীর ভূমিকায় আবুল ফজল তাঁর মানসপরিমণ্ডলে সময় ও সমাজের প্রতিফলন সম্পর্কে স্মরণীয় মন্তব্য করেছেন–

> ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে আমাদের জন্ম। দেশ আর সমাজের ক্রম-রূপান্তর, ভাঙ্গা-গড়া আর উত্থান-পতন ছায়াছবির মতো আমাদের চোখের সামনে ঘটে গেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। তার অনেক কিছু অবিশ্বাস্য, অনেক কিছু অনিবার্য যা না ঘটে যেন পারেই না। এ পালা-বদলে মুনষ্যত্বের অত্যুঙ্গ মহিমা যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি তার চরম অপমৃত্যুও। স্বসমাজের দারিদ্র-লাঞ্ছিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হতশ্রী জীবন দেখে বারে বারে বিক্ষুব্ধ হয়েছি। ফলে শৈল্পিক পরিমিতিবোধ আর সংযমের বাঁধ রক্ষিত হয়নি আমার অনেক লেখায়। কোন কোন লেখায় মাত্রাধিক সোচ্চার হয়ে উঠেছে আমার বক্তব্য। (ফজল, ১৩৮২: প্রারম্ভিক)

ব্যক্তি বা মানুষ সমাজ সৃষ্টি করে। তাই আবুল ফজলের সমাজচিন্তায় মানুষই মুখ্য। আবার আবুল ফজলের বিবেচনায় সাহিত্যিকগণই সমাজের সবচেয়ে বিবেকবান,সচেতন, দায়িত্বশীল মানুষ। সমাজের বর্তমান অসঙ্গতি-অব্যবস্থা-ত্রুটি যেমন সাহিত্যিককে চিহ্নিত করতে হয় তেমনি তা থেকে উত্তরণের উপায় বা সম্ভাবনার পথ-নির্দেশ দেয়াও তাঁর কর্তব্য। জন্মসূত্রে আবুল ফজল আধা-সামন্ত, ঔপনিবেশিক ও রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে বেড়ে উঠেছেন। ফলে তাঁর সমাজভাবনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমান সমাজের ক্রমপরিণতি যেমন ধরা পড়েছে তেমনি আভাসিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর জাতিক-আন্তর্জাতিক বহুভঙ্গ বাস্তবতা। 'সমাজ ও সাহিত্যিক', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'সমাজ ও সংবাদপত্র', 'নারী জাগরণ', 'রোকেয়া', 'মিসেস আর. এস. হোসেন' ইত্যাদি প্রবন্ধে আবুল ফজলের সমাজভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যিক সমাজেরই অঙ্গ। সমাজেই তাঁর উৎপত্তি, সমাজেই তাঁর লয়। আবার সামাজিক প্রয়োজনেই হয়েছে ভাষার সৃষ্টি– যে ভাষা হচ্ছে সাহিত্যের বাহন, সাহিত্যিকের মন-মানসের প্রতিরূপ। এভাবে সমাজ-সাহিত্য-

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিক একসূত্রে গাঁথা। সমাজ ও সাহিত্যিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব সমাজের। কারণ ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টি বড়। লেখকের ''কাঁচামাল' অর্থাৎ রচনার উপকরণের একমাত্র সরবরাহ ক্ষেত্র হল সমাজ– সামাজিক মানুষ।' তাই সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব এক মহৎ কর্তব্য– বরং সাহিত্যিকের ওপর এই দায়িত্বের দাবি অধিকতর। কারণ, তাঁর কার্যকারণ ও রচনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং তার প্রতিক্রিয় দেশ-কাল-পাত্রকেও ডিঙিয়ে। সুদৃঢ় সামাজিক ভিত্তির ওপর মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যিকের ধর্ম। (ফজল, ২০০৮:৪৩-৪৪)

লেখকরা 'সমাজের অস্বীকৃত বিধান-রচয়িতা'– শেলীর এই মন্তব্যের প্রেরণায় আবুল ফজল সাহিত্যিকদেরকে ভবিষ্যৎ-সমাজের স্বপ্ন-ছবি দেখার সাহসী দ্রষ্টা। তাঁর ভাষায়–

> ভবিষ্যতে কেমনতরো সমাজ আরা চাই, কি ধরনের সমাজ আমাদের কাম্য তার ছবি লেখকরা যদি না দেখেন, না আঁকেন তা হলে যা আছে তাই থেকে যাবে, মানুষ তাকেই মেনে নেবে অদৃষ্ট কিম্বা নিয়তির দোহাই দিয়ে– বিধির বিধান মনে করে। দুর্গন্ধ দুর্গন্ধ মনে হলে মেথরের জীবনও মেথরের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠতো। সুরভিত জীবনের কোন ছবি তার কল্পনায় জাগে না বলেই অভ্যাসের গোলাম হয়ে পড়তে তার বাধে না। (ফজল, ১৯৬৮:৩৩১)

ভবিষ্যত সমাজের উজ্জ্বল ভাব-রূপ দেখানোর দায়িত্ব সাহিত্যিকের। সমাজের প্রগতিশীলতা মানে যুগজিজ্ঞাসায় সাড়া দিয়ে সমাজের অগ্রগতি। অতীতের সব ভালো নীতিগতভাবে ভালো থাকলেও আবুল ফজল মনে করেন 'জীবনে যদি তা গ্রহণ-প্রয়োগে অসম্ভব মনে হয় তাহলে মনে গোঁজামিল দিয়ে তা চালানোকে সমাজের অগ্রগতি বলে না' (ফজল, ১৯৬৮:৩৩৩)। সবরকম বিপ্লবের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজ-প্রগতির কাম্য পথ তৈরি করতে পারে বিপ্লব-সংগ্রামের ঐতিহ্য যা কেবল শিল্প-সাহিত্যের পক্ষেই গড়ে তোলা সম্ভব। তাই প্রবল বাধার মুখেও সাহিত্যিককে সমাজে শিল্পের বীজ বপন করে যেতে হয়।

লেখক সামাজিক জীব বলেই সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সে অধীন। আবুল ফজল অত্যন্ত বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন– 'লেখা একটি পণ্য, লেখকরা পণ্যোৎপাদনকারী'– এ পণ্যের উপরই নির্ভর করে লেখকের জীবিকা ও সামাজিক সত্তা (ফজল, ১৯৬৮:১৬৩)। শুধু তাই নয়, প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে লেখক ও লেখাকে অর্থনীতির চাহিদা ও সরবরাহ-তত্ত্বের সম্পর্কে উপস্থাপন করে আবুল ফজল সাহিত্যের সম্পূর্ণ ভিন্নতর এবং উপযোগবাদী ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন। এই সম্পর্ক সেকালে যতই দূরাগত মনে হোক না কেন, একালে অব্যর্থ বলে আমাদের মনে হয়–

> সাহিত্যও আজকের দিনে এ চাহিদা আর সরবরাহের নীতিতেই নিয়ন্ত্রিত। সাহিত্যের উৎকর্ষ, প্রকরণ আর বিষয়বস্তুও তাই চাহিদার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সমাজে যদি সৎ, আন্তরিক ও উচ্চ চিন্তার কদর থাকে লেখার মান আর গতিও সেভাবেই মোড় নেবে আর সমাজ যদি হাল্কা কৃত্রিম সিনেমাধর্মী রহস্য রচনারই অনুরাগী হয়ে ওঠে সাহিত্যেরও প্রধান প্রবণতা তা না হয়ে পারে না। (ফজল, ১৯৬৮:১৬৩)

'সমাজ সাহিত্য গড়ে না সাহিত্য সমাজ গড়ে' এমন জিজ্ঞাসার উত্তরে আবুল ফজল জানিয়েছেন– 'সাহিত্য আর সমাজের অগ্রগতি হতে হবে যুগপৎ । একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা অচল। এ দুই একে অন্যের পরিপূরক' (ফজল, ১৯৬৮:১৬৩)। তবে লেখক যেহেতু সামাজিক মানুষ তাই সমাজের উন্নতি তথা দেশের উন্নতি ছাড়া সাহিত্যের উন্নতিও আশা করা যায় না। অনুন্নত দেশে উন্নত সাহিত্যও অবাস্তব। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের ওতপ্রোত সম্পর্কের কারণেই সাহিত্যিকের দায় আছে সমাজকে গড়ে তোলায়। আবুল ফজল লেখকের সেই দায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন–

> সৎ ও আন্তরিক চিন্তা, যে চিন্তায় লেখকের আস্থা আর প্রত্যয় রয়েছে তার মূল্য সাহিত্য-শিল্পে অপরিমেয়। সাহিত্য শিল্পের মূল্য আর আবেদনও এ কারণে।.... চিন্তার সততাই লেখককে দিয়ে থাকে সত্য কথনের দুর্বার সাহস। মহৎ সাহিত্যের প্রাণ এ সত্য–এ সত্যের ফলেই সমাজ হয় কলুষমুক্ত। লেখায় সত্যের প্রতিফলন না ঘটলে সাহিত্য স্বধর্মচ্যুত হতে বাধ্য। (ফজল, ১৯৬৮:১৬৪)

Dhaka University Institutional Repository

১.১.২
নারী শিক্ষা, পরিবার ও সমাজে নারীর অধিকার, আত্মসম্মান আবুল ফজলকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে। বিশেষত অবরোধবাসিনী মুসলিম নারীর ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্পেষণ এবং ধর্মের নামে তাঁকে মানবিক অধিকার-বঞ্চিত রাখার প্রথা থেকে উদ্ধারের প্রয়াসে আবুল ফজল নিরলস কর্মী ও সচেতন সাহিত্যিক। মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্মী হিসেবে তাঁর তারুণ্যের অভিযান ছিল নারীকে অন্তঃপুর থেকে বাইরের পৃথিবীতে নিয়ে আসার। 'নারী জাগরণ' প্রবন্ধে এই সংস্কারমুক্ত উদার কর্মী-আবুল ফজলের পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক *জাগরণ* পত্রিকায় জনৈক কুমারী নূরজাহানের 'বঙ্গ-মুসলিম নারী জাগরণ' শীর্ষক রচনার প্রতিক্রিয়া হলেও এ বিষয়ে আবুল ফজলের অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুলিখিত রচনাগুলির একটি। মুসলিম নারীর অবরোধ প্রথার পক্ষে-বিপক্ষে সমকালে যে আন্দোলন ও বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল আবুল ফজল তা বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, বহু যুগের অবরুদ্ধতার কারণে নারী দেহ-মনে পঙ্গু হয়ে পড়েছে বলেই তাদেরকে অবরোধের বাইরে আনার চেষ্টায় তারা নিজেরাই সাড়া দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারীর ভীত ও দুর্বল মনকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করা। স্বাধীনতার জন্য যেমন বহু সাধনার দরকার, তেমনি তাকে ভোগ করার জন্যও উপযুক্ততা আবশ্যক– নয়তো 'জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা অনিবার্য্য' (ফজল, ১৩৮২:৬৩৮)। আবুল ফজলের মতে আধুনিক মুসলমান মেয়েদের স্বাধীনতার ব্যাপারে 'ক্রমশঃ-নীতি' অবলম্বনের কারণ–

> মুসলমান মেয়ের অধীনতা তাহার এক জীবনের অধীনতা নহে; বংশ পরম্পরায় বহু-জীবনের অধীনতার চাপ তাহার ভিতর জমাট বাঁধিয়া তাহাকে এমন পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে আজ হঠাৎ রাস্তায় হাঁটিতে গেলে পড়িয়া যাইবার ভয় আছে– রাস্তায় দাঁড়াইয়া সে আজ অন্যের চোখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে পারিবে না। এত দিনের অধীনতার যাঁতা-কলে পড়িয়া স্বাধীনতা যে কি, তাহাতে যে তাহারও অধিকার আছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য তাহারও যে স্বাধীনতার দরকার–এ কথা নারী আজ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে। কাজেই ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। (ফজল, ১৩৮২:৬৩৯)

নারীমুক্তির জন্য পুরুষের আন্দোলনকে সমর্থন করেননি আবুল ফজল। তাঁর মতে, নারীর অধিকারের কথা নারীরই বলা উচিত, অবরোধ দূরীকরণে তাঁর সম্মতিও প্রয়োজন। হাত পেতে নেয়ায় যে দীনতা আছে তা নারীর জন্য সম্মান বয়ে আনবে না বলেই আবুল ফজল মনে করেন। পুরুষ-নারীর মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজ গড়ে ওঠে, সমাজের অগ্রগতিও তাই কেবল পুরুষের উন্নতি দিয়ে সম্ভব নয়। সমাজে নারীর অংশগ্রহণ অর্থবহ করতে শিক্ষাদীক্ষায় তাঁর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। নারীকে কেবল ভোগ ও লালসার সামগ্রী মনে করার মধ্যেই যেহেতু অবরোধের মূল কারণ নিহিত তাই নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও আবশ্যক। নারীর মধ্যে যে ভোগাতীত শক্তি আছে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে যা জীবনের সবদিকে বিকশিত হয়ে সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে এই বিশ্বাস নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থাকা জরুরি। জীবনে নারীর মর্যাদাজ্ঞান ফুটিয়ে তোলা শিক্ষিত নারী-পুরষ উভয়েরই দায়িত্ব।

পত্র-পত্রিকায় যেসব নারী অবরোধ প্রথার সমালোচনা করে এই বর্বর প্রথা উঠিয়ে দিতে বলছেন তারাও নিজকে অবরোধের মধ্যে আচ্ছাদিত রেখে পূন্য অর্জন করাকেই পছন্দ করেন, এমনকি অবরোধের মধ্যে থেকে কুশল জিজ্ঞাসা করার মতো ব্যতিক্রমও তারা ঘটাতে উৎসাহী নন। তাই যেসব হিতৈষিনী কর্মিষ্ঠা নারী সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নারী স্বাধীনতা ও শিক্ষার কথা বলছেন তাদের প্রচেষ্টায় মুসলমান মেয়েদের মধ্যে তেমন আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে না।

মুসলমান মেয়েদের অবরোধ ছেড়ে বাইরে আসার উপায় হিসেবে কেবল শিক্ষকতা এবং চিকিৎসা পেশাকেই উপযুক্ত বা কার্যকর মনে করেন না আবুল ফজল, তাঁর আহ্বান 'মানুষের মঙ্গলামঙ্গলকে আদর্শ করিয়া জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক প্রয়োজনে মুসলমান মেয়েরা অবরোধের বাহিরে আসিবেন' (ফজল, ১৩৮২:৬৭৪)। যেমন–উচ্চশিক্ষা ছাড়া মুসলমান মেয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না তাই তাঁকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে আর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও দিতে হলে মুসলমান নারীকে অবরোধের বাইরে আসতে হবে। আবুল ফজল মুসলিম নারীকে এমনকি উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্যও প্রস্তুত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর প্রাণিত আহ্বান–

> আজ মুসলমান এই আন্দোলনে যোগ না দিলে, সেই দিন সেই আন্দোলনে মুসলমান ছেলে-মেয়েরা কি অন্যের অর্জ্জিত মুক্তি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে?... কাজেই এই স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমান মেয়েদের পরিপূর্ণ সাহায্য দরকার। এই জন্যও মুসলমান মেয়েদের অবরোধ ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে হইবে। (ফজল, ১৩৮২:৬৪৩)

বাঙালি মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষা ও অধিকার-সচেতনতার অগ্রদূত মিসেস্ আর.এস. হোসেন তথা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্মময় জীবনের সংগ্রাম-সাফল্য আলোচনা করে সমসাময়িক নারী সমাজকে উদ্দীপ্ত করতে লিখেছেন 'মিসেস্ আর. এস. হোসেন'। বহু প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে নারী শিক্ষার 'তাজমহল' সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অনমনীয় দৃঢ়তা, সকল বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করে নিজের অন্তর্নিহিত সাধনালব্ধ সত্যকে আঁকড়ে থাকার মানসিকতার আবেগঘন বর্ণনা দিয়েছেন আবুল ফজল। আবুল ফজলের ভাষায়–

> সন্তানহীনা বিধবা– উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা অতুল সম্পত্তি তাঁহার সহায় ছিল না। তথাপি আজ বহু বৎসর হইতে এই মহিমময়ী নারী কী নির্ভীক অনম্য হস্তে নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতার পতাকা বহিয়া চলিয়াছেন– আজিও সে চলা বন্ধ হয় নাই। (ফজল, ১৩৮২:৬৭৬)

রোকেয়ার প্রাণান্ত প্রচেষ্টার পরও সমাজে নারীর আশানুরূপ সাড়া না পাওয়াতে হতাশ হয়েছেন আবুল ফজল। সমাজসেবার নামে আত্মস্বার্থপরায়ণ ও আত্মপ্রচারেরত কতিপয় মানুষের ক্ষুদ্রতাকে তাচ্ছিল্য করে রোকেয়ার নিঃস্বার্থ ও নীরব সমাজসেবা-নারীসেবাকে উপস্থাপন করেছেন অলঙ্কৃত শব্দাবলিতে–

> বন্ধনক্লিষ্ট বাংলার নারী-আত্মা তাঁহার লেখনীমুখে ফরিয়াদ করিয়া উঠিয়াছে। বহুদিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতালপুরী হইতে সে যেন পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়। এ মুক্তির বাণীর জন্য ভবিষ্যৎ বাংলার নারীজাগরণের ইতিহাস লেখক তাঁহাকে বা তাঁহার সাহিত্যকে ভুলিতে পারিবে না। যশের কাঙ্গাল বাঙ্গলা! যে দেশে নিজের কাগজে নিজেকে বঙ্গ-গৌরব, হজরত মৌলানা অমুক তমুক ইত্যাদি লেখা হয়, সে দেশে একটি মেয়ের যশ, সুখ্যাতি ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দুই হাতে যশ ও সম্মানকে উপেক্ষা করিয়া শুধু নিজের সাধনাকে জয়-যুক্ত করিবার চেষ্টায় নিজেকে দিনে দিনে ক্ষয় করিয়া দিতেছেন, ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নয়? তিনি বয়োবৃদ্ধা পর্দ্দার বাহিরে আসা, বিশেষত এ বয়সে হয়তো তাঁহার সংস্কারে বাধে না, কিন্তু এ ধূয়া ধরিয়া পাছে কেহ তাঁহার সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার চেষ্টা করে– যে সাধনার ভিতর দিয়া শত শত নারী জ্ঞান ও আলোকের পথে চলিয়াছে– এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার নিজের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও বিসর্জ্জন দিয়াছেন। (ফজল, ১৩৮২:৬৭৮)

বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত মুসলিম নারী শিক্ষার স্কুলকে বাংলার 'দাম্পত্য প্রেমের অভিনব তাজমহল' এবং নারীকল্যাণে নিজকে তিলে তিলে নিবেদনকে 'অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের কুতুবমিনার' হিসেবে বর্ণনা করেছেন আবুল ফজল (ফজল, ১৩৮২:৬৭৯)। আশা প্রকাশ করেছেন এটি হবে নরনারীর তীর্থস্থান ।

১.১.৩

আবুল ফজল পেশাগত জীবনে শিক্ষকতা করেছেন মাদ্রাসা থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত। অবসর গ্রহণের পর স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। জীবনের উপান্তে এসে, ১৯৭৫-পরবর্তী সামরিক সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল অবস্থানে তাঁর বিচরণ-পরিক্রমা পূর্ণ হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য-অভিমত

Dhaka University Institutional Repository

যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে[৪] আবুল ফজলের আলোচনার ধরন কেবল একজন দর্শকের, বিশ্লেষকের নয়। ঔপনিবেশিক বা পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মাঠপর্যায়ের চিত্র এতে পাওয়া যায় যা অনেকটা বিবরণধর্মী এবং উপদেশমূলক।

নিজে 'নিউ স্কিম' মাদ্রাসার ছাত্র[৫] হয়েও একজন পরিপূর্ণ শিক্ষক হিসেবে ইংরেজ আমলের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আবুল ফজলের অগাধ আস্থা ও মুগ্ধতা বিশেষ গুরুত্ববহ। তিনি সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থার এবং শিক্ষার মানের সাথে তুলনা করে ইংরেজ প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। ইংরেজের শিক্ষাব্যবস্থা কেবল কেরানি তৈরি করার শিক্ষা ছিল– প্রচলিত এই 'ঢালাও' মন্তব্যে বাস্তবকে অস্বীকার করা হয় বলে মনে করেন আবুল ফজল। তাঁর মতে, সেই শিক্ষায় শিক্ষিতরাই পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু করে গবেষণা, সাংবাদিকতা সর্বত্র সকল বৃহত্তর অর্জন ও সামাজিক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করছে। বাংলা বা উর্দু যেহেতু তখন পর্যন্ত জাতীয় ভাষার মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি তাই আবুল ফজল তৎকালীন জাতীয় সংহতির জন্য ইংরেজি ভাষার প্রচলন বাড়াতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আবুল ফজল নিজে *স্যাডলার কমিশনের* রিপোর্টের ভিত্তিকে সংস্কারকৃত নিউ স্কিম মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন, স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ ও পরামর্শকে তিনি দেশীয় শিক্ষার জন্য অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করতেন।[৬]

আবুল ফজলের মতে 'শিক্ষা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার– শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ দুই-ই। এর পেছনে দীর্ঘ প্রস্তুতি চাই, বিশেষ করে মানসিক প্রস্তুতি।' (ফজল, ১৯৭৪:৬৪) তাই শিক্ষাসূচি আর শিক্ষা প্রস্তুতিতে স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর মনে করেন তিনি। কারণ ছাত্রের শিক্ষাজীবনের ভিত রচিত হয় এ স্তরে। তাই এ স্তরের পাঠ্যসূচি হওয়া উচিৎ যথাসম্ভব সরল ও জটিলতামুক্ত। 'পরিমাণের উপর জোর না দিয়ে গুণের উপর জোর দেওয়া হলেই ভালো ফল লাভের সম্ভাবনা বেশী।' (ফজল, ১৯৭৪:৩৯)

আবুল ফজলের শিক্ষাচিন্তা ধর্মনিরপেক্ষ, উদার ও মানবিক শিক্ষার বিকাশসাধনের পক্ষে সবসময়ই বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭১ পূর্ববর্তীকালে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল জাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে প্রবল করার উদ্দেশ্যে। এই বিতর্ক তখন সমাজের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ উৎসাহ, সংঘর্ষও সৃষ্টি করেছিল বলে জানা যায়।[৭] এসময় আবুল ফজল ধর্মীয় শিক্ষার নানা সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর মতামত উপস্থাপন করেছিলেন। তবে তাঁর মতে, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সাথে ধর্মহীনতার কোন সম্পর্ক নেই, এমনকি তা ধর্মবিরুদ্ধও নয়।এ বিষয়ে আবুল ফজলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা[৮] উল্লেখযোগ্য–

> ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা মানে ধর্মহীন শিক্ষা নয়। তা হলে সেক্যুলার দেশগুলিতে এত সব মহাপ্রাণ ধার্মিকের আবির্ভাব ঘটতো না। মানব-কল্যাণ উৎসর্গিত-প্রাণ যত মানুষ ওইসব দেশে দেখা যায়, আমাদের মতো ধর্ম-প্রাণ জাতিতে তার সিকি পরিমাণও তো দেখা যায় না। সেক্যুলার দেশেও ধর্ম আছে, ধর্ম-শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান পালিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের একমাত্র দাবি তো ধর্ম-শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে না আনার। ধর্ম-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি চালু থাক, তার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তর পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ যেমন আছে তা অব্যাহত থাক তাতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পক্ষপাতীদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। (ফজল, ২০০৮:১৯০)

বৃটিশ আমলের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতির উদাহরণ দিয়ে আবুল ফজল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, সেই পদ্ধতি থেকেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত ধার্মিক মুসলমানের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণার খণ্ডন করে লিখেছেন 'ইসলামি শিক্ষা পদ্ধতি দাবি করা যেমন ঈমানের অঙ্গ নয়, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি দাবি করাও ঈমানের বরখেলাপ কিছু নয়' (ফজল, ১৯৭৪:৭৩)।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মান্ধতাকে দৃষ্টির অন্ধত্বের চেয়ে বড় উল্লেখ করে আবুল ফজল জানিয়েছেন 'চোখের অন্ধতা শুধুমাত্র দৃষ্টিশক্তিই হরণ করে, কিন্তু ধর্মান্ধতা হরণ করে বুদ্ধি-যুক্তি-বিচার-বিবেক আর সব রকম মূল্যবোধ।'(ফজল, ২০০৮:১৮৮) তাই ধর্মভিত্তিক শিক্ষাকে যারা ধর্ম মনে করেন তাদের অন্ধত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে 'ধর্মভিত্তিক বনাম ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রসঙ্গে' প্রবন্ধে আবুল ফজলের যুক্তি–

> আরবদের মাতৃভাষা আরবি-কোরান-হাদিস, ফেকা-উসুল-তফ-সির ইত্যাদি যা কিছুকে এক কথায় ইসলামি ধর্ম-বিদ্যা বলা হয় তা সবই আরবিতে। শিক্ষা-জীবনের শুরু থেকেই আরবেরা এসবের সঙ্গে পরিচিত (এ সবকে বাদ দিয়ে ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা আর কাকে বলা হয় আমার জানা নেই)। তবুও শ্রেষ্ঠ ধার্মিকের আদর্শ কি এ যুগের আরবরা? (ফজল, ২০০৮:১৮৮)

বরং ধর্মীয় শিক্ষার নামে এই অন্ধত্ব ইসলামের প্রাচীন খারেজি-শিয়া-সুন্নি-ওহাবি-কাদিয়ানি-ফরায়েজি-লা-মজহাবি ইত্যাদি নানা নামে চিহ্নিত ধর্মীয় 'বহুত্ব'কেই বরং উৎসাহিত করছে। এ শিক্ষার যারা সমর্থক তাঁদের কথা ও কাজের স্ববিরোধিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবুল ফজল লিখেছেন–

> মনে হয় এঁরা যে-ধর্মভিত্তিক শিক্ষা চান সে শুধু পরের ছেলের জন্যই, নিজের ছেলেমেয়ের জন্য নয়। যে শিক্ষাপদ্ধতি এঁরা নিজের ছেলেমেয়ের জন্য অকেজো আর অনাবশ্যক মনে করেন সে শিক্ষা-পদ্ধতি এঁরা দাবি করছেন পরের ছেলেমেয়েদের জন্য। (ফজল, ২০০৮:১৮৯)

ধর্মনিরপেক্ষ তথা সেক্যুলার শিক্ষা যেহেতু ঐহিকতার শিক্ষা, তাই তার সাথে ধর্মের পারলৌকিকতার সম্পর্ক না থাকাই যুক্তিসংগত। অন্যদিকে রাষ্ট্র মানুষের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জাগতিক বিষয়ে দায়িত্ব নেয়, কোন পারলৌকিক জীবনের দায়িত্ব নেয়া বা মানুষকে ধার্মিক বানানোর দায়িত্ব গ্রহণও তার পক্ষে অসম্ভব। আবুল ফজল মনে করেন, তাতে রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতি তো হয়ই সমাজের প্রতি বা মানুষের প্রতি তাঁর দায়িত্বও হয় বিপর্যস্ত । তবে মানুষের আত্মার বিকাশ সাধনে ধর্মের শাশ্বত ভূমিকার কথা আবুল ফজল অস্বীকার করেন না। (ফজল, ২০০৮:১৯১)

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবুল ফজল প্রথানুরাগী ও আদর্শবাদী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের প্রতিষ্ঠাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবককে সমাম দায়িত্বশীল হওয়ার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন আবুল ফজল। তুচ্ছ কারণে শিক্ষাজীবনের ক্ষতি করে ধর্মঘট পালন করা অনুগত্যহীনতার সংস্কৃতি এবং তা বর্জনীয় বলে মনে করেন তিনি। শিক্ষা সম্পর্কীয় ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা শিক্ষকের হাতে থাকা উচিত বলে মনে করেন আবুল ফজল। তাঁর মতে, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য যুক্তি বিচারের চর্চা কারণ 'কাঁচা বয়সে যুক্তিহীনতা একবার প্রশ্রয় পেলে তাকে সহজে দমানো যায় না' (ফজল, ১৯৬৮:৪১)। ছাত্রদেরকে 'র‍্যাশনাল' তথা যুক্তিবাদী করে তোলা শিক্ষকের দায়িত্ব এবং তা করতে পারলে শিক্ষার অর্ধেক উদ্দেশ্য হাসিল হয় বলে তিনি মনে করেন।[৯] ব্যয়বহুল ক্যাডেট কলেজ শিক্ষার বিস্তার দিয়ে শিক্ষা-চাহিদার শতভাগের একভাগও মিটানো সম্ভব নয়। বরং সেখানে জীবনযাত্রার এমন একটা কৃত্রিম মান তুলে ধরা হয় যার সাথে চারদিকের সমাজের কোন সম্পর্ক নেই বলে অভিমত আবুল ফজলের।

১৯৬৬ সালের বাস্তবতায় লেখা 'দেশ ও দেশের ছাত্র সমাজ' প্রবন্ধে আবুল ফজল ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মত উপস্থাপন করেছিলেন, আজকের প্রেক্ষাপটেও যা সমান গুরুত্ববহ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যতটুকু ছাত্র-রাজনীতি প্রচলিত তাতে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ই শুধু গুরুত্ব পাওয়া উচিত অথচ দেখা যায় ঐ সীমিত কর্মকাণ্ড ও নির্বাচন নিয়েই ছাত্রদের মধ্যে মারামারি ও হানাহানি। তাই ছাত্রদেরকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পালনে পরমতসহিষ্ণু হওয়ার ও হার-জিত মেনে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আবুল ফজল। তিনি প্রচলিত ছাত্র-রাজনীতির পক্ষে নন –'ছাত্ররা সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকুক– দেশ বা জাতীয় স্বার্থ যেখানে জড়িত নেই, তাদের শিক্ষা-জীবনের বাইরে যে সবে তাদের নাক গলান উচিত নয়' (ফজল, ১৯৬৮:১৮৮)। কিন্তু এও বিবেচ্য যে, সারা দেশ আর গোটা সমাজ

যদি রাজনীতিগ্রস্ত হয় তাহলে ছাত্রদেরও গা বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। এর জন্য আবুল ফজল দায়ি করেন, সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। তাঁরা দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠতে পারলে দেশের সর্বস্তরের রাজনীতিতে এত শোচনীয় পরিণতি নেমে আসতে পারতো না বলেই তাঁর বিশ্বাস। পরীক্ষায় নকল, পাঠ্যবই সংশোধনে স্বেচ্ছাচার, শিক্ষা কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের মর্যাদা না দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে চরম অব্যবস্থাপনার চিত্র আবুল ফজল তুলে ধরেছেন 'শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা প্রায় নৈরাজ্যের সম্মুখীন' প্রবন্ধে । তবে এসব বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের চলতি আলোচনার সাথে সম্পর্কিত এবং সাময়িক।

১.১.৪

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ভূমিকা দেশ ও সমাজগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্রকে 'চতুর্থ রাষ্ট্র' 'জাতির কণ্ঠস্বর' ইত্যাদি এবং সাংবাদিককে 'সমাজজীবনের ডাক্তার' বিশেষণে প্রশংসিত করে উভয়ের স্বাধীনতার আবশ্যকতা সম্পর্কে আবুল ফজলের স্মরণীয় মন্তব্য–

> 'ডাক্তারের যেমন রোগীর রোগ নির্ণয়ের পুরোপুরি স্বাধীনতা থাকা চাই তেমনি সংবাদপত্রেরও সংবাদ প্রকাশের আর সমাজদেহকে তন্ন তন্ন করে বিচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন। এ না হলে শুধু যে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতা দুর্বল হয়ে পড়বে তা নয়, দেশ, সমাজ আর জাতিও হয়ে পড়বে হীনবল, রক্তহীন আর ফ্যাকাশে। (ফজল, ১৯৬৮:১৪৫)

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনামলে সংবাদপত্রের ওপর সরকারি বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং জাতীয় স্বাধিকার আন্দোলনে বিস্ফোরিত উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে আবুল ফজল একাধিক প্রবন্ধে[১০] দেশ ও সমাজগঠনে সংবাদপত্রের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে 'সরকার সমর্থক' আর 'সরকার বিরোধী' কথা দুটি তাঁর পছন্দ নয়। এই বিরোধের শুরু সরকারের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়ার ফলে। 'চোখ বুঁজে সরকারের সমর্থন বা নির্বিচারে সরকারের সমালোচনা কখনো সংবাদপত্রের আদর্শ হতে পারে না' বলে আবুল ফজলের অভিমত (ফজল, ১৯৬৮:১৪৮)। সংবাদপত্র সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রভূতভাবে সহায়তা করতে পারে। রাষ্ট্র যখন অসীম বা এককভাবে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী হয় সংবাদপত্র পারে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে। তবে যে সমাজের জন্য তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশা করেন সেই সমাজের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তিনি আশাবাদী ছিলেন না, একাত্তর-পূর্ব রাজনীতিতে 'ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার কথা যে মাঝে মাঝে শোনা যেত, তা অনেকখানি সাময়িক সুবিধাবাদ বলেই' আবুল ফজলের মতে হয়েছিল কারণ 'যাঁরা তা বলেন, তাঁরা নিজেরাও জীবনে তা পালন করেন না' (ফজল, ১৯৬৮:১৫১)। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ঐক্য এবং সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট হয়ে সমাজে চলছিল একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থা, ধনবৈষম্য প্রকট হয়ে উঠছিল। ফলে ভারসাম্যহীন সমাজব্যবস্থায় ব্যবধান বাড়ছিল আদর্শ আর বাস্তবতায়। মনের কথা খুলে বলার মতো অবস্থাও তখন ছিল না, তবু সাধ্যানুযায়ী নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি ব্যক্ত করার কাজ করতেই হবে সকলের, সংবাদপত্রেরও। তৎকালীন প্রবীণ সমাজকর্মী হিসেবে আবুল ফজলের নির্দেশনা–

> অবস্থাকে মেনে নিয়েই অবস্থাকে বদলাবার সাধনা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অবস্থাকে বদলে বদলেই এগুতে হবে আমাদের। এক অবস্থা পেরিয়ে অন্য অবস্থায় উত্তরণের নামই সভ্যতার অগ্রগতি– সমাজের বিবর্তনও ঘটে এভাবে।
> (ফজল, ১৯৬৮:১৫৩)

একাত্তর-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশেও সংবাদপত্র বা লেখকের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রের পীড়ন, নিয়ন্ত্রণের তেমন কোন পরিবর্তন না হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করে আবুল ফজল লিখেছিলেন শাসকগোষ্ঠী বা ক্ষমতাসীনরা সবসময়ই সৃষ্টিশীল মানুষের কণ্ঠরোধ করতে চায়, সমাজে বুদ্ধিজীবীদেরকে দেখে সন্দেহের চোখে, ক্ষমতার সীমা ছাড়ানোই তাদের স্বভাব। কিন্তু তাঁরা ভুলে যায় যে, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা মানে জাতির স্বাধীনতা হরণ করা,

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংবাদপত্রকে দুর্বল ও ক্ষীণ কণ্ঠ করে দেয়া মানে জাতিকে দুর্বল ও রুদ্ধবাক করে দেওয়া।' (ফজল, ১৯৮৫:৪৮) তাছাড়া বর্তমানে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিশ্বপরিমণ্ডলে রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাই সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, রাষ্ট্র সম্পর্কে সমাজের মানুষের স্বচ্ছ ধারণার জন্য সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের কলমের স্বাধীনতা আবশ্যক।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সমাজে শান্তির প্রকৃত রূপ কতটা অচেনা এবং দূরাগত হয়ে পড়েছিল তার চিত্র পাওয়া যায় আবুল ফজলের 'বৌদ্ধধর্ম ও বিশ্বশান্তি' প্রবন্ধে। পৃথিবীতে বারবার মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়, মনুষ্যত্ব হয় বিপর্যস্ত, মানুষে-মানুষে হানাহানি, রক্তপাত, হিংস্রতার শেষ নেই। কারণ শান্তি ও মৈত্রীর কথা কেবল মুখেই শোনা যায়, বাস্তব আন্তরিক প্রয়াসের ভীষণ অভাব। আবুল ফজল বৌদ্ধধর্মের শান্তির বাণীর মধ্যে বিশ্বমানবতার শান্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। তবে তাঁর বিশ্বাস পৃথিবীতে শান্তি আনতে হলে শক্তিমন্ত দেশগুলোর প্রচেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতা থাকতে হবে–

> এই শান্তি হচ্ছে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের মৌখিক বুলি, এর সঙ্গে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই, নেই মনুষ্যত্বের যোগাযোগ। এটা নিছক ব্যক্তিগত, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ হাসিলের এক-রকম ফন্দি-ফিকির মাত্র। ব্যক্তি তথা মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু কাগজ-পত্রে শান্তির বাণী প্রচার করলে তা ভাল প্রপেগেণ্ডা হতে পারে কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা তাতে হবে না। তাই আমাদের জীবদ্দশায় আমরা দু'দুটা নরমেধযজ্ঞ দেখতে পেলাম। এখনও পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই, বিশেষ করে সামরিক শক্তিমত্ত দেশগুলি অহরহ মুখে শান্তির বাণী আউড়াচ্ছে আর হাতে কলমে তৈরী করছে বিচিত্র ও বিপুল ধ্বংসকর আণবিক বোমা। হাতে এদের আণবিক বোমা, মুখে শান্তির ললিত বাণী। (ফজল, ১৯৬৮:৯৫)

মনের ভিতর ছুরি শান দিতে দিতে মুখে শান্তির বাণী আউড়ালে যে শান্তি নামবে তা হল 'কবরের শান্তি, শ্মশানের শান্তি, তা কখনো জীবনের শান্তি নয়' (ফজল, ১৯৬৮:৯৫)। তাই, আবুল ফজল মনে করেন, ব্যক্তি মানুষের মন থেকে যদি হিংসা বিদ্বেষ দূর না হয় তাহলে বিশ্বশান্তি চিরকালই মানুষের নাগালের বাইরে থাকবে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের আদর্শ আবুল ফজলের সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনের আলোকবর্তিকার কাজ করেছে' (খোন্দকার, ১৯৮৪:৪৫৯)। মুসলিম সমাজের অগ্রগতির ও ব্যক্তির বিকাশের পথে বাধা হয়ে থাকা দৃঢ়মূল সংস্কারের জগদ্দলকে সরানোর জন্য আবুল ফজল তাঁর বিভিন্ন লেখায় যে আওয়াজ তুলেছেন তাতে 'উদ্দেশ্যমূলকতা ক্রিয়াশীল থাকলেও শিল্পীর স্বভাবজ প্রেরণায় সে রচনা শিল্পগুণমণ্ডিত' (খোন্দকার, ১৯৮৪:৫০২)।

Dhaka University Institutional Repository

১.২.১ সংস্কৃতিভাবনা

আবুল ফজলের সংস্কৃতিভাবনা দেশ-ধর্ম-সীমানাহীন উদার-মানবিক মূল্যচেতনায় গড়ে উঠেছে। সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ কোনো সংস্কৃতিতে আবুল ফজল বিশ্বাসী নন। 'বিচারপরায়ণতা ও গ্রহণশীল মন দিয়ে এ বিশ্বকে জানার চেনার ও আপন করে নিয়ে সুন্দর ও মহৎ ভাবে জীবনযাপনের উপায়কেই তিনি সংস্কৃতি বলে মনে করতেন' (শিখা, ২০১৪:১৬৯)। তাঁর শুভচিন্তা, নৈতিক ও বিবেকী বোধ সবই মানুষ, মানবিকতা বা মানবতন্ত্র-উদ্ভূত। পাশ্চাত্য আধুনিকতার অন্ধ-অনুকরণ বা বাঙালি মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদ রক্ষণশীলতায় মুখ বুঁজে থাকা কোনটিই আবুল ফজলের মনঃপুত হয়নি। বরং বাঙালির গ্রহণশীলতা ও আবেগ-ঘনিষ্ঠতাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রগতিমুখ্য মুক্তচিন্তায় অবগাহনই ছিল তাঁর চরিত্রানুগ। তাঁর সংস্কৃতিভাবনাও তাই সাহিত্যচিন্তারই প্রতিফলন। সংস্কৃতিসাধনার প্রধান লক্ষ্য জীবনে মাত্রাজ্ঞান ও পরিমিতিবোধ জাগিয়ে তোলা, সাহিত্যে মানুষ সেই সাধনার কাজটিই করে। কেবল দেহের দাবী নিয়ে যে বেঁচে থাকা তা পশুজীবনের, মানুষের নয়। দেহের উর্ধ্বে মানুষের আরো যে দাবী আছে আবুল ফজলের কথায় 'সে দাবী মনের দাবী, আত্মার দাবী, প্রতিভার দাবী। এই দাবী পূরণের দায়িত্ব ও ভার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিসেবীদের উপর' (ফজল, ১৯৬১:১)।

সংস্কৃতি সম্পর্কে ক্লাইভ বেল তাঁর Civilization গ্রন্থে যে ধারণা দিয়েছেন তার ওপর অনেকটা নির্ভর করেছেন আবুল ফজল; মুসলিম সাহিত্য সমাজের তথা কালের দিক নির্দেশনাও সম্ভবত সেদিকেই ছিল। বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানব সভ্যতার ভবিষ্যত অনিশ্চয়তায় ইয়োরোপের মনীষীদের উদ্বেগ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। তখন স্বাভাবিকভাবেই এই চিন্তার আঘাত সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালের পূর্ব-বাংলায়ও নতুন চিন্তার আলোড়ন তোলে। আবুল ফজলও দেখেছেন 'চোখের সামনে দু-দুটো প্রলয়ংকর মহাযুদ্ধ ঘটে গেল... দুই বিপরীত পক্ষ তাদের যুদ্ধনীতির সমর্থনে দোহাই পেড়েছেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির.... আমাদের দেশেও অপেক্ষকৃত সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে যে নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে তারও পেছনে সক্রিয় প্রেরণা যুগিয়েছে ধর্মের নাম ও সংস্কৃতির সংকট। ইউরোপ আমেরিকা রাষ্ট্রকে সংস্কৃতি আর আমাদের দেশ সংস্কারকে সংস্কৃতি ধরে নিয়ে নিজেদের পশু-মানসের সমর্থন খুঁজেছে ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আড়ালে' (ফজল, ২০০৮:১১১)। কিন্তু যে বাস্তবতায় ক্লাইভ বেল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রহণ ও সমজদারির পরামর্শ দেন সেই বাস্তবতায় আবুল ফজল নেই। একারণে আবুল ফজলের সংস্কৃতিচিন্তার ক্ষেত্রে একটা স্ববিরোধিতা আছে বলে মনে করেন আনোয়ার পাশা (পাশা, ১৯৮১:৩৯২)।

সংস্কৃতি কি? বা কেন? এমন উত্তর সন্ধান করতে গেলে আবুল ফজলের 'সংস্কৃতি', 'সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' ইত্যাদি প্রবন্ধে ইংরেজ প্রাবন্ধিক ক্লাইভ বেলের অনেক মন্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। যেমন–মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যসাধনাই সংস্কৃতি, সংস্কৃতি বিচিত্র ও বহুবর্ণ। কারণ জীবন বহুবর্ণ– সংস্কৃতির সাধনা জীবনের সাধনা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে-কোন গোঁড়ামি আত্মবিনাশী ও মারাত্মক। সংস্কৃতির ধর্ম গ্রহণ– বর্জন নয়। তবে যখন 'জীবিকার চেহারা বদলের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির চেহারাও-বদলে যায়–যেতে বাধ্য'এবং যারা 'সংস্কৃতিসাধনায় এই গতি-প্রগতির ধারা বুঝতে পারেন না, ধরতে পারেন না, উপলব্ধি করতে পারেন না সেই সব স্থবিরদের সংস্কৃতিসাধনা আজকের দিনে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হতে বাধ্য' (ফজল, ১৯৬১:৩)– আবুল ফজলের এই দৃষ্টিভঙ্গি কৃচিৎ প্রকাশিত হলেও এটি সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর বহুল বিবৃত চিন্তাচেতনার অনুগামী নয়– ব্যতিক্রম। তাই এমন প্রত্যয়কে 'দ্বিধাগ্রস্ত' বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আনোয়ার পাশা। কারণ আবুল ফজল সংস্কৃতির শাশ্বত রূপে বিশ্বাসী। তাহলে এই দ্বিধা বৈপরীত্ব নয় কেন এমন প্রশ্নও হয়তো অমূলক নয়। আনোয়ার পাশা তার উত্তর দিয়েছেন এভাবে–

> তিনি [আবুল ফজল] যা বলতে চান সেটি এই যে, সংস্কৃতির নামে কোনো ধর্মীয় কিংবা জাতীয় সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না– বাস্তব ক্ষেত্রে এই সংকীর্ণতা দেশের মধ্যে আছে বলেই কথাটা বলার দরকার ছিল। এই সংকীণতা থেকে মুক্তির বাস্তব তাগিদেই তাঁকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকে বিবর্তনধর্মী বলতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে নতুনের দোহাই পেড়ে সংস্কৃতি-

Dhaka University Institutional Repository

> সাধনের নামে যাতে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় না পায় সেই জন্যই আবার সংস্কৃতির একটি চিরন্তন কেন্দ্রবিন্দুর সন্ধানে তৎপর হয়েছেন তিনি। (পাশা, ১৯৮১:৩৯৪-৯৫)

এই ব্যাখ্যায় পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতির সাম্প্রদয়িক রূপ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে আবুল ফজলের অবস্থানকে ইতিবাচক ও সচেতন প্রয়াস হিসেবে দেখা হয়েছে। যদিও জীবিকার উপকরণের সাথে সংস্কৃতির এই বিবর্তনবাদী সম্পর্কের কথা আবুল ফজলের চিন্তায় সক্রিয় হওয়ার উদাহরণ পরবর্তীতেও নেই বললেই চলে বরং তিনি বিলাস ও প্রয়োজনাতিরিক্ততার সাথে খুঁজে পেয়েছেন সংস্কৃতির সম্পর্ক।

১.২.২

'সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তা' প্রবন্ধে আবুল ফজল স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তেমন পরিস্থিতিতে নবতর চিন্তা ও স্বাধীন মনের প্রকাশ অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন। মুক্তচিন্তার ওপর আঘাত, স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা, মুক্ত হাওয়া আর স্বাধীন পরিবেশের অভাব, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনায় অনীহা এবং সর্বত্র অসহিষ্ণুতা সেই সময় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিনষ্টির বীজ বপন করেছিল। সেই পরিস্থিতিতে আবুল ফজলের উদ্ধৃত মন্তব্য কাল-অতিক্রমী প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছে–

> স্বাধীন মনের অধিকার হারালে মনুষ্যত্ব বলতে কিছু থাকে না– তখন সভ্যতার মানে দাঁড়াবে খোশামোদ তোষামোদে দক্ষতা আ ইজ্জত-সম্মানের মাপকাঠি হবে তোরণ, ইলেকট্রিক বাল্ব আর ডিনার পার্টির সংখ্যা। (ফজল, ২০০৮:১১৮)

স্বাধীনতা-পূর্বকালে রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক লেখকের স্বাধীনতা সংকোচনে আবুল ফজল উদ্বিগ্ন, সমাজের সর্বস্তরে বিবেক ও মূলবোধের অবক্ষয়ে আশাহত, আইনের শাসনের বিপর্যয়ে আতঙ্কিত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জ্ঞানানুশীলনের দৈন্যে ব্যথিত হয়েও শেষ পর্যন্ত আশাবাদী হতে চেয়েছেন প্রতিবাদী সাহিত্য-শিল্পের সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে। বাঙালির সংস্কৃতিকে ধর্মীয় মোড়কে আবৃত করে, তহজিব-তমুদ্দুনের 'আলখাল্লা' পরানোর চেষ্টা যারা করছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে আবুল ফজলের ভাষ্য–

> তাঁরা নিজেরা ধার্মিক যেমন নন তেমন নন সংস্কৃতিসেবীও। ধর্মের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন আর স্রষ্টার সঙ্গে বোঝাপড়াই তার একমাত্র লক্ষ্য– সাহিত্য-শিল্পও যে সময় সময় এ কর্তব্য পালন করে না তা নয়, কিন্তু তার দিগন্তরেখা আরো প্রসারিত, আরো বিস্তৃত। জীবনের সবরকম অভিব্যক্তিই তার এলাকাভুক্ত– চরম পাপীও তার প্রিয় বিষয়বস্তু।
> (ফজল, ২০০৮:১২১)

অথচ 'আমাদের দেশে যারা ধর্মের কথা বলেন, তাঁরা আনুষ্ঠানিক ধর্মের বাইরে মানব-জীবন, মানবচরিত্র ও মানবস্বভাবের কোন খোঁজই রাখেন না' (ফজল, ২০০৮:১২২)। তবু আবুল ফজল বিশ্বাস নামক 'পরম সম্পদে' আস্থা রাখেন এবং আশা প্রকাশ করেন অজেয় মানবাত্মা শত বাধা-বিঘ্ন আর নির্যাতন জয় করে প্রতিদিনের সাধনা দ্বারা বিশ্বাসকে রাখবেন সজীব ও সচল। (ফজল, ২০০৮:১২৩)

'সংস্কৃতি'– আবুল ফজলের ভাষায় 'মনের জমি নিয়মিত কর্ষণের নাম'। আবুল ফজলের ভাষায় 'প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা সংস্কতি বলি তারও লক্ষ্য মন আর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য কিংবা নাট্যাভিনয় এসবেরও ঐ একই লক্ষ্য– এসব মনচর্চা বা মনের কর্ষণেরই হাতিয়ার। (ফজল, ১৯৭৪ক:৩২-৩৩) সাংস্কৃতিক জীবন মানে সুন্দর ও সুশোভন জীবন। আবুল ফজল মনে করেন, এ-সূত্রে ধর্মকর্মও একরকম সংস্কৃতিচর্চা। কারণ এতেও মন আর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তবে ধর্মকে সংস্কৃতিতে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন আন্তরিকতা আর সত্যিকার ধর্মভাব। সংস্কৃতির সঙ্গে সুন্দর ও সুশোভন জীবনের সম্পর্কের কথা অন্য অনেক মনীষী বা সংস্কৃতি কর্মীর মতো আবুল ফজলও উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তার প্রকাশ ঘটে

Dhaka University Institutional Repository

মন-মানসের পুরোপুরি বিকাশ ঘটলে, একমাত্র সেই হতে পারে এমন জীবনের অধিকারী। যথাযোগ্য চর্চা দ্বারা মনকে জাগিয়ে তুলতে আর বিকশিত করতে পারে সাহিত্য আর শিল্পসাধনা। এগুলিকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তুলতে পারলে সংস্কৃতির বিকাশ হয় সহজতর। আন্তরিকতার স্পর্শ ছাড়া সংস্কৃতির চর্চা অসম্ভব। চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের মাধ্যমে পুরোপুরি মানুষ হওয়ার চর্চা করাই সংস্কৃতি।

অর্থাৎ সংস্কৃতি জীবনকে বিকশিত করে, মনকে জাগিয়ে তোলে, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার সাধনায় শক্তি জোগায়। 'সমাজ ও সাহিত্য' প্রবন্ধেও ক্লাইভ বেলের অনুসরণে আবুল ফজল লিখেছেন–

> সংস্কৃতি চর্চা মানে নিজের মনকে মার্জিত করে তোলা, অনুভব-অনুভূতি, আবেগ-প্রেরণাকে সতেজ আর তীক্ষ্ণ রাখা, মূল্যবোধকে জীবনের সামগ্রী করে নেওয়া। সজীব মন ছাড়া সংস্কৃতি চর্চা হতেই পারে না। এক মাত্র শিল্প-সাহিত্যই মনকে সজীব রাখে, সজীব করে তোলে, জুগিয়ে থাকে জীবনকে মহত্তর করে গড়ার এষণা– ব্যক্তিগত আর সমষ্টিগত দুই ক্ষেত্রেই। সাহিত্য মানে সহযোগিতা, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ। এ বোধই সমাজের মূল বুনিয়াদ–কোন রকম সামাজিক প্রগতিও এ বোধ ছাড়া সম্ভব নয়। (ফজল, ১৯৬৮:৩৩৫)

সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে আবুল ফজল আরও লিখেছেন সংস্কৃতির রূপ সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। দেশগত, বা রাষ্ট্রগত বা ধর্মগত বা সম্প্রদায় ও দলগত আচার-ব্যবহার, মতামত ও রীতি-নীতিকে আমরা আমাদের সুবিধা মতো সংস্কৃতি বলে পরিচয় দিলেও তা আসলে সংস্কৃতি নয়। আবুল ফজলের ভাবনা উদাহরণে বিশেষত্ব পায়–

> ধুতি-চাদর পরা হিন্দু সংস্কৃতি নয়, কোনো কোনো হিন্দুর দেশাচার বলা যেতে পারে, আচকান-পায়জামা পরাও তেমনি মুসলিম সংস্কৃতি নয়। কোট প্যান্ট হ্যাট পরাও খ্রিস্টান বা ইউরোপীয় সংস্কৃতি নয়। এই সবই আচার– ব্যক্তিগত বা দেশগত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মগত। তেমনি দাড়ি রাখাও মুসলিম সংস্কৃতি নয়, তা যদি হত তা হলে পাকিস্তান মন্ত্রীসভার অধিকাংশকেই মুসলিম সংস্কৃতির দুশমন বলতে হতো (বলা বাহুল্য, ধর্মীয় বিধান ও সংস্কৃতি এক কথা নয়)। শেভ করাও খ্রিস্টান বা ইউরোপীয় সংস্কৃতি নয়, তা হলে রাজা পঞ্চম জর্জ ও সপ্তম এডওয়ার্ড ও খ্রিস্টান পাদরিগণ ইউরোপীয় সভ্যতার শত্রুরূপেই গণ্য হতেন। (ফজল, ২০০৮:১১২)

তাই ধর্মবিশ্বাসী যেমন অধর্মাচারী হতে পারে তেমনি শিক্ষিতজন হতে পারে পাষণ্ড। সংস্কৃতি এসব ক্ষেত্রে অনুপস্থিত বলা যায়। সংস্কৃতিবানের পক্ষে কখনও সংস্কৃতির নামে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব নয় বলে মনে করেন আবুল ফজল ।

তবে স্বাধীনতা যে সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম শর্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বলা যায়, সাংস্কৃতিক জীবন-যাপনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপরিহার্য। কারণ, সভ্যতা বা সংস্কৃতি-সৃষ্ট ব্যক্তি আর রুচিবান সুন্দরচিত্ত মানুষেরই প্রভাবে গড়ে উঠে সংস্কৃতি। রুচি– বিশেষ করে সুরুচি ব্যক্তি-স্বাধীনতার ছায়াতলে হয় বিকশিত। ব্যক্তিমানসের উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করছে তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনের মান। তাই আবুল ফজলের কাছে শিক্ষা, সভ্যতা বা সংস্কৃতি বড় কথা নয়, বড় কথা সুশিক্ষা, সুসভ্যতা ও সুসংস্কৃতি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিভার চেয়ে 'গ্রহণ ও সমঝদারি' গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা কারণ এ-ছাড়া সভ্যতা বা সংস্কৃতির জন্ম হতেই পারে না। কারণ এই সমঝদারির ফলেই ব্যক্তির স্বভাব ও চরিত্রে আলোক ও মাধুর্যের বিকিরণ ঘটে (ফজল, ২০০৮:১১৩)। সমঝদারি মানে সুশোভন ও আনন্দিত জীবনের জন্যে প্রস্তুতি– প্রকৃত মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার তার সহায়।

সংস্কৃতির সাথে প্রয়োজনাতিরিক্ত জীবনযাপনের সম্বন্ধ নিগূঢ়। কারণ প্রয়োজন শেষেই গড়ে ওঠে মহত্ত্বচেতনা, উদাহরণস্বরূপ 'প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তাজমহল বা অজন্তা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। তবুও তাই হচ্ছে মানুষের সংস্কৃতি সাধনার নিদর্শন' (ফজল, ২০০৮:১১৪)। নিছক বেঁচে থাকা বা বাঁচার উপকরণটা যখন বড় হয়ে উঠে তখন জীবন হয় সঙ্কীর্ণ ও দরিদ্র, বাঁচার উদ্দেশ্যটা বড় হয়ে উঠলেই জীবন সুন্দর ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফজল যখন বলেন 'বিলাসই সভ্যতা বা সংস্কৃতি' তখন তিনি সংস্কৃতিকে জীবনোপকরণের বা জীবনযুদ্ধের সহায়ক মনে করেন না; সংস্কৃতি তখন বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণিপরিচয়ের উপজাত।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য ত্যাগের প্রয়োজন। উৎকট বিশ্বাস ও অন্ধ ভাবাবেগ হচ্ছে সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তরায়। আবুল ফজলের ভাষায় যদি এমন ঘটে 'তখন সংস্কৃতি থেকে সংস্কার হয়ে ওঠে বড়। এই সংস্কারই জাতীয়, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের লেবেল্ এঁটে বাধায় বিরোধ। ফলে সমাজ বা সম্প্রদায় হয়ে পড়ে এককেন্দ্রিক। আত্মকেন্দ্রিকতার অপর নাম হচ্ছে কূপমণ্ডূকতা' (ফজল, ২০০৮:১১৫)। সংস্কৃতি তাই মহত্ত্ব, সৌন্দর্যসাধনা, মনুষ্যত্ব এবং সজ্জীবনের সম্মিলন। সংস্কৃতি জন্মগত নয়, এমনকি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তও নয়। প্রতিদিন সচেতন সাধনার দ্বারা সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করতে হয়। এই সচেতন প্রয়াসের নামই মনের জমিতে কর্ষণ। আবুল ফজলের ভাষায়

> এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজলভ্য হবে তাঁর যিনি পরিচালিত হবেন যুক্তি, বিচার ও শুভবুদ্ধির দ্বারা। জীবনে বুদ্ধি ও বিচারের আসন সুদূর-প্রসারী। কিন্তু বুদ্ধি ও বিচারশক্তির প্রয়োগ করতে হবে জীবন-সাধনায়। মানুষের জন্য জীবনই সব চেয়ে বড়। ব্যক্তি নয়, জাতি নয়-জীবন। এই জীবনসাধকই হতে পারেন প্রকৃত সংস্কৃতিবান বা cultured। (ফজল, ২০০৮:১১৬)

মানুষ্যত্ব তথা মানব-ধর্মের সাধনাই সংস্কৃতি এবং একমাত্র এ সাধনাই জীবনকে করতে পারে সুন্দর ও সুস্থ।

'সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে আবুল ফজল এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখেছেন। একটা জাতির পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। কথাটা এভাবেও বলা যায়, একটা জাতিকে জাতি করে তোলে তার সংস্কৃতি– সংস্কৃতিতেই তার পরিচয়, তার যা কিছু স্বাতন্ত্র্য আর বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজন মৌলিক–'সব শিল্পীকেই যথার্থভাবে শিক্ষিত হতে হয়– শিক্ষিত হওয়া মানে দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে মনেপ্রাণে রুচিশীল আর চরিত্রবান হয়ে ওঠা' (ফজল, ২০০৮:১২৫)। শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে অথবা সমাজে ও পরিবারে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটলে সংস্কৃতিও বদলে যায়। আবুল ফজলের মতে, 'সংস্কৃতির এক সহজাত ধর্ম অচলায়তনকে ভাঙা, ডিঙিয়ে যাওয়া, কোথাও আটকে না থাকা; আটকে না পড়া' (ফজল, ২০০৮:১২৭)। কিন্তু অচলায়তন ভাঙার বিরুদ্ধে যে সাহসিকতা দরকার তা-ও সংস্কৃতিরই অংশ। মহৎ শিল্পীমাত্রই বিদ্রোহী। তাই সংস্কৃতির আরেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ প্রতিবাদ ও বিদ্রোহীচেতনা।

১.২.৩

১৯৭১-পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে উত্তরণের পর মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে স্বাধীন, মুক্ত ও অবাধ পরিবেশ সূচিত হয়েছিল আবুল ফজল তাতে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল এ স্বাধীনতা তেমন কোন জোয়ারের প্লাবন নিয়ে আসেনি আমাদের ভাবজীবনে–

> এ-সঙ্গে সাংস্কৃতিক জাগরণ যদি হাতে হাত না মেলায় তা হলে এ স্বাধীনতাও অচিরে অর্থহীন হয়ে পড়বে। মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না– এ খোরাকের সাহায্যে মন-মানসের বিকাশ আর সম্প্রসারণ ঘটে। সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য, অভিনয়, চিত্র আর সংগীত সবই সংস্কৃতির বুনিয়াদ। এসবের প্রভাবে ব্যক্তির শুধু নয়, সমগ্র জাতির মন আর চরিত্র সংহত আর পরিণত হয়, হয়ে ওঠে রুচিশীল আর সুস্থ। রাজনীতি যেখানে মানুষকে করে ক্ষমতা-সচেতন, সংস্কৃতিচর্চা সেখানে মানুষকে করে মনুষ্যত্ব-সচেতন। (ফজল, ২০০৮:১২৭)

শেষপর্যন্ত গণজীবনের সংস্কৃতির দিকেই দৃষ্টি রেখেছেন আবুল ফজল। গণমানুষের সংস্কৃতির ধারক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাঁর প্রশংসাসূচক ভাষ্য–

> সংস্কৃতিতে গণজীবনের প্রতিফলন শুধু ঘটে না, গণমানসের অভীপ্সা, এষণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন-কল্পনার প্রতিফলনও ঘটে তাতে। অর্থাৎ যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা সংস্কৃতিচর্চা নয়, যা হওয়া উচিত সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমকে হতে হবে তারও

Dhaka University Institutional Repository

ইঙ্গিতবহ আর পৃথিকৃৎ। তাই বুর্জোয়া সমাজের সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চার রয়েছে বিরাট ব্যবধান। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি শুধু গণমুখী নয়, জীবনমুখীও। (ফজল, ২০০৮:১২৮)

'বাঙালী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ' ১৯৬৬ সালে লেখা আবুল ফজলের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, যেখানে বাঙালি সংস্কৃতির ভবিষ্যত নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। প্রবন্ধে বাঙালি সংস্কৃতির ধারক মূলত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ-বৈপরীত্ব- দ্বন্দ্বের সমাধান নিয়ে তিনি খুব একটা আশাবাদী নন বরং তাঁর কাছে স্পষ্ট যে, বাঙালির সার্বজনীন কোন সংস্কৃতিই আসলে নেই আছে খণ্ড দৃষ্টিতে দেখা সংস্কৃতি। হয় তা হিন্দুর সংস্কৃতি, না হয় মুসলমানের সংস্কৃতি। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ব্যবহারিক জীবনের আচার-অনুষ্ঠান-খাদ্যাভ্যাস সামাজিক বোঝাপড়া-উঠাবসা সবমিলিয়ে যা কিছুর মধ্যে অমোচনীয় পার্থক্য স্থায়ী হয়ে আছে সেসব বিষয় উপস্থাপন করে মন্তব্য করেছেন–'বাংলা দেশে যুগ যুগ ধরে সে সংস্কৃতি দুই বিপরীত মোহনার অভিসারী। এ দু'য়ের সমন্বয়ের কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টাই কোন কালে হয়নি। অবশ্য তেমন চেষ্টা সফল হতো কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার জন্য যে ত্যাগ ও জীবনবোধের প্রয়োজন তা তৎকালীন বাংলা দেশের দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের কারো ছিল না। সংস্কৃতি সমন্বয়ধর্মী না হলে যা ঘটার তাই ঘটেছে' (ফজল, ১৯৬৮:২৭-২৮)।

সংস্কৃতির বিভিন্ন পার্থক্যের মধ্যে ধর্মের পার্থক্য এতটাই গভীর যে তা জীবানাচারের সর্বান্তকরণে প্রবেশ করে অভিন্নতার রূপটিই ধ্বংস করেছে। ভাষার ঐক্যও সে পার্থক্য দূর করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে করেন না আবুল ফজল (ফজল, ১৯৬৮:২৯)। উপরন্তু রাষ্ট্রে ধর্মের ব্যবহার ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় এই দূরত্বও ক্রমশ বাড়ছে এবং রাষ্ট্রের উপর ক্ষেত্র বিশেষে এই কর্তৃত্ব আরও জোরদার হচ্ছে। ফলে অতীতে বাঙালির মধ্যে যতটুকু সাদৃশ্য ছিল তা-ও উধাও হচ্ছে বলে আবুল ফজল মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি ধুতি ও শ্রী শব্দের ব্যবহারের কথা বলেছেন।

তবে আধুনিক যুগে সংস্কৃতি শব্দের পরিবর্তিত অর্থ গ্রহণেই সায় আবুল ফজলের যেখানে সংকীর্ণ গোত্র বা এলাকার চেয়ে বৈশ্বিকতার মূল্য বেশি। সংস্কৃতির পরিচয় বিচিত্র, একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি সাংস্কৃতিক পার্থক্যের উদাহরণ দিয়েছেন– ধর্ম আর ভুগোলের অভিন্নতা সত্ত্বেও শিক্ষিত-অশিক্ষিতে, কৃষক-ব্যারিস্টারে, খাদ্যে-অখাদ্যে, নাম-পদবিতে, আহার-বিহারে, সবচেয়ে বড় কথা বিশ্বাস-অবিশ্বাসে। হিন্দু-মুসলমান 'এক চালের নিচে না থাকা' অথবা 'মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে না ওঠা'র মত সংস্কার আর সন্দেহের উদাহরণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধৃত করে আবুল ফজল অভিযোগ করেছেন–'এ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সে স্বর্ণযুগেও এ ছিল দেশের মানসিক আবহাওয়া। যে রূপ নিয়ে দেশের স্বাধীনতা এসেছে তার পেছনে এ মনোভাব ও তার প্রতিক্রিয়া কোন প্রেরণা জোগায়নি' (ফজল, ১৯৬৮:৩৬), এমন মনে করে ইতিহাসকে অস্বীকারের চেষ্টা অথবা 'প্রেক্ষিত আর বাস্তব ভুলে গিয়ে ইচ্ছা করে উট-পাখী সাজা'র মাধ্যমে বাঙালিরা নিজেদেরকে আরও বিভক্ত ও বিপন্ন করেছে (ফজল, ১৯৬৮:৩৭)। এজন্য বাঙালি সংস্কৃতিকে যারা আর্য-অনার্য, বৈষ্ণব-শাক্ত বিপরীত সাধনা-সংঘর্ষ ইত্যাদি নানা 'গোঁজামিল' দিয়ে হাজির করে তাকে অতীতের ব্যাখ্যা যা প্রাচীন-ইতিহাস-সম্মত মনে আখ্যা দিয়ে নিরপেক্ষ আলোকপাতের মাধ্যমে ভবিষ্যতের বাঙালি সংস্কৃতির রূপ আবিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছেন আবুল ফজল।

১.২.৪

ভাষা সংস্কৃতির প্রধানতম অঙ্গ। 'ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার পথ ধরে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন আবুল ফজল। ভাষার সাথে সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক বুঝতে হলে জানা দরকার 'ভাষার গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে সমাজের গতিপ্রকৃতির সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধা' (১৯৬৮:৪০৯)। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

পুঁথিসাহিত্য। আবুল ফজলের ভাষায় 'এক অচল সমাজের, এক অতি সীমিত ও গণ্ডীবদ্ধ মানুষের এ সাহিত্য, যে সমাজে ছিল না কোন চলিষ্ণুতার লক্ষণ, প্রতিদিনের জীবন-সমস্যাও ছিল না এমন বিচিত্র ও জটিল' সেরকম সমাজের ভাষাকে আজও যারা আদর্শ মনে করে এ যুগের চাহিদা মিটাতে সক্ষম বলে মনে করেন তাঁরা ভুলে যান যে ভাষা ভাবের অনুগামী, উভয়েই হাত ধরাধরি করে চলে (ফজল, ১৯৬৮:৪০৯)।

বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করেই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতিবহুল করে তুলেছেন এ অভিযোগকে অসত্য উল্লেখ করে আবুল ফজল লিখেছেন–

> তাঁরাও সাহিত্যের সনাতন পদ্ধতিতেই সাহিত্য রচনা করেছেন অর্থাৎ তাঁদের বিদ্যা অভিজ্ঞতা আর পরিবেশের ফলশ্রুতিই তাঁদের রচনা। তাঁরা কেউই পুঁথিসাহিত্যের উত্তর-সাধক নন, এমন কি ঐ সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল তাও মনে হয় না। তাঁদের ব্যাপক পরিচয় ছিল সংস্কৃত আর ইংরেজীর সঙ্গে আর অভিজ্ঞতা ছিল নিজ সমাজ আর পরিবেশের– সে সমাজের চাহিদা পূরণই ছিল তাঁদের রচনা। (ফজল, ১৯৬৮:৪১১)

আবুল ফজল বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের অনাবশ্যক ব্যবহার অসংগত মনে করেন। বাংলা ভাষা সংস্কারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিবেচনাকে কারবালার সাথে তুলনা করে লিখেছেন, 'এ মনোভাব নিয়ে ভাষাকে সংস্কার করতে গেলে ভাষা যে শুধু দুর্বল হয়ে পড়বে তা নয়, হয়ে পড়বে সংকীর্ণ ও পঙ্গু, হারাবে প্রকাশ আর চলৎশক্তি' (ফজল, ১৯৬৮:৪১৩)। তুর্কি শাসনের কঠিন নিষ্পেষণের কালে আরবদের ওপর যখন তুর্কি ভাষা চাপানো জোর চেষ্টা চলছিল তখন আরবরা মাতৃভাষার মধ্যেই প্রতিরক্ষা খুঁজে পেয়েছিল। তারা নিজের ভাষা ত্যাগ না করে তুর্কি ভাষাকেই বরং আরবিতে পূর্ণ করে তুলেছিল। আবুল ফজল এই উদাহরণ দিয়ে বলেছেন– 'আরবদের অনুকরণে আমরাও ইচ্ছা করলে প্রচুর বাংলা শব্দ উর্দুতে চালিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু তা না করে আমাদের কেউ কেউ তার বিপরীতটাই করেছে' (ফজল, ১৯৬৮:৪১৫)।

প্রচলিত বাংলায় আমাদের প্রথিতযশা কবি-লেখকগণের সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির পরও 'ভাষা-সংস্কার'এর প্রয়াসকে আবুল ফজল 'বস্ত্রহরণ'-পালার সাথে তুলনা করে এই তোড়জোড়কে সাময়িক উপদ্রব আখ্যা দিয়েছিলেন আর আস্থা প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, 'ভাষা তার স্বাভাবিক গতি পথে চলবেই' (ফজল, ১৯৬৮:৪২৬)।
ভাষায় আঞ্চলিকতা ও প্রমিতকরণের প্রয়াস সম্পর্কে আবুল ফজল তাঁর অভিমত দিয়ে লিখেছেন–

> সব ভাষারই একটা স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ড বা মান আছে, যাকে শিক্ষিত জনের বোধগম্য রূপ বলা যায়। সাহিত্যে ভাষার ঐরূপই অনুসৃত হয়। আমরা পূর্ব পাকিস্তানী লেখকদেরও ঐ ছাড়া অন্য উপায় নেই। মুখের ভাষায় সাহিত্য করতে গেলে আমাদে সাহিত্য জেলাওয়ারী হয়ে পড়বে আর তার ফল হবে মারাত্মক, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা আর রাষ্ট্র সবক্ষেত্রেই।' সুতরাং আমাদের সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য 'একটা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা আমাদের রাখতেই হবে আর করতে হবে সে ভাষারই চর্চা (কোন জেলা বা জনপদের মুখের ভাষা নয়)। (ফজল, ১৯৬৮:৪২৭)

ভাষা নির্মাণের ব্যাপারে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনই ভাষা নতুন রূপ নিচ্ছে সংবাদপত্রের হাতে। আবুল ফজল ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখকদের কর্তব্য সম্পর্কে অভিমত দিয়েছেন–

> আমাদের সাহিত্য ও জীবন বিকাশের উপযোগী কোন শব্দ গ্রহণে আমরা কোন রকম গোঁড়ামি আর অস্পৃশ্যতাকে দেবো না প্রশ্রয়। আমাদের লেখকদের এখন এ-মনোভাব হওয়াই উচিত। (ফজল, ১৯৬৮:৪১৬)

'একুশ মানে মাথা নত না করা', 'ভাষাই স্বদেশ প্রেমের বুনিয়াদ', 'একুশের তাৎপর্য', 'ভাষা এক ভয়ঙ্কর হাতিয়ার' 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও যুগসমস্যা', 'ভাষার সমাজতান্ত্রিক ভূমিকা' ইত্যাদি প্রবন্ধে একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তি-সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির সংগ্রাম-প্রেরণা-সংকল্পের অক্ষয় উৎস। মিথ্যা, অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত না করাই একুশের তথা ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা। তাই ১৯৫২ থেকে দূরে সরে এসে একুশ পরিণত হয়েছে বাঙালি জাতির সংগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যে। ভাষা আন্দোলনের আত্মত্যাগের প্রেরণা জাতির তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস-শক্তি তারুণ্যের মন-মননে সঞ্চালিত করার উদ্দীপনা জোগাতে আবুল ফজল লিখলেন-

> যে কোন জাতির জন্য সবচেয়ে মহৎ ও দুর্লভ উত্তরাধিকার হচ্ছে মৃত্যুর উত্তরাধিকার– মরতে জানা ও মরতে পারার উত্তরাধিকার। একুশে ফেরুয়ারির শহীদেরা জাতিকে সে মহৎ ও দুর্লভ উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন। (ফজল, ১৯৯৭:৮)

ভাষার শক্তি অনুধাবন করতে হলে 'ভাষার ব্যবহার সর্বব্যাপী করে তোলা অপরিহার্য' বলে মনে করেন আবুল ফজল (ফজল, ১৯৯৭:২৩)। 'ভাষার চেয়ে মানবিক কিছু নেই' এই বিশ্বাস থেকে আবুল ফজল ভাষার সঙ্গে মানবিকতার পরাকাষ্ঠা সমাজতন্ত্রের নিবিড় সম্পর্কের কথা এবং সমাজতন্ত্রের চাহিদা পূরণের উপযোগী করে ভাষাকে গড় তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন (ফজল, ১৯৯৭:২৯)।

১.২.৫

আবুল ফজল পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন 'রাজনীতি বনাম বুদ্ধিজীবী' প্রবন্ধে। তিনি নিজে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বা দলের সাথে কখনও জড়িত না থাকলেও সমাজমানুষের মঙ্গলচিন্তা ও কর্মীর দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়েছে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও কার্যক্রমের ওপর। তাঁর অভিমত 'অন্যসব ঐতিহ্যের তুলনায় রাজনৈতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতে প্রয়োজন অধিকতর সময়ের' (ফজল, ১৯৬৮:১৫)। রাজনীতি দেশের সমষ্টিগত জীবন তথা সমাজদেহের প্রতিভূ তাই রাজনীতিতে বিকৃতি ঘটলে তা সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়বেই। কেবল শাসকচক্রের হাতে আর রাজনীতি সীমাবদ্ধ নয় একালে। নাস্তিক বা নাস্তিক্যও এখন দুর্ভাবনার বিষয় নয় যতটা রাজনীতিবিদ ও রাজনীতি। পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস মানুষের শিথিল হয়ে পড়ছে। পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস শিথিল হওয়া মানে ধর্ম সম্পর্কেই বিশ্বাসের শৈথিল্য। কারণ ধর্মের আয়ু আর স্থায়িত্ব পুরোপুরি পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাসের ওপর। রাজনীতির নেশাকে মদের নেশার চেয়ে দুর্দমনীয় আখ্যা দিয়ে আবুল ফজলের জিজ্ঞাসা–

> যুক্তি আর বুদ্ধিহীন এক স্ববিরোধিতা, ব্যক্তিগত বা দলীয় লাভ লোকসান আর ক্ষমতায় বসা আর সে ক্ষমতাকে পৈত্রিক মিরাছের মতো আকড়ে থাকা যে রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ সেখানে সাহিত্যিক শিল্পীরা স্বস্তিবোধ করবেন কি করে? যুক্তি, বুদ্ধি বিবেচনা আর বিবেকী চিন্তাই ত যে কোন সৎ বুদ্ধিজীবীর মানস-উৎস– এসবকে বাদ দিলে বুদ্ধিজীবী কথাটার কোন মানেই থাকে না। (ফজল, ১৯৬৮:১৮)

তবে জাতির জন্য বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন 'দেশগত বা জাতিগত কোন ব্যাপারে যদি বুদ্ধিহীন যক্তিহীনতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর জাতীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়' (ফজল, ১৯৬৮:১৯)। জনচিত্তের অসাধারণ উর্বরতার ঐতিহাসিক সত্যে আস্থা রেখে আবুল ফজল আশা প্রকাশ করেন বুদ্ধিজীবীরা সেখানে যুক্তির বীজ বপন করে যথার্থ দায়িত্ব পালন করবেন। ছয়ের দশকে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, আবুল ফজল সর্বতোভাবেই সংকীর্ণ ক্ষমতার রাজনীতি থেকে দূরে থেকে জনচিত্ত গঠনে কাজ করাকেই বুদ্ধিজীবীদের সেই মুহূর্তের দায়িত্ব বলে মনে করেছিলেন।

'আবুল ফজলের সংস্কৃতি-চিন্তা স্বদেশচিন্তার নামান্তর' (ফজল, ১৯৮১:৩৯৭)। নতুন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা, নাগরিকদের জাতীয়তা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির রূপ ইত্যাদি বিষয়ে বিতর্ক শুরু হলে আবুল ফজল বাঙালি মুসলমানের জাতীয় চেতনার সাথে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিস্মৃত না হয়ে ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতিচিন্তার বিপদের কথা স্পষ্টভাবে বলতে থাকেন। ধর্মীয়বোধের প্রাবল্যে দেশ ও ইতিহাসজ্ঞান-লুপ্ত হয়ে বাঙালি মুসলমানের পরিচয়হীন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে 'সভ্যতার পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন– 'আরব দেশের ইতিহাস ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয় নি– ইতিহাসের শুরু থেকে তারও শুরু। তাই ঐ সভ্যতা যতোখানি ইসলামী তার চেয়ে অনেক বেশী আরবী' (ফজল, ১৯৬১:২১৬)। ভারত-বিভক্তির প্রেক্ষাপটে সাতচল্লিশ-পরবতীকালে নতুন রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণা করা হলে আবুল ফজল 'ধর্ম ও রাষ্ট্র'[১১] প্রবন্ধ লিখে ধর্মকে রাষ্টব্যবস্থায় টেনে আনার বিপক্ষে তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্ক ও মনীষাদীপ্ত বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। এতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের অসংগতি ও বিপদের কথা যেভাবে উল্লেখ করেছেন, আবুল ফজলের নিজের ভাষায় তার আংশিক উদ্ধৃতি–

> যে মানুষ ও মানুষের জীবন নিয়ে রাষ্ট্রের কারবার সে মানুষ ও তার জীবন চলিষ্ণু, পরিবর্তনশীল ও জঙ্গম। অথচ ধর্ম হচ্ছে তার বিপরীত। চোদ্দ শত বছর আগেও ধর্ম যা ছিল এখনো তাই আছে, চোদ্দ শত বছর পরেও তাই থাকবে। যে কোরান-হাদিসের নির্দেশ মতো রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন প্রণয়নের দাবি উঠেছে, মানুষের জীবনে সহস্র রদবদল ঘটলেও তার রদবদল ঘটানো মানুষের সাধ্যাতীত। অথচ আজকের মানুষ আর চোদ্দ শত বছর আগের মানুষ কখনো এক নয় এবং চোদ্দ শত পরের মানুষও এ মানুষ থাকবে না। তাদের জীবনের সমস্যাও হবে ভিন্নতর। (ফজল, ২০০৮:১৭৩)

রাষ্ট্র, আইন ও বিধি-বিধান, রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষের সুখ-সুবিধা-নিরাপত্তা সবই সম্পূর্ণভাবে জাগতিক পার্থিব ব্যাপার, এর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোনো সম্পর্ক নেই বলে আবুল ফজল মনে করেন। প্রবন্ধে আবুল ফজল নামায, রোজা, হজ্জ ও জাকাতের বিধানসমূহ কীভাবে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থার সাথে ইসলামের সাংঘর্ষিক হতে যেতে পারে তাঁর অনেক দৃষ্টান্ত এবং উদাহরণও উপস্থাপন করেছেন তিনি। তেমন একটি দৃষ্টান্ত– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এর সাথে সাক্ষাৎ করে একদল ধর্মীয় আলেম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে আইন করে নামায বাধ্যতামূলক করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উত্তরে তিনি জানিয়েছেন– 'এ করতে গেলে এ নতুন রাষ্ট্রের সব উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজ বন্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি এ অর্ডিনেন্স প্রয়োগেই নিয়োগ করতে হবে আর শহরে-বন্দরে, গ্রামে-মহল্লায় সর্বত্র খালি জেলখানাই তৈরি করতে হবে আর মোতায়েন করতে হবে পুলিশ' (ফজল, ২০০৮:১৭৬)। আরেকটি উদাহরণে আবুল ফজল যুক্তি দিয়েছেন বিশ্বাসকে সাক্ষ্য-প্রমাণ সহযোগে যাচাই করার অবাস্তবতা সম্পর্কে–

> আল্লাহ বিশ্বের তাবৎ সম্পত্তির মালিক–ঈমানের মতো এটাও একটা অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসের কথা। রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে এ বিশ্বাসকে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা না করলে এখানেও ফাঁকির ক্ষেত্র থেকে যায় প্রশস্ত।.... ধনসম্পদকে আইন করে বণ্টন করা এমন অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু যেটা নিছক বিশ্বাসের ব্যাপার তাকে আইন বা রাষ্ট্রীয় বিধির আওতায় আনা কিছুতেই সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত স্বীকৃতি ছাড়া এ বিষয়ে অন্য রকম সাক্ষী বা প্রমাণও অচল। অথচ ব্যক্তিগত স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির ওপর আইন বা দণ্ডবিধি নির্ভর করতে পারে না। অন্য সাক্ষী-প্রমাণ থাকলে চোরের অস্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে তাকে চৌর্যাপরাধ থেকে অব্যাহতি কোনো দেশের আইনই দেবে না। কিন্তু ঈমান বা বিশ্বাসের বেলায় তেমন সাক্ষী-প্রমাণের সুযোগ কোথায়? (ফজল, ২০০৮:১৭৫)

সুতরাং বিশ্বাসকে আইনে পরিণত করলে পদে পদে গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে হবে। আবুল ফজল বারবার এই গোঁজামিলে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ এতে লাভবান হয় ক্ষমতালোভীরা আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় সর্বসাধারণ মানুষ। 'ধর্মকে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রকে ধর্মের সঙ্গে জুড়ে দিতে গেলেই এ অদ্ভুত গোঁজামিল ও স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হতেই হবে। কারণ, ধর্ম অলঙ্ঘনীয়, তার নির্দেশ ও বিধান অপরিবর্তনীয়। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র স্থাণু নয়– প্রগতিশীল বলেই তা পরিবর্তনশীল। আর বিচ্ছিন্ন নয় বলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নানা স্বার্থে ও বিচিত্র আইন-কানুনে তা শৃঙ্খলিত' (ফজল, ২০০৮:১৭৭)। একইভাবে নামাজ-রোজাকেও রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় আনতে গেলে নতুন নতুন সংঘর্ষেরই সৃষ্টি করবে বলে আবুল ফজল মন্তব্য করেছেন (ফজল, ২০০৮:১৭৯)। এটি তাঁর ধারণাপ্রসূত হলেও এ-কথা বাস্তব যে, 'সত্য, ন্যায়, সামাজিক সুবিচার, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ইত্যাদির যে সব বড় বড় বুলি শোনা যায় এর কোনোটাই ইসলামের একচেটিয়া নয়। সব ধর্ম ও সব রাষ্ট্রেই এগুলি স্বীকৃত– এমন কি 'কাফিরি' রাষ্ট্রেও 'মিথ্যা' শুধু নিন্দনীয় নয়, দণ্ডনীয়ও' (ফজল, ২০০৮:১৮০)। আবুল ফজল ধর্মরাষ্ট্রের অসারতার বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করে প্রকৃত মানবিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রতিই তাঁর ঐকান্তিক সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। 'ইসলামি ভ্রাতৃত্ব', 'ইসলামি সুবিচার', 'ইসলামি রাষ্ট্র', 'স্বর্গ রাজ্য' ইত্যাদি ফাঁকা বুলিকে আকাশকুসুমের চাষ আখ্যা দিয়ে সর্বমানবীয় সত্যের দিকে রাষ্ট্রের উত্তরণ ঘটবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'মানবতন্ত্র'[১২] প্রবন্ধটি 'ধর্ম ও রাষ্ট্র' প্রবন্ধের পরিপূরক। *রাঙ্গা-প্রভাত* উপন্যাসের সাহিত্য-শিল্পী আবুল ফজল সন্ধান পেয়েছিলেন এই বোধের, রূপকল্পের আশ্রয়ে তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন এই উপলব্ধির। কিন্তু তাতে চিন্তাশীল কর্মীর দায়িত্ব শেষ হয় না, তাই প্রয়োজন হয় বক্তব্যকে ঋজু ও 'চড়া সুরে' নিজের মনের মত করে উপস্থাপনের। যাতে দুই ধর্মের ভুক্তভোগী মানুষকে সচকিত করা যায়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আনোয়ার পাশা যথার্থই লিখেছেন–

> মানবতন্ত্র শুধু আবুল ফজলের রচনার মধ্যেই নয়, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই। বলিষ্ঠ-প্রকাশভঙ্গির সাথে সত্যভাষণের অমেয় সাহস এবং অকুণ্ঠ মানবপ্রীতিতে এই প্রবন্ধটি সমুজ্জ্বল। যে সুন্দর মানসিকতা এই প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সেটি বাংলা সাহিত্যে বিরল। (ফজল, ১৯৮১:৪০০)

'ধর্ম ও রাষ্ট্র' প্রবন্ধের যেখানে শেষ 'মানবতন্ত্র' সেখান থেকেই শুরু। এতে আবুল ফজলের চিন্তায় যুগপৎভাবে ধরা পড়েছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের বিকল্পভাবনা এবং ব্যক্তিগত ভাবজগতের সাথে তার সমন্বয়ের চিন্তা। তিনি মনে করেন, ধর্ম পালন, ধার্মিক হওয়া এবং প্রকৃত মানুষ হওয়া এক কথা নয়। তাই পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সমাজের সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন প্রকৃত মানুষ, ধার্মিক সে না হলেও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না–

> মন্দিরে মসজিদে গির্জায় কে কী রকম আচরণ করে সেজদায় গিয়ে কে দীর্ঘতর সময় কাটায় তা মোটেও বড় কথা নয়। কোনো মানুষ বত্রিশ আনা হিন্দু চৌষট্টি আনা মুসলমান কি খ্রিস্টান হলেও পৃথিবীর কোনো লাভ-লোকসান ঘটে না। কিন্তু বাইরে, অর্থাৎ সমাজে এবং পরিবারেরও যদি আট আনা মানুষও হয় তাহলেই পৃথিবী বেঁচে যায়। আজ পৃথিবী এমন মানুষের প্রতীক্ষায়– যে মানুষের একমাত্র অভীপ্সা মানুষ হওয়ার– মানুষের মতো আচরণ করার। (ফজল, ২০০৮:১৬০)

ধর্মপালনের মধ্যে আছে বিপুল স্ববিরোধিতা। একদল মুখে ধর্মের যত বুলি আওড়ায়, মনে তা মোটেই ধারণ করে না। তাই বার্নার্ড শ'র উক্তি বদলিয়ে আবুল ফজল বলেন –'যাদের আল্লাহ্ শুধু ঠোঁটে আর তসবিতে তাদের থেকে সাবধান' (ফজল, ২০০৮:১৫৬)। প্রবীণ চিন্তানায়ক আবুল ফজল জীবনকালে পাক-ভারত উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের নৃশংসতা, হানাহানি প্রত্যক্ষ করেছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আকারে। তাঁর পীড়িত মর্মাহত শিল্পসাধনায় এর প্রতিকার তিনি সন্ধান করেছেন বারবার। তাই আবেদন জানিয়েছেন–'আমার বিশ্বাস ধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার দিন এসেছে। চরিত্র আর নীতিবোধের পরিবর্তে তসবির জনপ্রিয়তা, মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি বা হরি সংকীর্তনে কণ্ঠস্বরের প্রতিযোগিতা মোটেও সামাজিক অগ্রগতির দিগ্‌দর্শন নয়। ... ধর্মের প্রাথমিক স্তরের অনেক কিছুই আজ জীবনের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে। ধর্ম-জীবনেও যে সমাজিক জীবন– সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই তার যা কিছু মূল্য, এ বোধ না থাকলে ধর্ম জীবনবিমুখ হয়ে পড়তে বাধ্য' (ফজল, ২০০৮:১৫৮-৫৯)। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সমাজ বিকাশ এখনও কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছেনি সেখানে ধর্মের নামে ইহ-জীবন-বিমুখতা পরিণামে জাতির জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। ধর্মের নামে যে হিংস্রতা ও অমানুষিক কাণ্ড ঘটে তার মধ্যেও আছে স্ববিরোধিতা। ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মাদর্শ কোনটিই মানুষকে রক্ষা করতে পারছে না তাই 'ধর্মকে স্ববিরোধিতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানুষের দৃষ্টি ধর্মের দিক থেকে মনুষ্যত্বের দিকে ফেরাতে হবে। কোনো রকম ধর্মতন্ত্র নয়, মানবতন্ত্রকেই করতে হবে আজ সব দেশের ও সব রাষ্ট্রের আদর্শ' (ফজল, ২০০৮:১৫৬)। একজন ধার্মিকের চেয়ে একজন সাহিত্যিক বা শিল্পী যে এ ব্যাপারে অনেক উন্নত-চিত্ত তা আবুল ফজল জোরালো যুক্তিতে তুলে ধরেছেন–

> মানুষ মেরে বেহেস্তে যাওয়ার কল্পনাই তাঁর চিন্তার বাইরে। স্বয়ং ঈশ্বর নেমে এসেও যদি তাঁকে এমন নির্দেশ দেন, সাহিত্যিক তেমন ঈশ্বরকেও নিজের লেখন কক্ষ থেকে বের করে দিতে দ্বিধা করবেন না। ঈশ্বর নামধেয় কারো পক্ষে এমন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব–এ কথাটাই সাহিত্যিকের কাছে অবিশ্বাস্য। কিন্তু ধার্মিক তো সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করে না। কারণ, ধর্ম শাস্ত্রীয় ব্যাপার নিয়ে বিচার করাটাই তার কাছে অধর্ম। তার একমাত্র অবলম্বন অন্ধ বিশ্বাস আর অন্ধ অনুসরণ। (ফজল, ২০০৮:১৫৮)

এ প্রবন্ধে আবুল ফজল ধর্মের ওপর মানবতন্ত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা-ই নয়, এতে সাম্প্রদায়িকতাকে তীব্রভাবে আক্রমণও করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে আবুল ফজল কোনভাবেই ধর্মের বিরুদ্ধে নন[১৩], ধর্মের অপব্যবহার ও ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে। প্রকৃত ধর্মের অপব্যাখ্যারও বিরুদ্ধে তিনি। তাই যাঁরা ধর্মের নামে লৌকিক জীবনে অলৌকিকতাকে টেনে এনে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করা এবং মানুষকে বোকা বানানোর চক্রান্তে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধেই আবুল ফজলের বাক্যবাণ এবং যুক্তিশর। অকপট এই সত্য উচ্চারণে তাঁর দ্বিধাও নেই–

> যা অপার্থিব তাকে অপার্থিব থাকতে দিন– যা পার্থিব তাকে সর্বতোভাবে পার্থিবের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখুন। অপার্থিবের তথা আধ্যাত্মিকের প্রেরণা ও তৃষ্ণা মানুষ যে একেবারে অনুভব করে না বা তার কোনো প্রয়োজন নেই তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, তা ব্যক্তিগত সাধনা ও উপলব্ধির ব্যাপার। তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে টেনে আনায় আমার আপত্তি, টেনে আনলে শুধু সামাজিক জীবন নয়, আধ্যাত্মিক জীবনও নাজেহাল হয়। সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ পার্থিব ব্যাপার– যে মানুষ নিয়ে সমাজ সে মানুষও আগাগোড়া পার্থিব। কাজেই অপার্থিবের দোহাই দিয়ে এমন সমাজকে শাসন পরিচালনা করতে গেলে তা ব্যর্থ হবেই। এ ব্যর্থতার নজির আজ সর্বত্র। কেতাবের ইসলাম আর জীবনের ইসলামের মাঝখানে আজ বিরাজ করছে এক প্রশান্ত মহাসাগর। সব ধর্মের বেলায় এ কথা সত্য। (ফজল, ২০০৮:১৬১)

'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধেও ভিন্নস্বরে মানবতন্ত্রের জয়গান মুখরিত হয়েছে। মানুষের কল্যাণ সাধনের প্রয়াসই সর্বোত্তম সাধনা এমন বোধই এই প্রবন্ধের উপজীব্য। কিন্তু প্রচলিত অর্থে দান-খয়রাত-ভিক্ষা সমাজে যে কল্যাণধারণা গড়ে তুলেছে মানবকল্যাণ তা নয় মোটেই–

> মানব-কল্যাণ অর্থে আমি দয়া বা করুণার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাতকে মনে করি না। মনুষ্যত্বের অবমাননা যে ক্রিয়াকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাকে কিছুতেই মানব-কল্যাণ নামে অভিহিত করা যায় না। মানব-কল্যাণের উৎস মানুষের মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি আর মানবিক চেতনা বিকাশের মধ্যেই নিহিত। (ফজল, ২০০৮:১৬৫)

মানব-কল্যাণ পুরোপুরি এ জীবনেরই অঙ্গ এবং এ জীবনের সঙ্গেই তার সম্পর্ক। মানব কল্যাণের সাথে সম্মানের সম্পর্ক আছে, ভিক্ষা বা দানের সাথে তা নেই। আবুল ফজলের ব্যাখ্যা থেকে জানতে পারি– 'মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু নয়– এ এক জাগতিক মানবধর্ম। তাই এর সাথে মানব-মর্যাদার তথা human dignity-র সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য' (ফজল, ২০০৮:১৬৫)। সুতরাং মানবকল্যাণ সামাজিক ও সর্বমানবিকতাবোধকে জাগ্রত করে, যেহেতু সব মানুষই সমাজের অঙ্গ, তাই সব রকম কল্যাণ-কর্মেরও রয়েছে সামাজিক পরিণতি। রাষ্ট্রও এই কাজে নিষ্ক্রিয় নয় কারণ 'যে রাষ্ট্র হাতপাতা আর চাটুকারিতাকে দেয় প্রশ্রয়, সে রাষ্ট্র কিছুতেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে পারে না।' মানবকল্যাণ সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা ভাঙতে আবুল ফজল লিখেছেন–

> কল্যাণ-কর্ম সম্বন্ধে আমাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা বা conception রয়েছে যার ফলে আমরা সব রকম কল্যাণ-কর্মকে পারলৌকিক লাভালাভের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিই এবং সে লক্ষ্যটা সামনে রেখেই সাধারণ দান-খয়রাত থেকে স্কুল-মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিকে নিয়ে ও দেখে থাকি। ফলে এতে অনেক সময় মানবিক মর্যাদা হয় বিসর্জিত। (ফজল, ২০০৮:১৬৭)

আবুল ফজল বিশ্বাস করেন 'মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় সুপরিকল্পিত পথেই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব। একমাত্র মুক্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে করা যায় নিয়োগ। তা করা হলেই মানব-কল্যাণ হয়ে উঠবে মানব-মর্যাদার সহায়ক' (ফজল, ২০০৮:১৭০)।

ধর্মকে রাষ্ট্র-কাঠামোর সাথে জড়িত বা ব্যবহার করার ফলে বাংলাদেশে বারবার বিপর্যয় নেমে এসেছে। আবুল ফজল সবসময়ই রাজনীতির বা রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের মেলবন্ধনের বিরোধী। তিনি বারবারই জানিয়েছেন ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রের জাগতিক কার্যাবলির মধ্যে ধর্মের ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব বা রূপ কোনকালে কোন দেশেই ছিল না, এমনকি ইসলামের খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও নয়। এটা সবধর্মের ব্যাপারেই সত্য। আবুল ফজলের মতে–

Dhaka University Institutional Repository

> ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য আর প্রধান এলাকা পরলোক, পারলৌকিক জীবন, সে জীবনের জন্য শিক্ষা আর প্রস্তুতির ব্যবস্থা বিধান। অন্যদিকে রাষ্ট্রের শুধু প্রধান নয়, একমাত্র এলাকা ইহলোক, রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষের সুখ-সুবিধে, শান্তি আর উন্নয়নের ক্ষেত্র তৈরী করা–অর্থাৎ নাগরিকদের ইহজীবনের দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন। (ফজল, ১৯৭৪:১২)

আমাদের দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেও ধর্মের চেয়ে সস্তা আর লোক-ক্ষ্যাপানো শ্লোগান আর নেই। তাই অনেকেই এ শ্লোগানের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। একমাত্র উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল। 'ধর্ম স্বভাবে মিলনধর্মী, রাজনীতির চরিত্র বিরোধধর্মী' (ফজল, ১৯৭৪:১৪৮)। এমন বৈপরীত্বের কারণে আবুল ফজল এ আশঙ্কাও করেছেন যে, 'সমাজের ধর্মজীবন যদি রাজনৈতিক আখড়ার বিরোধ-দলাদলিতে পরিণত হয় তাহলে তা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পড়বে।' তাই তিনি ধর্মীয় আলেমগণকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন 'যারা সমাজের ধর্মজীবনের দিশারী তাদের পক্ষেও বিরোধপূর্ণ কোনকিছুতে জড়িত হওয়া উচিত নয়' (ফজল, ১৯৭৪:১৪৮)।

১.২.৬

রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে আবুল ফজল বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর বিশ্বাস ও প্রত্যাশার কথা লিখেছেন। গণতন্ত্রের বিধিব্যবস্থা প্রতিপালন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক– এসবই আবুল ফজল তাঁর রাজনৈতিক ভাবনায় স্থান দিয়েছেন। এমনকি 'গণতন্ত্র আর সমালোচনা হাত ধরাধরি করে চলে। সমালোচনা থেকেই রাষ্ট্র খুঁজে পায় সঠিক তথ্যের দিশা' (ফজল, ২০০৮:১৫১)। এমন কথাও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে রাষ্ট্র যখন অসহিষ্ণু আচরণ করেছে নাগরিকের সমালোচনায়। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি রক্ষায় রাষ্ট্রের বা তার নাগরিকের দায়িত্ব সম্পর্কে আবুল ফজলের নিচের বক্তব্য থেকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কিরূপ হওয়া উচিত তার আভাস পাওয়া যায়–

> আমি আমার রাষ্ট্রের প্রতি তাকাতে চাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। আমি অনুগত নাগরিক, সে সরকার বা রাষ্ট্র আমার আনুগত্যের অধিকারী কি না, আমার আনুগত্যের যথার্থ হকদার কি না তা জানার অধিকার আমার রয়েছে। আমার মানে সমস্ত নাগরিকের। নাগরিকের এটি একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। আমরা লেখকরা একই সঙ্গে সরকারের সমর্থক আবার সরকারবিরোধীও। সরকার যখন জনগণের কল্যাণের পথের অনুসারী তখন আমরা সরকারের পক্ষে, সরকার যখন জনস্বার্থের বিরোধী তখন আমরাও সরকারবিরোধী। সরকারবিরোধী হওয়া মানে দেশের বিরোধী বা দেশের শত্রু হওয়া নয়। (ফজল, ২০০৮:১৪৯)

'মানবতন্ত্র', 'ধর্ম ও রাষ্ট্র', 'পাকিস্তানী জাতীয়তার বুনিয়াদ' ইত্যাদি প্রবন্ধে রাষ্ট্রের ধর্মীয় রূপ তথা ধর্মীয় জাতীয়তার অগ্রহণযোগ্যতার কথা তিনি লিখেছেন। তিনি চেয়েছেন সমাজে মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে এবং থাকবে, এমন রাষ্ট্র। সুবিচার আর সমতাই হতে পারে জাতীয়তার বুনিয়াদ। অর্থাৎ জাগতিক নিয়মই হবে সেই রাষ্ট্রের বুনিয়াদ।[১৪] গণতন্ত্রেই আবুল ফজলের আস্থা[১৫], তবে সমাজতন্ত্রের সমতাভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি তাঁর কল্যাণচিন্তায় সমর্থন জোগায় ফলে আবুল ফজল গণতন্ত্রের সরকার-বিরোধীদলের সমীকরণের মধ্যেই সাম্যবাদী সমাজের শোষণমুক্তি ও মানবিকতার সমন্বয় সন্ধান করেন। এই সমতার লক্ষ্যেই 'সমাজতন্ত্র : জাতীয় চরিত্র সমাজবিপ্লব' প্রবন্ধে আবুল ফজলের আস্থা দেখতে পাই সমাজতন্ত্রের প্রতি। তিনি মনে করেন, সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও ধনবন্টনের সামঞ্জস্য বিধান করে রাষ্ট্র কাঠামোর ভারসাম্য নিয়ে আসা যায়। আবুল ফজল কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য 'সমবায়'-এর ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, এর মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলার সেই দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যাখ্যা করেছেন–

> দীর্ঘদিনের সাধনা, সংগ্রাম ও প্রস্তুতির ফলে যেমন অগণিত বিচ্ছিন্ন মানুষ একটা জাতি হয়ে ওঠে তেমনি একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত জনসজ্ঞ কর্ম ও পেশার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে করতেই লাভ করে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভংগীর সমতা ও ঐক্য। এ সমতা ও ঐক্যবোধ যখন বহুব্যাপক হয়ে একটা দেশগত রূপ নেয় তখনই তা 'জাতীয়' হয়ে ওঠে। (ফজল, ১৯৬৮:১৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এ বিষয় স্পষ্ট যে, কমিউনিজমে বিশ্বাস থেকে এই আস্থা উৎসারিত হয়নি, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভাবসম্পদই এই সাম্যবাদী মন্ত্রের উদ্গাতা। কারণ আবুল ফজল ধর্ম হিসেবে ইসলাম এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে কমিউনিজমের মধ্যে কোন তুলনার পক্ষপাতী নন। কারণ কমিউনিজম খণ্ডিত, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। অবশ্য তিনি সাম্যবাদের সাথে ইসলামি অর্থনীতির 'অনেকখানি মিল' আছে বলে মনে করেন।[১৬] এমনকি সমাজতন্ত্রের স্থলে 'ইসলামি সমাজতন্ত্র'[১৭] উচ্চারণেও তাঁর আপত্তি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩.১ সাহিত্যভাবনা

'সাহিত্য চিন্তায় আবুল ফজল সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন বরাবর' (জিল্লুর, ১৯৭৮:৬৫)। আমাদের বিবেচনায় তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে বিশেষ কোন শ্রেণিভেদে পৃথক করা যায় না; প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সমকালীন সাহিত্য বিবেচনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রচিত, সাহিত্য সম্পর্কে তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা-তাড়িত, ব্যক্তিত্ব বা সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নধর্মী। রচনাকালের দিকে লক্ষ রাখলে দেখা যায়, সাতচল্লিশ-পূর্বকালে আবুল ফজলের সাহিত্যচর্চার শুরুর দিকে ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার যখন জাগরণকাল তখন আবুল ফজল আবির্ভূত হয়েছিলেন সাহিত্যের কর্মীরূপে। সেসময় রূপমুগ্ধ কথা সাহিত্যিকের চেয়ে চিন্তাশীল বাস্তবকর্মীর প্রয়োজন ছিল বেশী। আর 'সাহিত্যের মধ্যে কর্মীপুরুষেরই অন্য নাম প্রবন্ধকার' তাই প্রবন্ধের মধ্যেই তাঁর চিন্তাশীলতার প্রকাশ ঘটতে শুরু করে স্বাচ্ছন্দ্যে। পরবর্তীকালে স্বল্পকালীন কলকাতায় অবস্থিতির ফলে প্রগতিশীল সাহিত্যান্দোলনের সাথে পরিচিতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে করেছে আরও প্রসারিত, উদার ও স্বচ্ছ। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা। তারপর থেকে 'ক্রমেই আবুল ফজল মুসলিম সমাজের ঊর্ধ্বে তৎকালীন বৃহত্তর বঙ্গ-সমাজের একজন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন' (আনোয়ার, ১৯৮১:৩৭০)। 'আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের ধারা'[১৮] প্রবন্ধে আবুল ফজলের চিন্তা ও প্রজ্ঞার সেই সামগ্রিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বলিষ্ঠতা লক্ষ করার মতো। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ ও বিকাশ বর্ণনা প্রসঙ্গে আবুল ফজল ইংরেজদের সাথে বাঙালিদের সম্পর্ককে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন– রাষ্ট্রনৈতিক বা ব্যাবসায়িক দিক থেকে নয়, চিত্তলোক ও মানসজগতের সম্বন্ধের সাড়ায়। এ বিষয়ে অনেকের মতো তাঁরও সন্দেহ নেই যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের ফল। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজ চিন্তা-নায়ক এবং ইয়োরোপের মনীষীদের সঙ্গে এদেশের শিক্ষিত শ্রেণির পরিচয় ঘটেছে, ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে বিপ্লব। এই বৈপ্লবিক সৃষ্টি ধারায় অবগাহনের ফলে বাঙালির মন ও মননের বিকশিত উজ্জ্বলতায় আলোকিত হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে জসীমউদ্দীন পর্যন্ত সবাই। আবুল ফজল মনে করেন, এত অল্প সময়ে এত সৃষ্টিসম্ভার আমাদেরকে ঋদ্ধ করেছে তার কারণ 'বাঙ্গালীর তীক্ষ্ণ গ্রহণ শক্তি ও সব কিছুকে নিজস্ব করে নেওয়ার অদ্ভুত প্রতিভা বাঙ্গালীকে নকল-নবিশীর হীনতা থেকে রক্ষা করেছে।' (ফজল, ১৩৮২:৫৫২) বাঙালির মনমানসিকতার পরিবর্তন ধরা পড়ে মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে তাঁর আধুনিক সাহিত্যের বিষয় ও উপকরণে দ্রুত উত্তরণের দিকে দৃষ্টি দিলে। মিল্টন, স্কট, সেক্সপীয়ার, ওয়র্ডস্ওয়র্থ, বায়রন, কীট্‌স, ব্রাউনিং, শেলির মত ইয়োরোপের চিন্তানায়ক ও সাহিত্যপ্রতিভার সাথে চেতনার নৈকট্যে আধুনিক তরুণদের মধ্যে রক্ষণশীলতার দেয়াল ভেঙ্গে নতুন মূল্যবোধকে বরণ করে নেয়ার যে শক্তি ও ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে তার ফলে অপসৃত হয়েছে বাঙালির মধ্যযুগীয় পিউরিটান চিন্তা। প্রথম মহাসমর পরবর্তীকালে মানুষের শ্রেয় ও প্রেয়বোধে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রবেশ করেছে তার ফলেই ক্ষত-বিক্ষত মন দেবতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দৃষ্টি দিয়েছে মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার দিকে। সাহিত্য হয়েছে মানবিক। আরও বেশি বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক। 'যুগের মানসিকতাকে অস্বীকার করে অতীতকে আদর্শ ধরে (সে অতীত যত গৌরবময় হউক না কেন) তরুণেরা আজ পেছনের দিকে পথ চলা আরম্ভ করেনি'(ফজল, ১৩৮২:৫৫৬) বলেই তা সম্ভব হয়েছে বলে আবুল ফজল বিশ্বাস করেন। পুরোনো ব্যক্তিক-সামাজিক-বিশ্বাস-মূল্যবোধ-নৈয়ায়িকতাকে ঝেড়ে ফেলে নতুনের দিকে সাহিত্যের এই পালাবদলকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। এই পালাবদল ধরা পড়েছে ঘরে-বাইরে নারীর অবস্থার, তাঁর আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তনে; অধিকার সচেতনতায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির হাত ধরে নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে লোকভয়-শাস্ত্রিক বাধা-সংস্কারের বেড়াজাল উপেক্ষিত হচ্ছে। ফলে আধুনিক লেখকের চিন্তাচেতনায় এসব নতুন করে স্থান করে নিয়েছে। নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, মোহিতলাল, বিভূতিভূষণ-সহ যাঁরা যুগের সুখ-দুঃখ, সমস্যা-জিজ্ঞাসা, জয়-পরাজয়, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অক্ষয় স্মৃতি ভাণ্ডারে ধরে রাখার চেষ্ট করছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আবুল ফজল। তাঁর কালের আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে তিনি লিখেছেন– 'যে সাহিত্যের এ বিচিত্র অঙ্কুর আমার চোখের সামনে ভাসছে সে সাহিত্যকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আমি আধুনিক কালের মানুষ, আমি আধুনিক কালকে ভালবাসি। কারণ এর চেয়ে সত্য কোন কাল আমার জানা নেই। অতীত ও ভবিষ্যতের উপর আমার কোন হাত নেই। আধুনিক সাহিত্য আধুনিক কালেরই সাহিত্য। এ যুগের আশা আকাঙ্ক্ষা, এ যুগের সুখ-দুঃখ সে সাহিত্যের বুনিয়াদ' (ফজল, ১৩৮২:৫৫৮)। তবে তিনি বিশ্বাস করেন তরুণদের হাতে আধুনিক সাহিত্যের ভবিষ্যত নিহিত থাকলেও 'শেক্সপীয়ার গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ মৌসুমী ফুল নয়। প্রতিভার জন্ম দৈবের হাতে, যে দৈবের উপর কোন কালের, কোন মানুষের হাত নেই' (ফজল, ১৩৮২:৫৬০)।

১.৩.২

ভাষাই যেহেতু সাহিত্য ও সাহিত্যিকের একমাত্র বাহন তাই যে কোন সাহিত্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ভাষার সংকট-অপমান-নিবর্তনে সর্বাগ্রে সতর্ক হয়ে ত্বরিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে এটাই স্বাভাবিক। তরুণ আবুল ফজলের সাহিত্যচিন্তা সূচিত হয়েছিল মাতৃভাষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের ঔদাসিন্য ও অবহেলা লক্ষ করে এবং স্বসমাজের কূপমণ্ডুকতা, সংস্কারান্ধতা ও পশ্চাৎপদকে দূর করার প্রত্যয়ে। দেশ বিভাগের অনেক আগে থেকেই শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের মধ্যে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা, ভাষার উত্তরাধিকার প্রশ্নে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তরুণ আবুল ফজলের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান-উদ্ভূত জিজ্ঞাসার জন্ম দেয় *তরুণ পত্র*-এ তিনি প্রশ্ন তোলেন–

> পৃথিবীতে অনেক কিছু অদ্ভুত দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দু? না বাংলা? আমার মতে ইহাই সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত কথা। আম গাছে আম ফলিবে না কাঁঠাল– এমন অদ্ভুত প্রশ্ন অন্য কোন দেশে কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না।

এই সরল জিজ্ঞাসা ও স্বচ্ছদৃষ্টি অর্জন করা রক্ষণশীল মুসলিম প্রতিবেশ-শিক্ষায় বেড়ে ওঠা আবুল ফজলের জন্য দুরূহ ছিল। সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের সীমাবদ্ধতা ও অন্তরায় চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি মুসলমান লেখকের অভিজ্ঞতার ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করলেও লক্ষ করেছেন যে, সমাজের পশ্চাৎপদতাই তার মূল কারণ। ভাষার প্রতি বিরূপতা এর একটি কারণ হলেও তা-ও আসলে সমাজের গভীরে সংস্কৃতিচেতনার মধ্যে প্রোথিত। কারণ অপরিণত ও আবেগসর্বস্ব ভিত্তিহীন ধর্মীয় বোধ বাঙালিকে ভাষা-প্রশ্নে হীনমন্যতায় নিক্ষিপ্ত করেছিল। এভাব অসংলগ্ন ও অসংগঠিত সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে ভাষার সৃষ্টিশীলতা হয়েছিল দুর্বল ও বিপর্যস্ত। শুধু তাই নয়, মুসলিম সমাজে শিল্প-সাহিত্য-চিত্রকলা-সংগীত সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব, পর্দার বাড়াবাড়ি, উদার চিন্তাচেতনার অভাব, জ্ঞানান্বেষণে অনীহা, ধর্মের ভাবগত তাৎপর্যের চেয়ে আচারিক ধর্মে উৎসাহ ইত্যাদি আবুল ফজলের সাহিত্যভাবনাকে নানাভাবে সমাজঘনিষ্টতার পথে চালিত করে সমাজের হিতসাধন ও সংস্কারাকাঙ্ক্ষায় উৎসাহিত করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' কর্মী হিসেবে এই চিন্তা বৃহত্তর সমাজভাবনার সাথে যাচাই করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এভাবে আবুল ফজলের সাহিত্যভাবনা শুধু সাহিত্য নয় সমাজভাবনারও গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সাহিত্যের সামাজিক উপযোগিতাকে অপরিহার্য মনে করেন বলেই কলাকৈবল্যবাদী তাঁকে বলা যায় না।

বিভাগপূর্বকালে প্রকাশিত 'মুসলমান কথা সাহিত্যের গতি ও পরিণতি'[১৬] প্রবন্ধে আবুল ফজল তাঁর কালের মুসলমানের কথা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে কথা সাহিত্য মানুষের অনন্ত-রাজ্যের ইতিহাস। টলস্টয়, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের উদাহরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন, সাহিত্যে তাঁরা মানুষের অন্তর্জগত ও বহির্জগত যে নিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তার প্রভাব সমাজজীবনেও পড়েছে। আবুল ফজল মনে করেন কথাসাহিত্য Realistic ও Idealistic হলেও Idealistic বা আদর্শবাদী সাহিত্যও বাস্তবতাকে

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কারণ আদর্শের কল্পনায় বাস্তবকে অবজ্ঞা করলে মানুষের মন তা মেনে নেয় না, সৃষ্টি হয় ব্যর্থ সাহিত্য। আবুল ফজল মনে করেন, আদর্শের আধার খুঁজতে স্বর্গে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, বাস্তব জগত থেকেই তা আহরণ করা যায়। অথচ মুসলমানের কথাসাহিত্য এখানেই পথ হারিয়েছে। বাস্তব জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহে তাঁর রয়েছে হাজার বাধা-সংস্কার-নিষেধাজ্ঞা। বাঙালি হিন্দু-সমাজকে ফুটিয়ে তুলতে হিন্দু-কথাসাহিত্যিকদের কৃতিত্ব তুলে ধরে আবুল ফজল লিখেছেন–

> সমাজের দৈনন্দিন জীবনকে সত্য-মূর্ত্তি দান কর্‌তে– তা'র বর্ত্তমানকে খুলে ধর্‌তে যুগ-প্রবর্ত্তক প্রতিভা না হ'লেও চলে। নূতন সৃষ্টি নাই বা হ'ল, কিন্তু বর্ত্তমান মুসলমানের বাস্তব জীবন-যাত্রাকে সত্য-মূর্ত্তি দিতে কোন আপত্তি নেই।(ফজল, ১৩৮২:৫৬৫)

আবুল ফজলের মতে, মুসলমান কথা-সাহিত্যিকদের অকৃতকার্যতার কারণ 'মুসলমান সাহিত্যিকেরা সমাজের সর্বাঙ্গীন জীবনকে জান্‌তে পার্‌ছেন না ব'লে। নর-নারীর চির-রহস্যময় সম্বন্ধই কথা-সাহিত্যের বেশীর ভাগ মাল-মশলা জুগিয়ে থাকে।... নরনারীর এই বিচিত্র সম্বন্ধ চিরদিন মানুষের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে' (ফজল, ১৩৮২:৫৬৬)। অথচ মুসলমান সমাজে এই মনস্তত্ত্ব জানা বা বোঝার কোন উপায় নেই। জীবনকে প্রকাশ করার জন্য জীবন সম্পর্কে যে গভীর পরিচয় থাকা প্রয়োজন তা মুসলমান সাহিত্যিকদের হয়ে উঠছে না নারী-পুরষ সম্পর্কের বহুভঙ্গ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে। বাঙালি মুসলমান বহুদিন আগ থেকেই বাংলা ভাষা চর্চা শুরু করলেও তাঁরা কথা-সাহিত্যে সাফল্য লাভ করতে পারেননি, স্ব-সমাজের সত্যিকার চিত্র কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেননি, যুগসন্ধির সংগ্রাম প্রতিভাত হয়নি ভাষায়। সবকিছুর কারণ জীবনকে না জেনেই আকাশকুসুম কাহিনীকে সাহিত্য মনে করার ভুল। সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কের বাস্তবতায় না গিয়ে কল্পিত সম্পর্ক ও নারীমূর্তি সৃষ্টির উদাহরণ টেনে আবুল ফজল এক্ষেত্রে কেবল কাজী আব্দুল ওদুদের *নদীবক্ষে* উপন্যাসকেই জীবনের যথার্থ রূপায়ণ বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে সব চরিত্র আমাদের আশেপাশের, পারিপার্শ্বিক জীবনের, প্রতিনিয়ত যাদের আমরা দেখছি তারাই। একারণেই এ সাহিত্য পাঠক ও সমালোচকপ্রিয় হয়েছে। এই সাফল্যের আরেকটি কারণ, আবুল ফজলের মতে,''নদীবক্ষে' যাদের চরিত্র স্থান পেয়েছে , তারা সমাজের খুব নিম্নস্তরের লোক– তাদের মধ্যে পর্দা অবরোধ কিছুই নেই, তাদের জীবনযাত্রা সকলের সম্মুখে খোলাই রয়েছে' (ফজল, ১৩৮২:৫৭৩)। কিন্তু মুসলমানের সাহিত্যে আভিজাত্যের মোহ দূরিভূত না হওয়ায় পাত্র-পাত্রীর বংশ-বৃত্তি-পর্দার এত কঠোর অনুশাসন। জীবনকে জানা সেখানে অসম্ভব। কারণ উভয়ের 'হৃদয়ের রংমহল তালাবদ্ধ'। আবুল ফজল মনে করেন মুসলমান নামধারী সাহিত্যিকের লেখা হ'লেই তা মুসলমানের জাতীয় সাহিত্য হ'তে পারে না, যদি না তাতে মুসলমানের জাতীয় জীবন ফুটে ওঠে।

১.৩.৩

সাতচল্লিশ-উত্তর নতুন দৈশিক-ভাষিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির জীবনাচার, সাহিত্যিকের মনোজগত সবই যখন দ্রুত বদলে যেতে থাকে তখন সাহিত্যের লক্ষ্য-উপাদান-উপযোগিতাও অনিশ্চয়তায় পথ হারানোর উপক্রম হয়। এসময় অনেক প্রবীণ সাহিত্যিকের সৃষ্টিশীলতায় অনুর্বর বন্ধ্যাত্ব দেখা দিলে আবুল ফজলকে আবারও কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। সাতচল্লিশের ভারত-বিভাগ-উত্তর কালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আবেগের মধ্যে ভেসে না গিয়ে আবুল ফজল ছিলেন শিল্পীর মানসমুক্তি ও সংস্কৃতির মানবিক বিকাশেরর সতর্ক ভাষ্যকার। ক্রমাগত সংকুচিত হতে থাকা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে নিয়মিত প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির পথ-নির্দেশকের দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়েছে। তাই ইতিহাসের প্রয়োজনে সৃষ্টিশীল রচনায় প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক আবুল ফজল প্রবন্ধকার হিসেবেই অধিকতর সম্মানিত ও স্মরণীয় হয়েছেন। সাতচল্লিশ-উত্তর পাকিস্তানের আত্যন্তিক ও কৃত্রিম ধর্মীয় উন্মাদনায় বাংলা সাহিত্যের রূপ-প্রকৃতি-ভবিষ্যৎ নিয়ে কতিপয় জিজ্ঞাসার মীমাংসা সন্ধান জরুরি হয়েছিল। যেমন, বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য কোনটি? ইসলামের সাথে এই ঐতিহ্যের সম্পর্ক-দূরত্ব কীভাবে নিরূপিত হবে? ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্য বিবেচনা করা হবে কীভাবে? ইত্যাদি। ঐতিহ্য প্রশ্নে তখনকার বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী তথা সমাজের শিক্ষিত অগ্রসর শ্রেণি স্পষ্টত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমদিকে পাকিস্তানবাদী আন্দোলন থেকে প্রাপ্ত ধর্মীয় উন্মাদনার বিপরীতে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হলেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর বিশেষত ছয়-দশকের শুরু থেকেই প্রগতিশীল তরুণ বুদ্ধিজীবীগণ একযোগে বাংলা ভাষার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের নিজেদের ঐতিহ্য বলে স্পষ্ট ভাষায় দাবি করতে থাকেন। তাঁরা ইসলামের সাথে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরোধের তথাকথিত অভিযোগ অস্বীকার করে একটি মানবিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজগঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন।

সাতচল্লিশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাঙালি সংস্কৃতিও চিন্তাজগতে সবচেয়ে বড় আঘাত আসে ভাষার অধিকার হরণের মাধ্যমে। একুশের রক্তঝরা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামের কারণে সেই অধিকার কেড়ে নিতে ব্যর্থ হয়ে বাংলা ভাষাকে বিকলাঙ্গ করার দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নে মনোযোগী হয় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। একাজে তাদের সহযোগী হয় ধর্মীয় উন্মাদনায় অন্ধ অথবা প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে আত্মবিক্রিত পাকিস্তানি শাসকের সমর্থনপুষ্ট একশ্রেণির বাঙালি সাহিত্যিক-লেখক-বুদ্ধিজীবী। ইসলামি তহজিব-তমুদ্দুনকেই দেশীয় সংস্কৃতির মানদণ্ড ধরে বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিল তাঁরা। এমনকি অনৈসলামিক আখ্যা দিয়ে বর্জন করতে চেয়েছিল বাংলা বর্ণমালাও। দেশের প্রবীণ বুদ্ধিজীবী হিসেবে এই অপচেষ্টা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন আবুল ফজল। ভাষাই সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন,বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর হামলা বাঙালির সেই মহৎ প্রেরণা ও আবেগের গতি রুদ্ধ করার প্রয়াস, যার মাধ্যমে জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সৃষ্টি হয় মহৎ সাহিত্য। জাতীয় জীবনে সেসময় ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জন প্রশ্ন মুখ্য হয়ে উঠেছিল। নতুন রাষ্ট্রে ধর্মভিত্তিক জাতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টির ডামাডোলের মধ্যে বাঙালির হাজার বছরের ভাষা ও সংস্কৃতিকে কীভাবে স্থান করে নিতে হবে অথবা আদৌ সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করা হবে কিনা ইত্যাকার জিজ্ঞাসায় যখন বাঙালি ঐতিহ্যের ধারক-সমর্থকগণ দিশাহার তখন, তখন আবুল ফজল বিনা দ্বিধায় জানিয়েছিলেন–

> সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের সাহিত্যিক আমরা কেউই নই। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্যের শুধু যে ভাষা পৃথক তা নয়– তার মন-মেজাজ, জীবন-জিজ্ঞাসা, এমনকি দৃষ্টিভঙ্গি আর শিল্পরূপও পৃথক। পাকিস্তানের দুই অংশের ইতিহাস ভূগোল ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। দুই অংশের মধ্যে ভৌগলিক দূরত্ব এত দুস্তর যে কল্পনায়ও সাধারণ নাগরিক একটার সঙ্গে আর একটার যোগসাজস করতে অক্ষম। এই দূরত্ব প্রাকৃতিক বলেই দুর্লঙ্ঘ্য। ইংরেজের সঙ্গে আমেরিকাবাসীর যতখানি মিল আমাদের ততখানি মিলও নেই। (ফজল, ২০০৮:৩০)

ঐতিহ্য প্রশ্নে ইয়েটস-কথিত Popular memory এবং Ancient imagination এর উদাহরণ দিয়ে জানিয়েছেন এ দুটিই ধর্মভিত্তিক বা দেশের ঐতিহ্যভিত্তিক হতে পারে তবে ধর্মের প্রভাব সেখানে সীমাবদ্ধ। নজরুলের 'মোহররম' আর 'বিদ্রোহী' কবিতা পার্থক্যের মধ্যেই জনমনের 'স্মৃতি' ও 'কল্পনা'র পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। তাই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলার আশংকায় আবুল ফজল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন– 'আজ আমাদের Popular memory ও Ancient imagination খণ্ডিত শিল্পীর মন-মানস বিপর্যস্ত, ছিন্নমূল ও নোঙরহীন।' কিন্তু উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন মুক্ত পরিবেশ, চিন্তা ও আস্বাদনের স্বাধীনতা– প্রয়োজন আন্তরিকতা। অথচ লেখার বিষয় ও ধরন নিয়ে শাসকের কোপানলে পড়ার আশঙ্কায় তখন এদেশের শিল্প-সাহিত্যে নেমে এসেছে বন্ধ্যাত্ব। আবুল ফজল এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন–

> জীবন ও জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে যে যে মতই পোষণ করুক, অথবা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা যার যেমন হোক– দল মত নির্বিশেষে সব লেখককে লেখার স্বাধীনতা দিতে হবে। এখন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য বিশেষ করে পাকিস্তানের দুই অংশে দৃষ্টিভঙ্গির যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের লেখকরা কিছুতেই দ্বিধামুক্ত হতে পারছে না।...

Dhaka University Institutional Repository

> বর্তমানে যাঁরা প্রগতিশীল বলে পরিচিত, যাঁরা লেখায় কিছুটা তেল-নুন-লাকড়ির কথা বলেন, তাঁদের পক্ষে কোনো সাহিত্যানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া পর্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। চট্টগ্রামে, কুমিল্লা, ঢাকা, কাগমারিতে যে কয়টা বড় আকারের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে, যদিও এর কোনোটাই নিছক বামপন্থীদের অনুষ্ঠান ছিল না, তবুও এর প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিরোধিতার ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ তোলা হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঢাকার কোনো কোনো দৈনিক প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন। তারপর দিনের পর দিন চলতে থাকে নিন্দার খেউড়। এ হচ্ছে এই অভিযোগের প্যাটার্ন! এঁদের চোখা নিন্দা হচ্ছে, 'ওরা কমিউনিস্ট, ভারতের দালাল অথবা যুক্তবঙ্গের সমর্থক।' কোনো যুক্তি নেই, কোনো প্রমাণ নেই– একটা rational উক্তি পর্যন্ত নেই। শুধু কটূক্তি। (ফজল, ২০০৮:৩১)

এমন পরিস্থিতিতে শিল্পীর পক্ষে আত্মস্থ হওয়ার সুযোগ নেই বলেই বিভাগ-পূর্বকালের সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকগণ হয়ে পড়েছেন ম্রিয়মান, দিশাহারা। এই নীরবতা বাংলা সাহিত্যের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি–

> পাকিস্তান আন্দোলন ও তার সাফল্য কী জানি কেন আমাদের প্রতিভাবন সাহিত্যিক-শিল্পীদের মন-মানসে কোনো নতুন জোয়ার আনতে পারে নি, অন্তরের অন্তঃস্থলকে গভীরভাবে নাড়া দেয় নি কারো, খুলে যায় নি তাদের চোখের সামনে সাহিত্য-শিল্পের কোনো নতুন দিগন্ত-রেখা। স্বাধীনতার অরুণোদয়ে কারো মন-মানস হয় নি মুখর– নতুন আবেগে আরো উদাত্ত-কণ্ঠ হয়ে ওঠে নি উচ্ছ্বসিত। (ফজল, ২০০৮:৩৩)

আবুল ফজল এই পরিস্থিতির মুক্তি দেখেছেন দুই দিকে। প্রথমত জাতীয় সাহিত্যের রূপ ঠিক করা প্রয়োজন সাহিত্যে আন্তর্জাতিকতার প্রলেপ দেয়ার আগেই। দ্বিতীয়ত তরুণ লেখক-সাহিত্যিককে হতে হবে বেপরোয়া মনোভাব সম্পন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বেপরোয়া কলমের খোঁচার উদাহরণ দিয়ে আবুল ফজল লিখেছেন 'জাত শিল্পী মাত্রই বেপরোয়া'।

১.৩.৪

পাকিস্তান-পূর্ব বাংলা সাহিত্য আমাদের ঐতিহ্য কি না?– এমন বিতর্ক যখন আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল তখন আবুল ফজল ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। ঐতিহ্যের রূপ-রীতি-পরিচয় তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন ঐতিহ্য দুই রকম– অধীত ঐতিহ্য এবং অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য। অধীত ঐতিহ্য মূল্যহীন নিষ্ফল, কারণ এর সাথে লব্ধ-অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে সাহিত্যের সার্বজনীন ঐতিহ্যকে অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য বলা যায়। আবার 'যে ঐতিহ্য সমসাময়িক অর্থাৎ যার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক রয়েছে– যা জীবনকে সঞ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম একমাত্র সে ঐতিহ্যই সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য। কারণ সাহিত্য জীবনের জন্য– জীবন সাহিত্যের জন্য নয়' (ফজল, ১৯৬৮:১০)। আবুল ফজলের অভিমত–

> ঐতিহ্য কথাটা আমাদের সাহিত্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। অধীত ঐতিহ্য আর অভিজ্ঞতার ঐতিহ্যে রয়েছে আসমান জমিন ব্যবধান।... অধীত ঐতিহ্য থেকে আমরা স্রেফ কাঠামোটাই নিতে পারি। কিন্তু সে কাঠামোয় প্রাণ সঞ্চার করতে হবে অভিজ্ঞতালব্ধ ঐতিহ্যের উপর রচনাকে দাঁড় করিয়ে। তাই রচনায় অভিজ্ঞতা সবচেয়ে মূল্যবান। মোট কথা অভিজ্ঞতাই ঐতিহ্য– ঐতিহ্যই অভিজ্ঞতা। জাতিগত অভিজ্ঞতাও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপায়িত হয়ে সাহিত্যের ঐতিহ্য হয়ে ওঠে। কারণ ব্যক্তিই রচনা করে সাহিত্য। (ফজল, ১৯৮০:৭)

তবে এজন্য বিদেশের সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে বর্জনের প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করেন। বরং সেই ঐতিহ্য যদি আমাদের শিল্প-সাহিত্য ও চেতনাকে দৃঢ় করে বিশ্বচেতনায় দাঁড়াতে সাহায্য করে তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণ করা যেতে পারে। আবার অভিজ্ঞতারও দুই রূপ– মানসিক ও ব্যবহারিক। ঐতিহ্য লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার ফল। ব্যবহারিকের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলে তবেই সেই ঐতিহ্য হয় গ্রহণীয়।

সাহিত্য মানুষের ধারাবাহিক সাধনার ফসল, ভূঁইফোঁড় কিছু নয়। তাই কালের ক্ষয় এড়িয়ে, মানুষের রুচির বিবর্তন ও পরিবর্তনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যেসব শিল্প-সাহিত্য চিরন্তন ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে সেগুলি যে দেশের, যে

Dhaka University Institutional Repository

জাতের, যে ভাষারই হোক না কেন সাহিত্যিকের কাছে উপেক্ষণীয় হতে পারে না। একারণেই ঐতিহ্য আহরণ কষ্টসাধ্য ও সাধনালব্ধ সম্পদ।[২০] আবুল ফজলের মতে ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি বা ভাষাগত কারণে সাহিত্য-শিল্পের স্মরণীয় ঐতিহ্য বিশেষকে উপেক্ষা করা মানে 'ছোটর জন্য বড়কে ত্যাগ করা' (ফজল, ২০০৮:৩৭)। আর 'মানা মানে অতীতের ও বর্তমানের যা কিছু স্মরণীয় তাকে যথাযথ মূল্য দেওয়া– এই মূল্য দেওয়ার ওপরই নির্ভর করে সাহিত্য-শিল্পের তথা সভ্যতার ধারাবাহিকতা। সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগার কোনো সম্পর্ক নেই' (ফজল, ২০০৮:৩৭)।

তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তানের কোন ঐতিহ্য নেই' বলে 'সাহিত্যের ঐতিহ্য' প্রবন্ধে আবুল ফজলের মন্তব্য বেশ বিভ্রান্তিকর। কারণ আমরা জানি ঐতিহ্য বলতে তিনি প্রধানত অভিজ্ঞতাকে বুঝিয়েছেন, সেই অধীত বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সাথে শরৎচন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের সাহিত্যে সামাজিক শৃঙ্খল ভাঙার উদাহরণও দিয়েছেন অথচ বাংলা ভাষার কোন ক্লাসিক্স নেই বলে বাংলা সাহিত্যের কোন ঐতিহ্যও নেই এমন ঢালাও মন্তব্য অনভিপ্রেত। তাঁর ভাষ্য নিম্নরূপ–

> আমাদের নিজেদের অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব কোনো সাহিত্যিক ঐতিহ্য নেই– নেই আমাদের কোনো ক্লাসিকস বা এপিক্। এদিক দিয়ে উর্দু-বাংলার অবস্থা প্রায় সমান। উর্দুরও নেই কোনো উল্লেখযোগ্য ক্লাসিকস বা এপিক্। ফলে আমাদের সাহিত্য জীবনের বুনিয়াদ কিসের ওপর প্রতিষ্ঠা করা হবে তা আমাদের সাহিত্যসেবীদের সামনে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা সবাই প্রায় দিশেহারা। তাই কেউ আশ্রয় নিতে চাইছে ইসলামে, কেউ দেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শে, কেউ সাম্যবাদে, কেউবা অন্য কিছুতে। সাহিত্যিক-শিল্পীর জন্য এর কোনোটাই নিরাপদ আশ্রয় নয়। (ফজল, ২০০৮:৩৮)

তবে শাস্ত্র বা ধর্মকে ঐতিহ্যের স্থান দেয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি আপত্তি জানিয়েছেন আবুল ফজল–

> ধর্মের কাজ মানুষের সামাজিক নীতিবোধ জাগিয়ে তোলা ও মানুষের মনকে দেওয়া আধ্যাত্মিক খোরাক। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ছাড়া ধর্ম কখনো সাহিত্যের পথ ও পাথেয় হতে পারে না। ধর্ম ব্যাপারটি অত্যন্ত অনড়, যাক বলে rigid; তাতে পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। তেমনি রাষ্ট্র, রাজনৈতিক মতবাদ বা ইজমগুলিও তাই। এ সবের কোনো একটাকে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি করতে গেলে বনের বাঘকে খাঁচায় বন্ধ করলে যে দশা হয় সাহিত্য শিল্পেরও সেই ঘটে।...
>
> সাহিত্য হল মানুষের মনের মুক্তির ক্ষেত্র। তাই সাহিত্যিককে এসব শৃঙ্খল ভেঙে ভেঙেই এগুতে হয়। শৃঙ্খল বা শাসন নেই, অন্তত যখন তিনি লিখতে বসেন তখনকার মতো তিনি সামাজিক বা শাস্ত্রীয় মানুষ নন। তখন তিনি শুধু শিল্পী। (ফজল, ২০০৮:৩৮)

মহৎ শিল্পী ধর্ম বা শাস্ত্রের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারবেন না এটাই সৎ সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য।
আবুল ফজলের মতে ভাষা-শব্দ-প্রতীক-রূপকেরও ঐতিহ্য রয়েছে। বহিরঙ্গের ঐতিহ্য। প্রয়োগনৈপুণ্যে, দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে, অর্থ-ব্যাপ্তি ও ইঙ্গিতময়তার জন্য এমনভাবে সাহিত্যের অঙ্গ ও ঐতিহ্য হয়ে পড়েছে যে তা কখনো সাহিত্যের আঙ্গিক থেকে বাদ যাবে না। সাহিত্যের অন্তরের ঐতিহ্যও গুরুত্বপূর্ণ। আবুল ফজল এই দুই ঐতিহ্যের উদাহরণ হিসেবে যথাক্রমে 'বিদ্রোহী' ও 'বনলতা সেন' কবিতার উল্লেখ করে লিখেছেন–

> ইতিহাস, ভূগোল পুরাণ-কাহিনী, রূপকথা, কিংবদন্তি, লিজেন্ড এপিক আর ব্যাপক অর্থে যাকে ক্লাসিক্স বলা হয় এসবই সাহিত্যের ঐতিহ্য। ক্লাসিকস শুধু যে রচনার দেহ অলঙ্করণের উপকরণ জোগায় তা নয়, রচনার অন্তরলোকের রূপায়ণেও তা সাহায্য করে। সাহিত্যের একটা চিরন্তন নীতি ও নিজস্ব চরিত্র আছে– ঐতিহ্যবোধ সেই ধারণাকে স্পষ্টতর করে তোলে। ফলে লেখকও বেঁচে যায় বহু বিভ্রান্তির হাত থেকে। সাহিত্যের নীতি বা চরিত্র কোনোক্রমেই সাম্প্রদায়িক বা দলীয় নয়। তাই খাঁটি সাহিত্য ব্যক্তিক হয়েও নৈর্ব্যক্তিক, সামাজিক হয়েও অসামাজিক, জাতীয় হয়েও আন্তর্জাতিক। (ফজল, ২০০৮:৪১)

১.৩.৫

আবুল ফজল অত্যন্ত জোরালো ভাষায় চিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। শিল্প-সাহিত্যের যে কোন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে, রাজনৈতিক বা সামাজিক মূল্যচিন্তার অধঃপতনে অথবা রাষ্ট্রীয় নিবর্তনে তাঁর প্রতিবাদী শব্দ

Dhaka University Institutional Repository

ভাষণে-অক্ষরে জাতির মননশীলতাকে উদ্দীপ্ত রেখেছে। চিন্তা যেরকমই হোক 'আমি স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী' এমন উদাত্ত ঘোষণার পর আবুল ফজল লিখলেন–

> চিন্তা ভুল হতে পারে, কিন্তু আন্তরিক চিন্তা কখনো মূল্যহীন হতে পারে না। সব রকম স্বাধীন চিন্তাই লেখক ও পাঠক উভয়ের মনের দিগন্ত খুলে দেয়। মনের চেয়ে বড় বন্ধন আর নেই। সে বন্ধন কাটার প্রধান হাতিয়ার চিন্তা। (ফজল, ২০০৮:১৪৫)

কলমের স্বাধীনতা চিন্তার স্বাধীনতারই নামান্তর। 'চিন্তার স্বাধীনতা মানে লেখকের স্বাধীনতা। লেখকের স্বাধীনতা মানে প্রকাশের স্বাধীনতা' (ফজল, ২০০৮:১৪৯)। আবুল ফজল সারাজীবন যে সত্যনিষ্ঠার সাধনা করেছেন, বিবেক ও মানবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন মানবজীবনে সমাজের সর্বস্তরে তা-যে বারবার চোখের সামনেই ভূলুণ্ঠিত হয়েছে তা সংবেদনশীল লেখকমানসের অগোচর ছিল না। তাই 'বুদ্ধির মুক্তি'র জাগ্রত সৈনিক বারবার অধর্মের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখ-রাঙানির বিরুদ্ধে, সমাজের অন্ধত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লেখকের স্বাধীনতা ও শিল্পীর স্বাধীনতার কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে বাংলাদেশের সৃষ্টিশীলতার ও বুদ্ধিজীবিতার জগতে বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে। একদিকে আর্থিক-প্রলোভন ও পেশাগত-সুযোগসুবিধা সম্বলিত নিশ্চয়তার হাতছানি অন্যদিকে ভয়ভীতি-নিপীড়ন-কণ্টকিত অনিশ্চিত জীবনের হুমকি মধ্যে পড়ে অধিকাংশ সচেতন লেখক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক যখন হয় বিক্রীত না-হয় বিবরবাসী তখন এই অন্ধকার দূর করতে আবুল ফজলকেই লিখতে হয়েছে 'শিল্পীর স্বাধীনতা'। আবুল ফজলের মতে ইংরেজ শাসনামলেও লেখক-শিল্পী ছিল স্বাধীন কারণ রাজনীতির বাইরে ইংরেজ শাসন ছিল উদার ও শিথিল। তাই লেখক-শিল্পী ছিলেন সৃষ্টিমুখর। আবুল ফজল প্রকারান্তরে পাকিস্তানী স্বৈরশাসকের দিকে ইঙ্গিত করে হিটলার, রাশিয়ার জার শাসক, রোমান সম্রাট সিজারের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন–

> দুর্দান্ত শাসকেরা চিরকালই শিল্পীর স্বাধীনতাকে হরণ করতে ও দমন করতে চেয়েছে। আজও বহু দেশে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু এসব দুশ্চেষ্টা বার বারই ব্যর্থ হয়েছে, সামনেও হবে। এক চক্ষু হরিণের মত ক্ষমতার নেশায় পাওয়া শাসকরা কিন্তু তা দেখতে পান না বা দেখেও না দেখার ভান করেন। (ফজল, ২০০৮:১৩৯)

লেখকের স্বাধীনতা যে শুধু লেখকের জন্যই প্রয়োজন তা নয়, দেশের জনসাধারণের জন্যও তা অত্যাবশ্যক। কারণ লেখক চিন্তার স্বাধীনতা হারালে সমাজেরও নতুন চিন্তা করার সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। আবুল ফজলের ভাষায়– 'পোষা বাঘ যেমন পুরোপুরি বাঘ নয়, তেমনি পোষা শিল্পীও খাঁটি শিল্পী নয়। শিল্পীর জন্য স্বাধীনতা– বিকাশের স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য। যেমন অপরিহার্য পুরোপুরি বাঘ হওয়ার জন্য স্বাধীন অরণ্য-জীবন' (ফজল, ২০০৮:১৩৯)।

সুতরাং চিন্তার স্বাধীনতা প্রয়োজন নিষেধের বন্ধন কাটতে। আবুল ফজল উদাহরণ দিয়েছেন– চোখের সামনে যে সূর্য আছে সেটা যদি না থাকে তো পৃথিবীর চেহারা কেমন হতে পারে, কিংবা শয়তান আছেন- ঈশ্বরও আছেন কিন্তু না থাকলে পৃথিবীর কোন রূপ আমরা দেখবো– সেই কল্পনার স্বাধীনতা লেখকের থাকতে হবে। 'কল্পনা ভুল হতে পারে, ভ্রান্ত হতে পারে' কিন্তু আবুল ফজল প্রশ্ন রেখেছেন 'তাই বলে আমি কি কল্পনা করতেও সাহস করব না? চিন্তা করতেও ভুলে যাব' (ফজল, ২০০৮:১৪৪)? কল্পনা বা চিন্তা করার এই দুঃসাহসটুকু না থাকলে 'নবভাবের অগ্নিস্পর্শ ঘটে না' –

> এ স্বাধীনতা খর্বিত হলে– স্বাধীন চিন্তায় লেখকরা বাধা পেলে, একদিন চিন্তা করতেই তাঁরা ভুলে যাবেন– তাঁরা ভুলে যাওয়া মানে জাতি ভুলে যাওয়া। কারণ তারাই তো জোগাবেন জাতিকে নব নব চিন্তার উপাদান। (ফজল, ১৯৬৫:৯৭)

স্বাধীনতা ছাড়া মনুষ্যত্ব পূর্ণতা পায় না ফলে সাহিত্যও হয় অপূর্ণাঙ্গ, খণ্ডিত। বিভাগোত্তর পাকিস্তানে এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন আবুল ফজল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

অর্জিত স্বাধীনতার পরও পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটায় আবারও লেখকের স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো শব্দ ব্যবহার করে আবুল ফজলকে লিখতে হয়েছে–

> খাঁটি লেখক কখনো হ্যাঁ হুজুরের ভূমিকায় নামতে পারে না। রাজনৈতিক মুক্তির চেয়েও মনের মুক্তি, বুদ্ধির মুক্তি অনেক মূল্যবান। ওই ছাড়া স্বাধীনতা কখনো অর্থপূর্ণ হয় না।... তাই লেখার স্বাধীনতা, লেখকের স্বাধীনতা আমাদের যে কোন মূল্যে অক্ষুণ্নই রাখতে হবে।(ফজল, ২০০৮:১৫২)

'ভাষা আর লেখকের স্বাধীনতা' প্রবন্ধে আবুল ফজল চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তা ও কল্পনার স্বাধীনতা দাবি করেন। কবি ইকবাল থেকে উদ্ধৃত[২১] করে তিনি লিখেছেন, ব্যক্তির জন্য ও সমাজের জন্য জাগ্রতচিত্ততা আবশ্যক। জাগ্রতচিত্তের মানুষ তৈরি করার খোরাক তথা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে সাহিত্য ও সাহিত্যিক। চিন্তা ও কল্পনা বাধাগ্রস্ত হলে ব্যক্তি ও সমাজের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব হয় না। সমাজ যদি নতুন চিন্তার আস্বাদ ও অভিজ্ঞতা-বঞ্চিত হয় তবে সেই সমাজ হয় অথর্ব অচল–

> কাজেই লেখক আর তাঁর রচনার পথে কোন বাধা না থাকাই উচিত। কালচার বা সবরকম সংস্কৃতির এক প্রধান শর্ত পরমতসহিষ্ণুতা, ভিন্নমত ও ভিন্নপথ-অন্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যেও থাকতে পারে এবং থাকা উচিত, অধিকন্তু তা স্বাস্থ্যপ্রদও। মনে-প্রাণে এ-নীতি মেনে না নিলে সাহিত্যের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে পারে না। সমাজ আর রাষ্ট্র যদি তার মতামতের রোলার সাহিত্যের উপর চালাতে শুরু করে, তা'হলে সাহিত্য শুধু নয়, সমাজও হয়ে পড়বে অচল আর অথর্ব। তাবৎ সভ্য দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, আগে চিন্তা আর মননশীলতা, পরে তার পথ বেয়ে দেখা দেয় ব্যবহারিক উন্নতি আর সমৃদ্ধি। অর্থাৎ আগে চিন্তা পরে কর্ম; আগে কল্পনা পরে বাস্তবায়ন। সবরকম সমৃদ্ধির এ-ই ইতিহাস। (ফজল, ১৯৭৪ক:১৩)

লেখক তার আবেগ–ভাব প্রকাশ করেন ভাষার মাধ্যমে। সুতরাং ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতাও তাঁর থাকা চাই। সাহিত্য আর সংস্কৃতি সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। সবরকম সংস্কৃতি সাধনার প্রধান বাহন সাহিত্য। কোনকারণে লেখার স্রোত বন্ধ হয়ে গেলে সমাজের সবরকম মননশীলতার ধারাও রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন কোন এক অচলায়তনে স্থাণু হয়ে পড়তে পারে সমাজ। 'সমাজকে সচল, সজীব আর সচেতন রাখার জন্যই সাহিত্য আর সবরকম মননশীলতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী' (ফজল, ১৯৭৪ক:১২)।

সাহিত্য ও শিল্পের কাজ হলো মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করা–মনকে শুধু মুগ্ধ করা নয়, হৃদয়কে জাগিয়ে তোলাও। ইতিহাসের সূচনায় মানুষের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিল লৌকিক ধর্মদর্শনকে কেন্দ্র করেই। তথাপি মানুষ ধর্মাদর্শে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সাহিত্যিকের কল্পনার জগৎ গড়ে তুলেছে ব্যাপকতর প্রভাব ও আবেদনের জগত। তাই আবুল ফজলের মতে, 'মনের মধ্যে সহজে প্রবেশ করে বলেই ধর্মগ্রন্থের ওপর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব। ধার্মিকের চেয়ে সাহিত্য রসিক মানুষ হিসেবে বড়' (ফজল, ২০০৮:২৫)। ধর্মাদর্শ ও ভাবধারা সাহিত্যে রূপায়িত না হলে তা কেবল কেতাবি বা মৌখিক বুলি হয়েই থাকে, মানুষের মনের খোরাক হতে পারে না। তা আমাদের তথকথিত ধার্মিকদেরকে রসবোধশূন্য, ভারসাম্যহীন মানুষ আখ্যা দিয়ে আবুল ফজলের অভিমত–

> হিন্দু তার দেব-দেবীকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারে শিল্পে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, নাটকে, নভেলে। নিত্য নতুনভাবে রূপায়িত করে তাকে জীবনের সামগ্রী করে নিতে তার কোনো বাধা নেই। বৌদ্ধরাও তা করতে পারে- বুদ্ধ ও বুদ্ধ-জীবন নিয়ে কত অসংখ্য শিল্প-কলাই না দেশ বিদেশে গড়ে উঠেছে। খ্রিস্টানরাও তাই করে। খ্রিস্ট ও মেরির জীবন নিয়ে কত অসংখ্য শিল্প যে সৃষ্টি হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। যে কোনো শিল্প-বস্তুর যে প্রেরণা তার রস তথা আনন্দের সম্পর্ক রয়েছে- তাই সহজে তা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে ও নাড়া দেয়। শিল্প ও সাহিত্যের ভেতর দিয়ে অন্যান্য ধর্মের ভাবুকদের জীবন যেমন অনেকের মন-মানসের ও ধ্যানের বস্তু হয়ে উঠেছে, ইসলামের বেলায় তা হয় নি। (ফজল, ২০০৮:২৬)

সুতরাং মুসলমানের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে হলে পুরনো উপকরণকে নতুন আঙ্গিকে ও নতুন রূপে সাহিত্যে ব্যবহার ও রূপায়িত করার স্বাধীনতা লেখকের থাকা চাই। এই স্বাধীনতা না থাকায় মুসলমানের সৃজন-প্রতিভা

Dhaka University Institutional Repository

কোনদিকে মুক্তি না পেয়ে শুধু মসজিদ আর স্মৃতিসৌধ চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে যার পরিধি অত্যন্ত সীমিত এবং সাধারণ শিল্পীচিত্তের আয়ত্তের বাইরে।

১.৩.৬

সাহিত্য কি? কে সাহিত্যিক? কীভাবে সাহিত্য রচিত হয়? সাহিত্যিকের দায়িত্ব কী? – সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে এমন প্রাথমিক জিজ্ঞাসার উত্তরও আবুল ফজল খুঁজেছেন প্রবন্ধে[২২]। সরল জবাব দিয়েছেন–সাহিত্য হল ভাব আর অনুভূতির প্রকাশ। যিনি প্রকাশ করতে পারেন তিনিই সাহিত্যিক। অর্থাৎ প্রকাশ সাহিত্যের অপরিহার্য শর্ত কারণ–'সব মানুষই অল্পবিস্তর ভাবতে আর অনুভব করতে পারে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে লাখে এক' (ফজল, ১৯৬৮:১৬২)। মনের আন্তরিক কোন ভাব প্রকাশের জন্য লেখক নিজের মাধ্যম খুঁজে নেয়। আন্তরিকতার স্পর্শ ছাড়া সেটি হৃদয়বেদ্য হয় না। লেখক সামাজিক জীব বলেই সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সে অধীন। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে কে-কোনটিকে গড়ে তোলে এই প্রশ্নের জবাবে আবুল ফজল লিখেছেন–

> সাহিত্য শিল্পের অগ্রগতি যুগপৎ হতেই হবে। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা অচল। এ দুই একে অন্যের পরিপূরক। তাই উন্নত দেশে অনুন্নত সাহিত্য বা অনুন্নত দেশে উন্নত সাহিত্য আশা করা যায় না। (ফজল, ১৯৬৮:১৬৩)

তাই সাহিত্যিকের দায়িত্ব সমাজে সৎ ও আন্তরিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটানো। সাহিত্য জীবন নিয়ে, জীবনের জন্য; তাই সাহিত্যকে হতে হয় জীবনভিত্তিক। সাহিত্যেই মানবতার কণ্ঠ সবচেয়ে উচ্চকিত এবং বলিষ্ঠ। আবুল ফজল মানবচিত্তে ও জীবনে সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন–

> স্নেহে-ভালবাসায়, প্রেম-প্রীতিতে যে একটা অনির্বচনীয় আবেগী মূল্য রয়েছে সাহিত্য আমাদের সে সম্পর্কে সচেতন করে তোলে– মনুষ্যত্বের একটা অদৃশ্য অন্তর্জগৎ আমাদের অহরহ ঘিরে রয়েছে– যা না থাকলে মানুষ হিসেবে আমাদের জীবন ব্যর্থ হতো। মানুষের অন্তর্জগত উদ্ঘাটন সাহিত্যের প্রতিদিনের দায়িত্ব। (ফজল, ১৯৬৮:১৬৫)

চিন্তা, ভাব, আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা এ সবই যেমন একদিকে সাহিত্যের উপজীব্য তেমনি অন্যদিকে এ সবকে জাগিয়ে তোলা, এ সবের দিগন্ত প্রসারিত করাও সাহিত্যশিল্পের এক প্রধান ভূমিকা। সভ্যতা এরই ফল। কারণ চিন্তার বিকাশের সাথেই সভ্যতার ক্রমোত্তরণ। আবুল ফজলের মতে সাহিত্য-শিল্পের আসল ভূমিকা 'ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সমন্বয় সাধন' কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যে তা অপসৃত হওয়ায় সাহিত্য হয়ে পড়েছে বাস্তবতাবিমুখ এমনকি জীবনবিমুখও। আঙ্গিকের চমৎকারিত্বের চেয়ে নতুন চিন্তার স্ফুলিঙ্গ সন্ধানে ব্যাপৃত নয় সাহিত্য এই ছিল আবুল ফজলের অভিযোগ। সাহিত্যে নবতর চিন্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবসময় দুরূহ বলেই তা লেখকের অনলস সাধনার বিষয়। বিদেশি সাহিত্যের অনুকরণ করে শুধু আঙ্গিক চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা তাঁর সমর্থন পায়নি কোনকালেই। সাহিত্যকে সময়ের পালাবদলের সাথে ভূমিকার পালা বদল করতে হয়। প্রবীণ লেখকদের কাছ থেকে চিন্তা ও ভাবের কথা শুনতে না পেয়ে আবুল ফজল ভাব ও চিন্তার প্রকাশে 'চালাকি' ত্যাগ করে সত্য প্রকাশে সৎ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তরুণদের প্রতি।

মহৎ সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সাথে ধর্মের মূলনীতির সমন্বয় চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে আবুল ফজলের 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে। মনুষ্যত্ব, সামাজিকতা, জীবনসাধনা, ইসলামের বাণী সৎ সাহিত্যের অভীষ্ট। 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'– কবির মতো ইসলামেরও কথা– কারণ সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষ পূর্ণ মানুষ নয়, 'আশরাফুল মাখলুকাৎ' তো নয়ই। এভাবে বিশ্বাসহীন জীবন নোঙ্গর-ছেঁড়া নৌকার মতো। বিশ্বাস ও ঈমান শুভকর্ম ও সৎ জীবনের উৎস। মনুষ্যত্বই ধর্ম, মনুষ্যত্বহীনতাই অধর্ম– দেশে দেশে ভাষায় ভাষায় তার পরিভাষা যাই হোক। সাহিত্যেও নির্দিষ্ট ঈমানের ওপর জোর দেয়ার কথা বলেছেন আবুল ফজল। তার ভাষায়– 'আমার মতে ব্যক্তিগত

Dhaka University Institutional Repository

ও সামাজিক জীবনের সমন্বয় সাধনই ধর্ম এবং ধার্মিক (প্রচলিত অর্থে নয়) হওয়ার জন্য ঈমান বা বিশ্বাস অপরিহার্য' (ফজল, ১৯৬৫:১৪৭)।

সাহিত্যিক সমাজেরই অঙ্গ। সামাজিক প্রয়োজনে ভাষার উৎপত্তি, আবার সেই ভাষাই সাহিত্যিকের মানস-পরিস্ফূটনের বাহন। এভাবে ভাষা-সাহিত্য-সাহিত্যিক ও সমাজ একসূত্রে গ্রন্থিত। আবুল ফজল সাহিত্যিক এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন–

> সাহিত্যিক ছাড়া সমাজ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সমাজ ছাড়া সাহিত্যিক কল্পনা করাই যায় না। ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির তথা সাহিত্যিক থেকে সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব তাই অনস্বীকার্য। সমাজ ছাড়া সাহিত্যিক, সাহিত্যিক হতে পারে না, পারেন না পা বাড়াতে জীবনে, এমন কি রচনায়ও তাঁরা অচল হয়ে থাকতে বাধ্য। কারণ তাঁর 'কাঁচামাল' অর্থাৎ রচনার উপকরণের একমাত্র সরবরাহ ক্ষেত্র হল সমাজ– সামাজিক মানুষ। তাই অন্যের বেলায় যেমন সাহিত্যিকের বেলায়ও তেমনি সামাজিক দায়িত্ব এক মহৎ কর্তব্য– বরং সাহিত্যিকের ওপর এই দায়িত্বের দাবি অধিকতর। কারণ, তাঁর কার্যকারণ ও রচনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং তার প্রতিক্রিয় দেশ-কাল-পাত্রকেও ডিঙিয়ে।(ফজল, ২০০৮:৪৩)

তবে সমাজ-জীবনে রূপায়ণ শুধু নয়– মহৎ জীবনের মহৎ চিন্তা-ভাবনার রূপায়ণও সাহিত্যিকের কাজ। এক কথায়, 'সুদৃঢ় সামাজিক ভিত্তির ওপর মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যিকের ধর্ম' (ফজল, ২০০৮:৪৪)। আবুল ফজল সমাজ রূপায়ণের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের করণীয় সম্পর্কে তাঁর অভিমত দিয়ে লিখেছেন–

> সাহিত্যের ধর্ম হলো জীবনে সঙ্গতি, সামঞ্জস্য সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা। সামাজিক জীবনে যেটুকু অসঙ্গতি আছে সাহিত্যিক তাকে সঙ্গতি দিয়ে থাকেন। তাই জীবনের ফটোগ্রাফিক বর্ণনা কখনো সাহিত্য নয়– জীবনকে সাহিত্যের রূপে রূপায়িত অর্থাৎ সঙ্গতিদানই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষ্য। যেখানে জীবন একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যে পরিণতি লাভ করেছে, যা বাস্তব হয়েও হয়েছে বাস্তবাতীত তাই সাহিত্য। তাকে সন্ধান ও রূপায়ণই সাহিত্যিকের ধর্ম। (ফজল, ২০০৮:৪৫)

১.৩.৭

আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যের আধুনিকতা সম্পর্কে আবুল ফজলের অভিমত, ব্যাখ্যা ও জিজ্ঞাসা সমকালীন পর্যালোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রায় নিকটবর্তী সময়ে 'কল্লোল গোষ্ঠী' ও 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনা শুরু করায় আধুনিকতা সম্পর্কে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে যে ভাবালোড়ন তৈরি হয় আবুল ফজল তার থেকে দূরে ছিলেন না। তিনি আধুনিকতাকে কয়েকটি প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমত দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈশ্বিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-মানবিক পরিস্থিতি, দ্বিতীয়ত- আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবধর্ম, তৃতীয়ত- বাংলাসাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ ও অনুশীলন।

আধুনিকতা বলতে হাল আমল বা সমসাময়িকতা বোঝায় না, বোঝায় এক বিশেষ মনোভঙ্গি যা 'একটা সর্বব্যাপী অসন্তোষ, বিদ্রোহ, চলতি কিছুকে না মানার এক বেপরোয়া ঔদ্ধত্য, ইচ্ছে করে সব রকম সংযম ও শৃঙ্খলাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া, দুর্বল বোহেমিয়ানার সাহায্যে রচনায় নবত্ব আনার প্রয়াস' (ফজল, ২০০৮:৪৮-৪৯)। আধুনিকতা, যাকে ইংরেজিতে modernist বলা হয়, আসলে বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় মনন-চেতনার প্রভাব। এই দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় ধর্ম-সংস্কার-বিশ্বাস-সভ্যতা-মূল্যবোধ সবই যখন টলায়মান তখনকার সেই পটভূমির যথার্থ চিত্র তুলে ধরেছেন আবুল ফজল–

> মানুষের মন হয়েছে সব রকম আদর্শচ্যুত, উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে অগণিত যুদ্ধ-ফেরত তরুণ আর সারা দুনিয়ার বিক্ষত-হৃদয় বুদ্ধিজীবীরা, যুদ্ধের নির্মমতা যাঁদের বুদ্ধি ও অনুভূতিকে করে দিয়েছে ছিন্নভিন্ন তাঁরা চোখের সামনে দেখেছেন নির্মম ও অকারণ ধ্বংসের আর অহেতুক হত্যার এক পৈশাচিক রূপ। মনের ভেতর এক বিরাট শূন্যতা নিয়ে যারা যুদ্ধ থেকে ফিরে এল তাদের অনেকেই দেখল কোথাও মাথা রাখার ঠাঁই নেই– মনের ভেতর যেমন সব কিছু ভগ্ন ধ্বংসস্তূপে পরিণত, বাইরেও তাই। এমন ফাঁকা ফাঁকা ও ত্রিশঙ্কুদশা মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছিল নবমানবতাবোধ, মনুষ্যত্বে আর সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আস্থা, নীতি ও

Dhaka University Institutional Repository

> সৎকর্মে বিশ্বাস, ধর্ম ও প্রেমে স্বস্তি ও আশ্রয়– যুদ্ধ সে সবই ভেঙ্গে তছনছ করে দিলো– মানুষ হলো সর্বতোভাবে দেউলিয়া। সামনে কোনো আশা-ভরসা নেই, নেই কোনো আশ্রয় ও অবলম্বন। মনের সব প্রদীপ গেছে নিবে। মনের এ অবস্থায় ঈশ্বর, স্বর্গ, প্রেম, ধর্ম সবই হয়ে গেল তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যের ব্যাপার। দ্বিধা, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সংশয়ে সব মন আলোড়িত ও বিপর্যস্ত। এ পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে যে সাহিত্যের জন্ম তা-ই নাম পেলো আধুনিক বা অতি আধুনিক। (ফজল, ২০০৮:৪৮)

যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সাহিত্যের মূল্যায়নে রাজক্ষমতার পালাবদলকে মানদণ্ড ব্যবহার হত, সাহিত্যের বিচার ছিল সর্বকালীন ঐতিহ্যের মাপকাঠিতে। তখন মূল্যায়ন করা হত চিরন্তনতার– সাময়িকতার নয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যই প্রথম দৃষ্টি ফেরায় লেখকের স্বাধীনতার দিকে। সৃষ্টি করে মূল্যায়নের নতুন মাপকাঠি। প্রচলিতকে অস্বীকার করে নতুন যুগজিজ্ঞাসা ও জীবনকাঙ্ক্ষার দিকে সাহিত্য পূর্ণতার সন্ধানী হয়ে ওঠে।

আধুনিকতার ইয়োরোপীয় প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশে তার অভিযোজন ভিন্নতর চিৎপ্রকর্ষ সৃষ্টি করেছিল।
তাই ইয়োরোপীয় আধুনিক সাহিত্য-শিল্পচর্চা-জীবনমান তাঁকে মুগ্ধ করলেও তিনি বাংলা সাহিত্যে ইয়োরোপীয় আধুনিকতার চর্চাকে বিভিন্ন কারণে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি। বরং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেখলে এই চর্চায় বাংলা সাহিত্যের তেমন স্থায়ী লাভ হয়নি বলেই মনে করেন আবুল ফজল (ফজল, ২০০৮:৫০)। আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর আপত্তির মধ্যে সাময়িকতা ও চিরন্তনতার দ্বন্দ্বই সবচেয়ে প্রবল। রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে, টলস্টয়, শরৎচন্দ্র বা রোমা রোলাঁর সার্থক ও চিরকালীন সাহিত্যসৃষ্টির উদাহরণ দিয়ে আবুল ফজল বলেছেন –

> চিরকালের সাহিত্যই তাঁরা রচনা করেছেন– শুধু সমসাময়িক কালের মধ্যে তাঁদের রচনা সীমিত হয়ে নেই। এঁদের সকলের রচনায় আধুনিকতা যে পর্যায় পরিমাণে স্থান পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও এঁদের শুধু আধুনিক বললে ছোট করা হয় না কি? এঁরা সর্বকালের, কেউই নন বাতিল বা বাসী অথবা পেছন তারিখ। সার্থক শিল্পীদের রচনা আধুনিকতার সীমায় আবদ্ধ নয় বলেই তাঁরা কখনো সংকীর্ণ অর্থে আধুনিক নন। (ফজল, ২০০৮:৫০)

আবুল ফজল মনে করেন বাংলা সাহিত্যে বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিকতার যাত্রা শুরু হয়েছিল *কল্লোল* সাহিত্যিক গোষ্ঠীরও আগে, কাজী নজরুল ইসলামের পত্রোপন্যাস *বাঁধনহারা* প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তারপর 'বিদ্রোহী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা–

> 'কল্লোল' বের হওয়ার প্রায় দেড় বছর আগে বাংলা সাহিত্যে সব কিছু না মানার, সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার যে দমকা হাওয়া তা বইয়ে দিল 'বিদ্রোহী'। বাঁধনহারায় আধুনিকতার যেটুকু প্রভাতকলি ছিল 'বিদ্রোহী'তে তাই তূর্য ধ্বনি হয়ে ফেটে পড়ল। এভাবে নিজের অজান্তেই কল্লোলের বহু আগে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার ভিৎপত্তন করলেন নজরুল– পরবর্তীকালে 'কল্লোল যুগে'র যিনি হলেন প্রধান ব্যক্তি। (ফজল, ২০০৮:৫২)

উল্লেখ হয়েছে যে নজরুল-সম্পাদিত *ধূমকেতু*-ও প্রকাশিত হয় কল্লোল-এর আট মাস আগে এবং আধুনিকতার উদ্গাতা বলে পরিচিত *কালিকলম* ও *প্রগতি* প্রকাশ পেতে থাকে আরো পরে। *কল্লোল* বের হওয়ার আগে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের *ধূমকেতু* কীভাবে অস্থির করে তুলেছিল তার পরিচয় তুলে ধরেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত *কল্লোল যুগে* গ্রন্থে। অর্থাৎ আবুল ফজলের প্রতিপাদ্য হলো, বাংলা সাহিত্যে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য আধুনিকতার সারমর্ম প্রথম ধারণ করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামই। অবশ্য এ বিষয়ে কোন কোন সমালোচকের ভিন্নমত দুর্লক্ষ্য নয়–

> কল্লোলের কয়েকবছর পূর্বেই কাজী নজরুল ইসলামের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে সচকিত করে তুলেছিল, কল্লোল গোষ্ঠীও তা-তে উদ্দীপিত হয়েছিল। কিন্তু স্মরণীয়, নজরুলের স্বাতন্ত্র বাস্তব সামাজিক, ও রাজনৈতিক জীবনের বিদ্রোহে, সাহিত্যের নব প্রকরণ উদ্ভাবনে নয়।(সারোয়ার, ১৯৮৭:৪১)

প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ যেমন নতুনকে গ্রহণের পথ সুগম করে আবার গভীর ও আন্তরিক মননশীলতার সংযোগ ছাড়া সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায় সত্যিকার আধুনিকতার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না অভিযোগ করে আবুল ফজল লিখেছেন আধুনিক বাংলা কবিতায় এর লক্ষণগুলি সবচেয়ে বেশি

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ্য হলেও এখানেই আধুনিকতা সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ। কারণ হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতামতকে 'প্রামাণ্য ও অপ্রতিরোধ্য' উল্লেখ করে আবুল ফজল লিখেছেন–

> তাঁরা কবির চেয়েও বিশেষণটার ওপর জোর দিচ্ছেন বেশি। তাঁরা যতখানি 'আধুনিক' হতে চাচ্ছেন ততখানি 'কবি' হতে চাচ্ছেন না। তাঁরা অহঙ্কার করছেন কবিতা নিয়ে নয়, আধুনিকতা নিয়ে।জোর দেওয়া হচ্ছে কে কতখানি আধুনিক তার ওপর।(ফজল, ২০০৮:৫৪)

সমাজ-সচেতন শিল্পীর মধ্যে সাহিত্যে আধুনিকতা সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না রেখেই আধুনিক হওয়ার ঝোঁক রয়েছে বলে মনে করেন আবুল ফজল, যা কাম্য নয়। তাঁর মতে এটা নিন্দার কথা নয়, বরং স্বাস্থ্যের লক্ষণ, সজাগ মনের পরিচায়ক। তবে তাঁর মতে, আধুনিকতারও সীমা আছে, আর আধুনিকতা লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র। আবুল ফজল আধুনিকতার সাময়িক উত্তেজনা ও প্রতিবাদী অধ্যায়ের শেষে অবসাদ বা অবসন্নকালকে যথার্থই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। সাফল্যে মাধ্যমে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়, অপসৃত হয় প্রচলিতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। এ বিষয়ে আবুল ফজলের লেখা উদ্ধৃত করা যায়–

> আজকের আধুনিকও একদিন চলতি ঐতিহ্য ও সমাজে ফিরে যান, ফিরে যেতে বাধ্য হন। মনের ত্রিসীমানাতেও তখন আর স্থান পায় না বোহেমিয়ানিজম বা বাউণ্ডুলেপনা। বরং এখন থেকে শিল্পী বেশ কষে চর্চা করতে থাকেন নকল বনেদিয়ানা। এর ফলেই একদিন যাঁরা বাংলা সাহিত্যে আধুনিক বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা আজ আর তা নন। স্বভাবতই সামাজিক মর্যাদাই নিয়ে আসে সমাজের সঙ্গে আপোষের ইচ্ছা। আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা ছাড়া আরো অনেক কারণে আধুনিকতার পতন ঘটতে পারে। (ফজল, ২০০৮:৫৭)

কাজেই সাহিত্যে আধুনিকতা বড় কথা নয়- অকপটে জীবন কথা জীবনের সত্যকে উদ্‌ঘাটনই বড় কথা। শিল্পের স্বভাব ও ধর্ম হচ্ছে অর্জন ও বর্জন, ত্যাগ ও গ্রহণ, যাচাই ও বাছাই– এভাবেই শিল্পে তিলোত্তমা গড়ে ওঠে। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ প্রশ্নে আবুল ফজলের উত্তর– 'জীবনের জটিলতা, প্রতীকের ব্যাপক ব্যবহার, স্বল্প কথায় বেশি অর্থারোপ যে এ জটিলতার এক বড় কারণ তাতে সন্দেহ নেই' (ফজল, ২০০৮:৫৯)। আধুনিক মনের সঙ্গে আধুনিক জীবন ও সমাজের বাস্তব অবস্থার সংঘর্ষের ফলেই সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাব ঘটেছে। অতিমাত্রায় বিষয় ও চটক নির্ভরতাও আধুনিক সাহিত্যের সমূহ ক্ষতিকর দিক বলে তাঁর ধারণা। আবুল ফজল রবীন্দ্রবিরোধিতাকে আধুনিকতা নামে চালানো বা সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যকে প্রচল-বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে আধুনিক হওয়ার বা বলার প্রবণতাকে সমর্থন করেন না। তাঁর মতে 'খাঁটি শিল্পী তো anti হতে পারে না– anti ব্যাপারটিই শিল্পীর জন্য মারাত্মক।' কারণ 'তা সহজেই শিল্পীর মনে পরিমিতিবোধ নষ্ট করে ভালো রচনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়' (ফজল, ২০০৮:৬০)।

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতাগুলি আবুল ফজল চিহ্নিত করেছেন 'আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে। বাংলা কবিতায় আধুনিকতার আবির্ভাব ভঙ্গি বা আঙ্গিকের নতুনত্বে, 'নতুন ঢঙে'। (ফজল, ১৯৬৮:২০) আধুনিক সাহিত্যের এই প্রবণতা আবুল ফজলের কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। আঙ্গিক সর্বস্বতার আয়ু বেশিদিনের নয় বলেই মনে করেন আবুল ফজল। তাঁর মতে সাহিত্যে বিশেষত কাব্যে 'আবেগের স্থান থাকতেই হবে' (ফজল, ১৯৬৮:২২)। তবে আবেগ পরিণত ও সুনির্দিষ্ট রূপ না নিলে তার কোন মূল্য নেই। আবেগের চেয়ে বাস্তবতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হলেও শিল্প এ দুয়ের সমন্বয় বলে মনে করেন আবুল ফজল। কবিতার জন্য ব্যবহারিক ও মানসিক উভয় অভিজ্ঞতাই অপরিহার্য অথচ আধুনিক কবিতায় অভিজ্ঞতাও অপসৃত বলে মনে করেন তিনি। তাঁর মতে, শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্রোহের মূল্য যথেষ্ট, কারণ তা নবতর জীবনজিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। আধুনিক কবিতায় এর অভাব রয়েছে বলে মনে করেন তিনি (ফজল, ১৯৬৮:২৪)। তাছাড়া অনুন্নত দেশের লেখকের জন্য সাহিত্যচর্চা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য কারণ তাদেরকে লিখতেও হয়, আবার সেই লেখার পাঠকও তৈরি করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহ আধুনিকতার অন্যতম উপাদান, কিন্তু 'বিদ্রোহী সাহিত্য' এবং 'প্রতিবাদী সাহিত্য' এক নয়। আবুল ফজল এই দুয়ের পার্থক্য নির্দেশ করে লিখেছেন–

> আমাদের সমাজের হত-শ্রী অবস্থা দেখে আমরা অনেকেই অনেক সময় বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদমুখর হয়েছি। আমাদের বহু রচনায় তার প্রতিফলন ঘটেছে। এ সবকেও স্রেফ 'প্রতিবাদী' সাহিত্যই বলা যায়। যথার্থ 'বিদ্রোহী সাহিত্য' এ নয়। আমরা জীবনে যা মেনে নিয়েছি অনেক সময় তারই প্রতিবাদ করেছি কলমের মুখে। ফলে আমরা খাঁটি হতে পারি নি, সাহিত্য-কর্মে হতে পারি নি 'সত্য'। ত্রিশের লেখকদেরও এ দশা ঘটেছিল। এ হয়তো প্রাচ্য সমাজ-ব্যবস্থা আর তাতে লালিত মনেরই এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আমাদের লেখকদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক স্ববিরোধী সমাজেই বাস করতে হয়। (ফজল, ২০০৮:৮৩)

অর্থাৎ বিদ্রোহ সার্থক হয় কথা ও কাজের মিলের মধ্যে। বাহ্যিক জীবনের দাবি আর আভ্যন্তরীণ জীবনের চাহিদার সংঘর্ষ যেমন অনিবার্য তেমনি তার সমাধান সন্ধানও মানুষের অবিরাম সাধনা। এর সমাধানের পথে বিদ্রোহেরও আবির্ভাব। আবুল ফজলের মতে, বিদ্রোহ গভীর জীবন-জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়ে রচনা আর শিল্পকর্মে সার্থক প্রতিফলন ঘটলে তখনই তাকে 'বিদ্রোহী সাহিত্য' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে (ফজল, ২০০৮:৮৪)। আবুল ফজল বিদ্রোহী বলে খ্যাত ত্রিশের আধুনিক কয়েকজন কবির সৃষ্টিশীলতাকে 'শোচনীয়ভাবেই ব্যর্থ' অভিমত দিয়ে লিখেছেন তাদের বিদ্রোহ 'যতখানি ভাবগত ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল ভঙ্গিগত' (ফজল, ২০০৮:৮২)। তিনি মনে করেন 'সমকালীন জীবন ও জীবনের সমস্যার মুখোমুখি হয়ে উন্মুক্ত চোখে তার নগ্ন রূপটা দেখে নেওয়া আর তাকে শিল্পায়িত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বলে আমাদের আধুনিকতাও হচ্ছে না খাঁটি' (ফজল, ২০০৮:৮৫)।

আবুল ফজল আধুনিক সাহিত্যকে সাময়িক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি বা লেখকের গতিশীল মনের গ্রহণশীলতা বলেই মনে করেন। তিনি চিরন্তন সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্যের উর্ধ্বে রেখেছেন সবসময়, কারণ তাঁর মতে সাহিত্যে আধুনিকতার চেয়ে চিরন্তনতার মূল্যই বেশি– 'গতিধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে শত পরিবর্তন মেনে নিলেও মনের মতোই সাহিত্য-শিল্পেও চিরন্তনতার উপস্থিতি অনিবার্য' (ফজল, ২০০৮:৭৩)। বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের সাহিত্যান্দোলনের প্রতিভূগণ তাঁদের নিজের মন আর পরিবেশের সংগতি সাধনে ব্যর্থতার কারণে 'প্রতিভা আর প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কেউ সার্থক শিল্পীর মর্যাদায় পারেননি পৌঁছতে।' তাঁদের রচনাকে 'কৃত্রিম' আর 'ভুঁইফোড়' আখ্যা দিয়ে ঐ আন্দোলনের তিন কবির পরিণতকালে প্রথা আর প্রতিষ্ঠায় স্থির হওয়ার উদাহরণ দিয়েছেন আবুল ফজল (ফজল, ২০০৮:৭৩)।

অথচ বিভাগোত্তর কালে বাংলাদেশের সাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গের ত্রিশের দশকের মরে 'ভূত হয়ে যাওয়া' সাহিত্যাদর্শ অনুসৃত হতে দেখে আবুল ফজল নতুন সাহিত্যকর্মীদের তিরস্কার করে আঙ্গিক নির্ভর কৃত্রিমতার মোহ ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন পরিবেশ-বিচ্যুত না হয়ে নিজের সাহিত্যের স্বকীয়তা ও চরিত্র গড়ে তুলতে। ত্রিশের কবিদের আধুনিকতাকে যারা অনুসরণ বা পাথেয় মনে করেন তাদেরকে নিজ মনে আধুনিকতা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন আবুল ফজল। প্রাতিবেশিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতিই তাঁর জোর অভিমত–

> যুগ জিজ্ঞাসায় সব সাহিত্যই আধুনিক– কিন্তু এ আধুনিকতার পটভূমি সব সময় শিল্পীর মন আর পরিবেশ। সাহিত্যের মূল প্রেরণা-উৎস মন বটে কিন্তু পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন মন আশ্রয়চ্যুত বলে সে মন যে শিল্প-বস্তুর প্রেরণাস্থল সে শিল্পেরও আশ্রয়-চ্যুত বা কৃত্রিম না হয়ে উপায় নেই। (ফজল, ২০০৮:৭৪)

সে-সাথে আধুনিক সাহিত্য গড়ে তুলতে প্রয়োজন 'আধুনিক মন' ও 'সৎ শিল্পী' ; আর 'সৎ শিল্পী মানবতন্ত্রী না হয়েই পারে না' (ফজল, ২০০৮:৭৫)।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩.৮
বাংলা কবিতায় আধুনিকতার উত্তুঙ্গ প্রচারক জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আবুল ফজল আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এঁদের রচনা গভীর কিন্তু ব্যাপ্তিহীন। সাধনা অকৃত্রিম, একনিষ্ঠ ও সুগভীর কিন্তু প্রতিভা সীমিত। কবিতায় তাঁরা সংযতবাকের চূড়ান্ত। বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে দুজন বিপরীতধর্মী, নিজস্ব সুরের সাধক, কিন্তু দুজনেই ছিলেন একান্তভাবে নির্জনতার কবি। জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে আবুল ফজলের অমোঘ উপলব্ধি– 'কবিতায় থামা বা থামতে জানা কবির জন্য যে কত বড় মৌলিক গুণ তার প্রমাণ জীবনানন্দের কবিতা' (ফজল, ১৯৬৫:১১৭)। জীবনানন্দের কবিতার দুরূহতার ব্যাপারে এলিয়টের মন্তব্য উদ্ধৃত করে আবুল ফজল প্রকারান্তরে আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে বক্তব্যের অস্পষ্টতা বা দুরূহতার যে অভিযোগ তারই জবাব দিয়েছেন–

> অনেক কবিতা এ কারণে কঠিন মনে হয় যে কবিরা এখন হাতে রেখে কথা বলেন। প্রকাশ করেন না অনেক কিছুই, ইচ্ছা করেই অনেক কিছু ছেড়ে যান। তারা যা ছেড়ে যান পাঠক তা পূরণ করে নেবেন বা নিতে পারবেন এ ভরসায়। (ফজল, ১৯৬৫:১১৮)

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার সম্পর্কে আবুল ফজলের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> আজ সাহিত্যের ঐতিহ্য মানে শুধু নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমার ঐতিহ্য মনে করলে ভুল করা হবে। আজ ঐতিহ্যের সীমা সারা সভ্য জগত– সবদেশের সাহিত্য ও মননশীলতার ঐতিহ্যই আধুনিক কবি ও সাহিত্যশিল্পীর ঐতিহ্য। (ফজল, ১৯৬৫:১২৫)

ঐতিহ্যের এই পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হয়েই কবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত । তবে বর্ণিত দু'জনের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা শেষে আধুনিক কবিতার এই ধরন সম্পর্কে আবুল ফজলের মন্তব্য–

> এখন তাবৎ সভ্য দেশের কবিতার ঐতিহ্য আমাদের কাব্যে অনুপ্রবেশ করেছে। হালের এ আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য যতদিন না আমাদের মন-মানসে ও রক্তে প্রবেশ করে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যে পরিণত হচ্ছে ততদিন আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ থেকে যাবেই।(ফজল, ১৯৬৫:১৩৪)

আবুল ফজল নিজেও সম্ভবত আমাদের 'মন-মানস-রক্তে' অনুকৃত বা অনুসৃত আধুনিকতার, যা আসলে 'তিরিশের' আধুনিকতা নামে পরিচিত, ঐতিহ্যে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান।

সাহিত্য শুধু সাহিত্যিকের সাধনা নয়, কোন আধ্যাত্মিক বা অপার্থিব ব্যাপারও নয়, এটি সম্পূর্ণ লৌকিক এবং ব্যাবসায়িক ব্যাপরও বটে। এর সাথে 'অর্থনৈতিক' সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। লেখক, পাঠক, প্রকাশক এই তিন যোগসূত্রে সাহিত্যের গতি আর সমৃদ্ধি নির্মিত হয়। তাই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা প্রয়োজন। আবুল ফজল সেই সময়ই প্রকাশনা শিল্পের জন্য সুরক্ষা চেয়েছিলেন। আশা করেছিলেন এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল মুদ্রাকর, প্রকাশক, দপ্তরি, ব্লকমেকার প্রমুখ কর্মচারী-শ্রমিকের জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালা ঘোষিত হলে এই শিল্পের বিকাশে তারা অবদান রাখতে পারবে। বিদেশি বই ও পত্রিকার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ দেশের সাহিত্য ও প্রকাশনা শিল্পের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। কারণ 'অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়' (ফজল, ২০০৮:৭২)। আবুল ফজল সকলের উদ্দেশ্যে দুটি নিবেদন রেখেছিলেন– প্রথমত দেশের বই-পুস্তককে নিজের সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ করে দেওয়া, বিদেশি প্রকাশনার সাথে এর তুলনায় না যাওয়া। দ্বিতীয়ত সাহিত্য আমদানির ক্ষেত্রে কিছুটা নির্বাচন নীতি গ্রহণ করা ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩.৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সাহিত্য-সমাজচিন্তা, সৃষ্টিশীল রচনা, দার্শনিক উপলব্ধি ও মননশীলতা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধে আবুল ফজলের মুগ্ধ প্রতিক্রিয়া, প্রশংসা-পরিতৃপ্তিসূচক পর্যালোচনা এবং সশ্রদ্ধ অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কবিকে অনুসরণ করেছেন, কবি-ব্যক্তিত্বকেও অনুসরণ করেছেন। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গল্প-উপন্যাস এবং আরও যত চিন্তাশীল রচনাসম্ভার, এমনকি কবিজীবনীও[২৩]। রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়ে ধারণ করার সংগ্রামেও সামিল হয়েছেন আবুল ফজল। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানি শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দেশব্যাপী আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী। চট্টগ্রাম কলেজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর দেয়া সভাপতির ভাষণ পরে 'রবীন্দ্র-মানস' নামে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক প্রতিকূল পরিবেশে পাকিস্তানের জাতীয় কবি আল্লামা ইকবালের সাথে রবীন্দ্রনাথের একটি মনোজ্ঞ তুলনামূলক আলোচনায় এই দুই মহৎ কবির অখণ্ড মানবতার সাধনাকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখার কথা বলেছেন আবুল ফজল। তাঁদেরকে সম্প্রদায় বিশেষের কবি ভাবা অনুচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, দায়িত্ব ও সহানুভূতিবোধ বিশেষভাবে এই আলোচনায় এসেছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপনের নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে এবং ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আবুল ফজল তাঁর দায়িত্বের প্রতি সচেতন থেকেই প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন–

> কবিকে জাতীয় কবি জাতীয় সাহিত্যিক হিসেবে দেখতে ও বিচার করতে গেলে চোরাবালিতে পা না দিয়ে উপায় নেই। কূপমণ্ডুকতার এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে পাকিস্তানবাসীর পক্ষে পৃথিবীর কোন মহৎ কবিকেই শ্রদ্ধ দেখানো সম্ভব হবে না। এমনকি নজরুল ইসলামকেও নয়। (ফজল, ১৯৬৫:৮৯)

স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন 'আমি কোন মহৎ কবিকেই 'জাতীয় কবি' মনে করি না।' আর এই শ্রদ্ধা নিবেদন 'ভারতে জাতীয় কবিকে নয়, বিশ্বের এক মহান কবিকে' (ফজল, ১৯৬৫:৯১)। সত্য প্রকাশে দ্বিধাহীন আবুল ফজলের এমন অকপট ভাষণ আমরা বারবার লক্ষ করি।

'রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম' প্রবন্ধের আলোচনায় রবীন্দ্র-মানসে ধর্মের প্রভাব আলোচনা করেছেন। ধর্ম গভীরতর উপলব্ধি, গভীর উপলব্ধির মানস অভিজ্ঞতা ছাড়া মহৎ প্রতিভা সার্থকতা লাভ করে না। রবীন্দ্রনাথ পারিবারিকভাবে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন তাই 'একই সঙ্গে কবি-প্রতিভা ও গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞার অধিকারী' তিনি। ফলে মামুলী অর্থে ধর্মকে গ্রহণ করেননি রবীন্দ্রনাথ। আবুল ফজল লিখেছেন–

> মানুষের যা Essential quality অর্থাৎ মনুষ্যত্ব তাকেই রবীন্দ্রনাথ ধর্ম নামে অভিহিত করেছেন। কাজেই তার ধর্ম আঞ্চলিক নয়, আনুষ্ঠানিকও নয়। প্রচলিত অর্থে হিন্দুধর্ম বলতে যা বোঝায় তা তো নয়ই। (ফজল, ১৯৬৫:২৮৯)

মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি রবীন্দ্রনাথ, দেখতে চেয়েছেন অখণ্ডরূপে। তা না হলে 'মানুষের স্রষ্টাও যখন বিচ্ছিন্ন তথা শ্রেণীগত রূপ নিতে বাধ্য তখন যত ধর্ম তত ঈশ্বর না হয়ে উপায় নেই।' তাই 'সাম্প্রদায়িক খোলসের নীচে সব মানুষের মধ্যে যে আসল মানুষটি রয়েছে অর্থাৎ তার মনুষ্যত্ব' রবীন্দ্রনাথের মতে 'সেই হচ্ছে তার ধর্ম, মানুষ হিসেবে তার পরিচয় নিহিত রয়েছে ওখানে' (ফজল, ১৯৬৫:২৯০)। নিজের কাণ্ডজ্ঞানকে গুরু বা পীরের হাতে তুলে দেওয়ারও বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-মনোভাব– 'আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন– গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।' উদ্ধৃত করে আবুল ফজল জানিয়েছেন যে, ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'কাণ্ডজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা' প্রকাশ পেয়েছে এই উক্তিতে– 'যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র, যা শাস্ত্র তা-ই বিশ্বাস্য নয়' (ফজল, ১৯৬৫:২৯০)।

মানুষের ঐক্য সম্পর্কে যিনি সচেতন নন তাঁর পক্ষে নিজের ধর্মের মূল ভাবটুকুও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের বাইরে ধর্ম যে আরো বড় এ বোধ থেকে সে বঞ্চিত। আসল কথা 'নিত্য-ধর্মকে জানলেই

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ-ধর্মকে জানার পথ হয় সুগম' (ফজল, ১৯৬৫:২৯৩)। তবে সবার আগে চাই ধর্মবোধের অনুশীলন, কারণ মনুষ্যত্ব ও সভ্যতা ধর্মবোধের সমার্থক। রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে দেখেছেন ব্যক্তিগত সাধনার বস্তু হিসেবে। অন্তরে তার অধিষ্ঠান অন্তরেই তার উপলব্ধি।

'মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ ও রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধ দুটির বিষয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিকৃত ও উদ্দিষ্ট প্রচারের ফলে মুসলমান সমাজে উদ্ভূত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখা ও রবীন্দ্র-জীবনী থেকে নানা ঘটনা উদ্ধৃত করে আবুল ফজল রবীন্দ্রমানসে বাঙালি মুসলমানের এক বিশেষ অন্তর্চ্ছবি উন্মোচন করেছেন। আবুল ফজলের মতে, রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনে সক্রিয় তখনো আত্মসচেতন মুসলমান মধ্যবিত্ত কিংবা বুদ্ধিজীবী শ্রেণির আবির্ভাব হয়নি। তখন বাংলা দেশে যে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম অভিজাত পরিবার ছিল তাদের মধ্যে বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের সঙ্গে ছিল না কোন রকম যোগাযোগ। ফলে স্বামাজিকভাবে মুসলমান সমাজের খুব কাছাকাছি আসার তেমন সুযোগ রবীন্দ্রনাথ জীবনে পাননি বলেই মনে করেন আবুল ফজল। এক দেশ এক ভাষার মানুষ হয়েও হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক জীবন প্রবাহিত ছিল ভিন্নতর খাতে– রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ঐক্য এবং এ দুই ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক পারস্পরিক নির্ভরতাও সামাজিক ঐক্য স্থাপনে হয়েছে ব্যর্থ– ্ এই ব্যর্থতা দেখে বারবার ব্যথিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তবু মুসলমান লেখক-সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর সম্পর্কের আন্তরিকতা বিশেষত কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্‌দীন-এর সাথে রবীন্দ্রনাথের পত্র যোগাযোগ উদ্ধৃত করে আবুল ফজল জানিয়েছেন– 'গুণী ও যোগ্য মুসলমানকে রবীন্দ্রনাথ সবসময় শ্রদ্ধা করতেন এবং কাছে আনার চেষ্টাও কম করেননি' (ফজল, ১৯৬৮:৭০)। শুধু দেশি নয় বিদেশি মুসলমানদের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তির কথাও রবীন্দ্রজীবনী থেকে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা করেছেন আবুল ফজল। তন্মধ্যে পারস্যে, ইরাকে, মিশরে আতিথ্যগ্রহণ, বিশ্বভারতীর জন্য রাজা ফুয়াদের আরবি বই উপহার, আগা খানের কণ্ঠে হাফিজের কবিতার আবৃত্তি শোনার আগ্রহ, মুসলিম মালয় রাজার আতিথ্য গ্রহণে উৎসাহ, তুর্কি বীর কামাল আতাতুর্ক-এর মৃত্যুতে শান্তিনিকেতন বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ করে আবুল ফজল রবীন্দ্রনাথের অসমাম্প্রদায়িকতা ও সহজাত মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় তুলে ধরেছেন 'যা সব রকম ক্ষুদ্রতা ও মনুষ্যত্বহীনতার উর্ধ্বে থাকতে সহায়তা করেছে' (ফজল, ১৯৬৮:৭৪)।

রবীন্দ্রনাথই একমাত্র মনীষী যিনি মুসলমানদের বিক্ষোভ অন্তরে উপলব্ধি করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম'কে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত হতে আপত্তি জানিয়ে বহুজনের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে পাকিস্তান শব্দটির প্রয়োগ বা প্রচার দেখে যেতে না পারলেও যে-মনোভাব থেকে মুসলিম মনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের চেতনা, দাবী ও প্রতিষ্ঠা তা তিনি স্বাভাবিক কবি-দৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর বেশ কয়েকটি রচনা থেকে উদ্ধৃত করে এই উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন আবুল ফজল। 'লোকহিত', 'ছোটো ও বড়', 'স্বরাজসাধন', 'হিন্দু-মুসলমান', 'কালান্তর' প্রভৃতি রচনা ছাড়াও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *রবীন্দ্র-জীবনী* থেকে উদ্ধৃত করেছেন কবিজীবনের এমন কিছু স্মৃতি যেখানে এ বিষয়ের আলোকপাত রয়েছে। মুসলমানের হৃদয়বেদনা, প্রতিবেশী সমাজের অসহিষ্ণু ও অন্যায় ব্যবহারের ফলে তাদের মনে কীভাবে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেক আগে থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, উঠতে চেয়েছিল তা কবির উপলব্ধির বিষয় না হয়ে পারেনি। সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে মুসলমানরা যে ব্যবহার পেয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের মতো স্থিতধী মানুষকেও যেভাবে বিচলিত করে তুলেছিল তা থেকে মুসলমান সমাজের বিরক্ত ও মরিয়া হয়ে ওঠা সহজেই অনুমেয়। আবুল ফজল জানিয়েছেন, মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধকে রবীন্দ্রনাথ 'সত্য ইচ্ছা' বলে মেনেছেন এবং তাকেই হিন্দু-মুসলমান মিলনের উপায় বলে চিহ্নিত করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনী থেকে রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃত করে কবির আকাঙ্ক্ষার রূপ প্রকাশ করেছেন আবুল ফজল – 'ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

হতে হবে।' পরবর্তীকালে বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এই সমকক্ষতারই আভাস পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আবুল ফজল রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে লিখেছেন–'দীর্ঘ অন্যায় ব্যবহার, ঘৃণা ও হৃদয়হীন উপেক্ষার ফলে, হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, যে ছিদ্র যে ফাঁক দেখা দিয়েছিল যার ফলে মুসলমান বলতে বাধ্য হয়েছিল 'আমরা পৃথক'– রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রত্যক্ষ করেননি, হৃদয় দিয়ে অনুভবও করেছেন' (ফজল, ১৯৬৫:৩০১-৩০২)। আবুল ফজল রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে আধুনিকতার চিরকালীন বৈশিষ্ট্য, প্রচলভাঙার দ্রোহীচেতনার প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। তাই রবীন্দ্র সৃষ্টিশীলতা তাঁর মতে চিরন্তনতার প্রতীক।

১.৩.১০

আবুল ফজল কাজী নজরুল ইসলামকেই বাংলা সাহিত্যে বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর আধুনিকতার তুর্যবাদক বলে মনে করেন। নজরুল-সাহিত্যে জাতীয় ও বিশ্বসাহিত্যের অখণ্ডরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছিল সাম্য, মানবতা, স্বাধীনতার মূলগত ঐক্যে। তাঁর প্রেমভাবনায় বা উজ্জীবনী স্বরেও ব্যক্তিতন্ত্র বা স্বাতন্ত্র্য প্রাধান্য পায়নি, সমষ্টির মুক্তি ঘোষিত হয়েছে। তাই কোন অর্থেই আত্মরতির কিংবা আত্ম-মগ্ন কবি বলা যায় না নজরুলকে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের এই পার্থক্য চিহ্নিত করে 'নজরুল কাব্যের ভূমিকা' প্রবন্ধে আবুল ফজল লিখেছেন–

> কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' সহিত নজরুলের 'বিদ্রোহী'র তুলনা দিয়ে থাকেন। কিন্তু 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'- কবির ব্যক্তি-চিত্তেরই স্বপ্নভঙ্গ, তার লক্ষ্য ও আবেদন অন্বেষা ও সম্পূর্ণ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। একটি বিশেষ ব্যক্তিরই তা আত্ম-আবিষ্কার। 'বিদ্রোহী' কিন্তু তা নয়-এ বিদ্রোহী সমস্ত যুগেরই প্রতিনিধি, সমস্ত মানবাত্মারই প্রতিভূ।(ফজল, ১৯৭৪ক:৬)

নজরুল প্রেমের কবি, প্রেমভাবনা তাঁর মানবতা-ধর্ম-জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। আবুল ফজলের মতে 'বিদ্রোহী কবিতা অসার্থক হত যদি শুধু বিদ্রোহ আর ভাঙনের কথা থাকতো' (ফজল, ১৯৬৫:২০২)। নজরুল সর্বত্র সবল মানুষকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন, ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সাহিত্যে। এমনকি 'তাঁর প্রেম সবল মানুষের প্রেম। তাঁর প্রেমে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ আছে, কিন্তু ন্যাকামি নেই। মান, অভিমান, রাগ দ্বেষ কিছুই তাঁর প্রেম থেকে বাদ পড়েনি; কিন্তু এ সবকেই রূপ দিয়েছেন তিনি সবল মানুষের মতই' (ফজল, ১৯৬৫:২০৩)।

দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, মুসলিম দেশগুলির নবজাগরণ, শোষিত শ্রেণীর জয়যাত্রা, মানবতার নবচেতনা ও বেঁচে থাকার লড়াই, তারুণ্যের বেপরোয়া বাঁধনহারা উল্লাস এ সবেরই কবি কাজী নজরুল ইসলাম। যেখানেই অবিচার, অন্যায় জুলুম ও পরাধীনতা সেখানেই নজরুল হেনেছেন আঘাত। ক্ষমা করেন নি প্রতিক্রিয়াশীল কোন শক্তিকেই। দাসত্ব আর পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁর মতো এদেশের আর কোন কবিই সংগ্রাম করেন নি, এমন বিদ্রোহের বাণীও কেউ করেন নি প্রচার। আবুল ফজলের ভাষায়–

> মুসলিম জগতের নব-জাগরণের কথাই বা তাঁর মতো এত উদাত্ত কণ্ঠে আর এত বিচিত্রভাবে কেইবা প্রকাশ করেছেন? ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য আর তার বীর্যবন্ত সত্যের অমন প্রদীপ্ত বাণী-রূপ নজরুলের রচনা ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ বল্লেই চলে। সহস্র কণ্ঠে, সহস্র যন্ত্রে ইসলামের যে মর্মবাণী মুসলমানের মনের আকাশে একদিন সঞ্চার করেছিল এক অভূতপূর্ব আশা ও উদ্দীপনা, জাগিয়ে তুলেছিল তাঁর মনে অটুট এক আত্মপ্রত্যয়, আজাদীর সোনালী স্বপ্নে তাঁর মন হয়েছিল বিভোর। (ফজল, ১৯৭৪ক:৬)

নজরুলের অন্যতম কৃতিত্ব তিনি মেহনতি মানুষের জন্য সাহিত্য রচনায় সফল হয়েছিলেন। নজরুল 'সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন সাহিত্যকে, বাড়িয়েছেন সাহিত্যের বিষয়বস্তুর দিগন্ত।' তাই নজরুলকে 'গণ-সাহিত্যের পথিকৃৎ' ঘোষণা করে আবুল ফজল উদাহরণ দিয়েছেন–

> আমি আমার চার পাশে বহু পিয়ন, খানসামা, আর্দালী প্রভৃতি মেহনতী মানুষকে গ্রামোফোন কিনে নজরুলের ইসলামী সংগীতের রেকর্ড বাজিয়ে আনন্দ পেতে আর তন্ময় হতে দেখেছি। অথচ একদিন এদের কাছে সংগীত ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। উপরে যে বদ্ধ দরজা ভাঙ্গা শিল্প আর শিল্পীর এক ভূমিকা বলে উল্লেখ করেছি তার বহু প্রমাণ নজরুল এভাবে দিয়েছেন। (ফজল, ১৯৭৪ক:৮)

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার মতো নজরুল কাব্যে আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ করা যায় 'নজরুল কাব্যে আধ্যাত্মিকতা' প্রবন্ধে। হিন্দু দর্শন ও উপনিষদ যেমন রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কাব্য ও সংগীতের পটভূমি ও পরিভাষা জুগিয়েছে, আবুল ফজলের মতে, নজরুলকে তেমনি প্রভাবিত করেছে মূলত সুফীদের মরমীবাদ (ফজল, ১৯৬৫:২১০)। পারসি কাব্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মরমীবাদ নজরুলের কবিসত্তার গভীরে স্থান করে নিয়েছিল, বদলে দিয়েছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তাই অংশত নজরুলের কবিতায় এবং প্রধানত গানে সর্বসংস্কারমুক্ত আত্মা– আত্মার সৃষ্টি-স্রষ্টাতত্ত্ব পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে রূপ দিতে হলে প্রতীক আবশ্যক। তাই মরমীবাদ যেসব প্রতীকে আভাসিত হয় নজরুলের গানে এমন প্রতীকের ছড়াছড়ি আমরা পাই। নজরুল-মানসে অখণ্ড মানবতার উপলব্ধি বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির জীবনদর্শনের অমূল্য সম্পদ যা রবীন্দ্রনাথের সগোত্র হয়েও স্বতন্ত্র ও যুগধর্মী। 'নজরুলের কবিকণ্ঠ' প্রবন্ধে আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে অনুধাবন করা যায় নজরুল-মানববাদের বিশেষত্ব–

> মানুষকে তিনি খণ্ডিত করে, বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি কখনো- মানবতার এ সার্বিক উপলব্ধিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সগোত্র। তবে রবীন্দ্রনাথ যেখানে অধিকতর সুকোমল, নমনীয় আর শালীন, নজরুল সেখানে স্পষ্টবাক্, সোচ্চার, রূঢ়, এমনকি স্থানবিশেষে আটপৌরেও। (ফজল, ১৯৭৪ক:১২৩)

'ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নজরুল' প্রবন্ধে আবুল ফজল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে নজরুলকে বিচার করেছেন। তাঁর মতে, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রত্যেকেই বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক শূন্যতাকে পূর্ণ করেছেন। এদের যে কোন একজনের অনুপস্থিতি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকে খণ্ডিত করে দিতে পারতো। প্রবল উন্মাদনায় সমাজের মন যখন বিক্ষিপ্ত ও আলোড়িত সে সময়ের প্রতীক মধুসূদন। ইউরোপীয় সাহিত্যের বিচিত্র রূপের সাথে আধ্যাত্মিক জীবনবোধ আত্মোপলব্ধির সাধনা পরিণতি পেয়েছে রবীন্দ্রনাথে। পরাধীনতা, পরবশতার বিরুদ্ধে যুগচিত্তের দ্রোহীচেতনার বাণীবাহক হলেন নজরুল। আবুল ফজলের মতে–

> স্বদেশের ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাস অমন একাত্ম হয়ে আর কারো জীবনে মিশেনি আর কারো রচনায় এ দুয়ের বাণীরূপ ফুটে ওঠেনি অমন জোরালো ও অনবদ্য ভাষায়। (ফজল, ১৯৬৫:৩৫১)

আবুল ফজল সাময়িকতাকে নজরুলকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মানতে রাজি নন। কারণ, তাঁর মতে, নজরুল নিজেই শুধু কবি হয়ে থাকতে চাননি, কবি পরিচয়ে আত্মতৃপ্তিও খোঁজেননি কোনদিন–

> সাময়িকতাই নজরুলকাব্যের প্রধান বিশিষ্টতা- এ মন্তব্য সত্য নয়। সাময়িক বহু বিষয়ে তিনি অজস্র কবিতা লিখেছেন- রচনা করেছেন দেদার সঙ্গীত এ বিনা দ্বিধায় স্বীকার্য। তবুও তাঁর কবিখ্যাতি স্রেফ সাময়িকতানির্ভর এ বলা যায় না। যুগ আর সমাজের একটা অপ্রতিরোধ্য দাবী আছে- সে দাবি আর দায় নজরুল সর্বান্তঃকরণে পালন করেছেন। (ফজল, ১৯৭৪ক:১২৩)

আমাদের ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে নজরুলের আবির্ভাব সে কথা স্মরণ রেখেই তাঁর শিল্পীসত্তা আর কবিকর্ম বিচার করা উচিত বলে মনে করেন আবুল ফজল। তিনি মনে করেন নিজের বক্তব্য সম্পর্কে নজরুলের প্রত্যয় অত্যন্ত দ্বিধামুক্ত। বাংলা কাব্যে এমন প্রত্যয় খুব কম দেখা যায়। নজরুলের কবিকণ্ঠই হতে পারে অবক্ষয় কবলিত পরিবেশে আমাদের দিশারী, নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা। আবুল ফজলের সাহিত্য সমালোচনায় ব্যক্তিগত অনুরাগের উপস্থিতি প্রবল। তাঁর প্রিয় লেখক ও ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে এসব লেখায়। নজরুল-রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই অসম্পূর্ণতা লক্ষ করা যায়।

১.৪

পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি ভাবগত ও সক্রিয় সমর্থনদানকারী বিকাশমান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে চিন্তাভাবনায় তুলনামূলক প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধি ছিলেন আবুল ফজল। বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপ্রসারণের সন্ধিক্ষণে এই আন্দোলনের ভাবগত 'গোঁজামিল'[২৪] ধরা পড়তে শুরু করে। এই 'গোঁজামিলে'র উপজাত উত্তরাধিকার ধর্মান্ধতা ও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো যখন সমাজদেহ দূষিত করতে শুরু করে আবুল ফজল তাঁর উপন্যাসো মাধ্যমে প্রথমে সেখানে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন, কিন্তু বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট ও সত্যনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে অচিরেই প্রবন্ধের আশ্রয় নেন। এসময়ই বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী ভাবধারার জোয়ারে আবুল ফজলও 'বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তা থেকে সরে এসে এ ধারার সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদী চিন্তার পথে ধীরে ধীরে সামিল হন' (মাহবুবুল, ২০০৮:১৭)। জীবনের শেষাবধি তাঁর মানসজগতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সাম্য, কল্যাণচিন্তা, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতার আলোকচ্ছটা অব্যাহত ছিল। ১৯৪৭-এর পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্যে ও প্রলোভনে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে নিষ্ক্রিয় সুবিধাবাদ ও স্বার্থান্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছিল তাকে পরিহার করে একাগ্র অধ্যবসায়ের মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি করার আন্দোলন গড়ে তোলার যে কয়জন কুশীলব ছিলেন আবুল ফজল তাঁদের অন্যতম। বিশেষত ১৯৫৮-র সামরিক শাসনের নিষেধাজ্ঞা-কবলিত সৃষ্টিশীলজগতে প্রলোভনের মরীচিকা উপেক্ষা করে পুরো ছয়ের দশক যাঁরা প্রতিবাদমুখর সৃজনশীলতার উত্তাপ ছড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও আবুল ফজলের নাম অগ্রগণ্য। তাই রফিক কায়সারের মন্তব্য সমর্থন করে উদ্ধৃত করা যায়–

> বুদ্ধিজীবীর জেদ এবং বিবেককে হরণ করার জন্য পাক-শাসকচক্র শাস্তির চাইতে প্রলোভনের জাল বিস্তারের পদ্ধতিকে কার্যকর পন্থা হিসেবে গ্রহণ করে। আবুল ফজল প্রলোভনের মরীচিকাকে উপেক্ষা করে নির্মাণ করেছেন বুদ্ধিজীবীর সাহসী পদচিহ্ন। সাহসী, অভিযাত্রীর সম্মান তাঁর অবশ্যপ্রাপ্য শিরোপা। আবুল ফজলের শিল্পসাফল্য কিংবা ভাবনা-কল্পনার গভীরতা নির্ণয়ের চাইতে তাঁর সাহসী পদক্ষেপের মূল্যায়ন এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (রফিক, ১৯৮৭:২০০)

বাঙালির সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতার কালে আবুল ফজলের সময়োপযোগী সাহসী ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সহায়ক হয়েছিল। ছয়ের দশকে আবুল ফজলের 'জাতির বিবেক'এর ভূমিকা পালন প্রসঙ্গে আহমদ শরীফের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য–

> শিক্ষিত-সাহসী-বেকারবিরল সেকালে অবসরপ্রাপ্ত প্রগতিশীল ও নির্ভীক স্পষ্টভাষী আবুল ফজলকে সম্বল, সভাপতি ও বক্তা করে সেমিনারে, মেঠো বক্তৃতায় এবং কাগুজে বিবৃতি মাধ্যমে ষাটের দশকের ঢাকায় তথা পূর্ববাঙলায় প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের একটা সাহসী মানস পরিবেশ গড়ে তুলেছিল ছাত্ররা। (শরীফ, ২০১৪:৫২৮)

সমকালীন জিজ্ঞাসা-তাড়িত হয়ে সমাজসচেতন লেখক হিসেবে আবুল ফজল তাঁর প্রতিক্রিয়া বা মতামত ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। তাতে সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, ধর্মদর্শন, অর্থনীতি, শিক্ষানীতির বিভিন্ন বিষয় যেমন রয়েছে তেমনি সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনাও রয়েছে। এসবের মধ্যে কোন তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক অনুসন্ধিৎসা দেখা যায় না। তাই আবুল ফজলের 'রাজনৈতিক বক্তব্য যাকে তিনি ঐ নামে ডাকতে নারাজ, অনেকের কাছে মনে হবে কিছুটা সরল ও অপেশাদার' এমনকি 'হ্যারল্ড লাস্কির উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ হলেও এসব প্রবন্ধকে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের উদাহরণ হিসেবে দেখা চলে না। তাঁর সকল বিবেচনাই সাহিত্যের ও সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে' (জিল্লুর, ১৯৮৭:৬৯)। একজন সজাগ সাহিত্যসেবী, সচেতন নাগরিক, আধুনিকতায় সভ্যতার মূল্যবোধে বিশ্বাসী আবুল ফজল রাজনীতির 'গন্ধস্পর্শ বাঁচিয়ে'[২৫] প্রতিবাদের ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর 'ব্যক্তিত্ব সন্দর্শন, সাহিত্যবোধ এবং সৃষ্টিশীলতা উদারতন্ত্র ও মানবতন্ত্রের আনুগত্যে গড়ে উঠেছে' (রফিক, ১৯৮৭:২১১)।

আবুল ফজলের রচনা, তাঁর চিন্তা ও যাপিত জীবনধারা বিশ্লেষণ করে কেউ তাঁর সাহিত্যকে 'ঔচিত্যবাদী'[২৬] কেউ 'হৃদয়ধর্মী'[২৭] আখ্যা দিয়েছেন। আবুল ফজলকে 'মুক্তবুদ্ধি-প্রতিভা মানতে রাজি না'[২৮] হলেও ড. এনামুল হকের মতে, 'ইসলামকে মনে-প্রাণে গ্রহণ ও অনুভব করে কিভাবে উঁচু-দরের সাহিত্য-শিল্পী হওয়া যায়, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বয়ং আবুল ফজল' (এনামুল, ১৯৮৭:৪২)। তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু আব্দুল কাদিরও তা-ই মনে করেন।[২৯] আবুল ফজল নিজেও তাঁর এই 'স্ববিরোধিতা'[৩০] সম্পর্কে সচেতন ছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়। আহমদ শরীফের মতে আবুল ফজল 'উদাসীন আস্তিক'[৩১]। তাঁর ভাবজগত আর ব্যক্তজগতের মধ্যে এই স্ববিরোধিতার কারণ মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষা যোগ করে রক্ষণশীল বাঙালি মুসলমানের মধ্যে মিশ্র শিক্ষা ও মিশ্র সংস্কৃতির প্রবর্তনা আবুল ফজলের জীবনে 'যার প্রভাব ও পরিব্যক্তি লঘু-গুরুভাবে শেষাবধি ছিলই' (শরীফ, ২০১৪:৫২৯)। এ প্রসঙ্গে খোন্দকার সিরাজুল হকের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবুল ফজলের মানসগঠনে ধর্মপ্রাণ পিতার প্রভাব উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেছেন – 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই জীবনাদর্শ একদিকে যেমন তাঁর সাহিত্যজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, অন্যদিকে তেমনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পথে তাঁকে ঠেলে দিয়েছে' (খোন্দকার, ১৯৮৪:৪৫৮)। তবে সামগ্রিকভাবে আবুল কাসেম ফজলুল হকের মূল্যায়নই এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বলে আমরা মনে করি[৩২]–

> আবুল ফজলের দৃষ্টিভঙ্গিকে উদারনৈতিক বলে অভিহিত করা যায়। তবে উদীয়মান কালের ইউরোপীয় উদারনৈতিক চিন্তবিদের প্রায় কোন বৈশিষ্ট্যই তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়নি। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে লেখার মাধ্যমে সমাজের কোন অংশকে প্রকৃতপক্ষে রুষ্ট করতে সাহসী হননি তিনি, অশুভবাদীদের মনে শুভবুদ্ধি জাগ্রত কতে চেয়েছেন শুধু। তাঁর লেখায় প্রতিবাদ ও আক্রমণ যেটুকু আছে, তাতে যে-সীমা পার হলে বিরুদ্ধপক্ষের শ্রদ্ধা হারাতে হবে সে পর্যন্ত অগ্রসর হননি তিনি। আবুল ফজলকে বলা চলে তাঁর কালের সাক্ষী... রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ কৌতূহলের সঙ্গে তিনি অবলোকন করেছেন, সাংবাদিকসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী প্রবন্ধ লিখে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন, তাঁর দৃষ্টি সমাজের গভীরে প্রবেশ করেনি কখনও।... সামগ্রিক বিচারে আবুল ফজল, রক্ষণশীলদের কাছে প্রগতিশীল, প্রগতিশীলদের কাছে রক্ষণশীল, নিজের কাছে উদার এবং বাংলাদেশের আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবীদের কাছে "বাঙালীর মনুষ্যত্ব ও বিবেকের অতন্দ্র প্রহরী" ' (শরীফ: ২০১৪:৫৩৩)।

আবুল ফজল তাঁর জীবন সাধনার মতো সাহিত্যসাধনায়ও সবসময় সরল ও শুভচিন্তা আহরণের দিকেই মনোযোগী ছিলেন। তাঁর 'মননশক্তি, সহজ জ্ঞান আর কল্যাণবুদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে' (মোতাহের, ১৯৮৭:২২)। তাঁর রচনাতে উদ্ধৃতির সৌজন্যে বিপুল পঠনপাঠনের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেই অধীত জ্ঞান দিয়ে তিনি তাঁর রচনাকে কোথাও ভারগ্রস্ত করেননি। নিজের মত তিনি সব সময় নিজের মতো করেই প্রকাশ করেছেন' (মোরশেদ, ২০১২:৩০২)। মুসলিম সমাজের 'সীমাবদ্ধ জ্ঞান' ও 'আড়ষ্ট বুদ্ধি'কে মুক্ত করার প্রত্যয়ে যিনি 'লা-পরওয়া' হয়েছিলেন তাঁর মননশক্তি ও সত্যনিষ্ঠা ধর্মাবিষ্ট সমাজের নানা দিকের সীমিত গণ্ডিকে খানিকটা প্রসারিত ও বন্ধনমুক্ত করার প্রেরণা ও সাহস জুগিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণের কারণ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

[১] প্রথম প্রকাশকাল– *ধূমকেতু*– শ্রাবণ ১৩২৯; *কল্লোল*– বৈশাখ ১৩৩০; *কালিকলম*– বৈশাখ, ১৩৩৩; *প্রগতি*– আষাঢ় ১৩৩৪।

[২] প্রকাশকাল– কার্তিক সংখ্যা ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

[৩] আবুল ফজলের জন্ম চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত কেঁওচিয়া গ্রামে ১ জুন ১৯০৩ সালে। গ্রামটির নামের সাথে আরাকান-নৃপতিদের শাসন ও মগপ্রভাবের ইতিহাস জড়িত আছে বলে সন্দেহ করেন আবুল কাদির(১৯৮৭:৪৪)। তাঁর পিতা মৌলভি ফজলুর রহমান চট্টগ্রাম শহরের সরকারি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ পরীক্ষা 'উলা' পাস করে কিছুকাল সন্দ্বীপে ইমামতি ও শিক্ষকতা করেন। পরে চট্টগ্রাম শহরের বিখ্যাত আন্দরকিল্লা জু'মা মসজিদের ইমাম পদে নিযুক্ত ছিলেন দীর্ঘ বত্রিশ বছর। আবুল ফজলের মা গুলশান আরা দক্ষিণ পটিয়ার হাশিমপুর গ্রামের মেয়ে। আবুল ফজলের জীবনাচার ও জীবনবোধ নির্মাণে পিতার ও পরিবারের রক্ষণশীলতার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এমনকি তাঁর সাহিত্যচর্চায় পিতার অনুমোদন ছিল না– নিমরাজি হয়েছিলেন উর্দুতে লেখার শর্তসাপেক্ষে। তবু আবুল ফজলের মধ্যে যে উদারতা ও সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী মনমানসিকতা গড়ে উঠেছিল তার পেছনে তাঁর নিজের ঔচিত্যবোধ ও মনস্বিতাই ছিল প্রধান। পিতার প্রভাবও ছিল, তবে তা লক্ষ্য নির্ধারণে নয়, লক্ষ্য অর্জনের পথ নির্মাণে। তিনি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলেন আলেম হওয়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু 'হাই-স্কিম' মাদ্রাসায় নতুন সিলেবাসের কারণে প্রচুর বাংলা বই ও পত্রিকা পড়ার সুযোগ হয়েছিল বলেই সাহিত্যের 'স' তাঁর মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিল বলে আবুল ফজলের বিশ্বাস।

আবুল ফজল ১৯২৩ সালে চট্টগ্রাম সরকারি (হাই) মাদ্রাসা থেকে প্রবেশিকা, ১৯২৫ সালে ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মাদ্রাসা বিভাগ থেকে আই.এ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কুল জীবনের প্রগতিশীল বন্ধু দিদারুল আলম কলেজ জীবনে সৃষ্টিশীল বন্ধু আব্দুল হক ফরিদী এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর সাহিত্যানুরাগী বন্ধু আবুল কাদিরের সান্নিধ্য তাঁর মানসগঠনে পাথেয় হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরই তাঁর সাংগঠনিক জীবনের হাতে-খড়ি– অধ্যাপক আবুল হুসেনের উদ্যোগে গঠিত আল-মামুন ক্লাব; বন্ধুদের সংগঠন ভোজ সংঘ, হাস্য সংঘ, পর্দাবিরোধী সংঘে তিনি সক্রিয় হলেন। ১৯২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি বন্ধু আব্দুল কাদির ও শিক্ষক আবুল হুসেনের উদ্যোগে গঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর সদস্য হিসেবে কাজ করতে থাকেন। পরে তিনি সংগঠনের মুখপত্র 'শিখা'-র সম্পাদকও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে বি.এ পাশ করে পিতার অনুমতি ছাড়াই কলকাতায় আইন পড়তে গেলেও পরে পিতার আদেশে তা ত্যাগ করেন। তবে সেখানেই 'সওগাত' অফিসে একাধারে তাঁর কর্মজীবন এবং সাহিত্যসাধনার গুরুত্বপূর্ণ পর্ব সূচিত হয়। সেখানেই তিনি কাজী নজরুল ইসলাম, শাহাদাৎ হোসেন, আবুল মনসুর আহমেদ, মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, গোলাম মোস্তফার মত প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪০ সালে তিনি অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন সরকারি মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজে চাকুরি শেষে ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালের ১৯ এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৫ এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৭ এর জুন পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পদে বহাল ছিলেন।১৯৮৩ সালে চট্টগ্রামের নিজ বাড়ি 'সাহিত্য নিকেতন'এ তাঁর মৃত্যু হয়। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী, অনুবাদ সব মিলিয়ে আবুল ফজলের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৬০টি। তন্মধ্যে উপন্যাস ৬টি, প্রবন্ধগ্রন্থ ১০টি। বিস্তারিত– সারোয়ার জাহান (১৯৮৭), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৯৪), আবুল ফজল (১৯৮৫ক)।

[৪] 'শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি মোটা কথা'(*সমকালীন চিন্তা*), 'সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে শিক্ষা সম্পর্কে দুটি কথা' (*সমকালীন চিন্তা*), 'ধর্মভিত্তিক বনাম ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রসঙ্গে' (*সমকালীন চিন্তা*), 'শিক্ষা আর শিক্ষকের সমস্যা' (*সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র*), 'দেশ আর দেশের ছাত্র সমাজ' (*সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র*), 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (*সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র*), 'শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা প্রায় নৈরাজ্যের সম্মুখীন'(*শুভবুদ্ধি*) ইত্যাদি প্রবন্ধ ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষার্থী বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবুল ফজলের বিভিন্ন লেখায় গুরুত্ব পেয়েছে।

[৫] আবুল ফজলের পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁকে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করে ধর্মীয় পেশায় নিযুক্ত করার। সেই লক্ষ্যে শৈশবে তাঁকে চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়। কিন্তু আবুল ফজল যখন দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র তখন ইংরেজ সরকারের শিক্ষা সংস্কার কর্যক্রমের আওতায় মাদ্রাসাটি 'নিউ স্কিম' হাই মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়। যেসব মাদ্রাসায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক শিক্ষা যেমন ইংরেজি ভাষা, বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষার বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল সেগুলিকে হাই মাদ্রাসা নাম দেয়া হয়। আবুল ফজলের জীবনে এই পালাবদল যে অশেষ তাৎপর্যবহ হয়েছিল তা তাঁর স্মৃতিচারণমূলক রচনা *রেখাচিত্র* -তে বিধৃত হয়েছে।

[৬] বিস্তারিত– মো. আব্দুল মান্নান (২০০৮:৬১)।

[৭] ১৯৭০ সালে প্রকাশিত *সমকালীন চিন্তা* গ্রন্থের 'সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে শিক্ষা সম্পর্কে দুটি কথা' প্রবন্ধে এমন একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যেখানে– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি-তে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের জেরে জৈব রসায়নের এক ছাত্র নিহত হয়।

[৮] সম্ভবত এই যুক্তিতেই আবুল ফজল স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার বিলোপসাধনের প্রস্তাব হলে তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন।

[৯] 'শিক্ষা আর শিক্ষকের সমস্যা' প্রবন্ধ ছাড়াও 'দেশ ও দেশের ছাত্র সমাজ' প্রবন্ধে একই আহ্বান জানিয়ে আবুল ফজলের বক্তব্য– 'সব শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে বিচারমুখী আর যুক্তিবাদী করে গড়ে তোলা। ...তোমরা যুক্তি-বিচার তথা র‍্যাশেনেলিজমের পথেরই অনুগামী হও– সে পথ

Dhaka University Institutional Repository

ধরেই তোমাদের নিজেদের জীবন আর তোমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলো' (ফজল, ১৯৬৮:২৮৫)। ছাত্রদেরকে সমাজতন্ত্রের পথে আহ্বান জানিয়েছেন।

[১০] 'সমাজ ও সংবাদপত্র' (*সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র*), 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' (*শুভবুদ্ধি*), 'লেখকের স্বাধীনতা' (*শুভবুদ্ধি*) ইত্যাদি প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে।

[১১] প্রথম প্রকাশিত হয় *সমকাল* পত্রিকার বৈশাখ ১৩৭০ সংখ্যায়।

[১২] প্রথম প্রকশিত হয় সমকাল পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধের কারণে ঐ সংখ্যা *সমকাল* বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে সরকার। প্রবন্ধটি রচনার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে যার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে প্রবন্ধেও। ঘটনাটি নিম্নরূপ : আবুল ফজলের *রাঙ্গা প্রভাত* উপন্যাস প্রকাশিত হলে এটিকে ইসলাম-বিরোধী ও পাকিস্তান-বিরোধী ধর্ম-বিরোধী আখ্যা দিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। *আজাদ*(১৯৬৪) পত্রিকায় *রাঙ্গা-প্রভাত*-এর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ উত্থাপন করেন অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী। আবুল ফজল তার প্রতিবাদে লেখেন 'মানবতন্ত্র' (পাশা, ১৯৮১:৪০০)। তবে রফিক কায়সার (১৯৮৭:২১১) জানিয়েছেন মানবতন্ত্রের বিষয়টি নিয়ে তখন ভাবছিলেন অনেকেই কিন্তু সাহস করে তা লিখেছিলেন আবুল ফজলই। এর ফলে তিনি আমদের ভাবনা-কল্পনাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

[১৩] আবুল ফজল বক্ষ্যমান প্রবন্ধ ছাড়াও এ বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিভিন্ন প্রবন্ধে লিখেছেন। মানবজীবনে ধর্মের ভূমিকা অথবা ধর্মবোধ সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন। যেমন 'ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা' প্রবন্ধে– 'ধর্মের একটা শাশ্বত ভূমিকা আছে। পারলৌকিক জীবনের প্রস্তুতি ছাড়াও মানুষের আত্মার বিকাশ সাধনও ধর্মের উদ্দেশ্য আর ভূমিকা' (ফজল, ২০০৮:১৯১)। আবার 'ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র : এক অবাস্তব কল্পনা' প্রবন্ধে– 'ধর্মের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ বা অনীহা নেই। ইসলামের মধ্যেই আমার জন্ম–ইসলামকে আমি যে শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি তাই নয়, আমার শিক্ষা জীবনের সূচনা থেকে ইসলামী শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাও আমাকে নিতে হয়েছে' (ফজল, ১৯৭৪:১৩)।

[১৪] 'পাকিস্তানী জাতীয়তার বুনিয়াদ' প্রবন্ধের মন্তব্য স্মরণীয়–'ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের হাওয়াই বুলির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তা টেকসই হতে পারে না কিছুতেই, কোথাও হয়নি' (ফজল, ১৯৭৪:১৫৯)।'সব রাষ্ট্রের মত আমাদের রাষ্ট্রের বুনিয়াদও হবে জাগতিক নিয়ম আর মূল্যবোধ' (ফজল, ১৯৭৪:১৬০)।

[১৫] একাত্তরে অবরুদ্ধ বাসভবনে লেখা রোজনামচা *দুর্দিনের দিনলিপি*-তে আবুল ফজলের মন্তব্য স্মরণ করা যায় – 'গণতন্ত্র এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয়, ভদ্র আর স্বীকৃত পন্থা। ... কিন্তু গণতন্ত্র মানে শুধু ক্ষমতা দখল নয়,ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়াও– গণতন্ত্রের সাফল্যও এ মনোভাবের উপর নির্ভর করে। গণতন্ত্রের প্রধান কানুন সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্বীকার করে নেওয়া' (ফজল, ১৯৮৩:৪১)। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অত্যাচার, হিন্দু-মুসলমানদের ওপর পাক-বাহিনীর নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতনের বর্ণনা, ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনে সমর্থন ইত্যাদি সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে অনেকক্ষেত্রে প্রবন্ধের চেয়ে সুগঠিত ও সুলিখিত ও হৃদয়গ্রাহী রচনা *দুর্দিনের দিনলিপি* (১৯৮২)।

[১৬] দেখুন– আবুল ফজল (১৯৬৮:১০৬), প্রবন্ধ– 'ইসলাম ও কম্যুনিজমে পার্থক্য'।

[১৭] 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে ভবিষ্যতে দেশগঠনের জন্য যে-আদর্শ সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতে বলেছেন ছাত্রদেরকে সে সম্পর্কে আবুল ফজল– 'আমরা কোন পথ ধরে এগিয়ে যাবো? আমার নিজের মনে সামনে যে পথ ভেসে ওঠে তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের পথ। এ পথের কথা আমি আমার সাহিত্যেও কিছু বলেছি। একে যদি কেউ ইসলামী সমাজতন্ত্র বলতে চায়– তাতেও আপত্তি নেই। আধুনিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের বহু বিষয়ে মিল রয়েছে' (ফজল, ১৯৬৮:২৪১)।

[১৮] প্রথম প্রকাশ– মাসিক *সঞ্চয়*, কার্তিক ১৩৪১ বঙ্গাব্দ সংখ্যা।

[১৯] ১৯২৭ সালে 'পর্দা প্রথার সাহিত্যিক অসুবিধা' নামে মুসলিম হলে পঠিত। পরে *নওরোজ* আশ্বিন ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।

[২০] টি.এস. এলিয়টের উদ্ধৃতি Tradition cannot be inherited and if you want you must obtain it by great labout. সহযোগে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন আবুল ফজল (২০০৮:৩৭)।

[২১] 'প্রতিমার সামনে জাগ্রতচিত্ত কাফের, কাবার ভিতর ঘুমিয়ে থাকা নিষ্ঠাবান মুসলমানের চেয়ে অনেক ভালো।'– ইকবালের এই উদ্ধৃতির উল্লেখ রয়েছে (১৯৭৪ক:১২)।

[২২] 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় ১৯৬৬ সালে।

[২৩] 'রবীন্দ্র-জীবন' প্রবন্ধটি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রজীবনী'র ওপর আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে সংসারের কোন দায়িত্বকেই অবহেলা বা অস্বীকার করেননি– এই বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন আবুল ফজল। রবীন্দ্রনাথের কর্মমুখরতা বাঙালির স্বাভাবিক কুঁড়েমি, দায়িত্বভীরুতা, ভাঁড়ামি, দীর্ঘসূত্রিতা, অপরিচ্ছন্ন চিন্তার বিপরীত। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর জীবনকে বুঝতে হলে তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় ঘটলেই চলবেনা। তার ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিকাশও উপলব্ধি করতে হবে বলে আবুল ফজল মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

[২৪] আবুল ফজল শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'বাঙালী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে এভাবে – 'আমরা বাঙালিরা দীর্ঘদিন ধরে গোঁজামিল দিয়ে এসেছি– চেয়েছি ইতিহাসকে ফাঁকি দিতে।' দেখুন– আবুল ফজল (১৯৬৮:৩৭)।

[২৫] পাকিস্তানি সামরিক শাসনের আমলে 'গণতন্ত্র' শব্দ উচ্চারণের বিপদ আশঙ্কায় 'সভ্যতার পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে 'সভ্যতা' শব্দের প্রয়োগ এবং রাজনীতিবিদদের ভূমিকার সমালোচনা করা প্রসঙ্গে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মন্তব্য 'সতর্কতা ও সদ্বিবেচনার সঙ্গেই সৎসাহসকে কাজে লাগিয়েছিলেন আবুল ফজল।' বিস্তারিত– জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯৮৭:৬৮,৭০)।

[২৬] আহমদ শরীফ (২০১৪:৫২৯)।

[২৭] ড. এনামুল হক (১৯৮৭:৪২)।

[২৮] আবুল ফজল সম্পর্কে ড. এনামুল হক – 'ইসলামী বা ইসলামের উৎসমূলকে কেন্দ্র করে যাঁর সমস্ত চিন্তা, ভাবনা ও সৃষ্টি আবর্তিত হয়েছে, তাঁকে আর যাই বলা যাক, অন্তত 'মুক্ত-বুদ্ধির' পরিচায়ক প্রতিভা বলা যায় না' (১৯৮৭:৪১)। অন্যত্র- ধর্মীয় সংস্কার-বিশ্বাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও আবুল ফজলের স্বাজাত্য তুলনা করে এনামুল হকের মন্তব্য– 'উভয়েই শেষ পর্যন্ত শিল্প-সুষমামণ্ডিত সাহিত্য-সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট না হয়ে ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন' (১৯৮৭:৪৩)।

[২৯] আব্দুল কাদির খানিকটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণে একই মন্তব্য করেছেন–'আবুল ফজল শাস্ত্রবাদীর যুগোচিত ব্যাখ্যা প্রদানের পক্ষপাতী হ'লেও প্রকৃতপক্ষে ছিলেন Fundamentalist – ধর্মের মূল নীতিমালার আলোকপ্রাপ্ত অনুসারক' (কাদির, ১৯৮৭:৪৯)।

[৩০] *লেখকের রোজনামচা*-য় আবুল ফজল লিখেছেন 'মুখে বা কলমে আমি যাই বলি বা লিখি না কেন, মনে হয় আমার ভিতরেও একটা ধর্মচেতনা ফল্গুধারার মতো নীরবে প্রবাহিত রয়েছে। এ ব্যাপারে আমার মধ্যেও স্ববিরোধিতার অন্ত নেই। (১৯৮৩:১৫৪) তাছাড়া তিনি বন্ধু ড. এনামুল হকের মন্তব্যও 'নির্ভুল' বলে মেনে নিয়েছেন।(১৯৮৩:১৫৩)।

[৩১] আহমদ শরীফ (২০১৪:৫৩০) লিখেছেন–'তিনি নাস্তিক ছিলেন না, ছিলেন উদাসীন আস্তিক।'

[৩২] মূল্যায়নটি উদ্ধৃত হয়েছে আহমদ শরীফ (২০১৪:৫৩৩) রচিত 'ঔচিত্যবাদী আবুল ফজল' প্রবন্ধ থেকে। আবুল কাসেম ফজলুল হকের লেখাটির সূত্র– *পটভূমি*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : আবদুল হক

২. সমাজভাবনা

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমান সমাজে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ জীবন-ভাবনা সঞ্চারণে দায়িত্বশীল ছিলেন যে-কজন সাহিত্য-শিল্পী, আবদুল হক[১] (১৯১৮-১৯৯৭) তাঁদের অন্যতম। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রগতিচিন্তা, ধর্মীয় জড়তা-মুক্তি, সমাজসচেতনার উত্তরসাধক আবদুল হক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মননশীলতার স্বাক্ষর রাখলেও তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে প্রবন্ধসাহিত্যে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক শুরু হলে উর্দুর বিরোধিতা করে বাংলাভাষার পক্ষে প্রথম প্রবন্ধ রচয়িতা আবদুল হক[২]। সাহিত্যচর্চার শুরু থেকেই তিনি ইতিহাস ও রাজনীতি-সচেতন; নিরপেক্ষ-স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয়তা-চেতনা তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার ঐশ্বর্য। বাঙালি মুসলমান সমাজের স্বরূপ অন্বেষণ, সেই সমাজের পশ্চাৎপদতার কারণ অনুসন্ধান এবং মুক্তির অন্বেষণ তাঁর প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য এবং যুক্তির শৃঙ্খলা ও পরিমিতি-জ্ঞান তাঁর প্রবন্ধের শক্তি। রাজনৈতিক আদর্শে সমাজতন্ত্রে আস্থাবান হলেও কোন দলীয় তকমা তিনি সবসময় এড়িয়ে চলেছেন। এমনকি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মী হওয়া সত্ত্বেও ছয় বা সাতের দশকের উত্তাল সময়েও তিনি দলীয় পরিচয় ধারণ করেননি। 'তাঁর মত এতটা রাজনীতিনিমজ্জিত মানুষের পক্ষে কোনো দলীয় রাজনীতির কার্যক্রম সম্পর্কে এতটা নির্মোহ থাকা বেশ ব্যতিক্রমী ঘটনা' (মাযহার, ২০০১:৩৯)। বাঙালি মুসলমানের আত্মবিকাশের ঐতিহাসিক-ঐতিহ্যিক রূপরেখাই ছিল তাঁর অন্বেষণের মূলক্ষেত্র। এই অনুসন্ধানে তিনি ব্যবহার করেছেন নির্মোহ-নিরাসক্ত বস্তুবাদী বিচারবুদ্ধি। সমসাময়িক দেশীয় ও ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি তাঁর মানসজগতের বিস্তৃতি ও আয়ত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের সহায়ক হয়েছিল। স্বভাবে স্বল্পবাক, নিভৃতচারী ও আত্মপ্রচারবিমুখ আবদুল হক তাঁর কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছানোর চার দশকে অতিক্রম করেছেন তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশবিভাগ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, পঁচাত্তরের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং তৎপরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক শাসন। প্রগাঢ় ইতিহাসবোধের কারণে সাতচল্লিশের আগে সর্বভারতীয় বাস্তবতায় বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে, সাতচল্লিশের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে এবং স্বাধীন বাংলাদেশেও নৈতিকতা-মূল্যবোধের অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িক বিনাশী শক্তির বিরুদ্ধে আবদুল হক দাঁড়িয়েছেন নির্দ্বিধায়। তাঁর সাহসী বক্তব্যের কারণে একাধিকবার বাতিল হয়েছিল পাকিস্তান সরকার সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত জনপ্রিয় পত্রিকা *সমকাল*-এর সংখ্যা, তবু স্বনামে বেনামে তিনি লিখেছেন এমন সব সত্যবাক্য যা 'উচ্চারণের জন্য বুকের পাটা দরকার ছিল'।[৩]

আবদুল হক রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা সাতটি– *ক্রান্তিকাল* (১৯৬২), *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ* (১৯৬৮), *বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৩৮০), *সাহিত্য ও স্বাধীনতা* (১৯৭৪), *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব* (১৯৭৬), *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮৪) এবং *চেতনার এলবাম এবং বিবিধ প্রসঙ্গ* (১৯৯৩)।[৪] এসব গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধের বেশিরভাগই সাহিত্য বিষয়ক এবং তন্মধ্যে এককভাবে নাট্যকার-নাট্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধই বেশি।

২.১

সমাজ, বিশেষত বাঙালি মুসলমান সমাজ, আবদুল হকের সমাজভাবনার কেন্দ্র। এই সমাজের ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি, আত্মপরিচয়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংস্কারান্ধতা, ঐতিহ্যশূন্যতা, সীমাবদ্ধতা-সংকীর্ণতা তিনি কাঠামোর ভিত্তিস্তর থেকে গভীর অভিনিবেশে উদ্‌ঘাটন করেছেন। আবার সাতচল্লিশোত্তর পাকিস্তানের বাস্তবতায় নতুন সম্ভাবনার চিহ্নও খুঁজেছেন এরই মধ্যে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' সমাজভাবনা তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। সমাজে নারীর অবস্থান, ধর্মের ব্যবহার ও বিস্তার, রাজনীতি-অর্থনীতির ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় তাঁকে ভাবিত করেছে। তবে সামগ্রিকভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শাসিত একটি মানবিক সমাজই আবদুল হকের

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ সমাজ। *ক্রান্তিকাল* গ্রন্থের 'রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে কাঙ্ক্ষিত সেই সমাজ নির্মাণের পূর্বশর্তগুলো উল্লেখ করে প্রকারান্তরে সমাজের মূল উপাদানগুলোই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন–

> মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সমাজ যতদিন নিজের অপচয় ও অবক্ষয় রোধ করতে না পারবে এবং নিজেকে সৃষ্টিমুখর করতে না পারবে ততদিন উত্তম নেতৃসমাজ সে সৃষ্টি করতে পারবে না, অপকৃষ্ট নেতৃত্বই হবে তার নিয়তি। মূল্যবোধের বাহন শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মনে-প্রাণে নিতে না পারলে এবং মননধারা ও মূল্যবোধের উত্তম ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে না পারলে কোনো সমাজেরই ভবিষ্যৎ নেই। (হক, ১৯৬২:৩৪)

আবদুল হক মনে করেন, সামাজিক রূপান্তরের মূলে অর্থনৈতিক রূপান্তরের অপ্রতিরোধ্য শক্তি কাজ করে। ফলে বদলে যায় ভাবধারা, জীবনযাত্রা-পদ্ধতি। গড়ে ওঠে নতুন সংস্কৃতি, এমনকি পিউরিটান মুসলিম-সমাজও বদলে গিয়ে নতুন যুগ-ধর্ম গ্রহণ করে– 'অর্থনীতি বদলে যাবে অথচ সমাজের মানসজগৎ ও বহিরঙ্গ বদলাবে না, এটা অসম্ভব।'(হক, ২০১২:৭২) আবদুল হক অবশ্য নব্যস্বাধীন পাকিস্তানের সমাজকে সামনে রেখে এই বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছিলেন, বিশেষত তুলনামূলক ধর্মীয়-বিধিনিষেধের শিকার মুসলিম নারীর সামাজিক অগ্রসরতার চিত্র তিনি উপস্থাপন করেছেন। এর সাথে বিদেশ ও বিদেশি সমাজ-সংস্কৃতির সংস্রব এবং অনিবার্য প্রভাব যুক্ত হয়ে সমাজের সজীব-গ্রহণশীল রূপ বজায় থাকে। আজকের সমাজও এই বাস্তবতার বাইরে নয়।

বাঙালি মুসলমান নারীর শিক্ষার অধিকার ও নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার ব্যতিক্রমী ও সংগ্রামী জীবন আবদুল হককে প্রাণিত করেছিল। বেগম রোকেয়ার রচনাপাঠ থেকে 'বিরাট ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভের আনন্দ পাওয়া যায়' বলে তিনি জানিয়েছেন। বিশেষ করে বাঙালি নারীর ব্যক্তিত্ব ও বাংলা ভাষার প্রতি বেগম রোকেয়ার অকৃত্রিম মমত্ব ও গভীর আকর্ষণে মুগ্ধ ছিলেন আবদুল হক। রোকেয়া সম্পর্কে তিনি লিখেছেন–

> সদা-সচেতন সংবেদনশীল জ্ঞান-অতৃপ্ত ছিল তাঁর মানস-প্রকৃতি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে একটা খুব উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব একান্তভাবে বাঙালি নারী-ব্যক্তিত্ব। তিনি এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলিম নারীসমাজের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি : এ-সমাজের সচেতন প্রয়াসে নয়, অবচেতন বাসনায়, এবং তাঁর নিজস্ব সাধনায়, সেইসঙ্গে সমকালীন সমাজ-মানসেরও প্রতিক্রিয়ায়। বৃহত্তর সমাজের প্রস্তর-কঠিন নানাবিধ প্রথার সঙ্গে নারী-সুলভ স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিকাশ-বাসনার সংঘর্ষ-উৎক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে তিনি দীপ্তিময়ী। এ স্ফুলিঙ্গে জ্বালা অবশ্যই কিছু আছে, কিন্তু তার চাইতে বেশি আছে দীপাবলির কমনীয় কান্তি এবং সর্বব্যাপ্ত প্রীতি। (হক, ২০১২:৭৫)

তবে আবদুল হকের বিবেচনায় 'নন কনফরমিস্ট' রোকেয়ার চিন্তার কেন্দ্রে ছিল নারী-জীবন, লক্ষ্য ছিল নারীর মানবীয় সত্তার প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাপারে রোকেয়া ছিলেন তাঁর যুগের তুলনায় অগ্রসর, ছিলেন ভবিষ্যৎদর্শিনী। তিনি এ-ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নারীর স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতির জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন।' যুগ-অতিক্রমী বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিতে এদেশের নারীকে 'রানী' করার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেছিলেন[৫] রোকেয়া, যেমনটি আবদুল হক চিহ্নিত করেছেন রোকেয়ার লেখা 'রানী' বানানের মধ্যে।

রোকেয়ার অধিকাংশ রচনাকে 'মতামতমূলক ও উদ্দেশ্যধর্মী' মন্তব্য করে আবদুল হকের অভিমত, 'মতামতের প্রকাশভঙ্গিতে ও রচনারীতিতে তিনি সর্বত্র সুগৃহিণীর পরিচয় দিতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর এ-সব রচনার মূল্য যতটা সুকুমার প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের জন্য নয়, তার চাইতে বেশি চিন্তার সাহসিকতার জন্য' (হক, ২০১২:৭৯)। সংসার-সমাজের প্রবল বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়িয়ে নারী শিক্ষা, নারী আন্দোলন ও চিন্তাচর্চা এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রে সংগ্রামে স্বনিয়োজিত থাকা রোকেয়ার অদম্য মনোবলের দিকে আবদুল হক যতটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন তার চেয়ে বেশি প্রণিধানযোগ্য তিনি মনে করেছেন বাংলা ভাষা চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য রোকেয়ার নিদারুণ সংগ্রামের অনালোকিত অধ্যায়কে। দ্বিতীয় খণ্ড *মতিচুর* গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে[৬] উর্দুভাষী পরিবেশের মধ্যে বাংলার প্রতি রোকেয়ার অকৃত্রিম আকর্ষণের কথা যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবদুল হক লিখেছেন–

> বাংলা ভাষা ছিল তাঁর সহজাত প্রকৃতিতে, তাঁর রক্তের ছন্দে ও ঝংকারে, কিন্তু পরিবেশও ছিল অতিশয় প্রবল প্রতিপক্ষ। এরপর বেগম রোকেয়া উন্নত সাহিত্য রচনা করেছিলেন কিনা সে বিচারে সমালোচক সংকুচিত হন, যদিও শেষ পর্যন্ত সে

Dhaka University Institutional Repository

> কর্তব্য তাঁর অপরিহার্য। কিন্তু এখানে মৌলিক কথাটা এই নয় যে তিনি অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করতে পেরেছিলেন কিনা; এখানে মৌলিক কথাটা হচ্ছে, এমন প্রতিকূল পরিবেশেও বাংলা সাহিত্যচর্চার মতো মন তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। অধিকন্তু এ মন বিশুদ্ধভাবে ব্যক্তি-মন ছিল না; এ ছিল তৎকালীন বাঙালি মুসলমানের অবচেতন সমাজ-মানসেরও অন্তর্গত। এবং এ-কথাও স্বীকার্য যে তিনি যাই লিখে থাকুন, রীতিগত ও প্রাকরণিক ত্রুটি তাঁর যাই থাক, বাংলা ভাষা ছিল তাঁর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদিক দিয়ে তিনি একান্তভাবে বঙ্গনন্দিনী। (হক, ২০১২:৭৬)

এ ছিল নারীর সত্তা অন্বেষী এক মহীয়সী নারীর ভিন্ন এক সংগ্রামের কথা। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর আগে মুসলিম সমাজের জাগরণে যাঁদের ভূমিকা স্মরণীয় বেগম রোকেয়া তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচনারীতি বা উৎকর্ষের জন্য নয়, সমাজের বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যেও চিন্তার দুঃসাহসিকতার জন্য। আবদুল হকের ভাষায় 'মানস-প্রকৃতিতে ও চিন্তায় আধুনিকতা বলতে যা বোঝায়, বাঙ্গালি মুসলিম-সমাজে মাতৃভাষায় তিনিই প্রথম উল্লেখ্য প্রবক্তা' (হক, ২০১২:৮০)।

আবদুল হকের মানসপরিধি গড়ে উঠেছিল কাজী আবদুল ওদুদের চিন্তার সাহচর্যে এবং সে-সূত্রে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'এর পরোক্ষ প্রেরণা ও প্রভাবে। ১৯৪৩ সালে রাজশাহী কলেজের ছাত্র থাকাকালে কাজী আবদুল ওদুদের *কবিগুরু গ্যেটে* গ্রন্থের প্রেসকপি তৈরির কাজ তাঁর আর্থিক টানাপোড়েন লাঘবে সহায়ক হয়েছিল।[৭] কিন্তু ওদুদের উদার মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একাত্মতা অনুভব করলেও তাঁর জাতীয়তা ও ধর্মচিন্তার সাথে আবদুল হক সহমত হতে পারেননি। এমনকি কাজী আবদুল ওদুদ অর্থনীতির ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য বা সমাজ-বিশ্লেষণে কোথাও অর্থনৈতিক কার্যকারণ তত্ত্বকে কাজে না লাগানোতে তাঁর চিন্তাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন আবদুল হক যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য–

> অর্থনীতি এবং সাহিত্যের মধ্যে বিরোধ আছে এ-রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়তো তাঁর ছিল, অন্তত অর্থনীতি যে মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে এমন কোনো ধারণার সাক্ষাৎ তাঁর রচনাপুঞ্জে পাওয়া যায় না। এই কারণে প্রখর যুক্তিবাদিতা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তার আধুনিকতা সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। (হক, ২০১২:৮১)

সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুর জাতীয়তাকে ভারতীয় জাতীয়তা বিবেচনায় সমর্থন দেওয়াকে আবদুল ওদুদের সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করার মতো 'ভুল ধারণা' মনে করেছেন আবদুল হক। তাছাড়া ওদুদ তাঁর প্রেয় বোধ থেকে 'মনুষ্যত্বের পূর্ণ উদ্বোধন'রূপে ধর্মকে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু আবদুল হকের মনে হয়েছে এই ভাবনা 'বাঙালি সমাজের অসাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রসারে খানিকটা বিঘ্ন হিসাবে কাজ করেছে' (হক, ২০১২:৮৮)। যদিও ওদুদের আস্তিক্যবোধ বা শেষ বয়সে ধর্মভাবে স্থিত হওয়া নিয়ে আবদুল হকের কোন জিজ্ঞাসা নেই। কিন্তু ওদুদ যে 'বিপ্লবের মধ্যে শুধু বিশৃঙ্খলাই দেখেছিলেন' এই বিষয়টি আবদুল হকের মনোযোগ এড়ায়নি, তিনি তা মানতেও পারেন নি। বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণ-মুক্ত সমাজ গঠনের দিকে ওদুদের কোন আস্থা বা আগ্রহ না থাকলেও শরিয়তি শাসন, ধর্মরাষ্ট্র, প্যান-ইসলামবাদ এসব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর চিন্তার অনুসারী ছিলেন আবদুল হক।

২.১.২

সমাজের শিক্ষা-প্রয়াসে এবং জাতির মানসগঠনে জীবনী-গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে আবদুল হক বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব ইতিহাস-বিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং নিজস্ব সমাজ থেকে উদ্ভূত মনীষী, লেখক, গণনায়ক ও সমাজ-নেতাদের জীবনী রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করছেন। আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে জীবনী-রচনা-প্রয়াস একান্ত দুর্লভ, তাই আবদুল হকের মন্তব্য–

> একটা সমাজে জীবনী-সাহিত্য-অর্থাৎ সেই সমাজের বিশিষ্ট মানুষদের জীবনীগ্রন্থ– কী পরিমাণে লিখিত হয় তা থেকে বোঝা যায় সে-সমাজ নিজের ইতিহাসকে যুগপৎ সমালোচনা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে কিনা, সমাজ-নায়কদের প্রতি কৃতজ্ঞ কিনা এবং নিজের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন কিনা। কেননা সমাজের ইতিহাস প্রধান অধ্যায়গুলি তার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন-কথার মধ্যেই বিধৃত হয়। (হক, ২০১২:১১৩-১১৪)

Dhaka University Institutional Repository

এই দুর্দশা কাটাতে জাতীয় বীর অনুসন্ধান করে তাদের বর্ণাঢ্য জীবন-চরিত রচনা করে জাতির আত্মপরিচয় ও প্রেরণার পূর্ণতা দানের প্রয়োজন কারণ আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির নায়কদের ভুলে থাকে আত্মবিস্মৃতির নামান্তর। বাঙালি মুসলমানের চরিত-সাহিত্যে বিদেশি বিশেষত ইরান-তুরান-প্রতীচ্যের অবাঙালি ধর্মনেতা-সমাজনেতা লেখক-কবিদের আধিক্য থেকেই আবদুল হক নিজস্ব ইতিহাস থেকে বীর সন্ধানের কথা বলেছেন। তাঁর উদাহরণ থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়–

> খালেদ, মুসা অথবা তারেক মহাবীর, ইকবাল মনীষী। কিন্তু তাঁরা বাঙালির বীর ও বাঙালির মনীষী নন। খালেদ-মুসা-তারেকের চাইতে বরিশালের এ.কে. ফজলুল হক এবং চট্টগ্রামের কাজেম আলী আমাদের অনেক আপন। এই কথাটা যতদিন আমরা না বুঝব ততদিন আমাদের দুঃখ ঘুচবে না। (হক, ২০১২:১১৪)

সমাজে নেতৃত্ব ও গণচেতনা সৃষ্টিকে অসাধারণ এবং জটিল রহস্য বলে মনে করেন আবদুল হক। এই রহস্যময়তার কারণ, ঠিক কীভাবে নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অপরাগতা। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়তি-চেতনা এবং সংকল্প যাকে এককথায় গণচেতনা বলা যায়, তবু প্রশ্ন থাকে– তা-ই কি ব্যক্তি-নেতৃত্ব রূপ দান করেন, নাকি গণচেতনার নির্যাস প্রথমে নেতৃত্বের মনে উদ্ভূত হয়ে পরে তা গণচেতনায় সঞ্চারিত হয়, অথবা জনগণের অবচেতন-আকাঙ্ক্ষাই নেতৃত্বের উন্নত প্রতিভায় বিচ্ছুরিত হয়ে সুতীব্র গতি সৃষ্টি হয় জাতির দেহে। আবদুল হক অবশ্য এক্ষেত্রে কোনো পক্ষে না গিয়ে ভাগ্যের কথা বলেন – 'জাতির কল্যাণকামী অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব জাতির জন্য সৌভাগ্য; ঠিক প্রয়োজনের সময় আবির্ভাব আরও সৌভাগ্য' (হক, ২০১২:১২৩) তবে তিনি একটা আদর্শ অবস্থার সংকেতও দিয়েছেন–

> আদর্শ অবস্থা তাকেই বলে যখন একই সঙ্গে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার আবির্ভাব হয় আবার জাতিও পূর্ণ সচেতন থাকে, তিনি জাতির স্বীকৃত স্বার্থ অনুযায়ী নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং এই উভয়ে মিলে জাতির অখণ্ড শরীর ও মন গঠন করে। কিন্তু এ-রূপ আদর্শ অবস্থার উদ্ভব বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় নেতা ও জাতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন সত্তা এবং তাদের স্বার্থ পরস্পর-বিরুদ্ধ; না হয় জাতি সচেতন কিন্তু যোগ্যনেতৃত্বহীন; না হয় নেতা অসাধরণ ব্যক্তি এবং জাতি তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাশার সোপান মাত্র, অথবা পরিস্থিতিটা আরও অন্য রকম। কিন্তু পরিস্থিতি যেমনই হোক কোনো না কোনো কল্যাণময় নিয়তির স্থির লক্ষ্যে (যেমন স্বাধীনতা অথবা জীবনযাপনের কোনো আদর্শ সম্বন্ধে) সচেতনতাই জাতির রক্ষাকবচ।(হক, ২০১২:১২৪)

যদিও নেতৃত্বের অপেক্ষায় সমাজ থাকে না। সমাজকে টিকে থাকতে হয় নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির বলে, নেতৃত্বহীনতাই সেখানে সাধারণ। অসাধারণ নেতৃত্বের উদ্ভব অসাধারণ ঘটনা হলেও অসাধারণ নেতৃত্বের আবির্ভাবকে কোন অলৌকিক গুণাবলির সমষ্টি মনে করেন না আবদুল হক (হক, ২০১২:১২১)। যেহেতু নেতৃত্বের উদ্ভব হয় সমাজদেহ থেকে তাই আবদুল হক গণচেতনাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। গণচেতনার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন মার্কসীয় ইতিহাসচেতনার সূত্র ধরে–

> গণচেতনার একটা প্রধান কথা সম্পদ-সৃষ্টির এবং শ্রেণী হিসাবে সমাজে তার বন্টনের স্বরূপ উপলব্ধি। আরেকটা প্রধান কথা হল ইতিহাস-চেতনা। কেবল রাজনৈতিক ইতিহাসই ইতিহাস নয়, অর্থনীতি সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস ব্যতীত ইতিহাস অসম্পূর্ণ। (হক, ২০১২:১২৫)

তাই সমাজে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত সব চেতনাকে গণচেতনা বলা যায় না। জীবনযাপনের সামগ্রিক পরিবেশের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামরত মানুষের সচেতনতাও এর সাথে জড়িত। নিজের স্বার্থ ও নিয়তি, শত্রু ও মিত্র সমন্ধে এভাবেই জনসমাজে গড়ে ওঠে সচেতনতা। এই স্বার্থ প্রধানত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। আবদুল হক তাই সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন গণচেতনাকে। কারণ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্ব ছাড়াই বাংলাদেশে ভাষা-আন্দোলন সফল হয়েছিল, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানও অর্জন করেছিল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। তাই আবদুল হকের অভিমত অসাধারণ নেতৃত্ব ও গণচেতনার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের দিকে–

> জাতীয় জীবনে সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে; কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও প্রমাণিত যে, গণচেতনাই জনসমাজের রক্ষাকবচ-স্বরূপ, অশুভ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। গণচেতনা এবং সঠিক নেতৃত্বের সম্মিলনেই জাতি তার প্রার্থিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে, তবে অনেক সময় গণচেতনাই সঠিক নেতৃত্বের জন্ম দেয়, এই কারণে সঠিক নেতৃত্বের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি, এবং বস্তুত তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন আছে গণচেতনার। (হক, ২০১২:১২৫)

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সমাজে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত সব চেতনাই গণচেতনা নয়। গণচেতনা আসলে গণসচেতনতা। আবদুল হক গণচেতনার স্বরূপ চিহ্নিত করে লিখেছেন 'জনসমাজ যখন একটা সমাজ হিসেবে তার স্বার্থ ও নিয়তি সম্বন্ধে, এবং তার স্বার্থ ও নিয়তির প্রকৃত শত্রু ও মিত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন তখনই তাকে সচেতন বলা যায়। এই স্বার্থ প্রধানত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক' (হক, ২০১২:১২৫)। সুতরাং মানুষ জীবনযাপনের প্রয়োজনে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিবেশের সাথে নিরন্তর সংগ্রামে মধ্য দিয়ে যে সচেতনতা অর্জন করে তাকে বলা যায় গণসচেতনতা। পরিবেশ সবচেয়ে বড় শিক্ষক একথা আবদুল হক বলেন কিন্তু এতেই সব শেষ হয় না কারণ সব মানুষ সচেতন হয় না, কিছু মানুষ হয়। আর সেই কাজটি করেন–দার্শনিক, লেখক, শিল্পী, উৎসর্গিত-প্রাণ রাজনৈতিক কর্মী এবং সমাজের আরও কিছু লোক। 'সমাজের অস্পষ্ট অনুভবকে গণচেতনায় রূপান্তরিত করা, তাকে সমাজে সঞ্চারিত করা, আর সংহত সক্রিয় করে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরই' (হক, ২০১২:১২৫)।

'রাসেল ও যাজক সম্প্রদায়' প্রবন্ধে কুসংস্কার, ধর্মের মনগড়া ব্যাখ্যা ও রক্ষণশীলতার সমন্বয়ে গঠিত চিন্তার অচলায়তনের পরিচয় তুলে ধরে তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের অগ্রগতির ধারাবাহিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজের বিকাশের সাথে সম্পর্ক রেখে মানুষের জীবনযাপন, ধ্যানধারণা যতই জটিল হয়ে উঠছে ততই ধর্মের অনেক বিধিবিধান অকার্যকর ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে বলে মনে করেন আবদুল হক। মানুষকে এসব বিধি-বিধান লঙ্ঘন করতে হয় জীবনের তাগিদে, প্রগতির প্রেরণায়, জীবনযাত্রার জটিল সমস্যার ঘূর্ণিপাকে পড়ে। ধর্ম একসময় সমাজের প্রয়োজনেই সবচেয়ে উন্নত বিধানগুলি দিয়েছিল কিন্তু সমাজ-প্রগতি সেগুলোকেই পেছনে ফেলে অকার্যকর করে দেয়। আবদুল হকের ভাষায়–

> প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মই প্রথম যখন প্রচারিত হয়েছিল তখন তার লক্ষ্য ছিল মানব-সমাজের প্রগতি। মানুষের অধ্যাত্মচিন্তা এবং পার্থিব নীতিবোধকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করাই ছিল ধর্ম-প্রচারকদের উদ্দেশ্য। অন্ততঃ আমাদের পরিচিত বড় ধর্মগুলোর ইতিহাসে তাই দেখতে পাই। সেই সংগে এটাও দেখতে পাই যে, মূল ধর্মনীতির সংগে এমন অনেক কিছু সম্পৃক্ত হয়ে গেছে যা ছিল আসলে সামাজিক প্রথা, বা সমাজ-চিন্তা, যা কম-বেশী অন্য আকারে হলেও নয়া ধর্মনীতি প্রচারের আগে থেকেই ছিল। তার পরেও প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মের পরিমণ্ডলে সমাজে শৃংখলা ও সামঞ্জস্য রাখার জন্য জীবন যাপন-পদ্ধতির মধ্যে অনেক-কিছু বর্জন, গ্রহণ ও প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। এসবই করা হয়েছে প্রগতির প্রয়োজনে। কিন্তু মূল ধর্মনীতির অতিরিক্ত অথচ ধর্মের অংগরূপে কথিত এইসব সংযোজন যে চিরদিনই প্রগতিমূলক থাকবে তার কোনো মানে নেই। (হক, ১৯৬২:১২০)

২.১.৩

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসেবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সূচনা হয় এবং দ্বিতীয় দশকে বিস্তার লাভ করে। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম সামাজিক বন্ধন দ্রুত শিথিল হতে থাকে। ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীকে এজন্য প্রধানত অভিযুক্ত করা হলেও দুই সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অসম বিকাশ, দীর্ঘদিনের সামাজিক সন্দেহ-অবিশ্বাস ও মানসিক-দূরত্ব এই ক্ষেত্র অনেকদিন ধরেই প্রস্তুত করছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতা আবদুল হককে বিচলিত করেছে সবসময়। বিভিন্ন ধর্মের বিরোধমূলক উপাদান ছাড়াও সাম্প্রদায়িকতার একটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য আছে বলে তিনি মনে করেন। ধর্ম বা ধার্মিকতা এক্ষেত্রে সুচতুরভাবে ব্যবহার করা হয় মাত্র। 'কাজী আবদুল ওদুদ' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আবদুল হকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য বিবৃত হয়েছে–

> সাম্প্রদায়িকতার কথা যাঁরাই চিন্তা করেছেন তাঁরা কখনো এই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাম্প্রদায়িকতায় ধর্মকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহারের কথা চিন্তা করেছেন বলে মনে হয় না। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধমূলক উপাদান আছে কিন্তু এক ধর্মাবলম্বী যখন অন্য ধর্মাবলম্বীকে নিজেদের বিশেষ রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক লক্ষ্যের পরিপন্থী চিন্তা করে তখন ধর্ম তাদের কাছে সেই রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক লক্ষ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, ব্যক্তিগত জীবনে তারা ধর্মের ধার ধারুক অথবা না-ধারুক। সংস্কৃতিগত-ভাবে অনুন্নত পাশাপাশি সমাজে এ-রকমটি ঘটে থাকে। (হক, ২০১২:৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তির প্রশ্নে ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা আবদুল হক একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা উৎপাটন বা সমাধানে ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের আন্তরিকতার অভাবই যে সবচেয়ে বড় কারণ তা আবদুল হক নিজস্ব ধরনে উপস্থাপন করেছেন–

> ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয় এবং রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক বিরোধে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাতে থাকে। ধর্মকে সংশোধন করে নয়, রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দাবির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারলে তবেই এ-রূপ ক্ষেত্রে বিরোধ এড়ানো সম্ভব। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিকেরা কখনই তা পারেন নি, বরং নানাভাবে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করেছেন। এই ব্যর্থতাই ভারতবর্ষীয় রাজনীতির মূল কথা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল–কিন্তু সেই অত্যন্ত কঠিন কাজটি আন্তরিকতার সঙ্গে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ করেছিলেন কিনা সেটাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে বড় প্রশ্ন হয়ে থাকবে। (হক, ২০১২:৮৭)

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালে যেমন পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে পরবর্তীকালেও তেমনি শাসক শ্রেণি স্বার্থেই সমাজে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটেছিল। পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে বসবাসরত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের ওপর রাষ্ট্রীয় অভিযোগ বা অপবাদ দিয়ে সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার আশংকা করেছেন আবদুল হক। 'যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, হিন্দুরা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করলেও নতুন পরিস্থিতিতে তারা 'মানসিক সামঞ্জস্য' বিধানের চেষ্টা করেনি একথা মানা যায় না (হক, ১৩৮০:৫৫)। আঠার বছর পর এহেন অপপ্রচার বা সন্দেহকে তিনি অসঙ্গত মনে করেন এবং শুধু মুসলমানদেরই মাতৃভূমির জন্য দেশপ্রেম আছে এমন ধারণাকে অবিবেচনা-ও-অহমিকাপ্রসূত বলে মনে করেন।

বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মিলে একাত্ম বাঙালি জাতিসত্তা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে বরাবরই ছিল মাথাব্যাথার কারণ, তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির পরও হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অবসান হয়নি, রূপ পাল্টেছিল মাত্র। এ ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের পরিস্থিতি ছিল প্রায় অভিন্ন। আবদুল হক তাই কয়েকটি প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িকতাকে মূল বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি এই বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন, কামনা করেছেন মানবিক মূল্যবোধ।

আশা করা হয়েছিল, তবু পাকিস্তানের স্বাধীনতার পরও সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত হয়নি, বর্জনের চেষ্টাও কেউ করছিল না। বরং বারংবার সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলে এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রূকুটি করে রাজনৈতিক বিশ্বাসের মত আঁকড়ে ধরে ছিল। আবদুল হকের মতে–

> সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগের লক্ষ্য যতটা না স্বসম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতি তার চাইতে অনেক বেশী অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অপ্রীতি; যতটা না স্নিগ্ধ হৃদয়বৃত্তি তার চাইতে অনেক বেশী অসূয়াবৃত্তি। বস্তুত অনুভবে ও ক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতার মূল লক্ষ্য স্ব-সম্প্রদায় নয়, অপর সম্প্রদায়।
>
> এই কারণে সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাধারণতঃ স্ব-সম্প্রদায়ের চিন্তায় ব্রতী নন, অপর-সম্প্রদায়-চেতনার আবেশে, অবসেশনে, প্রপীড়িত; সেবাপরায়ণ নন, অসূয়াপ্রবণ; স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য তিনি ততটা ক্রিয়াশীল নন, যতোটা অপর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল। এই কারণে সাম্প্রদায়িকতার একটা লক্ষণ শুচিবায়ুগ্রস্ততা, চিন্তায় ও আচরণে। (হক, ১৩৮২:৬৭)

অনুভবে ও চিন্তায় সাম্প্রদায়িকতা অনৌদার্য ও বদ্ধমানসিকতার লক্ষণ। এ হচ্ছে সমষ্টিচেতনা বিকাশের একটা অপেক্ষাকৃত অপরিণত স্তর বিশেষ বলে আবদুল হক মনে করেন (হক, ১৩৮২:৭২)। পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রাদায়িকতা বিলোপ অথচ সেখানে রীতিমতো এই দুষ্ট প্রবৃত্তির লালন চলছিল।

ছয় দশকের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবি এবং ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা দুর্বলতার প্রসঙ্গ টেনে আবদুল হক প্রতিভা স্ফুরণের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার্জনের কথা বলেছেন। মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ছাড়া কখনও প্রতিভা, ইংরেজিতে যাকে 'জিনিয়াস' বলে, জন্মলাভ করে না। তাই মাতৃভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য পাঠের সুযোগ বিদ্যালয় থেকেই অবারিত করতে হয়। যেহেতু 'সাহিত্যের উৎকর্ষ বহুলাংশে শিক্ষার– যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল' (হক, ১৯৬৮:৪৩)। তাই উৎকৃষ্ট শিক্ষা সাহিত্যের জন্য অপরিহার্য। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা ও

Dhaka University Institutional Repository

অবহেলা করার ঐতিহাসিক প্রমাণ বহন করছে ইংরেজি ও আরবি মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ঐতিহ্য। তাছাড়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার ব্যবহার সংকুচিত। তবে শুধু ভাষা নয়, আবদুল হক পৌরনীতি এবং বিশেষত ইতিহাস শিক্ষার মান কমে যাওয়ার আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন। তরুণদের জন্য রাষ্ট্রের ইতিহাস শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাঁর গুরুত্বারোপ আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক–

> আত্মবিস্মৃতের পক্ষে সৃষ্টিমূলক উদ্যম সম্ভব নয়, রাজনীতিতে, সাহিত্যে, অথবা সংস্কৃতিতে। সৃষ্টিমূলক উদ্যমের জন্য চাই, আরও অনেক কিছুর সঙ্গে আত্মপরিচয় এবং আত্ম-উপলব্ধি, মাতৃভূমির ইতিহাস-পাঠ ব্যতীত যা অসম্ভব। এবং চাই গৌরববোধ– অসার আত্মাভিমান নয়, প্রকৃত গৌরববোধ– ধার করা বীরত্বে যা সম্ভব নয়। (হক, ১৯৬৮:৪৫)

আবদুল হক অসাম্প্রদায়িক, যুক্তি ও মানবিকতাবোধ শাসিত একটি বহুত্ববাদী সমাজ কামনা করেছিলেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজ যেমন বাঙালি মুসলমানের চিন্তার জড়তাকে দূর করে বুদ্ধির মুক্তির লক্ষ্যে সমাজের কতিপয় পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হয়েছিল তেমনি আবদুল হকের লক্ষ্যও ছিল সমাজের সেইসব স্থবিরতা ও অচলায়তনে আঘাত করা। সমাজ প্রগতিতে আস্থাশীল বলেই তিনি ভাল যে-কোন কিছুর জন্য পুরাতনের মায়া ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন ইতিহাস গতিশীল এবং কোন আদর্শ বা প্রত্যয়ই চিরদিনের নয়। মানুষ নিরন্তর তার ক্রুটিপূর্ণ জীবনযাত্রার সংস্কার করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবনবিকাশের দিকে এই তাঁর প্রত্যয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.১ সংস্কৃতিভাবনা

ছয়ের দশকে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বাঙালির স্বাধীকারচেতনা যখন তীব্রভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছিল তখন আমাদের আলোচ্য মনীষীদের সবাই বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবোধকে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও সুগঠিত রূপ দেয়ার লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন ও দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। আবদুল হক বাঙালির ভাষা-সংগ্রামের প্রথম মসি-সৈনিক[৮]। তাই তার পক্ষেই বাঙালির জাতিগত অহংচেতনাকে জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজনীয় আঘাত দেয়া সম্ভব ছিল। তাঁর 'বাঙালি মুসলমান : ভূমিকা ও নিয়তি' প্রবন্ধের স্বরগ্রাম সে-রকমই।

বাঙালি মুসলমানের মানস-গঠন সম্পর্কে একই সময়ের অপরাপর বাঙালি মনীষীদের মতো আবদুল হকের মতামতও এই সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি ও সংশয়ের কথাই প্রতিষ্ঠিত করে। তবে তাঁর অনুসন্ধান আত্মজিজ্ঞাসার সূত্র ধরে, ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ মুখ্য নয় সেখানে। যেমন, বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণ অনুসন্ধানকে প্রাধান্য দিয়েছেন–

> বাঙালি মুসলমান তার প্রতিবেশীর চেতনায় স্মরণীয়ভাবে অনুপ্রবেশ করতে পারে নি। যেটুকু পেরেছিল তার মধ্যে মুসলমানত্ব হয়তো ছিল-হিন্দু-মানসের কল্পিত মুসলমানত্ব–কিন্তু বাঙালিত্ব ছিল না। বাঙালিত্ব ছিল হিন্দুদের একচেটিয়া। এইজন্যই বাঙালি মুসলমান–বাঙালি না মুসলমান–এমন ধাঁধা কারো কারো মনে জাগা সম্ভব হয়েছিল, এবং বাঙালি মুসলমানের কলমে ভালো বাংলা বেরোনো মনে হয়েছিল বিস্ময়ের ব্যাপার। (হক, ২০১২:৪২)

অর্থাৎ আবদুল হক মনে করেন বাঙালি মুসলমান তাঁর বাঙালিত্ব নিয়ে কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠ ছিল না, বা তাঁর বাঙালি- সত্তা লক্ষণীয় ছিল না বলেই প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মনে সে স্থান পায়নি। আবদুল হক ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

> বাঙালি মুসলমান তার দীর্ঘদিনের ইতিহাসে নিজেকে প্রবলভাবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে, অকুণ্ঠিতভাবে এবং সগৌরবে নিজেকে বাঙালি বলে ঘোষণা করে নি। ঘোষণা করার কথাও তার মনে লক্ষণীয়ভাবে জাগে নি। আর এই কারণে বাঙালি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার ইতিহাস ব্যর্থতায় সমাকীর্ণ। এ ব্যর্থতা কোনো এক বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই। (হক, ২০১২:৪৩)।

এই ব্যাখ্যারই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হল, বাঙালি মুসলমানের তুর্কি-মুঘল-পাঠান মিথ্যা জাতিত্বের মেকী-অহংকার এবং তৎসৃষ্ট সাম্প্রদায়িক-চেতনা। উভয়ই একই দিকে ইঙ্গিত করে– জাতি হিসেবে বাঙালি মুসলমানের অন্তঃসারশূন্যতা। আবদুল হক লিখেছেন–

> বাঙালি হিন্দু, আরব, ইরানি বা গ্রিক, পাঠান বা চীনা–এরা নিছক বিত্তের বলেই রণ-নৈপুণ্য, রাষ্ট্র-নৈপুণ্য বা চিত্তের ঐশ্বর্য অর্জন করে নি। এদের প্রধান ঐশ্বর্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে গোষ্ঠী-চেতনা, গোষ্ঠীর প্রতি উৎসর্গিত মনোভাব, যা থেকে রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য প্রেরণা সৃষ্টিশীল ধারায় উৎসারিত হয়েছে। আজকের দিনে জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায় তা এ ছিল না, কিন্তু এই চেতনা একটা গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে এবং বিভিন্ন ধারায় সৃষ্টিশীল হতে তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। বাঙালি মুসলমানদের এই চেতনাটি কখনো সংহত রূপ নেয় নি এবং এজন্যই তার ঐতিহাসিক জীবনে অসফলতা ও অনুর্বরতার ঐতিহ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (হক, ২০১২:৪৩)

এই আত্মপ্রবঞ্চনা কতটা আত্মবিধ্বংসী হয়েছে যে, বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস অনেকাংশেই হয়ে উঠেছে পশ্চিমাগত মুসলমানদের কাছে তার আত্মলোপ-প্রচেষ্টারই ইতিহাস। এর পরিণতি ছিল শোচনীয় এবং বহুদূর বিস্তৃত–

> বাঙালি মুসলমান যে বাঙালি, পশ্চিমাগত নয়, এই চিন্তার দ্বারা যেন সে পীড়িত হয়েছে; বাঙালি হওয়াটাকে সে যেন একটা অপরাধ বলেই গণ্য করেছে; আর তাই সকল ক্ষেত্রে পশ্চিমাগত মুসলমানদের নেতৃত্বকে–তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক–মেনে নেওয়াটাই তার মনে হয়েছে অবশ্যকরণীয়; বাঙালি মুসলমান তার নাম, তার পরিচ্ছদ, তার ধর্মচিন্তা, তার দর্শন-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-চিন্তা পুরোপুরি তাদের কাছ থেকে নেওয়ার চেষ্টা করেছে; সাহিত্যের উপাদান ও উপাখ্যানও প্রধানত

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছে তাদের কাছ থেকে; তার ভাষাকে বদলাবার চেষ্টা করেছে, কখনো কখনো বাংলা বর্ণলিপিও বর্জন করতে চেয়েছে, এমনকী বাংলাভাষাকেও অস্বীকার করার প্রয়াস পেয়েছে। (হক, ২০১২:৪৪)

কিন্তু বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্ধিগ্ধ হওয়ার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। নিজকে সগৌরবে বাঙালি বলে ঘোষণা দিতে পারলে, নিজের সত্তা ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে 'তার গোষ্ঠী চেতনা প্রবল হতে পারত, তার চিন্তা সংহত হতে পারত বেং অনুকরণবৃত্তি এত প্রবল হতে পারত না।' বলে আবদুল হকের অভিমত। তাছাড়া ইতিহাসের অনেক গতিপথ ঠিক করে নেয়ার এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। বাঙালি মুসলমান যে নিজকে বাঙালি বলতে অস্বীকার করেছে, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনি, হীনমন্যতায় ভুগেছে এই ঐতিহাসিক সত্যকে এড়ানোর উপায় নেই বলেই সেই ভুলের পরিশোধন প্রয়োজন। আবদুল হক যথার্থই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যচেতনাকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমে তা গড়ে উঠেছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে, ব্রিটিশ আমলে; পরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে সহাবস্থানের কালে নিজকে বাঙালি বলে ঘোষণা দেয়ার মধ্যে একধরনের অধিকারবোধ সৃষ্টি হয়। সবশেষে ভাষা আন্দোলন বাঙালি মুসলমানকে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও গোষ্ঠীচেতনার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আবদুল হক মনে করেন, এই চেতনায় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থবোধই প্রবল, পুরোপুরি বাঙালি সত্তার চেতনা এটি নয়–

বাঙালি হিসাবে তার নিজস্ব প্রবহমান জীবন, প্রবহমান সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং আরও বহু উপাদান নিয়ে সমগ্রভাবে যে-বাঙালি সত্তা, তা সে-ভাবনার মধ্যে এখনও একটা বড় অংশ নয়। এর একটা প্রমাণ, বাংলা ভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানি সাহিত্যের প্রতি শিক্ষাভিমানী সমাজের সীমাহীন তাচ্ছিল্য ও উন্নাসিকতা: বস্তুত বাংলাভাষার প্রতি তার যে প্রীতি তা এখন পর্যন্ত যতটা ভাবপ্রবণ ততটা প্রাগাঢ় আন্তরিকতাময় নয়। (হক, ২০১২:৪৬)

কিন্তু যতদিন তার এই সচেতনা না হবে যে, সে আরব-ইরানি-পাঠান-পাঞ্জাবি নয়– সে বাঙালি। তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার ভাষা এবং তার আরও অনেক নিজস্ব সম্পদ তাকে অলংঘনীয়ভাবে পৃথিবীর আর সব মানবগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। এই প্রকৃতি যাকে লালন করে সে মরুর পরিবেশের মানুষের মতো হতে পারে না। দুই সংস্কৃতি তাই আলাদা। সে বড় হতে চাইলে তার জাতিত্বের, বাঙালিত্বের গৌরববোধ থাকতে হবে। আবদুল হক যেমন লিখেছেন–

তার প্রবহমান জীবন, প্রবহমান সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং আরও বহু উপাদান নিয়ে তার যে বাঙালি সত্তা, বাঙালি ব্যক্তিত্ব, তাকেও বড় হতে হবে যদি সে বড় হতে চায়; কেননা একটা বিশিষ্ট সমাজ হিসাবে, একটা গণনীয় মানবগোষ্ঠী হিসাবে সেটাই তার ভূমিকা এবং নিয়তি। এই ভূমিকা এবং নিয়তিকে যতদিন সে স্বীকার করে নিতে না পারবে ততদিন তার সত্যিকারের মুক্তি সম্ভব হবে না–অতীতের ইতিহাসের বন্ধন থেকে মুক্তি, অনুকরণবৃত্তি থেকে মুক্তি, কায়াহীন ছায়াজীবন থেকে মুক্তি। (হক, ২০১২:৪৬)

আবদুল হক মনে করেন, শুধু ধর্মের ঐক্য দিয়ে মানুষের গোটা-জীবনযাত্রা-পদ্ধতি তার সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলা সম্ভব নয়। অথচ বাঙালি মুসলমানের কানে বহুকাল যাবত একটাই মন্ত্র আওড়ানো হয়েছে যে, ধর্ম ছাড়া তারা গৌরবের আর কিছুই নেই। আর সেই ধর্মের প্রতি আনুগত্য মানে ভিনদেশি সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য। এমনকি যে পুঁথি নিয়ে সে গর্ব করে, আবদুল হক যুক্তি সাজিয়েছেন, 'পুঁথি-সাহিত্যসহ সমগ্র মুসলিম-বাংলাসাহিত্যকে পরিমাণগতভাবে দেখলে দেখা যাবে, এই সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের কথা আজ পর্যন্ত যত লেখা হয়েছে; অবাঙালি মুসলমান, অবাঙালি অমুসলমান এবং আরব-ইরানি সংস্কৃতির কথা লেখা হয়েছে তার চেয়ে বেশি (হক, ২০১২:৪৭)।

সুতরাং বাঙালি মুসলমানকে বাইরের মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে হবে নিজস্ব ঐতিহ্য, ব্যক্তিত্ব ও গৌরবের দিকে। তার বিদ্রোহের ইতিহাস, লোকশিল্প, বন-পাহাড়, হাওর-সমুদ্র, সঙ্গীত-সাহিত্যই তার গৌরবের অফুরন্ত উৎস।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.২

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর তাত্ত্বিক-প্রভাব ও নেতৃত্বে প্যান-ইসলামবাদী চিন্তাচেতনার সাথে পরিচিত হয় বাঙালি মুসলমান সমাজের শিক্ষিত তরুণ অংশ। ইসলামি ভ্রাতৃত্বচেতনায় বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একবিশ্বচেতনা জাগ্রত করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। বাঙালি মুসলমানের আত্মবোধহীন, দেশবিচ্ছিন্ন জাতীয়চেতনা উদ্বোধনের ক্ষেত্রে প্যান-ইসলামিজ্‌ম্‌ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আবদুল হক মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও প্যান-ইসলামিক আন্তর্জাতিকতার অন্তঃসারশূন্যতা এবং সমসাময়িক বিশ্বে এসব মতবাদের অকার্যকারিতার তত্ত্ব-তথ্যসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন কয়েকটি প্রবন্ধে। 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ : পুনর্নিরীক্ষা' প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি পর্বে যা ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রতিপাদ্য নিজেই সংগ্রথিত করেছেন–

ক. পাকিস্তান সৃষ্টি-মাত্রই এই আন্দোলনের মুখ্য নেতৃত্ব দ্বিজাতিতত্ত্ব বর্জন করেছিলেন,

খ. ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বাস্তব ফলাফল ভারতের মুসলমান ও পাকিস্তানের হিন্দুদের জন্য অকল্যাণকর হয়েছিল।

গ. মুসলিম জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারিত রূপ প্যান-ইসলামবাদ দেশীয় মুসলমানদের প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব সৃষ্টি করেছিল। এই নীতি সে-সময়ের কোন কোন মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রের জন্য ছিল ক্ষতিকর এবং তৎকালীন বিশ্বপরিস্থিতিতে অবাস্তব।

ঘ. দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ছিল অসম্ভব, এমনকি কেবল পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যেও ছিল অসম্ভব ।

আবদুল হক মুসলিম জাতীয়তাবাদের যে বৈশ্বিকপরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন সেখান থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল যার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে লেখকের স্বচ্ছ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়–

> মুসলিম জাতীয়তাবাদ, বস্তুত মুসলিমবিশ্বে অধুনা অবান্তর। মুসলমান কেবল পাকিস্তানেই বাস করে না, এশিয়া-আফ্রিকার আরও অনেক দেশেই বাস করে, কিন্তু কোথাও তারা নিছক মুসলমান হিসাবে রাষ্ট্র গঠন করে নি। মুসলমানত্বই যদি তাদের একমাত্র কথা হতো তবে আরবরা আজও তুর্কিদের অধীনে এবং সুদানীরা মিশরের অধীনে হৃষ্টচিত্তে বাস করত। তার পরিবর্তে বরং লক্ষ্যযোগ্য ভাষা, সংস্কৃতি ও দৈশিক রাজনৈতিক স্বার্থে রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রনীতি। আরবরা তাই বহুধাবিভক্ত, কিন্তু সেইসঙ্গে আরব লীগ ও রাষ্ট্র-সংযুক্তির মাধ্যমে ঐক্যসাধনায় নিয়োজিত, ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ভাষা ও জাতিগত ভিত্তিতে। বর্তমানে রাষ্ট্রনৈতিক ও জাতিগত স্বার্থের কাছে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব যে কতখানি হীনমূল্য তা লক্ষণীয় মালয়েশীয়-ইন্দোনেশীয় সংঘর্ষে এবং সাম্প্রদায়িক মরক্কো-আলজেরীয় সংঘর্ষে। মুসলিম-জগতের চিন্তাধারা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন এবং নিজেদের স্বপ্নাতুর রোমান্টিকতার চক্রে আবর্তিত বলেই এ-সব আমরা এখনও ভালো করে বুঝি না। তাই আমরা বুঝি না, ইসরাইলকে যখন আরব রাষ্ট্রপুঞ্জ ও পাকিস্তান স্বীকৃতি দেওয়ার বিরোধী তখন তাকে তুরস্ক স্বীকৃতি দেয় কেন; কেনই বা সাইপ্রাসের গ্রীক-তুর্কি সংঘর্ষে পাকিস্তান সমর্থন দেয় তুর্কিদের এবং মিশর সমর্থন দেয় গ্রীকদের। এবং সর্বোপরি, আমরা কল্পনাও করি নি যে ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে নবজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সদস্যপদ দানের বিরোধিতা করবে কোনো 'খৃষ্টান' রাষ্ট্র নয়, 'বৌদ্ধ' রাষ্ট্র নয়, 'হিন্দু' রাষ্ট্র নয়, একটি প্রতিবেশী 'মুসলিম' রাষ্ট্র আফগানিস্তান! (হক, ২০১২:৫৯-৬০)

প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই সুবিন্যাস্ত ও সুলিখিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বাঙালি জাতীয়তাবাদকে নিরঙ্কুশ তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই তিনি প্রবন্ধে মূলত ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার তুলনায় ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার অগ্রহণযোগ্যতাই প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন, মুসলিম জাতীয়তাবাদ একটি অকল্যাণকর সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতা এবং এই বুলি একটি একটি বিশেষ শ্রেণির মুসলমানের পরীক্ষিত অস্ত্র। (হক, ২০১২:৬১) অন্যদিকে প্যান-ইসলামবাদ রোমান্টিক ভাবাবেগ। এভাবে অজস্র যুক্তি-তথ্য-প্রমানের পরম্পরা সাজিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে প্রবল বেগে ধাবমান বাঙালির প্রাণের দাবিকে অক্ষরে উৎকীর্ণ করে আবদুল হক লিখেছেন–

> সংহত জাতীয়তার চেতনাই রাষ্ট্রীয় জীবনে শক্তিশালী রক্ষাকবচ, অনৈক্য এবং বৈদেশিক প্রভাব উভয়ের বিরুদ্ধে; এবং পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত এমনি সংহত ঘনীভূত বাঙালি জাতীয়তবাদ। (হক, ২০১২:৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল হকের সংস্কৃতিচিন্তার কেন্দ্র বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবোধ। এ বিষয়ে তাঁর অভিমতকে সাতচল্লিশ ও তৎপরবর্তীকালের বাঙালি জাতীয়তাবাদের সারকথা বলা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি-স্বাতন্ত্র্যচেতনার উদ্বোধন ছিল বর্ণ হিন্দুর অংশগ্রহণে ধর্ম-সম্প্রদায়কেন্দ্রিক, তাকে মুসলমানের অংশগ্রহণ ছিল না, অথবা ছিল উপেক্ষিত। ফলে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ কখনও সামগ্রিক অর্থে বাঙালির জাতীয়তাবোধে পরিণত হতে পারে নি। কিন্তু ভাষা আন্দোলন পূর্ব-বাংলা তথা বাংলাদেশের বাঙালির জন্য সাংস্কৃতিক জাগরণের পথ উন্মুক্ত করে। বাঙালির ভাষিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা কীভাবে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদে রূপ লাভ করেছিল তার বিশ্বস্ত ও মর্মার্থমূলক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন আবদুল হক তাঁর *বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮৪) এবং *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব* (১৯৮৭) গ্রন্থের ১২ টি প্রবন্ধে। ভাষা আন্দোলন শুধু যে ভাষার জন্য লড়াই ছিল না, ছিল চাকুরির অধিকার, শিক্ষার অধিকারসহ আরও একগুচ্ছ মানবিক অধিকার আদায়ের প্রতীক এই চেতনা তখন খুব সক্রিয় ছিল। তাই ভাষা আন্দোলন খুব দ্রুত সকলের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করে। তবে আবদুল হক মনে করেন ১৯৪৭ এ *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক ইত্তেহাদ*, *সাপ্তাহিক বেগম* ও *মাসিক সওগাত* পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধসহ অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল তাতে উৎকীর্ণ জাতীয়তাবোধের মধ্যে কোন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিল না। এই আন্দোলন ছিল মূলত ভাষিক স্বাতন্ত্র্যচেতনাভিত্তিক। যেমন ২৯ জুন ১৯৪৭ তারিখে প্রকাশিত আবদুল হকের 'বাংলা ভাষা-বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার তীব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে–

> আমার মনে একটা প্রশ্ন সব সময়ে উদ্যত হয়ে থাকে : আমরা কেন আমাদের দেশে ইংরেজি-উর্দু-হিন্দি বলতে বাধ্য থাকব? আমাদের দেশে যারা বাস করে সেইসব ইংরেজ বা উর্দু-হিন্দিভাষীরা কেন বাংলা শিখতে বাধ্য হবে না? আমার মত এই যে, এদেশে যেসব অভারতীয় অথবা অবাঙালি বাস করবে, তাদের বাংলা শিখতে হবে, যদি তারা এদেশে বাস করতে চায় এবং আমাদের সঙ্গে চলতে চায়। বাংলা শেখা তাদেরই গরজ। তাদের জন্য ইংরেজি-উর্দু-হিন্দি শেখা আমাদের গরজ নয়, বরং আমাদের পক্ষে ঘোর অমর্যাদাকর। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের জন্য এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংযোগের জন্য যতটুকু ইংরেজি-উর্দু-হিন্দি শেখা দরকার, শুধু ততটুকুই আমরা শিখব এবং অন্ততঃ ততটুকু বাংলা পৃথিবীর জাতিপুঞ্জকেও শিখতে হবে। ভারতের অন্য অঞ্চলে যেয়ে যেমন সে-অঞ্চলের এবং ভারতের বাইরে যেয়ে যেমন সেখানকার ভাষা ব্যবহার না করে আমাদের গত্যন্তর নেই, তেমনি ভারতের অন্য অঞ্চলের এবং ভারতের বাইরেকার দেশের লোকদের বাংলায় এসে, বাংলা ব্যবহার না করে গত্যন্তর না থাকা উচিত। তাতেই প্রকৃত জাতীয় মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। (হক, ২০১৪:১৫)

কিন্তু এতে ভাষার প্রশ্ন সাতচল্লিশে সমাধান হয়নি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু আবদুল হক, মাহবুব জামাল জাহেদী, আবুল মনসুর আহমদ, ফররুখ আহমদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. এনামুল হক উত্তরভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী মুসলিমদের উর্দু-দাবির বিপরীতে স্বদেশ-স্বজাতির প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে যুক্তি-প্রজ্ঞা-আবেগ-দূরদর্শিতা সংশ্লেষে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রতিবাদের যে বুদ্ধিবৃত্তিক-পাটাতন তৈরি করে দিয়েছিলেন পরবর্তী সংগ্রাম সেই পথ ধরেই এগিয়ে গিয়েছিল, অর্জিত হয়েছিল চূড়ান্ত বিজয়।[৯] ভাষিক স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তায় উত্তরণের এই পথরেখা 'ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত নিচের উদ্ধৃতিতে বিধৃত হয়েছে–

> ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিভাবনার ভিত্তিতে একটা বিশেষ মানবগোষ্ঠী হিসেবে স্বাতন্ত্র্যবোধ, নিয়তিচেতনা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবোধ এবং ঐ স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ন রাখার ও একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠী হিসেব ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণের ইচ্ছা, জাতীয়তাবাদের এইসব লক্ষণ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্তর্গত ছিল। অবশ্য এই জাতীয়তাবাদ খুব স্পষ্ট ছিল না এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-কল্পনাও এর অন্তর্গত ছিল না। কিন্তু ভাষা সাহিত্য ও চাকুরির প্রশ্নে এই অনুভব বাঙালি শিক্ষিত মুসলিম সমাজে খুব দ্রুত ব্যাপ্ত হয়েছিল; এবং এটাই ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জনপ্রিয়তার কারণ। এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল লেখকদের রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত আলোচনায়, পাকিস্তান সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই, কোলকাতার পত্র-পত্রিকায়, এবং পরেও তাঁরা ক্রমাগত লেখনী চালনা করে গেছেন। এইভাবেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম সরব প্রকাশ। পুরনো সম্প্রদায়ভিত্তিক অনুভব থেকে এর উদ্ভব হলেও এই অনুভবের মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে বাঙালি মুসলমানদের অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। (হক, ২০১৪:৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাংলাদেশের মানুষের অপরিশোধিত জাতীয়তাচিন্তার কোন পরিশুদ্ধি যে ঘটেনি তার প্রমান পাওয়া যায় '৭৫-এ শেখ মুজিবর রহমানের সপরিবার হত্যাকাণ্ডের পর একটি চিহ্নিত মহলের 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' নামক বৈরী ধারণা প্রচারণায়। 'বাঙালি' কথাটা বর্জন করে এ রাষ্ট্রের নাগরিককে 'বাংলাদেশি' বলার পেছনে আছে অনেকখানি আত্ম-বিশ্বাস, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আছে সংশয়, জাতীয়তার ধারণায় অনিশ্চয়তা' (হক, ২০১২:১০৭)। আবদুল হকের এই প্রত্যয়ের সাথে শেখ মুজিব হত্যা-পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যারা তত্ত্বের উদ্‌গাতা তাদের অন্যতম অস্ত্র ছিল বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয়চেতনায় আবেগের উস্কানি এবং ভরসা ছিল অতীতের অস্পষ্টতা, অজ্ঞতা; স্মৃতিতে ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতা। ফলে যে অসাম্প্রদায়িক, সেক্যুলার জাতীয়তাবোধ বাংলাদেশের অধিকাংশ বাঙালিকে স্বল্পসময়ের জন্য হলেও প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে অজেয় করে তুলেছিল তাতে স্পষ্ট বিভ্রান্তি তৈরি হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রগতিশীল, মানবতবাদী ও মুক্তিচিন্তার বুদ্ধিজীবীদের মতো এহেন উদ্দেশ্যমূলক সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন আবদুল হক।[১০]

জাতীয়তার প্রশ্নটি আবেগ দিয়ে সমাধানের পক্ষে নন আবদুল হক। তাঁর মতে জাতীয়তা 'আবেগ ছাড়াও উপলব্ধির, অনুভবের, চেতনার ব্যাপার : মোটামুটি স্থায়ী চেতনার ব্যাপার, অনেক ক্ষেত্রে বহু শতাব্দীব্যাপী।' অর্থাৎ এটি 'এমন ব্যাপার নয় এবং উচিত নয় যা অল্পদিন পরপর পরিধেয় বস্ত্রের মতো পরিবর্তন করা যেতে পারে' (হক, ২০১২:১০৫,১০৮)। অথচ বাঙালির ইতিহাসের দিকে তাকালে তা-ই মনে হয়। আবদুল হক উদাহরণ দিয়েছেন এহেন অস্থির, অকেলাসিত আবেগের–

> গত চল্লিশ বছরে বর্তমান বাংলাদেশ নামক ভূ-ভাগের নাগরিকদের জাতীয়তার ধারণায় ছিল প্রথমে উপমহাদেশের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতা, তারপর পাকিস্তানের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা, তারপর আরও দু-একটি ছোটখাটো ধাপ অতিক্রম করে বাংলাদেশের চতুঃসীমার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তা। সাম্প্রতিককালে পুনরায় সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। জাতীয়তায় এ-দেশের মানুষ ছিল প্রথমে ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানি এবং বাঙালি, এখন বাংলাদেশী। (হক, ২০১২:১০৮)

আবদুল হক 'বাঙালি' পরিচয়কে বড় করে দেখতে চান, কারণ–

> বাংলাদেশে বাস করে শুধু এই কারণে এ-দেশের লোক বাঙালি তা নয়, আবহমানকাল যাবৎ বাঙালি নামে পরিচিত বলেই তারা বাঙালি। অধিকন্তু বাংলা তাদের মাতৃভাষা বলেও তারা বাঙালি। বাঙালি শব্দটা মূলত অসাম্প্রদায়িক, কিন্তু ইতিহাসে একপর্যায়ে বেশকিছু সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। 'আপনি বাঙালি না মুসলমান'–এ ধরনের প্রশ্নে তার প্রমাণ ধৃত হয়ে আছে। তারপর অনেক সাধনায় ঐ মাসিকতা মসৃণ হয়ে আসে এবং শব্দটি অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী অভিধা লাভ করে। কিন্তু এই ইতিহাসকে কেউ পাল্টাবার চেষ্টা করছেন। 'বাঙালি' কথাটা বর্জন করে এ রাষ্ট্রের নাগরিককে 'বাংলাদেশী' বলার পেছনে আছে অনেকখানি আত্ম-অবিশ্বাস, সার্বভৌমতার প্রশ্নে আছে সংশয়, জাতীয়তার ধারণায় অনিশ্চয়তা।(হক, ২০১২:১০৬)।

তিনি যথার্থ অনুধাবন করেছিলেন 'বাঙালি' নামটি নিয়ে 'বিতৃষ্ণার' কারণ– পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেও বলা হয় বাঙালি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদেরকে বাঙালি বলার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের অধিবাসীদের জাতীয়তা পরিবর্তনের বিষয়টির আরও গভীরে গিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের মূল উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করেছেন–

> গত চল্লিশ বছরে বর্তমান বাংলাদেশ নামক ভূ-ভাগের নাগরিকদের জাতীয়তার ধারণায় ছিল প্রথমে উপমহাদেশের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতা, তারপর পাকিস্তানের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা, তারপর আরও দু-একটি ছোটখাটো ধাপ অতিক্রম করে বাংলাদেশের চতুঃসীমার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তা। সাম্প্রতিককালে পুনরায় সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। জাতীয়তায় এ-দেশের মানুষ ছিল প্রথমে ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানি এবং বাঙালি, এখন বাংলাদেশী। (হক, ২০১২:১০৮)

এই বিস্রস্ত-অসংহত জাতীয়তা চেতনার বিপদ সম্পর্কে আবদুল হক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন 'একটা জাতি না হয়ে ওঠায় বাঙালিকে অতীতে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে, ভবিষ্যতেও দিতে হবে' (হক, ২০১২:১০৮)। তবে

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল হক বাঙালি ও বাংলাদেশি জাতীয়তা বিতর্ক অবসানে কোন সমন্বিত চিন্তার কথা বলেননি, যেমন– জাতীয়তায় বাঙালি, নাগরিকত্বে বাংলাদেশি অথবা সংস্কৃতিতে বাঙালি। বিষয়টি এজন্য হতে পারে যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং গণমনে কখনও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ একচ্ছত্র হয়ে উঠেনি। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিষয়টি কিছুকাল বিতর্ক সৃষ্টি করলেও অচিরেই তা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক সমর্থন হারায়।

২.২.৩

বাঙালি সামরিক জাতি নয় একথা আবদুল হক অযৌক্তিক মনে করেন না। তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা বিবেচনায় সামরিক জাতি বলতে হানাহানি, রক্তপাতে অভ্যস্ত সর্বদা সশস্ত্র সমাজ যারা স্বদেশের জন্য বা ভাড়ায় বিদেশের জন্য অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত থাকে এমন জাতিগোষ্ঠীকে বোঝায়। বাঙালি কখনও তা নয় কারণ যুদ্ধ করা তথা অস্ত্রচালনা বাঙালির পেশা ছিল না কোনকালেই। এটা বাঙালির স্বভাবজাত নয় নানাবিধ ভৌগোলিক কারণেই এই চারিত্র্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু বাঙালি যুদ্ধ করতে জানে না বা পারে না কিংবা বাঙালি ভীরু এসব তথাকথিত অপবাদ মুছে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বীরত্বপূর্ণ বিজয়। একে বাঙালি জাতির রূপান্তর আখ্যা দিয়েছেন আবদুল হক। কিন্তু আবদুল হক এই রূপান্তরের কারণকে কেবল যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাঁর চিন্তাকে আরও গভীরে প্রসারিত করে মূল কারণ সন্ধান করেছেন। তাঁর ভাষায় 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং আগ্রাসনের মুখে স্বদেশরক্ষায় দেশপ্রেম এবং জ্বলন্ত দেশপ্রেমই প্রধানতম অস্ত্র' কারণ 'যে-কোন আদর্শে উদ্দীপ্ত হলে খর্বকায় শীর্ণদেহ তরুণও ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে পারে ; দেশপ্রেম এবং আদর্শের অভাবে দীর্ঘদেহী সুপুষ্ট তরুণ মাংসপিণ্ড মাত্র' (হক, ১৩৮১:১৮২)। কিন্তু দেশপ্রেমই একমাত্র অস্ত্র নয়, রণনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও যে-কোনো যুদ্ধে প্রধান অস্ত্র, সেই সঙ্গে কূটনৈতিক প্রজ্ঞা। এর যে-কোনটির অভাবে সংগ্রামী বাহিনী পরাভূত হতে পারে' (হক, ১৩৮১:১৮২)। তারপরও আবদুল হক দেশপ্রেমকেই এগিয়ে রাখেন কারণ দেশপ্রেম বা কোনো আদর্শের তীব্র আকর্ষণ ছাড়া এসব অস্ত্র বেশী কাজে আসবে না। (হক, ১৩৮১:১৮২) এক সময়ের রণকুশল জাতি আরেক সময়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ইতিহাসে এমন উদাহরণ প্রচুর। সুতরাং ব্যক্তিস্বার্থ বা ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতিই পারে ইতিহাসে টিকে থাকতে। আবদুল হক মনে করেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি প্রমাণ করেছে রণলোলুপ সামরিক জাতি সে নয়, কিন্তু দেশের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করতে সে সক্ষম।

মুক্তিযুদ্ধের পর কষ্টার্জিত স্বাধীন দেশে শান্তি-স্বস্তির বদলে দুর্নীতি-লুটপাট, কালোবাজারী, মুনাফালোভী অসৎ ব্যবসায়ীর দৌরাত্ম্য ও রাজনৈতিক হানাহানি বৃদ্ধির কারণে কাঙ্ক্ষিত শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই প্রতিকারহীন অবস্থা ক্রমে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে হতাশায় নিমজ্জিত করলে সমাজের কিছু মানুষের চিন্তায় আবারও পাকিস্তানবাদী ধ্যান-ধারণা ফিরে আসে। আবদুল হকের মতে, এদের মধ্যে কিছু মানুষ সবসময়ই সচেতনভাবে পাকিস্তানকেই কামনা করে এসেছে, তারা যুদ্ধোত্তর স্বাভাবিক কষ্টের কাহিনীই মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে-শুনিয়ে হতাশা বাড়ানোর সুযোগ নিচ্ছিলো আর কিছু মানুষ প্রকৃতই সার্বভৌম বাংলাদেশ চেয়েছিল–

> কিন্তু এ-দেশের মানুষের প্রতি দরদের জন্য নয়, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য মুনাফার ভাগিদার বড় তরফকে অপসারণ করতে পারলে নিজেদেরই সুবিধে হবে বলে। দেশের হাওয়া বুঝে, প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের দলে এরা ভিড়ে গিয়েছিল। তা-ছাড়া অধঃপতন বলেও একটা ব্যাপার আছে। ঐ ভাগিদার এখন নেই, ওরা তাই মুনাফা লটতে ব্যস্ত। ন্যায় পন্থায় হোক আর অন্যায় পন্থায়, স্বাধীনতার মুনাফা চাই। এদের কাছে রাজনীতি মুনাফার জন্য, আদর্শের জন্য নয়। (হক, ২০১২:১৯৬)।

তারা প্রথম দলভুক্ত তথা স্বাধীনতা বিরোধিদেরকে আরও সুযোগ করে দিয়েছিল এক হতাশাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে। তাছাড়া আবদুল হকের পর্যবেক্ষণে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্ষুদ্র-বৃহৎরাষ্ট্রপুঞ্জের দলাদলিতে টানাটানির পরিস্থিতিও দেশের স্বার্থ ও সম্ভাবনাবিরোধী বলে মনে হয়েছে। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন এসবের পেছনেও বহু মতে বিভক্ত দেশীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে নিজেদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা অথবা নানাভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে বলেই বাংলাদেশের সমাজ জীবনে দুর্দশা বৃদ্ধি, গণমনে হতাশা, সার্বভৌম স্বাধীনতায় আস্থা হ্রাস এবং অরাজকতার ও অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি।

আবদুল হকের মতে সামাজিক মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, নারীর স্থান, নিরাপত্তা ইত্যাদি একটি দেশের সংস্কৃতির অংশ। সেদিক থেকে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সমাজে সাংস্কৃতিক অবনমনের নানা লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছিল। আবদুল হক ছাত্র-রাজনীতিকেও এর সাথে যুক্ত করেন। সাতচল্লিশ-উত্তর কালে শিক্ষাসচেতন ও কৃতি হিন্দু ছাত্ররা ভয়ে ছাত্র-রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়নি, যুক্ত হয়েছে মুসলিম ছাত্ররা।(হক, ১৩৮২:১৯০) কারণ মুসলিম ছাত্ররা বিকাশের অনুকূল পরিবেশে শ্রেণি সচেতন হয়ে উঠছিল।

২.২.৪

বিশ্বব্যাপী তুমুল জনপ্রিয় ও প্রবাদতুল্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর দেবত্ব আরোপের ঐতিহাসিক পরিণতি শুভ হয়নি। তাদেরকে অতিমানবীয় বিবেচনা করাও ইতিহাসের শিক্ষা নয়। ইতিহাস বরং শিক্ষা দেয় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, স্ট্যালিন, মাও-সে-তুঙের মতো নেতাদেরকে মহান কীর্তিসত্ত্বেও সময়ান্তরে দোষ-ত্রুটি-ব্যর্থতার দায় নিতেই হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষ করে কমিউনিস্ট বিশ্বে চীন-সোভিয়েত নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন এবং বিপরীত দিকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের কূটচাল দেশে-দেশে রাজনৈতিক সম্পর্কের যে জটিল-স্বার্থান্ধ অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে ঔচিত্য-অনৌচিত্য, করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে কোন সুস্থির নৈতিক বা একরৈখিক ধারণায় পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ফলে একসময়ের দেবতাতুল্য নেতা সময়ান্তরে হয়েছেন অপাংক্তেয়, পরিণত হয়েছেন নিন্দা ও সমালোচনার বিষয়ে। তাদের বাণীও হয়েছে কোথাও বর্জিত কোথাও কেবল 'স্মরণীয়, পালনীয় নয়।' আবদুল হক ইতিহাস ও কালের অনিবার্য পরিণতির দার্শনিক মীমাংসা দিয়েছেন এভাবে–

> পদার্থের প্রকৃতি বুঝে উঠতে পারলে বিজ্ঞানী হয়তো পদার্থঘটিত যাবতীয় ঘটনা নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন, কিন্তু মানবসমাজ নিরন্তর পরিবর্তিত হবে অনির্দেশ্য মানবমন এবং তার পরিপার্শ্বের অবিশ্রাম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। এর একটা প্যাটার্ন থাকে, কিন্তু সে-প্যাটার্নও নিরন্তর পরিবর্তিত হয়। চিরপরিবর্তনশীল সমাজের জন্য কোনো অপরিবর্তনীয় ফর্মুলা উদ্ভাবন করা সম্ভব বলে মনে হয় না। মানুষের আদর্শের ব্যাপারে নানা প্রশ্ন এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রশ্ন তাই হয়তো চিরকালই থেকে যাবে। (হক, ২০১২:১৩০)

'All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand' – শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটক থেকে লেডি ম্যাকবেথের এই সংলাপ উদ্ধৃত করে দেশে দেশে হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা বদলের অগ্রহণযোগ্যতা ও বর্বরতার বিপক্ষে আবদুল হক তাঁর অভিমত দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন হত্যা বা সামরিক শাসন দিয়ে কখনও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় না, দেশের উন্নতির জন্যও তা কোন পদ্ধতি হতে পারে না। তাঁর এই আপত্তি কেবল মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয় রাজনৈতিক বিবেচনায়ও। (হক, ২০১২:১৩৪)। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবার-স্বজন হত্যা এবং ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলকে হত্যার রাজনীতি আখ্যা দিয়ে সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে এর অবসান হওয়া উচিত বলে মত ব্যক্ত করেছেন আবদুল হক। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহল থেকে যেসব যুক্তি দিয়ে এসব ঘটনার সমর্থন বা প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল মূলত তা-ই ও প্রবন্ধের আলোচ্য। তবে আবদুল হকের এই প্রত্যয়ও অমূলক ছিল না যে, 'অনুন্নত দেশেই (এবং কোনো কোনো উন্নত দেশেও) রাষ্ট্রনায়কেরা বলে দিতে চান ইতিহাসে কী লিখতে হবে এবং কী লিখতে হবে না। কিন্তু ইতিহাস শেষ পর্যন্ত সে সব কথায় কর্ণপাত করে না।' বিশেষ করে শেখ মুজিবকে 'বাংলাদেশের পৌনে দুহাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম বাঙালি রাষ্ট্র-স্থাপয়িতাদের অন্যতম' অভিমত দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য তাঁর ত্যাগ ও অনন্যতার কথা বর্ণনা করেছেন আবদুল হক। পনেরই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক পটভূমি ও পরবর্তী প্রেক্ষাপট আলোচনায় তাঁর নির্মোহ-নির্দলীয় মত প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৫
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম বাংলায় লেখা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর করা হয়। বিজয় দিবস, সংবিধান দিবস এবং বাংলা ভাষার এই বিশেষ দিনে আবদুল হক বিপুল আশা নিয়ে জাতির ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছেন 'বাংলা ভাষা : সংকট ও সম্ভাবনা'। বাংলা ভাষার প্রকৃত বিকাশ পশ্চিমবঙ্গে নয় বাংলাদেশেই হবে এই সম্ভাবনা তখন অপ্রতিরোধ্য। কারণ বাংলাদেশে বাংলা ভাষা অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই ভাষার ঐতিহ্যে যোগ হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসক-শোষককে পরাভূত করে স্বাধীন দেশ গঠনের দু'দুটো সংগ্রামের গৌরব। আবদুল হক আশা প্রকাশ করেছেন ভাষার দুর্বলতা ও অপব্যবহার দূর করে ভাষাকে সর্বতোমুখী করার মাধ্যমে এর প্রকাশ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করবে তরুণ প্রজন্ম।

প্রত্যেকটি মানুষের একটি পারিবারিক ও সামজিক পরিচয় ও ভূমিকা রয়েছে। যদি সে তা-থেকে বিস্মৃত হয় তাহলে আত্মপরিচয় সংকটে ভুগতে থাকে। কারণ মানুষ শুধু মাতৃক্রোড়ে জন্মলাভ করে না, দেশ ও ভাষার কোলেও তার জন্ম। বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে এই উপলব্ধির সংকট তীব্র কারণ স্বদেশ ও স্বভাষা নিয়ে বাঙালি মুসলমানের উদ্বাস্তু মনোভাব পুরনো এবং সুবিদিত। আবদুল হকের এই বক্তব্য কয়েকটি প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়। আসলে তাঁর স্বদেশ ভাবনারই অংশ এটি। তবে বাংলা ভাষার প্রতি এক শ্রেণির শিক্ষিত বাঙালির উদাসীনতা যে তাচ্ছিল্যের পর্যায়ে চলে গেছে 'ভাষা স্বদেশ সত্তা' প্রবন্ধে সে সম্পর্কে খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন তিনি। যদিও প্রবন্ধটির প্রেক্ষাপট ছয়ের দশকে বাঙালি জাতীয়তার দ্বন্দ্বসংকুল সময়, তথাপি এর বিষয়ের গুরুত্ব ও বাস্তবতা আজও অমলিন। স্বাধীনতা-পূর্বকালে যেমন উত্তরকালেও তেমনি সমাজের একশ্রেণির মানুষ মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার হীনম্মন্যতা ত্যাগ করতে পারেনি। বাংলায় কথা বলাকে তারা শুধু 'অজ্ঞতার লক্ষণ' বা 'মর্যাদাহানিকর' মনে করতেন না, এর মধ্যে তাঁরা 'অশুভ ইঙ্গিত'ও খুঁজে পেতেন। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে এই অশুভ ইঙ্গিত যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিবেচনা, তা সহজবোধ্য। কিন্তু বাংলায় কথা না-বলার পেছনে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে যে মানসিকতা কাজ করে তা আজও খুব বেশি বদলায়নি। এর মূল কারণ, আবদুল হকের মতে, নিজকে শিক্ষিত প্রমাণ করা বা শিক্ষিত জাহির করা। আবদুল হক আরও শ্লেষাত্মক ভাষায় বর্ণনা করেছেন– 'অনেকের ধারণা, ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ বলতে পারাই স্মার্ট, কালচার্ড এবং এডুকেটেড জেন্টলম্যানের লক্ষণ' যদিও বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বললেও যে-কেউ ভদ্রলোক হতে পারবেন, তবে ঠিক জেন্টলম্যানের মত নয় (হক, ১৩৮১:১৪৭)। এই মানসিকতার অন্য একটি দীনতর রূপও আছে যা আরও বেশি গ্লানিকর –

> শাদা ইত্যাদি নানা রঙের চামড়ার লোক এ-দেশে কয়েক বছর বাস করেও যদি বাংলা না শেখে তবে সেটা কারো কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না। আমি ভিনদেশে যাই, আমাকে সে-দেশের ভাষার অথবা সে-দেশের লোকের বোধগম্য কোনো ভাষায় কথা বলতে হবে। ভিন-দেশের লোক এদেশে আসুক, অথবা এ-দেশে কয়েক বছর বাস করুক, তবু আমাকে তাদেরই ভাষায়, অথবা তাদের বোধগম্য কোনো বিদেশী ভাষায় কথা বলতে হবে। সবাই আমার কাছে ওটা আশা করে। ওটা আমার দায়– কয়েক শতাব্দী থেকে। কারণ ওরা তো আর বাংলা জানে না। (হক, ১৩৮১:১৪৮)

এই কষ্টবোধ থেকে আবদুল হক শোনান তাঁর মনোভাব, যারা বুঝতে চান না তাদের বুঝিয়ে দেন –

> আমার সমাজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কথা বলতে আমার বাধতে পারে। আমারই মতো বাঙ্গালীর সাথে, মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় আমি কথা বলতে পারি একথা প্রমাণ করতে পারলে তাঁর কাছে আমার মর্যাদা বাড়বে শুধু এই কারণে বিদেশী ভাষায় কথা বলতে আমি গ্লানি বোধ করি। আমি তাই কোনো বাঙ্গালীর সাথে পারতপক্ষে ইংরেজীতে কথা বলি না। (হক, ১৩৮১:১৪৮)

এই প্রগাঢ় দেশপ্রেম এবং ভাষাপ্রীতির কথা আবদুল হকের সংস্কৃতিভাবনার স্বতোৎসারিত ঔজ্জ্বল্য।

সর্বস্তরে বাংলা চালু করার প্রয়াসের মধ্যে ইংরেজিকে কিভাবে বা কতটুকু গুরুত্ব দেয়া উচিত সে ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা কোথাও নেই বলে মনে করেন। ইংরেজির মাধ্যমে যে নতুন চিন্তা ও জ্ঞান ভাষায় প্রবেশ করে তা

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ও সাহিত্য উভয়ের জন্য স্বাস্থ্যকর। বিশেষত উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংরেজির আবশ্যিকতায় সন্দেহ নেই আবদুল হকের। তিনি লিখেছেন–

> যে ভাষা মৃত–যেমন সংস্কৃত ভাষা–একমাত্র সে-রূপ ভাষার সম্পদরাজিই সম্পূর্ণভাবে অনুবাদ করা সম্ভব, ইংরেজির মতো জীবন্ত ভাষার যাবতীয় সম্পদরাজিকে কখনো অন্য কোনো ভাষার মুঠির মধ্যে ধারণ করা সম্ভব হবে না, অধিকাংশই মুঠির বাইরে থেকে যাবে। আর এই কারলেই বিজ্ঞান, মানববিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষিত হওয়ার জন্যে শুধু ঐসব বিষয়ের বাংলা বই পড়াই যথেষ্ট হবে না, রেফারেন্স-এর জন্য সর্বদাই ইংরেজি বইও মনোনীত করতে হবে যথেষ্ট পরিমাণে। অতএব, ক্ষুদ্র পুকুরকে সমুদ্র জ্ঞান করতে না চাইলে পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত ভাষার এবং প্রধানত ইংরেজির চর্চা, এবং ব্যাপক চর্চা, অক্ষুণ্ন না-রেখে উপায় নেই। প্রাজ্ঞ সমাজের একটা স্বীকৃত অভিমত সমাজগুলোর কয়েক শতাব্দী পেছনে পড়ে আছি, এই কারণে আমরা কতটুকু অগ্রসর হতে পারছি তা অন্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে (ব্যাপক অর্থে) সবসময় মিলিয়ে না দেখলে, অন্যের সঙ্গে সবসময় নিজের তুলনা না করলে এবং নিজের মান নির্ধারণ না করলে প্রগতির স্বপ্ন মরীচিকা বলে প্রমাণিত হতে পারে। (হক, ২০১২:১৯৯)

২.২.৬

'আত্মার অমরত্ব', 'চাঁদের মৃত্যু চাঁদের জন্ম' 'মহাবিশ্বে নিঃসঙ্গ-চেতনা' 'চেতনার এলবাম' ইত্যাদি প্রবন্ধে জগৎ-জীবন সম্পর্কে আবদুল হকের দার্শনিক ভাবনার সাথে বিজ্ঞানমনস্কতার চমকপ্রদ মেলবন্ধন পাওয়া যায়। মানবিক অনুভূতি ও মানবীয় চিন্তার সাথে মহাজাগতিক জিজ্ঞাসার রহস্যময়তা এক হয়ে প্রবন্ধগুলিতে তন্ময়াবিষ্ট রোমাঞ্চকর অনুভূতির রসসঞ্চার করেছে। আবার মহাজাগতিক অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব ভাবনার মধ্যে বিশ্বব্যাপী মারণাস্ত্রের হুংকারে বিপন্ন মানবজাতির সঙ্কট তথা লেখকের যুদ্ধবিরোধী চেতনাও পরিস্ফূটিত হয়েছে[১১]। এসব প্রবন্ধে তাঁর চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ততার কারণে ভাষাও প্রবহমান এবং কাব্যিক। এসব প্রবন্ধে তার বক্তব্য কেবলই আত্মগত এবং কিছুটা ভাবগতও। ফলে সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর-খোদাভাবনা, ইহাকাল-পরকাল ইত্যাদি দার্শনিক বিষয়ের সাথে অবলীলায় যুক্ত হতে পেরেছে নিঃসীম মহাবিশ্বের কথা, অনন্তকালের সাথে মানুষের ইহকাল-পরকালের বোঝাপড়া, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, বিগব্যাং, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, অথবা মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা-না-থাকা নিয়ে যুক্তিবাদী ও ভাববাদীর পরস্পরবিরোধী দাবি। যেমন পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবকে 'আকস্মিক' এবং 'নিয়মের মধ্যে একমাত্র অনিয়ম' উল্লেখ করে আবদুল হক বলেছেন–

> ঝিনুক থেকে মুক্তা হয়, কিন্তু সব ঝিনুক থেকে হয় না। কোনো-কোনো ঝিনুকে এক ধরনের বিকৃতি দেখা দিলে মুক্তার জন্ম হয়। এই-যে বিকৃতি এবং তা থেকে মুক্তার জন্ম এ হচ্ছে একটা অনিয়ম। কিন্তু এই অনিয়মের নিয়ম আছে। সৌরজগতে মানুষের জন্ম এমনি একটা অনিয়মিত নিয়ম। তবে তফাৎ এই যে অনিয়ম হলেও যেখানে হাজার হাজার ঝিনুকের মধ্য থেকে মুক্তার জন্ম হয় সেখানে সৌরজগতে মাত্র একবারই চেতনাসম্পন্ন প্রাণীর জন্ম, এবং এটা খুবই সম্ভব যে হাজার হাজার ছায়াপথের মধ্যে শুধু আমাদের ছায়াপথেই ঐ একটিমাত্র মুক্তার জন্ম হয়েছে, নিয়মের মধ্যে অনিয়ম হিসেবে তার আবির্ভাব। (হক, ২০১২:৩৭)

এই চিন্তায় বিজ্ঞান আছে, দার্শনিকতাও আছে। আবদুল হক তাঁর কল্পনাকে আরও প্রসারিত করেন। তাঁর মতে, এই আকস্মিক উদ্দেশ্যহীন অনিয়মের ঘটনা এত অসংখ্য আকস্মিক ব্যাপারের সমন্বয়ের ফল যে 'অতগুলি আকস্মিক ব্যাপারের একসাথে ঘটার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি' (হক, ২০১২:৩০)। এমন মন্তব্য দৈবকে সমর্থন করার মতো মনে হলেও আবদুল হকের এই ধারার চিন্তায় প্রকৃতপক্ষে দার্শনিকতার চেয়ে বিজ্ঞানমনস্ক জিজ্ঞাসাই প্রবল বলে আমাদের মনে হয়। তবে তাঁর কল্পনা যুক্তিতে নয় ভাষাতে প্রাণ পায়; যেমন বিশ্বসৃষ্টিতে বস্তু ও চেতনার এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক উদ্ঘাটন করে আবদুল হকের কাব্যিক জিজ্ঞাসা–

> বস্তুময় লক্ষ্যহীন মহাবিশ্বে চেতনার লীলা–তা যত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষণকালীনই হোক–এক অপরূপ দৃশ্য। বস্তু থেকে উদ্ভূত হয়েও চেতনা প্রকৃতিতে বস্তুবিরোধী–আবার বস্তুই তার অবলম্বন, বস্তুর অবলম্বন ব্যতীত চেতনা সম্ভব নয়। বস্তু থেকে উদ্ভূত হয়ে বস্তুতেই তার চরম পরিণতি। বস্তু অপরূপ রূপে রূপময়–তাকে একমাত্র সে-ই নিরীক্ষণ করে, তাকে চিন্তা-অনুভব-কল্পনা-স্বপ্ন দিয়ে ঘিরে রাখে– আর কেউ নয়। তাকে এভাবে নিরীক্ষণ করার আর কেউ নেই। আর আছে একটি প্রস্ফুটিত ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকার, তারপর সেই ফুল তুলে ঘ্রাণ নেওয়ার, ফুল দিয়ে কোনো প্রিয় বস্তু সাজিয়ে রাখার, কোনো প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার? মহাবিশ্বে আর কোথায় এমনটি ঘটে থাকে? কোথায় আর আছে ঐ ফুল, মেঘ,

Dhaka University Institutional Repository

> সুর্যোদয়, চন্দ্রালোক, বজ্রধ্বনি–যে অনুভব জাগ্রত করে তাকে ছন্দোময় কবিতায়, কবিতাময় গদ্যে, বহুবর্ষ চিত্রে ধরে রাখার বাসনা? (হক, ২০১২:৩২)

১৯৬১ সালে সোভিয়েত নভোচারি ইউরি গ্যগারিনের চাঁদের কক্ষপথ পরিভ্রমণের পর চাঁদে যাওয়ার জন্য মানুষের আগ্রহের সংবাদ আবদুল হকের চিন্তায় 'কবি-চোখের চাঁদ-দেখা' এবং 'বিজ্ঞানী-চোখের চাঁদ-দেখা' নিয়ে ভিন্ন বোধের জন্ম দিয়েছে। কবির চিন্তায় চাঁদ অনেকরূপে ধরা পড়ে কিন্তু সেই অপূর্ব ক্ষমতা বিজ্ঞানীর নেই– এমনটি প্রমাণ করতে আবদুল হক বাংলা ও ইংরেজি কবিতায় ব্যবহৃত চাঁদের সৌন্দর্যের নানা কাব্যিক উদাহরণের সাথে জোর্তিবিজ্ঞানীর টেলিস্কোপে দেখা 'বসন্তরোগীর মুখের মত' চাঁদের তুলনা করে বিজ্ঞানী-চোখের চাঁদ সম্পর্কে লিখেছেন–'যে-কোনো একদিন জ্যোস্নালোকিত রাত্রে চাঁদের দিকে তাকালে অনায়াসে যা দেখা যায় তার চেয়ে কত নিকৃষ্ট এই দেখা' (হক, ২০১২:২৫)। তবে তাঁর এমন রচনা ব্যতিক্রমী শুধু নয়, বিশেষ হয়ে ওঠে যখন তিনি বাস্তব আর কল্পনার চাঁদের মধ্যে এক দার্শনিক সমীকরণ উপস্থাপন করেন–

> চাঁদে গেলে যদি সব বর্ণ সব ধর্মের বৈষম্য বিলোপ পায়, যদি মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে, তবেই নতুন চাঁদের জন্ম সার্থক হবে, আর পুরনো চাঁদের হবে পুনর্জন্ম। পুরনো চাঁদ থেকে একটা নব মানবীয় দর্শনের শুভ্র দীপ্তি বিচ্ছুরিত হবে, সে দীপ্তিতে স্নাত হয়ে পবিত্র হয়ে উঠবে নবজাত চাঁদ। তা যদি না হয় তবে অন্তত একটি চাঁদের মৃত্যু হবে এবং সে মৃত্যুতে সংক্রামিত হবে আরেকটি চাঁদ। (হক, ২০১২:২৭)

২.২.৭

আবদুল হক মানুষ ও সমাজের প্রগতিতে বিশ্বাসী – প্রগতিশীলতার ধর্মে আস্থাবান। বিশেষত প্রকৃতিকে করায়ত্ত করে সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলার যে-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা তাকে ইতিবাচক ও আশাসঞ্চারী মনে করেন তিনি। কিন্তু এসবের মধ্যেও পারমাণবিক বোমার আতঙ্ক, যুদ্ধ, কালোবাজার, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা মনুষ্যত্বের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও পুনর্নীরিক্ষা করার দাবি জানায়। তথাপি এ কথাই যথার্থ যে, 'মানুষ নিরন্তর তার ত্রুটিপূর্ণ জীবনযাত্রার সংস্কার করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবনলাভের দিকে'(হক, ১৯৬৮:১৮৫) মানুষ এভাবেই জীবনকে সংস্কৃত করে, কিন্তু জীবন সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ ধারণা তার নেই। তাই মানুষ যুগে যুগে শরণাপন্ন হয়েছে পয়গম্বর, প্রতিভা বা যুগস্রষ্টার– যাঁরা মানুষকে জীবন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা বা পথনির্দেশ দিতে পারেন। কারণ তাঁদের দৃষ্টি ও ক্ষমতা সাধারণের চেয়ে প্রসারিত। কিন্তু মানবজীবনের অগ্রগতির এই ধারার সাথে আধুনিক প্রগতিবাদী ধারার পার্থক্য অনেক। প্রকৃতি ও সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ও ভয় থাকায় মানুষের মননধারাকে একসময় নিয়ন্ত্রণ করতো ধর্ম। কিন্তু সেই ভয় ও বিশ্বাস ক্রমে ভেঙে গেছে প্রকৃতির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব বৃদ্ধির সাথে, ধর্মের রূপান্তর হয়েছে– হয়েছে মানুষের জীবনেরও পরিবর্তন। আবদুল হক মনে করেন, ধর্ম ছাড়াও মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে তাঁর কৃতকার্যতা-বিফলতার বাস্তবজ্ঞান ও ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতা। (হক, ১৯৬৮: ১৮৬) ধর্মনিরপেক্ষ বিচারবৃত্তিই উন্নত সমাজের মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার সমাধান দিচ্ছে। আর নিজের ক্ষমতার ওপর প্রবল আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানুষের চিন্তাধারাকে বস্তুমুখিন করে তুলেছে। মোট কথা, ধর্মের স্থান নিচ্ছে বিচারবৃত্তির প্রাধান্য এমনকি 'নৈতিক কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারিত হয় অভিজ্ঞতা-শানানো বিচারবৃত্তি দিয়ে' ফলে 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত কোনো কোনো মহলে অস্বীকৃত' (হক, ১৯৬৮:১৮৭)।

আবদুল হক ধর্ম ও সমাজপ্রগতির এই চালচিত্র উপস্থাপন করেছিলেন ১৯৪৭ সালে, 'প্রগতি ও ধর্ম' প্রবন্ধে[১২]। ধর্ম সম্পর্কে নিজের বিশ্বাস সরাসরি উপস্থাপন করতে তিনি চাননি, বস্তুত তা আবদুল হকের স্বভাব বিরুদ্ধও বটে, তবে মানবসমাজের সার্বিক অগ্রগতির নির্দেশনাকে চিনে নেওয়াই এই বিশ্লেষণের লক্ষ্য তা বেশ বোঝা যায়। আবদুল হকের ধারণা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে–

> আজকের দিনের নীতিবোধ বিচার-বৃত্তির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও, আকাশ থেকে পড়া কোনো বীজ থেকে মনের ক্ষেতে এর উপ্তি হয়নি। আদিমতম মুহূর্ত থেকেই এই নীতিবোধ মানুষের মনে ছিল, কমবেশী ঘুমিয়ে। প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানস-প্রকৃতির পরিবর্তন এবং বিচার-বৃত্তির প্রবলতর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই নীতিবোধ বিকশিত হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

Dhaka University Institutional Repository

> এর বিকাশের সহায়তা করেছে অনেক-কিছু : রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনসমূহ। উদাহরণঃ চুরি-ডাকাতি, হত্যা, মিথ্যাকথন ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়েছে বাইরের শক্তিগুলো দিয়ে। সৎজীবন যাপন, দয়া প্রদর্শন, সদ্ব্যবহার প্রদর্শন ইত্যাদি আদিষ্ট ও অনুমোদিত হয়েছে বাইরের শক্তিগুলো দিয়ে। (হক, ১৯৬৮:১৮৮)

আবদুল হক মনে করেন, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই তার নীতিবোধের মূলকথা– নীতিবোধ সংশ্লেষিত জীবনবোধের সাথে। আর আজকের যুগে অথবা 'প্রগতি ও ধর্ম' প্রবন্ধের সমসময়ে, জীবনবোধের সাথ শুধু ব্যক্তি নয় বৃহত্তর অর্থে সমষ্টি তথা মানবতাবোধও সম্পৃক্ত। এভাবে আবদুল হক সভ্যতার ধারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষের আদিম বিশ্বাস-ভীতি ধর্মবোধে এবং ধর্মবোধ ক্রমোত্তীর্ণ হয়ে মানবতাবোধে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে তাতে ধার্মিক মানুষ বা ধর্ম না থাকার কোনো কারণ ঘটেনি বলেই তার বিশ্বাস। কারণ 'মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য যখন সত্য, পৃথিবীতে সব রকম লোকের জন্মই যখন সম্ভব, তখন মনে হয়, ধার্মিক লোকেরও অভাব কোনো দিন হবে না' (হক, ১৯৬৮:১৯০)।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ সাহিত্যভাবনা

আবদুল হকের প্রবন্ধের মধ্যে বিষয় বিবেচনায় সাহিত্য বিষয়ক রচনাই সর্বাধিক। তাঁর সাহিত্যভাবনা স্বদেশ ও সমাজ ভাবনার সমান্তরালে বিকশিত। যুগপ্রভাব এবং রাজনৈতিক বাস্তবতাই এর কারণ। বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলায় যাঁরা সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন কিংবা যারা ঔপনিবেশিক শাসনের কালকে সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় নিয়েই নতুন দৈশিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় পদার্পণ করেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলের চিন্তায় ও সৃষ্টিশীলতায় ধর্ম-সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা গুরুত্ব পেয়েছিল। আবদুল হকও তার ব্যতিক্রম নন। তাই সমাজ, মাতৃভাষা, মাতৃভূমি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি আবদুল হকের সাহিত্যচিন্তার সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা'[১৩] ১৯৪৪ সালে বি.এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশের অবসরে রচিত। সাহিত্যের বিষয় ও উপাদান, ভাষার সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক, সাহিত্যের মানবিচার, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ধারণ-বর্জন, কৃতি সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে আবদুল হকের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে। 'সাহিত্যিক মূল্যবোধ', 'সাহিত্য ও দেশপ্রেম', 'রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'সাহিত্য-উপভোগ ও সংস্কৃতি', 'সাহিত্যের দিগন্ত', 'সাহিত্য ও সরকার', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'সাহিত্যিকের সমস্য', 'শিক্ষা ও সাহিত্য', 'প্রত্যয়ের সাহিত্য', 'আধুনিক কবিতা', 'সাহিত্য হিসেবে নাটক', 'ইতিহাস-সাহিত্য', 'জাতীয় চরিত সাহিত্য', 'কালের প্রেক্ষণা', 'মূল্যায়নের মরীচিকা' ইত্যাদি প্রবন্ধে আবদুল হকের সাহিত্য বিষয়ক মতামত বিধৃত হয়েছে। এছাড়াও তিনি সাহিত্য-প্রতিভা ও সাহিত্যকর্ম মূলায়নধর্মী বেশ কিছু নিবন্ধ রচনা করেছেন। মূল্যায়নের বিশেষত্বে এসব নিবন্ধ যতটা গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব সাহিত্যভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে ততটা নয়। তবে এসব নিবন্ধের কেন্দ্রে যে ব্যক্তিত্ব বা সৃষ্টিকর্ম থাকে তা লেখকের শিল্পী-মানস নিরূপণে সহায়ক হতে পারে এমন বিবেচনা অযৌক্তিক নয়।

২.৩.১

১৯৪৭ সালে ধর্মসম্প্রদায়ভিত্তিক দ্বিজাতি-তত্ত্বের আলোকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারতে বিভক্ত হয়। ফলে বিভাগোত্তর পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলার সাহিত্য অখণ্ড বাংলার ব্যাপকতর পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সংকীর্ণ প্রতিবেশে স্থাপিত হলেও, স্বতন্ত্র ও নতুন ধারার সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু ক্রমশ সৃষ্টিশূন্যতা গ্রাস করেছিল এই ধারাকে। যে পরিবেশ নতুন চেতনা ও মূল্যবোধের জন্য বৈপ্লবিক ও জাগরণমূলক হতে পারতো সেই পরিবেশে স্থবিরতা দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছিল বলে মনে হয়েছে আবদুল হকের। রেনেসাঁর লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিক্ষমতাকে মুক্ত করা, দুঃসাহসিকতায় অনুপ্রাণিত করা, বিচিত্র ধারায় উৎসারিত করা– পরিণত হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণে। আবদুল হকের মতে, সাহিত্য ক্ষেত্রে এই স্থবিরতার সামাজিক কারণ সাতচল্লিশোত্তর সেই সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে সাহিত্য-সচেতন ছিল না, সৃষ্টির প্রবল উদ্যম ছিল না সাহিত্যিকদের মধ্যে। এই অভিযোগ সময়ের প্রায় সব সহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীই করেছেন, তবে এর কারণ খুঁজতে ততটা নিবিষ্ট ছিলেন না কেউ। আবদুল হক এই বন্ধ্যাত্বের কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখেছেন, এসময়ের সাহিত্য-চিন্তায় এমন কতগুলি প্রবণতার অস্তিত্ব রয়েছে যা সাহিত্যের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির জন্য কল্যাণকর নয়। যেমন–

এক. 'রেজিমেন্টেশনের প্রয়াস'[১৪] যার জন্য সাহিত্যিক সমাজের একাংশ নিজেরাই দায়ী।

দুই. মানবিক মূল্যবোধের 'অপঘাত-মৃত্যু' যা লেখকদের মানসিক স্থৈর্যকে পীড়িত করেছে। আবদুল হক লিখেছেন–'মানবিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, সর্বপ্রকার মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সংগে সংগে সাহিত্যিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এই অবক্ষয় প্রকাশ পেয়েছে শিল্পাদর্শের পরিবর্তে শিল্পচেতনাহীন আদর্শ ও রেজিমেন্টেশনের প্রতি পক্ষপাতের আকারে'(হক, ১৯৬২:১৭)।

তিন. নিষ্ঠার সাথে সাহিত্যাদর্শের সাধনা করার মতো স্বাধীন পরিবেশের অভাব। এই সমস্যাকে আবদুল হক রাজনৈতিক সমস্যা বলেছেন, নন্দনগত নয়। স্পষ্টত তিনি পাকিস্তান আমলের সামরিক শাসনের

Dhaka University Institutional Repository

বিধি-নিষেধের মধ্যে থেকে ফরমায়েশি সাহিত্য রচনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যখন শব্দ ব্যবহার, আদর্শ বা বিষয় নির্বাচন সবই কঠোর কণ্ঠে ও নিরাপোস ভঙ্গিতে বলে দেয়া হত।

চার. প্রচলিত অভিজ্ঞতা, অনুভব ও চিন্তার বিদ্রোহী সাহিত্য রচনার নিষেধাজ্ঞা। আবদুল হক বিদ্রোহী সাহিত্য বলতে অবরুদ্ধ সমাজের মুক্তির জন্য যে সাহিত্য প্রয়োজন তার কথা বলেছেন।

পাঁচ. ধর্মাশ্রয়ী শুচিবায়ুগ্রস্ততা সমসাময়িককালের সাহিত্যচর্চায় ছিল নিয়মিত বাধা। তবে এর সঙ্গে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রশ্নও জড়িত আছে বলে মনে করেন আবদুল হক। অন্যত্র তিনি এই সমস্যাকে 'পিউরিটানিজম' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এর প্রধান কারণ যুক্তিবাদের দুর্বলতা ও চিন্তার জড়তা। নজরুলকে কাফের ঘোষণা, ভাষাকে বিধর্মী প্রভাব থেকে মুক্ত করার ব্যস্ততা পিউরিটান মানসিকতার পরিচায়ক।

ছয়. আত্মসমালোচনার অভাবও তৎকালীন সাহিত্য-প্রয়াসের আরেকটি দুর্বলতা। যে-কারণে কোন সমালোচনা সাহিত্যও গড়ে ওঠেনি। তবে আবদুল হকের মতে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের আগে সমালোচনা সাহিত্যের উদ্ভব হয় না।

সাত. সচেতন বা অচেতন 'অসাহিত্যিক সমঝদারি'[১৫]।

সাহিত্যের মধ্যে আবার সৃষ্টিশীল লেখকের উদ্যম ও প্রেরণা ফিরিয়ে আনতে অবক্ষয়ের এসব লক্ষণ দূরীভূত করতে হবে বলে মনে করেন আবদুল হক। তাঁর মতে এজন্য প্রয়োজন আমাদের সাহিত্য-চিন্তার সংস্কার, শিল্পচেতনার চর্চা, সুস্থ সাহিত্যিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা।

পরাধীন মনোবৃত্তির উত্তরাধিকার হচ্ছে দেশ ও ভাষার প্রতি অবজ্ঞা, জাতীয় মর্যাদাবোধের অভাব এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের পরিচয়। আবদুল হক বাঙালির জাতিগত দৈন্যের পরিচয় দিয়ে বলেন, আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কারণেই আজও ইংরেজি শিক্ষিতরাই প্রকৃত শিক্ষিত বলে পরিচিত হয়, স্বাধীন দেশে এখনও চালু থাকে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল। কতিপয় বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে আবদুল হক তীর্যক ভাষায় লিখেছেন–

> পারি বা না পারি আমরা শুদ্ধভাবে আরবী উচ্চারণের এবং আরবী বানান লেখার চেষ্টা করি, আমরা অবাঙালীত্বের গন্ধ পেলেই উর্দুতে কথা বলতে চাই এবং শুভ্র চর্ম অথবা নিখুঁত ইউরোপীয় লেবাস দেখলেই আমাদের মুখে ইংরেজী বুলি ফোটে। নজরুল নামের সুপরিচিত বর্গীয় 'জ' শুদ্ধ অথবা অন্তস্থ 'য' শুদ্ধ, 'খারাপ' শুদ্ধ অথবা 'খারাব' শুদ্ধ, এমনিতরো গবেষণায় আমরা অক্লান্ত। ব্যাকরণের নিয়ম জানা সত্ত্বেও আমরা কখনো যদি ইংরেজী বলতে লিখতে গিয়ে ভুল করে বসি তাহলে লজ্জায় মরে যাই। কিন্তু বাংলা ভাষার বেলায়? তখন তেমনি ভুল করে বসলে এইসব শুদ্ধচারীই অম্লান বদনে বলেন, "বাংলা ভাষায় আমি তো ভালো লিখতে-বলতে পারিনে!" একেই বলে হীনমন্যতা। দেশপ্রেম এবং জাতীয় সম্ভ্রমবোধের অভাব থেকেই এ মনোবৃত্তির জন্ম হয়।(হক, ১৯৬২:২৭)

আবদুল হক মনে করেন 'নিজের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিমুখতা,– হীনমন্যতা এবং জাতীয় সম্ভ্রমবোধের অভাব থেকে এবং এমনকি দেশপ্রেমের অভাব' (হক, ১৯৬২:২৮) থেকে এমন মানসিকতার উদ্ভব। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও প্রীতির আন্তরিক উচ্চারণ আবদুল হকের আবেদনে প্রস্ফুটিত হয়–

> আজকের শিক্ষিত সমাজের মনোবৃত্তির অবসান, শিক্ষিত সমাজের যে শীতল প্রস্তরকঠিন ঔদাসীন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অপাংক্তেয় করে রেখেছে সেই ঔদাসীন্যের অবসান। এজন্যে কেবল সাহিত্যের নিজস্ব আবেদন থাকাই যথেষ্ট নয়, সর্বব্যাপী দেশপ্রেমেরও প্রয়োজন, যে দেশপ্রেম মানুষকে বিদেশের বিভ্রান্তিকর ঔজ্জ্বল্য থেকে বাঁচিয়ে বারবার দেশের ধূলিময় অন্তরঙ্গতায় ফিরিয়ে আনে । নিজের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধ দেশপ্রেমেরই একটা স্নিগ্ধ ও সংস্কৃতিময় প্রকাশ। (হক, ১৯৬২:২৯)

ইতিহাসের শিক্ষাই এমন যে, লেখনী চালনায় বা শিল্পকীর্তি স্থাপনে অথবা সংস্কৃতির প্রসারে অবদান রাখা রাজনৈতিক নেতার অনেক দোষ-ত্রুটি মানুষ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে, তাঁকে সম্মান দেয়। তাই রাজনীতিবিদের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা থাকলে ইতিহাসে স্থান পাওয়ার জন্য অব্যর্থ উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি একদিকে রাজনৈতিক নেতার জন্য আত্মশুদ্ধি অন্যদিকে সৎকাজের মতো মূল্যবান। তাই আবদুল হক মনে করেন 'জাতি ও রাষ্ট্র পরিচালনের গুরুভার যাঁদের স্কন্ধে ন্যস্ত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা তাঁদের জন্যে একান্ত বাঞ্ছনীয়' (হক, ১৯৬২:৩৩)।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের পাঠক হতে অথবা সহিত্যকে উপভোগ করতে হলে সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে নিতে হবে। এর জন্য পাঠক বা আস্বাদনকারীর উপযুক্ত শিক্ষা, রুচি এবং রসবোধ থাকা জরুরি বলে মনে করেন আবদুল হক। তিনি মনে করেন

> যাঁদের চিন্তায় ও অনুভবে নীতিবাদ ধর্মবাদ অথবা নানা রকমের গোঁড়া রাজনৈতিক আদর্শের একান্ত এবং সার্বভৌম আধিপত্য এবং যাঁরা শুধু এইসব "বাদ"-এর অথবা রাজনৈতিক আদর্শের গজকাঠিতে সাহিত্যের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে উৎসাহী তাঁরা সাহিত্যের প্রকৃত নীতিবাদী অথবা ধর্মবাদী অথবা রাজনৈতিক আদর্শবাদী বলে দাবি করতে পারেন না, তেমনি কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত পালন না করলে কেউ প্রকৃত রসজ্ঞ সাহিত্য-পাঠক হতে পারেন না।(হক, ২০১২:১৪৭)

ঠিক একই ভাবে সাহিত্য যিনি উপভোগ করার সামর্থ্যও রুচিবান বা সংস্কৃতিবানের লক্ষণ। যেহেতু, 'সংস্কারমুক্ত সংস্কৃতিবান রসজ্ঞ পাঠকই যথার্থ সাহিত্য উপভোগ করতে পারেন'(হক, ২০১২:১৪৮)। এভাবে সাহিত্য-শিল্প-চিত্রকলা ইত্যাদি রসাস্বাদন-সূত্রে সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবদুল হক লিখেছেন–

> সাহিত্য-উপভোগের রুচি ও সামর্থ্য সংস্কৃতির লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণ চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি বিবিধ ললিতকলা উপভোগের রুচি ও সামর্থ্য, উন্নত মূল্যবোধ, চিন্তা ও অনুভবের সূক্ষ্ম ও মার্জিত আচরণ ইত্যাদি। এইসবের অনুশীলন থেকে যিনি বিরত তাঁকে কেউ সংস্কৃতিবান বলে না। সমাজ সম্বন্ধেও সেই কথা। সমাজের নৈতিকতাবোধ ধর্মানুভূতি অথবা আদর্শবাদ যাই হোক, সংস্কারমুক্ত মনে সাহিত্য ললিতকলা ও বিবিধ শিল্প উপভোগের উপযোগী মানসিকতা ও রুচির অনুশীলন কে কতটা করতে পেরেছেন তা থেকে বোঝা যায় ব্যক্তি এবং তাঁর সমাজ সংস্কৃতির কোন্ পর্যায়ে অবস্থিত। (হক, ২০১২:১৪৮)

সাহিত্যিককে সমগ্রভাবে অবলোকন না করে কেবল একাংশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে বা তাঁর আংশিক সমালোচনা করে তাকে পূর্ণাঙ্গ হিসেবে রূপ দিতে চাইলে সাহিত্যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়। কারণ অংশ কখনও সমগ্রের স্থান নিতে পারে না। সেই চেষ্টা মহৎ প্রতিভাকে খণ্ডিত ও অবমূল্যায়িত করতে পারে আবার 'ব্যক্তির নীতিবোধ রাজনীতি ধর্মনীতি ইত্যাদির বাটখারা' দিয়ে মহৎ প্রতিভাকে ওজন করতে গেলে সেই ব্যক্তির ওজনই ধরা পড়ে বলে মনে করেন আবদুল হক। (হক, ২০১২:১৪৯)

২.৩.২

ভাষা-আন্দোলন পরবর্তীকালেও বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর বিজাতীয় ভাষা-সংস্কৃতির শিকল পরানোর সুদূরপ্রসারী অপচেষ্টা শেষ হয়নি। পাকিস্তানি শাসকের পরিকল্পনায়, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ও তাদের এদেশীয় দোসর সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় বাংলা ভাষাকে কখনও আরবি হরফে কখনও বা রোমান বর্ণে লেখার অপপ্রয়াস চলছিল। ভাষাকে ইসলামিকরণের নামে সংস্কৃত শব্দ-পরিত্যাগ, ইসলামি রূপ-প্রতীকের দেদার ব্যবহার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ইসলাম-বিরোধী আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে প্রচারণা চলতে থাকে। এসময় আবদুল হক একশ্রেণির ভাষা ও ধর্মকে মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে যারা উদ্ভট ও অযৌক্তিক যুক্তিকে বাংলা ভাষার ওপর জবরদস্তি চালাচ্ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে বলেন–বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এমন বিদেশি শব্দের ব্যবহার, তা আরবি-ফারসি যাই হোক, খুবই স্বাভাবিক যদি তা প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু জোর-জবরদস্তি করে তা চালানোর চেষ্টা করা উচিত নয়।[১৬] আরবি-ফারসির প্রয়োগে ধর্মীয় যুক্তির বিপরীতে আবদুল হক বলেন–

> আরবি-ফারসি শব্দ মানেই যে ইসলাম বা ইসলামি তমদ্দুন এবং সংস্কৃত শব্দ মানেই যে হিন্দুধর্ম বা হিন্দু-সংস্কৃতি তাও নয়। তাই যদি হয় তাহলে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগে লিখিত অগ্নিদেবতা-প্রশস্তিকে ইসলামি সংস্কৃতি এবং বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত কলেমা তৈয়বকে হিন্দু-মন্ত্র বলে স্বীকার করতে হয়। বস্তুত অনাবশ্যক আরবি-ফারসি শব্দের জন্য যে-মোহ অনেকের মধ্যে দেখা যায় তা অসঙ্গতই বলতে হবে। (হক, ২০১২:১৫২)

সাহিত্য-সৃষ্টি ও বিচারের বাধ্যতামূলক মানদণ্ড যদি ধর্ম হয় তাহলে তা সাহিত্য হতে পারে না। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সাহিত্যের উদাহরণ দিয়ে আবদুল হকের অভিমত, 'ফরমায়েশ দিয়ে রেজিমেন্টেশন করে প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণির সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়’ (হক, ২০১২:১৫৩)। এ সম্পর্কে আবদুল হকের বিস্তারিত ভাষ্য তাঁর সাহিত্যাদর্শ অনুধাবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ–

> সাহিত্য নিছক সাহিত্য হতে পারে, হওয়া সম্ভব এবং আধুনিক যুগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাই হয়ে থাকে। তার আদর্শ হতে পারে শুধু সুন্দরের ধারণা, শুধু মানবপ্রেম, কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী যে-কোনো মতবাদ। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার বা চিন্তাধারার সঙ্গে এ-সব আদর্শের মিল থাকতে পারে, নাও পারে। যিনি যে ধর্মেরই অনুসারী হোন, প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই আরেকটি ধর্ম থাকে, সেটি সাহিত্য-ধর্ম। যে-মুহূর্তে হাতে কলম থাকে সে-মুহূর্তে এ ধর্মই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়, এ ধর্মেরই তিনি নিষ্ঠাবান কর্মী। আমরা বলতে পারি সাহিত্য যেন কারো ধর্মভাবে আঘাত না হানে, যেন রাষ্ট্রবিরোধী না হয়, নৈতিকতা বিরোধী না হয়, এবং মানবতাবিরোধী আদর্শ প্রচার না করে, কিন্তু এ-ছাড়া আর কোনো মতবাদই আমরা সাহিত্যিকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। ফরমায়েশ দিয়ে রেজিমেন্টশন করে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়, বিপ্লবোত্তর রাশিয়া তার প্রমাণ। (হক, ২০১২:১৫৩)

পুঁথি সাহিত্যকে মুসলমানের আদর্শ সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস সম্পর্কে আবদুল হক স্পষ্ট যুক্তি দিয়ে লিখেছেন যে, যারা পুঁথি সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তাদের বিরাট অংশ ব্যর্থ হয়েছেন এজন্য যে তাঁরা সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে যে বাংলা তখন উপযুক্ত ছিল তা ভালো জানতেন না। তাছাড়া স্বাদেশিকতা বা স্বাজাত্য প্রকাশের বিপক্ষে তিনি নন, তবে জাতীয় বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে তার সীমারেখা টানা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তাঁর অভিমত–

> পুঁথিসাহিত্যের ভাষায় আমাদের সাহিত্য রচনা করা উচিত, এবং এ প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষাই হওয়া উচিত আমাদের সাহিত্যের ভাষা, কোলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষা নয়। এ-সব প্রচারকার্যের ফলে সত্যিই পুঁথিসাহিত্যের ভাষায় এবং আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা কিছু হয়েছে, কিন্তু সাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে এমন কোনো লেখা এখনো টেকে নি। হতে পারে প্রশ্নটা মূলত মাধ্যমের নয়, প্রতিভার। তবু একটি কথা বিবেচনা করার আছে। স্বাদেশিকতা এবং স্বাজাত্য খুব প্রশংসনীয় মনোভাব, কিন্তু জাতীয় বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে কোথাও একটা সীমারেখা টানতে হবেই। (হক, ২০১২:১৫৩-৫৪)

সমসাময়িককালে পুঁথিসাহিত্যের মধ্য দিয়ে ভাষার ক্ষেত্রে এক ধরনের পিউরিটান মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল বলে তাঁর মনে হয়েছে। ভাষার মধ্য দিয়ে বা অন্য কোন ক্ষেত্রে ‘পিউরিটান’ মনোভাব প্রকাশ পেলে তা সাহিত্যের জন্য ক্ষতিকর– এই তাঁর অভিমত। কারণ রেনেসাঁর যে-অন্যতম লক্ষণ বুদ্ধির মুক্তি, চিত্তের প্রসার, জ্ঞানের পিপাসা– এই তিন সম্পদকে মুসলিমরা ধরে রাখতে পারেনি ‘পিউরিটান’ মানসিকতার জন্যই, এমন অভিমত আবদুল হকের। ‘সাহিত্যের দিগন্ত’ প্রবন্ধে ইয়োরোপের রেনেসাঁ-উত্তর সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে নিচের উদ্ধৃতিতে–

> শুচিবায়ুগ্রস্ততাকে ইউরোপ বর্জন করতে পেরেছিল, পিউরিটানিজমের জীর্ণ খোলস ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছিল বলেই আমাদের রক্ষা। আমাদের সংস্কৃতিকে বহুলাংশে বাঁচিয়ে রেখেছে ওরাই। বিনা দ্বিধায় অন্যের সংস্কৃতির চর্চা করতে পেরেছিল এবং দুনিয়ার যা-কিছু ভালো তাকে আত্মসাৎ করতে পেরেছিল বলেই বাঁচবার সংগ্রামে ওরা জয়ী হয়েছে। ইতিহাসের এই কয়েকটি শিক্ষার প্রতি চোখ বুজে থাকলে আমাদের মঙ্গল হবে না। (হক, ২০১২:১৫৪)

২.৩.৩

সমসাময়িক পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকগণ ‘অতীতমুখী রোমান্টিকতা, অবাস্তব আত্মপ্রসাদ ও কল্পনাসর্বস্ব আত্মরঞ্জনে’ ব্যস্ত বলেই তৎকালীন পূর্ববাংলার সাহিত্য অস্পষ্ট চিন্তার কুয়াশায় ছিল নিমজ্জিত। সেই সাথে মুক্তচিন্তাকে বাধাগ্রস্ত করা, লেখকের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকা এবং ‘বিশেষ ছাঁচে ঢেলে’ সাহিত্য-সংস্কৃতি তৈরি করার প্রয়াসকেও অস্বাস্থ্যকর আখ্যা দিয়ে আবদুল হক লিখেছেন–

> বৈচিত্র্য সাহিত্যের প্রাণময়তার লক্ষণ, চিন্তার বৈচিত্র অনুভবের বৈচিত্র্য, প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য–তা বলে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। এ বৈচিত্যকে ভয় করার কিছু নেই। টি.এস.এলিয়ট ক্যাথলিক, এবং বার্ট্রান্ড রাসেল নাস্তিক, কিন্তু উভয়ের জন্যই ইংরেজ গর্বিত। সুন্নি শেখ সাদি, শিয়াপন্থী ও সংশয়বাদী নাসিরুদ্দিন তুসি, মুক্তবুদ্ধি ওমর খৈয়াম–এঁদের নিয়েই ফারসি সাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্য। এমনকী আবুল আলা মা’রি যিনি মুসলমান হয়েও কেয়ামতে বিশ্বাস করতেন না, মুর্দার দাফনের চেয়ে শব-দাহই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন, তিনিও আরবি সাহিত্যে গৌরবময় স্থানই পেয়েছেন, অপাঙ্‌ক্তেয় হন নি। এঁদের মতো

Dhaka University Institutional Repository

> সাহিত্যিক, এবং ইবনে সিনা ও মোতাজিলাবাদীদের মতো দার্শনিক যে মুসলিম-জগতে আর জন্মাল না তার কারণ এই নয় যে মুসলিমসমাজের প্রতিভা নেই, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতিও এর প্রধান কারণ নয়, কেননা পৃথিবীর কোনো-না-কোনো অঞ্চলে মুসলমানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ছিল উনিশ শতকের প্রথম পাদ অবধি; এর প্রধান কারণ আল-আশারির সময় থেকে চিন্তার প্রতিক্রিয়া এবং গোঁড়ামি ও সংকীর্ণ চেতনায় নিমজ্জন, এবং পিউরিটানিজম। (হক, ২০১২:১৫৫)

ছয়ের দশকে মতপ্রকাশের ওপর সামরিক শাসকের কঠোর নজরদারি ও পত্র-পত্রিকার ওপর নিত্য-নতুন নিষেধাজ্ঞার পীড়নে সৃষ্টিশীলতার জগতে নেমে আসে স্থবিরতা। আবার শাসকদলের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানবাদী সাহিত্যাদর্শের অব্যাহত প্রচারণা চলতে থাকে পুরোদমে। লেখকের স্বাধীন মতপ্রকাশের সেই দুর্দিনে আবদুল হক অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরোক্ষ-বিবৃতি ও ইঙ্গিতধর্মী বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যের সাথে সরকারের সম্পর্কের জটিলতা ব্যাখ্যা করেছেন এবং অন্তিমে উন্নত সাহিত্য ও লেখকের স্বাধীনতার স্বার্থে সরকারকে নিরাসক্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, সাহিত্যের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক সমাজ। কিন্তু সমাজ যথেষ্ট অগ্রসর, শিক্ষিত ও উন্নত না হলে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বা সাহিত্যের উন্নয়নে ঐতিহাসিকভাবেই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা স্বীকৃত ও গৃহীত হয়ে আসছে। তবে সাহিত্যের লক্ষ্য যেহেতু সমগ্র মানব-জীবন নিরীক্ষা, সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্র সবই যার অঙ্গীভূত, সেহেতু অনেকক্ষেত্রেই তা শাসকের মনঃপুত অভিমত ব্যক্ত করে না। কিন্তু সরকার যখন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে তখন অবশ্যই এমন বিদ্রোহ বা বিরোধিতা উৎসাহিত করে না। তাহলে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সাথে লেখকের উপর আরোপিত নির্দেশ পালন করা বা না-করার সম্পর্ক থেকে যায়। এ অবস্থায় কোন পরিস্থিতি উভয়ের জন্য অনুকূল এমন প্রশ্নে আবদুল হক লিখেছেন–

> যখন সরকার ও সাহিত্য উভয়েরই চরিত্র সমধর্মী শুধু তখনই সরকার স্বেচ্ছায় সাহিত্যের পোষকতা করতে পারেন, কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও শুধু স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণাতেই সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব, আরোপিত নির্দেশে নয়। কিন্তু সরকার ও সাহিত্য যখন পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীচরিত্রের তখন সচেতনভাবে সরকারের পক্ষে সাহিত্যের পোষকতা সম্ভব নয়। বস্তুত যে-কোনো সরকার যে-কোনো প্রকার সাহিত্যের পোষকতা করতে পারেন এ আশা দুরাশা মাত্র এবং অপ্রজ্ঞারই লক্ষণ। সাহিত্যের পোষকতা করা সরকারের উচিত এ-কথা বলার আগে তাই কোনো বিশেষ সরকারের পক্ষে কী ধরনের সাহিত্যের পোষকতা করা সম্ভব তা ভেবে দেখা উচিত। (হক, ২০১২:১৫৭)

অর্থাৎ, যে-কোন পরিস্থিতিতেই বিশেষ আদর্শে আস্থাবান সরকার, তার বিভাগসমূহ বা কর্মচারীরা সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যের বিপরীতে সাহিত্যে কোন কিছুই ঘটতে দেবে না। তাই সরকারকে সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য, লেখকের আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস থেকে দূরে সরে আসাই সবচেয়ে উত্তম বলে মনে করেন আবদুল হক। সরকারের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর মত–

> সাহিত্য সৃষ্টি নয়, সাহিত্য বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিই তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। অনুকূল পরিবেশ বর্তমান তখনই বলা যায় যখন দেশে একটা বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত সমাজ বিদ্যমান এবং সে-সমাজ আদর্শগত কারণে কোনো প্রকার মতামতমূলক সাহিত্য পাঠে বাধাগ্রস্ত নয় এবং অর্থনৈতিকভাবে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় সমর্থ, দেশে যথেষ্ট সাহিত্য-পত্রিকা, প্রকাশন-সংস্থা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বর্তমান, এবং এ-সবের পোষকতায় সরকার সাহিত্যের হিত ব্যতীত অন্য প্রকার বিবেচনায় বিরত, সাহিত্যের কোনো বাহনই করায়ত্ত রাখেন না এবং বেসরকারি বাহনের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করেন না, এবং বিজ্ঞাপন বন্টনের সময় সরকারি স্বার্থ অথবা পত্রিকার প্রচার-সংখ্যাকেই একমাত্র মানদণ্ড বিবেচনা করেন না। (হক, ২০১২:১৬০)

সাহিত্যিকের জন্য, শিল্পীর জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা ছাড়া কোন শিল্পীই সমাজের বা মানুষের হিত সাধন করতে পারেন না। কিন্তু সবকালেই রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম ও দলীয় আদর্শের সংঘাতে আক্রান্ত হয় সাহিত্য। আবদুল হকের মতে, সমাজে সাহিত্যের ভূমিকা প্রেরণাদায়ক এবং প্রমোদমূলক উভয়ই। তাই রচনার নৈতিক সামাজিক ও আদর্শগত মূল্য থাকাই সম্ভব। এমনকি সব আদর্শের সাথে সাহিত্যিকের সম্পর্ক বিরোধমূলকও নয়, তথাপি সাহিত্যিককে নানারূপ আদর্শে চিহ্নিত করা বা হওয়ার আহ্বান সাহিত্যের জন্য ক্ষতিকর।

Dhaka University Institutional Repository

'সাহিত্যিক মূল্যবোধের সাথে আদর্শের সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া শোচনীয় হয়েই দেখা দেয় সাহিত্যে। তাকে বহন করতে হয় বিজয়ী আদর্শের পতাকা। সেই আদর্শ সবসময় সাহিত্যিকের মনঃপুত না হলেও তাকে মানতে হয়। তাই আবদুল হক মনে করেন সাহিত্যিকের পূর্ণ স্বাধীনতা কখনও ছিল না। মধ্যযুগে দরবারের সাহিত্যও তৈরি হত রাজার মর্জিমাফিক। তবে সেসময় রাজা-বাদশা তাঁর কবির কাব্যে সংস্থিত কয়েকটি স্তুতিবাক্যেই সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু একালে যারা সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাঁরা কেবল স্তুতিবাক্যেই সন্তুষ্ট নন, 'আপাদমস্তক আনুগত্য ও কর্তব্যপালন, এ বিষয়ে তাঁরা সজাগ। রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রখর দৃষ্টি, আনুগত্যের তৌলে প্রত্যেকটি শব্দ মেপে হিসাব না মেলানো পর্যন্ত তাঁদের অস্বস্তি।'(১৯৬৮:৫৯) তাই একালের সাহিত্যিকের পথ বিঘ্ন-কন্টকিত। একাগ্র সাহিত্য সাধনার তন্ময়তা তাঁর নেই। উপরন্তু যাঁরা দল ও রাষ্ট্রপরিচালন করেন তারাই যদি ক্ষমতা ব্যবহার করে, সাহিত্যের দার্শনিক ও নির্দেশক হয়ে ওঠেন তাহলে 'সাহিত্যের প্রামাণ্য সমালোচকও দার্শনিককে হয় নীরব থাকতে হয় নয়তো করতে হয় অরণ্যে রোদন' (হক, ১৯৬৮:৫৯)।

২.৩.৪

সাহিত্যিক সমাজেরই সৃষ্টি। তাই আবদুল হক সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করেন না কিন্তু শিল্পী হিসেবে তাঁর দায়িত্বই সর্বাধিক বলে মনে করেন। সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্বও শিল্পী হিসেবেই পালন করতে হয়। কারণ লেখক 'সমাজের রক্ষক নন, সমাজকল্যাণী নন, সমাজের সংস্কারকও নন, শিল্পী– যদিও প্রেরণাগতভাবে এইসবই তিনি হতে পারেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই বিচার্য বিষয় তিনি মূলত শিল্পী কিনা' (হক, ২০১২:১৬২)। তবে আবদুল হক পুরোপুরি কলাকৈবল্যবাদীও নন, কারণ তিনি জানান যে, মহৎ সাহিত্যের শিকড়ও সাহিত্যিকের স্বকাল ও স্বসমাজের মধ্যে প্রোথিত। মহৎ উপলব্ধি বা মহৎ দর্শন ব্যতীত যেমন মহৎ সাহিত্য সম্ভব নয়, তেমনি –

> শিল্পী হিসেবে লেখকের দায়িত্ব অবশ্যই শিল্পের প্রতি, কিন্তু তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক-ব্যক্তিত্ব দুটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। সে-রূপ বিচ্ছিন্নতা স্বীকার করলে এটডও স্বীকার করতে হয়, সমাজের একজন ব্যক্তি হিসেবে তিনি দায়িত্বহীন হতে পারেন না, তবে শিল্পী হিসেবে দায়িত্বহীন হতে পারেন, হওয়ার অধিকার তাঁর আছে। এ-রূপ অভিমত স্ববিরোধী এই কারণে যে, সাহিত্য সমাজের জন্যই এবং শেষ পর্যন্ত সামাজিক কাজ, এ-রূপ কাজ যা সমাজকে প্রভাবিত করে থাকে।(হক, ২০১২:১৬২)

আবদুল হকের মতে, কোনো শিল্পই সমাজ-নিরপেক্ষ নয়। যত বিশুদ্ধ শিল্পের কথাই বলা হোক না কেন তা সমাজেরই কিছু লোকের উপভোগের জন্য, আর এই কারণে তা সামাজিক তাৎপর্যযুক্ত। মহৎ সাহিত্যমাত্রেরই একটা অভ্রান্ত লক্ষণ সর্বজনীনতা এবং সর্বকালীনতা। কিন্তু এই সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা সাহিত্যিক যে-বিশেষ স্থানে ও সময়ে সংস্থিত তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় থেকেই উৎসারিত হওয়া সম্ভব। সৎ ও দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক তাই শিল্পী হিসেবে তাঁর সামাজিক দায়িত্বের প্রতি সজাগ থাকেন সমাজ-বিচ্ছিন্ন নিস্তরঙ্গ জীবন তিনি কামনা করেন না। সংগ্রামে শান্তিতে সমাজের নিয়তির সঙ্গে সংযুক্ত থেকেই তাঁর ভূমিকা স্থির করেন। আবদুল হক মনে করেন, মৌলিক সাহিত্যকর্মের জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন আর তার মহত্ত্ব বিচারের জন্য সময়ই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিচারক। মোট কথা, মহৎ সৃষ্টির সামাজিক তাৎপর্য তথা হিত-অহিত অনুধাবনের জন্য 'সমাজমানসকেই শিক্ষিত হয়ে উঠতে হয়, দৃষ্টিকোণ অথবা চিন্তাধারা বদলাতে হয়' (হক, ২০১২:১৬৩)।

সাহিত্যিকের সমস্যা জীবন ও জীবিকার। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সাহিত্যিক তাঁর মনোমত বা সাহিত্যকর্মের উপযুক্ত পরিবেশ পান না। তাঁর আর্থিক অনিশ্চয়তাও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিপত্তিজনক। আর্থিক উদ্দেশ্য নিয়ে 'বেস্ট সেলার' রচনা চর্চা আদর্শবাদী নয় কিন্তু শক্তিশালী এমন সাহিত্যিকের কাজ হতে পারে তবে প্রকৃত সাহিত্যিকের মনে তা 'প্রেম ও প্রয়োজনের রক্তাক্ত সংঘর্ষ' বলেই মনে করেন আবদুল হক। এ যুগে মৌলিক চিন্তাও প্রকৃত সাহিত্যিকের জন্য সমস্যা। সাহিত্যিক জীবনের শুরু থেকে স্বীকৃতি না পাওয়াই তার কারণ। মৌলিক চিন্তা করতে গিয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হলে সাহিত্যের জন্য শুভ নয়, সাহিত্যিকের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার জন্যও নয়। এর অর্থ প্রথানুরাগ নয়। কারণ আবদুল হক মনে করেন, সত্য-সন্ধানী ও সৎ সাহিত্যিক হতে গেলে 'নন-কনফরমিস্ট' হতেই হয়, এমনকি প্রথাবিরোধিতাকে তিনি প্রগতির অন্যতম শর্তও মানেন। আবদুল হকের মতে– 'প্রত্যেক সাহিত্যিকই নিজেকে যে চিন্তাধারার স্রোতে দেখতে পান সে স্রোতে ভেসে যাওয়া আরামদায়ক, এমনকি কখনো কখনো লাভজনকও। কিন্ত যিনি মৌলিক প্রতিভার অধিকারী, যিনি সাহিত্যের ব্রতে একনিষ্ঠ তিনি স্রোতের উজানে চলতে বাধ্য হন' (হক, ১৯৬২:১৩৪-৩৫)।

২.৩.৫

রেনেসাঁ, যন্ত্রসভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মন্ত্র নিয়ে ইয়োরোপীয় যে-আধুনিকতা কবিতার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল, তা আসলে হাহাকার-হতাশাতাড়িত ইয়োরোপের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র। শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট পুঁজি-বিকাশের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী নির্মমতার সাক্ষ্য বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ইয়োরোপীয় সমাজের দগদগে ক্ষত। আবদুল হক পশ্চিমা আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণের নামে এই অবক্ষয়ের সাহিত্যাদর্শ পরিত্যাগ করে আত্মপ্রত্যয়ের সাহিত্যকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণে আগ্রহী। মূলত বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের আধুনিকতার বিষয়-পরিধি-প্রকরণের সমালোচনা করে আবদুল হক লিখেছেন যে, পশ্চিমা সাহিত্যের যেসব কবিদের রচনা ও প্রকরণ অনুকরণ করে ত্রিশের কাব্যাদর্শ গড়ে উঠেছে তাদের সাথে আমাদের আধুনিক বলে বিবেচিত কবিদের সামাজিক-ব্যক্তিক জীবনাভিজ্ঞতার পার্থক্য যথেষ্ট। সুতরাং ইয়োরোপীয় কবিদের দেশীয় সংস্করণ হওয়া অনভিপ্রেত ও অস্বাভাবিক। আবার ব্যক্তিপ্রতিভার কারণে ও ধরনে প্রকরণেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। তাই –

> এ-দেশের একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা তাঁদের কারো মতো না-হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ভিন্ন সমাজের ভিন্নরূপ পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এবং ভিন্ন প্রকারের ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও যদি তাঁদের কারো এদেশীয় সংস্করণ হওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে সেটা অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে অস্বাভাবিক।......
>
> প্রশ্ন যেখানে ব্যক্তিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যের সেখানে, সূক্ষ্মতর অর্থে, প্রকরণের প্রশ্নও অবান্তর নয়। প্রতিভাধর লেখক একটা কিছু বলেন না শুধু, বলার জন্য অনেক সময় বিশেষ একটা স্বকীয় প্রকরণও উদ্ভাবন করেন। এ-রূপ ক্ষেত্রে ঐ বিশেষ প্রকরণের একমাত্র সার্থকতা ঐ বিশেষ লেখকের আত্মপ্রকাশের জন্য : প্রকরণ এখানে সার্বজনীন নয়, ব্যক্তিক। এবং প্রতিটি মৌলিক লেখক যেহেতু চিন্তায় ও অনুভবে স্বতন্ত্র, এই কারণে এক লেখকের উদ্ভাবিত প্রকরণ অপর লেখকের অনুপযোগী, অপর দেশের লেখকের তো বটেই। (হক, ২০১২:১৪৪)

এমনকি ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিকতা প্রশ্নেও দুই ভূগোল-পরিবেশ-পরিস্থিতির বিস্তর পার্থক্য থাকে। 'লেখকের ঐতিহাসিকবোধ তাঁকে সমকালীন করে তোলে', 'ঐতিহ্যবোধের কাম্য লক্ষ্য দেশচেতনা' অথবা 'স্থানীয় না হয়ে সার্বজনীন হওয়া দুঃসাধ্য'– ইংরেজ কবি টি.এস.এলিয়ট-কৃত এসব মন্তব্য উদ্ধৃত করে আবদুল হক প্রশ্ন রেখেছেন–

> সাহিত্য ব্যক্তিরই সৃষ্টি, কিন্তু সমাজের এবং ঐতিহ্যের সংঘাতেরও সৃষ্টি, এই হিসাবে বহুল পরিমাণে সমাজের এবং ঐতিহ্যেরও সৃষ্টি; সমাজ ও ঐতিহ্য যদি স্বতন্ত্র হয়, তবে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য কতটা স্বতন্ত্র এবং কতটা সদৃশ হওয়া সঙ্গত? (হক, ২০১২:১৪৫)

এই জিজ্ঞাসার অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে তাঁর নির্দেশ ধার করা সাহিত্যের ঐতিহ্য-রিক্ততার দিকে–

> কতকগুলি সাধারণ সূত্রের কথা বাদ দিলে প্রতিটি ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতির সমস্যা ও প্রয়োজন তার নিজস্ব; সে-সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কেউ কাউকে সাহায্য করে না; সংগ্রাম করতে হয় নিজস্ব পদ্ধতিতে। এজন্য দরকার নিজস্ব কৌশলের, নিজস্ব মূল্যবোধের। এক দেশের প্রয়োজনে অন্য দেশ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারে; কিন্তু সংস্কৃতি অথবা সাহিত্য জিনিসটা নির্দিষ্ট ছকে কোনো কারখানায় তৈরি নয়, এ আরও জটিল এবং সমাজের দৃশ্য-অদৃশ্য নানা স্তরে তার শিকড় অনুপ্রবিষ্ট। (হক, ২০১২:১৪৫)

সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, যেহেতু আমাদের দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি যুদ্ধোত্তর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স বা পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ নয় সেহেতু 'ঐসব দেশের সাহিত্য-লক্ষ্য এবং মূল্যবোধের প্রতি নির্বিচার গদগদ-ভাব খুব বাস্তববোধের পরিচায়ক নয়' (হক, ২০১২:১৪৫)। বরং আমাদের সমাজ সেই সময়ে ইতিহাসের যে

Dhaka University Institutional Repository

'থরথর' মুহূর্তে পৌঁছেছিল তখন এসব ক্ষয়িষ্ণুতার ভাণ ছিল আত্ম-অপচয় মাত্র। এজন্য আমাদের সমাজের অনগ্রসরতা-অবনতিকে রূপ দিতে পারাই নিজেদের ক্ষমতাকে চিনে নেওয়ার জন্য সবচেয়ে দরকারি। আবদুল হক পাশ্চাত্যের ও আমাদের সমাজের এমন পার্থক্য সম্পর্কে লিখেছেন–

> গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ আমাদের যে- জিনিসটার অভাব ছিল তা হচ্ছে বাঞ্ছনীয় জাতীয়তাবোধ (অথবা অন্তত গোষ্ঠীচেতনা, কেননা জাতীয়তাবোধ অপেক্ষাকৃত আধুনিক জিনিস), সংহতি ও সংগঠন। এবং আমাদের ছিল, এখনও আছে, বহুবিধ সংস্কার, কুসংস্কার, সর্বপ্রকার জাগতিক এবং মানসিক কূপমণ্ডূকতা (মাত্র কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করছি); আমাদের সমাজের লক্ষণগুলি অনুন্নত সমাজের লক্ষণ, অধঃপতিত সমাজের ঠিক নয়। কিন্তু পশ্চিমী সমাজের যে-ক্ষয়িষ্ণুতা তা ধনিকের অনাচার-অর্জিত ব্যাধির মতো। আমাদের ব্যাধি মূলত পুষ্টিহীনতার, ওদের ব্যাধি মূলত অনাচারের। (হক, ২০১২:১৪৩)

এই নির্বিচার গ্রহণকে আবদুল হক যুক্তিহীন হুজুগ এবং পশ্চিমের কাছ থেকে 'নেওয়ার প্রথা' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ফলে তা হয়ে উঠেছে অনভ্যস্ত পশ্চিমা আধুনিক পোশাক বা খাবারের ফ্যাশানের মতো অস্বস্তিকর এবং অন্ধ-অনুকরণজাত। আবদুল হকের মতে এভাবে যে ব্যাধি সাহিত্যে ও সমাজে বাসা বেঁধেছে তার নাম 'আত্মবিস্মৃতি ও চিন্তাহীনতা' (হক, ২০১২:১৪৬)। এ থেকে পরিত্রাণ পেত্রে হলে আমাদেরকে নিজেদের সমাজ ও সামর্থ্যের দিকে তাকানোর পরামর্শ দিয়েছেন আবদুল হক। তাঁর মতে, নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও সম্ভাবনাময় পূর্ব বাংলার সাহিত্যের জন্য যা দরকার এবং স্বাভাবিক তা হচ্ছে প্রত্যয়ের সাহিত্য এবং আত্মপ্রত্যয়ের সাহিত্য–

> কেননা বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। অন্ধবিশ্বাস আমি সমর্থন করছি না, স্বীকেন্দ্রিকতার কথাও বলছি না, কিন্তু আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত প্রকৃত মানবজীবন ধারণ এবং মূল্যবান কিছু করা সম্ভব হয়। লেখক স্বদেশি অথবা বিদেশি রেওয়াজের প্রতিধ্বনি মাত্র নন; তিনি ব্যক্তি, কিন্তু শুধু ব্যক্তিও নন; তিনি তাঁর সমাজের এবং তাঁর কালের কণ্ঠস্বর, এবং কখনো ইতিহাস-নায়ক: সমাজের অন্তর্নিহিত বাসনা রূপ প্রার্থনা করে তাঁরই মধ্য দিয়ে। প্রকৃত সচেতন এবং স্বস্থ লেখক এই ভূমিকার মধ্যেই নিজের সার্থকতা সন্ধান করেন। সাহিত্য দেশ ও কালকে অতিক্রম করে, সার্বজনীন এবং সর্বকালীন হয়, দেশ ও কালকে বরণ করেই। (হক, ২০১২:১৪৬)

২.৩.৬

বাংলাভাষায় রচিত ও প্রচলিত অর্থে আধুনিক বলে বিবেচিত কবিতা আসলে ''আধুনিক'-পূর্ব কবিতার তুলনায় দরিদ্র' (হক, ২০১২:১৬৭)। আর আধুনিক কবিতার যেসব উপাদানকে আধুনিকতার লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয় সেগুলি, আবদুল হকের মতে, 'কোন চিরস্থায়ী মানদণ্ড' নয় (হক, ২০১২:১৬৬)। কারণ–

> আধুনিকতার ধারণাটা যুগ-নির্ভর–রুচি ও বিচারের মানদণ্ড অনুযায়ী একযুগে যা আধুনিক অন্য যুগে তা শুধু সাম্প্রতিক বলে বিবেচিত হতে পারে। তার অর্থ এই যে, সব সময়ের জন্যই আধুনিক এমন কবিতা আছে–এবং নেই। অন্তত এ কথা বলা চলে যে কাব্যের আধুনিকত্বের কোনো চিরস্থায়ী মানদণ্ড নেই এবং এ-সম্বন্ধে একমত হওয়া প্রায় অসম্ভব। অতএব কাব্যের আধুনিকত্ব নামক বিষয়ে আমি এখানে কোনো বিতর্কে যাব না; যাকে আধুনিক বলা হয় সেই কবিতার কয়েকটি লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলব মাত্র। (হক, ২০১২:১৬৬)

আবদুল হকের মতে বাংলা কবিতার আস্বাদ্যতা, কবিতায় নজরুল-জীবনানন্দীয় সহজাত কাব্যগুণ ও সাফল্য, ইত্যাদি বিবেচনায় আধুনিক কবিতা পাঠক-বিরূপ এবং অসফল। আবদুল হকের মন্তব্য থেকে আধুনিক কবিতার অন্যান্য সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রতিপাদ্য পাওয়া যায়–

> বাংলাভাষায় লিখিত আধুনিক কবিতার বয়স বর্তমানে কম নয়, আধুনিক কবির সংখ্যাও অনেক এবং এই কবিতার বিরুদ্ধবাদী অনেক থাকলেও উৎসাহী সমঝদারের অভাব কখনো ছিল না, কিন্তু নজরুল ইসলামের সহজাত এবং জীবনানন্দের অনেকটা-সহজাত কাব্যপ্রয়াসের বাইরে, পশ্চিমমুখিন অতি-সচেতন প্রয়াস (পশ্চিমবঙ্গের) বাংলা কাব্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করে নি। কবিতার সাফল্যের পরিমাপ হয় বহুলাংশে তার স্মরণ-যোগ্যতা দিয়ে, বা অবিস্মরণীয়তা দিয়ে; আনন্দের জন্য কবিতা বহুদিন যাবৎ বারংবার পঠিত হয় কিনা, আবৃত্ত হয় কিনা, উদ্ধৃত হয় কিনা তা দিয়ে। স্বীকার না করে উপায় নেই, এ-সব গুণের বিচারে আধুনিক কবিতা 'আধুনিক'-পূর্ব কবিতার তুলনায় দরিদ্র। কাব্যপাঠক আধুনিক কবিতায় এ-রূপ আনন্দ বেশি পান না। (হক, ২০১২:১৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল হক জানিয়েছেন, দুরূহ কাব্যরীতি বাংলাভাষায় এসেছে পশ্চিম-ইউরোপের কতিপয় অতি-উল্লেখিত কবির কাব্য-মতবাদ ও রচনারীতির প্রভাবে। তন্মধ্যে সার-রিয়ালিস্ট মতবাদের মূলকথাই হল দুর্বোধ্যতা– 'বিশুদ্ধ কবিতাকে যে বোধগম্য এবং অর্থবহ হতেই হবে তা নয়; কোনো কবিতা অর্থবহ বলেই যে কবিতা তাও নয়; কবিতার আবেদন বিশুদ্ধ কবিতা হিসাবে কাব্যবোধের নিকট, কাব্যার্থ তার আকস্মিক অনুষঙ্গ মাত্র'। সুতরাং এই রীতিতে রচিত কবিতা অচেতন মানসের উদ্বোধন মাত্র। আর বিশুদ্ধ কাব্যের আবেদন 'শব্দের ধ্বনি, মাত্রা এবং অস্পষ্ট স্মৃতি-উদ্বোধনের সমবায়ে সংবেদনশীল মনে যে অনুভবের সৃষ্টি হয়' সেখানে। (হক, ২০১২:১৬৮)

অন্যদিকে আধুনিক কবিতার কয়েকটি প্রধান স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য হল–

> এই কাব্য বোধগম্য হওয়া অনাবশ্যক, ছন্দ অনাবশ্যক, সুপঠনীয়তা অনাবশ্যক, সুঠাম গঠন অনাবশ্যক। কেননা এ-সবের কোনোটাই বিশুদ্ধ কাব্যের মৌলিক লক্ষণ নয়। কারো কারো মতে চিত্রময়তা অনাবশ্যক, বিমূর্ততাই বরং আধুনিকতার লক্ষণ। এই স্বীকৃতিগুলি কোনো একক কবির নয়, সমষ্টিগতভাবে আধুনিক কবি-সম্প্রদায়ের; অন্তত আধুনিকতার অভিধা-প্রত্যাশী অধিকাংশ কবির।(হক, ২০১২:১৬৮)

তাছাড়া আধুনিক কবি 'কবিতার সুপঠনীয়তাকে, শ্রুতি-স্পর্শ-সৌরভময়তাকে অবজ্ঞা করেন' বলে আবদুল হক মনে করেন (হক, ২০১২:১৬৯)। আধুনিক কবিতার সমালোচক অমলেন্দু বসু, হরপ্রসাদ মিত্র ও অশোক মিত্রের উদ্ধৃতিতে আবদুল হক জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতা নজরুলকে দিয়ে শুরু হয়েছিল অথচ পরবর্তীকালে এই সত্য চাপা পড়েছে। তাঁরা সবাই আধুনিক কবি ও কবিতাকে বিশেষত্বহীন, গৌণ, জীবন থেকে অবচ্ছন্ন, দেশ ও জনতা থেকে সরে যাওয়া নিরলম্ব বস্তু বলে মেনেছেন। তাই আবদুল হক সন্দেহ পোষণ করেন, আধুনিক কবি কাব্য নির্মাণের জন্য সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে কাব্যের বীজ সংগ্রহে প্রয়াসী হলে তা বিশ্বসাহিত্য অধ্যয়নে কবি ও পাঠকের যোগ্যতার পরিচায়ক হতে পারে কিন্তু কবিতা রচনায় তাঁর সহজাত প্রতিভা উপেক্ষিত হয়। তাঁর ভাষায়–

> মৌলিক কাব্যপ্রেরণার জন্য মনে হয় এ একটা কঠিন শর্ত; অন্তত কাব্যোপভোগের জন্য এ একটা অতিশয় কড়া শর্ত। সোনার হরিণের পেছনে পেছনে ছুটতে সবসময় রাজি–কোনো সময় ক্লান্ত বা অনিচ্ছুক নন–এমন পাঠকের সংখ্যা এই কর্মব্যস্ত শতাব্দীতে বিরল হওয়াই স্বাভাবিক।(হক, ২০১২:১৭৩)

সুতরাং কবিতা লেখা হয়ে গেলে তা কবিতা হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। কবিতা আধুনিক বা সাম্প্রতিক নয়, সমকাল-চেতন বা বিশেষ ঐতিহ্যচেতনও নয়। বিশ্বাস ও প্রত্যয় সম্বন্ধে যাঁর যে-রূপ ধারণাই থাকুক, যা কবিতা তা কবিতা হিসাবেই স্বীকার্য (হক, ২০১২:১৭৩)। অথচ দুরূহতা, চিন্তায় ও প্রকরণে সুদূরাশ্রয়িতা, চতুর রহস্যময়তা, গাদ্যিকতা ও অন্যান্য লক্ষণের অতিরিক্ত চর্চা কবিতার স্বাস্থ্যের পক্ষে যে প্রতিকূল, পশ্চিম-জগতে এবং পশ্চিমবঙ্গে তা প্রায় প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কারো কারো কবিতায় সেইসব লক্ষণচর্চা চলছে। তাই আবদুল হকের অভিমত–

> পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদের তুলনায় বাংলাদেশীয় কবিরাই পাঠযোগ্য ও প্রকৃত কবিতা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে লিখেছেন, এবং প্রকৃত প্রতিভার লক্ষণ বস্তুত তাঁদের কবিতায়ই অভ্রান্ত। তাঁদের কবিতা বিশেষত্বহীন নয় এবং যুগাবসানে তাঁদের অবস্থিতি নয়। চল্লিশের দশকে, পঞ্চাশের দশকে এবং ষাটের দশকে তাঁরা সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, একক আধিপত্য কারো নয়, কিন্তু যৌথভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে; এবং এ ধারা পরিপুষ্টিমান। তাঁদের উপর বিভিন্ন প্রভাব আছে, কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে সেইসব প্রভাব আত্মস্থকরণ, আত্ম-আবিষ্কার এবং সৃষ্টিশীলতা। চল্লিশের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদের তুলনায় বাংলাদেশীয় কবিদের সৃষ্টিশীলতা অধিকতর সক্রিয়; তাঁদের কবিতা অধিকতর সুগঠিত বাংলাদেশীয় কবিদের সৃষ্টিশীলতা অধিকতর সক্রিয়; তাঁদের কবিতা অধিকতর সুগঠিত ও দৃঢ়পেশী।(হক, ২০১২:১৭৩)

আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনও আশাবাদী ছিলেন না আবদুল হক, বিশেষত ইয়োরোপীয় আধুনিকতার পশ্চিমবঙ্গীয় রূপ নিয়ে বরং তাঁর উদ্বেগই প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়। তার প্রধান কারণ দুরূহতা হলেও আবদুল হকের আরও মনে হয়েছে মননমূলক, শিক্ষামূলক, নিছক প্রমোদমূলক এমনকি গীতিকবিতা হিসেবেও কবিতার সামাজিক সমাদর সঙ্কুচিত হচ্ছে। 'দুর্বোধ্যতার বিলাস' ছাড়াও কবিতার

Dhaka University Institutional Repository

আবেদনময়তা না থাকাও এর যথেষ্ট বড় কারণ। কবিতার জনপ্রিয়তা হ্রাসের জন্য 'স্থূল আনন্দদায়ী প্রমোদকলার চকচকে আকর্ষণ ও যান্ত্রিক সুলভতা, মুনাফাসর্বস্ব সমাজের উর্ধ্বশ্বাস প্রতিযোগিতা আবার অন্য দিকে নিঃস্ব জীবনের কঠোরতা ও অবসরহীন জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা'কেও দায়ি করেছেন আবদুল হক।(হক, ১৯৬২:৬৬)

২.৩.৭

আবদুল হক শুধু নাট্যকার ছিলেন না, ছিলেন নাট্য-অনুবাদক, নাট্য-সমালোচকও।[১৭] আবদুল হকের একটি নিজস্ব নাট্যভাবনা ছিল। যার মূল কথা–'নাটককে শুধু অভিনয়যোগ্য স্ক্রিপ্ট-এ সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, তাকে পাঠযোগ্য সাহিত্যও হয়ে উঠতে হবে'।(মাযহার,২০১২:ভূমিকা) আবদুল হকের নিজস্ব নাট্যভাবনা বিধৃত হয়েছে 'সাহিত্য হিসেবে নাটক', 'নাটক ও সাহিত্য' ইত্যাদি প্রবন্ধে। তাঁর অভিমত, শুধু মঞ্চে অভিনয়ের জন্য নাটক নয়– মঞ্চের অভিনয় সমাপ্ত হয়ে গেলেও নাটকের ভূমিকা সমাপ্ত হয় না, সার্থক নাটকের এই হল লক্ষণ। তার আবেদন ছড়িয়ে থাকে পাঠকক্ষে নির্জন মুহূর্তের উপভোগের মধ্যেও। সাহিত্যানুরাগী কদাচিৎ যে নাটকের অভিনয় দেখার সুযোগ পান সেটাও পাঠের মাধ্যমে উপভোগ করতে পারেন তখনই কেউ প্রকৃত নাট্যানুরাগী বলে দাবি করতে পারেন। আবদুল হক লিখেছেন–

> কোনো ব্যক্তিকেই যথার্থ নাট্যানুরাগী চলা চলে না–সাহিত্যানুরাগী ও সংস্কৃতিঅনুরাগী হিসেবে–যদি তিনি নিজের ভাষার চতুঃসীমার বাইরে পৃথিবীর অন্তত একটি কি দুটি সুউন্নত নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত না হন। একমাত্র সাহিত্য হিসেবেই সে-নাটকের সঙ্গে পরিচয় সম্ভব।(হক, ২০১২:১৮৫)

নাটকের সাহিত্যগুণ থাকার যৌক্তিকতা নিয়ে 'নাটক ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তাঁর অভিমত–

> একথা বোধ হয় বেশী যুক্তি-প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে মঞ্চ সাফল্যই নাটকের উৎকর্ষের একমাত্র প্রমাণ নয়, যেমন জনপ্রিয়তা নয় সাহিত্যের। চিত্তবিনোদন করতে পারে, হাততালি কুড়োতে পারে অনেক কিছুই: ডিটেকটিভ ফিল্ম, পালোয়ানের কুস্তি, সার্কাস। কিন্তু রসানুভূতি জাগাতে হলে চাই সাহিত্য–যার বাইরে নাটক নয়। সাহিত্যের মূল্যবোধগুলিকে বাদ দিয়ে এবং শিল্পধর্ম বর্জন করে নাটক সাহিত্য নয়, নাটকও নয়।(হক, ১৯৬২:৪৫)

বাংলাদেশে সাহিত্য হিসেবে নাটক গড়ে না ওঠার প্রধান কারণ নাটকের কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি এখানে। এর সাথে ধর্মীয় আবেগের সংযোগও উপেক্ষণীয় নয়। আবদুল হক লিখেছেন–

> এ-দেশের সাহিত্য হিসেবে নাটক গড়ে না-ওঠার অনেক কারণ আছে। একটা কারণ বাংলাদেশের নাটকের ঐতিহ্য নেই। আজকের বাংলাদেশের জনসমাজ প্রধানত যে সম্প্রদায়কে নিয়ে গঠিত সেই সম্প্রদায় এককালে যাত্রা অথবা নাটকের চর্চা প্রায় করেই নি; সুনজরেই দেখে নি বলা চলে। যাত্রা-নাটক-গান-সঙ্গীত এবং অন্যান্য প্রকার শিল্পকলা একসময়ে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল–যদিও সে নিষেধ অনেক এলাকা অথবা পরিবার লঙ্ঘন করেছে, এবং আলাউদ্দিন খাঁ-র মতো সঙ্গীতপ্রতিভার জন্ম দিয়েছে। এই সম্প্রদায়টির সচেতন এবং গোঁড়া অংশ অল্পকাল আগেও ব্যাপক অর্থে যে-সব দেশের সংস্কৃতিকে তার ঐতিহ্যের অন্তর্গত বলে কল্পনা করত সেই মুসলিম দেশগুলির কোনোটিরই নাট্যসাহিত্যে কোনো অবদান নেই। (হক, ২০১২:১৮৪)।

আবদুল হকের নাট্যাদর্শ গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য নাটকের আদলে। সেখানে গ্রীক বা এলিজাবেথীয় নাটক রচনার একটি প্রতিষ্ঠিত রীতি ছিল, নাট্যকারেরা সেই রীতি মেনেই নাটক রচনা করতেন– এমন উদাহরণ দিয়ে আবদুল হকের ভাষ্য, 'আমরা যখন গ্রিক ও এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্য পড়ি–বস্তুত চিরায়ত সব নাট্যসাহিত্যই পড়ি, কেননা সে-সব নাটক সাহিত্য হিসেবেও লেখা হয়েছিল' (হক, ২০১২:১৮৯)। তাঁর মতে সেকালে 'প্রায় নাট্যকারেরই লক্ষ্য ছিল কেবল অভিনয়যোগ্য স্ক্রিপ্ট রচনা নয়, একইসঙ্গে পাঠযোগ্য নাটক প্রণয়ন। এলিজাবেথীয় নাটক কেবল এই কারণেই মহৎ হতে পেরেছে' (হক, ২০১২:১৮৯)। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন শেক্সপিয়ার, ইবসেন, বার্নাড শ, স্যামুলে বেকেটের সাহিত্যগুণসম্পন্ন নাটকের। অথচ বাংলা নাটক বিচারের সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড গড়ে ওঠার আগেই, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, নাট্যমঞ্চের ব্যবসায়-নীতি প্রচলিত হয়ে গেছে বলে

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল হক মনে করেন। ফলে নাটকের শিল্পমান গড়ে ওঠার প্রশ্নই উঠেনি। নাটকের মঞ্চায়ন, অভিনয় ও সাফল্য সম্বন্ধে আবদুল হকের চিন্তা বিশুদ্ধ শিল্পানুরাগীর, তিনি লিখেছেন–

> নাট্যকার কেবল মঞ্চযোগ্য স্ক্রিপট-লেখক নন, তিনি একজন শিল্পী– যেমন চিত্তাকর্ষক কাহিনী লেখাই ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, সেই কাহিনীকে শিল্পসম্মত রূপ দেওয়াই তাঁর কাজ। এ-বিষয়ে বাঙালি ঔপন্যাসিক যতটা সচেতন, বাঙালি নাট্যকার ততটা নন। এসকাইলাস অথবা সফোক্লিস, শেক্সপিয়ার অথবা ওয়েবস্টার, ইবসেন অথবা বার্নার্ড শ' শুধু দর্শকের মুখ চেয়ে নাটক লিখেছিলেন, সাহিত্য হিসেবে নাটক লেখেন নি এ-রকম ধারণা ঠিক নয়। ইবসেন এবং বার্নার্ড শ' বরং জনমতের প্রতিকূলে উজান ঠেলেছিলেন, সেইসঙ্গে তাঁরা তাঁদের দেশের নাটকের ধারাকেই পরিবর্তিত করেছিলেন। অভিনয়-সফল হলেই নাটক লেখা সফল হল বলে অনেকে মনে করেন। নাটক বিচারের এটা যথার্থ মানদণ্ড নয়। খুব বিক্রি হলেও একটা উপন্যাস তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর হতে পারে; তেমনি একটা সফল অভিনীত নাটকও তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর হতে পারে। এ-দেশে নাটক বিচার করা হয় দর্শক-সমাগম দেখে, কিন্তু নাটকের বিচার হওয়া উচিত একইসঙ্গে যোগ্যতা দেখে এবং সাহিত্যের মানদণ্ডে। যে-নাটক মঞ্চযোগ্য নয় তা নাটক নয়; আবার যে-নাটক মঞ্চযোগ্য কিন্তু সাহিত্য হিসেবে নিকৃষ্ট তাও নাটক নয়। যে-নাটক একই সঙ্গে মঞ্চযোগ্য এবং সাহিত্য তাই নাটক। নাট্যসাহিত্য বিচারের এই-ই হওয়া উচিত নিম্নতম শর্ত। (হক, ২০১২:১৯০)

আবদুল হক তাঁর নাট্যচিন্তার সূত্র ধরে আশা প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশের দর্শক ও নাট্যামোদীর মধ্যে নাটককে সাহিত্য হিসেবে হৃদয়ে ধারণ করার সচেতনতা একদিন হবে। তাঁর আশাব্যঞ্জক শব্দাবলি থেকে উদ্ধৃত করা হল–

> নাট্যাভিয় যৌথ শিল্প, কিন্তু নাট্যকার এই প্রয়াসের সকল সহযোগীর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। নাট্যাভিনয়ের সকল উপকরণের মধ্যে নাটক হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম উপকরণ, এবং তারও বেশি–একখণ্ড জীবন। নাট্যভিনয় সমাপ্ত হলে সব কর্মী ঘরে ফিরে যান, মঞ্চের সমস্ত উপকরণ খুলে ফেলা হয়, মেকআপ সাবান দিয়ে ঘষে বিলুপ্ত করা হয়, কিন্তু নাট্যকার তারপরেও থেকে যান তাঁর নাটকে–তাঁর ক্ষুদ্র বর্তিকা নিয়ে কালের অন্ধকারে আরো অনেক আলোকদূতের মিছিলে যোগদন করেন–কিন্তু তিনি থাকেন বৃহত্তর সাহিত্যের অংশ হিসেবে। বাংলাদেশ কখনো সে মিছিলে যোগদান করবে কিনা বলা কঠিন, কিন্তু সেজন্য সচেতনতা চাই।(হক, ২০১২:১৯৪)

২.৩.৮

স্বদেশের ইতিহাস জানা, অনুসন্ধান করা ও চর্চা করা স্বদেশ-চেতনা ও জাতীয় জাগরণের জন্য অপরিহার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি হিন্দুর বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের একটা অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ছিল জাতীয় ইতিহাসচর্চা। ইতিহাস চর্চার প্রেরণায় তাদের কেউ কেউ ফারসি ভাষাও আয়ত্ত করেছিল, প্রকাশ করেছিল ইতিহাস-বিষয়ক পত্রিকা। তাই বাংলা সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইতিহাস-সাহিত্য হতে পেরেছিল। অথচ সেই ইতিহাস-সাহিত্যেই বাঙালি মুসলমানের তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। কেন নেই তার কারণ জানিয়ে আবদুল হক লিখেছেন–

> স্বদেশের ইতিহাসচর্চায় বাঙালি মুসলিম সমাজের উদ্যমহীনতার ব্যাপারটি মনে হয়, সেই সুপরিচিত বাঙালি মুসলিম মানসেরই পরিচয়, যে মানস এক সময় বাংলাভাষাকেই অবজ্ঞা করেছিল : বলেছিল, "এটা আমাদের ভাষা নয়"। সবাই অবশ্য বলে নি, কিন্তু কেউ কেউ বলেছিলেন এবং তাদের অনেকে প্রভাবশালীও ছিলেন। আমাদের সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত দীনতার এ একটা ঐতিহাসিক কারণ। আরও একটা কারণ আত্মবিস্মৃতি– যা এ-দেশের দীর্ঘ পরাধীনতার ফল এবং কারণ উভয়ই। এ সমাজ ইতিহাস-চর্চা করে নি কারণ এ সমাজ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ইতিহাস সৃষ্টি করে নি– রাজনৈতিক অর্থে। কিন্তু তা বলে ইতিহাস তাকে ক্ষমা করেছে কি? (হক, ২০১২:১১৮)

বাঙালি মুসলমানের আত্মবিস্মৃতির দিকে ইঙ্গিত করে ইতিহাসে তার প্রায়শ্চিত্তের কথাও আবদুল হক বলেন–

> স্বদেশের ইতিহাসচর্চা সমাজের আত্মসচেতনতারই একটা লক্ষণ। যে সমাজ আত্মসচেতন নয় এবং আত্মপরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ, সে-সমাজ আত্মবিস্মৃত হবে এবং এ-জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এতে বিচিত্র কী? (হক, ২০১২:১১৮)

সাতচল্লিশোত্তর কালে এই আত্ম-সচেতনতার লক্ষণগুলি ফুটে উঠতে থাকে বলে আবদুল হক মনে করেন। স্বজাতি স্বদেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরানোকে তার শুভ লক্ষণ বলে তিনি মনে করেন। তবে তখনও

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার ইতিহাস ছিল উপেক্ষিত এমন জানিয়েছেন আবদুল হক। তবে ভারতে লেখা বাংলার ইতিহাস গ্রন্থের বেশিরভাগই সাম্প্রদায়িকতা দোষ দুষ্ট এমন অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁর মতে–

> এ-কালের নতুন ঐতিহাসিক চেতনার আলোকে ইতিহাসের নব নিরীক্ষার এবং নূতন ব্যাখ্যারও প্রয়োজন আছে।স্বাধীন সমাজের আত্মোপলব্ধির জন্য এ-রূপ নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যা অত্যাবশ্যক। (হক, ২০১২:১২০)

২.৩.৯

আবুদল হক সাহিত্যের উৎকর্ষ ও ধারাবাহিকতার জন্য সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সবসময়। *ক্রান্তিকাল* -এর ‘সাহিত্যিক মূল্যবোধ’ প্রবন্ধে আবদুল হকের মন্তব্য থেকে সাহিত্য-সমালোচনার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়–

> সমালোচনা-সাহিত্যের প্রধান কাজ হচ্ছে সাহিত্যের মূল্যবিচার, সাহিত্যিক মূল্যবোধ ও নীতিগুলোর প্রতিষ্ঠা এবং পাঠকের চিন্তন ও সংবেদনশীলতার সংস্কার, সেই সংগে লেখকেরও। সমালোচক সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করেন, উত্তম সাহিত্য থেকে অনুত্তম সাহিত্যকে পৃথক করেন এবং উত্তম সাহিত্যের সমঝদারিতে পাঠককে দীক্ষিত করেন। (হক, ১৯৬১:২০)

‘মূল্যায়নের মরীচিকা’ প্রবন্ধে তাঁর অভিমত, সাহিত্য সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য সাহিত্য মূল্যায়ন। সমালোচনা দুরকম হতে পারে– একটি সাহিত্যের মৌলিক তত্ত্ব বা প্রিন্সিপাল নিয়ে আলোচনা এবং প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনা অথবা লিটারেরি ক্রিটিসিজম। আবদুল হকের মতে, যেভাষার গদ্য সাহিত্য যত পুরাতন তার সমালোচনা-সাহিত্যও তত পুরাতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (হক, ২০১২:১৭৫)। পুস্তক সমালোচনাকে সমালোচনা-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত মনে করেন না তিনি। সমালোচনা তথা সাহিত্য-মূল্যায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস। আবদুল হক লিখেছেন–

> সাহিত্যের ইতিহাস কিয়দংশ সাহিত্যমূল্যায়নেরও ধারাবাহিক বিবরণ, যদিও মূল্যায়নের সব কথা ইতিহাসে বলা হয় না। সমালোচনা ও মূল্যায়ন এক কথা, ইতিহাস অন্য কথা। তথাপি, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে মূল্যায়নের ওপর ইতিহাসকে নির্ভর করতে হয়। যদি মূল্যায়নেই ভুল থাকে তাহলে সাহিত্যের পাঠক-সমাজের বিশেষ কাজে আসে না, বরং তাদেরকে বিভ্রান্ত করে। সাহিত্যের কোনো ভালো ইতিহাসই নিছক লেখকদের এবং তাঁদের রচনাবলির ধারাবাহিক বিবরণ নয়। তবে সাহিত্যের ইতিহাস মূলত মূল্যায়নের ধারাবাহিক বিবরণ নয়। সাহিত্যের ইতিহাস একইসঙ্গে সমাজমানসেরও বিচিত্র ভাবনার ইতিহাস। (হক, ২০১২:১৭৬)

সাহিত্য মূল্যায়নের পথ সবসময়ই কন্টকাকীর্ণ। কারণ এতে আছে ‘প্রীতির পিচ্ছিল প্রলোভন’, ‘অনেক রকম স্বার্থের প্ররোচনা’ (হক, ২০১২:১৭৭)। অনুন্নত সমাজে এই প্রবণতা বেশি। উন্নত সমাজ ও উন্নত সাহিত্যের ক্ষেত্রেই কেবল সমালোচকের কলমের পেছনে সূক্ষ্ম বা স্থূল শক্তি বা প্রতিবন্ধকতা কাজ করে না।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লেখককে শুধু লেখক হিসাবেই বিচার করা উচিত আর এ-ভাবেই তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব; কিন্তু তাঁর ব্যক্তিমূল্য অথবা সামাজিক মূল্য সন্তর্পণে সমালোচককে প্রভাবিত করতে পারে (হক, ২০১২:১৭৭)। তবে সাহিত্যের মূল্যায়নে রাজনৈতিক তাৎপর্যকে উচ্চমূল্য দেওয়া সাহিত্যের মানদণ্ডে এতটা সঙ্গত নয় বলেই আবদুল হকে ধারণা। উদাহরণ স্বরূপ, নজরুলের কবিতাকে বক্তব্যের পরিমাপে মূল্যায়নের সমালোচনা করে তিনি বলেন–

> তাঁর কবিতার সমালোচনা প্রায়ই তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা; এ-সমালোচকের দৃষ্টি থাকে শুধু তাঁর বক্তব্যের উৎকর্ষের প্রতি, যুগের অগ্রসরমানতার পরিমাপে– কবিতার উৎকর্ষের প্রতি নয়। কিন্তু বক্তব্যের উৎকর্ষ এবং কবিতার উৎকর্ষ এক কথা নয়। কবিতার বক্তব্য কারো কাছে উৎকৃষ্ট মনে হলে সেই কবিতার উৎকর্ষ বিচারের ক্ষমতা লোপ পেতে পারে। বক্তব্যের উৎকর্ষকেই অনেক সময় ধরা হয় কবিতার উৎকর্ষ। কিন্তু বক্তব্যের এই মূল্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে; ফলে যে-কবিতা একসময় খুবই মূল্যবান মনে হয় তা অন্য সময় মূল্যহীন মনে হতে পারে। (হক, ২০১২:১৭৮)

অন্যদিকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাও একটি বড় প্রভাবক। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল সাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ দিয়ে আবদুল হক লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ব্যক্তিগত এবং সমকালীন ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

বাদ দিয়ে তাঁদের রচনার মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা জানি তাঁদের এই ব্যক্তিগত ইতিহাস তাঁদের রচনার প্রকৃত মূল্যের সঙ্গে একটা অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন করে যা প্রকৃত মূল্যের থেকে স্বতন্ত্র। আবদুল হক খ্যাতিমানদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা যথার্থই চিহ্নিত করেন–

> রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের যে মূল্যায়ন এ-যাবৎ করা হয়েছে তার মধ্যে তাঁদের প্রকৃত মূল্য এবং সামাজিক খ্যাতির অনুপাত কতখানি তা দীর্ঘদিন নির্ণীত হবে না (সব লেখকের ক্ষেত্রেই এ-কথা খাটে)। তাঁদের জীবন কথা, রচনার ইতিহাস এবং পরিপার্শ্বের কাহিনী দীর্ঘদিন তাঁদের অনুসরণ করবে। তাঁদের রচনার প্রকৃত মূল্যের সঙ্গে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলির দীর্ঘদিন অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করবে যার মূল্য সামাজিক, ঠিক সাহিত্যিক নয়। (হক, ২০১২:১৭৯-১৮০)

জীবন্ত সাহিত্য সবসময় পরিবর্তনশীল বলেই সাহিত্য যেমন বদলায় তেমনি সমালোচনাও বদলায় পরিহার্যভাবে, বদলায় সমালোচনার বিবেচ্য বিষয়; কেবল সমকালীন সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, যে সাহিত্য বারবার সমালোচিত হয়েছে তার ক্ষেত্রেও; যে মূল্যায়ন আগে করা হয়েছে তার পুনর্মূল্যায়ন করা হয়, এবং পুনর্মূল্যায়নেরও পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যমানের এই পরিবর্তবর্তশীলতা কেবল সাহিত্যের নিজের অন্তর্নিহিত কারণে ঘটে না। বিদ্যমান 'সাহিত্যের সঙ্গে নূতন সাহিত্য এবং তারপর আরও নূতন সাহিত্য নিরন্তর সংযুক্ত এই কারণে; শুধু একটা বিশেষ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে নয় বিশ্বমানব গোষ্ঠীর মধ্যে, একটি সাহিত্যের চিন্তা-অনুভব-প্রকৌশল অন্য সাহিত্যের চিন্তা-অনুভব-প্রকৌশরে ওপর ছায়াপাত করছে, এবং এইভাবে সমালোচনার সমগ্র পরিপ্রেক্ষিত কখনো ধীরে-ধীরে কখনো দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে' (হক, ২০১২:১৮১৮২)।

সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সাথে কাল ও ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সাহিত্যের মূল্যমান বিচারের সাথেও এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কারণ ঐতিহ্য ও সাহিত্য নিবিড়ভাবে সন্নিবেশিত থাকে। তাই সাহিত্যের নামে পাঠকের সামনে যা উপস্থাপিত হয় সেখান থেকেই মৌলিক সাহিত্য খুঁজে বের করা হয় সমালোচনার মাধ্যমে। আবদুল হক এই মূল্যায়ন সম্পর্কে 'কালের প্রেক্ষণা' প্রবন্ধে লিখেছেন– 'সাহিত্যিক তাঁর যুগের সৃষ্টি এবং যুগের স্রষ্টাও; সাহিত্য-ঐতিহ্যের সৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের স্রষ্টাও। যেখানে তিনি সৃষ্টি সেখানে তাঁকে চিনতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু সেখানে তিনি স্রষ্টা সেখানে তিনি মৌলিক এবং প্রায়শ সেখানেই তাঁর মূল্য নির্ণয়ে নৈরাজ্য'(হক, ১৯৬২:৫৬)। সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ে বা বিচারে এমনকি অনুধাবনে মূল্যোপলব্ধির তারতম্য বা যে-বৈষম্য সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে আবদুল হকের অভিমত কালের শিক্ষার দিকে–

> সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য সহসা নির্ণীত হয় না। কেবল পাঠক ও সমালোচকরে কাছেই নয়, স্বয়ং লেখকের কাছেও হয় না অনেক সময়। বেকন ভাবতে পারেন নি যে তাঁর প্রবন্ধাবলীই একদিন তাঁর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকৃতি বলে মর্যাদা পাবে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠ কবিতা ও নিকৃষ্ট কবিতার গুণগত তারতম্য নিজেই উপলব্ধি করতে পারতেন না অনেক সময়। কোন্ কবি বা সাহিত্যিক পারেন নিজের রচনার সঠিক মূল্য নির্ণয় করতে? (হক, ১৯৬২:৫৭)

অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কালই ঠিক করে দেয় প্রকৃত সাহিত্য কোন্‌টি। আবদুল হকের ভাষায়– 'সাহিত্য উপভোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সমালোচকের, সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ-দৃষ্টি সমালোচকের। তাঁর কর্তব্য সাহিত্যিকের কৃতি এবং অকৃতি, সৌন্দর্য ও স্খলন নির্দেশ করা' (হক, ১৯৬২:৫৭-৫৮)।

এভাবে কাল-সমাজ-ব্যক্তির রুচি-বাধ্যতা-অবাধ্যতার সংঘর্ষ এড়িয়ে সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য শেষ পর্যন্ত নির্ণীত হয়। একেক সমালোচক একেক গুণ ও দোষ উদ্‌ঘাটন করার পর, অনেক সংস্কারের ক্ষয়, নিরসন, নিরপেক্ষ অবস্থার উদ্ভব এবং বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষ সমাপ্ত হওয়ার পর সাহিত্যের মূল্য স্পষ্টীকৃত হয়। যখন যথেষ্ট কালগত দূরত্ব থেকে সাহিত্যের দৈর্ঘ্য বিস্তার ঘনত্বের সবটুকু দৃষ্টিগোচর হয়, যখন সাহিত্যকে সকল মত-বিশ্বাস-নিরপেক্ষভাবে শুধু সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করার মতো মনোভাবগত অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হয় (হক, ১৯৬২:৫৮)।

অর্থাৎ কাল-ই প্রকৃত বিচারকের কাজ করে। এজন্য কালগত দূরত্বও যথেষ্ট গুরুত্ববহ। আবদুল হক এই শিক্ষাকে বলেছেন 'শুদ্ধিকরণের শিক্ষা'। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে নির্ণয় হয় কোন্ সাহিত্য কতকাল স্থায়ী থাকবে

Dhaka University Institutional Repository

পাঠকসমাজে। কতটা বা কীভাবে থাকবে তা-ও ঠিক করে কাল-ই। কালের শুদ্ধিকরণের মধ্যে আরো একটা শিক্ষা আছে, তা-হল– 'প্রাকৃত মনের চাহিদা মিটিয়ে এবং ক্ষণ-জনপ্রিয়তা অর্জন করে যত বৈষয়িক মুনাফাই আসুক, সে মুনাফা সাময়িক। এবং সে মুনাফার সংগে কালের স্বীকৃতির কোনো অপরিহার্য সংযোগ নেই। সাহিত্যিক নিষ্ঠা ও সততা বর্জন করে এবং সাহিত্যের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে কালের দরবারে সমাদর পাওয়া সম্ভব নয়। কাল এ ব্যাপারে নির্মম নিষ্করুণ' (হক, ১৯৬২:৬১)। তাই জনপ্রিয়তাকেও অমূলক বা অসার মনে করেন না আবদুল হক। তাঁর অভিমত–

> জনপ্রিয়তা এবং ভাবীকালের স্বীকৃতির মধ্যেও কোন অপরিহার্য বিরোধ এবং শত্রুতা নেই। সাহিত্যের ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতা সে সাক্ষ্য দেয় না। প্রচুর সংখ্যক সাহিত্যিক বর্তমানের জনপ্রিয়তা এবং ভাবীকালেরও স্বীকৃতি পেয়েছেন। (হক, ১৯৬২:৬০)

'সাহিত্য সুরুচির প্রশ্ন', 'সমকালীন সাহিত্যমানস', 'সাহিত্য ও জাতীয় সম্ভাবনা' ইত্যাদি প্রবন্ধে সমাজের সাথে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বিশেষ সম্পর্ক নিরীক্ষা করেছেন আবদুল হক। এসব আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি অভিমত সম্পর্কে অবগত হই। যেমন, জনপ্রিয়তাকে সাহিত্যের একটি মানদণ্ড মানতে আবদুল হকের আপত্তি নেই কারণ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের মনই সাহিত্যিকের লক্ষ্য তথাপি তাঁর ধারণা, জনপ্রিয়তাই সাহিত্য বিচারে সর্বদা নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নয়। সমাজে সাহিত্যের আরেক উপযোগিতা হল 'সমাজের আরও অনেক উপাদানের মত সাহিত্যও পরিবেশ সৃষ্টি করে। ভালো সাহিত্য সুরুচি ও সংস্কৃতি বিকীরণ করে আবার অসুস্থ সাহিত্য বিপরীত ফল উৎপাদন করে' (হক, ১৩৮১:৬)। উৎকৃষ্ট সাহিত্য সাময়িকভাবে অবহেলিত থাকতে পারে, কিন্তু চিরকাল নয়। সমসমায়িক সাহিত্যিকগণের মধ্যে বিশ্বদৃষ্টি, প্রসারিত চিন্তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। আবার কারো কারো মধ্যে সমাজের রক্ষণশীলতা রয়ে গেছে। সমাজে সাহিত্যের ভূমিকার সাথে 'হৃৎপিণ্ডের' তুলনা করে আবদুল হক বলেন– প্রবহমান সাহিত্যহীন জাতি, ক্ষীণপ্রভা সাহিত্য-প্রয়াসের জাতিকে ইতিহাসের যাত্রাপথে ম্রিয়মান হয়ে পাশে দাঁড়াতে হয়, দরিদ্রের মতো। যদি সেই জাতি রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী বা রণকুশল না হয় তবে তাকে বরণ করতে হয় প্রবলের নিস্পেষণ। কারণ সাহিত্যহীন জাতিকে ঘুমন্ত বা সভ্যতার নিম্নস্তরে বিবেচনা করে সুসভ্য ও প্রবল জাতিসমূহ। আবদুল হক মনে করেন, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বস্তরে নিয়ে যেতে না পারা আমাদের সাহিত্যের দুর্বলতা।

২.৩.১০

কাজী নজরুল ইসলাম মূল্যায়নে আবদুল হকের দৃষ্টিভঙ্গিতে খানিকটা মুগ্ধতার সুর থাকলেও কোন বিহ্বলতায় মূল্যায়নের আতিশয্য নেই। গল্প ও উপন্যাসে নজরুলের শিল্পচর্যা ও শিল্পসার্থকতা সম্পর্কে অত্যন্ত মৃদু সমালোচনা[১৮] করলেও সার্বিকভাবে নজরুল সমালোচনায় আবদুল হকের অনুরাগই প্রতিষ্ঠিত। নজরুলকে বাঙালির ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণা হিসেবে আবদুল হকের ঘোষণায় তা-ই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও যখন বাংলাভাষার উত্তরাধিকার প্রশ্নে বাঙালি মুসলমানের দ্বিধা-সংশয়, জড়তা ও উন্নাসিকতা কাটেনি, নজরুলের আবির্ভাবের পর সে দ্বিধার অবসান হয়। ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনেক কারণের মধ্যে আবদুল হক এটাও গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন যে–

> তার মধ্যে একটা কারণ এই ভয় ছিল যে, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে আমরা নজরুলকে হারাব। সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে চিন্তা করা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজবাদের চেতনা সঞ্চারের একটা সূত্র ছিল নজরুল-সাহিত্য। (হক, ২০১২:৯৪-৯৫)

মৃত্যুর আগে প্রায় চৌত্রিশ বৎসর যাবত নীরব এবং কাব্যজগতে অনুপস্থিত থাকার পরও নজরুলের জনপ্রিয়তা কমেনি, জনগণের কবি ছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছে এমনই মনে করেন আবদুল হক। অথচ নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাকে সম্পাদিত সংকলনে গ্রন্থভুক্ত করেননি বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দের মতো কবিগণ। সৈয়দ আলী আহসান করেছিলেন বিরূপ মন্তব্য। তবু নজরুলের কবিতার প্রয়োজন অবসিত হয়নি। কারণ –

> নজরুল ইসলামের বিপ্লবাত্মক এবং প্রতিবাদী অনেক কবিতার আবেদনেরও তাই অবসান হয় নি, অবসান হবে না। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়িয়ে অবলীলাক্রমে নতুন কবিতা লিখেছেন, এবং বাংলা কবিতার নমনীয়তার সঙ্গে সবল

Dhaka University Institutional Repository

> পেশলতা যুক্ত করেছেন। আধুনিক পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে, শান্তির চেয়ে সংগ্রামের পথই বেশি, নির্মম নিষ্ঠুর অমানুষিক সেই সংগ্রাম অনেক সময়েই দীর্ঘস্থায়ী অথবা অনিশ্চিত। বিপ্লবকামী পৃথিবীর এই মেজাজের সঙ্গে 'বিদ্রোহী' এবং আরও অনেক কবিতার মর্মকথার মিল আছে। বুদ্ধদেব বসু অথবা অন্যান্য যাঁরা প্রধানত গীতি-কবিতার অনুরাগী, কবিতার এলাকার এই সম্প্রসারণ এবং প্রকৃতির এই পরিবর্তন তাঁদের ভালো না-ও লাগতে পারে। (হক, ২০১২:৯৬)

বাংলা কবিতাকে নজরুল জনসাধারণের খুব কাছাকাছি এনেছিলেন যাকে আবদুল হক বলেছেন 'কবিতার গণতন্ত্রায়ণ'। এর অর্থ নজরুল 'কবিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছেন কবিতা ও রাজনীতির সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর ও প্রত্যক্ষ করেছেন' (হক, ২০১২:৯৭)। গান রচনায় নজরুল প্রতিভার অনন্যতাকে আবদুল হক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁর মতে যে-কোন সংস্কৃতিমূলক গান লেখার জন্য সে-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় থাকাই যথেষ্ট, কোনো দেবদেবীর ভক্ত হওয়ার দরকার করে না– একথা নজরুল প্রমাণ করেছেন তার সহজাত প্রতিভাবলে। বাংলা সাহিত্যসাধনায় বাঙালি মুসলমানের হীনম্মন্যতা মোচন ও আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নজরুলের অবদান শীর্ষে।

'নজরুল ইসলাম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধটি এ জাতীয় রচনার মধ্যে ব্যতিক্রম এবং বিশিষ্ট। আবদুল হক নজরুল ইসলামের কাব্যে জাতীয়তার দুই ধরনের রূপ নির্দেশ করেছেন– মুখ্যত ভারতীয় জাতীয়তা, গৌণত বাঙালি জাতীয়তা। আবদুল হক মনে করেন নজরুলের কোন কোন কবিতা থেকে অনুমান করা যায় যে , কবিমানসে ''পূর্ববঙ্গ' একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে' স্থান পেয়েছিল এবং 'মনে হয় কবি পূর্ববঙ্গকে ভারতীয় জাগরণদূতের ভূমিকা দিয়েছিলেন' (হক, ১৩৮১:৪১)। আবদুল হক অবশ্য স্বীকার করেন যে ভারতীয় জাতীয়তা নজরুলের কাব্যে এতই ব্যাপ্ত যে তা খুঁজে নিতে হয় না সে তুলনায় বাঙালি জাতীয়তার চিহ্নগুলো খুঁজে বের করতে হয়। কবিতার চেয়ে গানে এই জাতীয়তা-লক্ষণগুলি অধিকতর স্পষ্ট। কবিতা ও গান থেকে আবদুল হক উদাহরণ দিয়েছেন কয়েকটি, যেমন–
ফনিমনসা কাব্যের 'হেমপ্রভা' 'অশ্বিনীকুমার' 'মুক্তিকাম' কবিতায় আবার *সুরসাকী*, *বনগীতি*, *গানের মালা* গীতি সংকলনে ছড়িয়ে থাকা এসব উদাহরণের কয়েকটি আবদুল হক উদ্ধৃত করেছেন, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সেখান থেকে কয়েকটি[১৯] দেওয়া হল–

১। স্বাগত বঙ্গে মুক্তি কাম
সুপ্ত বঙ্গে জাগুক আবার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম।

২। পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গা-বিধৌত পূর্ব-দিগন্তে
তরুণ-অরুণবীণা বাজে তিমির বিভাবরী অন্তে।

৩। ঘুমাইয়াছিল আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবন,
বহু বৎসর মুখ চেপে ছিল পাষাণের আবরণ।

বিশেষত তৃতীয় উদাহরণের কবিতায় বাঙালির ওপর বিদেশি দুঃশাসনের চিত্র এঁকেছেন নজরুল, যা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ প্রেরণাদায়ক হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আবদুল হক। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এবং আবদুল হক তা উত্থাপনও করেন, 'সেকালে বঙ্গদেশের অখণ্ড সত্তা সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন না থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি বিশেষ করে পূর্ববঙ্গকে নিয়ে গান লিখলেন' (হক, ১৩৮১:৪১)?

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ৩রা বৈশাখ তারিখের *নবযুগ* পত্রিকার নজরুল-রচিত সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃত করে নজরুলের বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রূপটি দেখাতে সক্ষম হয়েছেন আবদুল হক। সম্পাদকীয় শুরুর বক্তব্য[২০] এবং শেষের বক্তব্যে[২১] নজরুল ঐক্যবদ্ধ বাঙালীর স্বাধীনতা আবার বাঙালীর স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা উভয়ই প্রত্যাশা করেছেন। ফলে নজরুল মানসে স্বাধীনতা বা জাতীয়তার রূপ সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। আবদুল হক তাই এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে 'প্রথম জীবনে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কিন্তু কবিজীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে সার্বভৌম বাংলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন' (হক, ১৩৮১:৪৫)।

ফারসি ভাষায় রচিত কবি ওমর খৈয়াম ও কবি হাফিজের কবিতার নজরুল-কৃত অনুবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে আবদুল হক নজরুল সাহিত্যের ভিন্নমাত্রার সন্ধান দিয়েছেন। নজরুল ইসলাম ফারসী সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। বিদেশি সাহিত্যের মধ্যে তিনি একমাত্র আরবি ছন্দ ও ফারসি সাহিত্যই সচেতনভাবে বাংলায় গ্রহণ করেছেন। যদিও ফারসি গজল সংগীতের অনুসরণে বাংলা গজল সৃষ্টি নজরুলের আরেক অবদান। আবদুল হক নজরুল অনুদিত 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'-এর বিশেষত্ব ও বিচ্যুতির আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন হাফিজের কবিতার প্রতি নজরুল অন্যান্যের দৃষ্টান্তে আকৃষ্ট হয়েছেন কিন্তু 'হাফিজ তার কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি' (হক, ১৯৬৮:১০২)। হাফিজ অনুবাদে আড়ষ্টতা এবং অসাবধানতা এর প্রমাণ। অবশ্য এর কারণও উল্লেখ করেন তিনি– কবির মৃত্যুপথযাত্রী পুত্র বুলবুলের রোগশয্যার পাশে বসে অনূদিত হয়েছিল এই কাব্য। তবে 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' এর অনুবাদে ছান্দিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নজরুল পূর্বসুরী ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদক যথাক্রমে ফিটজেরাল্ড ও কান্তিচন্দ্র ঘোষের চেয়ে বিশ্বস্ত। কারণ তাঁরা অনুবাদ-কবিতাকে 'নতুন কবিতার মানে উন্নীত' করলেও নজরুলের অনুবাদে ফারসি ছন্দ, অন্তমিলের বিশেষ রীতি অক্ষুণ্ন থেকেছে যা বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয়েছে বলে আবদুল হক মনে করেন। যদিও তিনি অনুবাদের উৎকর্ষ বিবেচনায় কান্তি ঘোষকেই এগিয়ে রেখেছেন।

কাব্য এবং কাব্য রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে নজরুলের চিন্তার দ্বৈধ বিচার করে আবদুল হকের মনে হয়েছে নজরুল দুটি আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন, তবে সবসময় সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেননি। 'নজরুলের সমাজ-চিন্তা' প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি তাঁর মতামত বিধৃত করেছেন। নজরুলের 'শিল্পসৃষ্টি এই অসামঞ্জস্যের ও বিরোধের অসংখ্য চিহ্ন ধারণ করে রয়েছে' বলে তিনি মনে করেন। (হক, ১৯৬২:১১০) নজরুলের সমাজ-চিন্তা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই প্রতিপাদ্য অনুসরণ করে দেখা যায় যে, নজরুল তাঁর সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন আবার শিল্পীর দায়িত্বকেও তিনি অস্বীকার করতে চাননি। স্বভাবগতভাবেই তিনি সামাজিক-দায়িত্বে বা কর্তব্যবোধে উদ্দীপ্ত মানুষ। মুসলিম সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামি, অবরোধ প্রথা, সঙ্গীত ও শিল্পকলার বিরোধিতা, স্বল্পশিক্ষিত মোল্লাদের তালাক-ফতোয়া এবং পশ্চাৎপদ চিন্তা ইত্যাদি সম্পর্কে নজরুল বরাবরই প্রতিবাদমুখর ছিলেন, ছিলেন কঠোর ভাষার সমালোচক। সমাজের বিচিত্র ক্ষেত্রে নজরুলের উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতা কেবল মানবতাবোধ উৎসারিত নয়, আবদুল হকের মতে 'নজরুলের 'সাম্যবাদী'র কবিতাগুলো এবং আরও অনেক কবিতা তাঁর সমাজ-চেতনার অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি' (হক, ১৯৬২:১১৫)। তিনি 'গাহি সাম্যের গান' কবিতাকেও নজরুলের সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে একটা তাৎপর্যপূর্ণ নীতি-ঘোষণা' বলে মনে করেন।(হক, ১৯৬২:১১৫)

এভাবে মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে এবং যে-কোন ধরনের সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে নজরুলের অবস্থান কেবল সাহিত্যে নয়, গানেও সর্বত্র প্রকাশ্য। বিশেষ করে সমাজের মোল্লা-মৌলবিদের তীব্র বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করে নজরুলের গান মুসলিম সমাজ-জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছিল। আবদুল হক উদ্ধৃত করেছেন সিরাজগঞ্জের বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে নজরুলের অভিভাষণ। তরুণদেরকে তিনি আহ্বান জনিয়েছিলেন 'সঙ্গীত-শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি-নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়' (হক, ১৯৬১:১১৪)। বাঙালি মুসলমানের হীনমন্যতা দূর করে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করায় নজরুলের অবদান আবদুল হক যথাযথ গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪
অন্য অনেক বাঙালি সাহিত্যিকের মতো আবদুল হকেরও সাহিত্যে হাতেখড়ি হয়েছিল কবিতা লিখে। ১৯৪৪ সালের শেষ ক'মাস থেকে ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়ার সময় *সওগাত* ও *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় খণ্ডকালীন চাকুরিসূত্রে বিশেষভাবে প্রবন্ধের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি।[২২] বস্তুত সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় আবদুল হকের মতো প্রখর যুক্তিবাদী ও মুক্তচিন্তার প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীর পক্ষে প্রবন্ধের মাধ্যমেই সামাজিক বিলোড়নে অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল। তাই আবদুল হকের সাহিত্য ভাবনায় সমাজ এতটা গুরুত্ব পায়, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান সমাজ। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হলে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত যে-ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয় আবদুল হকের সাহিত্যবোধ তখন দিক-নির্দেশকের মতো বাংলা সাহিত্যের গতিপথ নির্ধারণে সহায়ক ছিল। প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও নিজস্ব ধরনের সাহিত্য নির্মাণের কথা তিনি অকপটে বলেছেন। তবে জাতীয় সাহিত্য, গণসাহিত্য ইত্যাদি চলতি-বিতর্কে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। তারচেয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যের গতিপথের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সাহিত্যের গলদ ও সমস্যাগুলি চিহ্নিত করাতেই ছিল তাঁর আগ্রহ। তাই ইয়োরোপ বা প্রাচ্যানুগত্য বর্জন করা, ঐতিহ্যের নামে বা ধর্মীয় অন্ধ-আনুগত্যের নামে ভিন্‌দেশি সাহিত্যকে নিজস্ব ঐতিহ্য মনে করা, বাংলা ভাষার দাবিতে হীনম্মন্যতা ইত্যাদি বিষয় তাঁর সাহিত্যচিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নাটকের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় রীতির অনুরক্ত হলেও সাহিত্যবিচারে তিনি তা নন, সরলতা ও পাঠকপ্রিয়তাকে গুরুত্ব দেন। তাঁর সাহিত্যভাবনা গড়ে উঠেছে একান্তই শিল্প এষণা থেকে। কারণ সাহিত্যিকের প্রধান দায়িত্ব তাকে শিল্পী হতে হবে, তাঁর সামাজিক দায়িত্বও শিল্পী হিসেবে তাঁর দায়িত্বেরই অংশ এই নীতিই আবদুল হকের সাহিত্যচিন্তার মূলসুর।

আবদুল হক মতামত প্রকাশে, যুক্তি প্রয়োগ বা বিস্তারে অতিমাত্রায় বিশুদ্ধতাবাদী, অথচ নীতিতে 'পিউরিটান' তিনি নন। বক্তব্য বিষয়ে কখনও কখনও ভারসাম্যনীতি বজায় রাখার চেষ্টা হলেও নিরপেক্ষ থাকার প্রয়াস এটি নয়। বরং নিজের অবস্থানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করার চেষ্টা।[২৩] আবদুল হক রচিত ব্যক্তিত্ব-মূল্যায়নধর্মী রচনা প্রসঙ্গে আহমদ শরীফের ভাষ্য থেকে জানা যায় 'দেশ-কাল-সমাজ সরকার বৈরী ছিল বলে আবদুল হক প্রায়শ তাঁর পরিব্যক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন পূর্ববর্তী প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার, মত-পথ সিদ্ধান্তের পরিচিতি দান সূত্রে। এভাবে তিনি তাঁর মনের কথা, অভিপ্রায়, অভিলাষ অনেক সময়েই পরোক্ষ বয়ান করেছেন' (শরীফ, ২০১৬:১২০)। সুতরাং বলা যায়, বক্তব্যকে নির্বিশেষ করার দিকে আবদুল হকের যে প্রবণতা তা পরোক্ষ বয়ানের লক্ষ্যে করা হয় বলে কখনও কখনও তাঁর মত আড়ালে থেকে যায়। কিন্তু তাতে আবদুল হকের প্রবন্ধের মহিমা ক্ষুণ্ন হয়নি কারণ সময়ের রূঢ় সত্য উচ্চারণে তাঁর অমিত সাহস তাঁকে চরম বিপন্নকালেও অচলিত বা বিচলিত সাহিত্যিকের দলভুক্ত করতে পারেনি। তাই সমসাময়িক আরেক নির্ভীক প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফের এই মন্তব্য মোটেই অতিরঞ্জিত নয় যে আবদুল হক ছিলেন 'পূর্ব পাকিস্তানে ও স্বাধীন বাংলাদেশে গাঢ়, গভীর, মুক্তচিন্তার যুক্তিনিষ্ঠ, প্রগতিবাদী, সত্যসন্ধ শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক' (শরীফ, ২০১৬:১১৯)।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

[১] আবদুল হক, প্রকৃত নাম মোহাম্মদ আবদুল হক, জন্মগ্রহণ করেন বাংলা ১৩২৫ সালের ২৫শে আশ্বিন তারিখ (১০ অক্টোবর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) রাজশাহী জেলার গোমস্তাপুর থানাস্থ উদয়নগর গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর বাবার নাম সহিমুদ্দিন বিশ্বাস, মায়ের নাম সায়েমা খাতুন। এগারো ভাইবোনের মধ্যে আবদুল হক ছিলেন জ্যেষ্ঠতম। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও বাবার উৎসাহ, লেখাপড়ার প্রতি অদম্য আকর্ষণ এবং মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারণে আবদুল হক শিক্ষাজীবনের সকল স্তরে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৯ সালে করটিয়া সা'দত কলেজ থেকে এইচ.এস.সি, ১৯৪৪ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ এবং ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ উত্তীর্ণ হন। আবদুল হকের মেধা-মননশীলতা গড়ে ওঠার পেছনে শৈশবের পাঠাভ্যাস বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। বাবা সহিমুদ্দিন বিশ্বাসের পাঠাভ্যাস ছিল বিধায় তাঁর ধার করে আনা বই পড়ে আবদুল হকের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। চতুর্থ শ্রেণিতে বঙ্কিমের উপন্যাস পড়ে সে-রকম উপন্যাস লেখার ইচ্ছাও তাঁর শৈশবের রোমান্টিসিজম ছিল বলে আবদুল হক স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন। (মাযহার, ২০০১:২৯-৩০) রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম সংগঠক কাজী আবদুল ওদুদের সান্নিধ্য লাভ এবং পরবর্তীকালে কলকাতায় *মাসিক সওগাত* ও *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় খণ্ডকালীন চাকুরি আবদুল হকের মানসগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। যদিও আবদুল হক অন্যের প্রভাবমুক্ত হয়ে মৌলিক সাহিত্য রচনার প্রয়াসের কথাই ব্যক্ত করেছেন।–উদ্ধৃত, মাযহার(২০০১:৩২)।

আবদুল হকের প্রথম রচনা একটি কবিতা, প্রথম প্রকাশিত লেখাও 'কে ও' নামের একটি কবিতা, প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ একটি নাটক *অদ্বিতীয়া*(১৯৫৬) অথচ বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন মননশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক হিসেবে। তাঁর প্রথম প্রবন্ধের নাম 'সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা' প্রকাশিত হয়েছিল *মাসিক মোহাম্মদী*-তে। প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ *ক্রান্তিকাল* প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। বিস্তারিত– আহমাদ মাযহার (২০০১)।

[২] বিস্তারিত আবদুল হকের সমাজভাবনা অংশের টীকায় বর্ণিত।

[৩] 'সাহিত্যসাধক আবদুল হক' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ (২০১৬:১২১) *বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* গ্রন্থের উল্লেখে এ কথা লিখেছেন। উল্লিখিত গ্রন্থে আবদুল হকের 'এই বেনামী প্রবন্ধমালা' শীর্ষক ভূমিকা থেকে সমসাময়িক কালে লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের ওপর পাকিস্তানী সামরিক সরকারের দমন-পীড়ন-নিয়ন্ত্রণের আংশিক বিবরণ পাওয়া যায়, যা থেকে প্রকৃত পরিস্থিতির ব্যাপকতা অনুমান দুরূহ নয়।

[৪] মাহবুব বোরহান (২০০১) প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির প্রকাশকালভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করে নাম দিয়েছেন– পাকিস্তান পর্যায় এবং বাংলাদেশ পর্যায়। এসব গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধের মোট সংখ্যা ১২৭টি; তন্মধ্যে পাকিস্তান পর্যায়ে ৮০টি এবং বাংলাদেশ পর্যায়ে ৪৭ টি।

[৫] পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডি, জজ–সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডি Viceroy হইয়া এ-দেশের নারীকে 'রানী' করিয়া ফেলিব। আমরা উপার্জন করিব না কেন?–যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামীর' গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না? (২০১২:৭৮)

[৬] বেগম রোকেয়ার জ্যেষ্ঠ সহোদরা করিমুন্নেসার নামে উৎসর্গীকৃত।

[৭] কাজী আবদুল ওদুদ তখন টেক্সট বুক বোর্ডের সেক্রেটারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বোমাবর্ষণের কারণে কিছু কিছু সরকারি অফিস বিভিন্ন মফস্বল শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। টেক্সট বুক বোর্ড অফিস সেই সূত্রে রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এক সহপাঠীর মাধ্যমে এই কাজ জুটেছিল আবদুল হকের। (মাযহার, ২০০১:১৫)

[৮] হায়াৎ মামুদ-এর *অমর একুশে* গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি– 'জুন মাস থেকেই বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজ আসন্ন মুসলিমপ্রধান বাঙালি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন বক্তব্য প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন আজকের প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক আবদুল হক'। (১৯৮৫:৩৩) *ভাষা আন্দোলনের আর্থসামাজিক পটভূমি* গ্রন্থে আতিউর রহমান-লেনিন আজাদ (২০০০:৩৭-৩৮) একই তথ্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে আবদুল হক *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব* (২০১৪) গ্রন্থের 'ভাষা আন্দোলনের পটভূমি' প্রবন্ধেও বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, ভারত বিভাগের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা-ভাগ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখেননি তৎকালীন বাঙালি নেতৃত্ব। তাই পাকিস্তান ও ভারতের রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক শুরু হলে ২৩ এপ্রিল ১৯৩৭ সালের দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বাংলা ভাষাকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়। আমাদের বিবেচনায় উর্দুর বিপরীতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে (যে কোন রাষ্ট্রের) এটিকেই এ যাবৎকালের প্রথম সংগঠিত প্রস্তাব হিসেবে গণ্য করা যায়। বিস্তারিত– আতিউর-লেনিন (২০০০:৩৪)।

১৯৪৭ সালের ৩ জনু ভারত-বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষিত হলে ১৭ জুন নিখিল ভারত মোছলেম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চৌধুরী খালেকুজ্জামান মজলিশ-এ-ইত্তেহাদুল মোছলেমীনের বার্ষিক সভায় 'উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হইবে' ঘোষণা দেন এবং ভাষার প্রশ্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করেন। এই সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৯ জুন তারিখের *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায়। এর প্রতিবাদে আবদুল হক *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় ২২ জুন ও ২৯ জুন তারিখে পরপর দুই কিস্তিতে 'বাংলা ভাষা-বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন যেখানে তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর অযৌক্তিকতার ব্যাখ্যা এবং বাংলার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন। সে-সময় পরপর চারটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন আবদুল হক। যদিও তার আগে ১৯৪৩ এবং ১৯৪৬ সালে যথাক্রমে আবুল মনসুর আহমদ এবং ফররুখ আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

স্ব-স্ব প্রবন্ধে বাংলা ভাষার পক্ষে তাঁদের যুক্তি তুলে ধরেছিলেন তবে উর্দুর প্রতি দুর্বলতাও তাতে প্রকাশিত হয়েছিল। বিস্তারিত– হায়াৎ মামুদ (১৯৮৫)।

[৯] এঁদের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে। তবে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আবুল মনসুর আহমদ-এর মত সুধীজন প্রতিবাদ সত্ত্বেও 'উর্দু সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ও সহনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন' হায়াৎ মামুদ (১৯৮৫:২৫)।

[১০] বস্তুত এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত অপরাপর প্রাবন্ধিকগণ জাতীয়তার এই ধারণাকে নাকচ করেছেন। এ বিষয়ে আবুল ফজল, আহমদ শরীফ এবং আহমদ ছফার বক্তব্য যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

[১১] দেখুন– 'মহাবিশ্বে নিঃসঙ্গ চেতনা' (২০১২:৩৫), 'চেতনার এলবাম'(২০১২:৪১)।

[১২] ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ* গ্রন্থভুক্ত।

[১৩] প্রবন্ধটি *মাসিক মোহাম্মদী*তে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিতে তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি বলে পরবর্তীতে লজ্জিত হয়েছিলেন। দেখুন – মাহবুব (২০০৮:৩৩)।

[১৪] *ক্রান্তিকাল*(১৯৬২) গ্রন্থের ভূমিকায় আবদুল হক 'ক্রান্তিকাল' নামকরণের আভাস দিয়েছেন 'সাহিত্যের ক্রান্তিকাল' বলে। এই ক্রান্তিকাল নতুন পরিবেশে নতুন সাহিত্যের প্রস্তুতিকাল বলে নয় শুধু, কতিপয় সমস্যাচিহ্নিত সে জন্যও। সেই সমস্যার কথা প্রবন্ধগুলিতে বিধৃত হয়েছে এমনই তিনি বলেছেন। কিন্তু যা উচ্চারণ করেননি তা হল, সামরিক শাসকের নির্দেশের নিস্পেষণে সাহিত্যের ক্রান্তিকাল চলছিল তখন। এই পরিবেশকে তিনি ধারণ করেছেন 'রেজিমেন্টেশন' শব্দের মধ্যে যা সাধারণত ব্যবহৃত হয় সেনাছাউনিতে।

[১৫] আবদুল হক লিখেছেন–'যা সাহিত্য নয় তাকে সাহিত্য বলে তুলে ধরা অসাহিত্যিক সমঝদারি।'(১৯৬২:২৩) তবে এটা সচেতন সমঝদারি। অচেতন অসাহিত্যিক সমঝদারির লক্ষণ এই যে, 'সাহিত্য বলে যা গণনীয় তার সমাদর আমাদের পাঠক সমাজে হয় না অথচ সাহিত্য নামের যা অযোগ্য তা দশকের পর দশক ধরে পঠিত হয়' (হক, ১৯৬২:২৩)।

[১৬] *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ* (১৯৬৮) গ্রন্থের 'সাহিত্যের দিগন্ত' প্রবন্ধে আবদুল হক লিখেছেন–'পাকিস্তান কায়েম হওয়ার দরুনই অঢেল আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ আমদানির যৌক্তিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এ-রূপ মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই; কিন্তু যে-কোনো ভাষার শব্দ এনে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করার এবং তার প্রকাশ-ক্ষমতাকে প্রসারিত করার অধিকার আমাদের আছে। অমন যে উন্নত ইংরেজি ভাষা, সে ভাষায়ও অজস্র বিদেশি শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে, এখনও করছে, আমরা বিদেশি শব্দ নেব না কেন? এই বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দও থাকবে, তাদের নিজস্ব কোনো বিশেষ অধিকারে নয়, জোর-জবরদস্তি করে নয়, আমাদের প্রয়োজনে।' (হক,১৯৬৮:৫০)

[১৭] আবদুল হক রচিত মৌলিক নাটক ২টি– তন্মধ্যে *অদ্বিতীয়া(১৯৫৬)* তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থও বটে, নাটকের অপর গ্রন্থ *ফেরদৌসী*(১৯৬৪)। পাঁচটি নাটিকার সংকলন *সোনার ডিম* (১৯৭৬) সহ মোট গ্রন্থসংখ্যা ৩টি। তবে তাঁর অনুবাদ নাটক রয়েছে ৮টি। তন্মধ্যে ইবসেন-এর ৭টি এবং বরার্ট শেরউড-এর ১টি। বিস্তারিত দেখুন– মাযহার (২০০১:৪৮-৭৮) এবং বোরহান (২০০৮:৩৩)।

[১৮] *ক্রান্তিকাল* গ্রন্থভুক্ত 'নজরুলের গল্প ও উপন্যাস' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

[১৯] উদ্ধৃত– আবদুল হক (১৩৮১:৩৮,৪০,৪১)।

[২০] উদ্ধৃত– (হক, ১৩৮১:৪৫)। 'বাঙালী যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলবে বাঙালীর বাংলা সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালীই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে।'

[২১] উদ্ধৃত, আবদুল হক (১৩৮১:৪৫)।
'এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালীর – আমাদের
দিয়া প্রহারেণ ধনঞ্জয়
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাতে
'রামা'দের 'গামা'দের
বাংলা বাঙালীর জয় হোক। বাংলার জয় হোক। বাঙালীর জয় হোক।'

[২২] বিস্তারিত আহমাদ মাযহার (২০০১:১৫,১৬,২১,২২)

[২৩] উদাহরণস্বরূপ 'সমাজ ও সাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি– 'শিল্পী হিসেবে লেখকের দায়িত্ব অবশ্যই শিল্পের প্রতি, কিন্তু তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক-ব্যক্তিত্ব দুটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। সে-রূপ বিচ্ছিন্নতা স্বীকার করলে এটাও স্বীকার করতে হয়, সমাজের একজন ব্যক্তি হিসেবে তিনি দায়িত্বহীন হতে পারেন না, তবে শিল্পী হিসেবে দায়িত্বহীন হতে পারেন, হওয়ার অধিকার তাঁর আছে। এ-রূপ অভিমত স্ববিরোধী এই কারণে যে, সাহিত্য সমাজের জন্যই এবং শেষ পর্যন্ত সামাজিক কাজ, এ-রূপ কাজ যা সমাজকে প্রভাবিত করে থাকে' (হক, ২০১২:১৬২)।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : আহমদ শরীফ

৩. সমাজভাবনা

শৈশব থেকেই যিনি পারিবারিক পরিবেশে দেখেছেন সাহিত্যচর্চা, শুনেছেন উৎসাহী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের আলোচনা, সেই জ্ঞানসংগ্রাহী প্রতিবেশের মধ্যমণি আবুল করিম সাহিত্যবিশারদকে (১৮৭১-১৯৫৩) ভাষা ও সাহিত্যের ওপর নিরন্তর গবেষণারত দেখার, তাঁকে আদর্শিকভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করার বিরল সৌভাগ্য যাঁর হয়েছিল সেই মনীষী গবেষক ও প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ[১] (১৯২১-১৯৯৯) বাংলাদেশের অন্যতম সমাজসচেতন, সাংগঠনিক কর্মচঞ্চল, প্রথাবিরোধী লেখক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান, কৃতিত্ব ও গৌরবের ওপর ১৭৭০ পৃষ্ঠার[২] বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণা আহমদ শরীফকে দিয়েছে ‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ হিসেব স্থায়ী অভিধা’ (কবির, ২০১৩:৬৯)। সাহিত্য সম্পর্কে আহমদ শরীফ তাঁর স্বকীয় চিন্তাভাবনা তুলে ধরতে শুরু করেন গত শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকেই।[৩] এসময় থেকে আমৃত্যু প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তিনি শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, দেশ-ভাষা-জাতীয়তা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে মানবতা, শ্রেয়োবোধ ও চিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন নির্দ্বিধায়, ‘অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহসে’।

আহমদ শরীফের সমাজভাবনা বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ, ইতিহাস ও সংস্কৃতিচেতনা পরিস্রুত। মার্কসীয় সমাজবীক্ষণ তাঁর বিশ্লেষণের করণকৌশল। ফলে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ভিত্তিতল-উপরিতল-সম্পর্কের নিরিখে সমাজ-প্রগতির সূক্ষ্ম-স্থূল যে-কোনো পরিবর্তন-আবর্তন তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। বিশ্বব্যাপী বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের রাজনীতি-অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনায় সাম্রাজ্যবাদী নকশা সম্পর্কে সচেতন পর্যবেক্ষণ আহমদ শরীফের সমাজভাবনায় প্রতিফলিত হয়। সমাজের অন্তস্তল অবধি নিরীক্ষণ-ক্ষমতা তাঁকে দিয়েছে সময়ের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও সক্রিয় সামাজিক-রাজনৈতিক ভাষ্যকারের স্থান। বিশ্লেষণের চেয়ে মন্তব্য, বিবরণের চেয়ে প্রতিক্রিয়াপ্রবণতাই আহমদ শরীফের এ ধরণের রচনার বিশেষত্ব। তিনি অর্জন করেছিলেন প্রথা বা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্যে অবাধ বিচরণ–বিজারণের পাণ্ডিত্য, সবসময় ভবিষ্যতমুখী নতুনত্বে আস্থা রাখার তথা গ্রহণশীলতার যোগ্যতা। সংস্কৃতি তাঁর লেখার মুখ্য উপজীব্য, সাহিত্যে তাঁর বিচরণ সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে। সমাজ, বিশেষত সমাজের মানুষ, তাঁর দার্শনিক অনুধ্যান– সকল ভাবনার কেন্দ্র। সমাজে মানুষের আচরণ-বিচরণ, সম্পর্ক-ব্যক্তিত্ব, চিন্তা-দুশ্চিন্তা, প্রত্যাশা-বৈপরিত্ব ইত্যাদি ভাবানুষঙ্গ ও জীবনানুষঙ্গ আহমদ শরীফের রচনার সবসময়ের বিষয়। আহমদ শরীফের আলোচ্য সমাজ শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ নয়, আধুনিককালের বাঙালি মুসলমান সমাজও– তবে প্রধানত বাংলাদেশের মানুষের সমাজ। কারণ স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে আহমদ শরীফ তাঁর মতামত প্রকাশের জন্য দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রপত্রিকা-সহ সভা-সেমিনারে বক্তৃতা-বিবৃতিকে বেছে নেন।

৩.১.

বাঙালির কৃষিভিত্তিক আধা-সামন্ত মূল্যবোধের সমাজ কতগুলো ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামোয় এবং পরবর্তীকালে সাতচল্লিশ-উত্তর সামন্ত-বুর্জোয়া মূল্যবোধের সমাজে প্রবেশ করেছিল। দেশজ বাঙালি মুসলমান সমাজের বিবর্তনধারা সম্পর্কে আহমদ শরীফের বিশ্লেষণ কয়েকটি প্রতিপাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। ইতিহাস থেকে আহৃত বিপুল তথ্য-প্রমাণ, প্রজ্ঞালব্ধ যৌক্তিক অনুমান, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় প্রশ্নোত্তর ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহমদ শরীফ এসব প্রত্যয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নিয়েছেন। কারণ বাঙালি মুসলমানের কয়েকটি বদ্ধমূল ধারণা তার মানস-স্বাস্থ্যের পরিপন্থী বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। এগুলো অপনোদনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

ক। বাংলা বলতে প্রশাসনিকভাবে মুঘল আমলের সুবাহ-ই-বাঙ্গালা এবং কোম্পানি আমলের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বোঝায় যা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত অঞ্চল। কিন্তু বাঙালি মুসলমান বলতে বাংলার দেশজ মুসলমানকেই বোঝায়। এসূত্রে বিহার বা উড়িষ্যার মুসলমান বাঙালি মুসলমান নয়, অবাঙালি মুসলমান।

খ। দেশজ বাঙালি মুসলমান সাধারণভাবে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির হিন্দু-বৌদ্ধের বংশধর। ধর্মান্তরণের ফলে তাদের জাত্যান্তর বা বৃত্ত্যান্তর খুব কমই ঘটেছে। তুর্কি-মুঘলরা তাদের শাসিতজন হিসেবেই দেখতো। গ্রামে সংখ্যালঘু দেশজ ও স্থায়ী নিবাসী মুসলমানরা ছিল ধনী-মানী-ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ শ্রেণির অনুগত ও শাসিত-শোষিত। সৈনিকবৃত্তি কখনও দেশজ বাঙালি মুসলমানের পেশা বা প্রচলন কোনোটাই ছিল না। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের যুদ্ধের ঐতিহ্য বা যোদ্ধাস্বভাব ছিল না। সৈনিক ছিল বিদেশি মুসলমানেরা, শাসনের স্বার্থেই।

গ। বাঙালি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বশীল শ্রেণি যারা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী বলে সমাজে প্রভাবশালী ছিল, তারা কেউ প্রকৃত বাঙালি ছিলেন না; ছিলেন বহিরাগত অথবা তাদের বংশধর। এমনকি বাঙালি হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈশ্যরাও ছিলেন না বাংলার ভূমিপুত্র। বহিরাগত মুসলমান যারা বাংলায় স্থায়ী হয়েছিল তারা বাংলাভাষী হলেও দেশজ নিম্নবর্গজাত বাঙালি মুসলমানের সাথে একাত্মতাবোধ করেনি কখনও।

ঘ। শিক্ষা ও বিত্তের ঐতিহ্যবিরলতা বাঙালি মুসলমানের অনগ্রসরতার মূল কারণ। দেশীয় বাঙালি মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রচলন বা ঐতিহ্য ছিল না। এর কারণ ইতিহাসের আদিপর্বে ব্রাহ্মণ্য শাসকশ্রেণি কর্তৃক বর্ণাশ্রিত সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের লেখাপড়া বা শাস্ত্রশিক্ষার অধিকার হরণের মধ্যে প্রোথিত।

ঙ। বিজাতীয় ইংরেজদের কাছে রাজ্য হারানোর যন্ত্রণা বা অপমানই বাঙালি মুসলমানের ইংরেজ-বিদ্বেষ ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহা বা ঔদাসীন্যের কারণ– এমন ধারণা প্রামাণ্য নয়। বরং শিক্ষার ঐতিহ্যসম্পন্ন পরিবার যারা মূলত বাঙালি মুসলমান শাসকগোষ্ঠীভুক্ত এবং অবাঙালি-বহিরাগত তাদের মধ্যে ১৮২৪ সাল থেকেই ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে মুর্শিদাবাদে স্কুল চালু হয়ে যায় নওয়াবদের উৎসাহে। প্রথম বিলাত যাত্রীও ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের আজিমুদ্দিন ও এহতেশামউদ্দিন।

চ। ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ভূমিকা তথা উপনিবেশ-বিরোধী চারিত্র্য অর্জনের মূল কৃতিত্ব নিম্নশ্রেণির দেশজ বাঙালি মুসলমানের।

ছ। কোম্পানি আমলের শেষাবধি সুবাহ-ই-বাঙ্গালা তথা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলের মানুষের মানসজগৎ বা সামাজিক সংস্কার-রীতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কোম্পানির কর্মচারী বা সহযোগী হিসেবে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এবং শিক্ষিত মুসলমানদের অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠা পায়। তবে অসদুপায় অবলম্বন, উৎকোচ-উপঢৌকনের সাহায্যে অর্থোপার্জনে এই শ্রেণির প্রতিযোগিতার শিকার হয় বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে নিরক্ষর ও দরিদ্র বৃত্তিজীবী, প্রান্তিক চাষী ও কুটিরশিল্পজীবী।

জ। বাঙালি মুসলমান বা নিম্নবর্ণের হিন্দুর অশিক্ষা-দারিদ্র্য ব্রিটিশ-ষড়যন্ত্রের ফল নয়, ব্রিটিশ-বিদ্বেষের কারণেও নয়। ইংরেজ শাসনের ফলে তারা নতুন করে কোনো দুর্ভাগ্যের শিকার হয়নি।

এতসব ভ্রান্তিপাশে নিমজ্জিত বাঙালি মুসলমান কতগুলো অলীক প্রত্যয় নিয়ে আত্মোন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারবে না এটা আহমদ শরীফ অনুধাবন করেছিলেন বলেই বারবার এই দেশবিচ্ছিন্ন স্বধর্মী মানসিকতাকে আঘাত করছেন। শত শত বৎসর ধরে বাঙালির যে নেতিবাচক সামষ্টিক-চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে অথবা প্রচারিত হয়েছে তা সুকৃতির নয়। আহমদ শরীফ জনরুচি ও গণমনের সেই প্রকৃতি তুলে ধরেছেন পরিবর্তনের প্রয়োজনেই–

> বাঙালি বহু জনহিতে, বহুজন সুখে অর্থাৎ সামষ্টিক বা জাতীয় কল্যাণে সজ্ঘবদ্ধ হয়ে ধৈর্য, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে দৃঢ়চিত্তে সংকল্পপুষ্ট দীর্ঘকালীন সংগ্রামে অসমর্থ। কালো পিঁপড়ের মতো সে স্ববুদ্ধি চালিত হয়ে স্বস্বার্থে ঘুরে বেড়ায়– লাল পিঁপড়ার মতো যৌথ কর্মে তার উদ্যোগ নেই। [স্বস্বার্থে ও স্বকাজে সৎ সরল দুর্বল বাঙালি অবশ্য খুব পরিশ্রমীও।] সে একাই বাঁচতে চায়, তাই অন্যকে প্রথম সুযোগেই ঠকায়– নিয়ম-নীতি-আদর্শ পায়ে দলে লাভ-লোভের সামান্য প্ররোচনায়। পরিজন প্রতিবেশীর কল্যাণের ও স্বার্থের মধ্যেই-যে নিজের কল্যাণ, স্বার্থ, নিরাপত্তা, স্বস্তি ও সুখ নিহিত– এ তত্ত্ব বা যুক্তি সে স্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না। চোর, প্রতারক, মিথ্যেবাদী, তোষামুদে, ঈর্ষা, সুযোগসন্ধানী, সুবিধাবাদী, ঋণগড়াটে ও মামলাবাজ বলে বারোশো বছর ধরে বিদেশী মাত্রেই বাঙালির নিন্দা করে এসেছে। আমাদের চরিত্রের এসব দোষত্রুটি সচেতনভাবে সংশোধন করতে হবে স্ব স্ব জীবনে। দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধিই চরিত্রের ভিত্তি। (শরীফ, ২০০৬:৩৭)

বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্যপ্রীতি প্রবল। তবে এ ঐতিহ্য দেশদুর্লভ এবং অতীতপ্রীতিজাত। এটি সংস্কারেও তার অনীহা কারণ, 'ইসলামের সর্বকালীন ও সার্বজনীন উপযোগ-চেতনা মুগ্ধ মুসলমানকে করেছে কাল ও ভুগোল-বিমুখ– তথা দেশ-কাল-পরিবেষ্টনীর গুরুত্ববিমুখ। তাদের মতে বিশুদ্ধ শাস্ত্রানুগত্যই উন্নতির সোপান, সর্বপ্রকার জাগতিক সমস্যা-মুক্তির উপায়' (শরীফ, ২০০৬:৩৯)। মুসলমানের এই মানসিকতা লালনে ইয়োরোপীয়রা বিগত পাঁচশ বছর ধরে উৎসাহ দিচ্ছে। দেশ-কাল-জাতি-প্রতিবেশচেতনা মুসলিম মনে যাতে উপ্ত না হতে পারে সেজন্য 'ইসলামি' শব্দটার বহুল প্রয়োগ সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপীয়দের প্রিয়। আহমদ শরীফ উদাহরণ দিয়েছেন–

> দুনিয়ার অন্য সব জাতির সুখ-সম্পদ-শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি দৈশিক নামে চলে ও স্বতন্ত্রভাবে বিবেচিত ও অভিহিত হয়, কিন্তু সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সব কিছু ইসলাামিক নামে পরিচিত [হোটেল, সেলুন, দোকান, নাচ, গান, শিল্প, ব্যাঙ্ক, পোশাক সবকিছুই ইসলামি] । এ অপপ্রয়োগে ইসলামের মর্যাদা ক্ষুণ্নই হয়, বরং প্রযোজ্য শব্দ হতে পারত 'মুসলিম'। সাধারণ মুসলমানও এতেই আনন্দিত ও তুষ্ট। ইসলাম যেহেতু দেশ-কাল-নিরপেক্ষ একটি জীবনতত্ত্ব ও জীবননীতি, সেহেতু 'ইসলামি' নামে অভিহিত চৌদ্দশো বছর পূর্বের আরব-সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে যেন যে-কোনো দেশের ও কালের মুসলিমের রয়েছে পিতৃধনের মতো সহজ ও স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। সেই অক্ষয় সম্পদ-চেতনাই তাকে আজ অবধি রেখেছে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চিন্ত। (শরীফ, ২০০৬:৪০)

১৯৪৭ সালে নবগঠিত পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ববাংলায় মধ্যবিত্তের উত্থানে যে সামাজিক বিলোড়ন সৃষ্টি হয় আহমদ শরীফ তার পরিণতি সম্পর্কে আহমদ শরীফের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে নতুন রাষ্ট্রে নবগঠিত মধ্যবিত্তের মনোভাবে যে ক্রমবর্ধমান অপ্রেম ও অসামাজিকতার লক্ষণ ফুটে উঠেছিল তার অন্যতম কারণ তাদের হাতে যোগ্যতাতিরিক্ত অর্থের আগমন। এর ফলে কিছু লোক উচ্চবিত্তের তালিকায় উঠে গিয়ে সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে আত্মসুখ, ঐশ্বর্যগর্ব ও আভিজাত্য-লোভের প্রবল চাহিদা তৈরি করে দিয়েছিল। সরকারি বেতনভুক্ত কর্মচারী ও চাকুরিজীবীদের বেতন বাড়িয়ে দেয়ার ফলে তাদের মধ্যে ভোগলিপ্সা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তারা গণবিচ্ছিন্ন হয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বসবাস করতে থাকে। অথচ তারাই ছিল সমাজের অগ্রসর শিক্ষিত অংশ, যাদের মাধ্যমেই সমাজ-সংস্কৃতি শক্তিশালী হতে পারতো। পাকিস্তান সরকার এভাবে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে নেতৃত্বের অগ্রসর অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হওয়ায় অসহায় হয়ে পড়ে পাঁচ কোটি সাধারণ মানুষ। আহমদ শরীফ এই বিত্তশালীদের আত্মসর্বস্বতাকে উনিশ শতকের কলকাতার মধ্যবিত্তের সাথে তুলনা করে লিখেছেন তথাকথিত উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের এই আত্মসম্মানবোধ ও আভিজাত্যচেতনা মিথ্যা কারণ 'আসলে সবাই বিত্তহীন। চাকুরি না করে যে খেতে-পরতে পারে না, সে বিত্তবান হয় কী করে' (শরীফ, ২০১০:১৯)! দিনমজুরের সাথে তার তফাৎ নেই। তৎকালীন মধ্যবিত্তের প্রকৃত অবস্থা চিহ্নিত করে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত এই বিত্তহীন বা স্বল্পবিত্ত শ্রেণির মতো অসহায় দুঃখী মানুষ এদেশে সত্যিই আর নেই। এদের বিত্তের সঙ্গে বৃত্তি-বেসাত যুক্ত না হলে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটানো মুস্কিল, বৃত্তি যা জোটে তা সামান্য কেরানিগিরি, এরা কুলি-মজুরের চাইতেও অসহায়। কেননা এরা দুঃখের কথা কইতেও পারে না, সইতেও পারে না; ভিক্ষারঝুলিও নেয়া চলে না, গাছতলায়ও বাস করতে পারে না। এবং এদের জীবনবোধ অশিক্ষিতদের চেয়েও বেশি বলে বেদনাও তীব্রতর। (শরীফ, ২০১০:১৯)

আহমদ শরীফ মনে করেন, আধুনিক যুগে যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রভাবে জনজীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে নানাভাবে। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে বড়ধরনের পরিবর্তন, শাসক শ্রেণির অত্যাচার, আর্থিক-বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট সামাজিক বঞ্চনা ও নিপীড়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবিকার কঠিনতর সংগ্রাম ব্যবহারিক জীবনে গ্লানি ও হতাশা বৃদ্ধি করেছে। মানুষ ক্রমেই হয়ে উঠছে অসহিষ্ণু, বস্তুতান্ত্রিক, অমানবিক; বিচ্ছিন্ন হচ্ছে সৃজনশীলতা ও মননজীবনের আনন্দ-সৌন্দর্য-আস্বাদন থেকে। মানুষের জীবনে আনন্দ নেই কিন্তু আনন্দের পিপাসা আছে, আনন্দোপকরণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে অথচ আনন্দ হয়ে গেছে আলেয়ার মতো অলীক। ব্যবহারিক জীবন ও মনোজীবনের এই উৎপীড়িত দুর্দশা আমাদের সমাজকেও গ্রাস করছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আহমদ শরীফ। মনোজগতের শ্রান্তি মনুষ্যজাতির জন্য বড় সংকট, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক জীবনে দ্বন্দ্ব-হানাহানির কারণ; তৃপ্তি-আনন্দ-স্বস্তি দুর্লভ বলেই নৈরাশ্য চেপে বসে জাতীয় জীবনে। এ সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা–

> যারা মার খায়, তারা সহ্য করতে অভ্যস্ত। আর যারা মার দেয়, তারাও একে অন্যায় বলে উপলব্ধি করতে অক্ষম। ফলে যে-চেতনা যে-মর্যাদাজ্ঞান, যে-অধিকার আদায়-প্রয়াস বিপ্লব আনে, তা আমাদের দেশে আজো স্বপ্ন। (শরীফ, ২০১০:২১)

আহমদ শরীফের মতে, মানুষের মনে আশাবাদ জাগানোই এর সমাধান।

বাঙালির নিষ্ক্রিয় ও অদৃষ্টবাদী জীবনাদর্শ তার আত্মোন্নয়ের পথে বড় অন্তরায়। ইতিহাসের নিগূঢ় পাঠক আহমদ শরীফ এই অদৃষ্টবাদী জীবনাদর্শ দেখেছিলেন শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক বাঙালির মধ্যেও। তাই উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষককে তুলসি পাতার দৈবগুণাগুণে ভরসা করার দৃষ্টান্তে তিনি বিরক্ত হয়ে সেই বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত হানাকেই কর্তব্য স্থির করেন। তাঁর ভাষায়–

> আমাদের দেশের জনসাধারণ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সর্বপ্রকার দুর্যোগ-দুর্ভোগকে মনুষ্যসাধ্য-বহির্ভুত তকদিরের মামলা বলে আত্মপ্রবোধের ছলে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে অভ্যস্ত। এই অদৃষ্টবাদ মানুষের পুরুষ্কারকে যুগ যুগ ধরে অপমানিত ও নিরুদ্যম করে আসছে। এখানেই ঘটেছে আমাদের প্রাণধর্মের, মনুষ্যত্বের ও আত্মশক্তির অপমৃত্যু। 'একূল ভাঙে ওকূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা'– এই হচ্ছে আমাদের স্বীকৃত জীবন-দর্শন। এ মারাত্মক সর্বনাশা সংস্কার থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে হবে। কর্মবিমুখ, সাধনাভীরু, আকাঙ্ক্ষাবিহীন জনসাধারণ আলস্যকে উদাসীনতা, অক্ষমতাকে নিস্পৃহতা, কাপুরুষতাকে সহনশীলতা, আত্মবিশ্বাসকে অহঙ্কার, পরাজয়কে অদৃশ্যশক্তির ইচ্ছা, অভাব-অনটনকে আত্মিক শোধনের উপায় ও পার্থিব জীবনের দুঃখ-বেদনাকে পারলৌকিক জীবনে সুখের আভাস ঠাওরিয়ে, পৌরুষহীন নিষ্ক্রিয় জীবনকে শ্রেয় মনে করে নিয়েছে। (শরীফ, ২০১০:২২)

এই আত্মপ্রতারণা, পঙ্ককুণ্ড থেকে জাতিকে উদ্ধার করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে সাহিত্য-স্রষ্টাদের। তারা তরুণদের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও অধিকারবোধের সাড়া জাগানোর প্রয়াস নিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৩.১.২

উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণকে 'পড়ে-পাওয়া সমকালীন য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনার স্বরূপ কিংবা তাৎপর্য অনায়ত্ত' থাকা ইংরেজিশিক্ষিত অভিজাত শ্রেণির আত্ম-উন্নয়নের জন্য 'নিদ্রাভঙ্গ' বলে মনে করেন আহমদ শরীফ।[৪] হিন্দু কলেজ ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কেন্দ্রিক আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন আহমদ শরীফ–

ক. ফারসি-সংস্কৃত-আরবিশিক্ষিত পণ্ডিত বা মৌলভি।

খ. ইংরেজিশিক্ষিত ডিরোজিও-শিষ্য ইয়ং বেঙ্গল এবং

গ. ইংরেজিশিক্ষিত Educated বা 'এজু'।

কলকাতায় উদ্ভূত উনিশশতকী রেনেসাঁস ইংরেজি শিক্ষারই প্রত্যক্ষ ফল এবং ইংরেজিশিক্ষিত 'এজু' আর স্বকালে নিন্দিত 'ইয়ং-বেঙ্গল'রা-ই রেনেসাঁসের স্রষ্টা এ বিষয়ে অনেকের মতো আহমদ শরীফেরও দ্বিমত নেই (শরীফ, ২০১২:১৮৫)। তাঁদের মনীষার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির নাম দেয়া হয়েছে রেনেসাঁস। এই মনীষাদীপ্ত তরুণদের প্রাচ্যদ্বেষণা ও প্রতীচ্যএষণাই ছিল সকল ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের উৎস। তবে কথিত এই রেনেসাঁর কয়েকটি সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে আহমদ শরীফের ব্যাখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ–

১। রেনেসাঁর মনীষীরা স্বধর্মী-স্বজাতির স্বার্থচেতনায় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে অস্পৃশ্য এবং দেশজ মুসলিমদের হিতকামী হয়ে উঠতে পারেনি; সংকীর্ণ হিন্দু-স্বাজাত্যবোধ ত্যাগ করে হতে পারেনি বৃহৎ বঙ্গের বাঙালি।

২। মানবতাবোধের বিকাশ ঘটিয়ে মাটি ও মানুষের কাছাকাছি আসতে পারেনি; আবদ্ধ হয়েছিল স্বশ্রেণি ও স্বজাতির সংকীর্ণ সীমায়।

৩। পুরোনো ধ্যান-ধারণাতেই শেষপর্যন্ত অবসিত হয়েছিল বাংলার রেনেসাঁর সংস্কারমুক্তির প্রয়াস। এর উদ্যোক্তাগণ নতুন সৃষ্টি ও নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন না, সংস্কারের মাধ্যমে পুরোনোকেই নতুন করে আস্থা ও আশ্বাসের মধ্যে গ্রহণোপোযোগী করতে চেয়েছেন।

৪। অন্যদিকে বাংলায় রেনেসাঁস যাঁরা ঘটালেন আর যাঁরা রেনেসাঁসের ফল ভোগ করলেন তাঁরা ছিলেন কলকাতা শহরের ধনী-মানী-জমিদার এবং তাঁদের সন্তানেরা। ফলে রেনেসাঁরূপ সামন্ত-বুর্জোয়ার চিৎপ্রকর্ষ গণমানবকে সমকালে কিছু দেয়নি বরং পীড়ন ও বঞ্চনা বাড়িয়েছিল শত গুণ (শরীফ, ২০১২:১৯১)।

অথচ প্রকৃত রেনেসাঁ তা-ই যা–

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে পুরোনো ধান-ধারণা পরিহার করে নতুন করে ভাববার, কল্পনা করবার, শিখবার, জানবার, আঁকাবার, গড়বার, করবার এবং উদ্ভাবনের, আবিষ্কারের আর স্বদেশকে স্বভাষাকে ভালোবাসবার এবং নিজেকে শ্রদ্ধা করবার ও আত্মপ্রত্যয়ী হবার প্রেরণা ও স্বাধীনতা দান করে। (শরীফ, ২০১২:১৮৫)

এই বিবেচনায় উনিশ শতকের কলকাতার প্রতীচ্যবিদ্যায় শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক ভদ্রলোকের-ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের-মনীষার অভিব্যক্তি, কর্মের উদ্যোগ রেনেসাঁস সীমিত অর্থে, প্রকৃতপক্ষে Reformation। আহমদ শরীফের বিবেচনায়, 'মানববাদী বামপন্থীর বিচারে এই মনীষার প্রকাশ সুন্দর হলেও সার্থক নয়। কারণ এর রূপ আছে রস আছে কিন্তু আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভিপ্রেত উপযোগ নেই' (শরীফ, ২০১২:১৯০)। অর্থাৎ এই আত্মগড়নের মধ্যে কোনো সামাজিক আন্দোলন বা সামষ্টিক পরিবর্তন সম্ভাবনা ছিল না বলে তিনি মনে করেন। তাঁর এই ধারণা আরও প্রামাণ্য রূপ পায় নিচের বক্তব্যে–

যুরোপীয় ইতিহাস-দর্শন পাঠের ফলে এবং ফরাসি বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতার শিক্ষিত লোকেরা মাঝেমধ্যে দু'চারটা সরকারি অন্যায়ের কথা, শাসিতজনের দাবির কথা অনির্দেশ্যভাবে উচ্চারণ করতেন। রামমোহন থেকে তারও শুরু, জমিদার-রায়তদের কথা, শিক্ষার কথা, আইন-কানুনের ত্রুটির কথা, উচ্চতর পদে দেশীলোক নিয়োগের দাবি প্রভৃতি। কিন্তু সবকিছু ছিল প্রায় ব্যক্তিগত, সামষ্টিক দাবি বা আন্দোলনের পর্যায়ে যায়নি কেনোটাই ১৮৬৫ সনের পূর্বে। (শরীফ, ২০১২:১৫৫)

আহমদ শরীফের মতে এসব অনির্দেশ্য উচ্চারণ যতটা আদর্শিক বা নৈতিকতাজাত ততটা লক্ষ্যাভিসারী নয়– সামাাজিক পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষা তাতে বিপ্লবী পরিণতি পায়নি।

উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণির এই আত্মোন্নয়ের সাথে বৈষয়িক ও আর্থনীতিক সম্পর্কও ছিল। তাই এ ছিল কেবল প্রতীচ্য জীবনধারার প্রভাবে কৃত্রিম উপায়ে চোখ খোলার মতো জাগরণ, 'নতুন একটা মানদণ্ডের সাথে সংযোগের চাঞ্চল্য'[৫], মানসমুক্তি নয়–

> এটি ছিল বৈষয়িক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও স্বার্থসিদ্ধির যুগ, প্রতীচ্য শিক্ষা তাদের আধুনিক বুলি ও পন্থা বাতলে দিয়েছিল মাত্র। একে 'রেনেসাঁস' নামে অভিহিত করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। কেননা, এ সময়ে মানুষের প্রতীচ্য-জীবনধারার প্রভাবে কৃত্রিম উপায়ে চোখ খুলেছে মাত্র। মন-মানসের মুক্তি ঘটেনি, সম্ভাবনার দিগন্তও হয়নি উন্মোচিত আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে কিংবা নতুনতর জীবন-চেতনায় ও জগৎ-ভাবনায়। ব্রাহ্ম-ওয়াহাবি-আর্যসমাজী মানসের ও আন্দোলনের সঙ্গে রেনেসাঁসের পার্থক্য মর্মগত ও গুণগত– লক্ষ্যগত নয়।(শরীফ, ২০১২:১৫৮)

অতএব, কলকাতার ধনী-মানী শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ 'রেনেসাঁসের জন্যে গৌরববোধ করা, সগর্বে রেনেসাঁসের মহিমা কীর্তন করা, রেনেসাঁসওয়ালাদের প্রশংসা করা প্রকারান্তরে গণ-মানবের দুর্ভোগ দুর্দশাকে অস্বীকার করার এবং মুৎসুদ্দি-কমপ্রেডরের তারিফ করার সামিল' (শরীফ, ২০১২:১৯২)।

৩.১.৩

১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র-শিক্ষকদের সংগঠন মুসলিম সাহিত্য সমাজের সংগঠকদের মন-মানসিকতা, জীবনাচার ও বিশ্বাস-বিচলন এবং সংগঠনের সাফল্য-ব্যর্থতার কথা আহমদ শরীফ বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধসমূহ– 'উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের স্বরূপ', 'কাজী আব্দুল ওদুদ', 'ওদুদ চর্চা', 'শিখার প্রাণপুরুষ আবুল হোসেন', 'মুক্তমনের ঔচিত্যবাদী আবুল ফজল' 'সাহিত্যসাধক আব্দুল হক' ইত্যাদি। এ সময়ের অগ্রসর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান তরুণদের এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল লেখার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে 'মত-পথ' সম্বন্ধে শিক্ষিত মুসলিমদের অবহিত করানো এবং প্রভাবিত করা। তাঁদের সংগঠনের মুখপত্র 'শিখা'র শিরোভাগে স্থান পেয়েছিল আদর্শিক ঘোষণা– 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। তাঁদের অবলম্বন ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি। তাঁদের মানসপটে ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বৌদ্ধিক জাগরণের নেতাদের ছবি। শিক্ষিত মুসলিম তরুণদের মধ্যে শিখা এবং মুসলিম সাহিত্যসমাজ সীমিত সময় ও পরিসরে যে চেতনাস্রোত সৃষ্টি করেছিল বিভিন্ন কারণে তা সাফল্য পায়নি কিন্তু সেই সময় এই উদ্যোগ যে ঐতিহাসিক শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেছিল তার তুলনা নেই বলেই এমন অসম্পূর্ণ বা সাময়িক উচ্ছ্বাসান্দোলনের ফলাফল আজও গুরুত্বপূর্ণ। আহমদ শরীফের ভাষায় বুদ্ধির মুক্তির 'সেই প্রাবচনিক আপ্তবাক্য আমাদের আজো নিত্য আওড়ানো কেজো বলেই, আবশ্যিক উপাদেয় বলেই জরুরী' (শরীফ, ২০১৪: ৪৫৯)।

তিনি মনে করেন 'সাহিত্যসমাজী'দের কেউ 'পরবর্তী জীবনে দ্রোহী রূপে সংস্কারক রূপে মুক্তচিন্তক রূপে স্বভূমিকা পালন করেননি। তাঁরা সকলেই ডিরোজিও-শিষ্যদের মতো পরিণত জীবনে স্বধর্মবিশ্বাসে স্থিত থেকেছেন, পাকিস্তানের সমর্থক হয়েছেন, কেউ কেউ সাম্প্রদায়িক চেতনারও স্বাক্ষর রেখেছেন। রসুল, জিন্নাহ-র প্রশস্তিও রচনা করেছেন, ইসলামি জোশ বশে লিখেছেন রসুলচরিত, অনুবাদ করেছেন কোরআন-হাদিস, অবজ্ঞা করেছেন সাম্যবাদ-সমাজবাদকে, সমর্থন করেছেন বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ও এর আবশ্যিকতা' (শরীফ, ২০১৬:১২২)। তাই আহমদ শরীফ প্রশ্ন তুলেছেন 'তাহলে কি তাদের সবটাই ছিল তারুণ্যের আবেগ-উচ্ছাসের অভিব্যক্তি, মন-মগজ-মননজাত প্রত্যয়ের সম্পর্কশূন্য?' কেবল প্রশংসা নয়, তাদের আদর্শচ্যুতির নিন্দাও সমানভাবে উচ্চারিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি (শরীফ, ২০১৬:১২২)। বাঙালি মুসলিম সমাজে এই গোষ্ঠীর কার্যক্রম বা তাঁদের চিন্তা-ভাবনা কোনো উল্লেখযোগ্য রেখাপাত করতে সক্ষম হয়নি উপরন্তু আহমদ শরীফ মনে করেন তাদের চিন্তা-ভাবনায় 'মুসলিম সমাজ মোটেও উপকৃত হয়নি'। এর কারণ ব্যাখ্যা করে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> তাদের দ্রোহের কালে বাঙলার মুসলিম সমাজে বোদ্ধা ও পড়ুয়া শিক্ষিত জন ছিল প্রায় করগণ্য। ১৯৩০-৩২ সনের গোল টেবিল বৈঠক কিংবা তার পরবর্তী মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক নীতি-আদর্শের দ্রুত প্রসার কালে শিক্ষিত মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও

> দেশকালের রাজনৈতিক চেতনা-বিরোধী হওয়ার ফলে 'সাহিত্য সমাজে'র চিন্তা-চেতনার প্রভাব তখন তার অস্তিত্বের মতোই মুসলিম মনে নিঃশেষে বিলুপ্ত। (শরীফ, ২০১৬:১২২-১২৩)

হয়তো প্রত্যাশা বেশি ছিল বলেই ব্যর্থতায় এত ক্ষোভ। এই সমালোচনার আরেকটি লক্ষ্য শিখার মূল সংগঠকদের ইসলাম ও মুসলমানপ্রীতি যা আহমদ শরীফের বিবেচনায় সময়ের উদার ও সর্বমানবিক লক্ষ্যকে পদদলিত করেছে। তাঁরা ইসলাম ও মুসলমানকে ভালোবাসেন বলেই ধনে-মানে, বিদ্যায়-বিত্তে, বুদ্ধিতে-বেসাতে পিছিয়ে পড়া স্বধর্মীকে রামমোহনী কায়দায় চিন্তা-চেতনা ক্ষেত্রে যুগোপযোগী করে তোলাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাই আহমদ শরীফের মতে তাঁরা সর্বার্থেই সংস্কারক (শরীফ, ২০১৪:,৫৩০)। বিভিন্ন সময়ে মুসলিম সাহিত্য সমাজের সংগঠকদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকার সমালোচনা করে আহমদ শরীফ যা বলেছেন তাতে স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। কখনও তাঁরা সংস্কারক, কখনও মোটেও নন। কখনও তাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো কখনও একেবারে নাকচ করার মধ্য দিয়ে এসব স্ববিরোধিতার প্রকাশ রয়েছে। বিশেষ করে মুসলমানদের ধর্মচিন্তার জড়তা ও সংস্কারান্ধতাকে তাঁরা যেভাবে আঘাত করার চেষ্টা করেছেন সেটা স্বীকার করেও কেবল আস্তিকতার মানদণ্ডে সব প্রয়াসকে নিরর্থক মনে করাও আহমদ শরীফের অতিসংরক্ষণবাদী সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। এমনকি উত্তরকালে এই সংগঠনের অকার্যকারিতা বা তাদের চিন্তাভাবনার উপযোগশূন্যতার কথাও সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়– এর কারণও নয় একক বা সুনিশ্চিত।[৬] কারণ সংগঠকদের বার্ধক্যের কালে 'অভিপ্রেত মানুষে সমাজ ভরে ওঠার'[৭] কথা স্বপ্নাতীত মনে হয়। তবে একথা অবশ্য মান্য যে, মুসলিম সাহিত্য সমাজের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে আহমদ শরীফের অনুমান অনেকটাই অব্যর্থ।

৩.১.৩

ঐতিহ্য সম্পর্কে আহমদ শরীফের নিজস্ব চিন্তা ছিল, তা আমরা দেখেছি। এই চিন্তা তাঁর সমাজভাবনাকেও প্রভাবিত করেছিল।'একটি প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা' প্রবন্ধে তিনি জাতীয়তাবাদ উদ্বোধন, সমাজে পুরোনোর পুনরাবর্তন ও পুনরাবৃত্ত ঐতিহ্যের মাধ্যমে পশ্চাতপদতা সৃষ্টির কারণগুলো বর্ণনা করেছেন। জাতীয়তাবাদের প্রভাবে ইউরোপে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য সন্ধান, গণ সাহিত্য, ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অর্জনের চিন্তা বিকশিত হয়। এর প্রভাবে লোকসাহিত্য, ইতিহাসের উপাদান ইত্যাদি গুরুত্ব পায়। ফলে ভাষা, ঐতিহ্য, লোকসাহিত্যের মতো মানবিকতা ও প্রগতির আধুনিক উপকরণগুলো বিকাশ লাভ করেছিল। কিন্তু আহমদ শরীফের মনে করেন, ঐতিহ্যপ্রীতি অতীত-আচ্ছন্নতা তৈরি করে যা পরিণামে রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতা জন্ম দেয়। 'পুরাতনে আস্থাহীনতাই বরং ভবিষ্যতে নতুন প্রত্যয় লাভের সহজ উপায়।' বস্তুত 'ঐতিহ্য প্রেরণার উৎস' এই প্রচলিত প্রত্যয়ে আহমদ শরীফের আস্থা নেই। তিনি রেনেসাঁস এবং রিভাইভালিজমের উদ্ভব ও পার্থক্য চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন যে, অতীতের পুনরুজ্জীবন রেনেসাঁ নয়, রিভাইভালিজম– যা মানুষকে অতীতগর্বী ও গৌরবময় ঐতিহ্যের আস্ফালনে আশ্রয়সন্ধানী করে। মনের বিকাশ ও বিস্তার সেখানে অসম্ভব। আহমদ শরীফের ভাষায় 'পীড়ন থেকে, কুসংস্কার থেকে, বদ্ধচিন্তা থেকে, দারিদ্র্য থেকে, অজ্ঞতা থেকে, দুর্বলতা থেকে, ভীরুতা থেকে মুক্তির অভিব্যক্ত উল্লাসের নাম রেনেসাঁস' (শরীফ, ২০১০:৪৮৭)। আড়াইশ বছর ধরে এর উন্মেষ-বিকাশ-পরিণতি দেখেছে পৃথিবীর মানুষ। এতে রিভাইভালিজমের কোনো ছাপ নেই। অতীতের অবিকল পুনরুৎপাদন বা পুনরুত্থানই রিভাইভালিজম যা ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। আহমদ শরীফ স্বভাবতই রিভাইভালিজমের বিপক্ষে। এমনকি উভয়ের সমন্বয়ও তিনি অসাড় মনে করেন। কারণ পরস্পর বিপরীত সত্যে আস্থা স্থাপন আহমদ শরীফের ভাষায় 'চরিত্রহীনতার পরিচায়ক– সত্যকে গ্রহণ না করার নামান্তর' (শরীফ, ২০১০:৪৮৭)।

সমাজে সংঘর্ষ ও সংঘাতের সমাধানকল্পে ক্ষমা ও উদারতা অথবা আক্রোশ ও সহিংসতার চর্চা দুটি পরস্পরবিরোধী প্রত্যয়। কিন্তু সমাজসংগঠনে দুয়ের গুরুত্বই আমরা লক্ষ করি। আহমদ শরীফ সমাজ থেকে বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্রে এই অনুশীলনের যথোপযুক্ততা যাচাই করেছেন 'প্রতিকার পন্থা' প্রবন্ধে। তাঁর মতে ব্যক্তির চরিত্র সংশোধন, সমাজ-রাষ্ট্রে অন্যায়ের প্রতিকার-প্রয়াস ও শাসনের নৈতিক ভিত্তি হওয়া উচিত মূলত ক্ষমা ও উদারতা। তবে বল প্রয়োগ ও শাস্তিও পরিহার্য নয়। কারণ প্রবল ও পরাক্রান্ত ক্ষমাকে দুর্বলতাই মনে করে। শোভন ও পরিস্রুত পদ্ধতিতে বাস্তবকে গ্রহণ করা এবং বর্বরতা পরিহার ও ঘৃণা করাই সভ্যতার জন্য কল্যাণকর। উভয়ের দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই সভ্যতার বিকাশ হচ্ছে। আহমদ শরীফ প্রতিকারের পন্থা হিসেবে আপাত-অকেজো সালিশ-ক্ষমা-অহিংস নীতির মধ্যে মানবিক বোধ-বুদ্ধির বিকাশ সম্ভাবিত মনে করেন। মহৎ আদর্শের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিহিত আছে বলেই বিশ্ব ক্রমশ ধীরে হলেও আদর্শকেই গ্রহণ করছে বলে তাঁর বিশ্বাস। আহমদ শরীফ Real ও Ideal-পন্থা নামে আসলে মানুষের মনোজগতে প্রতিকার-বাঞ্ছার জন্য দুই আদর্শের দ্বন্দ্বের কথাই ব্যক্ত করেছেন–

> বস্তুত বাহুবল ও সশস্ত্র প্রতিকার পদ্ধতি-আজো Real এবং বিবেক-বুদ্ধির কাছে নিরস্ত্র নিবেদন আজো Ideal । প্রাণঘাতী ও রক্তক্ষরা শাস্তিই শায়েস্তা করার মোক্ষম প্রতিকার-নীতি– এটি আজো Real অপরটি Ideal। Real -এ আপাত কার্যসিদ্ধি হয়, কিন্তু পরিণাম নিস্ফল। Ideal -এ আপাত ব্যর্থতা অবধারিত, কিন্তু পরিণাম ফলপ্রসূ। Ideal -এ পৌঁছতে সময় লাগে, Real -এর ফল তাৎক্ষণিক। Ideal ভুললে আমাদের জীবন অর্থহীন হয়ে পড়বে, আর Real -কে অস্বীকার বা অবহেলা করলে আমরা পথে দাঁড়াব। (শরীফ, ২০১০:৪৯৫)

এ প্রবন্ধে আহমদ শরীফ ফ্রান্‌জ ফানোঁ, গ্যারিবাল্ডি, মাওৎসে তুঙ, রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল নেহেরু, এলবি জনসন প্রমুখের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে আদর্শ, শান্তি ও সহাবস্থানের পক্ষে তাঁর অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে ফানোঁ-মাওৎসেতুঙ-গ্যারিবল্ডি বাহুবল-নির্ভর হিংসাত্মক সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। ফানোঁর রেচেড অব দি আর্থ থেকে উদ্ধৃতি-

> 'Violence is a cleansing force. It Frees the native from his inferiority complex and from his despair and inaction, it makes him fearless and restores his self-respect'

কিন্তু এলবি জনসন এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি থেকে পাই সহাবস্থান নীতির -

> ' To convert hostility into negotiation, bloody violence into politics and hate into reconciliation.'

আহমদ শরীফ সহিংস পদ্ধতিকে ক্ষেত্র বিশেষে অনিবার্য মনে করলেও শেষাবধি মানুষের বিবেচনা-অহিংসা-সহমর্মিতাকেই প্রতিকার পন্থা হিসেবে কাম্য ও কার্যকর বলে মনে করেন।

৩.১.৪

দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষার মান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক অথবা শিক্ষার সামাজিক প্রয়োগ ও উপযোগিতা নিয়ে আহমদ শরীফের রয়েছে সুনির্দিষ্ট চিন্তা। তাঁর এসব চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে 'শিক্ষার হেরফের', 'শিক্ষার কথা', 'দেশের শিক্ষাতত্ত্বের সূত্রায়ণ', 'শিক্ষা : সেকালে ও একালে', 'আজকের শিক্ষাভাবনা', 'শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধের সংকট', 'নামের শিক্ষা ও কামের শিক্ষা', 'প্রতিক্রিয়াশীলতার শৃঙ্খলে বদ্ধ শিক্ষা', 'তিনরঙা শিক্ষাব্যবস্থা : তিন তাসের খেলা', 'কালের চাহিদানুগ শিক্ষানীতি', 'বিদ্যাদানের ও গ্রহণের রূপান্তর ধারা' ইত্যাদি প্রবন্ধে। এসব প্রবন্ধ কোনো নির্দিষ্ট সময় বা কালপর্বে বিবেচ্য নয় কারণ আহমদ শরীফ নিয়মিতই এ বিষয়ে চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। উপরন্তু দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার শিক্ষানীতি ত্রুটিবিচ্যুতি অপসারণের লক্ষ্যে গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার দৃষ্টান্তও তাঁর আছে।

জ্ঞান, বিদ্যা ও শিক্ষার সংজ্ঞার্থ থেকেই বোঝা যায় যে এগুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন। আহমদ শরীফ সরল ভাষায় জানিয়েছেন–যা জানা যায় বা হয় তা-ই জ্ঞান, যা শিখি তা-ই শিক্ষা, যা কারণ-ক্রিয়া সমেত জানি তা-ই বিদ্যা। তিনি এই ধারণাও দিয়েছেন যে, প্রাচীন কালে শ্রুতিই ছিল শিক্ষার মাধ্যম এবং ব্রহ্মজ্ঞান ছিল একমাত্র

বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতার পৌনপুনিকতাই ছিল প্রকৃত জ্ঞানের উৎস। তাঁর মতে আজও শ্রুতিই শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে গুরুত্ব নিয়ে টিকে আছে। 'শিক্ষা : সেকালে ও একালে' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ দেশজ শিক্ষার সামাজিক বিবর্তন বর্ণনা করেছেন সেই প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রত কাল অবধি। এ প্রবন্ধে বাংলায় তথা উপমহাদেশে শিক্ষার পদ্ধতি-বিষয় ও ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের সাথে শিক্ষা বিজ্ঞানের সম্পর্ক সামান্যই। দেশজ শিক্ষার কাঠামোর চেয়ে বর্ণ ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শিক্ষার শ্রেণিকরণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণেই এর বিশেষত্ব। আহমদ শরীফের ভাষায় শিক্ষার এই বিবর্তন লক্ষণীয়–

> ব্রহ্মবিদ্যা দিয়ে যে শিক্ষার শুরু, বিদ্যা বা শিক্ষা মানেই ঈশ্বরতত্ত্ব ও শাস্ত্র জানাই ছিল যে বিদ্যা, তা আজ ডিভিনিটি থেকে যে কেবল হিউমিনিটিতে এসে আক্ষরিক অর্থে থেমেছে তা নয়, এখন স্কুলে-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো হয় না তেমন কোনো ঐহিক মানবিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নেই। (শরীফ, ২০১৬:৪৭৪)

আজকের যুগে সন্তানকে পরীক্ষা পাস করিয়ে চাকরির যোগ্য করাই অভিভাবকের উদ্দেশ্য। এর কারণ জানিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন, বৃটিশ আমলে চাকরির জন্যই লোকে লেখাপড়া করতো, ঔপনিবেশিক সেই প্রভাবের কারণে আজও পরীক্ষা পাস করিয়ে সন্তানকে চাকরির যোগ্য করাই পিতামাতার চরম ও পরম সাফল্য। এজন্যই আমাদের অভিভাবকদের চেতনায় সন্তান মানুষ হওয়া মানে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া– চরিত্রবান বা জ্ঞানবান হওয়া নয় (শরীফ, ২০০৬:১০৯)।

আধুনিক যুগে শিক্ষিত মানুষ বলতে কেবল লেখাপড়া জানা লোক বোঝায় না, 'অধিত বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয় অংশ বোধ-বুদ্ধির আয়ত্তে এনে জীবনচর্যার অন্তর্গত করে নিতে হয়' (শরীফ, ২০১০:৪৮৯)। 'শিক্ষা যদি মানুষকে জ্ঞান-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনানিষ্ঠ না করে তাহলে শিক্ষা সামাজিক-মানবিক জীবনে বৃথা ও ব্যর্থ বলেই মানতে হবে', তাই 'সুশিক্ষিত মানুষ মাত্রই স্বশিক্ষিত'– এই আপ্তবাক্যে আহমদ শরীফের আস্থা (শরীফ, ২০১৬:৪৭৫)।
তিনি স্তরবিশেষে, প্রতিষ্ঠানভেদে শিক্ষা গ্রহণের যে পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন সেটাও তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন– কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শেখার নয় জানা-বোঝার স্থান। কারণ 'প্রাথমিক স্তর হচ্ছে না-বুঝে শেখার মাধ্যমিক স্তর হচ্ছে তাৎপর্যচেতনাহীন জানার, আর উচ্চশিক্ষা হচ্ছে সবকিছুই তাৎপর্যচেতনা অর্জনের। এ শেখার, জানার ও বোঝার স্তর অতিক্রম করলেই মানুষ হয় জ্ঞানী-প্রজ্ঞাবান, ন্যায়-অন্যায়, হিত-অহিত চেতনাসম্পন্ন জ্ঞান-যুক্তি-বিবেকবাদী ব্যক্তি' (শরীফ, ২০১৬:৪৭৬)।

শিক্ষার লক্ষ্যের যে প্রকার চিহ্নিত করেছেন আহমদ শরীফ তা শিক্ষা দর্শনেরও অন্যতম দিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমানের বৃত্তিমুখী শিক্ষার অত্যধিক ব্যাপকতায় শিক্ষাজর্নের আসল উদ্দেশ্যই ব্যহত হচ্ছে বলে তাঁর ধারণা। তাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন–

> মনুষ্যত্বের অনুভব-উপলব্ধি লক্ষ্যে নৈতিক-মানসিক শিক্ষা আর বৃত্তিজীবিতা লক্ষ্যে শিক্ষা দুটো ভিন্নতত্ত্ব, দুটোর উপযোগও ভিন্ন। নৈতিক-মানসিক শিক্ষার লক্ষ্য চাকরি বা বৃত্তিজীবিতা হতেই পারে না, বৃত্তিশিক্ষা-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রও আবশ্যিক ও জরুরি। তবে শিক্ষা বলতে সদর্থেই যে শিক্ষা নীতি-নিয়ম মানা সুনাগরিক তথা সমাজসদস্য তৈরি করে, যে শিক্ষা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকনিষ্ঠ বহুজনহিত ও বহুজনসুখকামী নাগরিক সৃষ্টি করে, সে শিক্ষাই কাম্য। (শরীফ, ২০১৬:৪৭৬)

প্রাথমিক-মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় অবধি প্রশ্নোত্তরমুখী শিক্ষা তথা পরীক্ষা-পাশের শিক্ষা যে বাঞ্ছিত মানুষ তৈরি না-করে শুধু সনদ-প্রাপ্ত মানুষ তৈরি করে তা অনুধাবন করেই আহমদ শরীফ এ থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, এমন পদ্ধতি পাঠ্য সম্পর্কে কোনো কৌতূহল তৈরি করে না। তাই পঠিত বিষয়ে ব্যাপক ও গভীর এবং সামষ্টিক, সামগ্রিক ও সামূহিক ধারণা দান ও অর্জন সম্ভব হবে এমন শিক্ষাদান-গ্রহণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে।(শরীফ, ২০১৬:৪৭৫)

বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব সমাজে মানবতা ও শ্রেয়োবোধের অবক্ষয়-অবহেলার সৃষ্টি করে। তাই সমাজহিতৈষী জ্ঞানার্জনের পথে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রিক জীবনবোধের জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার চেয়ে মানববিদ্যার শিক্ষাদান ও গ্রহণ করা প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। মানববিদ্যার অবহেলায় দেশে মননশীল সমাজবিদ ও সংস্কৃতিবান মনীষীর অভাব ঘটতে পারে। তাঁদের মনীষা থেকে বঞ্চিত হলে সমাজের ও সংস্কৃতির বিকাশ মন্থর বা রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আহমদ শরীফ মানববিদ্যা তথা মানবিক বিদ্যার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জীবনের বৃহত্তর সার্থকতার জন্য–

> যে নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ ও মূল্যোবোধের উপর সমাজবদ্ধ মানুষের মনুষ্যত্ব তথা জীবনবোধ প্রতিষ্ঠিত, তার সম্যক পরিচর্যা ও উন্নয়ন না হলে মানুষ কী নিয়ে বাঁচবে! মনের ঐশ্বর্য না থাকলে প্রাণের পরিচর্যার কী সার্থকতা! মানুষের জীবনের সব সমস্যাই মানসিক। আজকের দুনিয়ার দরদী মনীষীর প্রয়োজন তাই সবচেয়ে বেশি। কেননা মানববিদ্যা বিকাশ না হলে মানুষের মানস-জগৎ প্রসার লাভ করে না। মানুষের সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিকাশের মূলে রয়েছে এই মানববিদ্যা। (শরীফ, ২০১০:১৪৫)

অর্থাৎ বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রযুক্তি-বিজ্ঞান-চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব-আইন-মনোবিজ্ঞান থেকে অন্তত দুটি বিষয় সকলের পাঠ্য করা জরুরি বলে তিনি মনে করেন।

'শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধের সংকট' প্রবন্ধেও একই অভিমত পাওয়া যায়। সাথে যুক্ত হয়েছে মানবিক মূল্যবোধের সংকটের কথা। শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োজনের উর্ধ্বে যে অদৃশ্য অথচ অনুভবসাধ্য গুণ আছে তার গুরুত্ব দিয়ে আহমদ শরীফ আবারও মানবিক শিক্ষার গুরুত্বকেই তুলে ধরেছেন–

> চিন্তার, চেতনার, মানবতার, শ্রেণীবোধের ও বিবেকের প্রসারমুখী শিক্ষাকে অবহেলা করে কেবল জীবিকার্জন লক্ষ্যে বৃত্তিমুখী পেশামূলক শিক্ষাদানের উৎসাহ জাতীয় অবক্ষয়ের লক্ষণ, এর পরিণাম পরিবারের, সমাজের, সংস্কৃতির ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকরই হবে। শিক্ষার প্রথম, প্রধান ও শেষ লক্ষ্য হবে মানবমুখিতা, নইলে জাগতিকতায়, জীবিকায়, সামাজিকতায় ও মানসিকতায় ভারসাম্য রক্ষিত হবে না। (শরীফ, ২০১০ক:৬০)

এই ভারসাম্যহীন, অসমঞ্জস, অসম বিকাশ অনপনেয় সমস্যা-সংকট ও দুর্দশার কারণ হয়ে থাকে।

গণশিক্ষার সম্ভাবনা দুর্লক্ষ্য বুঝতে পেরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসমাজকে রক্ষার স্বার্থেই প্রচলিত ছাত্ররাজনীতির অবসান চেয়েছিলেন আহমদ শরীফ। তিনি মনে করেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সকল রাজনৈতিক দলগঠন ও সভা-সমিত নিষিদ্ধ করা উচিত। তবে ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রতিবাদ-বক্তব্য-দাবি প্রকাশের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে নির্দিষ্ট পার্ক-খেলার মাঠের ব্যবস্থা থাকা উচিত। শিক্ষক বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রদের কোনো আন্দোলন বা দ্রোহের অধিকার থাকা উচিত নয় বলেও তিনি মনে করেন।

সমসাময়িক রাজনীতির প্রজন্মবিনাশী কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করে তুলতেই তাঁর বক্তব্যে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের প্রস্তাব তুলেছিলেন আহমদ শরীফ। তবে তিনি এ-ও মানেন যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর আর্থসামাজিক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে ছাত্ররাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত খানিকটা স্ববিরোধী। যেহেতু রাজনীতি শিক্ষিত লোকের নেশা ও পেশা কিন্তু তারা ছাপোষা চাকুরে বা বৃত্তিজীবী, তাই ছাত্র ছাড়া সভা-মিছিল-সেমিনার-মিটিং সফল করা সম্ভব হয় না, ছাত্ররা নিজেরাই এগুলোর শ্রোতা-সমাবেশ-আন্দোলনকারী-ভোটার-স্লোগানদাতা। তাই রাজনীতি ও রাজনীতিক দলমাত্রই ছাত্র-প্রধান, ছাত্র-নির্ভর ও ছাত্র-সর্বস্ব। নেতারা বয়স্ক, সুবিধাবাদী, নির্বাচনপ্রার্থী, সুযোগসন্ধানী। তাই এদেশে আরো বহুকাল ছাত্ররাজনীতি চলবে বলেই আহমদ শরীফের ধারণা (শরীফ, ২০০৬:১০৯)।

শিক্ষাক্ষেত্রে ধন-বৈষম্য অবাঞ্ছিত, অমানবিক ও গণবিরোধী। শিক্ষার সার্বিক সুযোগ সবার জন্য অবারিত হওয়া আবশ্যিক। সর্বোপরি 'প্রয়োজন গণশিক্ষার– যার ফলে আনাড়ি শ্রমিক কুশল শ্রমিকে উন্নীত হবে। তার জীবনবোধ হবে প্রসারিত, আকাঙ্ক্ষা হবে উঁচু। আত্মোন্নয়নে হবে আগ্রহী, তখন তারা নির্বোধ শ্রমিকমাত্র থাকবে না, হবে এক-একজন জীবিকা-উদ্ভাবক উদ্যোগী মানুষ। ফলে গড্ডলিকা-স্বভাব হবে অন্তর্হিত। এর জন্যে দরকার সদিচ্ছা ও অর্থ– বিশেষজ্ঞ বা পরিকল্পনা নয়। 'গণশিক্ষা'র ফলে সমস্যা কমবে, তা নয়, তবে সমস্যার সমাধান ব্যক্তিক সহযোগিতায় ও সামর্থ্যে সহজ হবে এবং পীড়ন-শোষণ-বঞ্চনা অবাধ থাকবে না' (শরীফ, ২০০৬:১১৫)। আহমদ শরীফ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে অসম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বিকাশমান মধ্যবিত্তের লুটেরা-লুম্পেন চরিত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন তুলেছেন–

> আজকের এ মুহূর্ত এ দেশের শিক্ষা সুব্যবস্থার সুফল কারা পাচ্ছে এবং অব্যবস্থার ক্ষতিই বা কাদের হচ্ছে? অতএব আজকের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় দু'চার লক্ষ ভদ্রলোকের বা ভদ্রপরিবারের স্বার্থ-সম্পৃক্ত। সাড়ে আট কোটি অশিক্ষিত গণমানবের সর্বপ্রকার দুঃখের নিমিত্ত শিক্ষিত শোষক ও দুর্নীতিবাজ আমলা-ঠিকাদার-কারখানাদার-দোকানদার বাই। একটা শ্রেণীর স্বার্থকে সম্পদকে ও সমস্যাকে জাতীয় স্বার্থ, সম্পদ ও সমস্যারূপে চালিয়ে দেওয়া একপ্রকার প্রতারণা। (শরীফ, ২০১০ক:৬২)

আট-এর দশকের সামরিক শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সরকারের অপরিকল্পিত, পরিণামহীন ও অবৈজ্ঞানিক নানা উদ্যোগের সমালোচনায় মুখর ছিলেন আহমদ শরীফ। তাঁর মতে একনায়ক বা পুঁজিবাদী শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থায় জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে না বলেই ভূমিসংস্কারের কিংবা কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের মতো সংস্কারমূলক কাজে হাত না দিয়ে সরকার মার্কিন অর্থে কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় গড়ে গরিবের দেয়া অর্থে ভদ্রলোকদের রোজগারের ব্যবস্থা করে দেয়। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা না করে উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় ও ব্যবস্থা করাকে অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। তাঁর মতে সমসাময়িক সমাজে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন সামান্য। প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার, উচ্চশিক্ষা নয়। 'কেননা সবাই বিদ্বান হয় না– হবে না, হওয়ার প্রয়োজনও নেই। বৃত্তি ও কৃৎকৌশল বিদ্যা সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য' (শরীফ, ২০১০ক:৬২)। শিক্ষার বিস্তার যদি সরকারের লক্ষ্য হতো তাহলে সরকারি অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় না হয়ে গ্রামে-গ্রামে স্কুল হতো বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। 'শিক্ষক শিক্ষার্থীর চরিত্র গড়ে তোলে' এমন আপ্তবাক্যকে 'ভাঁওতার জিগির' আখ্যা দিয়ে তার প্রতিবাদ জানিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> শিক্ষা, জ্ঞান বা বিদ্যা মাত্রই বন্ধ্যা, যদি না তা কর্মে আচরণে প্রয়োগ করার অভিপ্রায় থাকে। অতএব বিদ্যা জ্ঞান দান করে– চরিত্র গড়ে না। চরিত্র গঠন নির্ভর করে শৈশব-বাল্যের পারিবারিক প্রতিবেশের উপর। (শরীফ, ২০১০ক:৬৩)

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরস্পর বিপরীত বিজ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষা একসাথে চলতে পারে না। কারণ সন্দেহ ও বিশ্বাস-তাড়িত শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় অসম্ভব। পাশাপাশি আস্থা রাখাও চরিত্রহীনতার লক্ষণ। কারণ তা পরস্পর বিপরীত সত্য। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা যায় না, বিশ্বাসের ভিত্তিতে যুক্তির অবতারণাও বিড়ম্বনা। সমাজের জন্য হিতকর ও মানুষের নৈতিক জীবনের মানোন্নয়নে জন্য মানবিক শিক্ষায় গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয়। আহমদ শরীফের মতে, শিশুদের বিশেষত প্রথম শ্রেণি থেকেই একাধিক ভাষা শিক্ষার জন্য বাধ্য করা শিশুমনস্তত্ত্ববিরোধী এবং অবৈজ্ঞানিক। তিনি মনে করেন, প্রাথমিক শ্রেণিতে শুধুই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু থাকা উচিত।[৮]

'বিদ্যাদানের ও গ্রহণের রূপান্তর ধারা' প্রবন্ধে মানবিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন যে, সময় ও সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে বিদ্যার্জনের লক্ষ্যও পরিবর্তিত হয়েছে। পারমার্থিক বিদ্যার স্থলে স্থান করে নিয়েছে পার্থিব ও বৈষয়িক বিদ্যা। পরমার্থজ্ঞান অর্জনের গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে জীবন-চেতনার উৎকর্ষ সাধন এবং সমাজ সদস্য হিসেবে প্রয়োজনীয় গুণের অনুশীলন। তাই আজ বিদ্যা মানে কেবল ঐহিক ও বৈষয়িক বিদ্যাই বোঝায়। কিন্তু আহমদ শরীফ মনে করেন, বৃত্তিক শিক্ষার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে চিত্তলোকের, চেতনা-জগতের, মানবিক বোধ-বুদ্ধি-বিবেকের অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ অনুশীলনে মানবিক শিক্ষা তথা

সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব-মনোবিজ্ঞান-আইন সহায়ক হবে। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ‘মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষা ব্যবস্থায় এথিক্স ও মরালিটি শেখানোর ব্যবস্থা রাখা আবশ্যিক’ (শরীফ, ২০১০ক:৫২)। এবং একই সাথে আমাদের শিক্ষায় সমকালীন হওয়ার স্বীকৃতি থাকাও বাঞ্ছনীয়। সেজন্য যদি শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রথাগত সম্পর্কের পরিবর্তে বেচাকেনার এই যুগে কেবল ন্যায়ভিত্তিক যুক্তিগ্রাহ্য নিয়মনীতির অনুগত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে তাকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। তাঁর ভাষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হওয়া উচিত ‘ব্যক্তিত্বের আকর্ষণজাত’ এবং ‘পারস্পরিক দায়িত্বের, কর্তব্যের, অধিকারের ও সৌজন্যের ভিত্তিতে’ (শরীফ, ২০১০ক:৫৩,৫৫)।

নারী শিক্ষা নিয়েও আহমদ শরীফের ছিল নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছে মূলত পুরুষপ্রধান সমাজে। মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও নিয়োজিত হয়েছে পুরুষের আকাঙ্ক্ষাপূর্তির লক্ষ্যে। নারী ভোগ-উপভোগের এবং পুরুষের দাসী এই ছিল এককালে পৃথিবীর তাবৎ সমাজে ধারণা। এমনকি নারীর স্বতন্ত্র সত্তা দূরে থাক্ তার আত্মাও ছিল অস্বীকৃত। আর নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে মাত্র বিংশ শতাব্দীতে। সকল সমাজে সব কালেই নারী শিক্ষা ছিল অবহেলিত এবং অপ্রয়োজন-গণ্য। এমনকি যেসব সমাজব্যবস্থা অগ্রসর চিন্তার ও আধুনিক বলে ইতিহাসে বর্ণিত সেগুলোতেও নারী শিক্ষা ও নারীর অধিকার-মর্যাদার সীমাবদ্ধতা ছিল। আজও শিক্ষিতা নারী আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠতে পারেনি। সে তার অভিভাবকত্ব পিতা-স্বামী ও পুত্রের ওপর অর্পণ করে বা বৃত্তিবশে স্বীকার করে নিশ্চিন্ত হয়। আহমদ শরীফ মনে করেন, এ শতকে নারী মুক্তি পূর্ণতা লাভ করছে। পরিবারে, সমাজে, দাম্পত্যে, নাগরিক অধিকারে, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে নারী-পুরুষ সহ-সম ও অভিন্ন অধিকারবোধ নারীসত্তার ও নারীজীবনের পূর্ণবিকাশের সহায়ক হচ্ছে।

আহমদ শরীফ শিক্ষা নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে মূলত প্রগতিশীল, মুক্তমনের সুনাগরিক গড়ে তোলার প্রয়োজনে উদারনীতিক, অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমুখী ও গণমুখী শিক্ষার কথাই বলেছেন। তাঁর চিন্তা সামগ্রিকভাবে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপ। এজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মানবিকগুণের উন্মেষ-বিকাশ উৎকর্ষের লক্ষ্যে বিশেষ পাঠ্য তালিকা তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেছেন। তাঁর কারণ দেশের সমাজ, শাস্ত্র, সংস্কৃতি ও আচার মহিমা নবীন শিক্ষার্থীদের মনে-মর্মে চেপে বসলে তারা মুক্তমনের ও মননের যুক্তিবাদী বিবেকানুগত মানুষ হতে পারবে না বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা তৈরির প্রয়াসে তাঁর রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব–

১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হোক, যাতে শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে শিক্ষার্থীরা মুক্ত মন-মগজ-মনন নিয়ে জীবন চেতনায় ও জগৎ ভাবনায় অভ্যস্ত হতে পারে। ব্রিটিশ আমলের মতো ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা বাংলা।

২) উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণি অবধি সব বিষয়ে পাঠদান ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হবে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে কারণ সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হচ্ছে ইয়োরোপ এবং লিপিবদ্ধ হচ্ছে ইয়োরোপীয় ভাষায়। নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণ-মনন ও সৃষ্টিও হচ্ছে ইয়োরোপীয় ভাষায়।

৩) উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার উচ্চতম শিক্ষার বিষয়গুলো যেহেতু দেশ-কাল নিরপেক্ষ সার্বজনীন, তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক অথবা জীবিকামূলক শিক্ষা গোটা পৃথিবীতেই অভিন্ন এবং যান্ত্রিক ও পদ্ধতিগত সেহেতু আধুনিকতম জ্ঞানদানের ব্যবস্থা রাখাই কেবল প্রয়োজন।

৪) মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধুনিকতম জ্ঞানের যন্ত্রের ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখা আবশ্যিক।

৫) এখনকার তিন প্রকারের মাদ্রাসার, বাংলা মাধ্যমের ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে এক প্রকারের সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা মাধ্যমিক স্তর অবধি চালু করারই আবশ্যিক ও জরুরি। (শরীফ, ২০১৬:১৪৭)

৩.১.৫

সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থান ও অবস্থার কথা প্রতিফলিত হয়েছে আহমদ শরীফের বিভিন্ন লেখায়। তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সমাজে নারীর প্রতি অবমাননাকর ধারণা ও রীতিনীতি নির্মূলে। এসবের মধ্যে প্রধান পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করা এবং নারীকে ভোগ্যা এবং ব্যবহার্য পণ্যের মতো উপযোগমূল্যে বিবেচনা করা। অবশ্য এজন্য নারীর মানস-মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায়ও ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। বেগম রোকেয়া যার নাম দিয়েছিলেন 'মানসিক দাসত্ব' তা থেকে মুক্তি পেতেও নারীকে হতে হবে আত্মমর্যাদাশীল, দ্রোহী। 'পণ ও যৌতুক', 'শাস্ত্র সমাজ ও নারীমুক্তি', 'নারী নির্যাতন : এর শেকড়ের সন্ধানে', 'নারী মুক্তি কি আজো সুদূরে', 'নারীর স্বাধীকার আদায়ের পূর্বশর্ত' ইত্যাদি প্রবন্ধে আহমদ শরীফ এসব মতামত উপস্থাপন করেছেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্পেষণ, শাস্ত্রের নামে চাপিয়ে দেয়া অন্যায্য বিধিবিধান থেকে নারীর মুক্তি ও অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিদ্যাসাগরের সময় থেকেই। বিশ শতকের প্রথম পাদে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনই নারীদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান দ্রোহিণী। *পদ্মরাগ, সুলতানা'স ড্রিম, নারীস্থান, অবরোধবাসিনী, মোতিচুর* তাঁর একক দ্রোহের সাক্ষ্য। তিনিই প্রথম সাহস করে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন যে শাস্ত্র ও সমাজ পুরুষের তৈরি বলেই নারী সর্বপ্রকারের মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত। অতএব নারীকে আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন হতে হবে। আহমদ শরীফ নারীমুক্তির প্রধান বাধা হিসেবে দায়ী করেন শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ, সামাজিক নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতি আর কিছু অবস্থা ও অবস্থানগত অলীক বিশ্বাস সংস্কারকে (শরীফ, ২০০৮:৪৩০)। এসব বাধা অপসারণে তিনি নারীর জন্য কিছু সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন এবং নারীর পক্ষে কিছু অর্জন ও বর্জনের তাগিদও দিয়েছেন। তিনি জানতেন আইন করে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়, এরজন্য প্রয়োজন মানুষের বোধের পরিবর্তন ও মূল থেকে সংশোধন। আহমদ শরীফ গভীর মূলে নাড়া দিয়েছিলেন– তা হচ্ছে শাস্ত্রিক বিধিবিধান। আমাদের সমাজবাস্তবতায় নারীর পক্ষে শাস্ত্রবিরোধী হয়ে বা নাস্তিক হয়ে আত্মোন্নয়ন কামনা করা দুরূহ কাজ তবু 'হাজার বছর বা শত বছর'[৯] যা-ই লাগুক এ পথেই ধীরে হলেও পরিবর্তন আসবে।

সমাজে নারীর প্রতি অবমাননা ও নির্যাতনের চিহ্ন প্রচলিত যৌতুক প্রথা এবং বাল্যবিবাহের বিলুপ্তি আশু প্রয়োজন বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। আহমদ শরীফ এর জন্য কর্তব্য স্থির করার আগে নারীর প্রতি সমাজের এহেন দৃষ্টিভঙ্গির কারণ উদ্ঘাটনের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। দেখিয়েছেন এর কারণ নিহিত সমাজব্যবস্থার গভীরে–

> ১. নারী পুরুষ ভোগ্যা, ২. নারী পুরুষের চরণাশ্রিতা সর্বপ্রকারে। ৩. নারী জমি স্বরূপ, পুরুষ হচ্ছে চাষীস্বরূপ, তাই পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজে-শাস্ত্রে সন্তানে রয়েছে কেবল বাপের অধিকার, মায়ের অধিকার স্বীকৃত নয়। ৪. পুরুষের ভোগ্য বলেই পুরুষের রিরংসা প্রসূন ঈর্ষা সুপ্ত রাখার জন্যেই নারীর স্বামীনিষ্ঠ থাকা আবশ্যিক। এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে আশৈশবের মগজধোলাইয়ের ফলে নারীমনে দেহের ত্বকের মতো, প্রাণের উৎস রক্তের মতো এক প্রকার হীনমন্যতা, পুরুষনির্ভরতা এবং শাস্ত্রিক বিশ্বাসসংস্কার অবিমোচ্য অপরিত্যাজ্য হয়ে রয়েছে। (শরীফ, ২০০৮:৪৩৪)

সমাজ থেকে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নির্মূল করতে হলে শিক্ষিত মানুষের দায়িত্ব বেশি। আহমদ শরীফের মতে, 'আমাদের ভদ্র সমাজটা নবীন ও ভুঁইফোড় বলেই অলংকারে, গৃহসজ্জায় ও পোশাকে কিংবা গাড়ি-বাড়ি-শাড়ি-

স্যুটে আভিজাত্য অর্জনে প্রয়াসী। তাই যৌতুক নয় কেবল ঘুষ-জাল-জুয়া-প্রতারণাও এখানে বহুল প্রচলিত।' (শরীফ, ২০০৮:৪২৪) তাই এসব কারণ নির্মূলে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কেননা সমাজব্যবস্থা এমনি থাকলে যৌতুকও থাকবে। সমাজ থেকে যৌতুকপ্রথা উৎপাটনের উপায়গুলো আহমদ শরীফের সুপারিশ[১০]–

১. সন্তানদের স্ব স্ব জীবনসাথী গ্রহণের স্বাধীনতা দান, অর্থাৎ মা-বাবার নিরপেক্ষ থাকা।

২. সমাজতন্ত্র অঙ্গীকার করা।

৩. স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জীবিকা অর্জনে সম্মত থাকা।

৪. বিবাহের ক্ষেত্রে কুলগৌরবে বা পদমর্যাদায় কিংবা ধন-সম্পদে গুরুত্ব না দেয়া।

৫. নারীর রূপগত কারণে আর পুরুষের অর্থোপার্জনে অসামর্থ্যজাত কারণে সাথী না জুটলে কৃত্রিম আর্থিক প্রলোভনে পাত্রস্থ বা পাত্রীস্থ না করা।

৬. আমাদের উঠতি সমাজে বিবাহে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদানকে আত্মসম্মানের প্রতীক বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এটি সামাজিক প্রথা যা ভাঙা প্রয়োজন। মুদ্রাস্ফীতির কারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ও গাঁয়ের গৃহস্থদের সমস্যামুক্তির জন্যে দামি অলঙ্কার বর্জনে অনুপ্রাণিত করার আন্দোলন এখনই গড়ে তোলা দরকার।

সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ দূর করতে হলে চাই সর্বাত্মক ব্যবস্থা। এতে পুরুষ-নারী উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। আহমদ শরীফের মতে সাধারণ নারীর মুক্তির কয়েকটি শর্ত পূরণ হওয়া চাই। ১. নারীকে শাস্ত্রিক বিধিনিষেধ দ্রোহিনী হতে হবে। ২. সর্বাবস্থায় পুরুষ একপত্নীক হবে, এবং তালাকে বা বিচ্ছিন্নতায় সমান অধিকার থাকবে। ৩. সন্তানের উপর স্ত্রীরও সমান অধিকার থাকবে। ৪. কাবিন আত্মবিক্রয়ের দলিল বলেই গর্হিত এবং পরিত্যাজ্য হবে, এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার আনুগত্য পরিহার করতে হবে। ৫. স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গী-সহচরী-সহযোগীরূপেই রোজগেরে হয়ে বা স্বাধীনভাবে বাস করবে। স্বামী প্রভু বা অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃত হবে না। বন্ধু ও হিতৈষী-সহকারী-সাহায্যকারী-সহযোগীরূপে ঘরে বাইরে সঙ্গী থাকবে মাত্র। ৬. অর্থ-সম্পদে কন্যারও সমান অধিকার থাকবে। পিতৃ প্রধান সমাজে কেবল চার সংখ্যক শর্তটি মুসলিম নারী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হবে। এসব ছাড়াও মনমানসিকতার পরিবর্তনের শর্ত হতে পারে–

> স্বামী বলেই কোন পুরুষই স্ত্রীর বা নারীর মান্যজন, অভিভাবক, শাসক, নিয়ন্ত্রক, কর্তা হবে না। স্ত্রী স্বামীর নাম বা পদবী ধারণ করবে না। পুরুষ কায়িক শক্তিতে, কর্মক্ষমতায় ও বয়সে স্ত্রীর চেয়ে এগিয়ে থাকায় ক্রমে স্ত্রীর নিজের শক্তিসামর্থ্য-সাহস-কর্মক্ষমতা-সমকক্ষতা সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় শূন্য হয়ে পড়ে। এ হীনমন্যতাই নারীকে তার স্বসত্তার মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে আস্থাহীন করে তোলে এবং প্রাজন্মক্রমিক এ ধারণা স্থায়ী মানসিকতায় পরিণত হয়। (শরীফ, ২০০৮:৪৩৪)

এছাড়াও আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধ অর্জনে জন্য নারীরও রয়েছে কিছু কর্তব্য। আহমদ শরীফ মনে করেন পুরুষের মতো জীবন-জীবিকার শাস্ত্র-সমাজের রাজনীতিক-আর্থিক ক্ষেত্রে সমান স্বাধিকার আদায়ের আগে, যা তাদের সাধ্যের মধ্যে তা-ই প্রথমে গ্রহণে-বর্জনে অর্জন করে দেখাতে হবে নারীকে। যেমন:

১. নামের সঙ্গে পিতার বা স্বামীর নাম যোগ করার মতো আত্মপ্রত্যয়হীনতা পরিহার করে স্বনামে স্বসম্মানে পরিচিত হোক।

২. উচ্চশিক্ষিতা, পদে-পদবিতে ধন্য পিতার সন্তান হয়েও কাবিন নমের উচ্চমূল্যে আত্মবিক্রয়ের গ্লানি ও লজ্জা থেকে মুসলিম নারী আত্মমুক্তি বাঞ্ছিত মনে করুক।

৩. হিন্দু নারীরা স্বামীকে জীবিতেশ্বর জ্ঞান করা, জন্মান্তরেরও সঙ্গী বলে জানা পরিহার করুক, বিবাহ বিচ্ছেদের, পিতৃ ও স্বামীর সম্পদের অধিকার দাবি করুক এবং বিধবারা পুনর্বিবাহে উৎসাহী হোক।

৪. দাম্পত্য জীবনে নারী-পুরুষ সমঅধিকারে প্রতিষ্ঠিত হোক, নারী ও পুরুষ উভয়েই বিয়ে করবে। বিয়ে হবে না।

৫. সন্তানে নারী-পুরুষের মা-বাপের অধিকার হবে সমান। সন্তান ইচ্ছেমতো মায়ের বা বাপের নামে পরিচিত হতে পারবে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকারে।

৬. বিবাহপূর্ব ও বৈধবোত্তর সন্তানও সামাজিক স্বীকৃতি পাবে, যেমন পায় পুরুষের লাম্পট্য জাত সন্তান। নারীরা শরীর চর্চায় তথা ব্যায়ামে, অস্ত্র চালনায়, করাতে, লাঠালাঠিতে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠুক।

৭. স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যে রূপসজ্জাও হোক বর্জিত। স্বাধীন হতে হলে নারীকে অবশ্যই শাস্ত্রানুগত্যও ছাড়তে হবে। (শরীফ, ২০০৮:৪৩৪)

পুরুষ তথা এই সমাজেরও বুঝতে হবে নারীর সতীত্ব ধারণা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি। এই ধারণা আসলে নারী সম্ভোগে পুরুষের একাধিপত্যের স্বাক্ষর ও স্বীকৃতিজাত।আহমদ শরীফ মনে করেন, এসব মধ্যযুগীয় ধারণা শুধু বর্জনই নয় ঘৃণা করা আবশ্যক। নারী ও পুরুষ সমমাত্রায় ও সম প্রয়োজনে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কাজে সমান সম্মান পাওয়া উচিত। নারী স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পেলেই পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে। যুক্তিবাদী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে আমরা যদি অতীতের শাস্ত্রে ও পরম্পরাগত বিশ্বাস সংস্কারে আস্থা পরিহার করি তাহলে অবশ্যই সমাজ পাল্টাবে। আহমদ শরীফের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি–

> আমাদের পণ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে স্বাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে নারীতে পুরুষে শ্রম প্রয়োগে কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, দফতরে, প্রতিষ্ঠানে, সংস্থায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, আড়তদারিতে বা দোকানদারিতে জীবিকা অর্জন করতেই হবে। কেউ কারো ঘাড়ে বসে খেলে পোষ্যের হীনমন্যতা থেকে মুক্তি মেলে না। তাই নারীকে জীবিকা ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতেই হবে। (শরীফ, ২০০৮:৪৩৯)

৩.১.৬

সমাজে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিস্তার আশংকায় আহমদ শরীফের ছিল গভীর উদ্বেগ। এর কুফল সম্পর্কে সকল মহলে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অবিশ্রান্ত মৌলবাদবিরোধী লেখায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। সমাজের ইতিবাচক, সেক্যুলার, প্রগতিপন্থ, নির্বিশেষ মানবিক বিকাশের জন্য মৌলবাদমুক্ত মানুষ ও চিন্তাচেতনা অপরিহার্য। সমাজের বড় ক্ষতও এই মৌলবাদ। তাই প্রগতিশীল সমাজ গঠনের প্রয়োজনে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন সর্বপ্রকার মৌলবাদ। আহমদ শরীফের ভাষায় জীবনের দৈশিক ও কালিক প্রয়োজন-চেতনার নাম প্রগতিশীলতা। কিন্তু ‘প্রগতিশীলতার সংজ্ঞা’ প্রবন্ধে তিনি দীর্ঘতম বাক্যের মাধ্যমে প্রগতিবাদীর সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছেন, চিহ্নিত ও পৃথক করেছেন প্রগতিবিরোধী মৌলবাদী অপশক্তির বৈশিষ্ট্যকেও–

> আমাদের ধারণায় যারা জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-বিশ্বাস-যোগ্যতা-দক্ষতা নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানুষ বলেই জানে ও মানে, যারা শোষিত-বঞ্চিত-প্রতারিত-পীড়িত মানুষকে শাসন-শোষণ-দলন-দমনমুক্ত করে প্রত্যেকটা মানুষকে তার স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করার ও রাখার সংগ্রামে আস্থাবান, যারা কল্যাণকর যা কিছু নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি তাকে অনুকরণে-অনুসরণে মানব উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ-বরণ করে আত্মোন্নয়নে উৎসাহী, যারা প্রতীচ্য মনীষার সর্বপ্রকার অবদান গ্রহণে-বরণে সদা আগ্রহী, যারা যন্ত্রে, তারে-বেতারে, যানে-বাহনে, প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে আধুনিকতম প্রতীচ্য মনীষার প্রসাদ গ্রহণে জীবনে-জীবিকায়-দেহে প্রাণে-মনে স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, আরাম ও আনন্দকামী, যারা আজকের সংহত ও পরিচিত পৃথিবীতে আদবে লেহাজে সেজন্যে এবং চিন্তায় চেতনায় আবিষ্কারে উদ্ভাবনে নির্মাণে, জীবনযাপন পদ্ধতিতে, তৈজসে আসবাবে পোশাকে আহার্যে ভাষায় বৈশ্বিকস্তরে আন্তর্জাতিক হতে উৎসাহী অর্থাৎ অভিন্ন ব্যবহারিক ও মানসসংস্কৃতি সৃষ্টিতে ও বরণে উৎসুক, তারাই প্রগতিবাদী ও প্রগতিশীল।(শরীফ, ২০০৮:৪৫৯)

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থভুক্ত[১১] 'মিলন ময়দানের সন্ধানে', 'মানুষের অভিন্ন মিলন ময়দানের সন্ধানে', 'মিলন ময়দান তৈরির পথে মৌলবাদই বাধা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলো শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-জাতি-বিজাতি নির্বিশেষে মানুষের একাত্মতার চেতনাকে প্রতিবিম্বিত করে 'মিলন ময়দানের' রূপকে। তেমন সর্বমানবিক মিলন ময়দানে এক হয়ে বাস করতে হলে সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বিষয় বর্জন করতে হবে, যার প্রধান চিহ্ন শাস্ত্র ও ধর্ম। তাই এমন অভিন্নতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হলে ভাববাদীদের ছাড়তে হবে বিশ্বাস-আস্থা-ভরসার উপাদান। মৌলবাদ ও ভাববাদ অভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি তথা মিলনের পথে বড় বাধা। কারণ–

> ভাববাদীরা বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানীর সব বস্তুগত অবদান নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার করে বাস্তব ও বাহ্যজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম ভোগ-উপভোগ করে বটে কিন্তু অনাস্থায় অবজ্ঞায় উপহাসে পরিহারে বর্জন করে বিজ্ঞানকে ও বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তত্ত্বকে তথ্যকে ও সত্যকে।
>
> তারা স্রষ্টাতে বিশ্বাস, আস্থা ও ভরসা রাখে (belief, faith, trust) জন্মে, জীবন মৃত্যুর ও মৃত্যু-উত্তরকাল পরিসরে যা ঘটে যা ঘটবে সব কিছুর স্রষ্টা, নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রকরূপেই। এবং শৈশব থেকে জীবনাবসান কাল অবধি স্রষ্টার প্রতি অনুরাগী থাকা তার মানব-প্রতিনিধির মাধ্যমে দেয়া বিধি নিষেধ নামের শাস্ত্র মেনে চলা, তার আদেশের নির্দেশের অনুগামী থাকা এবং সারা জীবন ধরে জাগ্রত মুহূর্তে তার অনুগত থাকা দেহে প্রাণে মনে উপাসনা করা, স্রষ্টায় ও শাস্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। (শরীফ, ২০১৬:৭৭)

এমনকি আহমদ শরীফ বিশ্বমানবতার মিলন ময়দান সৃষ্টির স্বার্থে অভিন্ন স্রষ্টা মেনে নেয়ায় বিশ্বাসী; শুধু স্ব স্ব শাস্ত্র পরিমার্জন করে মানুষের জন্য কালোপোযোগী করলে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক ঐক্যের জীবনযাপন পদ্ধতি ও ব্যবহারিক সংস্কৃতি মানুষের আয়ত্ত হতো। ফলে বাড়তো সহাবস্থান ও সহযোগিতার গুরুত্বচেতনা। বিশ্ব মানুষের জন্য বসবাসের অধিকতর যোগ্য হয়ে উঠতো। তাঁর এই উপলব্ধি গুরুত্বপূর্ণ যে–

> অতএব স্রষ্টা মান, পৃথিবীর বিভিন্ন শাস্ত্রোক্ত অভিন্ন বিধি নিষেধগুলো আচারে আচরণে অনুশীলন কর, তা হলেই বৈরী পৃথিবী করুণার ও মৈত্রীর আধার হয়ে মানুষের জন্যে বৈশ্বিক স্তরে আন্তর্জাতিক মিলন ময়দান তৈরি করবে। নির্মাণ করবে মানুষের জীবন যাপনের অভয়াশ্রম ও আশ্রম। (শরীফ, ২০১৬:৭৭)

আহমদ শরীফের এই প্রতিপাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে– সার্বজনীন স্রষ্টা মানুষের মিলনের পথে বাধা নন, বাধা শাস্ত্র। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে মৌলবাদীর অস্ত্রই শাস্ত্র। আহমদ শরীফ-মানসের অভিন্ন মিলন ময়দান সন্ধান শান্তির লক্ষ্যে অবিরাম চলতেই থাকবে।

পঁচাত্তর পরবর্তীকাল থেকে আশির দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় এক দশকে স্বাধীন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অবলুপ্তি ও সামরিকশাসনের প্রতিষ্ঠা-প্রভাবে আর্থসামাজিক-রাজনীতিক ক্ষেত্রে সর্বত্র গণমানবের অধিকারহীনতা, দুর্দশা-দুর্ভোগ, সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির প্রসার, সামাজিক অনাচার-অত্যাচার-অন্যায় প্রবৃদ্ধি লাভ করেছিল। 'কালের দাবী ও রাজনীতি', 'উন্নয়নশীল দেশে রাজনীতিক ও গণমানব', 'দেশ ও রাজনীতি', 'আজকের বাঙলার রাজনীতি', 'ইদানীং সংবাদে বিম্বিত বাঙলাদেশ', 'নেতৃত্ব-সংকট', 'তেমন মানুষ চাই', 'গণনেতার প্রতীক্ষায়', 'অবক্ষয় কবলিত বাংলাদেশ', 'কে ধরবে হাল কে উড়াবে পাল' ইত্যাদি প্রবন্ধে সমসাময়িক সরকারি-রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ-পদক্ষেপ-কর্মকাণ্ড, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আহমদ শরীফের প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত 'নেতৃত্ব-সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন–

> স্বাধীন বাঙলাদেশে কাম্য কিছু বৃদ্ধি পায়নি। বেড়েছে মুদ্রা, বেড়েছে দ্রব্যমূল্য, বেড়েছে খুনখারাবী ও রাহাজানি। বেড়েছে ছল-চাতুরী-প্রতারণা, বেড়েছে ভেজাল, বেড়েছে জুলুম-জালিম ও মজলুম। বেড়েছে সোনার দাম। তাই মা-বাপের প্রশ্রয়ে বেড়েছে ছেলেমেয়েদের মুক্তাঙ্গন প্রেম, তৎসম্পর্কিত প্রতারণাও এসিড ছোঁড়া। বেড়েছে ধনী সন্তানদের ব্রিটেনে, যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় বসবাস। বেড়েছে দুবাই-ওয়ালার ধনের আস্ফালন, বেড়েছে কুমারী মেয়েদের সালওয়ারকামিজ প্রীতি, বেড়েছে তরুণদের জামার খোলা বোতামে কেশর প্রদর্শনী আর বেড়েছে রাজনীতির অঙ্গনে টাউটের সংখ্যা। (শরীফ, ২০১০ক:৮৪)

আহমদ শরীফ মনে করেন এ সময়ের সকল বিকৃতি-বিপর্যয় ও দুরবস্থার জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষিত শহুরে লোকের ধনলিপ্সা ও মানঅন্বেষা' (শরীফ, ২০১০ক:৯০)। তাছাড়া শিক্ষিতের চারিত্রিক অধঃপতনকেও তিনি অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। কিন্তু এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা, ঐক্যে অক্ষমতা বা যূথবদ্ধ সংগ্রামে অপারগতা সর্বোপরি গণমানবের মুক্তি-কাঙ্ক্ষী, দৃঢ়-চরিত্র, মনীষাদীপ্ত, সাহসী নেতৃত্বের অভাবের কারণে রাষ্ট্র 'স্থির সমুদ্রে ছেঁড়াপাল, ভাঙা-দাঁড় ও হৃতহাল একটি নৌকা'র মতো লক্ষ্যহীন ভাসমান (শরীফ, ২০১০ক:৮৩)। এ সময়ে আহমদ শরীফ এমন নেতৃত্ব আশা করেছিলেন 'যে নেতা জানেন জীবনে জয় ও প্রতিষ্ঠা আপোসে নয়, প্রতিরোধে ও সংগ্রামেই সম্ভব। তিনি আরও জানেন– শ্রেয় রয়েছে কুকুর হয়ে আদর পাওয়ায় নয়, বাঘ হয়ে 'গুলি' খাওয়ায়' (শরীফ, ২০১০ক:৮৪)। বাংলাদেশের জন্য নিবেদিত একজন সাহসী নেতার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা আহমদ শরীফের সবসময়ই ছিল।

৩.১.৭

আট-এর দশকের অন্তিমে এবং নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের জন্য স্বৈরশাসক বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে আহমদ শরীফ আদর্শিকভাবে সক্রিয় বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করেন। এসময় পত্রপত্রিকায় দেশের সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে নিরন্তর প্রবন্ধ-নিবন্ধ-কলাম লেখার মাধ্যমে চলতি বিষয়ের ওপর তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণস্বভাব প্রকাশিত হয়। গণমানুষের হিতকামী এবং মানবতাবাদে অবিচল আস্থার কারণে যে কোনো সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে আহমদ শরীফ দিকনির্দেশকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছেন। অদম্য জেদ, সাহস ও ক্ষতিস্বীকারে অভীক ছিলেন বলেই এসব পরিস্থিতিতে গা-পা বাঁচানোর চিন্তা তিনি করেননি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দেশপ্রেমিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের অভাবপ্রসূত অনির্দেশ্য রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে দেশের আর্থসামজিক-প্রশাসনিক-আমলাতান্ত্রিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ায় আহমদ শরীফের সকল ক্ষোভ-বাক্যবাণ দল ও দলীয় রাজনীতির উপর অনেকবারই বর্ষিত হয়েছে। 'দেশের অনির্দেশ্য বেতাল বেঢক হালচাল' প্রবন্ধে এর পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের সামজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামতে দলীয় বিবেচনার চেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে সাধারণ মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্টতা। রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি-কর্মকাণ্ড ছাড়াও তাদের আদর্শিক অবস্থানও আহমদ শরীফের বিবেচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। এক্ষেত্রে, আদর্শিক সহযোদ্ধা হওয়ায়, একমাত্র বামপন্থীদের সমালোচনায় আংশিক নমনীয় হলেও[১২], দোষ-ত্রুটি-ব্যর্থতা তুলে ধরতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি আহমদ শরীফ। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমের সমালোচনার উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য–

> আওয়ামী লীগ, বাকশাল, বি.এন.পি, অতীতাশ্রয়ী মৌলবাদী জামায়েত ইসলামী, জাসদ, বাসদ, ন্যাপ, এন.এ.পি. প্রভৃতি ও নিম-বামদল, সব বুর্জোয়া দল ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে বটে, তাদের দিয়ে কোন লোকোপকারের আশা-আশ্বাস নেই। জনগণের প্রতি তাদের কোন দরদের সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই তাদের কথায় ও আচরণে। তারা গা-পা বাঁচিয়ে আস্ফালন করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিরোধ কিংবা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। (শরীফ, ২০১২:২৫৫)

সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ সংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন–'অর্থসম্পদ বণ্টন ব্যবস্থায় 'অতি' এবং 'অনা' শ্রেণিই সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছে, সঙ্কটের উৎস এখানেই' (শরীফ, ২০১২:২৮৫)। অবশ্য এই সংকট আত্মপরিচয় অবজ্ঞাসহ ঐতিহাসিক নানা ভ্রান্তিরও ফল।[১৩] আহমদ শরীফের মতে, কালান্তরে প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পন্থা আছে তিনটি– ধনে, মানে ও গুণে বড় হওয়া। দেশে ধনের ও মানের মানুষরাই বড়লোক। গুণের মানুষ হতে উৎসাহ বোধ করছে না কেউ– এটাই শিক্ষার গলদ। সমাধান সম্পর্কে

আহমদ শরীফের মত, বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষাকে গলদমুক্ত করে 'সমাজে মানুষের অর্থ সম্পদের অধিকারে দুর্লঙ্ঘ্য দুস্তর ব্যবধান-বৈষম্য ঘুচাতে হবে' (শরীফ, ২০১২:২৮৮)।

স্বাধীনতা-পরবর্তী এক যুগের মধ্যে (১৯৭৭ এবং ১৯৮৬-র একদশকের কালিক ব্যবধান সত্ত্বেও) বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় ঘুষ-দুর্নীতি-ভেজাল, মারামারি-কাড়াকাড়ি-হানাহানির অবস্থার কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়নি। বরং আবর্তিত সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র হিসেবে দেখা দিয়েছে নেশা ও মাদক, শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভোগলিপ্সা। (শরীফ, ২০১২:৩১৬) এই পরিস্থিতিতে আহমদ শরীফ বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক অভিলাষের ঐতিহাসিক সামাজিক-আর্থনীতিক কার্যকারণ অনুসন্ধান করে সমাজের অভ্যন্তরের আন্তরসত্য উপস্থাপন করেন। দুহাজার বছরের নির্জিত নিরক্ষর বাঙালি মুসলিম সমাজে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও জীবিকার্জনের আধুনিক উপায় আয়ত্তের উচ্চাশা বহুকালের বঞ্চিত মনে এক অপ্রতিরোধ্য ভোগ-বাঞ্ছার সৃষ্টি করেছিল বলেই শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালি মুসলমানের পক্ষে মুক্তস্বাধীন বাংলাদেশ ছিল ভোগ-উপভোগের জগৎ। 'সংকটের মূলে' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের বর্ণনায় পরবর্তী চিত্র–

> এ ছিল বুভুক্ষুর মিছিল। 'মুক্তবাংলা'য় আমরা এ বুভুক্ষুদেরই অবাধ অসংযত ও অসংকোচ লুটপাট, কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি ও ঠেলাঠেলির চরম লীলা প্রত্যক্ষ করেছি। অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির ফলে তা শিক্ষিত সমাজে আজ ভিন্নাকারে প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রজ্ঞাবানের প্রত্যাশা ছিল– দ্বিতীয় পুরুষে লিপ্সা মন্দা হবে, প্রলোভন হবে প্রশমিত, অথবা সমাজ-ব্যবস্থার হবে পরিবর্তন। কিন্তু দেশে আজো দশ কোটি মানুষ এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের ঘরেও দ্রুত তৈরি হচ্ছে নতুন শিক্ষিত বুভুক্ষু। কাজেই আর্থিক-রাষ্ট্রিক এ ব্যবস্থা বহাল থাকলে লুটপাট, কাড়াকাড়ি, হানাহানি বাড়বে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এমনি অবস্থায় সদিচ্ছা, সুবুদ্ধি ও সৎসাহস নিয়ে গণকল্যাণে নামার লোক থাকবে সংখ্যালঘু; কিন্তু জনহিতৈষীর ছদ্মবেশে দাঁও মারার উদ্দেশ্যে রাজনীতির আসর এখনকার মতোই সরগরম রাখবে অন্য সবাই। ঘুষে-ভেজালে-পাচারে-চোরাকারবারে যেমন তা প্রকট, সুযোগসন্ধানী-সুবিধাবাদী-মিথ্যুক-প্রবঞ্চক-প্রতারক-চাটুকারের আধিক্যেও তেমনি তা প্রমাণিত। (শরীফ, ২০১৬:২৯০)

স্বাধীনতা-উত্তর সামরিক সরকারের সময় সামাজিক পরিস্থিতির ভয়াবহতা বর্ণনায় আহমদ শরীফ 'জাতির বিবেক' খ্যাত আবুল ফজলের উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন–

> তরুণ-সমাদৃত আবুল ফজলকেও তাই 'উপদেষ্টা' হয়ে 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের' আর্থিক জীবনে 'ইসলামী নীতির' এবং ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনা বর্জনের মহিমা বর্ণনায় মুখর হতে দেখি। তাঁর আকস্মিক টুপীপ্রীতিও স্মর্তব্য। ... মুক্ত বাঙালাদেশ যারা চায়নি, সরকারী প্রশ্রয়ে তারাই প্রশাসনিক পদে জাঁকিয়ে বসেছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও আসর দখল করেছে তারাই। (শরীফ, ২০১২:২৯৩)

ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদী মহলের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশে দেশে সামরিক শাসন, মৌলবাদ ও এনজিও-র প্রতিষ্ঠা ও পুঁজিবাদী শোষণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও আট-এর দশকে রাজনীতির নামে যে অশুভ শক্তি বেড়ে উঠছিল তা বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন আহমদ শরীফ। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক এ সময়ের রাজনীতির সাথে আহমদ শরীফের সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন–

> ১৯৮০-র দশকের গোড়া থেকে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদী মহল পৃথিবীর দেশে দেশে জনসাধারণকে এবং সকল প্রগতিশীল শক্তিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার হীন-উদ্দেশ্যে রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করার দুরভিসন্ধি নিয়ে যেসব উস্কানিমূলক প্রচার কার্য চালাচ্ছে সেগুলোকে তিনি কুসংস্কার দূর করার আন্তরিক প্রয়াস মনে করেছেন, এবং সেসবের বিরুদ্ধে ধর্ম-ব্যবসায়ী ও ধর্মান্ধ অপশক্তির যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলায় তিনি সক্রিয় হয়েছেন ও স্বতঃস্ফূর্ত উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন। 'মৌলবাদ' বিরোধী প্রচারে তিনি উৎসাহ বোধ করেছেন। তিনি লক্ষ করেননি যে, এর ফলে সমাজের লুপ্ত ও সুপ্ত কুসংস্কারগুলো জেগে উঠছে। (কাসেম, ২০০১:১৭১)

অন্যদিকে জনসংখ্যা ও বেকার সমস্যা বৃদ্ধির কারণেও সমাজে অস্থিরতা, দুর্নীতি, উদ্ধত, বেপরওয়া, প্রতারক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটি অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রয়োজন। পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত

পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বাজার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এর প্রতিকারের কথা ভাবা যেতে পারে বলেও মনে করেন আহমদ শরীফ (শরীফ, ২০১২:৩০২)। তাঁর মতে, প্রগতিবাদী ও মৌলবাদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস-বৃদ্ধির ওপরেই নির্ভর করে এগারো কোটি বাঙালির আর্থিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক জীবনের ভাবীরূপ (শরীফ, ২০১২:৩১৫)।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বৈরশাসনোত্তর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের সময় সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজ নামে যে ধারণা বিস্তার পায় সে সম্পর্কে আহমদ শরীফের বিশ্লেষণ গুরুত্বহ। Civil Society প্রতীচ্যে উদ্ভূত একটি তত্ত্ব ও ব্যবস্থা। এটি পুঁজিবাদী বুর্জোয়া বিশ্বছকের অংশ এবং সাম্রাজ্যবাদিদের কাজে লাগে মূলত তৃতীয় বিশ্বে মার্কিন মহাজনী ব্যবসার চাল 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' চালু করতে। আহমদ শরীফের ভাষায়–

> এর মোদ্দা তাৎপর্য হচ্ছে, তাত্ত্বিক নির্যাস হচ্ছে, গোটা দুনিয়াব্যাপী আমরা আমাদের স্ব স্ব পণ্য বেচা-কেনার বাজার পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত ও অবাধ করে দিচ্ছি, ভালো পণ্যের আদর-কদর হবে, অর্থাৎ 'সার্ভাইভ্যাল অব দ্য ফিটেস্ট' 'ফ্যায়ার প্লে অ্যান্ড নো ফেভার' নীতিই সবার পক্ষে সমভাবে প্রেয় ও শ্রেয়। তার গলিতার্থ হচ্ছে প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টেকো তো ভালো। নইলে দারিদ্র্যে-অনাহারে মর! তখনো আমরা দানে-ত্রাণে তোমাদের বাঁচিয়ে রাখবো। বাজার অর্থনীতি যেমন মার্কসবাদ ও মার্কসীয় সমাজ ব্যবস্থা বিরোধী এবং কম্যুনিজম 'নিপাত' করার অন্যতর পুঁজিবাদী-বুর্জোয়া নীতি প্রসূন, তেমনি 'সুশীল সমাজ' চিন্তা-তত্ত্ব-জিগির-স্লোগান-নারাও গণতন্ত্রের মৌল অঙ্গীকার এবং সমাজতান্ত্রিক নীতি-আদর্শ বিরুদ্ধ। (শরীফ, ২০১৬:১৯০)

কাজেই Civil Society বা সুশীল সমাজ চেতনা ও পরিকল্পনা আর বাস্তবায়ন প্রয়াস মূলত মধ্যযুগীয় শাস্ত্রের লোকাচারের যান্ত্রিক ছাঁচে তৈরির অলীক, অবাস্তব ও অসার্থক স্বপ্ন ও সাধ মাত্র। গণতন্ত্রে নাগরিক মাত্রেরই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আবশ্যিক ও জরুরি আর স্বীকৃত মৌলমানবাধিকার। Civil Society বা সুশীল সমাজ গোড়াতেই নাগরিকের এ অধিকারে হামলা রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে।

'প্রথাসম্মত ভদ্রতাকে ঘৃণা ক'রে আহমদ শরীফ রোধ করতে চান সুবিধাবাদী ভদ্রতাকে। 'বেয়াদবি' নামে প্রবন্ধ লিখে স্তব করেন তিনি বিদ্রোহী বেয়াদবের' (হুমায়ূন, ২০০৪:৩২)। প্রতীকী অর্থে সমাজে সমষ্টির বেয়াদবি চালু করার কথা বলেছেন তিনি। ব্যক্তির বেয়াদবি আমাদের কাছে অন্যায় বা অশোভন, দুরাচার তো বটেই। কিন্তু বেয়াদবির মধ্যে প্রচলকে মেনে না নেয়া এবং নতুন প্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠিত করার যে ঔদ্ধত্য আছে তা যদি সমষ্টির লক্ষণ হিসেবে প্রকাশিত হয় তাহলে সমাজের প্রগতিশীলতা বহুগুণে বিভূষিত হবে বলেই আহমদ শরীফ মনে করেন। তাই এক ভিন্নধর্মী ব্যঞ্জনায় সাধিত প্রবন্ধে 'বেয়াদবি'র সামাজিক নেতিবাচক অর্থকে অন্তর্গূঢ় ইতিবাচক ব্যঞ্জনায় প্রতীকায়িত করেছেন আহমদ শরীফ। এই ব্যঞ্জনায় বেয়াদবির মধ্যে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার তাড়না আছে। আছে 'প্রগতির লক্ষণ, আত্মচেতনার অভিব্যক্তি, বিদ্রোহের বীজ, বিপ্লবের সংকেত, নতুন সমাজসংস্কৃতির পূর্বাভাস।' পুরাতনের বিরুদ্ধে নতুনের স্পর্ধিত আত্মপ্রকাশের নাম বেয়াদবি।

জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আর্থরাজনীতিক, বৈষয়িক, পেশাগত, উৎপাদন যন্ত্রের প্রয়োগ ইত্যাদির নতুন নতুন প্রভাব মেনে নিলে পারিবারিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহার-সংস্কৃতি-সম্পর্ক সকল ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পরিবর্তন মেনে না নিয়ে উপায় নেই। এমন পরিবর্তনকে অভ্যস্ত-স্বস্থ ব্যক্তি বা দল যারা জন্ম থেকেই সম্মান-সৌজন্য-ভক্তি-আনুগত্য পেয়ে আসছে এবং তাকে অধিকার বলে ভাবতে শিখেছে তাদের পক্ষে মেনে নেয়া দুরূহ। ফলে একসময়ের মুরুব্বি-ধনী-বিদ্বান-শহুরে মানীদের মানসম্মানে আঘাত লাগে, তারা একে বেয়াদবি আখ্যা দেন। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন তাকে মেনে নিতেই হয়। বেয়াদবি তাই পরিবর্তিত প্রতিবেশে গণমানবের ভাগ্য পরিবর্তনের পন্থা এবং ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্র্যকামিতার লক্ষণ বলেই মনে করেন আহমদ শরীফ। সাহিত্য ক্ষেত্রেও এমন 'বেয়াদবি'-র পরিচয় দিয়েছেন আহমদ শরীফ–

> লোকনিন্দার পরওয়া না করে সমাজ গর্হিত আচরণ যেমন অবাঞ্ছিত তথা বেআদবি, তেমনি সাহিত্যে-শিল্পে-দর্শনে-ইতিহাসে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারের নিন্দা, পুরোনো শাস্ত্রে শ্রদ্ধার স্বল্পতা, সমাজের পুরোনো নিয়মনীতি পালনে শৈথিল্য, বিজ্ঞাননির্ভরতা, যুক্তিবাদিতা, আন্তর্জাতিকতা, স্বাধিকার চেতনা, স্বায়ত্তশাসনে আগ্রহ, আর্থিক জীবনে সুবিচার ও সমাজতন্ত্রে স্বস্তির আশ্বাস প্রভৃতিও সামন্ত-বুর্জোয়াদের কাছে বেয়াদবি ছাড়া কিছুই নয়। (শরীফ, ২০১১:৫৯)

তাই 'জয় হোক বেয়াদবের' এমন আশা করার মধ্যেই নতুনের আবাহন ধ্বনিত। বেয়াদবি আসলে প্রগতিশীলতারই নামান্তর।

৩.১.৮

আহমদ শরীফ ততটা রাজনীতি বিশ্লেষক নন, যতটা সমাজ-বিশ্লেষক। আবার সমাজ বিশ্লেষণও তিনি পদ্ধতিগতভাবে করেন না। কিছুটা মার্কসীয় সমাজ বিশ্লেষণধারার সহায়তা ও ইতিহাসের নিবিড় অনুসরণ এবং প্রধানত ঘটনা বা বিষয়ের সাথে তাঁর মনন-সংবেদনার জারণ-বিজারণে তৈরি হয় আহমদ শরীফের সমাজভাবা। দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন পর্যবেক্ষণের সাথে গণমানুষ ও জনসমাজের চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশা, সম্ভাবনা-ব্যর্থতার তুলনামূলক চিত্র হয়তো তাঁর প্রবন্ধগুলোকে সাময়িক প্রয়োজন ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা দেয় না। সামাজিক পরিবর্তনেরও তিনি পর্যবেক্ষক, কখনও সমালোচক বা ভাষ্যকার কিন্তু বিশ্লেষক নন। আহমদ শরীফ সমাজের সকল সমস্যার সমাধান মার্কসবাদী অর্থনীতি বা সমাজতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজে পান সকল ক্ষেত্রে–

> পুঁজিবাদীর-বুর্জোয়ার কোনো নীতি-নিয়ম-ব্যবস্থাই গণমুক্তি ঘটাতে পারে না। মার্কসবাদই কেবল মানুষ মাত্রেরই খেয়েপরে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার স্বীকার করে এবং সুস্থ সমর্থ জনগণকে কাজ দিয়ে শিশু রুগ্ন-বৃদ্ধ-পঙ্গু-পাগলদের ভাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখাই হচ্ছে মার্কসবাদী সরকারের তথা রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে স্বীকৃত। এ জন্যে আজো মার্কসবাদের কোনো বিকল্প মেলে না। উন্নততর ও শ্রেষ্ঠতর অন্য কোনো নীতি-নিয়ম-ব্যবস্থা উদ্ভাবিত না হওয়া অবধি মানববাদী, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানবাদী ও বিবেকবাদী মাত্রেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে প্রয়াসী হওয়া। (শরীফ, ২০১৬:১৯১)

একবিংশ শতকে বাংলাদেশের প্রায় সবক্ষেত্রেই নতুন শিক্ষা-সম্পদ প্রাপ্ত ভুঁইফোড় লুম্পেন বুর্জোয়া শ্রেণি স্বস্থ হয়ে মনে-মগজে-মননে-মনীষায় উৎকর্ষ লাভ করবে এবং জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, অর্থের, বাণিজ্যের, গবেষণার দার্শনিক চিন্তা-চেতনার ও সাহিত্যের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন শতকে তাঁদের কৃতিতে ও কীর্তিতে নিজেদের ও দেশকে ধন্য খ্যাতিমান করবেন এই প্রত্যাশায় ভবিষ্যত আঁকেন আহমদ শরীফ (শরীফ, ২০১২:২০০)। তাঁর মতে, উত্তরণের বা মুক্তির পথ মিলবে সবার জন্য জীবিকা অর্জনের তথা কাজের কিংবা ভাতার ব্যবস্থা হলে। এ-কথা তো অভ্রান্ত যে মধ্যযুগের সমাজের 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' যেভাবে গণমানুষের হৃদয়ের বাণী হয়ে ছিল আজো বাঙালির সমাজে সেই চাওয়াই হয়তো ভিন্ন ভাষায় বলে যাচ্ছে 'ভাত ও ভাতার নিশ্চিতি মিললেই রাষ্ট্রে আসবে স্থিতি-স্বস্তি শৃঙ্খলা, ঘটবে উন্নতি' (শরীফ, ২০১৬:৭৫)।

সমাজের ক্ষত ও ক্ষতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করায় আহমদ শরীফ অব্যর্থ, প্রতিবাদী ও স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি সঠিক চিহ্নিত করেছিলেন যে, 'আমাদের বাংলাদেশের মানুষের স্বভাবে-চরিত্রে নীতি আদর্শহীনতার পারস্পরিক অবিশ্বাসের মূলে রয়েছে দারিদ্র্যভীতি বেকারত্ব-বিভীষিকা, সরকারের যোগ্যতায় অনাস্থা, আত্মশক্তি ও সাহসে প্রত্যয়হীনতা। ফলে বেকারের সংখ্যা যতই বাড়বে দুর্নীতি অনীতি নৈরাজ্য, অপরাধ প্রবণতা শুধু দুর্দম্য নয় অদম্য হয়ে উঠবেই' (শরীফ, ২০১৬:৭৫)। কিন্তু আহমদ শরীফ সমাজ সমস্যার কোনো সমাধান বা প্রতিকার পরিকল্পনা দিতে মনোযোগী নন। সমাজতন্ত্র প্রবর্তন ও মৌলবাদ নিবর্তনের মধ্যে তিনি সকল সমস্যার সমাধান দেখেন কিন্তু তা যে বিপ্লবসাপেক্ষ এটাও মানেন। তাই আশু ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদির

কথা বললেও তা বাস্তবায়নের কোনো উপায় তিনি দেখাননি, কিংবা এসব উপায়ও প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিশীল কোনো উদ্ভাবন নয়। যৌতুক ও পণ প্রথা, নারী নির্যাতন, পরীক্ষা পদ্ধতির অসারতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাঁর জিজ্ঞাসার মধ্যে যে তীব্র সংবেদনশীলতা পাওয়া যায় সে অনুযায়ী প্রতিকারপন্থায় তিনি উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেননি। তবে সামাজিক সমস্যায় আহমদ শরীফের মন্তব্য বা বিশ্লেষণ সর্বমানবিক, মঙ্গলচেতনাঋদ্ধ, উদারনৈতিক কোনো সমাধানের দিকনির্দেশনা দিতে পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত।

৩.২.১ সংস্কৃতিভাবনা

আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনা গড়ে উঠেছে– (১) প্রীতি ও সৌন্দর্যানুভূতি (২) আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ (৩) শ্রেয়োবোধ ও কল্যাণচেতনা (৪) সহিষ্ণুতা ও উদারতার ওপর ভিত্তি করে। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, সেসূত্রে মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন যাঁদের মনীষায় গড়ে উঠেছিল তাঁদের চিন্তার সাযুজ্য থাকা দুর্লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণবাঞ্ছা ও মানবহিতৈষণা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, অবশ্য উত্তরকালে তিনি মার্কস-ফ্রয়েড-ডারউইন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে পুরোপুরি বস্তুবাদী হয়ে ওঠেন, তাঁর সংস্কৃতিচিন্তাতেও আশ্রিত হয় বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও কার্য-কারণতত্ত্ব।[14] তদুপরি উপরে বর্ণিত সুজনোচিত মৌল-গুণাবলির ওপর তাঁর আস্থা অটুট ছিল। কারণ তিনি বলতেন, 'সৌজন্যই সংস্কৃতি' আর সৌজন্যের ধারকই সুজন হয়। স্বাধীনতা-পূর্বকালে রচিত *বিচিত-চিন্তা* (১৯৬৮), *সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা* (১৯৬৯), *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০), *জীবনে-সমাজে-সহিত্যে* (১৯৭০) গ্রন্থে তাঁর সংস্কৃতিভাবনা তত্ত্ব ও দার্শনিক প্রজ্ঞানির্ভর হলেও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ঘন ঘন রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় আহমদ শরীফের সংস্কৃতিচিন্তা সামাজিক উপলব্ধি-প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশে পরিণত হয়।

আহমদ শরীফের মতে সংস্কৃতিবান মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি ও আত্মমর্যাদবোধ-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। নিজে সুন্দর হওয়া এবং চারপাশের পরিবেশকে সুন্দর করার সাধনাই সংস্কৃতিবানের সাধনা। সুন্দরের সাধনার বলেই একজন প্রকৃত ধার্মিক, সংস্কৃতিবান ও সুনাগরিক একই লক্ষ্য এবং মর্যাদার মোহনায় মিলিত হন। 'বিকাশের পথে মানবতা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের বক্তব্যের[15] উদ্ধৃতি–

> মনুষ্যত্ব বা সৌন্দর্যবোধ অর্জনে চেষ্টা এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস বা সাধনা বা সৌন্দর্যানুভূতিই হচ্ছে সংস্কৃতি বা কৃষ্টি-সাধনা। সুরুচি বল, সংস্কৃতি বল সবকিছুরই প্রেরণা আসে সৌন্দর্য-পিপাসা থেকে এবং এ সবকিছুই সৌন্দর্য-উপাসনা। এর লক্ষ্য হচ্ছে সুন্দরকে নিজের মধ্যে পাওয়া। দেহে-মনে, বুকে-মুখে সুন্দর হওয়াই হচ্ছে সংস্কৃতি সাধনার চরম ফল– পরম পরিণতি। এ ফল প্রাপ্তি ঘটলেই একজন মানুষ হয় যথার্থই ভদ্রলোক তথা সুনাগরিক, হয় ধার্মিক। কেননা মর্যাদাবোধই ভদ্রলোকের প্রধান বৃত্তি বা guiding force।
>
> সৌন্দর্য-বুদ্ধির প্রথম ফল আত্মমর্যাদাবোধের উন্মেষ বা জাগরণ। যার মর্যাদাবোধ আছে, কোনো অন্যায়-অপকর্ম করতে পারে না সে। অন্যায়-অপকর্ম হচ্ছে সৌন্দর্যবোধের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সংহারক। এটিই সমাজে নিন্দনীয়, ধর্মে পাপ আর রাষ্ট্রে অপরাধ। এ-ই হচ্ছে একশব্দে দোষ– যা জ্ঞানের বৈরী, যা মনুষ্যত্ব, তথা সৌন্দর্য-সাধনার পথে প্রবলতর বাধা।... ... কাজেই দেশ, ধর্ম ও রাষ্ট্র মানুষের জীবন-সাধনায় উপায় বা উপলক্ষ মাত্র– আদর্শ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। (শরীফ, ২০১০:১২৯)

সংস্কৃতিবান মানুষ হবে স্বতন্ত্র; তবে সেই স্বাতন্ত্র্য, মতানৈক্য বা আচার পার্থক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না; আত্মোৎকর্ষের ভিত্তিতে অর্জিত ও রক্ষিত হয়। 'স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> সংস্কৃতিচর্চার পূর্ব-শর্ত হচ্ছে আত্মমর্যাদাবোধের উদ্বোধন। যার মর্যাদাবোধ আছে, সে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। সংস্কৃতির প্রথম পাঠ সহিষ্ণুতা ও উদারতা। রুচিবান মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণার শিকার হতে চায় না। তার মধ্যে থাকবে স্বাতন্ত্র্য-চেতনা, সে-স্বাতন্ত্র্য অর্জিত ও রক্ষিত হবে আত্মোৎকর্ষের ভিত্তিতে। (শরীফ, ২০১০:১৩৪)

সংস্কৃতিবানের স্বাতন্ত্র্য অনন্যতার নামান্তর। অপরের কল্যাণচিন্তা, অর্থাৎ `To know all is to pardon all' তার উপলব্ধ সত্যসার; `Live and let live' বা 'নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও' অর্থাৎ কল্যাণবাঞ্ছার মধ্য দিয়ে শ্রেণির সহ-অবস্থানতত্ত্ব তার জীবনের নিয়ামক; 'নিজে ভালো হও, আর অপরের ভালো চাও, ভালো করো'– আদর্শ তার জীবনের দিশারী।[16] তবে আহমদ শরীফের বিশেষ প্রতিপাদ্য : সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই, সংস্কৃতির কোনো স্থায়ী রূপ থাকতেই পারে না। (শরীফ, ২০১০:১৫৩)

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্তির পর তৎকালীন পূর্ববাংলায় পাকিস্তানবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতি নির্মাণের অপচেষ্টা কালে একশ্রেণির বিদ্বান বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতিকে হিন্দুর সংস্কৃতি বলে অবজ্ঞা করে তাতে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের মোড়ক দিয়ে উপস্থাপনের প্রয়াস নিয়েছিল। আহমদ শরীফ, বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগবশত এসব অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। যাঁরা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রবক্তা তাঁদের দ্বৈতাবস্থান সম্পর্কে আহমদ শরীফের বক্রোক্তি–

> তাঁরাই আবার য়ুরোপীয় গণতন্ত্রের ভক্ত, গণতন্ত্রী সংবিধানের দাবিদার, রোমান-আইনের অনুরাগী, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যায় উৎসুক, রেডক্রসের মহিমায় মুগ্ধ, য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রসাদ গ্রহণে উন্মুখ। (শরীফ, ২০১০:১৫৩)

সংস্কৃতি কোনো বদ্ধ, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ চর্চা বা চর্যা নয়।[১৭] এটি প্রবহমন, পরিবর্তনীয়। সংস্কার হয় বলেই তা সংস্কৃতি; না হলে হতো কুসংস্কার। জীবনের জন্য যা অবশ্য বর্জনীয়। আহমদ শরীফ বহমান, প্রাণময় ও বিকাশমান সংস্কৃতিকে লালন করতে চান বলেই সাংস্কৃতি শুচিতার কথা অবান্তর মনে করেন, 'দেশ, জাত ও ধর্ম' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ্য[১৮]–

> সাংস্কৃতিক শুচিতার কথামাত্রই অবান্তর। কেননা সংস্কৃতি বদ্ধকূপের জীয়ল মাছ নয়। সংস্কৃতি বহত নদীর স্রোত। প্রতিদিনের সূর্যের সঙ্গে তাল ঠুকে চলার নামই সংস্কৃতিপরায়ণতা। তাই সংস্কৃতি কখনো অবিমিশ্র হতে পারে না, গ্রহণে-সৃজনেই তার স্থিতি ও বহমানতা। বিকাশমানতাই সংস্কৃতি। সুন্দর ও কল্যাণকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করা, উদ্ভাবন করা, আবিষ্কার করা, জীবনে গ্রহণ করা ও ফুটিয়ে তোলাই সংস্কৃতি। যে সৃজন করতে পারে না, গ্রহণ করেই তাকে সংস্কৃতি চালু রাখতে হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুচিবাই সংস্কৃতিবিমুখতার অন্য নাম। সৌন্দর্যচেতনা, কল্যাণবুদ্ধি, সৃজনশীলতা অন্তত গ্রহণশীলতা সংস্কৃতিপরায়ণতার লক্ষণ। (শরীফ, ২০১০:১৪৬)

সংস্কৃতি, আহমদ শরীফের মতে, সমবায়ী চিন্তার ফল নয়। সমষ্টি নয়, ব্যক্তিচিত্তেই এর উদ্ভব ও বিকাশ। তাই পরিস্রুত জীবনচেতনা এবং সংস্কৃতির সহাবস্থান দেখি আমরা। 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে তিনি এই চিন্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

> [সংস্কৃতি] জাতীয় কিংবা দেশীয় সম্পদ হতে পারে, কিন্তু ফসল হবে ব্যক্তিমনের। কেননা সংস্কৃতিও কাব্য, চিত্র ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার মতো স্রষ্টার সৃষ্টি। কৃতিত্ব স্রষ্টার বা উদ্ভাবকের। তা অনুকৃত বা অনুশীলিত হয়ে দেশে পরিব্যাপ্ত ও জাতে সংক্রমিত হতে পারে এবং হয়ও। তখন culture হয় সাধারণের সম্পদ ও ঐতিহ্য এবং পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে। (শরীফ, ২০১০:১৪৯)

সাংস্কৃতিক প্রেরণার মূলে রয়েছে সৌন্দর্য-অন্বেষা, মনুষ্যত্ব ও অনুভববেদ্য মনোবৃত্তি। অসুন্দর ও অকল্যাণকে বর্জন করে জীবনকে সংস্কৃতিবান করে তুলতে হয় বলেই সংস্কৃতিবান জীবনের রূপদক্ষ শিল্পী। শুধু প্রয়োজন আর উপযোগ-চর্চা জীবনকে অর্থহীন করে। তাই মানুষ কেবল উপযোগ সৃষ্টিতেই তুষ্ট থাকে না, জীবনকে অর্থপূর্ণ করার দিকে তৎপর হয়। যেখানে প্রয়োজনের শেষ, সৌন্দর্যের শুরু সেখান থেকেই। ক্রমাগত জীবনের নতুন তাৎপর্য সন্ধানে মানুষ ব্যাপৃত হয় বলেই, সৌন্দর্য-পিপাসার শেষ নেই। এই পিপাসাই মানুষকে এগিয়ে নিচ্ছে জীবন-বিকাশের নতুন নতুন দিগন্তে–শ্রেয়সের সন্ধানে। পুরাতনে অস্বস্তি ও অবজ্ঞা না জাগলে নতুনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস জাগে না। মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এই পিপাসা, অন্বেষা ও প্রয়াসের ফল। আহমদ শরীফের মতে–

> মৌলিক সংস্কৃতি মাত্রই সৃজনধর্মী ও গতিশীল। এজন্যে সংস্কৃতি কখনো পুরোনো হতে পারে না। অনুকারক অনুসারকের গতানুগতিক ধারার সংস্কৃতি আসলে সংস্কৃতি নয়–আচার। কেননা স্থিতিশীল সংস্কৃতি প্রাণের প্রেরণাহীন ও তাৎপর্য-বর্জিত আচারে কিংবা সংস্কারে অবসিত হয়। যেমন জাকাত দানের মূলে দুঃস্থ মানবপ্রীতি, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি এবং সংবেদনশীল ব্যাকুল হৃদয়ের যে মানবিক প্রেরণা ছিল, তা আজ অবলুপ্ত। ফলে তা আজ একটি অনভিপ্রেত ধর্মীয় কর্তব্য–একটি যান্ত্রিক আচার মাত্র। (শরীফ, ২০১০:১৫০)

সুতরাং সর্বক্ষণ নতুন হয়ে ওঠার সাধনা সংস্কৃতিবানের ব্যক্তিত্বের জন্য উপযোগী। আহমদ শরীফ তাঁর সংস্কৃতিচিন্তার সঙ্গে সমন্বিত করে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনধারা বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। তেমন একটি

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য– গ্রহণশীলতা, সংস্কৃতির জন্য যাকে আহমদ শরীফ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বাঙালি সংস্কৃতির অনন্যতা, আহমদ শরীফের (শরীফ, ২০১০:১৫১) মতে, গ্রহণ ও আত্মস্থ করার শক্তির মধ্যে নিহিত। অবশ্য এই সংস্কৃতি সৃষ্টিশীল নয়। বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণশীল কিন্তু অনুকারক উল্লেখ করে 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> সৃজনশীলতার সাথে গ্রহণশীলতাও থাকা চাই, নইলে সংস্কৃতি চালু রাখা যায় না। এজন্যে কোনো দেশের বা জাতির সংস্কৃতি কখনো অমিশ্র বা মৌলিক থাকে না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাঙ্গীকরণ বা আত্মস্থ করাই হচ্ছে সাধ্য। যারা সৃজনে সমর্থ নয়, অথচ গ্রহণবিমুখ–যেমন পার্বত্য ও আরণ্যক মানুষেরা–তাদের মন-মনন ও সমাজ স্থাণু।
>
> কেননা সংস্কৃতিপরায়ণতার অন্য নাম গতিশীলতা। ক্রমোৎকর্ষ ও উন্নয়নই এর ধর্ম। আমরা–বাঙালিরা সংস্কৃতিবান হয়েছি, এগিয়ে চলেছি–সৃজন করে নয়, গ্রহণ করেই। (শরীফ, ২০১০:১৫১)

বাঙালির আরেকটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য একাত্মকরণ, যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে গ্রহণ শুধু নয় নিজের মতো করে আত্মস্থ করার ক্ষমতাও দিয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই স্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে বাঙালির সংস্কৃতি। কোনো নতুন বা উন্নত সংস্কৃতি সৃজনের ইতিহাস নেই তাঁর। আহমদ শরীফ 'দুর্দিন' প্রবন্ধে বাঙালির এমন গ্রহণশীল সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন–

> পাঁচ রকমের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের জাতি। পাঁচ মিশেলি হয়েছে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। তাহলে কোন্ অর্থে আমরা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলি? আমরা গ্রহণ করি, আর নিজের মতো করে নিই, যার নাম স্বাঙ্গীকরণ। এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের রূপ আর জাতীয় স্বরূপ।(শরীফ, ২০১০:১৫৩)

দেশ-ধর্ম-ভাষা-জাতীয়তা কোনোকিছুই এককভাবে সংস্কৃতির জন্য নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রক হতে পারে না– এটিও আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনার গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাঁর এই চিন্তার ব্যাখ্যা দিয়ে *স্বদেশ অন্বেষা* গ্রন্থের 'সংস্কৃতির মুকুরে আমরা'প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন–

> ধর্মমতের অভিন্নতা দেশ-কাল নিরপেক্ষ সংস্কৃতির জন্ম দেয় না। যদি তা-ই হত, তাহলে গোটা দুনিয়ায় কয়েকটা ধর্মীয় সংস্কৃতিই থাকত। কেবল ভাষাই যদি সংস্কৃতির ভিত্তি হত, তাহলে পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতিই থাকত। সংস্কৃতি যদি আঞ্চলিক সীমানির্ভর হত, তাহলে ভৌগলিক সংস্কৃতিই হত সংস্কৃতির উৎস। সংস্কৃতি যদি রাষ্ট্রিক সংস্থাজাত হত, তাহলে রাষ্ট্র ভাঙা-গড়ার সঙ্গে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটত। যদি বিদ্যাই অভিন্ন সংস্কৃতির জনক হত, তাহলে পাশ্চাত্যবিদ্যা এতদিনে সারাবিশ্বের শিক্ষিত সমাজে একটি একক সংস্কৃতি গড়ে তুলত। (শরীফ, ২০১০:৩৬২)

সংস্কৃতি এক সমন্বিত, সুষম, সুজনোচিত জীবনাচার ও জীবনবোধ। জ্ঞান এবং পরিচর্যার মাধ্যমে এটি বিকশিত ও বিভূষিত হয়– এককভাবে কোনো ধর্ম-ভাষা-রাষ্ট্র-বিধিব্যবস্থা দ্বারা সংস্কৃতি সৃষ্ট বা গঠিত হয় না। আহমদ শরীফ একথার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত; আবার নির্দিষ্ট সংস্কৃতির ওপর ভৌগোলিক, জলবায়ুগত ও প্রাতিবেশিক প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করেন না। অর্থাৎ আহমদ শরীফের সংস্কৃতি-ভাবনার মূলে স্থান পেয়েছে কিছু বস্তুগত ও প্রত্যক্ষ উপাদান এবং কিছু ভাবসম্পৃক্ত, অবস্তুগত ধারণা। 'সংস্কৃতির মুকুরে আমরা' প্রবন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ থেকে বিষয়টি প্রমাণিত হয়–

> যে-কোনো মানুষের সংস্কৃতিতে কিছু ধর্মীয় আচারের রঙ, কিছু দেশের জলবায়ুর প্রভাব, কিছু ভাষার রস, কিছু প্রয়োজনের রেশ, কিছু শিক্ষার ফল, কিছু সম্পদের ছাপ, কিছু জ্ঞানের লাবণ্য, কিছু বিদ্যার দান, কিছু হৃদয়বৃত্তির প্রসূন, কিছু মননের মসৃণতা, কিছু প্রজ্ঞার দীপ্তি, কিছু মানবিকতার মাধুর্য, কিছু কল্যাণ-চিন্তার স্নিগ্ধতা থাকেই। সবকিছুর সমন্বয়ে সংস্কৃতি মানুষকে সৃজন করে। তাই সৌজন্যেই সংস্কৃতির পরিচয়। সুজন মাত্রেই মনুষ্যত্বসম্পন্ন। কাজেই সৌজন্যের অপর নাম পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। অতএব সংস্কৃতি মানবতারই নামান্তর। একজন মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষই কেবল সুজন ও সুনাগরিক হতে পারে। এমন মানুষ অসত্য, অসুন্দর ও অকল্যাণের শত্রু। একজন জীবনসচেতন সত্যসন্ধ সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ তার মানবিক দায়িত্বে ও কর্তব্যে অবহেলা করে না। (শরীফ, ২০১০:৩৬২)

আহমদ শরীফের মতে, সংস্কৃতির প্রধান উৎস ঈশ্বরপ্রোক্ত ধর্মশাস্ত্র ও তার আনুষঙ্গিক নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, আচার-আচরণ এবং পালা পার্বণ (শরীফ, ২০১০:১৯)।

কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতি সুনিশ্চিতভাবেই দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী– একটি তার হার্দ্যিক ও মননজাত অপরটি প্রাতিবেশিক ও সত্তা-উদ্ভূত। আহমদ শরীফ এর নাম দিয়েছেন 'দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব'। সংস্কৃতির দ্বৈতাদ্বৈতবাদ একের সংহতির মধ্যে বহুর বিকাশ সাধনের তত্ত্ব।

> সংস্কৃতি একাধারে যেমন দেশ-কাল-জাত ধর্ম-নিরপেক্ষ [কেননা, সৌন্দর্যে, কল্যাণে ও মানবতায় দেশ-কাল-জাত-ধর্মের পার্থক্য স্বীকৃত নয়], তেমনি দৈশিক-কালিক-জাতিক, ধার্মিক ও বৈষয়িক আভরণও থাকে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংস্কৃতিতে লগ্ন। কেননা মানুষের প্রয়াস দেশগত ও প্রয়োজনগত চেতনার অনুগত। কাজেই মানুষের সংস্কৃতি একই লক্ষ্যে অনুশীলিত বলেই তা যেমন সর্বমানবিক; আবার দেশ, কাল ও প্রয়োজনের প্রভাব স্বীকার করে বলে তা তেমনি ব্যক্তিক, সামাজিক, আঞ্চলিক আর ধার্মিকও বটে। সংস্কৃতিতে আমরা তাই বহুতে একের সংহতি, একেতে বহুর বিকাশ লক্ষ করি। (শরীফ, ২০১০:৩৬৩)

সর্বমানবিকতাবাদে উত্তীর্ণ হতে হলে বহুকে যেমন ধারণ করতে হয় তেমনি প্রয়োজনের প্রভাবে হতে হয়ে একত্বের সংহতিসম্পন্ন। এভাবেই বাঙালির সংস্কৃতিতে বহুত্বের উপস্থিতি ও আত্মীকরণ-ক্ষম ঐতিহ্যের সন্ধান দিয়েছেন আহমদ শরীফ, তাঁর প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিপুল গবেষণা ও বিশ্লেষণে এর বহু উদাহরণও সংযোজিত হয়েছে। বাঙালির চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় নীহাররঞ্জন রায়ের 'বৈতসী' শব্দটি তাঁর পছন্দ হয়েছিল, তিনি সেটি ব্যবহারও করেছেন, যার অর্থ বেতের মতো নমনীয় অথচ সতত ঋজু।

সংস্কৃতিবান হলে মানুষ হয় সংবেদনশীল, পরিণামদর্শী। কিন্তু একা সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না। 'সংস্কৃতিবান ব্যক্তিমাত্রেই কেবল নিজের প্রতি নয়, প্রতিবেশীর প্রতিও নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করে' (শরীফ, ২০১০:৩২)। এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছড়িয়ে তৈরি করে প্রতিবেশীদের সুষ্ঠু জীবনের ভিত। চরিত্রবল, মুক্তবুদ্ধি এবং উদারতার ঐশ্বর্যই এমন মানুষের সম্বল ও সম্পদ। বেদনামুক্তি এবং আনন্দ-অন্বেষাই সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনসত্য।

অপসংস্কৃতি সম্পর্কে আহমদ শরীফের মত কিছুটা ভিন্ন। 'সংস্কৃতি সম্বন্ধে' প্রবন্ধে অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> যা কিছু সমকালীন চেতনা-বিস্তার জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে-ওঠা নীতিনিয়মের রীতিরেওয়াজের প্রথাপদ্ধতির, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের এবং যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনের প্রতিকূল তা-ই অ ও অপ সংস্কৃতি। (শরীফ, ২০১২:৩২৯)

তবে, বিদেশাগত যে-কোনো আচরণ-অভ্যাসই অপসংস্কৃতি মানতে সম্মত নন তিনি। 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি' প্রবন্ধে তাঁর মত– অনভ্যস্ততার কারণে সাময়িকভাবে বিদেশি সংস্কৃতিকে খারাপ মনে হতে পারে, কিন্তু নতুনকে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকা চাই–

> দেশকালের প্রতিবেশে যন্ত্র বা হাতিয়ার নিয়ন্ত্রিত জীবিকাপদ্ধতির ও জীবিকাক্ষেত্রের চাহিদা অনুগ জীবনাচার উদ্ভাবন ও গ্রহণই হচ্ছে সংস্কৃতির বিকাশমানতার ও প্রবহমানতার প্রমাণ। গতিশীল সংস্কৃতিই জীবনের চলমানতার সাক্ষ্য। ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তার আর জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলে সংস্কৃতির স্বাস্থ্য সহজে বিকৃতি পায় না, পাবে না।
> (শরীফ, ২০১০ক:৩৬৬)

হাতিয়ারের উৎকর্ষের ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্তনের সাথে সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্পর্কিত বলেই প্রতীচ্য সংস্কৃতি প্রাগ্রসরতায় নতুনত্বে শ্রেয়োচেতনায় জীবনমুখী ও সদ্বুদ্ধিজাত। আমাদের অনভ্যস্ত আকস্মিক দৃষ্টিতে তা অপসংস্কৃতি। কিন্তু বিদেশি সংস্কৃতি মাত্রই অপসংস্কৃতি নয়, আহমদ শরীফের মতে এই অভিধা আপেক্ষিক।

সংস্কৃতি চলমান, গতিশীল এবং প্রতিমুহূর্তে বিকাশমান। ফলে নতুনকে বরণ করে নেয়ার মানসিকতা সংস্কৃতিবানের বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃতিকে বটবৃক্ষের মতো 'সারাজীবন বর্ধিষ্ণু ও বিকাশপ্রবণ' উল্লেখ করে আহমদ শরীফ আবিষ্কার-উদ্ভাবন এবং সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই সংস্কৃতির উৎকর্ষ নিহিত বলে মন্তব্য করেছে।(শরীফ, ২০১২:৩৪৬) তিনি 'লোকসংস্কৃতি'র নামে অনক্ষর পূর্বপুরুষে জীবনাচারকে বাঙালির সংস্কৃতি হিসেবে প্রমাণ করার শহুরে অপচেষ্টার ঘোর বিরোধী। তাই আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনার অন্যতম প্রতিপাদ্য– অতীতমুখীনতা বা ঐতিহ্য সংস্কৃতি নয়, 'এ কালের অবদানই হবে আমাদের বড়াইয়ের গৌরব-গর্বের বিষয়' (শরীফ, ২০১২:৩৪৭)।

যেহেতু মানুষের জীবন সময় ও পরিপার্শ্ব সাথে নিয়ে চলে। তাই সুন্দর ও কল্যাণ সাধনার সঙ্গে মানুষের জীবিকার্জনের সাধনাও চলতে থাকে। প্রয়োজন শেষ হওয়ার পরই কেবল সৌন্দর্যচেতনার উদ্ভব হতে পারে– কথা যেখানে শেষ সেখান থেকে যেমন সুরের শুরু। তাই উত্তরকালে[১৯] আহমদ শরীফের ভাবনায় গণমানবের সংস্কৃতির কথা বারবার এসেছে। যেমন, সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বিশ্রুত মন্তব্য 'ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম' (মোতাহের, ২০১৯:৩১) উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন–

> কাজেই সংস্কৃতির শ্রেণীচরিত্র আছে, যেমন সাহিত্যেও প্রতিফলিত রয়েছে শ্রেণীচরিত্র বা চেতনা, আর লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য তো আমরা সার্বক্ষণিক উচ্চারণে প্রকাশ ও প্রচার করি। অশিক্ষিত গেঁয়ো হলেই 'লোক' folk আর শিক্ষিত শহুরে হলেই তথা বিদ্যা-রুচি-বুদ্ধি-সংস্কৃতি যা-ই থাক, সাফকাপুড়ে হলেই 'মানুষ' হয়। (শরীফ, ২০১০:২২)

অতএব আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনা শেষাবধি সর্বমানবিকতা ও শ্রেয়োচেতনাতেই স্থিত; রূপান্তরশীলতায় বিশ্বাসী, অদূর ভবিষ্যতে বৈশ্বিক সংস্কৃতিতে স্বপ্নাবিষ্ট ।

৩.২.২

আহমদ শরীফ বাংলার সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য-প্রমাণাদি যাচাই করে, লৈখিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলা ও বাঙালির আদিরূপ বিনির্মাণের অক্লান্ত সাধনায় নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁর অনেকগুলো প্রবন্ধে এসব বিশ্লেষণলব্ধ ফলাফল বিধৃত হয়েছে। বিশেষত *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০), দুই খণ্ডে প্রকাশিত *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১৯৭৮ ও ১৯৮৩) এবং *বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা* (১৯৮৫) গ্রন্থে তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, বাঙালির জীবন-চেতনা ও সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের বিপুল পাঠানুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এসব গবেষণালব্ধ প্রতিপাদ্য-সিদ্ধান্ত-অনুসিদ্ধান্ত-জ্ঞান পরবর্তীতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে রাষ্ট্র-রাজনীতি-গণমানব সম্পর্কে সাম্প্রত ভাবনায় অংশগ্রহণ করতে এবং বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের অগ্রণী-বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালনে।

আহমদ শরীফ শুধু মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের অবদান চিহ্নিত করতে আগ্রহী ছিলেন না, মূলত তাঁর অন্বেষা ছিল বাঙালির ইতিহাস, যে ইতিহাস রাজ্যশাসকের নয় শাসিতের পরিচয় দেয়,[২০] যার ইঙ্গিত বঙ্কিম চন্দ্র দিয়েছিলেন 'বাঙালির ইতিহাস' প্রবন্ধে।[২১] 'বঙ্গ', 'বাংলা' ও 'বাঙালি' শব্দের ঐতিহাসিক ভিত্তি ও অস্তিত্বের উৎস থেকে যাত্রা শুরু করে[২২] স্বাধীনচেতা অথচ চিরবঞ্চিত-পরাধীন-শাসিত-অস্পৃশ্য-মৃত্তিকালগ্ন বাঙালির ইতিহাস লেখার তাড়না আহমদ শরীফ অনুভব করেছিলেন[২৩] ইতিহাসের এমন এক বৈপ্লবিক সময়ে যখন বাঙালি তাঁর আত্মপরিচয় অন্বেষণে[২৪] সংগ্রামমুখর, নির্ভীক-সংকল্পবদ্ধ। তাঁর প্রত্যয়ীভাষ উল্লেখ্য–

> বাঙালার প্রচলিত শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক ইতিহাসে বাঙালী নেই। সেখানে রয়েছে উত্তর-ভারতীয় জৈন-বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ও তুর্কি-মুঘলের কৃতি এবং কীর্তির বিবরণ। সে-ইতিহাস পড়ে আমরা যে কেবল আত্মপরিচয় ভুলি তা নয়, নিজেদের জ্ঞাতিদেরও ঘৃণা করতে শিখি। (শরীফ, ২০১২:২৯)

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির আত্মানুসন্ধান প্রেরণাবাহী, সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে ওঠে। ফলে বাংলা ভাষার শিকড়বাহিত জাতীয়তাবোধ আহমদ শরীফকে নিয়ে যায় শিকড়ের উৎসসন্ধানে। তিনি *বেস্‌সান্তরজাতক*, *গাথাসপ্তশতী*, *সুভাষিত রত্নকোষ*, *কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়*, *সদুক্তিকর্ণামৃত*, *প্রাকৃতপৈঙ্গল*, *ডাকার্ণব*, বিভিন্ন *দোহাকোষ*, *চর্যাগীতি*, *শেখ শুভোদয়া* প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের বাঙালির সমাজ-পরিবার-পরিবেশ-অভ্যাস-শাস্ত্র-আচার-সংস্কার সম্পর্কে চিত্রময় বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন[২৫]। এসব বর্ণনা থেকে আমরা একদিকে পাই বাঙালির পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রাচীন বঙ্গ ও তৎসন্নিহিত এলাকায় গাঙ্গেয় সভ্যতার উন্মেষকালীন পরিচয়, অন্যদিকে বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন। আহমদ শরীফের এই বিপুল অনুসন্ধানের প্রতিপাদ্যসমূহকে আমরা কয়েকটি সূত্রে উল্লেখ করতে পারি:

ক. প্রত্ন-বাঙালির অস্তিত্ব না থাকলেও আর্যপূর্ব যুগ থেকেই এই অঞ্চলের মানুষের পৃথক সত্তা বিদ্যমান। যা পরবর্তীকালে অনার্য কৌমসমাজের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে একালের তফসিলী সম্প্রদায়, আদিবাসী-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর (হাড়ি-ডোম-কোল-ভীল-মুণ্ডা-সাঁওতাল-রাজবংশী ইত্যাদি) মধ্যে আজও টিকে আছে।

খ. আর্যপূর্বযুগেও রাঢ়-বঙ্গে সমৃদ্ধ জনপদ ও উন্নত অনার্য সংস্কৃতি ছিল যা প্রায়-বিস্মৃত এবং অনাবিষ্কৃত।

গ. সামান্য ব্যতিক্রম[২৬] বাদে, প্রায় দু হাজার বছরের পরাধীনতা বাঙালির গণমন থেকে নিজস্ব সত্তা ও সংস্কৃতির কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। বাঙালির পরিচয় হিসেবে যা বর্ণিত হয় তা শোষক ও শাসিতের শেখানো-দেখানো-বলানো, স্বাধীনচিন্তার ফল নয়।

ঘ. বাঙালি ধর্মবিপ্লবের আধারে ইতিহাসের প্রাচীনতম সমাজবিপ্লবের উদ্গাতা। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। দুটিই ছিল নিরীশ্বরবাদী আন্দোলন।

ঙ. দেশজ বাঙালি মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু একই নৃতাত্ত্বিক উৎসজাত।

'দেশকাল', 'বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে', 'বাঙলা ও বাঙালী', 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', 'বাঙালী সত্তার স্বরূপ সন্ধানে', 'বাঙালীর সংস্কৃতি', 'বাঙালীর সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি', 'বাঙালীর মৌলধর্ম', 'বাঙালীর মনন-বৈশিষ্ট্য', 'ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালী', 'বাঙলার গতর-খাটা মানুষের ইতিকথা' ইত্যাদি প্রবন্ধে এসব প্রতিপাদ্য বিশ্লেষিত হয়েছে।

কোন সংস্কৃতিকে বলা হবে বাঙালির সংস্কৃতি? অথবা বাঙালির কোনো সংস্কৃতিকে আমরা প্রাধান্য দেব? এমন প্রশ্নের উত্তরসন্ধান আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনার অন্যতম দিক। এর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি নিজেই আমাদেরকে কিছু প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছেন যার মাধ্যমে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার সূচনা হতে পারে। আহমদ শরীফের জিজ্ঞাসা–

> সংস্কৃতির কথা যখন আমরা বলি তখন মনে রাখতে হবে, সকলের সংস্কৃতি এক নয়। আমরা কার সংস্কৃতির বিকাশ চাই? কার উন্নতি চাই? দাসের এক সংস্কৃতি, গরীবের এক সংস্কৃতি, অস্পৃশ্যের এক সংস্কৃতি, হিন্দুর এক সংস্কৃতি, বৌদ্ধের এক সংস্কৃতি, মুসলমানের এক সংস্কৃতি। অন্যদিকে প্রভুর এক সংস্কৃতি, ধনীর এক সংস্কৃতি, ব্রাহ্মণের এক সংস্কৃতি, ধর্মব্যবসায়ীর এক সংস্কৃতি, মোনাফেকের এক সংস্কৃতি, প্রতারকের এক সংস্কৃতি, মিথ্যাবাদীর এক সংস্কৃতি। একদিকে জালেমের সংস্কৃতি, আর

> একদিকে মজলুমের সংস্কৃতি। আমরা কোন সংস্কৃতি চাই? আমরা কার পক্ষে? নাকি আমরা নিরপেক্ষ? নিরপেক্ষ তো ধূর্ত, কপট, মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, চালবাজ, সুবিধাবাদী, মোনাফেক, মক্কার। আমরা তাহলে কোন্ সংস্কৃতির প্রতিনিধি– জালেমের না মজলুমের? (শরীফ, ২০০১:৮১)

সুতরাং নিজেদের সংস্কৃতিকে চিনে নিতে হলে ইতিহাস থেকে এর উত্তরগুলি খুঁজে নিতে হবে। বাঙালির সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ অন্বেষণের মধ্য দিয়ে আহমদ শরীফ সে চেষ্টাই করেছেন ।

'বাংলা' নামের প্রাচীনত্বের সাথে বাঙালির ইতিহাস সম্পৃক্ত। আহমদ শরীফ প্রমাণ ও অনুমানে জানিয়েছেন–

> অস্ট্রিক, আলপাইন, পামিরীয়, দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির সমবায়ে আধুনিক বাঙালী জাতির উদ্ভব। সাত শতকের গোড়ার দিকে বোধ হয় শশাঙ্কের নেতৃত্বে প্রমথ বঙ্গ-গৌড় রাজ্যে গড়ে ওঠে। চর্যাপদে 'বঙ্গ'-এর সঙ্গে 'আল' ও 'আলী' প্রত্যয় যোগে বঙ্গাল ও বাঙ্গালী শব্দ চালু হয় দেশ ও জাতি অর্থে। ঐতরেয় আরণ্যকেও (আঃ ৫ম শতক) 'বঙ্গ' শব্দ দেশ বা জাতি অর্থে পাওয়া যায়। চর্যাপদে 'আজি ভুসুক বঙ্গালী ভইলী' বা 'অদঅ বাঙ্গাল দেশ লোড়িউ' আর সর্বানন্দের 'অমর কোষ' (১১৫৯ খ্রিঃ) 'বাঙ্গাল বচ্চার' শব্দ পাচ্ছি। নিত্যাহ্নিকতিলকে (লিপিকাল ১৩৯৫ খ্রিঃ) 'বঙ্গিদেশ' ব্যবহৃত হয়েছে। মুঘল আমলেই কেবল গৌড়-বঙ্গাদি অঞ্চল 'সুবা-ই-বঙ্গাল' নামে আখ্যাত হয়। ফলে কয়েকশ বছরের অব্যবহারে অন্য নামগুলো অপরিচিত হয়ে উঠল, আর 'বঙ্গ' নামটি গোটা সুবার জন্য ব্যবহৃত হতে থাকল। কাজেই 'বঙ্গ' নামের প্রাচীনতা চর্যাপদ ও ঐতরেয় আরণ্যকের প্রাচীনতার ও প্রামাণিকতার ওপর নির্ভর করে। (শরীফ, ২০১২:১১৭)

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের আলোকে বিশ্বাস করতে হয়, আর্যপূর্বযুগেই বাঙালি-সমাজ ও সংস্কৃতি এক উন্নত স্তরে অবস্থান করছিল। বেস্সান্তরজাতক, টলেমি বর্ণিত গঙ্গারিডই, শিবিরাজ্য-চেতরাজ্য, পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সেরকমই আভাস দেয়[২৭]। এতে বোঝা যায়, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, অর্থাৎ মৌর্যবিজয়ের আগেও এ অঞ্চলে সভ্য রাজা, রাজ্য ও প্রশাসন চালু ছিল, অতএব কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যও ছিল। ছিল সুপ্রাচীন বাণিজ্য-বন্দর, গজারোহী সৈন্যবাহিনী-সুরক্ষিত প্রবল প্রতাপশালী রাজা। আহমদ শরীফ এই প্রাচীনত্বের চেয়ে যে বিষয়টিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তা হল বাঙালির নিজস্ব ধর্মদর্শন-ভাষা-সংস্কৃতি ছিল যা বহুবছরের অধীনস্ততায় বা আগ্রাসনের ফলে ক্রমে ক্রমে সে বিস্মৃত হয়েছে[২৮], এমনকি সেই সংস্কৃতি-বিমুখও হয়েছে বলা যায়–

> সভ্য ও সংস্কৃতিবান হওয়ার জন্যে যে বাঙালীর জৈন-বৌদ্ধ মতবাদ গ্রহণের কিংবা মৌর্য-শুঙ্গ-কান্ব-গুপ্ত শাসনে থাকার প্রয়োজন ছিল না, বরং উক্ত সাম্রাজ্যবাদীদের শাস্ত্র, শাসন ও সংস্কৃতি যে বাঙালীর শাস্ত্র, সংস্কৃতি ও ভাষা বিলুপ্তির কারণ হয়েছিল, তা বেড়াচম্পায়, হরিণারায়ণপুরে, দেবগঙ্গায় চন্দ্রকেতুর গড়ে এবং 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শনাদিই (প্রায় দেড় হাজার খ্রিঃ পূর্বাব্দের) প্রমাণ করেছে। উত্তর-ভারতীয় শাস্ত্র, শাসন এবং সংস্কৃতি বাঙালীকে দু'হাজার বছর ধরে আত্মবিস্মৃত রেখেছে। তাই স্বতন্ত্র সত্তায় পরে আর কোনোদিন আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাও তাদের মনে জাগেনি। (শরীফ, ২০০১:২৩)

বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর থেকে দুহাজার বছরের বহিরাগত-বিজাতীয় শাসন-শাস্ত্রের প্রলেপ সরিয়ে নিলে যে সত্য উদ্ভাসিত হয় তা থেকেও বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপাদানগুলো সংগ্রহ করা যায়। আর্যপূর্ব দেশি জনগোষ্ঠীর এই ইতিহাসই আহমদ শরীফের অন্বিষ্ট–

> আসলে আমরা যাকে বৈদিক আর্য বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বলি তার চৌদ্দ আনাই আর্যপূর্ব দেশী জন-গোষ্ঠীর অবদান। শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা, নারী, বৃক্ষ, পশু এবং পাখি দেবতা, মূর্তিপূজা, মন্দিরোপাসনা, ধ্যান, ভক্তিবাদ, অবতারবাদ (ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নবীবাদ স্মর্তব্য), জন্মান্তরবাদ, প্রেতলোক, ঔপনিষদিক তত্ত্ব বা দর্শন, সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র এবং স্থাপত্য, ভাস্কর্য সবটাই দেশী। যাযাবর আর্যের স্থাপত্য-ভাস্কর্য জানা থাকার কথা নয়। ইরানের নর্ডিক আর্যরাও ইসলামী, আশশিরীয়, সুমেরীয় ও ব্যাবিলীয় প্রভাব স্বীকার করেই হয়েছে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উন্নত। (শরীফ, ২০১২:২৬)

বাংলায় আর্যবসতি ইতিহাসসমর্থিত হলেও রক্তসংকর বাঙালির প্রত্নরূপে এই মিশ্রণ নেই বললেই চলে, বিশেষত নর্ডিক আর্যরক্ত। তবে নর্ডিক আর্যশাখার বৈদিক আর্যদের শাস্ত্র, সমাজ-সংস্কৃতি (জৈন-বৌদ্ধ-সহ) দু'হাজার বছর ধরে বাঙালীর মন-মনন ও জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করছে। ভারতীয় আর্য এবং ইরানীয় আর্যদের মধ্যে দেব-দেবী-অসুর-অপদেবতার লড়াই,[২৯] জেন্দাবেস্তাঁ ও ঋগ্বেদের ভাষার নৈকট্য থেকে এ অঞ্চলে আর্য-উপস্থিতি ও শাসন

সম্পর্কে যতই নিশ্চিত হওয়া যাক না কেন তারা যে পাণ্ডববর্জিত বাংলা সম্পর্কে অনাগ্রহী বা সংশয়াচ্ছন্ন ছিল একথা কারো অজানা নয়। এসূত্রেই পাওয়া যায় দেশজ বাঙালি মুসলমান এবং হিন্দুর প্রাচীন পরিচয়উৎস। আহমদ শরীফের বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রাচীন বাংলার নিষাদরা অস্ট্রিক-দ্রাবিড় আর কিরাতরা ছিল মঙ্গোল; বাঙলার দেশজ মুসলমানরা এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকগুলি (তফসিলী) অস্ট্রিক-দ্রাবিড়। আর সম্ভবত উচ্চবর্ণের হিন্দুর মধ্যে আলপীয় রক্ত বেশি (শরীফ, ২০০১:২৬)। অর্থাৎ সেখানেও আর্যরক্তের প্রভাব নেই বললেই চলে। বাংলায় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যদের আগমন ঘটে গুপ্তযুগে পূজার্চনায় পৌরহিত্যের সুযোগে। তাদের অনুচর বা ভৃত্য হিসেবে আসে ঘোষ, গুহ, বসু, মিত্র, দত্ত (দত্ত কারো ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে) প্রভৃতি। বাঙলাদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কখনো ছিল না। আহমদ শরীফ দাক্ষিণাত্যের অনার্য-অবয়ব ব্রাহ্মণদের উদাহরণ দিয়ে যুক্তি দিয়েছেন, বাংলায় ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্যের আলোকে বিচার করলে মেল-পটিবিন্যাসের সময়ে দেশি লোকও ব্রাহ্মণ-বৈদ্য হয়েছে বলে মানতে হবে (শরীফ, ২০০১:২৮)।

তাহলে বহিরাগত আলপাইনীয়-বৈদিক আর্যরা যাদেরকে পরাভূত করে দাসানুদাস বানিয়েছিল সেই অন্ত্যজ-ব্রাত্য-অস্পৃশ্য কারা?– এই জিজ্ঞাসাতাড়িত হয়েই আহমদ শরীফ জানিয়েছেন–

> আসলে বাঙলায় বৌদ্ধ বিলুপ্তির সুযোগ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সমাজ গড়ে ওঠে সেন আমলে কৃত্রিম (বল্লালসেনী কৌলীন্য প্রথা) বর্ণ বিন্যাসের ফলে যার জের চলে জাতিমালা কাছারী, গাঁই-পটি-মেলবিন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে সতেরো শতক অবধি। নৃ-বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় কিন্তু বাঙলার জনগণের মধ্যে বৈদিক আর্যভাষীর রক্ত কিংবা অবয়ব মেলে না। কোনো কোনো নৃ-বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে সত্য বলে মনে হয়। তাঁদের মতে বাঙলার উচ্চ বর্ণের লোকগুলি (ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা) আর্যভাষী আলপীয় এবং অস্ট্রিক দাবিড়দের পরে সমুদ্রপথে বাঙালায় ওড়িয়ায় প্রবেশ করে। এরাই প্রভুত্ব করতে থাকে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের ওপর। এদের জীবিকার ও সেবার প্রয়োজনে অস্ট্রিক দ্রাবিড়দের মধ্যে থেকে যাদের এর সহযোগী ও সেবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে বৃহদ্ধর্ম পুরাণের শূদ্র-উত্তম ও মধ্যম সঙ্কর তথা স্পর্শযোগ্য বা জলচারযোগ্য শ্রেণীর নির্দিষ্ট পেশার ও প্রশ্রয়ের অস্ট্রিক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ (সৎশূদ্র ও সদ্গোপ)। অন্যেরা রইল নির্দিষ্ট হীনবৃত্তিজীবী রূপে, চিরনিঃস্ব অস্পৃশ্য হয়ে- যারা 'অন্ত্যজ' রূপে অভিহিত। (শরীফ, ২০০১:২৮)

এই শেষোক্ত মানুষই আদি-বাঙালি, তাদের সংস্কৃতিই বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি–

> অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মঙ্গল বাঙালীর পরিচয় মেলে তাদের জীবন চেতনার ও জগৎ-ভাবনার ফসল সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে, কায়াসাধনতত্ত্বে, রজ-শুক্র চর্যায়, দারু-টোনা-বাণ-উচাটন-বশীকরণ শক্তির চর্চায়, ডাক-ডাকিনী-যোগী-যোগিনীর মাহাত্ম্য ও প্রভাব শিকারে, তাদের কৃষিতত্ত্বে ও আবহাওয়া চেতনায়; বৌদ্ধ মতের মহাযান সঞ্জাত মন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহজযানে, লোকায়ত শাস্ত্রে ও লৌকিক দেবতার উদ্ভাবনে, বৈষ্ণব সহজিয়া মতে, বাউলতত্ত্বে, চৈতন্যের প্রেমবাদে, পীর-নারায়ণ-সত্যের উপলব্ধিতে; আর বেদে, তাঁতী, পোদ-কিরাত-নিষাদ প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণীর আচারে সংস্কারে এবং তথাকথিত উপজাতির জীবন পদ্ধতিতে। সবচেয়ে বেশি মেলে বাঙালীর চেতনার গভীরে জগৎ ও জীবনভাবনায় নারী-দেবতার প্রভাব স্বীকারে, চণ্ডী কালী দুর্গা মাতৃকাপূজায়, অরিদেবতারূপেও ওলা ষষ্ঠী শীতলা মনসা প্রভৃতি নারীদেবতা কল্পনায়। (শরীফ, ২০০১:৩০)

বাঙালি আজও তার সামষ্টিক অচৈতন্যে হাজার বছরের এই সংস্কৃতির প্রভাব বহন করে চলেছে। আহমদ শরীফের ভাষায় যারা 'দেশজ বাঙালি মুসলমান' এবং নিম্নবর্ণের ও তফসিলী সম্প্রদায়ের হিন্দু তারাই চিরকালের সেই শোষিত-নির্জিত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভোটচীনার বংশধর; স্বল্পসংখ্যক সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা, বারুই, গারো, নাগা, কুকী, মুরং, চাকমা, মারমা প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীও এই অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

আহমদ শরীফ বিত্তবান ও শক্তিমানের শ্রেণিস্বার্থের বিপরীতে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত গণমানবের সংগ্রামী জীবনকেই হাজার বছরের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। তা তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করে লিখেছেন–

> দেশ-দুনিয়ার বিশেষ করে ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রিত সমাজে ছোট কর্ম বলে নিন্দিত অথচ উৎপাদন-সম্পর্কিত পেশায় নিযুক্ত নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির অজ্ঞ অনক্ষর চিরনিঃস্ব নিষ্পেষিত শাসিত-শোষিত অবনতশির দাস-দুর্বল মানুষ-পাঁচ হাজার বছরে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির এত বিকাশ-বিবর্তন সত্ত্বেও [যে] আদিম বাধা ও বাধ্যতা অতিক্রম করে দেহে-মনে স্বাভাবিক বিকাশ পায়নি, পায়নি দেহে-মনে সুস্থ ও স্বস্থ হবার সুযোগ ও পরিবেশ শাহ-সামন্ত-শাস্ত্রী-সমাজপতির সনাতনী প্রথা-পদ্ধতির চাপে পড়ে–। (শরীফ, ২০০৬:২৩)

এই ঐতিহাসিক শোষণের বিপরীতে আহমদ শরীফ ইতিহাসে যে বাঙালির সন্ধান করেছেন সে স্বভাব-বিদ্রোহী[৩০]। আমরা জেনেছি, প্রাচীন গ্রিসে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস-বিদ্রোহ ছাড়া পৃথিবীর জানা ইতিহাসের প্রাচীনতম সমাজ-বিপ্লবের ঘটনা ঘটেছিল বাঙালির অংশগ্রহণেই[৩১]। তারপর আরও অন্তত আটটি ভাববিপ্লব বা সংস্কৃতিবিপ্লবের তালিকা আহমদ শরীফ দিয়েছেন যার সবগুলোর নেতৃত্বেই ছিল নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির অজ্ঞ অনক্ষর চিরনিঃস্ব নিষ্পেষিত শাসিত-শোষিত অবনতশির দাস-দুর্বল মানুষ–

> প্রথম। বাংলার একাংশে পুণ্ড্র ও মগধ সাম্রাজ্যের প্রসারে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের শুরু ও অবসান।
> দ্বিতীয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী গুপ্তদের রাজত্বে– রাঢ়ে পুণ্ড্রে ও বঙ্গে।
> তৃতীয়। মগধে উত্থিত বৌদ্ধ পালবংশীয় রাজাদের চারশ বছরের শাসনকালে।
> চতুর্থ। ব্রাহ্মণ্য বিপ্লব। দাক্ষিণাত্য থেকে উগ্রবাদী সেনদের আগমনে।
> পঞ্চম। তুর্কী আমলে ব্রাহ্মণ্য হামলা-ভয়মুক্ত গণমানবের দেবধর্ম প্রতিষ্ঠা।
> ষষ্ঠ। চৈতন্যের ভাববিপ্লব।
> সপ্তম। সাম্রাজ্যবাদী মুঘল শোষণকালে নির্জিত মানুষের পীরনারায়ণ-সত্যর উদ্ভব।
> অষ্টম। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শাসন পদ্ধতি ও ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে প্রতীচ্য বিদ্যায় দেশের প্রথম স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত মনীষী রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে। (শরীফ, ২০১০ক:২৪৫)

৩.২.৩

বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আঞ্চলিকতা সুপ্রকট। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও সীমারেখা, জীবনযাপনপ্রণালী, গোত্র ও কৌমচেতনার প্রভাবে এবং সর্বোপরি একচ্ছত্র শাসনে না-থাকার কারণে বাংলাদেশান্তর্গত সব ঐতিহ্যে সব বাঙালির অধিকার ছিল না। আঞ্চলিক মন, মনন ও সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ আজো জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। (শরীফ, ২০০১:১৯) যেমন– সাহিত্যক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার প্রভাবে ধর্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল হয়েছে রাঢ় অঞ্চলে, মনসামঙ্গল হয়েছে পূর্ববঙ্গে, বৈষ্ণব সাহিত্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে; বাউল প্রভাব পড়েছে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণকেন্দ্রী উপদেবতার প্রভাব-প্রসার ক্ষেত্র হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ। গীতিকা হয়েছে ময়মনসিংহে-চট্টগ্রামে, মুসলিম-রচিত সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ ঘটেছে চট্টগ্রামে। গাজন, গম্ভীরা, বৈষ্ণবগীতি, বাউলগান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি প্রভৃতিরও স্থানিক বিকাশ লক্ষণীয়। আবার শৈল্পিক-নির্মাণেও আঞ্চলিকতা দুর্লক্ষ্য নয়– ঢাকাই মসলিন ও শঙ্খশিল্প, সিলেটী গজদন্ত ও বেতশিল্প, নদীয়ার পাটশিল্প, রাজশাহী-মালদহ-মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প, পাবনা-টাঙ্গাইলের বস্ত্রশিল্প, চট্টগ্রামের নৌ-ও দারু-শিল্প স্মর্তব্য।

কিন্তু সংস্কৃতির আঞ্চলিক রূপভেদ অভিন্ন হয়ে ওঠে বাঙালির লিখিত সাহিত্যের চর্চায় এবং ভাবান্দোলনের বিস্তারে। আহমদ শরীফের মতে, বাঙালির প্রকৃত রেনেসাঁ সূচিত হয়েছিল মধ্যযুগের বৈষ্ণব ভাবান্দোলনকে কেন্দ্র করে। বাঙালির মানবতাবাদী ধর্মাদর্শ এসময়েই ‘ঈশ্বরে চণ্ডাল-ব্রাহ্মণের সমঅধিকারে’র বাণী শুনিয়ে বলেছিল

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' এবং তা গৃহীত হয়েছিল বিস্তৃত-বিশাল বাংলার জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রাকৃতজনের মুখে ও অন্তরে। 'বাঙালীর সংস্কৃতি' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়–

> সেন আমলে এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবল হয়। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধসমাজ বর্ণে বিন্যস্ত হয়ে বল্লালসেনের নেতৃত্বে উগ্র ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে তোলে। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। গীতা-স্মৃতি-উপনিষদের মত সে মুখে গ্রহণ করলেও মনে মানেনি। তার ঠোঁটের স্বীকৃতি বুকের বাণী হয়ে ওঠেনি। কেননা সে ধার করে বটে, কিন্তু জীবনের অনুকূল না হলে অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করে না। তাই সে তার প্রয়োজনমতো জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার প্রতীক দেবতা সৃষ্টি করে পূজো করেছে, আশ্বস্ত হতে চেয়েছে ঘরোয়া ও মানস জীবনে। তার মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি তার স্ব-সৃষ্ট দেবতা। জীবনের সামাজিক সমস্যার সমাধানে অধ্যাত্মজীবনের বিকাশসাধনে সে আরো এগিয়ে এসেছে। জীমূতবাহন এবং বল্লালসেন-রঘুনাথ-রামনাথ প্রভৃতির স্মৃতি ও ন্যায়, দেবকী-ধ্রুবানন্দ-পঞ্চাননের মেল-পটি প্রভৃতি গোত্র এবং বর্ণবিন্যাস প্রয়াস, চৈতন্যের ভগবৎপ্রেম ও মানব-প্রীতিবাদ বাঙালী জীবনে রেনেসাঁস আনে। এবং তার প্রসাদে আপামর বাঙালীর দেহ-মন-আত্মা গ্লানিমুক্ত হয়। এ নতুন কিছু ছিল না, গৌতমের করুণা ও মৈত্রীতত্ত্বের ঐতিহ্যে সুফীমতের প্রভাবেই মানব-মহিমা বাঙালী চিত্তে নতুন মূল্যে ও ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত হয়। বাঙালী নতুন করে 'জীবে ব্রহ্ম' এবং 'নরে নারায়ণ' দর্শন করে। তখন বাঙালীর মুখে উচ্চারিত হয় মানুষের মর্যাদা এবং মনুষ্যত্বের মহিমা 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণ।'-মানবিক সম্ভাবনার এ স্বীকৃতি সেদিন জীবন-বিকাশের নিঃসীম দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। তাই বাঙালীর কণ্ঠে আমরা সেদিন শুনতে পেয়েছিলাম চরম সত্য ও পরম কাম্য বাণী– 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। (শরীফ, ২০০১:৩৪)

যেহেতু সংস্কৃতি জীবিকাপদ্ধতির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত সেহেতু সংস্কৃতিরও আঞ্চলিক, সামাজিক, কালিক, শ্রেণিক ও ব্যক্তি ভেদ থাকে। আহমদ শরীফ মনে করেন, শাস্ত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কারই মানুষের মন-মত অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। একারণে আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক পার্থক্য কিংবা স্বাতন্ত্র্য দেখতে পাই। উদাহরণ দিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> পাক প্রণালীতে, খাদ্যাখাদ্য নিরূপণে, তামা পিতল ও মাটির থালা বাসন-গ্লাসের ব্যবহারে, ঘর-দোরস্থাপন পদ্ধতিতে, পোশাকে-পরিচ্ছদ, মসজিদ-মন্দির-গির্জার আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যে এ পার্থক্য সুপ্রকট। আসন ও শয্যাবিন্যাসে, দিক নির্বাচনে যেমন শাস্ত্রীয় স্বাতন্ত্র্য সুপ্রকট তেমনি সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, বক্তব্যে, আদর্শে এবং লক্ষ্যেও এ স্বাতন্ত্র্য অলক্ষ্য নয়। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ প্রসূত মূল্যবোধ ও সমস্যাই সাহিত্য রূপায়িত হয়। তাই গল্পে উপন্যাসেও বিভিন্ন ধর্মবলম্বীর জীবন সমস্যা ও সমাধান পন্থা অভিন্ন নয়। তা ছাড়া শাস্ত্রীয় প্রভাবে চিত্রশিল্পে, মূর্তিশিল্পে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে কারো অনীহা আবার কারো আগ্রহ জেগেছে। কেউ চর্চা করেছে, আবার কেউ বিরত থেকেছে। ফলে দৈশিক শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ভাস্কর্য স্থাপত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্ম ও ঐতিহ্য নির্বিশেষ বাঙালীর অবদান নয়- আর্থিক-শৈক্ষিক অবস্থানভেদে অঞ্চল ও সম্প্রদায়ভেদে শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য ভাস্কর্য সংস্কৃতি সভ্যতা স্বাতন্ত্র্যলাভ করে। (শরীফ, ২০০১:৪০)

'বাঙালীর মনন-বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধে বাঙালির জগৎচেতনা ও জীবনভাবনার সাথে জড়িয়ে আছে তাঁর লোকায়ত সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ– তাঁর দৈনন্দিন বিশ্বাস, সংস্কার, ভয়-শঙ্কা-আনন্দ-উৎকণ্ঠায় পালিত লোকাচারাদি, তাঁর সম্পর্কের ধরন বা কারণ, তাঁর সামাজিক প্রতীক-প্রতিজ্ঞা-নিষেধ-নিয়ম ইত্যাদি। আহমদ শরীফের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত থেকে দুইস্তরে তা বর্ণনা করায় যায়–

এক. প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির চিন্তাভাবনা

বাঙালির মননশীলতার আদি উৎস অনুসন্ধান করেছেন নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে । ব্যবহারিক ও মনস্তাত্ত্বিক জীবনে বাঙালির প্রাত্যহিক চিন্তা-চেতনা, বিষয়বুদ্ধি, তাঁর বিশ্বাসের কারণ-ধরন, সৃষ্টিশীলতার প্রকারভেদ বা চিন্তার বিস্তৃতি-গভীরতা সবই আহমদ শরীফ ব্যাখ্যা করেছেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিশৃঙ্খলা এবং ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে। বাঙালির মননশীলতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, বাঙালির গ্রহণশীলতা। বিশেষত ধর্মের ক্ষেত্রে। বাঙালির প্রাচীন দেবতারাও ছিল ইষ্টদেবতা; সংসার ও জীবনের সুখশান্তির জন্য তাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল– পারত্রিক পরিত্রাণের জন্য নয়। এটি বাঙালির ধর্মচিন্তারও গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করে। আহমদ শরীফের ভাষায়–

> বাঙালি মুখে মহৎ বুলি আওড়ায় বটে, কিন্তু আসলে সে এই মাটির মায়াসক্ত জীবনবাদী। সে বস্তুতান্ত্রিক, ভোগলিপ্সু, তাই সে সশরীরে অমরত্বকামী। এজন্যেই সাংখ্যের প্রাণ-রসায়নতত্ত্ব, আয়ুবর্ধক যোগ ও শক্তিদায়ক তন্ত্র তার প্রিয় হয়েছে। চিরকালই তার সর্বপ্রকার জিজ্ঞাসা ও প্রয়াস জীবনভিত্তিক এবং জীবনকেন্দ্রী। তার সাধনা বাঁচার জন্যেই। তাই সে দেহাত্মবাদী। (শরীফ, ২০১২:৫১)

দুহাজার বছর ধরে বাঙালি দেহতত্ত্ব দিয়েই জীবনরহস্য ও জগৎতত্ত্ব বুঝবার সাধনা করেছে। এই জগৎ-জীবনভাবনা দুভাবে প্রকটিত হয়েছে–

প্রথমত- দীর্ঘজীবন লাভ ও জীবনকে নির্বিঘ্নে উপভোগের জন্য অলৌকিক শক্তিধর হওয়ার প্রয়োজন থেকে দেহাত্মবাদী যোগতন্ত্র, যাদুটোনা, তুক-তাক, ঝাড়ফুঁক, কবচ-মাদুলি, মারণ-বশীকরণ ইত্যাদি অনুশীলন।

দ্বিতীয়ত- বিভিন্ন শক্তি, প্রতীক, লৌকিক দেবতা ও পীরস্তুতি-স্তাবকতা।

বলা যায়, আদিবাঙালি মাত্রই দেহাত্মবাদী, নিরীশ্বর; সাংখ্য তার দর্শন, যোগতন্ত্র তার আচরিত ধর্ম। এমনকি বিদেশিতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত মধ্যযুগের অদ্বৈতবাদী বাঙালিও কায়াসাধক। ফলে আত্মসমাহিত, আত্মরতি ও আত্মসাধন-সম্পৃক্ত, সমাজস্বার্থ নিরপেক্ষ জীবনতত্ত্ব বাঙালির বৈষয়িক ও নৈতিক জীবনকে বিড়ম্বিত করেছিল। একদিকে বাঙালি মনীষার অতুলনীয় অর্জনসমূহ প্রতিনিধিত্ব করার মতো শ্রেষ্ঠ মানুষের নেতৃত্বের অভাব অন্যদিকে বিদেশি শাসকদের নিকট হাটের-মাঠের-বাটের 'ইতর মানুষ'কে বাঙলার ও বাঙালীর প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষ বিবেচনায় সহস্র বৎসর ধরে বাঙালির নিন্দা রটনার ফলে শাসকসৃষ্ট 'হেজিমনি' বা আধিপত্যবাদী মত সৃষ্টি হয়েছে যা আজো বাঙালিকে লজ্জিত করে। (শরীফ, ২০০১:৫৬)

এই সুদীর্ঘ কায়াসাধনার বলে মধ্যযুগের বাঙালি যে সূক্ষ্ম, জটিল ও উচ্চমার্গীয় চিন্তার জন্ম দিয়েছিল তা আজও বাঙালির মননের শক্তি, তার সৃষ্টিশীলতার শৃঙ্গ। অথচ চিরকাল শাসিত ও নির্জিত বাংলার শাসকনির্মিত ইতিহাসে তা অনালোচিত তো বটেই, উপেক্ষিতও। উপরন্তু এরূপ ভিন্ন জীবন-দৃষ্টির কারণে বাঙালি রাজ্য গৌরব, শাসনদণ্ড, ধনগর্ব, ক্ষমতা ও বাহুবলের প্রতাপকামনা বা অর্জনে উৎসাহ বোধ করেনি– ইতিহাসে এমন উদাহরণ অল্প নয়।

বিদেশি ধর্ম বাঙালি গ্রহণ করেছে বটে, তবে কোনো ধর্মই অবিকৃত রাখেনি। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলামকে সে নিজের পছন্দমতো রূপ দিয়ে আপন করে নিয়েছে। যদিও সব ধর্মই স্থান-কালভেদে বিকৃত হয়, তবে আহমদ শরীফের মতে, ধর্মের বিকৃতিতে বাঙালির বাঙালি-স্বভাব ও মননের ছাপ এত প্রকট যা অন্যত্র দৃষ্টিগোচর নয়।

দুই. আধুনিক যুগের বাঙালির মনন

আধুনিক বাঙালির মনন গড়ে উঠেছে প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে, ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামোর মধ্যে। ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে তদনুযায়ী সমাজগঠনের প্রেরণাবশে বাঙালি আত্মপ্রত্যয়হীন, লক্ষ্যহীন, ভোগলিপ্সু জীবনধারা গড়ে তুলেছিল। এমনকি বাঙালির ইয়োরোপবাহিত জাতীয়তাবোধও ছিল খণ্ডিত; স্বধর্ম বা স্বগোত্রীয় চেতনাসর্বস্ব। আহমদ শরীফ এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতাবাহী বাঙালি সম্পর্কে লিখেছেন–

> জমিদার সমিতি গড়ে উঠল, কৃষক সমিতি তৈরি হল না। য়ুরোপে দেখল রাষ্ট্রিক জাতীয়তা, আর নিজেদের জন্যে কামনা করল ধর্মীয় জাতিসত্তা। তাই বাঙালী হিন্দু শিক্ষিত হয়ে হিন্দু হয়েছে, মুসলিম হয়েছে মুসলিম–কেউ বাঙালী থাকেনি। হিন্দু কংগ্রেস ময়দানী বক্তৃতায় ভারতবাসীমাত্রেরই মিলন ও সংহতি কামনা করেছে কিন্তু নির্জিত স্বধর্মীর কায়িক স্পর্শকে জেনেছে অপবিত্র বলে। তাই হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগই এদেশে টিকল, বাঙালী হিন্দু দিল্লির অভিভাবকত্বে পেল স্বস্তি, বাঙালী মুসলিম করাচীর কর্তৃত্বে হল নিশ্চিন্ত। বাঙলা ও বাঙালী যে খণ্ডিত হল, বিচ্ছিন্ন হল, তাতে দুঃখ করবার রইল না কেউ। দেশ নয়, ভাষা নয়, গোত্র নয়, ধর্মই আজো বাঙালীর জাতীয়তার ভিত্তি। (শরীফ, ২০০১:৫৭)

স্পষ্টতই উদ্ধৃতির শেষ বাক্য আহমদ শরীফের হতাশাবিদ্ধ উচ্চারণ। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও অস্তিত্বের গৌরবগর্বী হলেও বাঙালির আত্মপরিচয় উদ্ঘাটনে উদাসীনতা ও আত্মশক্তিতে অনাস্থার জন্য শিকড়বিহীন ধর্মান্ধতাকেই তিনি দায়ী করেছেন।

বাঙালির যৌথ-অবচেতনে প্রায় স্থায়ী রূপ পাওয়া কতিপয় নেতিবাচক প্রবণতা এবং চারিত্র্য আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেও ভিন্নরূপে ক্রিয়াশীল ছিল। বৃহতের সাথে মিলনের সাধনায় অনাগ্রহ, সঙ্ঘশক্তিতে অনাস্থা বা একতাবদ্ধ হতে অসামর্থ হওয়া, দৈশিক জাতীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞতা, যৌথকর্মে অপারগতা বাঙালির সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য; তার সুদীর্ঘ পরাধীনতার মূল কারণও বলে আহমদ শরীফ মনে করেন (শরীফ, ২০০১:৫৮)।

তাই বাঙালি জাতির সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয়, অনুকরণীয়, মানবতাবাদী নেতার আবির্ভাব কামনা করে আহমদ শরীফ বাঙালির ভবিষ্যত নির্মাণে মানবতাবাদ, সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা-সহাবস্থান ও মার্কসীয় বণ্টনতত্ত্বে আস্থা রাখেন। মানুষকে কেবল ‘মানুষ’ হিসেবে জানা ও মানার মানবতাবাদী দর্শনে তিনি বিশ্বাস করেন কিন্তু তাতে উত্তরণের জন্য শাস্ত্রের সাথে সমন্বয়বাদী চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করেন সরাসরি। কারণ ধার্মিকতার প্রধান শর্ত স্বধর্মে আস্থা এবং পরধর্মে অনাস্থা ও অবজ্ঞা। (শরীফ, ২০০১:৫৯) ফলে শাস্ত্রীয় বিবেচনা তথা ধর্মভেদ, উগ্র-জাতীয়তার বিভাজন, গোত্রদ্বেষণা বা বর্ণবিদ্বেষ সৃষ্টি করে কেবল; প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় নির্বিশেষ মানবের মহামিলনের পথে। তাঁর মতে ‘নিরীশ্বর-নাস্তিক অন্তত শাস্ত্রদ্রোহী মুক্তবুদ্ধি মানবতাবাদী বাঙালীর ওপর নির্ভর করছে বাঙালীর সুন্দর ভবিষ্যত’ (শরীফ, ২০০১:৫৯)।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের সূত্রে বাঙালির স্বভাব ও মননের নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আহমদ শরীফ তুলনা-প্রতিতুলনা-প্রতীক-অলঙ্কারের আশ্রয়ে চিত্তাকর্ষক মন্তব্য করেছেন। তেমন কয়েকটি নিম্ন উদ্ধৃত হলো–

১। সে [বাঙালি] তর্ক করে, যুক্তি মানে কিন্তু হৃদয়-বেদ্য না হলে জীবনে আচরণ করে না। তাই সে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম ধর্ম মুখে যতটা গ্রহণ করেছে, অন্তরে ততটা মানেনি। সে তার জীবন ও জীবিকার অনুকূল করে রূপান্তরিত করেছে ধর্মকে। (শরীফ, ২০০১:১৮)

২। বাঙালী ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয়। উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনাতেই এর প্রকাশ। তাই বাঙালী যখন কাঁদে, তখন কেঁদে ভাসায়। আর যখন হাসে, তখন সে দাঁত বের করেই হাসে। যখন উত্তেজিত হয়, তখন আগুন জ্বালায়। তার সবকিছুই মাত্রাতিরিক্ত। তার অনুভূতি- ফলে অভিভূতি-গভীর। কেঁদে ভাসানো, হেসে লুটানো আর আগুন জ্বালানো আছে বটে, কিন্তু কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী নয়- যেহেতু উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা মাত্রেই তাৎক্ষণিক ও ক্ষণজীবী। বাঙালীর গীতিপ্রাণতার উৎস এখানেই। (শরীফ, ২০০১:১৩১)

৩। কোনো বৃহৎ ও মহতের সাধনা সাধারণ বাঙালীর কোনো কালেই ছিল না। সে একান্তভাবে জীবন-সেবী ও ভোগবাদী। এ ব্যাপারে সে আত্মা-পরমাত্মাকে তুচ্ছ জেনেছে, স্বর্গ-নরককে করেছে অবহেলা। বৈষ্ণব সমাজের বিকৃতও এই একই মানসের ফল। বঞ্চিত দরিদ্র বাঙালী যেখানেই ভোগের সামগ্রী দেখেছে, সেখানেই তার লুব্ধচিত্ত কাঙাল হয়েছে।(শরীফ, ২০০১:১৩২)

৪। জনে জনে জনতা হয়, মনের ‘সায়’ না থাকলে একতা হয় না, একত্রিত হওয়া সহজ কিন্তু মিলিত হওয়া সাধনাসাপেক্ষ। সে-সাধনা বাঙালী করেনি, তাই আবেগবশে যে ক্ষণিকের জন্যে উদার হয়, উত্তেজনাবশে সে ক্ষণিকের জন্যে মরণপণ সংগ্রামে নামে, মৌহূর্তিক স্বার্থবশে ঐক্যবদ্ধও নয় কিন্তু কোনোটাই টেকে না। তাই চৈতনের সাম্য ও প্রীতিভিত্তিক প্রেমবাদও বাঙলায় ব্যর্থ হল। এজন্যে বাঙালী বৈষয়িক জীবনে কোনো বৃহৎ কর্মে উদ্যোগী হলেও সফল হয় না। লীগ-কংগ্রেসের জন্ম বাঙলায়, বিদ্বান বুদ্ধিমানও বাঙলায় সুলভ ছিল তবু নেতৃত্ব বাঙালীর হাতে থাকেনি। সঙ্ঘশক্তি নেই বলে সে চিরকাল বিদেশী শাসিত শোষিত ও দুঃস্থ। নিজে বঞ্চিত হয়েও স্বধর্মীর গৌরব ও ঐশ্বর্যগর্বে সে গর্বিত ও আনন্দিত থাকে। (শরীফ, ১৯৭৪:৭৮)

৫। বাঙালি বহু জনহিতে, বহুজন সুখে অর্থাৎ সামষ্টিক বা জাতীয় কল্যাণে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধৈর্য, ত্যাগ ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে দৃঢ়চিত্তে সংকল্পপুষ্ট দীর্ঘকালীন সংগ্রামে অসমর্থ। কালো পিঁপড়ার মতো সে স্ববুদ্ধি চালিত হয়ে স্বস্বার্থে ঘুরে বেড়ায়– লাল পিঁপড়ের মতো যৌথ কর্মে তার উদ্যোগ নেই।[স্বস্বার্থে ও স্বকাজে সৎ সরল দুর্বল বাঙালি অবশ্য খুব পরিশ্রমীও]। সে একাই বাঁচতে চায়, তাই অন্যকে প্রথম সুযোগেই ঠকায়– নিয়ম-নীতি-আদর্শ পায়ে দলে- লাভ-লোভের সামান্য প্ররোচনায়।[৩২]

৩.২.৪

বাঙালির সংস্কৃতি পরিগ্রহণশীল। চিরকালই সে ছিল বিদেশি ও বিজাতি শাসিত। তাদের থেকেই বাঙালি পেয়েছে প্রশাসনিক ঐতিহ্য। পোশাক-পরিচ্ছদ আসবাবাদিও এসেছে নানা জাতি থেকে, তা সত্ত্বেও সবকিছু নিজেদের মতো করে গড়ে নেয়ার অভ্যাস বাঙালির মজ্জাগত। তাই সে ধার করেছে বটে, কিন্তু অনুকরণ করেনি। ধর্মের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম বাহির থেকে নিলেও নিজেদের প্রয়োজনসিদ্ধ রূপ দিয়েছে বাঙালি। নিজেরা তার রূপান্তর যেমন ঘটিয়েছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে নতুন মতবাদের। বাঙালির বজ্রযানী-সহজযানী, যোগতান্ত্রিক ও থেরবাদী বৌদ্ধমত, লৌকিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম, স্বসৃষ্ট দেবতা, অপদেবতা ও উপদেবতা, নব-স্মৃতি, নব-ন্যায়, নব-বৈষ্ণববাদ, সহজিয়া বাউলমত, পীরবাদ, ব্রাহ্মমত, ওয়াহাবি-ফরায়েজি-মুহম্মদমত আমাদের দেশ-কালের প্রয়োজন ও যুগ-জীবন চেতনার সাক্ষ্য। এসবের মধ্য দিয়ে এ জীবনকে ভালবাসার, এ জগৎকে সত্য বলে জানার, প্রিয় করে নেয়ার প্রবণতায় বাঙালির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক প্রাণসম্পদ নিহিত। এই ঐহিকতার মধ্যেই বাঙালির ধর্ম, নীতিবোধ, আচার-আচরণ বিকশিত হয়ে চেতনার বহুবর্ণিল ঐশ্বর্যে রূপান্তরিত হয়েছে বারবার। বাঙালি তার জীবনকে চালু আচারের ও বাঁধা নীতির দাস করেনি। রীতি ও নীতিকে চলিষ্ণু জীবনের সহায়ক সহচর করতে চেয়েছে। নিজের মন-মতো না হলে কোনো আচার-বিশ্বাস তার কাছে গ্রহণীয় নয়, তাই অন্তর্জগতে চিরবিপ্লবী বাঙালি শরীয়তি ইসলামকে আমল না দিয়ে একপ্রকার লৌকিক তথা দেশজ ইসলামকে অবলম্বন করেছিল; বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য কোনো ধর্মই অবিকল আত্মস্থ করেনি। এভাবে ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্যাদি শিল্পের ক্ষেত্রেও বাঙালি নতুনের পিয়াসী ও স্রষ্টা। হাজার বছরের বাঙালির মন ও মনীষার উৎস-প্রকৃতি অনুসন্ধান করে আহমদ শরীফ দেখেছেন– মীননাথ থেকে নজরুল পর্যন্ত বাঙালির প্রকৃত ধর্মের নাম– মানবতা, প্রকৃত আরাধ্য– মানুষ, চিরকালীন আবেগ– প্রীতি ও প্রেম। আত্মিক, আর্থিক, সামাজিক, পারমার্থিক সব চিন্তা, সব মন্ত্রই বাঙালি নানাভাবে পেয়েছে এঁদের কাছে; পেয়েছে সাম্য ও করুণার বাণী, পেয়েছে মুক্তবুদ্ধি ও উদারতার দীক্ষা। বাঙালি জেনেছে, প্রকৃত বাঙালির অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত বাণী 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। হাজার বছরের ঐতিহ্যলালিত এই মর্মবাণী শোনা গিয়েছিল মধ্যযুগেও। অন্তঃস্বভাবে বাঙালি ভাববাদী অথচ প্রাত্যহিক উপযোগ-তত্ত্বেই তার আস্থা অধিক। এসবের শিকড় বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্ম নয়, তারও আগে বাঙালির পূর্বপুরুষ-রচিত কৌম-সমাজের মর্মমূলে প্রোথিত[৩৩] –

> যখন সে জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তখনো কৌমচেতনা ছিল প্রবল এবং সম্ভবত বৌদ্ধ-মৌর্য শাসনেও তার বিচলন ঘটেনি। ব্রাহ্মণ্যগুপ্ত শাসনেই বৃত্তিগত বিভাগ বর্ণবিভাগে বিকৃত হয়। কেননা সে-সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীর সংখ্যা বাড়ে এবং বৌদ্ধ পাল আমলের প্রথম যুগে এ চেতনা ম্লান হলেও শেষের দিকে শঙ্করাচার্যের নব ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে এবং উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণাদি কর্মচারীরর বাহুল্যে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সমাজ দ্রুত অপসৃত হয়ে বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে উঠতে থাকে আর ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন আমলে তা পূর্ণতা লাভ করে। এজন্যেই বাঙালির বর্ণবিন্যাস নিতান্ত কৃত্রিম। মোটামুটিভাবে দশ থেকে ষোল শতক অবধি মেল ও পটি বন্ধরে কাজ চলে। বল্লাল চরিত, দৈবকী-ধ্রুবনান্দ-পঞ্চানন ঘটক ও জাতিমালা কাছারি তার সাক্ষ্য। এমনি করে নির্বর্ণ বৌদ্ধ সমাজ থেকে বর্ণাশ্রিত হিন্দু সমাজ গড়ে উঠে। ফলে এখানকার হিন্দু-মুসলমান–কারো জাত-বর্ণ পরিচয় সন্দেহাতীতরূপে যথার্থ নয়। বিশেষ করে দ্রাবিড়-নিগ্রো-মোঙ্গল কারো মধ্যেই যখন বর্ণবিভাগ ছিল না, তখন এ যে আরোপিত ও অর্বাচীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। (শরীফ, ২০১০:৩৭০)

এ-সবই বাঙালি-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, যা সামাজিক-সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সূচিবদ্ধ; এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন বাঙালির জাতীয়তাবোধের বীজ রয়েছে

বৃহত্তর বঙ্গ-গৌড়-রাঢ়-পুন্ড্র নিয়ে গঠিত বিস্তৃত প্রাচীন বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ধর্ম-ইতিহাস-ঐতিহ্যের উৎসে, প্রাকৃতজনের 'বুলি' বা মৌখিক ভাষায়। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকেই, বিশেষত ভাষা-আন্দোলন-পরবর্তীকালে, যেসময় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে একটি অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা স্ফটিকায়িত হতে থাকে তখন বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য, অনন্যতা ও ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন আহমদ শরীফ। তাঁর সেসময়ের অনেক রচনায় বাঙালির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সামষ্টিক-নির্জ্ঞান, এসবের রূপ-রূপান্তর ও সামষ্টিক প্রেরণাসঞ্চারী অন্তঃশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সেই উত্তাল সময়ে মৃত্তিকালগ্ন সংস্কৃতি থেকে জাতীয়তাবোধের অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা ও সাফল্যের উদ্ভাস লক্ষ করে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন–

> আজ বাঙালি পায়ের তলায় মাটির সন্ধান নিচ্ছে। এই মাটিকে সে আপনার করে নিচ্ছে। এর মানুষকে ভাই বলে জেনেছে। আজ আর কেবল ধর্মীয় পরিচয়ে সে চলে না। স্বদেশের ও স্বভাষার নামে পরিচিত হতে সে উৎসুক। দুর্যোগের তমসা অপগতপ্রায়– প্রভাত হতে দেরী নেই– সামনে নতুন দিন, নতুন জীবন। (শরীফ, ২০১০:৩৬৮)

শিক্ষিত বাঙালি জেগে উঠবে; জাগ্রত, স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ বাঙালির মধ্যে সংস্কৃতি চর্চা দ্রুত প্রসার লাভ করবে; ঋদ্ধ চেতনায় হবে প্রতিষ্ঠিত– এই ছিল তাঁর আশা। অসাম্প্রদায়িক, আত্মজাগরণমূলক জাতীয়তাবাদের এই প্রেরণাই বাঙালিকে এক রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাস সৃষ্টি করার শক্তি যুগিয়েছিল। শোষিত বাঙালি আত্ম-আবিষ্কারের সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ইতিহাস গড়েছে বারবার। আহমদ শরীফ ইতিহাসের গৌরবে ধারায় বাঙালির সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র অঙ্কণ করতে গিয়ে সাম্প্রত দুর্বলতার কারণও তুলে ধরেছেন। ১৯৬৯ সালে, বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, আহমদ শরীফ লিখলেন–

> ইংরেজ আমলে শিক্ষিত অধিকাংশ বাঙালি লেখাপড়া করে কেবল হিন্দু হয়েছে কিংবা মুসলমান হয়েছে, বাঙালি হতে চায়নি। হিন্দুরা ছিল আর্য গৌরবের ও রাজপুত-মারাঠা বীর্যের মহিমায় মুগ্ধ ও তৃপ্ত এবং মুসলমান ছিল দূর অতীতের আরব-ইরানের কৃতিত্ব-স্বপ্নে বিভোর। এরা স্বাদেশিক স্বাজাত্য ভুলেছিল, বিদেশীর জ্ঞাতিত্ব গৌরবে ছিল তৃপ্তমন্য। এদের কেউ স্বস্থ ও সুস্থ ছিল না। তাই বাঙলা সাহিত্যে আমরা কেবল হিন্দু কিংবা মুসলমানই দেখেছি। বাঙালি দেখেছি কৃচিৎ।
> (শরীফ, ২০১০:৩৬৭)

আহমদ শরীফের এই প্রতিপাদ্য থেকে বাঙালি জাতির অনেক ব্যর্থতার কারণ উদ্ঘাটিত হয়, সময়ের প্রয়োজনে সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রেক্ষাপটও তৈরি হয়। তাই বলা যায়, বাঙালির পরাধীনতার ইতিহাস তাঁর আচরিত জীবনযাপন পদ্ধতি ও সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত। আহমদ শরীফ সেই কারণই বর্ণনা করেছেন–

> বাঙালির এই কাঙালপনার পরিচয় রয়েছে তার স্বসৃষ্ট উপদেবতা-অপদেবতা কল্পনায় ও তুকতাক, যাদু-টোনা, মন্ত্র-তন্ত্র-কবচ-মাদুলীপ্রীতিতে। আপাতসুখ ও আত্মরতি তাকে করেছে স্বার্থপর, ধূর্ত ও লোভী। তাই সে যৌথকর্মে অসমর্থ। তার বুদ্ধি ধূর্ততায়, তার সংকল্প উচ্ছ্বাসে, তার প্রয়াস স্বার্থে অবসিত। কালো পিঁপড়ের মতো সে নিঃসঙ্গ সুযোগসন্ধানী। এসব নিশ্চিতই বাঙালির স্থায়ী কলঙ্কের কথা। (শরীফ, ২০১০:৩৭০)

কিন্তু তার গৌরব-গর্বের বিষয়ও অনেক। মাটিকে ভালোবাসা ও দেহকে সকল ধর্মের আকর ভাবার মধ্য দিয়ে বাঙালি নতুন জীবনদর্শনের সন্ধান দিয়েছে। বাঙালির সাংখ্য ও যোগতত্ত্ব একসময় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে প্রাকৃতজনের ভাবজগত। ইসলামের আবির্ভাবের পরও বাঙালি তার স্বসৃষ্ট দেব-দেবী, পীর মাহাত্ম্যের ওপর আস্থা রেখেছে –

> সে তর্ক করে, যুক্তি মানে কিন্তু হৃদয়-বেদ্য না হলে জীবনে আচরণ করে না। তাই সে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম ধর্ম মুখে যতটা গ্রহণ করেছে, অন্তরে ততটা মানেনি। সে তার জীবন ও জীবিকার অনুকূল করে রূপান্তরিত করেছে ধর্মকে। সে পূজো করেছে তার স্বসৃষ্ট উপ ও অপ-দেবতার। সৃষ্টি করেছে স্বকীয় মতবাদ ও আচার-আচরণ বিধি। বৌদ্ধ যুগে বাঙালির কালচক্রযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান; ব্রাহ্মণ্য সমাজে সত্যপীরবাদ, যৌগিক-সূফী তত্ত্ব, ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদ এবং রামমোহনের ব্রাহ্মমত তার সাক্ষ্য।

এভাবে দেশজ লৌকিক ধর্মই কালে কালে বাঙালির জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাঙালির স্বাধীনতাপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ ও সজ্ঞ-শান্তির সাক্ষ্য নগণ্য বটে, কিন্তু তার মাটি ও মর্ত্যপ্রীতি সর্বত্র সুপ্রকট। আদিতে তারও ছিল কৌম জীবন। বাহ্যত কর্মবিভাগ সে স্বীকার করেছে, সমাজে কর্মগত সহযোগিতা ও সংহতির গুরুত্বও কখনো অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রবণতা ও আত্মরতি ছাপিয়ে উঠেছিল তার সহমর্মিতা ও সমধর্মিতার বন্ধনকে। (শরীফ, ২০১০:৩৭০)

একালের বাঙালির সমসাময়িক সংস্কৃতিচর্চায় দুটি ধারা লক্ষ করেছেন আহমদ শরীফ – প্রতীচ্যের অনুকৃত ধারা ও লোক-ঐতিহ্যের অনুসৃত ধারা। তিনি মনে করেন দুটোই কৃত্রিম। কারণ প্রথমটি 'ধনে-মানে উন্নত জাতির সংস্কৃতি বরণের প্রবণতাপ্রসূত। দ্বিতীয়টি স্বাজাত্যাভিমানের ফল। প্রথমটিতে রাজনীতিক চেতনা অনুপস্থিত, দ্বিতীয় ধারায় রাজনীতিক উদ্দেশ্য প্রবল।' আহমদ শরীফ মনে করেন 'গণসাহিত্য, গণশিল্প ও লোক-ঐতিহ্য চর্চায় রাজনীতিক মনই ক্রিয়াশীল' (শরীফ, ২০০৬:৫৮-৫৯)।

প্রতীচ্য ধারাও শহুরে কপট সুবিধাবাদিতার পরিতোষক। আহমদ শরীফ বিশ্বাস করেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের তরুণদের মধ্যে এসব অনুকৃত বা উচ্ছৃঙ্খল চর্চার মধ্যেও পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষা আছে। এগুলোর সবই মন্দ বা পরিহারযোগ্য বলেও মনে করেন না। তাই জোর করে বন্ধ না করে বয়স্কদের মৌন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। প্রথম অভিঘাতের উদ্দীপনা কমে এলে জীবনদৃষ্টি ও মূল্যবোধের সাথে পরিমার্জিত হয়ে পরিবর্তিত সংস্কৃতি গড়ে উঠবে বলে আহমদ শরীফের বিশ্বাস। তাঁর মতে, যুগপ্রভাব যেহেতু আবশ্যিক এবং অবশ্যম্ভাবী সেহেতু পরিবর্তনকে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে, করতে হবে ভালোর অনুকরণ কারণ–

বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত উদারতায় জনগণের বা লোকের হয়ে লোক-সংস্কৃতি সৃজন ও রক্ষণ সম্ভব নয়। দয়ার দানে অভাব মেটে না। জনগণকে শিক্ষিত করলেই তাদের জীবিকা-লগ্ন জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-চেতনা থেকেই অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃতি জন্ম নেব। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কৃত্রিম অনুশীলনে তা কখনো সম্ভব হবে না। (শরীফ, ২০০৬:৫৯)

'সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে আশা প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি শ্রেণিহীন সমাজের জীবিকা ও জীবনপদ্ধতিসম্পৃক্ত ও প্রয়োজনানুরূপ হবে। শহুরে শিক্ষিতদের শোষক-বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রসার প্রতিরোধকল্পে লোকসাহিত্যের উজ্জীবনের প্রচার-প্রয়াসকে সমর্থন করেন না আহমদ শরীফ, তাঁর অভিমত–

এসব গান-গাথা গণজাগরণের সহায়ক নয়–বরং পুরোনো বিশাস-সংস্কারেরই উজ্জীবক। সমকালীন গণসংস্কৃতি প্রচারের কল্যাণকর মাধ্যম তবে একালের গনমানবের জীবনযাত্রা ও জীবিকাসমস্যাভিত্তিক গণসঙ্গীত, গণনাট্য, যাত্রা, কবিগান, ছায়াছবি ও চিত্রশিল্প। তা হলেই গণ-অধিকার চেতনার ও গণমানুষের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে। (শরীফ, ২০০৬:৬৪)

১৯৭৫ সালের রাষ্ট্রীয় পটপরিবর্তনের রক্তাক্ত-অধ্যায়ের পর ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষায় ভাটা দেখে হতাশা ব্যক্ত করেন আহমদ শরীফ এবং 'স্বভূমে প্রবাসীমনের' সমালোচনায় কঠোর হন এমনকি ১৯৮৬ সনেও 'বাংলাদেশে দেশকাল-নিরপেক্ষ বিশ্বমুসলিম জাতিচেতনা নতুন করে প্রবল হচ্ছে ও প্রচার পাচ্ছে' যা, আহমদ শরীফের মতে, দেশের মাটির ও মানুষের প্রতি তাচ্ছিল্যের ও বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিতবাহী (শরীফ, ২০০৬:৫৫,৫৬)। বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি গণমানুষের জন্য ক্রমশ বৈরী হয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন আহমদ শরীফ। আত্মসম্মানবোধ, দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধিকে উন্নত ও স্বকীয় সংস্কৃতি নির্মাণের পূর্বশর্ত বলে মনে করেন। বাংলাদেশের বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় সবসময়ই আশাবাদী আহমদ শরীফ উপলব্ধি করেছেন- আমাদের সংস্কৃতি চর্চা হওয়া উচিত গণমানবের মুক্তির জন্য,শিক্ষিত শহুরে মধ্য ও উচ্চবিত্তের মানুষের বিবেক জাগানোর জন্যে, মানবতার খাতিরে শ্রেণিস্বার্থ ভুলে গণমানবের হয়ে গণমুক্তিসংগ্রামে শামিল হবার জন্যে শিল্প-সাহিত্য চর্চার প্রয়াস গভীর ও ব্যাপক হওয়া আবশ্যিক (শরীফ, ২০০৬:৮৯)। তবে আহমদ শরীফ বাংলাদেশের বাঙালির ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী।[৩৪] মানুষের মধ্যে সুরুচি সৌজন্য বৃদ্ধি পাবে, বাকস্বাধীনতা, কল্যাণচিন্তা ও শ্রেয়স-চেতনাই হবে ভবিষ্যত বাঙালির চিন্তার ভিত্তি, গণমানবের জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে উদার

মানবিক বোধের উপর, মানুষ হবে ধর্মবিশ্বাসী হবে কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সাম্প্রদায়িকতা এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। (শরীফ, ২০০৮:৬১-৬৩)

৩.২.৫

আহমদ শরীফের ধর্মচিন্তাকে প্রবন্ধের বিষয়ের আলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। এই বিন্যাসে তাঁর ধর্মবিষয়ক চিন্তার ধরনকে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর একই প্রবন্ধে সবগুলি বিষয়ের আলোচনাও অগোচর নয়।

এক. আস্তিক্য-নাস্তিক্য ও নিরীশ্বরচিন্তা : 'ধর্মবুদ্ধির গোড়ার কথা', 'জেহাদের স্বরূপ', 'মুক্তির অন্বেষায়', 'একটি বীজমন্ত্রের তাৎপর্য', 'কল্যাণ অন্বেষা', 'দেশ-জাত ও ধর্ম', 'নাস্তিকের ধর্ম', 'বিজ্ঞান বনাম বিশ্বাস', 'বিশ্বাস-সংস্কার বনাম সত্য ও তথ্য', 'যাদু, যুক্তি ও আধিমুক্তি', 'এ আধিমুক্তির উপায় কি' ইত্যাদি।

দুই. বাঙালির ধর্ম : 'বাঙালির মৌলধর্ম', 'বাঙলার ধর্ম' ইত্যাদি

তিন. ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা : 'জাতি দ্বেষণা ও সহাবস্থান', 'ইতিহাসের দর্পণে দুই শতকের বাঙালি', 'ইতিহাসের নিরপেক্ষ আয়নায় বাঙলাদেশ', 'উনিশ শতকের বাঙলায় জাগরণের স্বরূপ', 'বাঙলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে', 'বাঙালি হিন্দুর সুবিধা ও সমস্যা', 'আঠারো-উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে দু-একটি ধারণার পুনর্বিবেচনা', 'বিদ্বিষ্ট সম্প্রদায়চেতনার গোড়ার কথা', 'সাম্প্রদায়িকতা : বীজ-অঙ্কুর ও ফল', 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে জাতিদ্বেষণা' ইত্যাদি।

মানুষের মনে ধর্মবোধের জাগরণ সম্পর্কে আহমদ শরীফের বিশ্লেষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি অধ্যাত্মচিন্তাকে বিশ্বাস ও জ্ঞানের মধ্যবর্তী 'অস্থির মানস-স্তর' বলে চিহ্নিত করে ধর্মের সাথে জ্ঞানের দূরত্ব ও অজ্ঞানতার সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন–

> মানুষের অভিজ্ঞতা ও সংস্কার জ্ঞানের সংস্পর্শে জটিলতর হতে থাকলে 'বিশ্বাসের পরে এল জ্ঞান। তবু বিশ্বাসও রইল, জ্ঞানেরও ঠাঁই হল। জ্ঞান যুক্তির জনক। যুক্তি সংস্কার ভাঙে। বিশ্বাস সংস্কারকে প্রবল করে। যুক্তির আশ্রয় জ্ঞানজ বুদ্ধি, বিশ্বাসের প্রশ্রয় ভীরু মানুষের দুর্বলতায়, লোভী মানুষের অক্ষমতায়। যদিও বোধের থেকে বোধি, তা থেকে বুদ্ধির উন্মেষ, আর জ্ঞান বোধির যোগে আসে প্রজ্ঞা, তবু এর মধ্যে একটি প্রত্যয়স্বল্প অস্থির মানস-স্তর রয়েছে, যার ফলে জ্ঞান ও বিশ্বাসের মিশ্রণে গড়ে উঠে অধ্যাত্মবুদ্ধি, যা সুবিধেমতো কখনো জ্ঞানবাদী, কখনো বিশ্বাসপন্থী। এ বুদ্ধি এক অপার্থিব রহস্যলোক সৃষ্টি করে। ইহলোকে এ আলো-আঁধারির অস্পষ্টতা কখনো ঘুচবার নয়। কারণ অজ্ঞতা অসীম এবং জ্ঞানে অজেয়। (শরীফ, ২০১০:১৫৯)

আহমদ শরীফের ধর্মচিন্তা কল্যাণবাঞ্ছা ও মানবতার মুক্তি-অন্বেষার মধ্যে নিহিত। যুক্তি ও জ্ঞান তাঁর আরাধ্য তাই এই দুইয়ের প্রতিবন্ধক সবকিছু তাঁর কাছে বর্জনীয়। তবে মানুষই যেহেতু সকল চিন্তার কেন্দ্রে, তাই পার্থিব জীবনের কল্যাণকামনা থেকেই মানুষের ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব বলে আহমদ শরীফের ধারণা। যেহেতু পার্থিবজীবনকে নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন করাই মানুষের উদ্দেশ্য, সেহেতু সেটাকে পরকাল পর্যন্ত প্রসারিত করাও তাঁর লক্ষ্য। এজন্যই পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, শাস্ত্র, দেবতা-অপদেবতা, আত্মা-ঈশ্বরতত্ত্বের সৃষ্টি। আহমদ শরীফ মানুষের বিশ্বাসের রূপান্তরকে এভাবে সমীকৃত করেছেন–'সমাজে যা অন্যায়, রাষ্ট্রে যা বেআইনী, ধর্মে তা-ই পাপ' (শরীফ, ২০১০:১৫৭)। পার্থিব জীবনে দিশাহারা মানুষের যে 'অন্তর্জীবন লীলা' তা থেকে 'প্রাপ্তিলোভী' মানুষের মুক্তি নেই বলেই 'ধর্মবোধেরও মৃত্যু নেই' বলে আহমদ শরীফ মনে করেন (শরীফ, ২০১০:১৫৭)। তাঁর ভাষায়–

পার্থিব জীবনের কল্যাণ কামনায় ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনে তার বিকাশ আর দুর্বলের স্বস্তি-কামনায় তার চিরায়ু। (শরীফ, ২০১০:১৬০)

ধর্মের উদ্ভবের সাথে দেশ-কালের প্রয়োজন সম্পর্কিত। জীবনসমস্যার তাৎক্ষণিক ও সহজ সমাধান দিতে পারে বলেই এক ধর্ম অস্বীকার করে আরেক ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে, বস্তুত সব নতুন ধর্মই পুরোনো ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহজাত। এই প্রয়োজনচিন্তার কারণেই দেশ-রাষ্ট্র বা মানুষের দুর্গতির কারণ হিসেবে ধর্মহীনতাকে দাঁড় করানো হয়েছে সবকালেই, আহমদ শরীফ উদাহরণ দিয়েছেন সেন্ট অগাস্টিন বা ইবনে খলদুন থেকে আজকের দেশনায়কদের মতের এমন দুমর্তির। ধর্মের নামে মানুষের আত্মবিকাশ বা সৃজনশীলতার উদ্বোধনের দাবিকে তাই আহমদ শরীফ সাময়িক চাহিদা পূরণের স্বস্তিজাত বলে মনে করেন। তাঁর আরও একটি প্রতিপাদ্য এক্ষেত্রে উল্লেখ্য– ধর্মের মাধ্যমে আত্মবিস্তারের শক্তি কেবল ধর্মের উদ্ভব যেখানে সেখানেই ঘটে থাকে, অধীকৃত অন্যান্য অঞ্চলে তা দুর্লভ (শরীফ, ২০১০:২৪৪)। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন আরবে উদ্ভূত ইসলামের, যা পাশ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ক্রমশ কেন্দ্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তচেতনা হারিয়েছে।

ধর্মের উদ্ভব মানুষের কল্পজগতে এবং এর উদ্দেশ্য মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে কল্যাণসাধন ও শান্তি রক্ষা করা। ধর্মের বিধিবিধানের আবশ্যকতা সম্পর্কে 'মানববিদ্যা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

ধর্মবিধির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহারবিধি প্রয়োগ করে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করা। মূলত এক প্রত্যক্ষ সমস্যার সমাধানকল্পেই ধর্ম নামক বিধিগুলোর উদ্ভব হলেও এতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত এমন একটি মৌলিক রহস্যসূত্র যুক্ত হয়েছে, যাতে বিধিগুলো শুধু প্রত্যক্ষ জীবন সম্পর্কিত হয়েও জীবনোত্তর (অর্থাৎ এ-জীবনপূর্ব ও এ-জীবনোত্তর) কাল্পনিক জীবনের জের টেনে তাতে কল্পনাতীত সুখের মধুর চিত্র বা দুঃখের বিভীষিকার সংস্কার জন্মিয়ে দেয়া হয়েছে। এ না হলে উপায় ছিল না। কারণ কোনো নিয়ন্ত্রণশক্তি না থাকলে কোনো কানুনই কার্যকর করা সম্ভব নয়। সবলের সর্বগ্রাসী সর্বভৌম শক্তির নিয়ন্ত্রণ-সামর্থ্য দুনিয়াতে কারো নেই বলেই দুনিয়ার বাইরের কল্পজগতের একটা শক্তির একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ বিশাল বিচিত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম ও বৈচিত্র্যগুলো ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজনে অসহায় কৌতূহলী মানুষের মনে এমনি একটি অদৃশ্য শক্তির (যিনি স্রষ্টা বা নিয়ন্তা) কল্পনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
(শরীফ, ২০১০:১৪৩)

সুতরাং ধর্মের বিধিনিষেধের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য নির্দেশ করা। যেমন মিথ্যা বলা পাপ, কারণ তাতে যে-কোনো একজন বা একাধিক মানুষের ক্ষতি হয়; চুরি করা পাপ, কারণ তাতে যে-কোনো একজন বা একাধিক লোকের দুর্দশার কারণ ঘটে। (শরীফ, ২০১০:১৪৪)

'মুক্তির অন্বেষায়' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ ধর্মমতের উদ্ভব সম্পর্কে অনন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে 'ধর্মমত হচ্ছে বিশ্বাসের অঙ্গীকারে যুক্তি ও তাৎপর্যের সমন্বিত রূপ। যে-যুক্তির ভিত্তি জ্ঞানও নয়, প্রজ্ঞাও নয়, কেবলই বিশ্বাস, তা ফুটো পাত্রের জল ধরে রাখার মতো অলীক' (শরীফ, ২০১০:২৪৭)। এখানেই প্রাচীন ভয়-বিস্ময়-ভরসা-কল্পনা জাত প্রতীকতার সাথে আধুনিক ধর্মমতের পার্থক্য। অবশ্য আহমদ শরীফ যুক্তির মাধ্যমে বিশ্বাসে উপনীত হওয়াকে 'পুতুলে চক্ষু বসানোর নামান্তর' মনে করেন। আহমদ শরীফের ধর্মচিন্তার প্রধানতম দিক মানবের কল্যাণকামনায় বিশ্বমানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রত্যয়–

ব্যষ্টি ও সমষ্টি, পরিবার ও সমাজ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসজ্ঞ, জাতি ও জাতিসজ্ঞ, স্বাতন্ত্র্য ও সদ্ভাব, সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি, প্রতাপ ও প্রভাব, বিদ্বেষ ও প্রীতি, অসূয়া ও অনুরাগ, স্বার্থ ও সৌজন্য প্রভৃতির সমন্বয় ঘটিয়ে চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে বিশ্বমানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আজকের কল্যাণকামী মানুষের প্রয়াস হবে "To convert hostility into negotiation, bloody violence into politics and hate into reconciliation." (শরীফ, ২০১০:২৪৮)

বিশ্বাস হল, আহমদ শরীফের ভাষায় 'মিত্রকল্প শত্রু', যেখানে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান অনুগত হয়ে যায়। চিরকালই সংস্কারের কাছে মানুষ আত্মসমর্পণ করে আশ্বস্ত হয়েছে, কারণ সে তাঁর শত্রু চেনে না। তাই 'তাঁর

রক্ষক বিশ্বাস-সংস্কার যে তাকে গ্রাস করছে, তা সে মানে না। অজগরের দৃষ্টিমুগ্ধ শিকারের মতো তার অভিভূত চেতনা তাকে প্রতারিত করেছে। তাঁর বিমুগ্ধ আত্মা ফাঁদের চুম্বক আকর্ষণে ব্যাকুল। তাই তার মনে চেতনা সঞ্চার করা কঠিন' (শরীফ, ২০১০:২৪৫)।

'আচারিক ধর্মানুগত্য ও উগ্রজাতীয়তাবোধই মানবপ্রীতি ও মানবতাবোধ বিকাশের বড়ো বাধা' এবং 'আজকের মানব সমস্যার মূল কারণ' বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। মানুষ যতই কৃত্রিম আচারিক ধর্ম ও উগ্রজাতীয়তা পরিহার করে বিবেকের ধর্মে ও মানুষের অভিন্ন জাতীয়তায় আস্থা রাখতে পারবে বিশ্বমানবতার জন্য ততই মঙ্গল। আহমদ শরীফ প্রত্যাশা করেন 'চিত্তলোকে প্রীতি ও সহিষ্ণুতার চাষ এবং সেই ফসলে চিত্তলোক ভরে উঠবে' মানুষের। 'মানবতাই মানব ধর্ম'– এ বোধের অনুগত হবে ধর্মনিষ্ঠ মানুষের চিন্তা ও কর্ম (শরীফ, ২০১০:২৪৯)।

সমকালীন জিজ্ঞাসায় সাড়া দিয়ে নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করা আহমদ শরীফ-মানসের অন্যতম প্রবণতা। 'জেহাদের স্বরূপ' প্রবন্ধে তিনি জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য ও ধর্ম-সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে তাঁর মতামত দিয়ে ইসলামের আচরণিক পার্থক্য ও তজ্জাত সামাজিক সমস্যার পর্যালোচনা করেছেন যা আজকের প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। জিহাদ মুসলিম জীবনের অপরিহার্য অংশ এবং জীবনের অন্যান্য ব্রতের মতো একটি সময়োচিত ব্রত। অথচ ব্যবহারিক কারণে 'জেহাদ' শব্দটি মুসলমান-অমুসলমান উভয়ের কাছেই বিকৃত অথবা অনুপযোগী হয়ে গেছে। 'জেহাদ' বলতে অমুসলমানেরা বিধর্মী-বিধ্বংসী বর্বরতা বোঝে। অথচ ইসলামে বিশ্বাসের সঙ্গে সৎকর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মুখ্যত ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনবিধিই কোরআনে নির্দেশিত হয়েছে। জিহাদও এই বিধির অন্যতম অঙ্গ। ইসলাম একান্তভাবে সমাজকাঠামোভিত্তিক। এ অর্থে সমাজ-গুরুত্ব ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্যই মুসলমানকে মুসলিম শাসনের আওতায় থাকতে হয়। জিহাদ তাই প্রত্যেক মুসলমানের সামাজিক কর্তব্য, ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং ইমানের অঙ্গ। তবে জিহাদ কখনও আক্রমণাত্মক নয়, আত্মরক্ষামূলক। এ অর্থে জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের হয়ে সংগ্রামই শ্রেষ্ঠ জিহাদ। (শরীফ, ২০১০:১৬৫) তবে কালান্তরে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস্ত হয়েছে। আহমদ শরীফ এই পরিবর্তন সম্পর্কে লিখেছেন–

> এ-যুগে আমরা অতিপ্রগতি ও সংস্কৃতিচর্চার নামে এই স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিক আচরণে স্বাধীনতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্থায় এর উপরই আত্যন্তিক গুরুত্ব দেয়ার রেওয়াজই যে কেবল চালু হয়েছে তা নয়, সংস্কৃতিচর্চার প্রথম পাঠ হিসেবে এদিকে লোক-প্রবণতাও বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। এজন্যে পুরোনো চারিত্রিক ও সামাজিক নীতিবোধ বদলাতে হয়েছে। (শরীফ, ২০১০:১৬৪)

এর ফলে –

> আগে ছিল সমাজের জন্যই ব্যক্তি ও রাষ্ট্র। এখন হয়েছে ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র, আর সমাজ পেয়েছে বড়জোর Club-এর মর্যাদা–এর অপরিহার্যতা এ-যুগে আর স্বীকৃত নয়। ফল দাঁড়িয়েছে এই, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার-বাঞ্ছারূপ আত্মরতির ছিদ্রপথে সমস্ত গুরুত্ব ও মর্যাদা গিয়ে বর্তেছে রাষ্ট্রসংস্থার উপর। (শরীফ, ২০১০:১৬৪)

সুতরাং জিহাদ, আহমদ শরীফের মতে, সংগ্রামের ব্রত– যা থেকে বিচ্যুত অথবা যার অপব্যবহারে দিশাহীন হয়ে পড়েছে মুসলমান সমাজ। তাঁর ভাষায়–

> কোন আদর্শের জন্যে ও ন্যায়ের পক্ষে যে-কোনো প্রকারের সংগ্রামের নামই জেহাদ। তবু জেহাদ শব্দটি ঘৃণ্য হয়ে আছে। এর মূল্য-মাহাত্ম্য এ-যুগে মনে হয় মুসলমানদের কাছেও নেই। অবশ্য এজন্যে মুসলমানেরা নিজেরাই দায়ী। কেননা মুসলিম শাসনেও ইসলামী বিধান অনুসৃত হয়েছে কৃচিৎ আর রাজ্য-লোলুপ মুসলমান বাদশা-সুলতানেরা আত্মস্বার্থে আত্মমণাত্মক কাজে অর্থাৎ চড়াও হয়ে অপরের উপর হামলা ও জুলুম চালাবার জন্যেও অজ্ঞ-জনসাধারণকে জেহাদের ভাঁওতা দিয়ে উত্তেজিত করেছেন ও অনেক অনর্থ ঘটিয়েছেন। তাই জেহাদের নামে এমন ত্রাস ও অবজ্ঞা। যা অভিনন্দিত ও মহিমান্বিত মহৎ ব্রত হতে পারত, তা-ই হল অবাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। তবু সমাজ স্বার্থে নিত্য জেহাদ চাই। (শরীফ, ২০১০:১৬৪)

আহমদ শরীফের মতে, যে-অঞ্চল যে-সামাজিক বা মানবিক প্রয়োজনের নিরিখে যে-ধর্মের উদ্ভব, সময়ান্তরে বা দেশান্তরে তা কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ধর্মের উদ্ভবের পেছনে প্রয়োজনের মাত্রা ও বিশেষত্ব স্বীকার করে নিলে সমাজ পরিবর্তন বা সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা স্পষ্ট হয় কিন্তু তা শুধু বিশেষ দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে। আহমদ শরীফের ভাষ্য, মানবসভ্যতায় বারবার ধর্মের পরিবর্তন-বিবর্তন-সংস্কার একটাই ইঙ্গিত দেয় তা হল, ধর্ম যুগের চাহিদা পূরণের জন্যই, সর্বকালের জন্য নয়। ধর্মনিষ্ঠার মধ্যেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শক্তি-সম্পদ ও উন্নতি নিহিত অথবা ধর্মাচারহীনতার কারণে বিপর্যয় ও অবক্ষয় সৃষ্টি হয়– এমন কুসংস্কার অথবা ধর্মান্ধ-প্রচারণা নাকচ করে আহমদ শরীফ ধর্মদ্রোহীদের মাধ্যমেই মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস রচিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায়–

> মোহগ্রস্ত চিত্তে পুরোনোই শ্রদ্ধেয়, নতুনমাত্রই অবজ্ঞেয় ও অনভিপ্রেত। অথচ তাঁরা ভেবে দেখেন না যে হযরত ইব্রাহিম থেকে মাও সে-তুঙ অবধি কোনো যুগের কোনো দেশের কোনো চিন্তানায়ক ও সমাজকর্মীই পিতৃপুরুষের ধর্মে সন্তুষ্ট ও সুস্থির ছিলেন না। তাঁরা সবাই পুরোনো ধর্মদ্রোহী ও নতুন ধর্মের প্রবর্তক। যাঁরা তেমন অসামান্য মননশীল কিংবা সৃজনশীল নন, তাঁরাও (রিফর্ম) করেছেন পুরোনো ধর্ম যুগের চাহিদা পূরণের জন্যেই।
>
> কাজেই কোনো জ্ঞানী-মনীষীর কাছেই ধর্ম সর্বকালের বলে বিবেচিত হয় নি কখনো। আল্লাও দেশ-কালের প্রেক্ষিতে নতুন নতুন বাণী পাঠিয়েছেন তাঁর নবীদের মুখে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্র কিংবা বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-দর্শন প্রভৃতির অস্বীকৃতির তথা অগ্রাহ্যের ফল। এই দৃষ্টিতে যুগে যুগে দ্রোহী-নাস্তিকেরাই বিশ্বমানব ভাগ্যের দিশারী– দেশ-কালের মানবিক সমস্যার সমাধানদাতা। মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে এমনি দ্রোহীদের দানে। (শরীফ, ২০১০:২৪৫)

গোত্রীয় সংহতি-চেতনা ধর্মীয় ঐক্যবোধে রূপান্তরিত হয়ে মতবাদীর সাম্প্রদায়িক সংহতি গড়ে তোলে, তা থেকে গড়ে ওঠে বৈশ্বিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা। এভাবে রাজনৈতিক আদর্শ বা মতভিত্তিক সম্প্রদায়ও গড়ে উঠছে। এচেতনা মানুষের সাময়িক কল্যাণ আনতে পারে, ধর্মনিষ্ঠতায় নিয়োজিত করে, প্রয়োজন হয়তো মিটায় কিন্তু মানুষ চিরকালের জন্য সংকীর্ণ, অসহিষ্ণু, সহিংস ও দ্বন্দ্বপরায়ণ এক পরিচিতি লাভ করে। মানুষকে মানবিক গুণের বিকাশ ও উদার মানবতাবোধে দীক্ষা গ্রহণে সহায়তা করে না।

আহমদ শরীফ মনে করেন, ধার্মিক ও মতবাদী কেউই মানবিক সমস্যার সমাধান পুরোপুরি দিতে পারে না। তাঁর মতে ধার্মিক মানুষে খাঁটি মানবতা দুর্লভ কারণ ধার্মিক যতই উদার হোক স্বধর্মের স্বার্থে অপর ধর্মের প্রতি কোনো না কোনোভাবে বিদ্বেষ-দূরত্ব-বিভাজন লুকিয়ে রাখে। আবার মতবাদীও বিবেকের মানদণ্ড আর মানবতার স্বার্থে কাজ করলেও সেটাও ধর্মের মতোই, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে এই পার্থকের মধ্যেও ধার্মিকের চেয়ে মতবাদীকে এগিয়ে রেখেছেন আহমদ শরীফ, কারণ–

> ধার্মিক মানুষে খাঁটি মানবতা সুদুর্লভ। মুনষ্যত্বের সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ তা'তে অসম্ভব। তার হচ্ছে যান্ত্রিক জীবন। যেমন দুটোই সৎকর্ম হওয়া সত্ত্বেও ধার্মিক মুসলমান মন্দির নির্মাণে এবং ধার্মিক অমুসলমান মসজিদ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে না। এবং বিধর্মী ভিক্ষক দিয়ে কাঙ্গাল ভোজনের কিংবা ফিৎরা দানের পুণ্য মেলে না। তার ধর্মপ্রেরণা-প্রসূত দয়া যেমন অশেষ তার ঘৃণাও তেমনি তীব্র ও মারাত্মক। এজন্য তার মনুষ্যত্ব, তার মানবতা ও তার উদারতা তার ধর্মবুদ্ধিকে অতিক্রম করতে পারে না কখনো। তাই ধার্মিক মানুষের সংযম ও ন্যায়নিষ্ঠা সমাজ-শৃঙ্খলার সহায়ক হয়েছে বটে, কিন্তু মানুষের অগ্রগতির অবলম্বন হয়নি। আর মতবাদ যেহেতু যুক্তিভিত্তিক ও কল্যাণমুখী সেজন্যেই মতবাদই মতধারীর মনুষ্যত্ব ও মানবতার পরিমাপক। এটি তার বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অর্জিত বলেই এখানে সে স্বয়ম্ভু।
>
> সেকালের ধর্মমত আর একালের মতবাদ দুটোই মূলত সামান্য অর্থে ধর্ম,– জীবনযাত্রীর নিয়ামক। একটা ঐশ্বরিক, অপরটা নিরীশ্বর তথা মানবিক– পার্থক্য এটুকুই। কিন্তু কোনোটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। মানবিক সমস্যার সমাধানে কোনোটাই নয় পুরো সমর্থ। তবু গণহিতৈষণা-কামীর 'গণবাদ' শ্রেয় এবং গণতন্ত্র উন্নততর ব্যবস্থা। (শরীফ, ২০১০:২৫৪)

৩.২.৬

বাঙালির ধর্ম সম্পর্কে আহমদ শরীফের বিস্তারিত আলোচনা ও গবেষণার মৌল প্রতিপাদ্য– 'বাঙলার ধর্ম প্রবর্তিত ধর্ম নয়–লোকায়ত লোকধর্ম' (শরীফ, ২০১০:৪৩১)। যে ভৌগোলিক প্রভাবে ও ঐতিহাসিক কারণে এবং সমাজ বিবর্তনের ধারায় এই লৌকিক ধর্মচেতনার কালিক সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্ভব হয়েছে তাঁর পরিচয় ও তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ রয়েছে আহমদ শরীফের সুবিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য'-তে। আহমদ শরীফ বাঙালির ধর্মচিন্তার যে বিবর্তনধারা ব্যাখ্যা করেছেন তা অনুসরণ করলে আমরা বাঙালির আদি বিশ্বাসে পাই ঐহিকতা, নিরীশ্বর প্রাণবাদ, ভোগেচ্ছু ধর্মচিন্তার প্রতিফলন।

বাঙালি ধর্ম লৌকিক, সমন্বয়বাদী এবং গ্রহণশীল।[৩৫] আহমদ শরীফ লৌকিকতার উৎস ব্যাখ্যা করেছেন 'বাঙালীর সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে–

> সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, দেহতত্ত্ব- এগুলো হচ্ছে বাঙলার আদি মঙ্গোলদের দান, আর নারী দেবতা, পশু পাখি ও বৃক্ষদেবতা, জন্মান্তর প্রভৃতি হচ্ছে অস্ট্রিকদের দান। এগুলোর মধ্যে মন-মানসিকতা ও মননের যে বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত আছে, তার প্রভাব থেকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ কখনো মুক্ত ছিল না, আজো মুক্ত হয় নি, ভবিষ্যতেও হতে পারবে না। এ-বৈশিষ্ট্য বাঙালীর চরিত্রে ও জীবনে অন্তর্নিহিত। বাঙালী বৌদ্ধ, ব্রাক্ষ্মণ, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করে নানা সম্প্রদায়ের রূপ লাভ করেছে বটে, কিন্তু কখনো সে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব ছাড়তে পারেনি। ফলে বহিরাগত প্রতিটি মতবাদ এখানে এসে নতুন রূপ লাভ করেছে। নতুন চরিত্র নিয়েছে। বাঙালী রূপ নিয়েছে। (শরীফ, ২০১২:৭৯)

'বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে' প্রবন্ধেও বাঙালির লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের সারসত্য পাই, আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> দেশজ লৌকিক ধর্মই কালে কালে বাঙালীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাঙালীর স্বাধীনতাপ্রীতি, স্ব-জাত্যবোধ ও সঙ্ঘশক্তির সাক্ষ্য নগন্য বটে, কিন্তু তার মাটি ও মর্তাপ্রীতি সর্বত্র সুপ্রকট। আদিতে তারও ছিল কৌম জীবন। বাহ্যত কর্মবিভাগ সে স্বীকার করেছে, সমাজে কর্মগত সহযোগিতা ও সংহতির গুরুত্বও কখনো অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রবণতা ও আত্মরতি ছাপিয়ে উঠেছিল তার সহমর্মিতা ও সহধর্মিতার বন্ধনকে। (শরীফ, ২০১২:১৮)

বাঙালির মৌল ধর্ম সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র। তবে তার আগে আদি-অস্ট্রালদের সর্বপ্রাণবাদ থেকে সে শিক্ষা নিয়েছে মৈথুনতত্ত্বের। সে জেনেছে, প্রাণ ও প্রাণীর আবর্তন আছে, বিবর্তন সম্ভব-কিন্তু ধ্বংস যেন অসম্ভব। এর থেকেই হয়তো উদ্ভূত হয়েছে আত্মা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্ত্ব। সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের উদ্ভব বাংলাদেশেই, পরে বিস্তৃতি পায় সর্বভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলে। বলা যায় বাঙালির আদি মনীষা ও উন্নতচিন্তার গৌরব করা যায় এমন দুএকটি বিষয়ের মধ্যে সাংখ্য-যোগ আবিষ্কার ও চর্চা অন্যতম। যদিও মূলত মোঙ্গলরাই সাংখ্যতত্ত্বের দ্রষ্টা এর সাথে বাঙালির আদিপুরুষ অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস সমন্বিত হয়ে এর উদ্ভব। সাংখ্য হল দর্শন, যোগ ও তন্ত্র হল সেই দর্শনের আচার। তন্ত্র বলতে মায়াও বোঝায়। কায়াসাধনা বা দেহসাধনাই সাংখ্যদর্শনের মূল কথা। পরবর্তীকালে বৈদিক বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের সাথে এই সাংখ্য-যোগই প্রভাবে-সংঘর্ষে নতুন ধর্মমত সৃষ্টি করেছিল। আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> দেশী জন্মান্তরবাদ প্রতিমা পূজা, নারী, পশু ও বৃক্ষ-দেবতার স্বীকৃতি, মন্দিরোপাসনা, ধ্যান, কর্মবাদ, মায়াবাদ এবং প্রেততত্ত্ব দেশী মানস প্রসূত। কাজেই যোগ ও তন্ত্র সর্ব ভারতীয় হলেও অস্ট্রিক, নিষাদ ও ভোট-চীনা কিরাত অধ্যুষিত বাঙলা-আসাম-নেপাল অঞ্চলেই হয়েছিল এসবের বিশেষ বিকাশ। যোগীর দেহশুদ্ধি এবং তান্ত্রিকের ভূতশুদ্ধি মূলত অভিন্ন ও একই লক্ষ্যে নিয়োজিত। বহু ও বিভিন্ন মননের ফলে, কালে ক্রমবিকাশের ধারায় সাংখ্য, গোপ এবং তন্ত্র-তিনটে স্বতন্ত্র দর্শন ও তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এবং প্রাচীন ভারতের আর আর ঐতিহ্যের মতো এগুলো আর্যশাস্ত্র ও দর্শনের মর্যাদালাভ করে। (শরীফ, ২০১০:৪১)

সর্বভারতীয় সাধনায় এবং ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়েও সাংখ্য যোগ ও তন্ত্র বাঙলার ধর্ম, বাঙালীর ধর্ম। কেননা, এই ধর্মের উদ্ভব এবং বিশেষ বিকাশভূমি বাঙলা। আদি যোগ ও সাংখ্য ধর্মের কালিক বিস্তারে যেভাবে-যেরূপে টিকে ছিল এবং আজো টিকে আছ তার বর্ণনায় আহমদ শরীফ জানিয়েছেন–

অমৃতকুণ্ড, বৌদ্ধ সহজিয়ার দোঁহা ও চর্যাপদ, কৌলজ্ঞান নির্ণয়, বৈষ্ণব সহজিয়ার সহজিয়াপদ, বাউল গীতি, ধর্মমঙ্গল, শূণ্যপুরাণ, ময়নামতী-মাণিকচন্দ্র-গোপীচাঁদ গাথা, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীতি, গোরক্ষ বিজয়, অনিল-পুরাণ, হর-গৌরী-সম্বাদ, নূরনামা, পীরনামা, তাবিলনামা, আগম-জ্ঞানসাগর, আদ্য পরিচয়, নূরজামাল, গোর্খসংহিতা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি রচনা যেমন এদেশেই মেলে, তেমনি এদেশী লোকের ধর্ম-সাধনায় যোগতন্ত্র আজো অবিলুপ্ত। আজো হিন্দু-মুসলিম সমাজে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের সংখ্যা নগণ্য নয়। ডাকিনী-যোগিনী, তুক-তাক, দারু-টোনা, মন্ত্র-কবচের জনপ্রিয়তাও বৌদ্ধ প্রভাবে স্মারক। গুরু, প্রেত আর যক্ষ বৌদ্ধদের দান। আজো বৌদ্ধ-যোগ ও তন্ত্র বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের অধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যে এদেশেই বৌদ্ধ শাসন ও বৌদ্ধ প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী-উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে পাল রাজত্ব ও পূর্বাঞ্চলে সমতটে চন্দ্র ও শাসন। এখানেই অভিন্ন-সত্তায় মিলেছে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় এবং ভোট-চীনার রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি। প্রাচীনকালেই নয় কেবল মধ্যযুগে এবং আধুনিক কালেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও কলকাতার ব্রাক্ষমত বাঙালী ভারতবর্ষকে দান করেছে। (শরীফ, ২০১০:৪১)

আহমদ শরীফ বর্ণিত ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ’ প্রত্যয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রথমত ধর্মের মাধ্যমেই অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গল রক্তসংকর বাঙালির আদিরূপ অভিন্ন দর্শনের ঐক্যে বাঁধা পড়েছিল। দ্বিতীয়ত সেই অভিন্ন ধর্মই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তথা নাথ, যোগী, বৈষ্ণবদের মাধ্যমে লৌকিক ধর্মের আবহে বাঙালির ধর্মচিন্তার ঐশ্বর্যের কথা ঘোষণা করে যাচ্ছে, ‘বহিরঙ্গের প্রসাধনের মতো’। আহমদ শরীফ বাংলায় বিভিন্ন ধর্মমতের যে সম্মিলিত প্রবাহ তাঁর পরিচয় দিয়ে লিখেছে, বৌদ্ধ-ব্রাক্ষণ্য-ইসলাম কোনোধর্মই এখানে স্বরূপে গৃহীত হয়নি। বাঙালি তাঁর চিন্তাজগতের চির-স্বাধীন স্বভাব তাঁর সর্বপ্রাণবাদী, ঐহিক জীবনভাবনার সাথে মিলিয়ে নিয়ে গ্রহণ করেছে বহিরাগত সকল ধর্ম। আহমদ শরীফ লিখেছেন–

বাঙালীর এই যোগতান্ত্রিক জীবনতত্ত্বও বাঙালীর জীবনে ও মননে প্রগাঢ় ও ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। এর ফলে বহিরাগত বৌদ্ধ, ব্রাক্ষণ্য ধর্ম ও ইসলাম এখানে কখনো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এদেশীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারই বহিরাগত ধর্মমতের প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে এবং কালিক অনুশীলনে ও বহু মননের পরিচর্যায় সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে এনেছে ঔজ্জ্বল্য। এভাবে বৌদ্ধ বিকৃতির পরিণামে পেলাম লৌকিক দেবতা ও তান্ত্রিক সাধনা, ইসলামী বিকৃতিতে এর সত্যপীরকেন্দ্রী বহু দেবকল্প ও দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী লৌকিক পীর- যাদের দু-চারজন সেনানী শাসক হলেও অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব কাল্পনিক। আজো আমাদের সামাজিক, পার্বণিক ও আচারিক রীতি-নীতিতে আদিম Animism, Magic belief প্রবল ও মুখ্য। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কেবল বহিরঙ্গিক প্রসাধনের মতোই আমাদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য ও ঋক্থের সঙ্গে প্রলিপ্ত হয়ে আছে মাত্র। (শরীফ, ২০১০:৪৫)

কিন্তু বাঙালির ধর্মচিন্তার অপূর্ণতা বা ব্যর্থতা হল কোনো ধর্মই বাঙালির চিন্তাজগতে প্রসার লাভ করে সমাজবিপ্লব ঘটাতে পারেনি। বাঙালির সাংখ্য অথবা বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্ব আলোড়ন তুলেও সফল হতে পারেনি পরিণতিচিন্তা না থাকার কারণে। ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রে বাঙলার ছিল স্মরণীয়, কীর্তিমান পুরুষ– মীননাথ, গোরক্ষনাথ, শীলভদ্র-দীপঙ্কর-অম্বরনাথ-হাড়িপা-কানুপা-রামনাথ-রঘুনাথ-রঘুনন্দন চৈতন্য-রামমোহন-রামকৃষ্ণ প্রমুখ। কিন্তু এঁদের দেহাত্মবাদ, নির্বাণবাদ, মোক্ষবাদ, প্রেমবাদ শাস্ত্রানুগত্য মানুষের জাগতিক কল্যাণসাধন করেনি। মর্ত্যবাসী মানুষের মনে তাই এমন দিকপাল মনীষার লালন সম্ভব হয়নি। তার বৈরাগ্যপ্রবণ প্রেমবাদ ব্রাক্ষণ্যসমাজের ভাঙন ও ইসলামের প্রসার রোধ করেছিল কিন্তু পরিণামে বাঙালির পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। বস্তুত কোনোটিই বাঙালির চিন্তাজগতে প্রভাব বিস্তার করে ও সমাজে বিপ্লব ঘটিয়ে নতুন পথের দিশারী হতে পারেনি। ‘বাঙলার ধর্ম’ প্রবন্ধে আহমদ শরীফ বাঙালির ধর্ম-চিন্তার সারার্থ তুলে ধরেছেন–

ভৌগোলিক প্রভাবে ও ঐতিহাসিক কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারায় এর কালিক সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্ভব হয়েছে। .... বাঙালির ধর্মতত্ত্বে পাপ-পুণ্যের কথা বেশি নেই। অনেক করে রয়েছে জীবন-রহস্য জানবার ও বুঝবার প্রয়াস। লোক-জীবনে সে-প্রয়াস আজো অবিরল। মনে হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোক-জীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রশ্রয় কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যের আসমানী-চিন্তার মাহাত্ম্য-প্রলেপে বাস্তবজীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে এই নির্মিত ভুবনে বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও দুঃখী মানুষ। (শরীফ, ২০১০:৪৩১)

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির ধর্মবোধ ও ধর্মচিন্তর বিবর্তনধারার ব্যাখ্যা থেকে ধারণা করা যায়– বাঙালির ধর্মবোধ উদারনৈতিক, পরিগ্রহণশীল, ঐহিকতামুখ্য এবং সমন্বয়বাদী। এর সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে জড়িয়ে আছে পূর্বপুরুষের দেহাত্মবাদ ও কায়াসাধনার রেশ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের– সহজিয়া, বৈষ্ণব, নাথ, যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধনা।

৩.২.৭

বাঙালি মুসলমানের ধর্মচিন্তা সম্পর্কে আহমদ শরীফের পর্যালোচনা সবচেয়ে ব্যাপক, গভীর ও বিচিত্র। এই ধর্মভাবনায় প্রথম দিকে, ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের বাস্তবতায় ইসলামের যুক্তি ও তর্কবাদী মুতাযিলাদের সমর্থন থাকলেও ক্রমশ তিনি অধিকতর উদার ধর্মভাবনার দিকে আকৃষ্ট হন এবং বাহ্যিক আচারিক ধর্মের চেয়ে ধর্মের মৌলনীতিসমূহ চর্চাকে গুরুত্ব দিতে থাকেন। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের ধর্ম চর্চায় ঐতিহাসিকভাবেই বিজ্ঞান-যুক্তি-উদারতা-জ্ঞান-মানবতা এসবের গুরুত্ব না থাকায় এবং সেদিকে উত্তরণ ঘটার সম্ভাবনা না দেখে, আহমদ শরীফের ক্ষুব্ধ হন বাঙালির যুক্তিহীনতার সংস্কৃতিও বিশ্বাসপ্রবণ মনের ওপর। তিনি মানেন, ধর্মের ও ধার্মিকের বিশ্বাসপ্রবণতার ওপরই অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বৃদ্ধি। ক্রমাগত বাঙালি মুসলমানেরর ধর্মান্ধতার অন্ধকার দিক উন্মোচনের ব্রত নিয়ে লিখতে থাকেন তিনি। বিশেষত নব্বইয়ের দশকে তাঁর লেখায় ধর্ম-ধর্মহীনতার দ্বন্দ্ব, নাস্তিক-আস্তিক তুলনা-প্রতিতুলনা, বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তির চর্চা, সংস্কারান্ধতার বিপরীতে বিজ্ঞানের জয়, মৌলবাদের বিরুদ্ধে মানবতাবাদের প্রসার ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেতে থাকে। তিনি মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি ও বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ক্রমাগত নাস্তিক্যের প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠেন। তাঁর এরূপ চিন্তা তাঁকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে, তিনি সর্বমানবিকতাবাদ নাস্তিক্য ছাড়া সম্ভব নয় বলেই মনে করতেন। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, দেশপ্রেমিক নেতার প্রতীক্ষা, শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ইত্যাদি বিষয়ের সমাধানে আস্তিক বা ধার্মিকের ওপর তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি এমনকি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতাদের চিন্তায় ধর্মের গভীরতা নিয়েও সন্দেহ উত্থাপন করেছেন, সংশয় প্রকাশ করেছেন তাঁদের কমিউনিজমে আস্থা নিয়ে। আহমদ শরীফ প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ গবেষণায়-লেখায়-চিন্তায়-বক্তৃতায় যতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সর্বত্র ধর্মের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করেছেন, আলোকিত করেছেন বাঙালির বিপুল অনালোকিত জীবনবোধ। তন্মধ্যে ভাষায় ইসলামি রূপপ্রতীকের ব্যবহার, পুথির ভাষা, মধ্যযুগের সাহিত্য বিশ্লেষণ, সমকালীন রাজনীতি ও সমাজ সকল ক্ষেত্রই রয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর ধর্মভাবনায় ছিল নিখাদ মানবপ্রেম ও মানবতাবাদ।

মুসলমান লেখকদের লেখায় বে-ইসলামী রূপপ্রতীক ব্যবহারের অনৌচিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখার সমালোচনা করে আহমদ শরীফ ইসলামী সংস্কৃতির অনুসরণের নামে দেশীয় সংস্কৃতি পরিত্যাগের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত তুলে ধরেছেন 'সাহিত্যে রূপপ্রতীক' প্রবন্ধে। তাঁর মতে, কেবল বিশ্বাস বা আচরণের ব্যাপারেই 'ইসলামি' বা 'বে-ইসলামি' সংজ্ঞার্থের বা শব্দের প্রয়োগ ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে আরবি শব্দ ব্যবহারকে ইসলামি ভাবাদর্শ প্রচার বলা যায় না। দুটি এক বিষয় নয়। তাছাড়া ইসলামি বা মুসলিম সংস্কৃতি নামে চিহ্নিত করার মধ্যে যে পার্থক্য তা আহমদ শরীফ ব্যাখ্যা করেছেন। ইসলামি সংস্কৃতি বলে যেসব বিষয় প্রচলিত তা আসলে ইসলামপূর্ব কাফের বা ইহুদিদেরও সংস্কৃতি, আরবের মুসলমানরা ইসলাম গ্রহণ করলেও স্বজাতির বা স্বদেশের কুফরি ঐতিহ্যের গর্ব ছাড়েনি, ত্যাগ করেনি সেই সংস্কৃতি। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতে যেমন দেশি ও ইঙ্গ-ভারতীয় খ্রিস্টান সমাজ গড়ে উঠেছিল আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীনভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরান্মুখতার মধ্য দিয়ে ঠিক একই ভাবে উচ্চবিত্ত বাঙালি মুসলমানেরও ছিল বহির্মুখী মানসিকতা। আমাদের সংস্কৃতিতে তাদের কোনো শ্লাঘনীয় অবদান নেই বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। বরং নিম্নবিত্ত মানুষের ছিল মাটির প্রতি মায়া, নিজের সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ। তাই সে তৈরি করেছিল লৌকিক ইসলাম। তাদের জীবনচর্যায় মানবতাবাদ, প্রেমধর্ম, ভক্তিবাদ, বৈরাগ্যসাধনা মিলে এক অভিনব মরমীয়া তত্ত্বের জন্ম হয়েছিল। তার মধ্যে এসে মিশেছিল সব ধর্মের জীবন-জিজ্ঞাসার দেশীয়

রূপ। এসবের মধ্যেই সে সন্ধান করেছে জগৎ ও জীবনের মনোময় ব্যাখ্যা। এই প্রাকৃতজনেরা জীবন-ভাবনার প্রয়োজনে উচ্চারণ করেছে মানবতা ও মানব মহিমার চরম বাণী। আহমদ শরীফ দেশীয় সংস্কৃতির এই সার্বজনীন মানবতাবাদী রূপকেই বাঙালির প্রকৃত জীবন-সংস্কৃতি বলে মনে করেন।[৩৬] তিনি লিখেছেন–

> যারা 'ইসলাম'-অনুগ জীবন, আদর্শ ও সংস্কৃতির পক্ষপাতী, তারা বিগত হাজার বছরের বাঙলার ইতিহাসে নিছক ইসলামি সংস্কৃতির কোনো নিদর্শন পাবে না। অবশ্য সুফীতত্ত্ব প্রভাবিত এই সংস্কৃতিকে দেশী মুসলিম সংস্কৃতি বলে স্বীকৃতি দিয়ে সহজেই গৌরব করা যায়।
>
> সংস্কৃতি মানেই স্বস্থ জীবনবোধের প্রকাশ এবং প্রাণময়তার অভিব্যক্তি। আর চিন্তায় ও কর্মে সুন্দরের সাধারণ নাম সংস্কৃতি। এর চর্চা এবং স্বরূপে এর প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের নাম সাংস্কৃতিক চর্চা। কাজেই তা বহু বিচিত্র ও নতুন হয়েই ফুটে ওঠে। নিতান্ত আদর্শানুগত্য কোনো সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে না, এমনকি সুষ্ঠু লালনেও অক্ষম। এই জন্যেই সাধারণত আমরা ইসলামি সংস্কৃতি বলতে যা বুঝি ও বুঝাই তাও আরব-ইরান-তুরানের দেশজ ও গোত্রজ সংস্কৃতির পাঁচমিশেলী রূপ মাত্র। তাই এর পরিচায়ক নাম হওয়া উচিত 'মুসলিম সংস্কৃতি' এবং যেহেতু এ সংস্কৃতির উদ্ভব মুসলিম মানসে এবং এর প্রতিফলন হয়েছে মুসলমানেরই আচরণে ও কর্মে, সেজন্যে রূপকল্পে ও ভাবরসে তা ইসলামি জীবনবোধের দ্বারা প্রভাবিত। তাই বলে একে ইসলামি বলার যৌক্তিকতা নেই। (শরীফ, ২০১০:১২)

আহমদ শরীফ ধর্মের সাথে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাতিকতার স্পষ্ট বিভাজন রেখা টেনে লিখেছেন[৩৭] –

> মানুষ চিরকাল বিদেশের ও বিজাতির ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বাজাত্য ছাড়েনি। তাই পৃথিবীর তিনটে বহুল প্রচারিত ধর্মের ভাষা হিব্রু, পালি এবং আরবি– মসজিদ, মন্দির ও গীর্জার প্রাচীর ডিঙিয়ে বিদেশে কারো মুখের বুলি হতে পারেনি। (শরীফ, ২০১০:১২)

এ বিষয়ে মানুষের যার যার ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ন রেখেই পরিবার ও সমাজের সদস্য হয়ে দায়িত্ব পালনের উদাহরণ টেনে আহমদ শরীফ এর সাথে তুলনা করেছেন বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ঐক্যের সদর্থক ব্যঞ্জনার। যেখানে আত্মস্বাতন্ত্র্য বিলোপ করে বিশ্বমানবতায় বা আন্তর্জাতিকতায় লীন হয়ে না যাওয়ার মধ্যেই স্বাদেশিকতা , স্বাজাতিকতা ও স্বাভাবিকতার প্রকাশ। ইসলামানুগ আত্মজীবন চর্যার মাধ্যমেই বিশ্বমানব পরিচর্যার পাঠ গ্রহণ করতে হবে। আহমদ শরীফের ভাষায়–

> কোনো ভাষাতেই ধর্মীয় 'রূপ' থাক্তে পারে না, থাকে ধার্মিকভাব। মোমেন স্বেচ্ছায় যে কথা বলবে, যা ভাববে বা করবে, তাতে– এক কথায় তার চলনে-বলনে-করণে ইসলামি ভাব বা আদর্শ থাকবেই। সে যেখানেই থাকুক, যে-ভাষায়ই বলুক আর যে হাতিয়ারেই করুক। এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই। কাজেই মাতৃভাষার সঙ্গে ধর্মের ভাষা মিশালেই ভাষা ও সাহিত্যের ধর্মীয় রূপ মেলে না। কে না বোঝে যে আরবি ভাষায়ও আল্লাহ্‌র নিন্দা করা যায়, আবার সংস্কৃত ভাষায়ও আল্লাহ্‌র বন্দনা সম্ভব। (শরীফ, ২০১০:১৩)

তাই নিজ ভাষায় ও সাহিত্যে ব্যবহৃত অলংকার, ভাব-ব্যঞ্জনা, ধ্বনিসৌকর্য ও ঐশ্বর্য সর্বসাধারণের যতটা পরিচিত ও আস্বাদ্য বিদেশি ভাষার ব্যঞ্জনা ও লাবণ্য তাঁর কানে ততটা মাধুর্যমণ্ডিত হতে পারে না, বিদগ্ধ জনের পক্ষেই কেবল বিজাতীয় ভাষায় রস-আস্বাদন সম্ভব। একারণে আরবি, ফারসি, গ্রিক বা ইংরেজি ভাষার শব্দমাত্রই বাংলায় ব্যবহৃত হলে তা অর্থ-ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি-সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক নয়–

> আরব-ইরানিরা তাদের কাফের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য-রিক্‌থ অবহেলা করেনি, পরম শ্রদ্ধায় বরণ করে নিয়েছে। আমরা কিন্তু আমাদের অমুসলমান পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ভুলবার সাধনা করেছি, আর অবজ্ঞা করেছি আমাদের স্বকীয় ও স্বাদেশিক সম্পদকে। আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি যা-ই হোক না কেন, তা থাকবে (এবং থাকা বাঞ্ছনীয়ও) মুসলিম আরব ও ইরানির প্রতি। তাদের কাফের পূর্বপুরুষের জন্যে আমাদের কোনো শ্রদ্ধা-সমীহের ভাব থাকার কথা নয়, থাকা উচিতও নয়, অথচ এ ব্যাপারে আমাদের মনোভাব অদ্ভুত ও আত্মদ্বেষী। পাক-ভারতের দশ কোটি মুসলমানের কিছুসংখ্যক লোক আরব-ইরানি-তুরানির বংশধর হলেও নিশ্চয়ই আর সব মুসলমান দেশজ, তাহলে দাতার উপমা দিতে হলে বিদেশি বিজাতি কাফের 'হাতেমতাই'র চেয়ে দেশি এবং সম্ভবত জ্ঞাতি কর্ণের উপমা মনে জাগাই স্বাভাবিক ও শোভন। তেমনি কাফের কবি ইমরুল কায়েসের চেয়ে কালিদাসের দাবী কম নয়। (শরীফ, ২০১০:১৪)

আহমদ শরীফ এ প্রসঙ্গে বিদেশি অমুসলমান বীর বা রাষ্ট্রনায়কের রূপপ্রতীক ব্যবহার করে স্বজাতির বা স্বদেশের চেনা ঐতিহাসিক বীরকে অবহেলা করার মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মলাঞ্ছনার প্রমাণ পেয়েছেন। তাঁর অভিমত–

> আমাদের রূপপ্রতীক যদি বাছবিচার করতেই হয়, তাহলে আমাদের নীতি হবে–আমরা দেশি-বিদেশি মুসলিম ঐতিহ্য ও আদর্শপ্রসূ রূপপ্রতীকই কেবল গ্রহণ করব। দেশি-বিদেশি কোনো মুসলমানেরই জ্ঞাতি অমুসলিমের কিছু গ্রহণ করব না। আর যদি সাহিত্য-শিল্পের উৎকর্ষের জন্যে নির্বিচারে রূপপ্রতীক ব্যবহার করতে চাই, তা হলে দেশিগুলোকেও হেলা করব না, কোনো বিরূপতা দেখাব না। (শরীফ, ২০১০:১৪)

আহমদ শরীফ মনে করেন আন্তর্জাতিকতার এই যুগে বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সুন্দর ও কল্যাণকর ভালো সবকিছুকে সাদরে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। পরিত্যাগ করতে হবে আদিম গোত্র ও কোটারিপ্রীতির বশে পুরোনো ও বিশেষকে আঁকড়ে ধরার মনোভাব। প্রগতি ও জীবনময়তার স্বার্থেই এটা করতে হবে। ধর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর মানুষের লক্ষ্যকে বিক্ষিপ্ত করার পক্ষে নন আহমদ শরীফ, কারণ–

> হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান হওয়া তো লক্ষ্য নয় আমার জীবনের। হিন্দুয়ানী, মুসলমানী বা খ্রীষ্টানী নীতির (এগুলো প্রাত্যহিক জীবনযাপন পদ্ধতির এক-একটি system বা code) মাধ্যমে মানুষ হওয়া– সুন্দর হওয়াই আমার লক্ষ্য। শুধু এটুকু বলা যায় যে, জীবনযাত্রায় আমার পাথেয় ইসলামী বা হিন্দুয়ানী বা খ্রীষ্টানী মতাদর্শ ও পদ্ধতি। কোনো পদ্ধতিই পরিণতির পরিচিতি হতে পারে না, বড়জোর পরিণামের ইঙ্গিত দিতে পারে মাত্র। তার মধ্যে গুণগত তারতম্য সম্ভব এবং স্বাভাবিক। সুতরাং উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচারও চলতে পারে হয়তো। অতএব মানুষে মানুষে, নীতি ও পদ্ধতিতে, পথও পাথেয়তে, মতে ও মননে পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য সেই এক– জীবনকে সুন্দর করে রচনা করা; জীবনে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি ও উপভোগ করা। পথ ভিন্ন, পদ্ধতি নানা কিন্তু কাম্য এক, তীর্থ অভিন্ন। প্রাপ্তির স্বাদও অভিন্ন। (শরীফ, ২০১০:১২৯)

তবে আত্মনিয়ন্ত্রণবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, মর্যাদা-চেতনা, সততা-ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণাবলি মানুষকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। কেবল পরকালের শাস্তির ভয়ে প্রবৃত্তিপরবশ মানুষ ধর্মের বিধিবিধানে যা পাপ তা থেকে দূরে থাকে না। আহমদ শরীফের মতে, লোকনিন্দাভীতি এবং সমাজের নিয়মে যা অপরাধ তা ঘৃণা করার রুচিশীল মনই আসলে মানুষকে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ করে। উভয়ই, প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষাজাত আত্মমর্যাদাবোধের উৎসারণ। আহমদ শরীফের ব্যাখ্যায় বিষয়টি বিধৃত হয়েছে–

> শিক্ষাজাত আত্মসম্মানবোধ কিংবা সমাজে প্রতিষ্ঠাপ্রসূত মর্যাদা-চেতনা মানুষকে অনেক অপকর্মের প্রলোভন এড়িয়ে চলতে সহায়তা করে। তাছাড়া জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধীশক্তি, বিবেচনাসামর্থ্য ও তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধ জাগে। ইসলাম এও বুঝে যে প্রবৃত্তিপরবশ মানুষকে লোকান্তরের শাস্তির ভয়ে শায়েস্তা রাখা সম্ভব নয়। তাই জ্ঞানার্জনের জন্য এমনি তাগিদ। আমরা দেখেছি নরকাগ্নির ভয় মানুষের চরিত্র শোধনে যত না সহায়তা করে, তার চেয়ে ঢের বেশি এ ব্যাপারে কার্যকর হয় আত্মমর্যাদাবোধ। কারণ আত্মমর্যাদাবোধ থেকে কর্তব্যবোধ জাগা স্বাভাবিক। আল্লাহ অন্তর্যামী; মানুষের কোনো ভাব, ইচ্ছা বা কার্য আল্লাহর অগোচরে থাকে না–এ জেনেও প্রবৃত্তি বশে মানুষ অসৎকার্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু মানুষ মানুষকে ভয় ও সমীহ করে নিন্দার আশঙ্কায়। এ নিন্দাভীরুতা শিক্ষাজাত আত্মমর্যাদাবোধের ফল। মানুষ মূলত সৌন্দর্যপ্রিয়, সচেতনভাবে সৌন্দর্যের সাধনা না করলেও অবচেতন মনে তা সর্বদাই করে থাকে। ফলে প্রশংসা পাবার ভালো সাজবার অর্থাৎ কথায়, কাজে ও চালে-চরিত্রে সুন্দর হওয়ার একটা সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে মানুষের। পাছে লোকে নিন্দা করে এ ভয়ে মানুষ দুষ্কর্ম গোপনেই করে।
> (শরীফ, ২০১০:১৪৪)

আমাদের দেশে শাসন-শোষণের প্রয়োজনে এবং প্রবলের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দেশ-জাতি-ধর্মের দ্বান্দ্বিক ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হচ্ছে বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। দেশে দেশে আচরিত মুসলিম-সংস্কৃতির সমন্বয়ধর্মিতার উদাহরণ টেনে তাঁর এই পর্যবেক্ষণের পক্ষে তিনি লিখেছেন–

> মুসলমানেরা যে-ধর্ম মানে তা আরবোদ্ভূত। সেখানকার লোক ইসলাম মানে, কিন্তু দেশের অমুসলিম ও মুসলিম কোনো ঐতিহ্যকেই অবহেলা করে না। ইরানেও ধর্মমত দৈশিক ঐতিহ্যেবোধের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়নি। তুরস্ক-ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রেও দেশি লোকের ধর্মমতে ও ঐতিহ্যবোধে কোনো বিরোধ নেই। আমাদের দেশেই কেবল শাসন-শোষণের প্রয়োজনে কৃত্রিম তত্ত্বের অবতারণা করে দেশ, জাত ও ধর্মের দ্বান্দ্বিক ধারণা দানের অপচেষ্টা হচ্ছে। (শরীফ, ২০১০:১৪৬)

মধ্যযুগের নিরঞ্জনের রুস্মা থেকে যে বৈরিতার প্রকাশ, তা সৈয়দ হামজা বা গরীবুল্লাহ্‌র পুঁথির কালেও অপসৃত না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩৮] এই বৈরিতা-অবসানকল্পে উভয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রধানত ধার্মিকদের মধ্যে সুবিবেচনা ও মানবতাবোধের উদ্বোধন আশা করেছেন আহমদ শরীফ। কারণ 'ধার্মিক মানুষেরাই যে বিধর্ম ও বিধর্মী বিদ্বেষী' তা মধ্যযুগে নিরঞ্জনের রুস্মা থেকে সৈয়দ হামজার জৈগুনের কিস্‌সা বা পীরপাঁচালি পর্যন্ত সর্বত্রই লক্ষণীয়।[৩৯] বৃহত্তর বিবেচনায়, কেবল ধর্ম নয়, যা-কিছু মানুষের মিলনের পথে বাধা তা-ই মানবতার জন্য ক্ষতিকর–

> বর্ণ, ধর্ম ও রাষ্ট্র-চেতনা এই তিনটেই মানবিকতা ও মানবতার দুশমন। আজকের দুনিয়াব্যাপী খুনোখুনি ও কাড়াকাড়ির মূল কারণ। অধিকাংশ মানুষ এই বর্ণ, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্রবোধের উর্দ্ধে না উঠলে অর্থাৎ এসব ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিহার না করলে অশান্তি ও বিপর্যয় থেকে আজকে পৃথিবীর মুক্তি নেই। (শরীফ, ২০১০:২৮০)

৩.২.৮

বাঙালির ইতিহাসের পরতে পরতে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি, দ্বেষ-বিদ্বেষ, অবজ্ঞা-অস্পৃশ্যতা তাঁর সকল অর্জন ও গৌরবকে করেছে মসীলিপ্ত। ইতিহাসের নির্জিত-শোষিত-পীড়িত-ব্রাত্য বাঙালি সেন যুগের ব্রাহ্মণ্য শাসনের কাল থেকে বর্ণ-বৃত্তি-বিত্ত-শাস্ত্রীয় ভেদনীতির দ্বারা এক অনতিক্রম্য শোষণজালে আটকে পড়ে এবং চিরাচরিত উত্তম-মধ্যম-নিম্ন বা ব্রাত্য নামের অদৃষ্টলিখিত বিভাজনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে থাকে। এই বিভাজন নিম্নবর্ণের বাঙালি সমাজে অবজ্ঞা-বিদ্বেষের জন্ম দিলেও ইংরেজ আমলের মতো ঈর্ষাকাতরতার জন্ম দেয়নি। তাই আহমদ শরীফের প্রতিপাদ্য : বাঙালির ধর্মসাম্প্রদায়িক বিভাজন ব্রিটিশ শাসনামলের সৃষ্টি, শাসকশ্রেণির স্বার্থে ও প্ররোচনায়।

বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের বৈরিতার উদাহরণ দিয়ে আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকগণ সমভাবেই উৎসাহী। কারণ সংস্কৃতি রক্ষার নামে মুসলমানের যা বর্জনীয়, হিন্দুর জন্য তাই বরণীয়। (শরীফ, ২০১০:২৮১) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় ধার্মিক মানুষেরাই বিধর্ম ও বিধর্মী বিদ্বেষী, এমন মন্তব্য করে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের সমভাবেই উৎসাহী দেখি। মধ্যযুগে নিরঞ্জনের রুস্মাতেই প্রথম বৌদ্ধ-হিন্দুর বিদ্বিষ্ট সম্পর্কের সংবাদ পাই। বিজয়গুপ্ত প্রভৃতির মনসামঙ্গলে, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, লোচনদাস প্রভৃতির চৈতন্যচরিত গ্রন্থে, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, কৃষ্ণরামের অন্নদামঙ্গলে, সহদেব চক্রবর্তীর অনিল পুরাণ প্রভৃতিতে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ, বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। আবার জায়নুদ্দীনের রসুলবিজয়ে, শাবারিদ খানের রসুলবিজয়ে ও হানিফার দিগ্বিজয়ে, সৈয়দ সুলতানের 'জয়কুম রাজার লড়াই'-এ, গরীবুল্লাহ্‌র সোনাভানে, সৈয়দ হামজার জৈগুনের কিস্‌সাতে এবং কোনো কোনো পীরপাঁচালীতে হিন্দু ও হিন্দুয়ানীর, কাফের ও পৌত্তলিকতার প্রতি অবজ্ঞা-অসৌজন্য সুপ্রকট। (শরীফ, ২০১০:২৮০)

ব্রিটিশ শাসনকালে নতুন পরিবেশে ব্রিটিশ ইতিহাসকারদের ও শাসকদের কারসাজিতে হিন্দু ও মুসলিমের পারস্পরিক সম্পর্ক হয়ে ওঠে বিষাক্ত। 'বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ এর স্থূল কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন–

১। বাঙালি মুসলমানদের মিথ্যে তুর্কি-মুঘল-জ্ঞাতিত্বচেতনা।

২। ব্রিটিশের ভেদনীতির সাফল্যের লক্ষ্যে ব্রিটিশরচিত ইতিহাসে ভুল তথ্য প্রচার।

৩। প্রতীচ্য শিক্ষা হিন্দুর মনে স্বধর্মীর জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে শিক্ষিত মুসলিম-মনে হিন্দুকে পূর্বের প্রজা ও বর্তমানের শোষক-শাসক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবা শুরু হয়।

৪। মুসলিম তরুণ-তরুণীর জন্য জাত-পাত নিষেধাজ্ঞা ও সামাজিক বাধা না থাকায় তারা হিন্দু তরুণ-তরুণীর সঙ্গে সহজেই সম্পর্ক গড়েছে। হিন্দুর ক্ষেত্রে যা ছিল দূরধিগম্য। ফলে তিক্ততা ও ঘৃণা প্রসারিত হয়েছে।

এসব কারণ ছাড়াও আহমদ শরীফ দেশজ বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মানসগঠনের কতিপয় ভ্রান্তির চিত্র তুলে ধরেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের সম্পর্ক বিনষ্ট করেছিল। আহমদ শরীফ বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি-চেতনা-আচারে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ও বিকাশ সম্পর্কে মার্কসীয় চেতনালব্ধ আর্থরাজনীতিক বিশ্লেষণ[৪০] উপস্থাপন করেছেন। 'আঠারো-উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে দু-একটি ধারণার পুনর্বিবেচনা' প্রবন্ধের এই বিশ্লেষণে বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুর ধর্মবোধ ও অকেলাসিত ধর্মীয় আবেগের তুলনায় প্রাধান্য পেয়েছে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক রীতিনীতি, বৃত্তিব্যবস্থা, সুযোগ-সম্পদের ব্যবহারযোগ্যতা, শাসকশ্রেণির আনুকূল্য-উদ্দেশ্য-স্বার্থসংশ্লেষ ইত্যাদি বিষয়। এসূত্রে আহমদ শরীফের প্রতিপাদ্য– বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা এবং তজ্জাত বিদ্বেষ-হানাহানি-দাঙ্গার জন্য ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও শাস্ত্রাচার যতটা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিভেদ-নীতি ও নিয়ন্ত্রণাকাঙ্ক্ষা। তাছাড়া ঔপনিবেশিক সমাজে শাসক-শাসিত সম্পর্ক স্থায়ী করতে শাসিত ব্যক্তির বিকাশ-সম্ভাবনার অপমৃত্যু অবধারিতই থাকে যার ফলে গণমনে পুঞ্জীভূত হয় বিরূপতা। আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> ব্রিটিশ আমলেই সুপ্তোত্থিত মুসলিম গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে-উঠোনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ-বিদ্বেষ-ঈর্ষার জ্বালা নিয়ে ধন-মান-শিক্ষা-ক্ষমতা এবং উচ্চতর বৃত্তি বেসাত, জমিদারী, মহাজনী ও চাকরি প্রভৃতি আকস্মিকভাবে হিন্দু কবলিত দেখল, তা নয়। আগে সচেতন ছিল না বলে জ্বালা অনুভব করেনি। ইংরেজি শিক্ষার বদৌলত ব্রিটিশ শাসনে তারা তাদের দৈন্য সম্বন্ধে ভুল তথ্যের ও তত্ত্বের প্ররোচনায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হল মাত্র। এবং এতকালের প্রতিবেশী ব্রিটিশ-কৃপাপুষ্ট হিন্দুকেই তাদের দুঃখ-বঞ্চনা-শোষণ-নিঃস্বতার জন্যে দায়ী বলে জানল, বুঝল এবং মানল। সেদিন থেকেই হিন্দু হল কাঙ্ক্ষী মুসলিমদের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, পয়লা নম্বরের শত্রু। মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের শেষপাদ থেকেই মুসলিম সমাজে শোষক-শোষিত, বঞ্চক-বঞ্চিত চেতনার উন্মেষ ঘটে ইংরেজি শিক্ষার মন্থরভাবে প্রসারের ফলে। কাজেই সাম্প্রদায়িক চেতনারও ওই সময় থেকেই উন্মেষ এবং তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। (শরীফ, ২০১২:১৬৫)

ওয়াহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলনের ব্যর্থতায় সচকিত হয়ে ১৮৬০ সনের পর থেকে ধীরে ধীরে দেশজ মুসলমানের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা শুরু হয়। এর ফলে দেশজ মুসলমানের মধ্যে শাসক শ্রেণির ঘনিষ্ট হওয়ার সুযোগ বা যোগ্যতা অর্জিত হয়, কিন্তু ততদিনে বাঙালি হিন্দুর অধিকারে যাবতীয় আর্থিক-সামাজিক-বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা ও আত্মোন্নয়নের পথ। আহমদ শরীফের মতে, এসময় থেকেই বাঙালি মুসলমানের মনে অর্থনৈতিক বঞ্চনার ক্ষোভ জাগ্রত হয়, তার আগে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবই হয়নি উপমহাদেশে। কারণ সমশক্তিতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কলকাতা-মুর্শিদাবাদের বিদেশীর বংশধর উর্দুভাষী মুসলিমরাই ছিল নিরক্ষর, শহরে অনুপস্থিত, নির্জিত গ্রামবাসী অপরিচিত মুসলিমদের স্বঘোষিত ও ব্রিটিশ নিয়োজিত নেতা। ওদের দেখেই হিন্দুরা মুসলিমদের তুর্কি-মুঘল শাসকদের জ্ঞাতি ভাবতে শুরু করে।

বাঙালি মুসলমানের ক্রমবর্ধিত শিক্ষার হার তার মধ্যে যে অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল তার ফলে রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামও পাশাপাশি চলতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক মনোভাব। আহমদ শরীফ এজন্য শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনা অর্জনকে দায়ী করেন। যেমন–

> উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদের পরামর্শে ১৮৬০ সনের পর থেকে মুসলমানরা বৃটিশ-প্রীতিকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সন অবধি অধিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনা চাকরির ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষের রূপ নেয়। এর মধ্যে আযাদীকামী স্বস্থ মুসলমানরা ও চাকরির প্রত্যাশাহীন মোল্লা-মৌলানারা কংগ্রেসের মাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যান। আর অন্যেরা মুসলিম লীগের মাধ্যমে আর্থিক স্বাচ্ছল্য লাভের প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন হিন্দুদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব জিয়ে রেখে। এই সংগ্রাম মূলত হিন্দু জমিদার, মহাজন ও অফিসবাবুর বিরুদ্ধেই। তখন মুসলমান মাত্রেরই এই তিন শত্রু– ইংরেজ

নয়। কিন্তু হিন্দু-বিরল অঞ্চলের অর্থাৎ সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ কিংবা বেলুচিস্তানে মুসলিমদের হিন্দুবিদ্বেষ তেমন ছিল না, যেমন ছিল না মুসলিম-বিরল দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মনে মুসলিম-বিদ্বেষ। (শরীফ, ২০১০:৩৭৬)

আহমদ শরীফ মনে করেন- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে দুটি চালু ধারণার আশু পরিহার ও বিলুপ্তি প্রয়োজন ছিল–

এক. প্রাচীন ভারত মানে হিন্দু ভারত এ ভুল ধারণা। বরং মেনে নেয়া যৌক্তিক যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আর্য অবদান সামান্য।

দুই. দেশ-কাল-জাত-জন্ম-বর্ণ-পরিবেশ-পরিবেষ্টনী নিরপেক্ষ ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎবিহীন বৈশ্বিক মুসলিম সত্তার অভিন্ন অবিনশ্বর অস্তিত্বের মিথ্যা ধারণা। (শরীফ, ২০১০ক:৩১৮)

স্বজাতির রাজত্ব হারানোর ক্ষোভজাত কিংবা ওয়াহাবি ফরায়েজি আন্দোলন প্রসূত ইংরেজি বিদ্বেষ তেমন কেজো ছিল না প্রতীচ্য বিদ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে। এসব আলোচনাকালে আমরা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অংশ বিহার-ওড়িশার মুসলিমের অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনা করি না–

বাঙলা-বিহার-ওড়িশা নিয়ে ছিল সুবেহ বাঙালা বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। বাঙলার বিষয় আলোচনাকালে আমরা ওই দুটি অঞ্চলের কথা ভাবি না। ওয়াহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল বিহারে, পাটনায়। নেতৃত্বও ছিল ইনায়েত-বিলায়েত-কেরামত আলীদের। সেখানে অভিজাত পরিবারের সংখ্যা বেশি বলে বিহারে হিন্দুর চেয়ে নিতান্ত উনজন মুসলিমরা ধনে-মানে ও প্রতীচ্য শিক্ষায় এগিয়েছিল, যেমন ছিল উত্তর ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে। ওইসব অঞ্চলে ব্রিটিশ আমলে সরকারি চাকরিতে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিমের সংখ্যাই ছিল বেশি। (শরীফ, ২০০১:১৬৬)

আর এ-ও মনে রাখি না যে, বাংলাদেশে মুসলিমরা সামাজিক-আর্থিক-নৈতিক-শৈক্ষিক প্রভৃতি সব ব্যাপারে দুই পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তায় বাস করত। একদল ছিল বিদেশি উর্দুভাষী ধনী-মানী ফারসি-আরবি শিক্ষিত অভিজাত মুসলিম, গ্রামে এসব পরিবার ছিল দুর্লভ, তুর্কি-মুঘল আমলের প্রশাসনকেন্দ্রে ও বন্দর এলাকায় ছিল এদের নিবাস। এরা সংখ্যায় নগণ্য বটে, কিন্তু ধন-মান-বিদ্যাবলে বাঙালির স্বঘোষিত ও ব্রিটিশ ও সরকার স্বীকৃত নেতারা ছিলেন এদেরই গোষ্ঠীভুক্ত। (শরীফ, ২০০১:১৬৭)

অবাঙালি, অভিজাত মুসলমান শ্রেণির বাইরে আরেক দল ছিল সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামজুড়ে যে-সব আতরাফ-আজলাফ নামে অবজ্ঞাত নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবিত্তের এবং নিঃস্ব মুসলিম। তারাই ছিল সমাজে শতকরা নব্বই জন। যদিও সব গ্রামেই দু-একজন সাক্ষর লোক মিলত, তবু সাধারণভাবে বলা যায় তাদের মধ্যে লেখাপড়ার কোনো ঐতিহ্য ছিল না, যেমন ছিল না তাদের জ্ঞাতি তাঁতি-হাড়ি-ডোমা-বাগদি-কেওট-চাঁড়াল-কামার-কুমার-বারুই-তেলী প্রভৃতির মধ্যেও। আহমদ শরীফ যুক্তি দিয়েছেন, শিক্ষার ঐতিহ্য থাকলে এরা ইংরেজ ও ইংরেজি-বিদ্বেষবশে ইংরেজি বিদ্যা গ্রহণ না করলেও বাঙলা, ফারসি বা আরবি তো শিখত। কিন্তু এদের মধ্যে– এদের জীবনে কোনো প্রকার সাক্ষর শিক্ষার আভাসমাত্র মেলে নি। আজো যে পরিবার নিরক্ষর– তা স্মরণাতীত কাল থেকেই ছিল নিরক্ষর। কাজেই আহমদ শরীফের প্রতিপাদ্য– ব্রিটিশ-বিদ্বেষবশে নয়, শিক্ষার ঐতিহ্যহীন বলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্বে আতরাফ ও চাষি মুসলিমদের শিক্ষায় ছিল অনীহা-অবহেলা। তাই আহমদ শরীফের ভাষায় এসময়ের কিছু প্রামাণ্য তথ্য–

বাঙলার বুকে কলকাতায় সরকারি মাদ্রাসা স্থাপিত হল ১৭৮০ সনে অথচ মাদ্রসায় পড়াল-পড়ল অবাঙালীরাই। তাই পঠন-পাঠনের মাধ্যমে ছিল উর্দু-ফারসি। পরবর্তীকালে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ মাদ্রাসাও ওদের প্রভাবে পঠন-পাঠনের মাধ্যম হল উর্দু-ফারসি-আরবি। ১৯৩০-৩৫ সন অবধি বাঙালী মৌলবীদের তথা মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের বাঙলা বর্ণজ্ঞান পর্যন্ত ছিল না। শাস্ত্র শিক্ষার্থী বলেই মাদ্রাসার অবাঙালী ছাত্ররাও ইংরেজি ভাষা শেখা অবাঞ্ছিত বলে মনে করেছে। (শরীফ, ২০০১:১৬৮)

এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলিম সামষ্টিক নির্জ্ঞানের যে বর্ণনা আহমদ শরীফ দিয়েছেন তা বাঙালির ধর্মসাম্প্রদায়িকতার গুরুত্বপূর্ণ উৎস–

> ইংরেজি শিক্ষিতরা বিশ্ব-মুসলিমের অতীত কৃতি কীর্তি স্মরণ করে একাধারে আর্তনাদ ও আস্ফালন করে আত্মপ্রবোধ পেতে ও প্রবুদ্ধ হতে চেয়েছেন, আর স্বল্পশিক্ষিত দোভাষী পুঁথিকারেরা উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমপাদ অবধি শাস্ত্রানুশীলনের মাধ্যমে ধর্মনিষ্ঠ করে মুসলিমদের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্য দূর করার পন্থা বাত্লিয়েছেন। এসময় রাজ্য হারানোর ক্ষোভ থেকে জমিদার মহাজন চাকুরে হিন্দুর ধন-মান-প্রতিপত্তিই তাদের মনে পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বীর-প্রতিযোগীর ঈর্ষা ও ক্ষোভ জাগিয়েছে বেশি। ফলে বাঙালী মুসলিমরা ব্রিটিশ ভারতে অর্থ-বিত্ত-মননের কোনো ক্ষেত্রেই স্বস্থ ও সুস্থ থাকতে পারেনি। অথচ বর্ণহিন্দুরা যে দেশজ মুসলমানের ধন-সম্পদ লুট করেনি, তারা যে বৃত্তিজীবী শ্রেণী হিসেবেই চিরকাল দরিদ্র ছিল এবং ব্রিটিশ শাসন-শোষণ বাণিজ্যনীতিই যে তাদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি করেছিল, উকিল-ডাক্তার-জমিদার মহাজন চাকুরে বর্ণহিন্দুরা কেবল নিমিত্তমাত্র, ওরা মুঘল আমলেও যে এমনি ধনীমানী ও প্রতিপত্তিশালী ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে, তা তাদের জানিয়ে দেয়ার লোক ছিল না দেশে, আর তাদের এ বিভ্রান্তিমুক্ত করা ছিল ব্রিটিশ স্বার্থ-বিরোধী। ভোটাধিকার পাওয়ার পরে রাজনীতিকরাই তাদের মনে বঞ্চনার ক্ষোভ বেশি করে জাগিয়ে দেয়। ফলে মুসলিমমনে সুযোগ পাওয়ার আশা এবং হিন্দুমনে লব্ধ সুযোগ হারানোর ভয় সাম্প্রদায়িক-চেতনা তীব্র করে তোলে। (শরীফ, ২০০১:১৬৯)

'ইতিহাসের দর্পণে দুই শতকের বাঙালী' প্রবন্ধে উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের মানসজগতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের ব্যবধানে[৪১] যে-স্বধর্মীয় জাতীয়তাবোধের অঙ্কুরোদ্গমের কথা বর্ণিত হয়েছে তা বিশেষ তাৎপর্যবাহী। এতে একদিকে সাম্প্রদায়িকতা অন্যদিকে স্বাজাত্যবোধ উভয়েরই আস্ফালন দেখি। তবে হিন্দুর ধর্মীয় স্বাদেশিকতা ছিল আত্ম-উন্নয়নের লক্ষ্যে যার সঙ্গে দেশ-ধর্মের বিরোধ তো ছিলই না বরং তা সহায়ক হয়েছিল অভিন্ন-সংহত স্বদেশি-স্বধর্মী জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে পক্ষান্তরে মুসলমানের আত্ম-উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উপলব্ধি ছিল হিন্দুর প্রতিক্রিয়াজাত। হিন্দুও ঠিক এমনিভাবেই মুসলমানের তুর্কি-মুঘল জ্ঞাতিত্ব দাবিকে প্রতিক্রিয়াশীলের চোখে ঘৃণা করেছে বহু বৎসর। উভয়ের এই পরস্পরবিরোধী অবস্থান থেকে উদ্ভূত সামাজিক সংকট ব্রিটিশ শাসকদের দৃষ্টিগোচর হতে বিলম্ব হয়নি। আহমদ শরীফ সেসময়ের মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকে এই প্রতিক্রিয়াশীলতার উদাহরণ উল্লেখ করে লিখেছেন–

> উনিশ শতকের হিন্দুরা আত্মোন্নয়ন-লক্ষ্যে কেবল হিন্দুর ও হিন্দুয়ানির ধ্যান করত। কিন্তু ভারতের বাইরে হিন্দু নেই বলে তাদর স্বধর্মীয় জাতীয়তা দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে নি। ফলে তাদের ধর্মীয় ও দৈশিক জাতীয়তা পরিণামে প্রায়-অভিন্ন হতে পারল। কিন্তু মুসলিম জাতীয়তা দেশ-কাল নিরপেক্ষ হয়ে এক আদর্শিক বিশ্বমুসলিম জাতীয়তায় অবসিত হল। এজন্যে মীর মশাররফ হোসেনের কয়েকটি রচনা ব্যতীত উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম পাদের মুসলিমদের রচনার বিষয়বস্তু বঙ্গবহির্ভূত তো বটেই, এমনকি ভারত বহির্ভূতও। স্বধর্মীয় সেসব বিষয় সংগৃহীত হয়েছে স্পেন থেকে মধ্য এশিয়ায় ও সাহারা থেকে গোবি মরুতে তাদের মানস পরিক্রমার ফলে। আঠারো-উনিশ শতকের ব্রিটিশ-অনুগৃহীত হিন্দুরা যেমন প্রাক্তন শাসক মুঘলের প্রতি বিদ্বেষবশে ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে জেনেছিল, তেমনি ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানেরাও অর্থে-বিত্তে-সংখ্যায় প্রবল হিন্দু তেমন ভীতিবশে ব্রিটিশ শাসনকে আল্লাহর রহমত বলে মেনেছিল। উনিশ শতকের হিন্দুরা যেমন মুসলিমদের মনে ক্ষোভ বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা জাগিয়ে দ্রুত আত্মোন্নয়ন কামনা করেছিল, পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়া মুসলমানেরাও তেমনি মুসলিম মনে ব্রিটিশপ্রীতি আর হিন্দুভীতি ও বিদ্বেষ জাগিয়ে মুসলিমদের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা লালনের ও বৃদ্ধির প্রয়াসী ছিল। হিন্দু লিখিয়েদের মুসলিম বিদ্বেষের ও মুসলিম চরিত্র অবমাননার শোধ নিলেন মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ডাক্তার আবুল হোসেন, শেখ ইদ্রিস আলী, মতিয়র রহমান খান প্রমুখ অনেকেই। এবং শেষবয়সে মীর মশাররফ হোসেন আর কায়কোবাদও। (শরীফ, ২০০১:১৭৪)

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা-শত্রুতা-প্রতিহিংসা প্রকৃত ইতিহাসের অজ্ঞতাজাত এবং শাসক-শোষণ-শাসিত সম্পর্কে পূর্বধারণাপ্রসূত। এই স্বার্থবাদী চিন্তা সমাজের উচ্চশ্রেণির স্বচ্ছল, সুবিধাভোগী মানুষের মধ্য থেকে উদ্ভূত হলেও তা শ্রেণিস্বার্থে নিঃস্ব-দরিদ্র মানুষের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে। আহমদ শরীফ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

> প্রকৃত ইতিহাসের তথা তথ্যের অভাবে এবং মার্কসীয় তত্ত্বে অজ্ঞতাবশে বঞ্চিতের ক্ষোভতাড়িত মুসলিমেরা নিজেদের দুর্ভাগ্যের যে কারণ নিরূপণ করেছিল– যেমন ঈমানের শৈথিল্য, মুঘল রাজত্বের অবসান, ইংরেজদের পক্ষপাতিত্বে বর্ণহিন্দুর অর্থে-বিত্তে-

> শিক্ষায় প্রাগ্রসরতা, পূর্ববৈরবশে হিন্দুর মুসলিমদলন ও মুসলিম ইতিহাসকে বিকৃতকরণ, মুসলমানের সাতশ বছরের দান ও প্রভাব অস্বীকার, প্রতিহিংসায় ও স্বার্থবশে শিক্ষা ও সম্পদের ক্ষেত্রে মুসলিমদের দাবিয়ে রাখার হিন্দুপ্রয়াস-তার জন্যে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। হিন্দুরা তার আগেই মুসলিমদের এভাবেই দায়ী করেছিল হিন্দুদের দুর্ভাগ্যের জন্যে। (শরীফ, ২০১০:১৭৬)

উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণকে ইংরেজিশিক্ষিত অভিজাত বা বর্ণহিন্দুর আত্ম-উন্নয়নের জাগরণ বা নিদ্রাভঙ্গ বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। তার আগেই, পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় ৩০ বৎসর ধরে, ইংরেজরা শাসনের দায়িত্ব ও শোষণের শাসকসুলভ পদ্ধতি গ্রহণের আগে, দেশে বেনে-ফড়ে-মুৎসুদ্দি-গোমস্তা-ঘুষখোর-টাউট-মজুতদার-প্রতারকের অব্যহত লুটতরাজ-দুষ্কর্ম-দুর্নীতি-অত্যাচার সাধারণ মানুষকে অতীষ্ঠ করে তুলেছিল। এদের অধিকাংশই হিন্দু, স্বল্পসংখ্যক অবাঙালি মুসলিম যারা মুর্শিদাবাদের পতনের পর উত্তর ভারতে না পালিয়ে নানা কারণে কলকাতার আশপাশে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এরাই ১৯৪৭ সন অবধি বাঙালি মুসলমানের প্রতিনিধি হয়ে ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছে। শাসকগোষ্ঠী স্বরচিত ইতিহাসে যখন এদেরকেই 'মোহামেডান' বা মুসলমান আখ্যা দিল তখন সারাদেশের মুসলমানরাই হিন্দুদের নিকট চিহ্নিত হল তুর্কি-আফগান-মুঘলের বংশধর হিসেবে। ফলে গ্রামে-গঞ্জে যে বর্ণহিন্দু ও মুসলিম ছিল অসম, অপ্রতিযোগী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী তারাই হয়ে উঠল হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী। গ্রামের হিন্দুর মনে বিদ্বেষ ছিল, ব্রিটিশ লিখিত ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে তাদেরই দাসপ্রায় অস্পৃশ্য প্রজাস্বরূপ এই মিথ্যা পরিচয়গর্বী দেশজ বাঙালি মুসলমানকে তুর্কি-মুঘল-আফগানদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ভেবে। অথচ বাংলাদেশের কুটিরে ও প্রান্তরে, ক্ষেতে ও খামারে, হাটে ও বাজারে বাস করে এই মুসলমানেরই মানস-বিচরণের ক্ষেত্র হল স্বপ্নে ও শুনে-পাওয়া অদেখা ভুবন। ফলে কোম্পানি আমলের শুরুতেই একটি সাম্প্রদায়িক-প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বলে আহমদ শরীফ মনে করেন, যাতে 'বিরোধের ও বিচ্ছেদের ব্যবধান বাড়িয়েছিল উর্দু ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্য'–

> হিন্দুরা দেখল উর্দু রচনায় হিন্দুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত, তাই তারা নাগরী অক্ষরে হিন্দির চর্চা শুরু করল। বাঙালী মুসলিমও দেখল হিন্দুর বাঙালা রচনায় মুসলিম অনুল্লেখিত কিংবা অবজ্ঞাত বা নিন্দিত, তারাও তাই বাঙলাকে জানল হিন্দুর ভাষা বলে, নিজেদের জন্যে তাই কামনা করল উর্দু বা ফারসি। (শরীফ, ২০০১:১৮১)

এভাবে আহমদ শরীফের বিবেচনায় হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি যার জন্য দায়ী–

প্রথমত– শাসক ইংরেজ। কারণ তারাই প্রথম ধর্মবিশ্বাসানুগ 'হিন্দু' ও 'মুসলিম' অভিধায় ভারতবাসীকে চিহ্নিত করে বিভেদের-বিদ্বেষের বীজ-বৃক্ষ-ফলকে সার্থকভাবে কাজে লাগায়। উল্লেখ্য, ধার্মিক পরিচয় হিসেবে 'হিন্দু' নামটি প্রথম চালু করেছিল ইংরেজরাই।[৪২] (শরীফ, ২০১৪:৪৫৪)

দ্বিতীয়ত– শাসক শক্তির স্বরচিত ইতিহাসের বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য।

তৃতীয়ত– সাম্প্রদায়িকতার বোধ সৃষ্টিতে সহায়ক ছিল শহুরে শিক্ষিত উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু-মুসলমান, যারা 'শিক্ষিত হয়ে কেউ বাঙালি থাকেনি, হিন্দু বা মুসলমান হয়েছে'।

দূরবর্তী হলেও ভূমিকা ছিল স্বধর্মী-স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির, প্রথমে মুসলমানের– ওয়াহাবি ফরায়েজি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যার সৃষ্টি (শরীফ, ২০১৪:১৪৭) পরে হিন্দুর– বঙ্কিমচন্দ্র যার দ্রষ্টা। তবে আহমদ শরীফ মনে করেন এসব কারণে দেশজ মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর সম্পর্ক কোনো দ্বেষ-দ্বন্দ্বের ছিল না। তবে 'স্বধর্মী বলে, বিশেষ করে শাস্ত্রের সমর্থন রয়েছে বলে সামাজিকভাবে দেশজ মুসলিমের সম অবস্থানের শোষিত লাঞ্ছিত স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য তফশীলী হিন্দুরা কখনো বর্ণহিন্দু মহাজন-জমিদার বা চাকুরের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি' (শরীফ, ২০১৪:১৪৭)– এই বিষয়টি বাঙালির ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার কারণ অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ।

আহমদ শরীফ বিশ্বনাগরিকের মহামিলনযজ্ঞকে মানবতাকেই মানুষের একমাত্র ব্রত বলে মনে করেন। জাত-ধর্ম-গোত্রের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করে মহামিলনের মহায়োজনের মধ্যে মানবতার জয়োল্লাস ধ্বনিত হয়। স্বাতন্ত্র্য বা বিভক্তির সাধনা না করে আহমদ শরীফ আহ্বান জানিয়েছেন মানুষ ও মানবতার সাধনা করার–

> মানুষের সংস্কৃতির, সাহিত্যের, সঙ্গীতের ও আদর্শের রূপ হবে একটি– তা মানবতা। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' আজো যারা সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, ধর্মে-আদর্শে, সমাজে-সম্পদে স্বাতন্ত্র্যের কামনা-সাধনা করে তারা মানবতার শত্রু! কারণ– ধর্ম, সমাজ আর সংস্কৃতি মানুষের মনুষ্যত্ব সাধনার উপায় ও পন্থাস্বরূপ। এগুলো উপলক্ষ মাত্র– সিদ্ধি নয়, সুতরাং ব্যক্তির পরম ও চরম পরিচয় সে মানুষ। তার অবশ্য দেশ আছে, কাল আছে কিন্তু সে-সব তার পরিচয়বাহী নয়। যারা লক্ষ্য হারিয়ে উপলক্ষ নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি করে তারা শুধু হিন্দু, শুধু মুসলমান অথবা শুধু খ্রীস্টান– কিন্তু মানুষ নয়। মনুষ্যত্বের সাধনা তাদের নয়– মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা তাদের নেই। (শরীফ, ২০১০:১৬২)

ধর্মসাম্প্রদায়িকতা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক কাযকারণ সম্পর্কে গ্রথিত, আহমদ শরীফ তা-ই মনে করেন। সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা নিয়োজিত তাঁরা ইসলামের শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায় তাদের যারা পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, যারা শহুরে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দল। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ আদায়ের ক্রীড়নকে পরিণত হয় ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দল। তাই আহমদ শরীফের আক্ষেপ–

> বাঙালী মুসলিম কি কখনো দৈশিক ও ঐহিক জীবনের চিন্তাচেতনা নিয়ে স্বস্থ ও সুস্থ হয়ে আত্মপ্রত্যয়ীরূপে আত্মোপলব্ধির ও আত্মবিকাশের পথে এগোবে না, কেবল বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয় স্বপ্নে এবং অতীতের ও বিদেশের মুসলিম কৃতিগর্বে বিভোর থাকবে? আমরা কি চিরকাল কেবল মুসলিমই থাকব, বৈষয়িক ঐহিক মানুষ হব না? (শরীফ, ২০০১:১৭৭)

৩.২.৯

সাহিত্যচর্চার শুরুতেই দেখেছেন, মাতৃভাষা বাংলার জন্য রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। পিতৃব্য আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ১৯০৩ সালেই 'বাঙালি মুসলমানের জাতীয় ভাষা বাংলা' ঘোষণা দিয়েছিলেন *মাসিক মোহাম্মদী*তে। তারও প্রায় ত্রিশ বৎসর পর *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রভাষা দাবি করা হয় বাংলাকে। তখনও বিভাজনের রূপরেখা চূড়ান্ত নয়। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে, উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। যখন চূড়ান্তভাবে কীটদষ্ট ভারত থেকে বিভাজিত পূর্ব বাংলা কেবল ধর্ম-সমদর্শিতা আর সার্বিক-বিসদৃশ্যতার পশ্চিম-পাকিস্তানের সাথে এক করে ফেলা হয় তখনও বাংলাই ছিল রাষ্ট্রভাষার শীর্ষ এবং একমাত্র দাবিদার। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করে আর্যগর্বী স্বল্প সংখ্যক অভিজাত মুসলমানের ভাষা উর্দুকে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হলে পূর্ববাংলার বাঙালিরা এক রক্তক্ষয়ী সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিহাসে 'একুশে'-খচিত বাঙালি জাতির এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মানসপুত্র আহমদ শরীফ।

বাংলা ভাষার ওপর বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়েই তাঁর গবেষণা ও মননশীল অন্যান্য রচনার সৃষ্টি। বাঙালির সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি ভাষিক বিবর্তনসূত্রকে ব্যবহার করেছেন, বাঙালি জাতীয়তাবোধের প্রাণ জ্ঞান করেছেন বাঙালির ভাষিক ঐক্যসূত্রকে। আহমদ শরীফের সংস্কৃতিভাবনার গুরুত্বপূর্ণ দিক বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর সুগভীর চিন্তা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ। পাঁচের দশকের শুরুতেই, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সফল বাঙালির ভাষা বাংলাকে 'হিন্দুয়ানি' ভাষা আখ্যা দিয়ে একে ইসলামসম্মত রূপ দেয়ার প্রয়াসে আরবি হরফে বাংলা লেখা, 'দোভাষী পুথি'কে 'পুথি সাহিত্য' নাম দিয়ে মুসলমানের ভাষার ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা এবং বাংলা ভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য রোধকল্পে আরবি-ফারসি-উর্দু মিশ্রিত মুসলমানি বাংলা চালু করার রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র বিস্তারিত হতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের

আগে থেকেই এমন উদ্যোগ সচল থাকলেও পরবর্তীতে তা প্রকট আকার ধারণ করে। এমত রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বানান-সংস্কার, বর্ণ-সংস্কার ইত্যাদি ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ে শুরু হয় বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক। এসব বিষয়ে আহমদ শরীফের অংশগ্রহণ সীমিত হলেও ভাষা-আন্দোলন-উত্তরকালে বাংলা ভাষার ওপর পাকিস্তানবাদী 'তহজিব-তমুদ্দুনের' আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা-বৈশিষ্ট্যকে তাত্ত্বিক ভিত্তি দিতে এগিয়ে আসেন আহমদ শরীফ। 'বয়াংসীর বুলি' থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা গদ্য পর্যন্ত বাংলাভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তনধারা উন্মোচনের ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয়তা ঐ সময় থেকেই প্রকাশিত হয়। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩), ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২)-এর দেখানো পথে পুথির ভাষা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব উন্মোচনের মাধ্যমে বাঙালির সংস্কৃতির এক অনালোকিত অধ্যায়ের উন্মোচন করেন তিনি।

ভাষা-বিষয়ে আহমদ শরীফের প্রতিপাদ্যসমূহ প্রধানত একটি লক্ষ্য ও কয়েকটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর লক্ষ্য– বাংলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা আখ্যা দেয়ার ভ্রান্তিমোচন, এর ইসলামিকরণ-প্রয়াসকে ঐতিহাসিক-ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা এবং প্রমাণ করা যে, 'ধর্মান্তরে জাত্যন্তর হয়, কিন্তু দেশান্তর বা ভাষান্তর হয় না।'
এটি প্রমাণের জন্য তিনি অগ্রসর হয়েছেন দুদিক থেকে–
প্রথমত. পুথির ভাষা ও পুথি সাহিত্যের মূলানুসন্ধান,
দ্বিতীয়ত. বাংলা গদ্যের উৎপত্তি কালে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে সমকালীন জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে অভিমত।
'দোভাষী পুথির ভাষা'[৪৩], 'ভাষার কথা', 'পুথিসাহিত্যের ইতিকথা', বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে, 'জনজীবনধারা ইতিহাস চাই', 'ভাষা প্রসঙ্গে : বিতর্কের অন্তরালে', 'জাতিগঠনে ভাষার প্রভাব', 'বাংলা-ভাষা সংস্কার আন্দোলন' ইত্যাদি প্রবন্ধসমূহে আহমদ শরীফের ভাষাবিষয়ক চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

৩.২.১০
এটা অনুমান করা যায় যে, আর্যপূর্ব যুগে যেসব গোত্র বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলে বসবাস করতো, বাঙালি জাতি যাদের বংশরূপ বলে স্বীকৃত ও প্রমাণিত, তারা স্ব স্ব গোত্রের অথবা অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গল ও অন্যান্য অনার্য ভাষার মিশ্রণজাত, পরবর্তীকালে 'অসুর ভাষা'[৪৪] বলে কথিত, একটি সার্বজনীন ভাষায় কথা বলতো– যার লিখিত রূপ ছিল এমন প্রমাণ নেই। এই ভাষাই বৌদ্ধ-জৈন ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত উন্নত পালি বা প্রাকৃত ভাষার প্রভাব স্বীকার করে লিখিত রূপ নেয়, বাঙালি এই ভাষাকেই মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করে। লিখিত এই রূপের মধ্যে আজো টিকে আছে, আমরা যাকে 'দেশি শব্দ' বলি তার অনেক উদাহরণ– কোল, মুণ্ডা, কুকী, নাগাদের ভাষায় আজো যার রেশ ও লেশ রয়ে গেছে। বিদেশি মৌর্য-গুপ্ত-পাল ও সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল আগ্রাসনে সংস্কৃত চর্চা হয়ে উঠলো প্রধান। এসময়ে বাংলা ভাষা সংস্কৃত শব্দ ও সাহিত্যরস ধারণ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এরপর মুসলমান ধর্মপ্রচারক ও শাসকদের আগমনে, দীর্ঘকালীন শাসন-শোষণের সুযোগে, অনিবার্যভাবে বহু ফারসি, তুর্কি ও আরবি শব্দ ভাষায় স্থায়ী অবস্থান তৈরি করে। এই ভাষিক বিবর্তনধারায় ইংরেজ শাসনামলে সৃষ্টি হয় বাংলা গদ্য। এর আগে, কিছু আরবি-ফারসি-শব্দমিশ্রিত দলিল-দস্তাবেজ-চিঠিপত্র ব্যতীত, বাংলা ভাষার কেবল পদ্য রূপই ছিল, সেসময় বাংলা ভাষায় গদ্যে সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস কেউ করেনি। ইংরেজ আমলে নিতান্ত প্রয়োজনে[৪৫], ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাইবেলের অনুবাদ যার অন্যতম, কৃত্রিম গদ্য সৃষ্টি হল 'সাধু ভাষা' নামে। এই ভাষিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে আহমদ শরীফ পুথি সাহিত্যের উদ্ভব সম্পর্কে *বিচিত চিন্তা*-র'পুথি সাহিত্যের ইতিকথা' প্রবন্ধে যে ধারণা দিয়েছেন তাতে এই বিশেষ রূপ সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশী পাঠ ও চিন্তার

প্রতিফলন পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে যা অনেক বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের কারণ হয়েছিল। আমরা এই আলোচনা কয়েকটি সূত্রে বিন্যাস্ত করেছি–

১। 'পুথি', 'দোভাষী' ও 'পুথিসাহিত্য' শব্দের তাৎপর্য : 'পুস্তিকা'র বিকৃতিতে 'পুথি' শব্দের উদ্ভব। ছাপাখানা প্রবর্তিত হওয়ার আগে গ্রন্থমাত্রই 'পুথি' অভিধায় চিহ্নিত হত। ছাপাখানার যুগে ছাপাবই 'গ্রন্থ', 'পুস্তক', 'বহি' নামে অভিহিত হতে থাকে আর হাতে লেখা পুরোনো গ্রন্থগুলো 'পুথি' অভিধায় নতুন তাৎপর্য লাভ করে। যেমন, কৃত্তিবাসী রামায়ণের ছাপকপি হল পুস্তক, গ্রন্থ কিংবা বহি অথচ এর হাতে-লেখা পুরোনো প্রতিলিপি অভিহিত হল 'পুথি' নামে। এভাবে পুথি হয়ে উঠল ইংরেজি Manuscript এর বাংলা পরিভাষা। (শরীফ, ২০১০:৬৪)

'দোভাষী রীতি' বলতে দুটি ভষার কথা মনে হলেও এতে মিশ্রিত হয়েছে ফারসি, আরবি, তুর্কি, হিন্দুস্তানি ও বাংলা ভাষা। তাই অনেকের মতে, একারণে এর নাম 'মিশ্ররীতি' হওয়া উচিত। কিন্তু আহমদ শরীফ কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের এমন দাবিকে অস্বীকার করেন। তাঁর যুক্তি–

> ফারসি (কিছু তুর্কী) শব্দের আধিক্যে গড়ে উঠেছে আধুনিক উর্দু ভাষা, আর এর বিপুল প্রভাব রয়েছে হিন্দিভাষায়। এ দুটোর আদি সাধারণ নাম ছিল হিন্দুস্তানী এবং মুসলিম আমল থেকেই দিল্লী সাম্রাজ্যে Lingua Franca হিসেবে চালু ছিল এ ভাষা। এই হিন্দুস্তানী তথা উর্দুর সঙ্গে বাঙলার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে আমাদের দোভাষীরীতি এতএব 'দোভাষীরীতি'ই এর যোগ্য ও যথার্থ অভিধা। (শরীফ, ২০১০:৬৬)

উনিশ শতকের শেষার্ধে মীর মশাররফ হোসেন, রিয়াজ-আল-দীন আহমদ মাশহাদী প্রমুখ মুসলিম লিখিয়েরা এর নাম দেন 'দোভাষী রীতি'। বিশ শতকে হিন্দুরা এর নাম রাখেন 'মুসলমানী বাঙলা'। আর ১৯৪০ সনের পরে মুসলমানরা এ সাহিত্যের নাম দেন 'পুথি-সাহিত্য' (শরীফ, ২০১০:৩৮৫)।

'পুথিসাত্যিের ইতিকথা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ পুথিসাহিত্য শব্দসৃষ্টির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জানিয়ে লিখেছেন– 'বাঙলা ভাষা সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য-সূত্র আবিষ্কারের প্রেরণাবশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজে এবং *আজাদ* পত্রিকা-অফিসে গড়ে ওঠে 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। এখানেই শুরু হয় পুথির চর্চা। তাঁরাই মুসলিম রচিত আধুনিক সাহিত্য থেকে দোভাষী পুথির পার্থক্যজ্ঞাপক 'পুথি-সাহিত্য' নামটি চালু করেন। এর প্রয়োজন ছিল। কেননা এ ভাষাকেই বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা তথা ঘরোয়া আটপৌরে ভাষা বলে প্রচার করলেন তাঁরা! কাজেই 'দোভাষী পুথি' বলার আর উপায় ছিল না, সেক্ষেত্রে তাঁদের আন্দোলন ও উদ্দেশ্য দু-ই হত ব্যর্থ!' অর্থাৎ 'দোভাষীরীতি' 'দোভাষী পুথি' বা 'পুথি সাহিত্য' সব অভিধার পেছনেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

২। উর্দুর সাথে সম্পর্ক : দোভাষী পুথির উদ্ভবের সাথে সতেরো শতকের শেষার্ধে উর্দু লেখ্যভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবের ইতিহাস জড়িত। উত্তরভারত থেকে উদ্ভূত হয়ে এই ভাষা অবাঙালি বিদেশিদের দ্বারা ফারসি-আরবি ভাষাকে আশ্রয় করে কলকাতা, হাওড়া, হুগলির বন্দর এলাকায় প্রচলিত হয় এবং স্থানীয় মুসলমানের মুখের ভাষাকেও প্রভাবিত করে। এদের মাঝেই জনপ্রিয় হতে থাকে 'বটতলার পুথি'-খ্যাত দোভাষীরীতির সাহিত্য। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এই রীতিতে বাংলা সাথে আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগের আনুমানিক হার শতকরা ৩২টি।[৪৬] পাঠ্য উপকরণের অভাব অথবা ভাবের দুর্বোধ্যতা বা শব্দের দুরূহতা না থাকায় অবসরের এক বৈঠকেই শেষ করা সম্ভব বলে এসব পুথি মধ্যযুগের বৈদগ্ধ্যপূর্ণ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোকে বাজার ছাড়া করে (শরীফ, ২০১০:৬৪)। প্রণয়োপাখ্যান ছাড়াও পীর পাঁচালি, যুদ্ধকাব্য, ধর্মশাস্ত্রীয় রচনা স্থান পেতে থাকে। তারপর এই আদলে বা বিষয়ে কয়েকশত গ্রন্থ রচিত হয়েছে গত দেড়শ বছরের মধ্যে।

৩। দোভাষী পুথি রচয়িতা ও ব্যাবহারকারীদের সামাজিক পরিচয় : নবাব মুর্শিদকুলি খানের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে ইরানি-শিয়াদের ভাষা ও সংস্কৃতি সেসময় নতুন বন্দর হাওড়া-কলকাতা-হুগলি অঞ্চলের স্থানীয়দের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে ফারসি-উর্দুভাষী বিদেশিদের প্রভাবে স্থানীয় জনগণের মাতৃভাষাও বিকৃত হতে থাকে। সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণরামদাস *রায়মঙ্গল* (১৬৮৭) কাব্যে সত্যনারায়ণের উক্তিতে প্রথম ভাঙা হিন্দুস্তানি ও বিকৃত বাংলা ব্যবহার করেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালির পরবর্তী রচয়িতাগণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রমুখ কবির *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যে এই রীতি অনুসরণ করেন। এভাবে দোভাষী রীতি হিন্দু কবিদের লেখনীপ্রসূত হলেও এর বহুল প্রচলন ও জনপ্রিয়তার জন্য ফকির গরীবুল্লাহর (১৭৬০-৮০) প্রতিভা ও পরিচর্যার প্রয়োজন ছিল। তিনিই প্রথম বাংলা-হিন্দুস্তানি বাগধারার মিশ্রণে সৃষ্টি করেন দোভাষী পুথি *ইউসুফ জোলেখা*, *সোনাভান* ইত্যাদি। তাঁর সবকটি গ্রন্থই দোভাষীরীতি প্রয়োগে রচিত। তাঁর নিজের বুলি ছিল এ রীতির পরিপোষক, তদুপরি ব্রজবুলির উপযোগও তাঁর অবচেতন প্রেরণার উৎস ছিল বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। গরীবুল্লাহকে অনুসরণ করেন সৈয়দ হামজা (১৭৮৮-১৮০৫), মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ খাতের, জনাব আলী, আব্দুর রহিম, মনিরুদ্দিন, আয়েজুদ্দিন, মুহম্মদ মুনশী, তাজউদ্দিন, দানিশ প্রভৃতি প্রায় শতাধিক কবি। 'হিন্দুস্তানি ভাষা' 'এছলামি বাংলা' নামে কথিত এই বিকৃত বাংলা এসব অঞ্চলের চলিত ভাষায় পরিণত হয়, যা আজও চালু রয়েছে। পরবর্তীকালে, বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান-সম্ভাবনায় দ্বিজাতিতত্ত্বজাত মুসলমানের দেশে মুসলমানের ভাষা হিসেবে বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষাকে চালু করার উদ্যোগ মূলত এই অবাঙালি 'খোট্টা'দের প্রেরণা ও তাড়নাজাত (শরীফ, ২০১০:৬৭-৬৮)।

১৭৭৮ সনে হ্যালহেড বাঙলা ব্যকরণের ভূমিকায় আরবি ফারসি মিশ্রিত যে ভাষাকে 'সংস্কৃতিবানতার পরিচায়ক' বলেছেন, ১৮৫৫ সনে পাদ্রি লঙ তাঁর Descriptive Catalogue of Bengali Books নামক গ্রন্থ-তালিকায় এটিকে 'মাঝি-মাল্লাদের মধ্যেই প্রচলিত এবং মুসলমানি বাঙলা' বলে অভিহিত করেন। তিনি এ ভাষায় রচিত সাহিত্যকে 'মুসলমানী বাঙলা সাহিত্য' নামও দিয়েছিলেন। বস্তুত ১৮৩৫ সনে ফারসি দরবারী ভাষার মর্যাদা হারায় এবং ১৮৫৫ সনের মধ্যে কলকাতা শহরে ইংরেজি উচ্চশিক্ষিত লোক নগণ্য ছিল না। সেসাথে কেরি থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার সচেতন সাধনা ও প্রয়াসে সংস্কৃতের প্রাধান্য ছিল অপ্রতিরোধ্য।

তাই আহমদ শরীফের প্রতিপাদ্য– যেহেতু কলকাতার আশেপাশে অবস্থানরত নিম্নবৃত্তিজীবী মুসলমানের মধ্যে সংস্কৃতবহুল বাংলা বা ইংরেজি-শিক্ষিতের মত বাংলা বলা অথবা আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না তাই তারা 'দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর মত' করে দোভাষী পুথিতে আনন্দোপকরণ খুঁজে নেয়। সুতরাং নগরের মুসলমানের ভাষা আর গঙ্গা-ভাগীরথীর মাঝিমাল্লাদের মুখেই কেবল এই মিশ্ররীতির ভাষা চালু থাকবে এতে সন্দেহ নেই। আহমদ শরীফ আরও নিশ্চিত করেন, এভাষা কখনও গঙ্গা-ভাগীরথীর মাঝিমাল্লা ও নগরকেন্দ্রিক মানুষের বাইরের মানুষের মুখের ভাষা বা চলিত ভাষা ছিল না। তিনি লিখেছেন 'গৌড়, পাণ্ডুয়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শাসনকেন্দ্র ও বন্দর এলাকা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের দেশজ মুসলমানের কথ্য ভাষা তো বটেই, লেখ্যভাষাও চিরকাল অবিমিশ্র বাঙলা' (শরীফ, ২০১০:৬৮)। সেক্ষেত্রে কেরি উল্লেখিত 'গঙ্গাভাগীরথীর মাঝিমাল্লা' যে আসলে শহরের পাদদেশে বসতি স্থাপনকারী নিম্নবিত্তের মানুষ, যাদের অধিকাংশই ভাগ্যান্বেষণে আশ্রয় নেয়া মুসলমান ও নিম্নবর্গের হিন্দু জনগোষ্ঠী সেটা সহজেই প্রমাণ করা যায়।

৪। বাংলা গদ্যের উৎপত্তি : কিন্তু পাঠ্যপুস্তক রচনা, ধর্মপুস্তক অনুবাদ ও সৃজনশীল গদ্যের প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় গদ্যরীতি নির্মাণের প্রাথমিককালে অপ্রচল তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ এবং প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও আরবি-ফারসি শব্দ বর্জনের মধ্য দিয়ে একটি আদর্শরীতি প্রণয়নের যে-সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটেছিল তা নিয়ে বিতর্ক-কুতর্ক-

প্রতর্কের শেষ আজও হয়নি। যে প্রেক্ষাপটে বাংলা গদ্যে আরবি-ফারসির পরিবর্তে তখন সংস্কৃত প্রাধান্য পেয়েছিল তা বর্ণনা করে আহমদ শরীফের বিশ্লেষণ থেকে উল্লেখ্যযোগ্য অংশের উদ্ধৃতি–

> আমরা মুসলমান আমলের দলিল-দস্তাবিজে, চিঠিপত্রে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত বাঙলা গদ্যের সাক্ষাৎ পাই। কারণ তখনো গদ্যে সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা চালু না হওয়ায়, বাঙলা ভাষায় গদ্য সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস কেউ করেনি। আর এ-কথা কে না স্বীকার করবে যে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া কোনো ভাষাই মার্জিত ও শালীন হয়ে উঠতে পারে না। কেননা মুখের বুলি চিরকাল অপূর্ণ ও ত্রুটিবহুল, তাকে লিপিবদ্ধ করতে হলে অনেককিছু যোগ করতে হয়–অনেক পরিশোধনের প্রয়োজন। কারণ শিক্ষিত ও ভাবুক লোকের ভাব-চিন্তা প্রকাশের জন্যে অনেক বেশি শব্দের প্রয়োজন যা মননহীন অশিক্ষিত লোকের ঘরোয়া বা ব্যবহারিক জীবনে কাজে আসে না। ....
>
> বাঙলা গদ্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কেউ আরবি-ফারসি বা ইংরেজি ভাষার সাহায্য নেবে তা ভাবা অস্বাভাবিক নিশ্চয়ই। তাই কেরী-রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন প্রভৃতি সবাই সংস্কৃতের আশ্রয় নিলেন। প্রাকৃতজাত বাঙলাকে জ্ঞাতিত্ব সূত্রে তার প্র-প্র-প্রমাতামহী সংস্কৃতের উত্তরাধিকারিনী দাঁড় করিয়ে তাঁরা বাঙলা ব্যাকরণ ও শব্দসম্পদ সংস্কৃতানুগ করে তুললেন। এছাড়া ব্যবসাদারী ও অনভিজ্ঞ নূতন লেখকদের উপায়ই বা কী ছিল! বরং এরূপ না করে অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করলে অস্বাভাবিক হত। বস্তুত সে-যুগে-সে-অবস্থায় সংস্কৃতের সাহায্য না নিয়ে বাঙলা গদ্যকে একটা সুষ্ঠু ও শালীন রূপদান করা ছিল অসম্ভব। সে-যুগের কথাই বা বলি কেন, এ-যুগে আমাদের সাহিত্যে ব্যবহৃত 'চলতি ভাষায়'ও কী সংস্কৃত শব্দ বাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে? এ ব্যাপারে আমরা উড়িয়া ও আসামী ভাষার দিকে লক্ষ করলেও বুঝতে পারব, সংস্কৃত শব্দ আমদানি কেরী-মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যাসাগরের স্বেচ্ছাচারিতার ফল নয়! ভাষাকে সাবলীল করার জন্যে অপরিহার্য ছিল সংস্কৃত ভাষার সাহায্য। অনাত্মীয় আরবি-ফারসি-ইংরেজির চেয়ে রক্তসম্পর্কিত সংস্কৃতির সম্পদ আত্মস্থ করা যে সহজ ও শোভন হয়েছে তা কে অস্বীকার করতে পারে? এখানে স্মরণীয় যে, বাঙলা ভাষার আদিকাল থেকেই আমাদের পদ্যরচনায় প্রয়োজনমতো সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়েছে। আজকের দিনে ইংরেজী শব্দের পরিভাষাও সংগৃহীত হচ্ছে সংস্কৃত থেকেই।.... কিন্তু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আর সংস্কৃত রীতির আমদানি যে এক কথা নয়, তা' প্রথমদিককার লেখকগণ সহজে বুঝে উঠতে পারেনি। আমি Daily morning walk করি–এতে অধিকাংশ শব্দ ইংরেজি হলেও এ বাঙলা; 'Daily he walks in the প্রভাত' বাংলা মিশ্রিত হলেও-যে ইংরেজি তা কোনো শিক্ষিত লোককে বুঝিয়ে বলতে হয় না। (শরীফ, ২০১০:৫৬)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ব্যাকরণানুগ গদ্য রচনার ফলে বাংলা গদ্যের নিজস্ব রীতি নির্মাণে যে-কারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল, তারও আগে একই কারণে দোভাষী রীতির প্রচলনে বাংলা পদ্যের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সৌভাগ্যবশত কোনো প্রতিবন্ধকতাই স্থায়ী হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদে যেসব সংস্কৃত বা আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় চালু হয় সেগুলোকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছে বাংলা গদ্য। জোর করে কোনো শব্দ বা ভাষারীতি চালু করার সম্পূর্ণ বিরোধী আহমদ শরীফ। মধ্যযুগের চিঠিপত্র-দলিল-দস্তাবেজকে উদ্ধৃত করে বাংলা গদ্যে আরবি-ফারসি শব্দের অযাচিত বাহুল্যকে যারা আদর্শ হিসেবে দাঁড় করাতে চান তাদের উদ্দেশ্যে আহমদ শরীফের বক্তব্য– এসব অসাহিত্যিক ভাষার দ্বারা কোনো ভাষার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে যাওয়া সমীচীন নয়। অতএব কেরি-বিদ্যাসাগরী প্রচেষ্টার পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ভাষা আরবি-ফারসি মিশ্রিত হবার প্রবণতা লাভ করেছিল বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণাও তথ্যভিত্তিক নয়। এ যুগে কেউ বলে যে বাঙলা ভাষা ইংরেজি শব্দের দ্বারা পুষ্ট ও সুষ্ঠু হবার প্রবণতা দেখাচ্ছে, তা যেমন ভুল, পূর্ব-ধারণায়ও রয়েছে তেমনি ধরনের অসঙ্গতি। আহমদ শরীফ বাংলা গদ্যের নিজস্ব রীতি নির্ধারণে যে-কোনো বিদেশি শব্দ ও ভাষাকেই অযাচিত বলে মনে করেন। কারণ 'বিদেশী বিভাষার শব্দ গ্রহণ যে-কোনো ভাষার দীনতারই পরিচায়ক। সগোত্রীয় সংস্কৃতের ঋণ স্বীকার করে বাঙলা সে-দীনতা ঘুচিয়েছে; কাজেই বিদেশী শব্দে তার প্রয়োজন সামান্য' (শরীফ, ২০১০:৫৮)।

বাংলার পরিবর্তে উর্দু চালু করার চেষ্টা এবং তার ব্যর্থতায় প্রচুর আরবি-ফারসি তথা হিন্দুস্তানি শব্দ ও ভাষারীতির অনুপ্রবেশ, তারও ব্যর্থতায় অবশেষে আরবি হরফে বাংলা লিখবার চেষ্টা যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাধিত হয়েছিল আহমদ শরীফ তা উন্মোচন করে দোভাষী পুথির ঐতিহ্যকে বাংলাভাষার ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ

করাকে অযৌক্তিক ও অবান্তর বলে মত প্রকাশ করেছেন। তথ্য ও যুক্তিশৃঙ্খলায় সুমিত-সুদৃঢ় তাঁর এই 'অনুসন্ধান-লব্ধ ধারণা'র চৌম্বক-অংশ উদ্ধৃত করা হল–

> দোভাষী পুথির কোনো প্রভাব যে পল্লীবাসী মুসলমানদের উপর পড়েনি, তার প্রমাণ এদের রচিত পুরোনো বা নতুন গানে, গাথায়, ছড়ায়, রূপকথায়, কাহিনী-কাব্যে সে ভাষার কোনো নিদর্শন নেই। আমাদের উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে 'হারামণি, ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা' 'প্রবাদ-সংগ্রহে' এবং পাঁচালিগুলোতে।
>
> পল্লী অঞ্চলে দোভাষী পুথি বহুলপঠিত হত বলে বিশ্বাস করবারও কারণ নেই। চকবাজার ও শহুরে বস্তিতে এর উদ্ভব ও প্রচার সীমাবদ্ধ বললে সত্যের বিশেষ অপলাপ হবে না। উনিশ-বিশ শতকের দোভাষী উপাখ্যানগুলো কারা, কাদের আদেশে, কোনো প্রেরণায় রচনা করেছেন ও করছেন তার উল্লেখ অনেক পুথির সামাপ্তিভাগে রয়েছে–বটতলার প্রকাশকের আদেশ, আর্থিক প্রেরণা এবং খোট্টা পাঠকদের চাহিদাই রয়েছে এগুলো রচনার মূলে। অতএব এ-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির আন্তর বা বাহ্য যোগ কোথায়? অবশ্য বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত ছাপা পুথির অভাবে গাঁয়ের লোকেরাও দোভাষী পুথি পড়েছে–শুনেছে কিন্তু সে-ভাষা অনুকরণ করেনি। কাজেই দোভাষী পুথি সাহিত্যের ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারের প্রশ্নই অবান্তর। (শরীফ, ২০১০:৬০)

বৈষ্ণব যুগের বাংলা-মৈথিল মিশ্রিত-ভাষা 'ব্রজবুলি' বাংলা সাহিত্যে টিকতে পারেনি কৃত্রিমতার কারণ। তাই আহমদ শরীফ বাঙালির ব্রজবুলি চর্চার পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করেছেন 'ইতিহাসের ইঙ্গিত অবহেলার ফল কখনো শুভ হয় না' (শরীফ, ২০১০:৬৩)। এসবই একটি সত্য প্রকাশ করে, তা হল, অকারণে মূল-না-জানা ঐতিহ্য ও ব্যঞ্জনাবিহীন কতগুলো বোবা শব্দ এনে নিজের মুখের বুলিকে–সাহিত্যের ভাষাকে জড় করে তোলাতে কোনো লাভ নেই। যেহেতু 'ঋণমাত্রেই দৈন্যের পরিচায়ক' সেকারণে বিদেশী কাহিনী বর্ণনার জন্যে বিদেশি ভাষাও আমাদানি করলে স্বদেশি

> যারা বাঙলাকে সংস্কৃতানুরূপ বা ফারসি-ঘেঁষা করতে চান, তাঁরা বাঙলাভাষাকে রেহাই দিয়ে সহজেই যথাক্রমে হিন্দি বা উর্দুকে বরণ করে নিতে পারেন তাহলে সব দিক রক্ষা পায়। (শরীফ, ২০১০:৬৩)

তবে আহমদ শরীফ দোভাষী পুথির উদ্ভবকালে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে 'উত্তরভারতীয় আদলে প্রকাশমান দেশি মুসলিম সংস্কৃতির' সম্ভাবনা, যা পলাশী যুদ্ধের ফলাফলের মধ্যে অবলুপ্ত হয়, অস্বীকার করেননি। বরং তাঁর বিশ্লেষণ আরও সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনার অপমৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়–

> [দোভাষী রীতি] যা উচ্চবর্গের অভিজাতের পরিচর্যার অপেক্ষা রাখত, তা-ই নিম্নবিত্তের স্বল্পশিক্ষিত লোকের অনুশীলনে টিকে রইল শহরের সংকীর্ণ সীমায়। এ যেন দুধের প্রত্যাশায় ঘোলের সাধনা অথবা দুধের সাধ ঘোলে মিটানো। কেননা এ সাধনায় যাঁরা ব্রতী রইলেন, তাঁদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা ও অপরিস্রুত শিল্পরুচি যোগ্য ছিল না কোনো সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করার। সামর্থ্য ছিল না তাঁদের লক্ষ-চেতনা মনে জাগিয়ে রেখে এগিয়ে যাবার। এভাবে ব্যর্থ হল একটি জাতীয় স্বপ্ন, একটি ইপ্সিত সম্ভাবনা ও একটি মহৎ প্রয়াস। (শরীফ, ২০১০:৬৮)

'বিরূপ শিক্ষিত মনের কাছে' অমার্জিত রুচির অশ্লীলতা ও স্থূলতা-দোষে দুষ্ট দোভাষী সাহিত্য যেসব লেখক-পাঠকের সমবায়ী প্রয়াসে সৃষ্ট তাদের কাছে কাব্যোৎকর্ষের চেয়ে, যেভাবেই হোক, বক্তব্যের অনর্গল প্রকাশই ছিল মুখ্য। তারা প্রাকৃতজনের কবি, 'অসম্পূর্ণ শিক্ষার দরূণ নীতিবোধ ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি লোকায়ত স্থূলবোধের প্রতিচ্ছবি এদের রচনায় থাকা স্বাভাবিক' (শরীফ, ২০১০:৭০)। আহমদ শরীফ এই সাহিত্যিক প্রয়াসের ঐতিহাসিক-সামাজিক তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে লিখেছেন–

> [পুঁথিসাহিত্য] স্বধর্মনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও জাতীয় ঐতিহ্যগর্বী এবং অদ্ভুত কল্পনাপ্রিয় স্বাপ্নিক কবির রচনা।... আঠারো-উনিশ শতকী দোভাষী সাহিত্য আমাদের নগর-বন্দর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসের তথা জীবনচর্যার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিভূ! এ সাহিত্যই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ অবধি, শতকরা নিরানব্বইজন বাঙালি মুসলমানের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী জীবন ও ঐতিহ্য চেতনা। সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি সমাজকল্যাণ হয়, তাহলে মানতেই হবে দোভাষী সাহিত্যই গত একশ বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানের জগৎ ও জীবন ভাবনার নিয়ামক। এই দিক দিয়ে এ সাহিত্যের সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিমেয়! এ ভাষাও দাখিনী উর্দু ও উত্তর ভারতীয় উর্দুর মতো একটি মুসলিম ভাষা হতে পারত–এ

> উল্লাসবোধ, কিন্তু হল না–এ ক্ষোভই দোভাষী রীতি চিরকাল জাগিয়ে রাখবে স্বজাতি ও সংস্কৃতিপ্রিয় মুসলিম ঐতিহাসিকের মনে। (শরীফ, ২০১০:৭০)

ভাষা সম্পর্কে আহমদ শরীফের স্বকীয় বলিষ্ঠ চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রবন্ধে। ভাষা যেহেতু জীবনরসের উৎস তাই, আহমদ শরীফ মনে করেন, ভাষার ধর্মীয় রূপ নিরর্থক।[৪৭] ভাষা আধার, ভাব আধেয়। যেহেতু আধারের পরিবর্তনে 'আধেয়' প্রকৃতি বদলায়, হারায় না তাই ভাষা গৌণ, ভাবই মুখ্য। যেমন আগুনপূজক ইরানিরা ইসলাম গ্রহণ করলেও আরবের ভাষা গ্রহণ করেনি, ফারসি ভাষাতেই ইসলামের মর্মবাণী অনুবাদ করে নিয়েছে। ভাষা হয়েছে ইসলামি আদর্শের বাহন। এভাবে ইসলামি তহজিব-তমুদ্দুনের নামে বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার-প্রচারণার ফলে শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের মন-মানসিকতায় স্বজাতি-স্বধর্ম সংস্কৃতির যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়[৪৮] আহমদ শরীফ তার তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হাজির করে বিভ্রান্তিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় বাস্তবতায় প্রবল ধর্মীয় ভাবতাড়িত পরিবেশের চাপ ও তাপ উপেক্ষা না করেও তাঁর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্যের দৃঢ়তা লক্ষণীয়; তিনি ভাষায় 'Form এর পরিচর্যা নয়,– Spirit এর প্রতিষ্ঠা' চান। তাঁর ব্যাখ্যা, ভাষার গায়ে আচারিক ইসলামের লক্ষণ ফুটিয়ে তুললে তা বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না, তার মধ্যে ইসলামী ভাবকে 'অপরূপ' করে তুলতে পারলে বিশ্ববাসী আকৃষ্ট হবে। (শরীফ, ২০১০:৪)

লৌকিক সংস্কার ও ধর্মাদর্শের মধ্যে কোনটি কতটা গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত এ নিয়ে আহমদ শরীফের অবস্থান বা চিন্তাভাবনা রক্ষণশীল নয়, সমন্বয়ধর্মী। তিনি লৌকিক সংস্কারকে রেখেই ধর্মাদর্শ পালনের পক্ষপাতী আবার ধর্মাদর্শের সাথে লৌকিক সংস্কার সমন্বয়েও আগ্রহী। যেহেতু সংস্কৃতি অবিমিশ্র নয়, তাই বাঙালি মুসলমানেরও বিভিন্ন সংস্কৃতিকে নিজেদের দেশজ সংস্কৃতির সাথে আত্মস্থ করে উন্নত সংস্কৃতি গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত– দেশীয় ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যকে বর্জনের মাধ্যমে নয়, এই হল আহমদ শরীফের মত। স্বদেশ, স্বভাষা এবং স্বজাতির প্রতি মমত্ববোধই আমাদের সংস্কৃতি নির্মাণে দিকনির্দেশনার ভূমিকা রাখতে পারে। আহমদ শরীফ ইসলামী সংস্কৃতির নামে ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে দেশীয় ঐতিহ্য ও উপাদান বর্জনের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি ও মতামত তুলে ধরেছেন–

> ধর্মান্তরে জাত্যন্তর হয়, কিন্তু দেশান্তর বা ভাষান্তর হয় না। য়ূরোপ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু হিব্রু ভাষা ঠাঁই পায়নি সেখানে। বৌদ্ধধর্ম দেশদেশান্তরে গেছে, কিন্তু কারো জাতীয় ভাষা হয়নি পালি। কাফিরের ভাষা বলে আরবি ত্যাগ করেনি মুসলমান আরব। কোরআন তো নাযেল হল সে ভাষাতেই! বাঙালি মুসলমানের চিরকালের মুখের বুলি, প্রাণের ভাষা, স্বপ্নের বোল কী করে হয় হিন্দুয়ানী ভাষা? বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের ছাপ কম হবে না হিন্দুয়ানীর চেয়ে। (শরীফ, ২০১০:১২৬)

মানুষের মনন-চিন্তন নিত্য বিকাশমান। কাজেই তার নতুন ভাব-চিন্তা ধারণে সমর্থ অর্থগর্ভ ও ব্যাঞ্জনাবহ নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে হয়। সৃষ্টি প্রতিভা-সাপেক্ষ তাই প্রয়োজনে উদ্দিষ্ট ভাব-বাহী শব্দ অপর ভাষা থেকে ধার নিতে হয়। আহমদ শরীফ এটি দূষণীয় মনে করেন না–

> দুটো কারণে শব্দের সৃজন ও ঋণ গ্রহণ চলে: নতুন ভাব-চিন্তার উদ্ভাবনে এবং বস্তুর আবিষ্কারে। স্বদেশে যদি নতুন ভাব-চিন্তার উদ্ভব বা উন্মেষ হয়, কিংবা নতুন বস্তু তৈরি বা আবিষ্কৃত হয়, তা হলে নিজের ভাষাতেই সে-মনন প্রকাশক বা সে-বস্তু নির্দেশক শব্দ তৈরি হয়। আর যদি বিদেশী ভাব বা বস্তু নেয়া হয়, তা হলে প্রাসঙ্গিক বিদেশী শব্দকে নিজের ভাষায় ঠাঁই দিতে হয়। একে রোধ করতে যাওয়া যেমন নিরর্থক, এ-গরজ ছাড়া বি-ভাষার শব্দ আনার অপচেষ্টাও তেমনি অসার্থক। (শরীফ, ২০১০:৫)

বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ বা সাহিত্যের ভাষা নির্মাণ সম্পর্কে আহমদ শরীফ বিভিন্ন সময় চিন্তাসঞ্চারী ও তাৎপর্যপূর্ণ মতামত রেখেছেন। প্রমিত বাংলা গদ্যের রূপ-রূপান্তরের নানা পর্যায়ে ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজ ও সংস্কৃত ভাষার

প্রভাব এবং একই সময়ে প্রচলিত আরবি-ফারসি মিশ্রিত 'এছলামী বাংলা' সম্পর্কে আহমদ শরীফ গবেষণালব্ধ গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখেছেন। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য একটি কৃত্রিম ভাষার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক বলে মনে করতেন তিনি, সেটি সাধু ভাষার কাছাকাছি হওয়াই শ্রেয় এমনটাই তাঁর বিশ্বাস। 'কথাসহিত্যে সমস্যা ও এর বিষয়বস্তু' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন–

> সাধুভাষার কাছাকাছি না হলে কোনো কথ্যভাষাই দেশের সর্বাঞ্চলের লোকের বোধগম্য ও প্রয়োগ-যোগ্য হবে না। এটা বুঝেছিলেন বলেই পূর্ববঙ্গঘেঁষা উত্তরবঙ্গের লোক প্রমথ চৌধুরী গ্রহণ করেছিলেন ভাগীরথী তীরাঞ্চলের ভাষা। নতুন কথ্যভাষা গ্রহণ করবার গরজ আমাদের থাকলে, কুষ্টিয়া যশোহর বা খুলনা অঞ্চলের কথ্যরূপ গ্রহণ করাই শ্রেয়। বিশেষত সাহিত্যের ভাষা চিরকালই কিছুটা কৃত্রিম। প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত কথ্যভাষাও অকৃত্রিম নয়। ও-ভাষার অবিকল প্রতিরূপ কথায় ব্যবহৃত হয় না কোথাও। (শরীফ, ২০১০:২১)

বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ পারিভাষিক শব্দ গঠনে আরবি-ফারসি শব্দের অনুপযুক্ততা উল্লেখ করে এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারযোগ্যতা ও প্রয়োগ-সাফল্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন–

> ভাবে ও আঙ্গিকে (in form and spirit) গত একশ বছরের বাঙলা সাহিত্য তো দেশী ভাষার আবরণে বিলেতি বস্তুই। ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা য়ুরোপীয় শব্দের পরিভাষা নিয়েছি ও নিচ্ছি সংস্কৃত থেকেই। তবু আরবি-ফারসির জিগির ছাড়িনে। য়ুরোপীয় শব্দের পরিভাষা হিসেবে গৃহীত বলেই পুরোনো সংস্কৃত শব্দ নতুন তাৎপর্যে নতুন। কিন্তু আরবি-ফারসি শব্দের পুনর্ব্যবহারে নতুন ব্যঞ্জনা দুর্লভ। আমরা ভুলে যাই যে পুরোনো উপকরণে নতুন জিনিস তৈরি করলে তার রঙ বিশেষ খোলে না,– জৌলুস তো অভাবিত। (শরীফ, ২০১০:২৭৪)

অতএব, দোভাষী পুথির ভাষা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কৃত্রিম বাংলা গদ্য সম্পর্কে আহমদ শরীফের প্রতিপাদ্য–

> বাঙলা গদ্যে ও পদ্যে একটা নিজস্ব রীতি বা শৈলী ছিল। তাতে দুবার মাত্র বিপর্যয় আসে– একবার দোভাষী রীতির প্রচলনে, আর একবার সংস্কৃত ব্যাকরণানুগ গদ্য রচনার ফলে। সৌভাগ্যবশত কোনোটাই স্থায়ী হয়নি।(শরীফ, ২০১০:৫৮)

৩.২.১১

'বাংলাভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব' প্রবন্ধের মধ্যে বাঙালির ভাষিক জাতীয়তার ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ভিত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার প্রতি শাসক শ্রেণি ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অবজ্ঞা ও অবহেলার চিত্র বর্ণনা করে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন যে, প্রাচীন কাল থেকেই শাসক শ্রেণির প্রশ্রয়ে বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত বাঙালির অবজ্ঞা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শূদ্রের শিক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ করা, বাংলাভাষায় শাস্ত্রানুবাদ তথা আয়াত বা মন্ত্রের অনুবাদ পাপকর্ম গণ্য করা ছিল তেমন অবহেলার উদাহরণ। বাংলায় মৌলিক রচনা ছিল দুর্লক্ষ্য কারণ উচ্চশিক্ষিত, প্রতিভাবান কবিরা সাধারণত সংস্কৃত বা ফারসিতে লিখেছেন। যাদের সে যোগ্যতা ছিল না, তারাই মুখের 'বুলি'তে সাহিতচর্চা করেছেন। এভাবে নানা নিষেধাজ্ঞা ছিল শাসকদের স্বার্থসম্পৃক্ত, শোষণ নিরাপদ রাখার হাতিয়ার। বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দুদের বিচিত্র মনোভাবের উদাহরণ ছড়িয়ে আছে আমাদের সাহিত্যে। মধ্যযুগের পারলৌকিক জীবনসংশয়ী কবিদের মধ্যে যেমন স্বদেশী বুলিতে কাব্যচর্চায় সংকোচ ও আতঙ্কের পরিচয় আছে তেমনি আধুনিক কালের বঙ্কিম(১৮৩৮-১৮৯৪), মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যেও একই অবজ্ঞার চিত্র পাওয়া যায়। এমনকি নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৯২৬-৯৪), মাওলানা আকরম খাঁ(১৮৬৮-১৯৬৮), আমীর হোসেন (১৯১০-১৯৬৪), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৯) নবাব সলিমুল্লাহ(১৮৬৬-১৯১৫) নবাব সৈয়দ নবাব আলী কেউ বাংলাভাষী তো ছিলেনই না এমনকি কেউ কেউ বাংলাকে 'ছোটলোকের ভাষা'[৭৯] বলে নিন্দাও করেছেন। এসব দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় বাংলা ভাষার ওপর সাম্প্রদায়িকতা আরোপের নির্মম ঐতিহাসিক সত্য।

অন্যদিকে মধ্যযুগেও হিন্দুদের বাংলাভাষা চর্চার উদ্দেশ্য সাহিত্য সৃষ্টি ছিল না, ছিল ধর্মপ্রচার। কারণ শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত, কিন্তু সাধারণের ভাষা ছিল বাংলা। মুসলমান কবিগণ প্রণয়োপাখ্যান রচনার মাধ্যমে সাহিত্যে মানবিকতা ও মানবপ্রেম সূচনা করলেও সেকালেও বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্যে শিক্ষিত জনের ছিল তাচ্ছিল্যজনিত অবহেলা ও বিরূপ মনোভাব। এই অবহেলার সারসংক্ষেপ বিধৃত হয়েছে আহমদ শরীফের এই বর্ণনায়–

> উন্নাসিক ব্রাহ্মণ অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'বুলি'। উন্নাসিক মুসলিমদের কাছে 'হিন্দুয়ানী ভাষা'। কারুর চোখে 'প্রাকৃত ভাষা'[দ্বিজ শ্রীধর ও রামচন্দ্র খান ১৬ শতক], কারুর মতে 'লোক ভাষা'[মাধবাচার্য ১৬ শতক], কেউ বলেন 'লৌকিক ভাষা' [কবিশেখর ১৭ শতক], অধিকাংশ লেখক 'দেশী ভাষা' এবং কিছুসংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাষা' বলে উল্লেখ করতেন। বহিরাঞ্চলে এ ভাষার নাম গৌড়িয়া! (শরীফ, ২০১০:৩১২)

'জাতি গঠনে ভাষার প্রভাব' প্রবন্ধে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে আহমদ শরীফ বাংলা লেখ্য ভাষার বিবর্তনকে বাঙালির জাতিগঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ভাষিক জাতীয়তার জন্য অভিন্ন লেখ্য ভাষা এবং এককেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা উভয়ই প্রয়োজন–

> তেরো শতক অবধি বাঙলা-উড়িষ্যা এবং ষোলো শতক অবধি বাঙলা-আসামী অভিন্ন ছিল, তবু একচ্ছত্র শাসনের অর্থাৎ এককেন্দ্রিক শাসন-সংস্থার অনুপস্থিতির দরুণ অর্বাচীন অবহট্ট-উত্তর ভাষা সর্বজনীন লেখ্যরূপ পায়নি। তাই আঞ্চলিক বুলিই স্থানিক প্রয়োজনে লেখ্য ভাষায় উন্নীত হয়। ফলে বিহারে, উড়িষ্যায়, বাঙলায় ও আসামে চালু হল চারটি স্বতন্ত্র লেখ্য ভাষা। আর এর সুদূরপ্রসারী ফল এই দাড়াল যে মাগধী প্রাকৃত-ভাষী একটি ভাষিক জাতি বা সম্প্রদায় কালে চারটি ভাষিক জাতিতে পরিণত হল। যদি গুপ্ত ও পাল আমলের মতো একচ্ছত্র শাসন আধুনিক বুলিগুলোর স্বরূপ প্রাপ্তির সময়ে ও লেখ্যরূপ গ্রহণকালে চালু থাকত, তাহলে বিহার, উড়িষ্যা, বাঙলা ও আসাম জুড়ে একটি বিরাট ভাষিক জাতি গড়ে উঠতে পারত, এবং তাহলে আর্থিক, রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক শক্তিরূপে পূর্ব-ভারতে একটি মার্যাদাবান রাষ্ট্রের স্থিতি অবধারিত ছিল।
> (শরীফ, ২০১০:৩৮০)

ভাষার মাধ্যমেই মানবগোষ্ঠীর ভাব ও চিন্তার, সৌজন্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। আদিকাল থেকে অভিন্ন ভাষাই বিভিন্ন গোত্রের সমবায়ে সমাজ গঠনের সহায়ক হয়েছে। আহমদ শরীফ মনে করেন, এর আঞ্চলিক রূপ যতই বিভিন্ন হোক অভিন্ন লেখ্যরূপের মাধ্যমেই ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে।[৫০] বাংলা ভাষার লেখ্যরূপের মাধ্যমে অভিন্ন বাঙালি জাতি গঠনের ইতিহাস বর্ণনা করে লিখেছেন–

> বাঁকুড়া ও চট্টগ্রামের এবং মালদহ ও গোয়ালপাড়ার মানুষ যে একই লেখ্য ভাষার বন্ধনে ধরা দিয়েই বাঙালি হয়েছে, এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। নইলে তাদের স্থানিক বুলি এতই পৃথক যে তারা কোনোক্রমেই অভিন্নভাষী জাতি হতে পারত না। মালদহ কিংবা বাঁকুড়ার লোক সহজেই হতে পারত বিহারী, যেমন মেদিনীপুরের লোক হতে পারত উড়িয়া এবং সিলেটীরা হত আসামী। কাজেই আজকের বাঙালির স্বাজাত্যবোধের উৎস স্বভাষা। কেননা এ জাতি পরিচয়ে নৃতত্ত্ব, গোত্রচিহ্ন, ধর্মমত ও বর্ণবিন্যাস অস্বীকৃত। এমনকি আঞ্চলিক অভিমানও এক্ষেত্রে অবহেলিত। তাই পুরনো রাঢ়, সুম্ম, সমতট, বরেন্দ্র, বঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি গোত্রবাচক ও অঞ্চল নির্দেশক পরিভাষাগুলো আজ অবলুপ্ত। (শরীফ, ২০১০:৩৮০)

সাহিত্যে-শিল্পচর্চায়-ধর্মমতে-জীবনচর্যার রীতিনীতি সবকিছুতে বাংলাদেশে আঞ্চলিক রূপ যেমন বিভিন্ন, ভৌগোলিক বাধাও তেমন পার্থক্যসূচক। কিন্তু হাজার বছর ধরে 'অভিন্ন লেখ্য ভাষার মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষ এক অবিচ্ছেদ্য আত্মীয় সমাজ গড়ে তুলছে যার আধুনিক নাম বাঙলা দেশ ও বাঙালি' (শরীফ, ২০১০:৩৮২)।

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 'ভাষা প্রসঙ্গে : বিতর্কের অন্তরালে' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ বাংলা ভাষাকে ধর্মীয় প্রশ্নে বিতর্কিত করে পাকিস্তানবাদী ভাষাদর্শ সৃষ্টির দূরভিসন্ধিমূলক প্রয়াসের সমালোচনা করে লিখেছেন– 'মাতৃভাষার প্রতি নেহাত প্রীতিবশেই তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়নি, চেয়েছিল সাম্রাজ্যিক স্বার্থলোভে' (শরীফ, ২০১০ :৩৮৩)। আমরা জেনেছি যে, পুথি সাহিত্যকে ঐতিহ্যিক আদর্শ ধরে তারা বাংলার রূপ পরিবর্তন করতে চেয়েছিল

সেই চেষ্টা চলছিল পাঁচ ও ছয়ের দশক জুড়ে নানা তৎপরতায়।[৫১] পাকিস্তানি শাসক ও দেশীয় দোসররা সেসময় বাঙালি নেতাদের 'প্রাণী বিশেষের মত আনুগত্য' পেয়েছিল, পেয়েছিল 'বেরাদরিভাবে বিগলিত' এবং দাবি আদায়ের ব্যাপারে 'পরম উদারতায় উদাসীন' বাঙালির পরিচয়। কিন্তু আহমদ শরীফ এসবের জবাব দিয়েছেন। পুঁথি সাহিত্যের ভাষাকে মানভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াসকে যুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করে নাকচ করেছেন আহমদ শরীফ। এই ভাষা যে প্রকৃত অর্থে মুসলমানের বাংলা ভাষা নয় তা প্রমাণে মধ্যযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস থেকে তথ্য সংযুক্ত করে আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন, আরবি ফারসি বা উর্দু কোনোটিই বাংলা ভাষার ঐতিহ্যিক উপাদান হতে পারে না। ভাষাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে বিচারের বিপক্ষেও ছিল তাঁর শক্ত অবস্থান। আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় ব্যবহারকেই যারা ভাষার ঐতিহ্য বলে গ্রহণ করতে চান তাদের প্রতি আহমদ শরীফের মন্তব্য- 'শব্দ দিয়ে ভাষার জাতি নির্মিত হয় না, হয় বাক্য-গঠন রীতি বা ব্যাকরণ দিয়ে। তাছাড়া শব্দের দিক দিয়ে পৃথিবীর সব ভাষাই মিশ্র।' আহমদ শরীফের বিশ্লেষণ ও যুক্তি থেকে উদাহরণ–

> তারা বলে বাঙলা আরবি-ফারসি শব্দ-বহুল ছিল। উনিশ শতকে পাদরী ও পণ্ডিতের ষড়যন্ত্রে বাঙলা সংস্কৃতি-ঘেঁষা হয়ে উঠেছে। এর মূলে কোনো সত্য নেই। পনেরো শতকের শাহ মুহম্মদ সগীর থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কবি চুহর অবধি কবির লিখিত রচনায় এবং গোপীচাঁদ-ময়নামতীর গান, পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহগীতিকা, বাউলগান থেকে অল্পশিক্ষিত আজকের কবির মৌখিক রচনা অবধি কোথাও আরবি-ফরাসি শব্দবহুল বাঙলা নমুনা মেলে না। (শরীফ, ২০১০:৩৮৪)

এমনকি হাওড়া-হুগলি-কলকাতা-মুর্শিদাবাদ অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র বাঙলা ভাষায় যে আরবি-ফারসি শব্দ বিরল ছিল তা কেবল হ্যালহেড বা ফরস্টারের উক্তি থেকেই নয়, *কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ* কিংবা *ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সম্বাদ*– এর ভাষা থেকেও প্রমাণিত। আহমদ শরীফ আরও যুক্তি দিয়েছেন–

> উক্ত বন্দর ও শাসন-কেন্দ্রের সঙ্কর বাঙালিরা ছাড়াও দরবারীভাষা ফারসি শিক্ষিত অসাহিত্যিক বাঙালিরা কথাবার্তায় ও বৈষয়িক চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজ প্রচুর ফারসি শব্দ ব্যবহার করত, এখনকার অসাহিত্যিক রচনায় কিংবা কথাবর্তায় ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা যেমন অজস্র ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করে। তাই বলে গ্রাম-বাঙলার অশিক্ষিত মানুষকে পূর্বে ফারসি এবং এ যুগে ইংরেজি ভাষা প্রভাবিত করেছে বললে সত্যের অপলাপই হয়। প্রমাণস্বরূপ বলা চলে বাঙলার পল্লী অঞ্চলের মুসলমান নারী-পুরুষদের যারা পুরুষানুক্রমে চিরকাল নিরক্ষর, তাদের উপর নিশ্চয়ই উনিশ শতকের পাদরী ও পণ্ডিতের কিংবা এ যুগের পুস্তকী ভাষার প্রভাব পড়ার উপায় ছিল না বা নেই। তবে তাদের আঞ্চলিক বুলিতে শাস্ত্রীয় কিংবা সরকার সম্বন্ধীয় পরিভাষা ব্যতীত অন্য আরবি-ফারসি-হিন্দির প্রভাব নেই কেন! (শরীফ, ২০১০:৩৮৯)

তাছাড়া যেহেতু সংস্কৃতি স্বরূপত ব্যক্তিক, অবস্থানিক বা পারিবেশিক সেহেতু প্রতিবেশবিচ্ছিন্ন কোনো সংস্কৃতি কল্পনাতীত। সুতরাং ইসলামে অনুরাগই যদি উর্দুপ্রীতির কারণ হয়ে থাকে, তাহলে আরবিকেই আমাদের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত বলে যুক্তি দিয়ে আহমদ শরীফ তাঁর চূড়ান্ত প্রতিপাদ্যে যান–'আরবি-ফারসি শব্দ ও সাহিত্য মাত্রই ইসলামী নয়, একাধারে অমুসলিমেরও। অতএব বাঙলা ভাষার নিন্দা-কলঙ্ক রটানোর মূলে অভিসন্ধিই ক্রিয়াশীল' (শরীফ, ২০১০:৩৮৬)। বাঙালির ভাষিক জাতীয়তাবোধের এক ভিন্ন চিত্র আহমদ শরীফ উপস্থাপন করেছেন সম্ভাবনার সমীকরণে। ঐতিহাসিক বাস্তবতা ভিন্ন হওয়ায় সেই জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হতে পারেনি কিন্তু ভাষিক জাতীয়তার শক্তি ও সম্ভাবনা বুঝাতে আহমদ শরীফ এই অনুমিত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকেই আমরা জেনেছি, কোনো জনগোষ্ঠী বা জনসমষ্টি একচ্ছত্র শাসনে না থাকলে তাদের মধ্যে অভিন্ন ভাষিক, শাস্ত্রিক, আচারিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাভিত্তিক জাতিসত্তাবোধ জাগে না। আজকের বাংলাভাষী অঞ্চল ব্রিটিশপূর্বকালে কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না, অঞ্চলটিও ছিল না একক নামে পরিচিত। তাই ভাষিক ঐক্য হয়েছিল ব্যাহত। একচ্ছত্র শাসনে থাকলে এবং অঞ্চল-সম্ভূত শাসক বংশ থাকলে আঞ্চলিক শাসনে প্রাকৃত কিংবা অবহট্‌ঠই হতো দরবারি তথা প্রশাসনিক ভাষা। তাহলে আজ আমরা আসম-বাংলা-উড়িশা-বিহারে এক অভিন্নভাষী মানুষ পেতাম। বুলিগত তুচ্ছ পার্থক্য নিয়ে তিন-চারটে তথাকথিত স্বতন্ত্র ভাষা এমন কৃত্রিম ব্যবধানের দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারত

না। রাজশক্তির লালন পেয়ে মধ্যদেশীয় প্রাকৃত (শৌরসেনী) ও অবহট্ঠ একসময় সর্বভারতীয় জনগোষ্ঠীর ঐক্যের ও সংহতির বাহন হয়েছিল। তেমন ভাগ্য এ অঞ্চলের কোনো বুলিরও হতে পারত সীমিত পরিসরে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলা ভাষা বিকৃতির অপতৎপরতাকে কালিক ব্যবধানে খানিকটা দূর থেকে অবলোকন করার চেষ্টা করেছেন আহমদ শরীফ ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত 'বাংলা-ভাষা সংস্কার আন্দোলন' গ্রন্থে। যদিও এসব অপপ্রচেষ্টা প্রথমবার বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, পরে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তথাপি আহমদ শরীফ তাঁর ভাষায় 'সজলঘটমুখে আকাশ দেখানোর মতই' ভাষা সংস্কারে ষড়যন্ত্রীদের 'মতলবের নমুনা ধরে রাখবার'[৫২] চেষ্টা করেছেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০ বৎসর ধরে বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালি মুসলমানের বিকৃত ও অসুস্থ চিন্তা-চেতনা রচন ও মোচনে বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য-বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন আহমদ শরীফ যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় 'সরকারি অভিসন্ধিজাত একটা বানানো সমস্যা কি ভাবে গোটা জাতির শিক্ষিত সমাজের চেতনাকে সুদীর্ঘ কাল আচ্ছন্ন করে রাখে' (শরীফ, ২০১০ক:৩)। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকে গ্রন্থভুক্তির কাল পর্যন্ত বাংলাভাষার বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্রের শেষ তখনও হয়নি বলে তাঁর আশঙ্কাও ব্যক্ত হয়েছে আমাদের বিবেচনায় যা আজও প্রণিধানযোগ্য, সঙ্গে এই সতর্কবাণীও স্মরণযোগ্য–

> 'মুসলিম জাতীয়তার অনুরাগীদের মনে ওই ব্যাধি [বাংলাভাষা সংস্কার] আজো নির্মূল হয়নি। 'রাষ্ট্রপতি'র 'প্রেসিডেন্ট' হওয়ার কিংবা সড়ক-সরণি রোড-অ্যাভিন্যু হওয়ার মধ্যেই রয়েছে সে-রোগের আলামত ও সাক্ষ্য। .... একই চেতনার প্রভাবে এই সেদিনও বাঙলাদেশ 'বেতার' হল 'রেডিও বাংলাদেশ' আর লোপ পেল 'জয় বাঙলা' জিগির। (শরীফ, ২০১০ক:৫)

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বায়ান্নতে যে আন্দোলন সংঘটিত হয় তাতে ব্যর্থ হয়েই বর্ণ বর্জন, বানান সংস্কার, লেখার ধরন পাল্টানো, হরফ পরিবর্তন, কুফরি শব্দ পরিহার ইত্যাদি ছদ্ম-আন্দোলন সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে আরবি-ফারসি শব্দ ও হিন্দুস্তানি বাকভঙ্গির মিশ্রণে উদ্ভূত হয় এক 'খিচুড়ি বাংলা'[৫৩] গদ্যের। আহমদ শরীফের মতে সবকিছুর মূলেই ছিল, বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালি মুসলমানের দীর্ঘকালের হীনমন্যতা ও আত্মপরিচয়ের 'দ্বৈধ সত্তা'[৫৪] এবং এসবের লক্ষ্য ছিল 'কোলকাতার হিন্দুর ভাষা ও গ্রন্থ থেকে পূর্ব পাকিস্তানীর চাক্ষুষ ও মানস বিচ্ছেদ ঘটানো' (শরীফ, ২০১০ক:৮)। ভাষাকে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি মনে করার এমন একদেশদর্শী মনোভঙ্গি শিক্ষিত জনের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল, আহমদ শরীফ তাই অনেক যুক্তি দেখিয়ে তাঁর প্রতিপাদ্য ব্যক্ত করেছেন –

> বর্ণ-বানান-ভাষা সংস্কার আন্দোলন যেহেতু সদিচ্ছা-সদ্বুদ্ধিজাত ছিল না, ছিল না স্বচ্ছ ও সুস্থ মানসিকতার প্রকাশ, কেবল হিন্দু ও হিন্দুয়ানীবিদ্বেষ এবং করাচিওয়ালাদের শাসন-শোষণ কায়েম রাখার অপবুদ্ধিই ছিল এ অপকৌশল গ্রহণের মূলে, সেহেতু এ নিষ্ফল আন্দোলন কয়েক বছর পরেই বৃথা ও ব্যর্থ বলে পরিত্যাক্ত হল। (শরীফ, ২০১০ক:১২)

আহমদ শরীফের ভাষাচিন্তার সঙ্গে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের যোগসূত্র দুর্লক্ষ্য নয়। ভাষার বিবর্তনের সাথে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক-দূরত্ব, তাদের অভিরুচি-ইচ্ছা অথবা জীবনচর্যা যখন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে বলেই জাতির সামাজিক ইতিহাসের সাথে এর সম্পর্ক গভীর। বাঙালির জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ভূমিকা এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপে ভাষিক জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশগুলোর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধেছিল, আবার আরব জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি ভিন্ন ধর্মের ও সংস্কৃতির দেশ ও জাতিগুলো ভাষিক অভিন্নতায় একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায়। ভাষার গায়ে ধর্মের চিহ্ন বসানোর প্রয়াসও কম হয়নি যুগে যুগে। তার কারণ মধ্যযুগে ধর্ম ও শাস্ত্রের বাহন না হলে ভাষা প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের ভাষার ঐশ্বর্য ও প্রসার নির্ভর করে মননশীল চর্চার ওপর, সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে মননশীলতার চর্চা বৃদ্ধি করেই কেবল ভাষাকে ঋদ্ধ করা যায়। আহমদ শরীফ বাংলা ভাষার ওপর জবরদস্তির ব্যাপারেও সতর্ক করেছিলেন, যাতে ভাষার স্বাভাবিক প্রবহমানতা বজায় থাকে। আরবি-ফারসি শব্দ শুধু নয়, যে-কোনো ভিন্ন ভাষার শব্দই জোর করে বাংলায়

চালানোর চেষ্টা হতে পারে বিপজ্জনক। বাংলা ভাষার গায়ে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার নানা চিহ্নের প্রমাণ দিতে আহমদ শরীফ 'পানি' এবং 'জল' শব্দের উদাহরণ দিয়েছেন, যে-গুলোর উৎপত্তি না জেনেই মুসলিম ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বশে বাতিল করে। অথচ 'জল' শব্দটি অবিমিশ্র ফারসি, 'পানি' সংস্কৃত। এভাবে বিদ্বেষবশে 'বেতার' এর পরিবর্তে 'রেডিও' অথবা 'রাষ্ট্রপতি'র বদলে 'প্রেসিডেন্ট' শব্দ চালু করেছিল '৭৫-পরবর্তী সরকার। এসবই মানুষের বিদ্বিষ্ট ও সংকীর্ণ মনের পরিচয়, যা ভাষার গায়ে অঙ্কিত থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভাষার ওপর পৌরুষ প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর সর্বকালে সবজাতির ক্ষেত্রেই। আহমদ শরীফ আরও দেখিয়েছেন, ভাষায় অধিকাংশ বিশেষ্যই পুরুষবাচক; নারীবাচক শব্দ সৃষ্টি করতে হয় পুরুষবাচক শব্দের সাথে দীর্ঘ 'ঈ' ব্যবহার করে। সেখানেও ভাষা বহন করছে প্রবলের আকাঙ্ক্ষার চিত্র। নারীবাচক শব্দের মাধ্যমে পুরুষ নারীর ওপর তার আধিপত্যবাদী মনমানসিকতা ভাষার গায়ে সেঁটে দিতে চায়।

৩.২.১২

জাতি বা জাতীয়তা একটি সাম্প্রত ধারণা। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'জাতি' বলতে 'রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সংগঠিত জনসমাজ'কে বোঝায়। আর জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝায় 'পুঁজিবাদী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশক আদর্শকে' (সরদার, ২০০২:২৮৮-৯০)। অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লোবোত্তর ইয়োরোপে যন্ত্রশিল্প ও পুঁজির বিকাশের প্রতিক্রিয়ায় পূর্বের ধর্মের দেয়াল ভেদ করে দেশগুলো ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠন শুরু করলে প্রতিষ্ঠিত হয় ভাষিক, আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ (শরীফ, ২০০৮:৩০)। সুতরাং জাতীয়তার ধারণার সৃষ্টির সাথে পুঁজি ও ধনতন্ত্রের বিকাশের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। জাতীয়তা রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশক আদর্শ এবং পুঁজিবাদী শাসকগোষ্ঠীর জন্য অপরিহার্য। কারণ জাতীয়তাবোধ স্বাতন্ত্র্য ও জনতার ঐক্য সৃষ্টি করে পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। ঠিক একই কারণে এই চেতনা সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রীদের কাছে বর্জনীয়। ব্রিটিশ বাণিজ্যশক্তির ভারতবর্ষে পদার্পণ এবং উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তিই ভূমিকা রেখেছিল। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয় জাতিত্বের ধারণা ছিলই না।

অতীতে রাজ্য ছিল রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সে জন্য রাজার সঙ্গে প্রজার সমস্বার্থের যোগ ছিল না। তাই রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ ছিল অচিন্ত্য। কেবল সহমতবাদী অর্থাৎ সমস্বার্থমূলক একপ্রকার জাতিচেতনাই মধ্যযুগীয় মানব-সংহতির ভিত্তি ছিল। ধর্মীয় ঐক্যচেতনাই ছিল তার মধ্যে প্রধান। স্বাতন্ত্র্য এবং ঐক্যভাবনা জাতীয়তার ভিত্তি। আহমদ শরীফ প্রাচীন বাংলা থেকেই বাঙালির ঐক্যসূত্র সন্ধান করেছেন। আমরা জানি প্রাচীন বাংলায় 'জাতি' ছিল প্রথমে গোত্র বা কৌমবাচক এবং পরে বর্ণবিন্যাস্ত সমাজের বৃত্তিবিভাজিত গোষ্ঠীবাচক অভিধা। সেসূত্রে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গলদের ঐক্যবদ্ধতার প্রধান সূত্র হয়েছিল তাঁদের স্ব-উদ্ভাবিত সর্বপ্রাণবাদী দেহতত্ত্ব। পরবর্তীকালে বাঙালির সামষ্টিক ঐক্যের উদাহরণ আছে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম-বিদ্রোহে। পরাক্রমশালী পাল আমলে দিব্যক-ভীম-রুদ্রকের নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহের মধ্যে আহমদ শরীফ দেখেছেন স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যের রূপ, তাঁদের ক্ষমতারোহণ এবং কয়েক প্রজন্ম ধরে তা ভোগ করার ইতিহাসও আহমদ শরীফকে আলোড়িত করেছিল। সেই দ্রোহ আর জয়ের পেছনে সাধারণ মানুষের সমর্থন তিনি অনুমান করেছেন, তবে কী ছিল তার ভিত্তি সেই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসে অজানা বলে তিনি ভবিষ্যৎ গবেষকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তারও আগে ব্রাহ্মণ্য শোষণের প্রতিমূর্তি সেনদের বিরুদ্ধে বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের নেতৃত্বে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার মূলত প্রাচীন বাংলাতেই হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বাঙালির এই প্রবল প্রতিরোধকে 'অনার্য অভ্যুত্থান' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন আহমদ শরীফ। ঐক্যবদ্ধ বাঙালির আরেক প্রবল উদাহরণ 'অনার্য অভ্যুত্থান'। এসব আন্দোলন মূলত ধর্মভিত্তিক এবং কোনো পরিণামসন্ধানী নয় অথবা বাঙালির মননে বৃহতের সাধনা নেই বলেই

হয়তো এসব ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা সাময়িক উপপ্লব হিসেবেই ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে। আহমদ শরীফের মতে মধ্যযুগে ধর্ম শুধু পারলৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না– ছিল ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি-অর্জন, ক্ষমতারোহণ ও শোষণসহ বিভিন্ন জাগতিক ও বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির উপায়ও। কিন্তু বাঙালির চিন্তায় ভৌগোলিক, রাষ্ট্রিক বা ভাষিক জাতীয়তাবোধ উদ্বোধনের পূর্ববর্তী অবস্থা অনুধাবনের জন্য এই ইতিহাস জানা জরুরি।

বাঙালি যেমন তাঁর স্বতন্ত্র জীবনবোধের পরিচয় রেখেছে ধর্মের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও রেখেছে স্বকীয় মনোভঙ্গির স্বাক্ষর। চিরকালই বাঙালি শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। কিন্তু স্বাজাত্যের শিথিল বন্ধনের কারণে রাজা-প্রজায় যোগ ছিল না, ছিল না সমস্বার্থ ও অভিন্ন আদর্শের কোনো প্রেরণা। এ প্রসঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক বিবর্তনের যে ইতিহাস আহমদ শরীফ বর্ণনা করেছেন 'বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের বক্তব্যকে কয়েকটি সূত্রে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হল–

প্রথমত- আধুনিক ভৌগোলিক বাংলা কোনো এক নামে পরিচিত ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলের নাম ছিল ভিন্ন, ছিল গোত্রীয় শাসন।

দ্বিতীয়ত- জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যমত গ্রহণের পূর্বে আধুনিক অর্থে কোনো রিলিজিয়ন বা বাংলা পরিভাষায় 'ধর্ম' এখানে ছিল না।

তৃতীয়ত- বাঙালি সবসময়ই ছিল বিদেশিশাসিত, পরাধীন, নির্জিত। সার্বভৌম স্বশাসন বা বাঙালি রাজার কোনো নিশ্চিত অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। শশাঙ্ক-গোপাল-দিব্যকদের নিশ্চিত বাঙালি বলা যায় না। তবে নিশ্চিত না হলেও ইতিহাসে তারাই একমাত্র বাঙালি বলে কথিত স্বাধীন রাজা।

চতুর্থত- মৌর্য যুগ থেকে সেন আমল পর্যন্ত জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের পীড়নে বৌদ্ধদের সাম্য ও নির্বাণের সমাজ বর্ণাশ্রম প্রথায় রূপান্তরিত হয়। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার মানবিক অধিকারসমূহ অস্বীকৃত হয়। উত্তর ভারত অর্থাৎ আর্যাবর্ত থেকে আর্যব্রাহ্মণ কৌলিন্য প্রথার প্রচলন হয় বাংলায়। সর্বত্র যে গণ-অধিকার প্রচলিত ছিল তা প্রশাসনিক ভাবে অপহৃত হয়।

পঞ্চমত- বাংলাদেশ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য-চৈত্য-আচার-অনুষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল সেন আমলে। তবু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রে আচার-অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র-দেহতত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে দৃঢ়মূল হয়ে রইল লৌকিক দেবতার সংস্কারের মধ্য দিয়ে। অভিজাতরা অনেক লৌকিক দেবতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেছিল পৌরাণিক শ্রেষ্ঠত্বের চাতুর্যের মধ্য দিয়ে।

উপর্যুক্ত রাজনৈতিক ধারা বিবেচনায় রেখে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার ব্যাপক প্রকাশ ঘটে তুর্কি-মুঘল শাসনামলে। মুসলমানি শাসন দীর্ঘায়িত করার জন্য, ধর্মীয় চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জিইয়ে রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। আহমদ শরীফ এর পরিচয় দিয়েছেন 'বাঙলা ভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব' প্রবন্ধে–

> তুর্কী ও মুঘলেরা এদেশে মুসলিম শাসন দৃঢ়মূল করবার প্রয়োজনে বিদেশী ও দেশী মুসলিম মনে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জিইয়ে রাখতে প্রয়াসী হন। ধর্মের উৎসভূম আরব এবং শাসক ও সংস্কৃতির উদ্ভবক্ষেত্র ইরান-সমরখন্দ-বুখারার প্রতি জনমনে শ্রদ্ধাবোধ ও মানস-আকর্ষণ সৃষ্টির ও লালনের উদ্দেশ্যে কাফের-বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে স্বাতন্ত্র্যবোধ জিইয়ে রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠীর একটি সচেতন প্রয়াস ছিল। আলাউল হক, তাঁর পুত্র নুরকুতবে আলম, জাহাঁগীর সিমনানী, আলফ্সানী, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ প্রভৃতির পত্রে ও মনোভাবের আভাস আছে। (শরীফ, ২০১০:৩১২)

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাঙালির প্রবণতা শাসক-শোষক-পীড়নকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তথাপি সেটাই ছিল হাজার বছর ধরে নির্যাতিত-বঞ্চিত-অবহেলিত বাঙালির জন্য অনিবার্য পরিণতি। ব্রিটিশ শাসনামলে, উনিশ শতকে ইংরেজশিক্ষার প্রসারের মাধ্যম আধুনিক ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-

দর্শন চর্চার মাধ্যমে বাঙালি-মানসে স্বাতন্ত্র্যচেতনার ঊর্ধ্বে উঠে আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। যদিও 'ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির তথা ভারতবাসীর মধ্যে তখন বিকৃত অভিধায় স্বধর্মীয় ঐক্য ও স্বার্থচেতনাই ছিল 'জাতীয়তা' (শরীফ ২০১৪:১৪৬)। আহমদ শরীফের মতে এই জাতি চেতনাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। বাঙালিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ এবং ভাষাকে যথাক্রমে 'মাতৃভূমি' ও 'মাতৃভাষা' নামে অভিহিত করেন। 'বঙ্কিমের মনোজগৎ' প্রবন্ধ থেকে আহমদ শরীফের মন্তব্য উদ্ধরণযোগ্য–

> বঙ্কিমই প্রথম একটি ভৌগোলিক স্বদেশ ও স্বজাতি সন্বিৎসাবশে আবিষ্কার করেন সুবা-ই-বাঙ্গালা বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে [বাঙলা,বিহার, উড়িষ্যা] স্বদেশরূপে এবং অধিবাসীদের স্বজাতি বলে। বাঙলা প্রেসিডেন্সীর অধিবাসীরা [বিহার উড়িষ্যাসমেত] তাই বাঙালী অভিধা পেল তাঁর থেকেই। এর আগে 'দেশ' শব্দটাই ছিল স্বগ্রাম নির্দেশক। (শরীফ, ২০১৪:১৪৩)

আহমদ শরীফ মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাচিন্তা স্বধর্মী বা হিন্দু-জাতীয়তা অর্থে নয় তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সকল অধিবাসীর বৃহত্তর বাঙালির জাতীয়তা অর্থেই প্রযোজ্য। তবে ব্রিটিশ শাসনামলেই বাঙালি জাতীয়তা ধর্মীয় রূপ পায়।[৫৫] ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রচারিত মিথ্য ইতিহাস দ্বারা বিভ্রান্ত ও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও মানসবিভাজনের বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হিন্দু-মুসলমান পরস্পরবিরোধী জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ-ভারতবিভাজনের নীতিতে দ্বিজাতিতত্ত্বকেই নিয়ামক করে তোলে। বাঙালির অভিন্ন জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে উভয় সম্পদায়ের নেতৃত্বে ও গণচেতনায় যে ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি কাজ করেছিল আহমদ শরীফ অনেক লেখায় তা খণ্ডনের জন্য বিপুল যুক্তি-তথ্য-প্রমাণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে দেশজ বাঙালি মুসলমানের মিথ্যা তুর্কি-মুঘল-আর্য-জ্ঞাতিত্বগর্ব[৫৬], দেশ-কাল-আদর্শ-প্রতিবেশহীন স্বধর্মীজাতীয়তা চিন্তা[৫৭], হিন্দুর ব্রিটিশ-তোষণনীতি ও মুসলমানের অসহযোগতত্ত্ব ইত্যাদি প্রধান। এগুলোর প্রায় সবই বাঙালি মুসলমানের দীর্ঘকালীন মানস-বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী। হাজার বছরের প্রতিবেশী যখন শাসক বা শাসিতের প্রতীকে চিহ্নিত হয় তখন সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও প্রবেশ করে প্রতিক্রিয়াশীলতার বীজ। তবে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়-সংকট বা নৈরাশ্যপীড়িত 'আধি'[৫৮] আজও কাটেনি। সংহত জাতীয়তার জন্য তা কখনও সুখকর হয় না–

> ভৌগোলিক পরিবেষ্টনীগত জীবনের ও প্রয়োজনের অস্বীকৃতিতে হিন্দু আত্মত্রাণের প্রেরণা খুঁজেছে স্বধর্মে ও উত্তরভারতের বৈদিক, রাজপুত ও মারাঠা ঐতিহ্যে এবং মুসলমানও ত্রাণ সন্ধান করেছে তার স্বধর্মে ও আরব-ইরানে। এটির নাম স্বাধর্ম্য– প্যান হিন্দুইজম ও প্যান ইসলামইজম। ফলে মধ্য ও উচ্চবিত্তের হিন্দু-মুসলমান নানা কাজে একত্রিত হয়েছে কিন্তু তাদের মিলন হয় নি। যদিও তারা একই হাটে বেচা-কেনা করেছে একই বাটে হেঁটেছে, একই মাঠে ফসল তুলেছে, একই বন্যায় পীড়িত হয়েছে এবং মরেছে একই মহামারীতে। তারা পাশাপাশি বসেছে, ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়েছে,– বাইরে সর্বত্র মিলেছে, সহযোগিতা করেছে, অন্য সব কিছুই দেয়া-নেয়া করেছে, মনটাই কেবল দেয়া-নেয়া করে নি, তারা মনটা ফিরিয়ে রেখেছিল দেশবহির্ভূত ধর্মের ও ঐতিহ্যের আনুগত্যবশে। ওটার নাম স্বতন্ত্র্য ও স্বাধর্ম্য যার অপর নাম দেশকালহীন আদর্শিক জাতীয়তা। কিন্তু এই আদর্শিক জাতীয়তা কোন শ্রেয়সের সন্ধান দিয়েছে! (শরীফ, ২০১০:২৭১-২৭২)

বিত্তশালী ও অভিজাত বলে কথিত মুসলিম অথবা ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তা ও ধর্মীয় চেতনার চেয়ে আত্মোন্নয়নই মুখ্য ছিল।[৫৯] বহিরাগত মুসলিম ও দেশীয় মুসলমানের মধ্যে সামাজিক প্রতিপত্তি ও অবস্থানের বিস্তর পার্থক্য থাকায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে কতিপয় আভিজাত্যগর্বী বাঙালি মুসলমানের সীমিত অগ্রগতি ছাড়া ব্যাপক অর্থে বাঙালি মুসলমানের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটেনি।[৬০] আবার এই পশ্চাৎপদতার ভিন্ন কারণও পাওয়া যায় আহমদ শরীফের যুক্তিতে–

> ইংরেজের প্রতি বিরূপতা কিংবা ইংরেজির প্রতি অনীহাই বাঙালি মুসলমানকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে বিরত রাখে নি, শিক্ষার Tradition ছিল না বলেই তারা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠায়নি। অবশ্য উচ্চবিত্তের মুসলমানরাও যথাসময়ে সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে দিয়েছিল এবং তাদের অনেকের শিক্ষা পূর্ণতা পায় নি পরিবেশের অভাবেই। কেননা ইংরেজি শিক্ষা চালু হয়েছিল কোলকাতায়। সেখানে উচ্চবিত্তের মুসলমান ছিল অনেককাল অনুপস্থিত। কোলকাতা ও তার চারপাশের হিন্দুরাই পেয়েছিল ইংরেজি শিক্ষা প্রথমদিকে এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ব্যতীত বৈদ্য, নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানের কাছে ইংরেজি শিক্ষার দ্বার পারিবেশিক কারণেই রুদ্ধ ছিল বহুকাল। (শরীফ, ২০১০:২৫৮)

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি অসহযোগিতামূলক বিরূপ মনোভাব বা অবজ্ঞার কারণে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অনীহা ছিল এমন ভুল ধারণা থেকে বাঙালি মুসলমান আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করেছে কিন্তু আহমদ শরীফের মতে নিম্নবিত্তের বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুর ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনীহার পেছনে ঐতিহাসিক অনগ্রসরতাই মূল কারণ। এ শ্রেণির মধ্যে লেখাপড়ার ঐতিহ্যই ছিল না'[৬১] বলে মনে করেন তিনি–

> কেউ কেউ মনে করেন, মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিরূপতা ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবপ্রসূত। কিন্তু ওহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র বিহার ও উত্তর প্রদেশে তৎসত্ত্বেও ইংরেজি শিক্ষা প্রসার লাভ করেছিল। আমরা জানি কোনো আন্দোলনের প্রভাবই সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী হয় না। মুসলিম সমাজে ওহাবী প্রভাবও সর্বাত্মক ছিল না। তাছাড়া, ১৮৬০ সনের পরে ওহাবী আন্দোলন স্তিমিত এবং সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুসলমান সমাজে ইংরেজ ও ইংরেজি প্রীতি প্রবল হতে থাকে। তবু বিশ শতকের দ্বিতীয়পাদের আগে বাঙলার মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষা লক্ষণীয়ভাবে প্রসার লাভ করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কালাপানি পার হলে জাত-যাওয়া ও সমাজ-চ্যুতি নিশ্চিত জেনেও উনিশ শতকে কোনো হিন্দু বিলেত যাওয়ার সুযোগ ছাড়ে নি। ওহাবী প্রভাব নিশ্চয়ই হিন্দুর ঐ ধর্মীয় সংস্কার ও লাঞ্ছনাভীতির চেয়ে প্রবল ছিল না কখনো। আসলে নিম্নবর্ণের হিন্দুর যেমন, নিম্নবিত্তের মুসলমানেরও তেমনি লেখাপড়ার ঐতিহ্যই ছিল না। (শরীফ, ২০১০:২৫৯)

বরং আহমদ শরীফ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বিশেষত বহিরাগত, অভিজাত বলে কথিত শ্রেণিকে 'অবতংস' আখ্যা দিয়ে দেশীয় মুসলমান সমাজের প্রতি অবজ্ঞা ও দায়িত্বহীনতার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থাপন করেন। এই আভিজাত্যগর্বী শ্রেণির সামষ্টিক মানসিকতা ও প্রবণতাই ছিল এরকম। সামগ্রিকভাবে বাঙালি মুসলমানের অনগ্রসরতা, তাদেরকে বারবার বহির্মুখো ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে অস্থির-উদ্বাস্তু করে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করা, দৈশিক জীবন-চেতনা প্রসারে বাধা দিয়ে বিবরবাসী করে রাখার জন্য এই শ্রেণিই দায়ী বলে আহমদ শরীফ মনে করেন –

> বুর্জোয়া রাজত্বে ইংরেজি জানা হিন্দু দালাল-মুৎসুদ্দী-বেনিয়ান-চাকুরে বেতন, ঘুষ ও সুদের আকারে কাঁচামুদ্রা অর্জন করে ঐশ্বর্যবান হতে থাকে যখন, তখন বিদেশাগত মুসলমানের স্বল্পসংখ্যক বংশধর ছোট লোকদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পৈত্রিক-সম্পত্তি-নির্ভর নিশ্চিন্ত জীবনযাপনে মশগুল। কাজেই উচ্চবিত্তের ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মতো বহিরাগত উচ্চবিত্তের মুসলমানও যে কোম্পানী রাজত্বের প্রসাদ পেয়ে ধনী-মানী শ্রেণীরূপে গড়ে উঠতে পারত, সে-সম্ভাবনা হল তিরোহিত। তাদের ঔদাসীন্যে হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীই কেবল গড়ে উঠল– হিন্দু-মুসলিম মিশ্র বুর্জোয়া শ্রেণী আর গড়ে উঠতে পারল না। এবং এই শ্রেণীতে মুসলিম নামধারীর অনুপস্থিতিই ছিল ধর্মীয় স্বাজাত্যগর্বী বাঙালি মুসলমানের ক্ষোভের কারণ। কিন্তু বহিরাগত মুসলিম অবতংসরা বুর্জোয়া বিত্তের অংশ পেলে দেশী মুসলমানের বাস্তব ও বৈষয়িক কী উপকার হত– কেবল জাতীয় গৌরব-গর্ব করবার মতো নির্বোধ আত্মপ্রসাদ পাওয়া ছাড়া। যে কয়টি পরিবার ইংরেজ আমলের দু'শ বছর ধরে জমিদার হিসেবে টিকে ছিল, তারা দেশী মুসলমানের শিক্ষা বিস্তারে কী সহায়তা করেছে, স্কুল-কলেজ গড়েছে কয়খানা, ছাত্রবৃত্তি দিয়েছে কয়টি। অবশ্য পার্থিব নেতৃত্ব এবং অপার্থিব পুণ্য অর্জনের জন্য দান করেছে প্রচুর-লিল্লাহ দিয়েছে বটে। এরাই আরব-ইরানের খোয়াব দেখিয়ে, সমরকন্দ-বোখারার স্মৃতি জাগিয়ে, উর্দুর মহিমা কীর্তন করে স্বস্থ হতে দেয় নি বাঙালি মুসলমানকে। বারবার বহির্মুখো ও ছিন্নমূল করবার সচেতন প্রয়াসে তারা দেশী লোকের অগ্রগতির পথ করেছিল রুদ্ধ; দৈশিক জীবন-চেতনা প্রসারে দিয়েছিল বাধা। সে-প্রয়াসে আজো তাদের বিরতি-বিরাম নেই।
>
> অতএব মুসলিম শাসনকালে বিদেশাগত মুসলিম চাকুরে ও অভিজাতদের দ্বারা দেশী মুসলমানের কী উপকার হয়েছিল, তার ইংরেজ আমলে এদের তমঘা, আইমা, মদদ-ই মাশ ও জমিদারী বাজেয়াপ্তির বা হারানোর ফলে বাঙালি মুসলমানের কী ক্ষতি হল, তা আজ খুঁটিয়ে দেখবার-বুঝবার প্রয়োজন আছে। নতুবা স্বধর্মীকে স্বজাতি মনে করে অভিন্ন স্বার্থের সুবাদে আস্থা রাখার বিড়ম্বনা কখনো ঘুচবে না।(শরীফ, ২০১০:২৫৯,২৬০)

স্বকীয় বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগে তত্ত্ব ও তথ্যকে, প্রতিবেশ ও পরিস্থিতিকে নিজের জীবনের ও জীবিকার অনুকূল ও উপযোগী করে গড়ে তোলার সাধনাতেই বাঙালি চিরকাল নিষ্ঠ ও নিরত। এই জন্যেই রাজনীতির তত্ত্বের দিকটিই তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশি– বাস্তব-প্রয়োজনে সে অবহেলাপরায়ণ; কেননা তাতে বাহুবল, ক্রূরতা ও হিংস্রতা প্রয়োজন (শরীফ, ২০১০:৩৬৭)। এজন্যেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বাঙালির মানস-সন্তান হলেও নেতৃত্ব থাকেনি বাঙালির। বিদেশাগত ভুঁইয়াদের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর ধরে মুঘল বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে সর্বস্ব উৎসর্গ করতে বাঙালিরা দ্বিধা করেনি বটে, কিন্তু নিজেদের জন্যে স্বাধীনতা কিংবা সম্পদ কামনা করেনি (শরীফ,

২০১০:৩৬৭)। বাঙালি জাতীয়তাবাদ একবারই সর্বভারতীয় রূপ লাভ করেছিল– সেটি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর তা প্রতিহত করার ঘোষণায়। বাঙালি-মুসলমান হিন্দু এতটা নিঃসংকোচ সহযোগিতা ও সংহত একাত্মতা আগে আর দেখায়নি। প্রবুদ্ধ বাঙালির সে-ই ছিল সৃজনশীলতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ। সেই একাত্মতা ব্যাপ্ত হয়েছিল সৃজনশীল চর্চার মাধ্যমেই– প্রধানত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষার প্রমিত রূপ সৃষ্টি এবং ১৮১৮ সালে সংবাদপত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই চেতনাকে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে দেয়ার যুগপৎ প্রয়াসে।

১৯৪৭ সালের পর বিভাগোত্তর বাস্তবতায় ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের একাংশ হিসেবে বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে ধর্মীয় পরিচয় ও ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার প্রকট প্রবেশাধিকার লাভ করলে সাহিত্য-শিল্পসহ চিন্তা ও মননশীলতার সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক বিতর্ক-বিতণ্ডা সূচিত হয়। প্রথমে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক রাজনৈতিক মাত্রা পায়; পরে জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনায় স্ফুলিঙ্গ সঞ্চারিত হয়। এসময় নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য-সংস্কার চর্চা ও চর্যার গ্রহণ-বর্জন প্রশ্নে বাংলাদেশের লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্পষ্টত দুটি ধারা সৃষ্ট হয়[৬২]; যাদের একাংশ, ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ধারা হিসেবে বিশেষিত, পাকিস্তানি জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামী তহজিব-তমুদ্দুনিক আদর্শে বাঙালি মুসলমানের স্বাধর্ম ও স্বাতন্ত্রিক উত্তরাধিকারকে বর্জন করতে তৎপর। বিপরীত অংশ, প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার অধিকারী অসাম্প্রদায়িক ধারার পরিপোষক, ধর্মীয় আবেগে-উন্মাদনায় আপ্লুত না হয়ে হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঙালি মুসলমানের উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণে আগ্রহী। এই দুই ধারার চিন্তাচেতনা, সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন-পরবর্তী বাঙালির জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। আহমদ শরীফ দ্বিতীয় ধারার সক্রিয় চেতনাস্রোত। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠী বায়ান্নতে বিজয়ী হলেও পাকিস্তানি সামরিক-অভিজাততন্ত্রপুষ্ট শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকায় ধর্ম তথা সংস্কৃতি, জাতীয়তা, দেশ এই তিন স্বাতন্ত্রিক পরিচয়বাহী চিন্ময়চিহ্নকে নিয়ে বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা মীমাংসা-সন্ধানী হতে থাকে। আহমদ শরীফ এসময় রাষ্ট্র, গোত্র, আদর্শ ও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার স্বরূপ উন্মোচন করে 'দেশ, জাতি ও ধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন–

> জাতীয়তার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। জাতীয়তা অভিন্ন স্বরূপে গড়েও ওঠেনি কোথাও। কারো জাতীয়তা রাষ্ট্রসীমাভিত্তিক, যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে; কারো জাতীয়তা ধর্মভিত্তিক, যেমন ইসরাইলে; কারো জাতীয়তা গোত্রনির্ভর, যেমন আফগানিস্তানে; কারো জাতীয়তা রাজনৈতিক আদর্শকেন্দ্রী, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে। আজকের দুনিয়ায় সাধারণভাবে রাষ্ট্রিক-সীমাভিত্তিক জাতি-চেতনাই প্রবল। এ ধরনের জাতীয়তাবোধে রাজনৈতিক চেতনা ও স্বার্থবুদ্ধিই বন্ধনসূত্র, ধর্মমতের অভিন্নতা, সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ ও অভিন্ন-ঐতিহ্য-চেতনা তাতে অনুপস্থিত। এজন্য রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবোধ ও জাতি-পরিচয় নেহাত কৃত্রিম। রাষ্ট্রসীমার সংকোচ ও প্রসারণের সাথে কিংবা রাষ্ট্র ভাঙা-গড়ার সঙ্গে এমনি জাতীয়তার ও জাতির জন্ম-মৃত্যু ঘটে। রোমক জাতির অস্তিত্ব এমনি করেই লোপ পায়। অতএব, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে যে-জাতি-চেতনা জাগে, রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক অভিন্ন স্বার্থবোধনই তার জনক। এই স্বার্থ সূত্রে আবদ্ধ জাতির জীবন টেকসই নয়। স্বার্থগত বিরোধে সে সূত্র ছিঁড়ে যায়, জাতীয়তাও যায় উবে, যেমন মিশর-সিরিয়ার যুক্তরাষ্ট্রে। (শরীফ, ২০১০:১৪৬)

অর্থাৎ রাষ্ট্রভিত্তিক জাতি-চেতনা আধুনিক বিশ্বে প্রবল হলেও অনেক দুর্বলতা ও কৃত্রিমতামণ্ডিত। অপর দিকে, পাকিস্তান-সৃষ্টিলগ্নে ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় মুসলমানেরা জাতীয়তায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠার পেছনে ইসলাম বা মুসলিমসংস্কৃতি-চেতনা নয়, কাজ করেছে মূলত 'রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের বাঞ্ছা এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের উপায়' আর এর সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থবুদ্ধির সম্পর্কই অধিক বলে আহমদ শরীফ মনে করেন (শরীফ, ২০১০:১৪৬)। কিন্তু বাঙালি জাতি তার আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসারণের স্বার্থেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল, আত্মবিলোপ নয়। ফলে রাষ্ট্রের পরিচয় গড়ে তোলার লক্ষ্যই ছিল বাঙালির নিজস্ব সত্তা, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা। এমন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রিক ও বাহ্যিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধিপ্রসূত চর্যার সাথে ধর্মের সুসমন্বয়ের মাধ্যমে একটি নতুন জাতীয় সাংস্কৃতিক আবহ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন

আহমদ শরীফ। এক্ষেত্রে নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখার অভিমত তাঁর (শরীফ, ২০১০:১৪৭)।

বিভাগোত্তর কালে অভিন্ন জাতীয়তার স্বপ্ন দেখিয়ে পাকিস্তানকে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বিভিন্ন ধর্ম-সাম্প্রদায়িক যুক্তি বিন্যাস করা হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকদের নানা পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করে আহমদ শরীফ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের অসারতা, অগ্রহণযোগ্যতার যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। ধর্ম কোনো অবিমিশ্র একক মত বা শাস্ত্র নয়, এক 'বিরাট বিপুল রহস্যাবৃত মায়াময় মানসজগত যার জটিল আলো-আঁধারীর মধ্যে রয়েছে– আমাদের বাস্তব জীবনের সম্পদ ও সমস্যার, আনন্দ ও যন্ত্রণার, স্বপ্ন ও সত্যের রহস্যসূত্র' (শরীফ, ২০১০:৪১৬)। আহমদ শরীফ, পাকিস্তান সৃষ্টির বাস্তবতায়, বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তুলতে স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যে ঐক্যবোধ অন্বেষণের পরামর্শ দিয়েছিলেন; বিশ্বকে দেখতে চেয়েছেন তার সমগ্র স্বরূপে, ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিশ্বসত্তার যোগস্থাপনে সার্থকতা সন্ধান করেছেন। তাঁর ভাষায়–

> আমরা বৌদ্ধযুগের মূর্তিশিল্পে পিতৃপুরুষে নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করব, সেন আমলের সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদের নিন্দা করব, মসলিন শিল্পের গৌরব করব, মসজিদ শিল্পের প্রসারে উল্লাসবোধ করব, বাঙলা ঘরের আকর্ষণে আকুল হব। ধনপতি-চাঁদ সওদাগরে বাঙালির উদ্যম দেখে খুশি হব, সত্যপীর-বড়গাজীতে বাঙালির কল্যাণবুদ্ধির বিকাশ দেখে আশ্বস্ত হব। বাউল-দর্শনের গৌরব করব। আমরা রাষ্ট্রে সেবায় রত থাকব। পাকিস্তানের আপদে বিপদে জান-মাল কোরবান করব। আমরা কোরান-হাদিস জানব, ইসলামের ইতিহাস স্মরণ করব। সে-সঙ্গে চর্যাগীতির রহস্য উদঘাটন করব, বেহুলা-লখিন্দরের গল্প পড়ব, বৈষ্ণব পদাবলী আস্বাদন করব, বিদেশী তুর্কী-মুঘল শাসক বিদ্বেষী বঙ্কিম-সাহিত্যের রস-গ্রহণ করব, রবীন্দ্রসাহিত্য-সমুদ্রে অবগাহন করব। (শরীফ, ২০১০:১৪৭)

এ পর্যন্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে, ধর্মীয় বা আদর্শিক জাতীয়তা নয় আহমদ শরীফ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাকেই আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের উপযোগী বলে মনে করতেন। তাই বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর ধর্মীয় জাতীয়তার আগ্রাসনের মাধ্যমে শাসকের থাবা যখন বিস্তার লাভ করেছিল, তখনই 'জাতীয়তা'প্রবন্ধে আহমদ শরীফ সতর্ক করেছিলেন যে, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে ওঠে রাজনৈতিক স্বার্থে; শোষণের পথ নির্বিঘ্ন করতেই একশ্রেণির ক্ষমতালিপ্সু ধর্মকে ব্যবহার করে শোষণ ও সম্প্রীতির ভারসাম্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়–

> আজ দুনিয়ার সব রাষ্ট্রই–ধর্মভিত্তিক নয়–রাষ্ট্রসীমা ভিত্তিক জাতীয়তার আস্থাবান এবং এ অঙ্গীকারেই সমৃদ্ধিকামী। আমাদের ছাত্ররা দেশের ইতিহাস ও সাহিত্য-গ্রন্থে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তার এই বিভ্রান্তিকর দ্বৈতবোধই লাভ করে। ফলে তাদের জাতীয়তাবোধ প্রয়োজনানুরূপ ঋজু, পষ্ট ও দৃঢ় হয় না। এ জাতীয়তাবোধের ভিত্তি চোরাবালি, ফলত রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক। ধর্মীয় জাতীয়তায় আস্থা রাখলে, ইরানী, আফগানী প্রভৃতি যে-কোনো বিদেশী স্বধর্মীর শাসনে এ দেশের লোক নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করবে, যেমন তুর্কী-মুঘল আমলে দেশী মুসলমানরা শাসকের স্বাধর্ম্য গর্বে খুশি থাকত। (শরীফ, ২০১০:২৬৩)

তিনি এই ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করতে যুক্তি উপস্থাপন করলেন–

> বিধর্মীর সঙ্গে রাষ্ট্রিক যুদ্ধে যেহাদী-প্রেরণা-পন্থা গ্রহণ করলে স্বধর্মীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধে কোন্ প্রেরণা কাজ করবে? মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ দৃঢ়মূল হলেই মানুষ স্বদেশের স্বার্থে সর্বাবস্থায় সংগ্রামী প্রেরণা পায়। কাজেই আশুপ্রয়োজন মিটানোর জন্যে জাতীয়তাবোধের মতো অতি গুরুতর ধারণার সংকোচন-প্রসারণে যথেচ্ছ অপব্যবহার পরিণামে অহিতকর। (শরীফ, ২০১০:২৬৩)

'একটি প্রতারক প্রত্যয়' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ ধর্মীয় জাতীয়তার সমস্যা ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যা করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তার অনুপস্থিতি, তার পেছনে রক্তাক্ত, রাজনৈতিক ও গোত্রীয় দ্বন্দ্ব বর্ণনা করে আহমদ শরীফের মন্তব্য– 'আরবরা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তায় আস্থাবান নয়'। দৈশিক জাতীয়তাবোধ পাশ্চাত্য শিক্ষার দায়। ইংরেজ আমলে প্রতীচ্য প্রভাবে পাকভারতে তা জাগ্রত হয়। ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানও– শুধু 'স্বাধর্ম্য বশে নয়, সমস্বার্থেই সংহত হয়েছিল সংখ্যাগুরু

হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে'এ বিষয়টির পক্ষেও আাহমদ শরীফের জোরালো যুক্তি পাওয়া যায়। একারণে আহমদ শরীফ সবার জন্য এক মিলন ময়দানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন-যেখানে 'সুযোগ ও সম্পদের ক্ষেত্রে সুবিচার থাকবে'।

'রাজনীতি ও গণমানব' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের চিন্তায় সমতাভিত্তিক জাতীয়তা বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা গুরুত্ব পেতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনি মনে করতেন, ধর্মভিত্তিক হোক বা ভাষাভিত্তিক, কোনোকালেই জাতীয়তাবোধ শাসক-শাসিত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। ব্রিটিশভারতে হিন্দু মুসলমান জাতীয়তা ছিল নানবিধ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। গণমানুষের সমর্থন বা সম্পর্ক তাতে ছিল না। আহমদ শরীফ জাতীয়তার প্রশ্নে গণমানবের আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ দেখতে চেয়েছেন রাষ্ট্রের মধ্যে। তাই তিনি লিখেছেন–

> স্বদেশী বা বিদেশী শাসন এ যুগে বড় সম্পদ বা সমস্যা নয়। এ যুগে রক্ষক-বঞ্চিত সম্পর্ক সব সমস্যার মূলে। বঞ্চিত জনের কল্যাণ চিন্তাই , তার শোষণ ও দারিদ্র্য মুক্তিই এ-যুগের রাষ্ট্র-ভাবনার একমাত্র বিষয়। বুর্যোয়া স্বার্থের সংগ্রামকে গণ-সংগ্রাম বলে চালিয়ে দেয়ার দিন অপগত-প্রায় – এই প্রত্যয় নিয়ে মানুষের রাষ্ট্র-সাধনা ও রাজনৈতিক সংগ্রাম গণ-মুক্তি ও গণ-কল্যাণে নিয়োজিত হবে–এই আশ্বাসে ও অঙ্গীকারে আমরা সুদিনের প্রতীক্ষারত। (শরীফ, ২০১০:৪০৭)

সব ধর্ম, মানুষ ও সংস্কৃতির জাতীয়তা এক মিলন ময়দানে আনতে হলে জাতীয়তার কী রূপ হওয়া উচিত আহমদ তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'মিলন ময়দানের সন্ধানে' প্রবন্ধে। যা কিছু মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে– পোশাক থেকে শুরু করে ভাষা বা ধর্ম সবই একসূতায় গাঁথতে না পারলে মানুষের মধ্যে সর্বমানবীয় জাতীয়তা বা গণমানবের জাতীয়তা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এজন্য সকল সীমা-সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশকালধর্মবর্ণ নিরপেক্ষভাবে মানুষের মধ্যে বিবাহের রেওয়াজ চালু করলে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আহমদ শরীফ মনে করেন (শরীফ, ২০১০:৪১০)।

আহমদ শরীফ রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তায় সমর্থন জানিয়েছিলেন অনেক আগেই[৬৩], পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে সকলপ্রকার স্বাতন্ত্র্যবোধের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রিক জাতীয়তার কথা জোর দিয়ে বলতে দেখি তাকে।[৬৪] কিন্তু ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল জোয়ারে তা আর উচ্চারিত হয়নি। তিনি বাঙালির ভাষিক পক্ষেই কলম ধরেছিলেন। স্বাধীনতার পর আহমদ শরীফের উপলব্ধি নতুন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ও উজ্জীবিত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শের প্রেরণা তাঁকে আবারও সমতাভিত্তিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তার প্রতি বিশ্বস্ত করে তোলে। তিনি উপলব্ধি করেন 'জাতিসত্তা জাতিগঠনের ও জাতীয়তার সৃষ্টির পথে বড়ো দুরতিক্রম্য বাধা' (শরীফ, ২০১৬:১৭৪), কারণ প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরে জাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-পেশা-গোষ্ঠী-শ্রেণি-গোত্রগত ঐক্যচেতনা সুপ্তভাবে বন্ধন তৈরি করে রাখে। সুপ্তবন্ধন থেকে সুপ্তদ্বেষণাও সৃষ্টি হয়। তাই কোনো রাষ্ট্রেই এই ভেদ ঘুচানো যায়নি এবং যাবে না বলেই আহমদ শরীফের ধারণা।

তবে তাঁর ধারণা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনীতি থাকলেও রাষ্ট্রচিন্তা থাকে না। তাই 'কি নাম-কোথায় নিবাস-কি বৃত্তি' তথা আত্মপরিচয়ের চিরাচরিত জিজ্ঞাসায় আজও বাঙালি মুসলমানের কোনো জবাব পাওয়া যায় না। সে হয় বাঙালি না হয় মুসলমান– বাঙালি মুসলমান নয়। *এবং আরো ইত্যাদি*(১৯৮৭) গ্রন্থের 'স্বাতন্ত্র্য, সংস্কার, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তা' প্রবন্ধে জাতীয়তার সমস্যার সমাধান দিয়ে আহমদ শরীফের চিন্তা উল্লেখযোগ্য–

> আধুনিক রাষ্ট্রে কারো গৌত্রিক-শাস্ত্রিক ঐতিহ্য ও প্রতীক পরিহার করে সর্বজনগ্রাহ্য ও সেক্যুলার নীতি-আদর্শ ও প্রতীক গ্রহণ করেই জাতীয়তাবোধ ও জাতিচেতনা জাগানো ও দৃঢ়মূল করার প্রকৃষ্ট পন্থা। ননা বর্ণের, ধর্মের, গোত্রের, ভাষার নাগরিক অধ্যুষিত আধুনিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রিক, সরকারি ও প্রশাসনিক নীতি-নিয়ম ঐতিহ্য-আদর্শ ও প্রতীক গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে নাগরিকের মধ্যে অভিন্নমূল রশুনের সংহতি ও স্বার্থ চেতনা জাগানো ও রক্ষণ লক্ষ্যে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করা

আবশ্যিক ও জরুরি। এভাবেই কেবল অভিন্ন জাতি-চেতনা এবং জাতীয় স্বার্থ ও দায়িত্ববোধ ভিত্তিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করা সম্ভব। (শরীফ, ২০১০ক:৩৬৪)

১৯৭১ সালে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাঙালির একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক সাংবিধানিকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করলেও আহমদ শরীফ এর মধ্যে 'ফাঁকির দ্বারা ফাঁক পূরণের' চাতুর্যের নিন্দা করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। তাঁর মতে, শেষোক্ত তিনটি মূলনীতি প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যেই স্বতঃপ্রযুক্ত সুতরাং উল্লেখ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আর পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর থেকে বাঙালি ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বিতর্কতে তাঁর বক্তব্য[৬৫] অত্যন্ত স্পষ্ট– বাংলাদেশের অথবা পৃথিবীর যে কোনো স্থানেই যার মাতৃভাষা বাংলা, ধর্ম তার যা-ই হোক সে জাতিতে বাঙালি–

> বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের বাঙালিরা বাঙলাভাষিরা সত্তায় বাঙালি এবং রাষ্ট্রিক পরিচয়ে বাংলাদেশি, যেমন আগে ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় এবং পাকিস্তানি। স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করলে শাস্ত্রিক, গৌত্রিক ও ভাষিক সত্তার পরিবর্তন বিলুপ্তি ঘটে না। এ তত্ত্বে , তথ্যে ও সত্যে কোন বিরোধ বিতর্ক বিবাদের কারণ ছিল না, কিন্তু প্রথম স্বেচ্ছায় এক অভিসন্ধি বশে এ চেতনার পুষ্পে কীট ঢোকালেন জিয়াউর রহমান, হিন্দুদ্বেষণা বশে তিনি বাঙলাদেশের বাঙালী মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য-সচেতন করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালী থেকে পার্থক্যজ্ঞাপক পাকিস্তানি স্থলে 'বাঙলাদেশী' জাতীয়তা চিহ্নিত করলেন। (শরীফ, ২০১৫:২৬)

আহমদ শরীফের মতে মার্কসবাদীরাই প্রথম স্থানিক কালিক স্বীকৃতিতে গণমানুষের সঙ্গে অভিন্ন স্বার্থবোধে একাত্মতা অনুভব করে এবং এদেশে প্রথম দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা দেয়, তারা সত্তায় বাঙালি, রাষ্ট্রিক পরিচয়ে বাংলাদেশি এবং চেতনায় আন্তর্জাতিক ও মানববাদী। অন্যরা কেউ হিন্দু-বাঙালি, কেউ মুসলিম-বাঙালি বড়জোর বাঙালি-হিন্দু বা বাঙালি-মুসলিম।

আহমদ শরীফ জানেন এবং মানেন যে, কমিউনিজম বিপ্লবসাপেক্ষ, নাস্তিক্য অচল[৬৬], সবমানুষ কখনও নির্বিশেষ মানবপ্রেমী হবে না[৬৭], তথাপি একটি সেক্যুলার নিয়ম-নীতি-রীতিবিশিষ্ট রাষ্ট্রগঠনের মধ্যেই ভবিষ্যতের বাঙালি ও বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিহিত, যেখানে মাতৃভূমি হবে নির্বিশেষ অধিবাসীর নিশ্চিত নিবাস–

> রাষ্ট্রিক জাতি গঠনের ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ জাগানো একমাত্র উপায় ঐহিক– ইহজাগতিক এবং রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ও বিষয়ে সর্বপ্রকারে ও সর্বদা-সর্বত্র সেক্যুলার নীতি-নিয়ম, রীতি-পদ্ধতি সচেতনভাবে, সরকারীভাবে আন্তরিকভাবে প্রয়োগের প্রয়াস-প্রযত্ন করা, যাতে উনজনেরা বিশ্বাস-ভরসা-আস্থা-আশ্বাস ফিরে পায়, এ মাটিকে মৌরসী অধিকারে ও মমতায় আঁকড়ে থাকে এবং এ রাষ্ট্রকেই তারও দেহ-প্রাণ-মন-আত্মার লালন ও বিকাশ ক্ষেত্র বলে সে জানে এবং মানে যাতে সে অধিজনের কথায়-কাজে ও আচরণে বোঝে যে এদেশ বর্ণ-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে অধিবাসী মাত্রেরই মাতৃভূমি, অভয় আশ্রয়, নিশ্চিত নিবাস। (শরীফ, ২০১৪:৫৭৩)

৩.২.১৩

ইংরেজি 'সেক্যুলার' শব্দের প্রতিশব্দে ধর্মনিরক্ষেতা শব্দটি সঠিক নয় মনে করেন আহমদ শরীফ। ধর্মনিরপেক্ষতায় রাষ্ট্র সবধর্মকে সমান গুরুত্ব দেয়। যা এক ধরণের গোঁজামিল বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু 'সেক্যুলার' বলতে ধর্মহীনতা বোঝায়, এ বিষয়ে আহমদ শরীফের ব্যাখ্যা– 'সেক্যুলারিজমের কথা হচ্ছে 'লৌকিকতা' এবং কখনও পারলৌকিকতার কথা বলবে না' (শরীফ, ২০১৬:৫১৩)। আস্তিক বা বিশেষ ধর্মমতের লোকের দ্বারা কোনো ধর্মের অস্তিত্ব কথায় ও কাজে এবং আচরণে স্বীকৃতই হবে না। সরকার যে কোনো ধর্মবিশ্বাসের ধর্মীয় পালাপার্বণ সম্পর্কে থাকবে উদাসীন এবং নিরপেক্ষ। আর সে কারণেই সরকারি লোকেরা সরকারের পক্ষে ধর্মীয় পালাপার্বণে যোগ দেবেন না। রাষ্ট্রের সরকার এবং প্রশাসকেরা অন্ধ-কানা-খোঁড়া, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-

ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে জানবে, বুঝবে এবং মানবে। তার যোগ্যতা হিসেবে তাকে কাজ দেবে অথবা কাজে অসমর্থ হলে তাকে ভাতা দেবে।[৬৮]

আহমদ শরীফ মনে করেন, আমাদের দেশের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো তো বটেই, সবচেয়ে সচেতন নামধেয় যারা কমিউনিস্ট পার্টি, তারাও ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে যা এক ধরণের ভণ্ডামি– ভোট সংগ্রহের ছল। তাঁর মতে, বুর্জোয়া উদারতা মন্দের ভাল, তবে সমাজতন্ত্রের বিকল্প নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত একটি সেক্যুলার রাজনৈতিক দল[৬৯] গড়ে তোলা, যাতে গারো-সাঁওতাল-চাকমা-ত্রিপুরা-মারমা-হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্টান-মুসলিম সবাই এমনি রাজনৈতিক দলকে বল-ভরসার, জান-মাল-গর্দানের নিরাপত্তায় স্মরণ করবে।

আহমদ শরীফের মতে, জাগতিক জীবনের চাহিদা পুরণই হবে সরকারের বা রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান ও একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। সবাই নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে গৃহিত হবে। তাঁর মতে, তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্র হল– 'দুর্নীতি কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি; বেপরওয়া শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা এবং কৃত্রিম ভোটতন্ত্রের আবরণে জঙ্গীনায়কের শাসনের নামান্তর। তাঁর ভাষায়– আজকের দৈশিক জাতিচেতনা বা ভাষিক ঐক্যবোধ ও রাষ্ট্রিক বাঙালি জাতীয়তাবোধই অন্ধকার থেকে পরিত্রাণের উপায় তবে 'সুস্থ মানবিক চেতনার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা ও সহাবস্থান বুদ্ধিই কল্যাণের বিকাশের ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভ্রান্ত পন্থা' (শরীফ, ২০০৮:৩৪)। রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই দেশের ঐতিহাসিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী প্রভৃতি গুণী-জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবীদের অবাধ চিন্তার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক (শরীফ, ২০১০:২৬৬)। আহমদ শরীফ গণতন্ত্রে আস্থাশীল, তবে নির্বাচিত ব্যক্তি মাত্রেই যোগ্য মনে করেন না। তাঁর মতে, রাষ্ট্রাদর্শ ও শাসন পরিচালনার মতো দক্ষতাভিত্তিক দায়িত্বশীলতার জায়গায় ভোটাধিক্য নয় মেধা-মাহাত্ম্য তথা মনীষাকে মূল্য দিতে হয় (শরীফ, ২০১০:২৬৬)।

বিচিত চিন্তা-র (১৯৬৮) কালেই বিশ্বমানবতার বৈশিষ্ট্য, আবশ্যকতা বর্ণনা করতে গিয়ে আহমদ শরীফ[৭০] লিখেছিলেন, পৃথিবীব্যাপী মানুষের জাত ভিন্ন হতে পারে কিন্তু জাতি এক, ভাষা বিভিন্ন হলেও ভঙ্গি একই, ভাব বহুধা কিন্তু বক্তব্য-মূল অভিন্ন। টিকে থাকার লক্ষ্য ও সংগ্রামে, সংহতি ও সংঘবদ্ধতায় মনুষ্যজাতির একটাই রূপ– সে বিশ্বমানব। তাঁর ভাষায় এমন স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে যে, একদিন পৃথিবীর মানুষ এক হয়ে সকল ভিন্নতা, বিভেদ আর স্বতন্ত্রপরিচয়বাহী চিহ্ন মুছে ফেলবে, বাবা-মার দেয়া নামটাই হবে তার একমাত্র স্বাতন্ত্র্য-চিহ্ন–

> আমাদের বুকে বিশ্বমানবতার স্বপ্ন ও সাধনা না জাগলে, মুখে বিশ্বমানবতার বুলি না ফুটলে, মনুষ্যজাতির দুর্দিনে-দুর্যোগ শুধু বাড়বেই। জাতীয়তাবোধকে আন্তরিকভাবে প্রসারিত করতে হবে আন্তর্জাতিকতায়। নইলে নিষ্কৃতি নেই দেহ-মনের –উদ্ধার নেই সঙ্কট থেকে। ইদানীং দেখা যাচ্ছে এ বোধের উন্মেষ। এই বৃহত্তর মানবচেতনায় একদিন সারা দুনিয়া সাড়া দেবে। সেদিন দূরে নয়; টিকে থাকার গরজে, স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার অভিলাষে যেদিন আঞ্চলিক শাসন সংস্থার ব্যবস্থাভিত্তিক গোটা দুনিয়া পরিণত হবে এক রাষ্ট্রে। সেদিন দেশ, ধর্ম, জাত, বর্ণ নির্বিশেষে সব শুধু 'মানুষ' নামে হবে পরিচিত। (শরীফ, ২০১০:১২৯)

বিশ্ব মানবিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'এক বিশ্ব এক রাষ্ট্র' বা 'বিশ্বরাষ্ট্রে'র[৭১] ধ্বনিতে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের আদর্শ দুর্লক্ষ্য নয়। আহমদ শরীফের বিশ্বরাষ্ট্রের সর্বশেষ সংস্করণ 'সেক্যুলার একক রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ' শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবতার বৃহতের স্বপ্নই দেখায়। তাই বিশ্বমানবতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় হুমকি সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে সমাজ-রাষ্ট্র-সরকার সবস্তর থেকে নির্মূল করার ব্রতই ছিল তাঁর আমৃত্যু সাধনা। শেষ পর্যন্ত মানবতা ও শ্রেয়োচেতনার নিরিখে চেয়েছিলেন সকলের জন্য সমসুযোগের সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র। আহমদ শরীফের তারুণ্য থেকে বার্ধক্য, উচ্ছ্বাস থেকে প্রাজ্ঞতা কোথাও এই লক্ষ্য ও চাওয়ার মধ্যে লক্ষ্যযোগ্য বিচ্যুতি নেই। তাঁর আশা ছিল সে রাষ্ট্রে একক জাতীয়তাবাদের, গণতন্ত্রের ও বিভিন্ন ধর্মমতবাদীকে নির্বিরোধ সহযোগিতায় সহাবস্থান সম্ভব যদি রাষ্ট্র হয়ে নিখুঁত সেক্যুলার, ধর্ম হয় শুধুই ব্যক্তিক এবং নাগরিক মাত্রই হয়

পরমত-আচরণসহিষ্ণু। তিনি বলতেন, আমাদের আরও একটা প্রজন্ম অপেক্ষা করতে হবে রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্যে[৭২], সেই অপেক্ষার কাল এখনও শেষ হয়নি।

৩.৩.১ সাহিত্যভাবনা

আহমদ শরীফের প্রায় পাঁচ দশকের সৃষ্টিশীল অভিযাত্রায় রচিত তিনশতাধিক প্রবন্ধ সম্ভার থেকে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ বিবেচনায় নিয়ে সেগুলোকে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে :

এক। সাহিত্য সম্পর্কে তত্ত্বগত আলোচনা। যার অন্তর্ভুক্ত– সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ, উপাদান, পরিধি, উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ : 'কথাসাহিত্যে সমস্যা ও এর বিষয়বস্তু', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'কবিতার কথা', 'সাহিত্যের রূপকল্পে ও রসকল্পে বিবর্তনের ধারা', 'বুর্জোয়া সাহিত্য বনাম গণসাহিত্য','সাহিত্যে আদর্শবাদ বা অর্ডিন্যান্স', 'শিল্প সাহিত্যে গণরূপ', 'সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য', 'প্রবন্ধ সাহিত্য', 'গবেষণা-সাহিত্য ও প্রবন্ধ সাহিত্য', 'সাহিত্যে দেশ কাল ও জাতিগত রূপ' ইত্যাদি।

দুই। বাঙলা ভাষা ও বাঙালির ইতিহাসের আলোকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ : 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়া চিত্র', 'বাংলা সাহিত্যের ইসলামমুখী ধারা', 'দোভাষী পুথির ভাষা', 'পুথি সাহিত্যের ইতিকথা', 'বাঙলা সাহিত্যের আঁধার যুগের ইতিহাস', 'বাঙালির সংস্কৃতি', 'বাঙলা ও বাঙালি', 'ইতিহাসের ধারায় বাঙালি', 'বাঙলার ধর্ম', 'বাঙালির মনন বৈশিষ্ট্য', 'বাঙালী সত্তার স্বরূপ সন্ধানে', 'বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে', 'বাঙলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে', 'বাঙলার রাজনীতিক ইতিহাস', 'ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালি', 'বাঙলার সমাজে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান', 'ইতিহাসের দর্পণে দুই শতকের বাঙালি', 'ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস' ইত্যাদি।

তিন। সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্ম মূল্যায়ন। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ :
বঙ্কিম মূল্যায়ন – 'বঙ্কিম-মানস', 'বঙ্কিমের মনোজগৎ', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'মানববাদী বঙ্কিম', 'বঙ্কিম বীক্ষা : অন্য নিরীখে' ইত্যাদি
রবীন্দ্র-মূল্যায়ন – 'সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা', 'রবীন্দ্রমানসের স্বরূপ সন্ধানে', 'বলাকা কাব্যে মৃত্যু-মহিমা', 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ', 'পঁচিশে বৈশাখ', 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গে', 'তৃতীয় প্রজন্মের চোখে রবীন্দ্রনাথ', ইত্যাদি
নজরুল মূল্যায়ন– 'নজরুল মানস', 'যুগন্ধর কবি নজরুল', 'নজরুল ইসলাম : এক বিরূপ পাঠকের দৃষ্টিতে', 'নজরুল ইসলামের ধর্ম', 'নজরুল সমীক্ষা : অন্য নিরিখে', 'পাঠক সমালোচকদের চোখে নজরুল সাহিত্য' ইত্যাদি
শরৎচন্দ্র মূল্যায়ন – 'কালান্তরে শরৎবীক্ষা', 'কালিক প্রত্যয়ের আলোকে শরৎচন্দ্র' ইত্যাদি
জসীমউদ্‌দীন মূল্যায়ন – 'মাটিলগ্ন মানুষের দরদী কবি : জসীমউদ্‌দীন'

৩.৩.২

সাহিত্যের তত্ত্ব-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আহমদ শরীফের আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্ত ও দার্শনিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ আছে। মানবচিত্তে সৌন্দর্যঅন্বেষা ও সৌন্দর্যচেতনার রূপ-রূপান্তর তাঁকে আলোড়িত করেছিল, তিনি রূপমুগ্ধ প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে রসগ্রাহী মানবচিত্তের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করেছেন। ললিত শব্দবিন্যাসে, কাব্য-লক্ষণাদৃত বাক্যে সাহিত্যের অন্তরাত্মা উদ্ঘাটনের এই প্রয়াসে গল্প-কবিতা-নকশা-রম্যরচয়িতা[৭৩] তরুণ আহমদ শরীফের শিল্পী-মানস প্রতিবিম্বিত হয়।

সাহিত্য কী?–এ সম্পর্কে আহমদ শরীফের সরল জবাব 'সাহিত্য-শিল্প হচ্ছে কী ভাবছি তা নয়, ভাব কীভাবে প্রকাশ করছি তা-ই' (শরীফ, ২০১০:১৮)। অর্থাৎ বিচিত্র ভাবনার সমারোহ নয়, বিশেষ ভাবনার প্রকাশশৈলীই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে মানবমন ও মানব জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। মানব প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না থাকলে সৃষ্ট চরিত্র অস্পষ্ট ও অস্বাভাবিক হতে বাধ্য। সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কার, অদৃষ্টবাদ. নিয়তিনির্ভরতা, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব যে মানুষের আচরণকে বিচিত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তা না জানলে সজীব ও স্বাভাবিক মানুষ সৃষ্টি হয় না, 'এক কথায় মানুষের প্রতিমুহূর্তের বাহ্যাচরণ ও জীবন-প্রচেষ্টার মধ্যে মনুষ্যজীবনের বৃত্তি-প্রবৃত্তির যে অদৃশ্য প্রভাব রয়েছে, তার যথার্থ স্বরূপ না জানলে বা কারণ-ক্রিয়া জ্ঞান না জন্মালে কোন রচনাই শিল্পায়ত্ত হবে না' (শরীফ, ২০১০:১৮)।

বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না– এই বোধ মার্কসবাদী সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য। আহমদ শরীফ সেই সময়ের সাহিত্য চর্চায় তার অভাব অনুধাবন করেছেন। তবু সাতচল্লিশোত্তর পূর্ব বাংলায় নতুন রাষ্ট্র, ভূগোল ও জাতিত্ব-জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তির আত্মোন্নয়নকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন তিনি। কারণ এই আত্মোন্নয়ন ব্যক্তির হলেও তা সমষ্টির আশা-আকাঙ্ক্ষার সাহিত্য, যার নাম গণসাহিত্য, সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। গণসাহিত্যই ছিল আহমদ শরীফের আরাধ্য। সাহিত্যের ও জীবনের রূপ-রসের সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক বিবর্তন ধারায় ব্যাখ্যা করার প্রয়াস আহমদ শরীফের রচনায় পাওয়া যায়। তিনি মানব মনীষার ঋদ্ধি-বিকাশের সাথে সাহিত্যের রূপকল্প ও রসকল্পের বিবর্তন-ধারা ব্যাখ্যা করেছেন তিনটি স্তরে, প্রাচীন সাহিত্য থেকে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত যার বিস্তার–

প্রথম স্তরে বিস্ময়দৃষ্টি :
প্রকৃতির প্রতি, সৃষ্টির প্রতি মানবমনের বিস্মায়াবদ্ধ ও রহস্যাবৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। পশুর মতো ক্ষুন্নিবৃত্তিই যখন ছিল একমাত্র কাম্য। তবুও সেই বর্বরতম মানুষেরও 'মন' বলে পশুর থেকে উন্নততর একটি বৃত্তি ছিল যা তাকে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের বাইরে মনের পিপাসা মিটাবার দিকে পরিচালিত করেছিল। সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে বর্বরযুগের মানুষ দিয়েছে চকিত, বিস্মিত, ভীত, ত্রস্ত ও উল্লসিত দৃষ্টি। আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> মানুষ যা জানে না, যা বোঝে না, যা রহস্যাবৃত, যা অচেনা; তাকে জানবার, বুঝবার ও আয়ত্ত করবার এক উদ্দাম বাসনা, এক অসহ্য ব্যাকুলতা বোধ করে। মন দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, বুদ্ধির সাহায্যে, বোধির প্রয়োগে, চিন্তার মাধ্যমে তার একটা যুক্তিসহ বা বুদ্ধিগ্রাহ্য সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা না দিয়ে সে স্বস্তি পায় না। এভাবে সে বাহ্যজগতের সবকিছুর একটি সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দিয়ে আত্মপ্রবোধ পেয়েছিল। (শরীফ, ২০১০:৩১)

এই আত্মপ্রবোধ ও আত্মপ্রসাদের গুণে সৃষ্টি হয় রূপকথা, পুরাণ।

দ্বিতীয় স্তরে জ্ঞান :
জ্ঞান মানুষকে দিল শক্তি। জ্ঞানের বিকাশে মানুষের মধ্যে যে আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠলো কল্পলোকের সঙ্গে ইহলোক যুক্ত হয়ে এসময় গড়ে উঠল রোমান্সসাহিত্য বা মহাকাব্য। বিকশিত বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে অজানাকে জানার আগ্রহ থেকেই জ্ঞানের উন্মেষ। কল্পনাবিলাসের সাথে ইহলৌকিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি যুক্ত হয়ে প্রবুদ্ধ জীবনের জয়যাত্রা শুরু হল। 'বাস্তবজীবনই ব্যাপ্ত হল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে। এ ত্রয়ীর পটভূমিকায় সংঘাতে-ঈর্ষায়-বিদ্বেষে ও প্রীতি-অনুকম্পায় দেব-দৈত্য-সব রইল পরস্পরের প্রতিবেশী হয়ে' (শরীফ, ২০১০:৩২)।

তৃতীয় স্তরে সূক্ষ্ম জীবনবোধ :
এবার গানে-গাথায় দেও-জিন-রাক্ষসের কথা নয়, পরী-বিদ্যাধরী অপ্সরীর কামনা নয়; হতবাঞ্ছ জীবনের বিক্ষোভ, বঞ্চিত বুকের সঞ্চিত ব্যথার আক্ষেপ, তৃপ্ত হৃদয়ের প্রশান্তি, কৃতার্থ মনের উল্লাস, বিজয়ী বীরের আস্ফালন ও

দলিতজনের আর্তনাদই হল সাহিত্যের সামগ্রী। 'কাম আর অর্থ–এ দ্বিবিধ বর্গীয় ফল লাভেচ্ছাই গণজীবন নিয়ন্ত্রিত করছিল এ স্তরে' (শরীফ, ২০১০:৩২)। এ স্তরের মনুষ্যমনের প্রতিচ্ছবি পাই রোমাঞ্চময় বা রোমান্টিক সাহিত্যে। বাস্তবজীবনের পাওয়া-না-পাওয়া হৃদয়ের স্বরূপ, জীবনের সাধ-আহ্লাদ, দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চিত বুকের বিক্ষোভ, তৃপ্ত হৃদয়ের প্রসাদ অভিব্যক্তি পায় এই সাহিত্যে।

৩.৩.৩

বৃহত্তর তাৎপর্যে সাহিত্য ব্যক্তির জীবনচৈতন্য, ব্যক্তির অনুভূতির অভিব্যক্তি। অনুভূতি হল ভাবের সত্য অর্থাৎ মনের বিশেষ অবস্থাকে প্রকাশ করে এবং তা বাহ্যবস্তু নিরপেক্ষ নয়। আবার জীবনচৈতন্য হল বাহ্য পরিবেশের সাথে মনের গভীরতর যোগ-চৈতন্য। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি, বাহ্য পরিবেশের যোগ ও জীবনচৈতন্য মিলে যে ভাবের অভিব্যক্তি তা-ই সাহিত্য। সাহিত্যে জীবনচৈতন্য ও সমাজচৈতন্য গভীরভাবে যুক্ত। লেখকের জীবনচৈতন্যই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়।

সাহিত্যে বাস্তবতা বা কল্পনাসর্বস্ব, প্রয়োজনানুগ বা রসানুগ, গণসাহিত্য বা বুর্জোয়া সাহিত্য বলে কোনো বিভাজন থাকা উচিত নয়। যেহেতু সৃষ্টি মাত্রই কল্পনাধর্মী এবং ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কল্পনা অসম্ভব সে কারণে সাহিত্যস্রষ্টার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বোধ-বুদ্ধি, রুচি-প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পার্থক্যভেদে সাহিত্যের রসবৈচিত্র্য ঘটে। সাহিত্যে বস্তুভেদে অনুভূতিভেদ থাকতে পারে, রসগত স্তরভেদ থাকতে পারে কিন্তু এই তারতম্য সাহিত্যকে ভিন্ন নামে বিচ্ছিন্ন বা পরিচিত করতে পারে না। আহমদ শরীফ লিখেছেন –

> মূলত মানুষের জীবন ভাবসর্বস্ব বা অনুভূতি-সমষ্টি মাত্র। কাজেই অনুভূতির জগতে স্ব স্ব স্বাভাবিক প্রবণতানুসারেই সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং মনোভঙ্গির পার্থক্যবশতই আমরা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে ও রসে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় এবং বাস্তব ও অবাস্তবের সীমারেখা টানতে প্রয়াসী হই। আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা ও মতগত অনৈক্যের মূলও এখানে। সাহিত্যে রস-সর্বস্বতা, জীবন-সর্বস্বতা, সমাজ-সর্বস্বতা, রাষ্ট্র-সর্বস্বতা বা প্রয়োজন-সর্বস্বতা বলে কিছুই নেই–যা আছে তা অনুভূতি ও উপলব্ধির সর্বস্বতা। এর প্রকার-ভেদেই আদর্শ, নীতি, রস ও বিষয়-ভেদ ঘটে। (শরীফ, ২০১০:৪৩)

অর্থাৎ সাহিত্যের প্রকারভেদ বলতে আদর্শ-নীতি-রস বা প্রয়োজনের প্রকারভেদ বোঝায় না, আহমদ শরীফ মনে করেন, এটি অনুভূতি ও উপলব্ধির বিভিন্নতা। উত্তরকালে অবশ্য গণসাহিত্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

অন্যদিকে , অনুভূতিজাত উপলব্ধিই সাহিত্যের চরম কথা বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। তাই সাহিত্যকে উপভোগের বস্তুও বলা যায়। ব্যাখ্যা করে বুঝে নেয়া বা বুঝিয়ে দেয়ার বস্তু সাহিত্য কোনোভাবেই নয় (শরীফ, ২০১০:৪৫)। যে-কোনো লিখিত রচনাই সাহিত্য নয়, আবার কোন্ গুণে লেখা সাহিত্য মর্যাদা পায় তা-ও সহজে বিশ্লেষণসাধ্য নয়। এই মর্যাদা তথা সাহিত্য-শিল্পের সার্থকতা বিষয়বস্তুর উচ্চতা-তুচ্ছতার নিরিখে বিচার্য নয়। এর লক্ষণ, পরিস্ফূটন, আস্বাদ্যতা প্রতিফলিত হয় সহৃদয়-হৃদয়সংবেদী পাঠকের চিত্তে। আহমদ শরীফ এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন সহজ ভাষায়–

> সাহিত্য সে-রকম কোনো পদার্থ নয় যে তাকে কতগুলো উপাদানের সমষ্টি মাত্র বললেই তার স্বরূপ বোঝা যাবে। শব্দের মধ্যে পদের যে অর্থগত তফাৎ, অভিধানের শাব্দিক অর্থ আর কাব্যের চরণান্তর্গত পদের অভিধা যেমন ভিন্ন, তেমনি সাহিত্য আর সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে তফাৎ বিস্তার। এ কারণেই বিষয়বস্তুর উচ্চতা কিংবা তুচ্ছতা সাহিত্য-রসের পরিমাপক নয়। শিল্প বলতে যে-কথাটি আমরা বুঝতে ও বোঝাতে চাই তা বিশ্লেষণ-সাধ্য নয়। মাটি থেকে ঘাস হল, এ আমরা দেখলাম, কিন্তু কেমন করে হল তা বোঝানো যায় না। যে-কোনো লিখিত রচনাকেই যদি সাহিত্য বলে ধরা যায় তাহলে লেখাপড়া-জানা লোক মাত্রই লেখে এবং সব লেখাই সাহিত্য। কিন্তু সেসব রচনাকে সাহিত্য বলি না। সে কি কেবল বিষয়বস্তুর তুচ্ছতার জন্যে? তাহলে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ঘরোয়া চিঠিপত্র পর্যন্ত সাহিত্য হল কী করে? আদিকালের সেই তত্ত্ব এবার স্মরণীয়–'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্টত্যগ্রে' আর 'নীরস

তরুবরঃ পুরতো ভার্তি’। অথবা একালের ‘সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার’ কিংবা ‘তেলা মাথায় তেল’–এগুলির যে-কোন একটি শব্দ পাল্টালেই সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন কোনো মুখের ছবিতে একটি তিল এদিক-ওদিক করলেই মুখের আদলই যাবে বদলে। সাহিত্য-শিল্প তেমনি একটি অনুভব-সাধ্য ব্যাপার। ওটি থাকে তো রসও রইল, শিল্পও রইল। আর যা শিল্প তা-ই সাহিত্য। শিল্প-রস, কিংবা সৌন্দর্য সবকিছুর মূলে রয়েছে মানবিক রস, ইংরেজিতে যাকে বলে Human interest –প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ না থাকলে তা মানুষের পছন্দসই হতেই পারে না। আর যা তৃপ্তি দেবে না, চেতনায় ঘা দেবে না, তা সাহিত্য নয় নিশ্চয়ই। আবার অনেক সময় মানবিকতা থাকলেও যেমন মানবিক রস জন্মাতে পারে, তেমনি এর অভাব ঘটলেও মানবিক রসের অভাব হয় না। চিত্তের উল্লাসই শুধু কাম্য নয়, চিত্ত বিক্ষোভও উৎকৃষ্ট সাহিত্য-রস-হতে পারে; যেমন করুণ, ভয়ঙ্কর, বীভৎসাদি রস। কাব্যের সুষমা ও ব্যঞ্জনার যেমন তর্জমা হয় না, সাহিত্য-শিল্পও তেমনি ব্যাখ্যান্তর্গত নয়।
(শরীফ, ২০১০:১৭২)

কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের রসনিষ্পত্তি-ধারণা যেমন প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ, ‘সৌন্দর্য’ ও ‘প্রয়োজন’-চিন্তার পক্ষ-বিপক্ষ বিতর্কও তেমন তীব্র ও প্রাচীন। আহমদ শরীফ প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন না, তবে সাহিত্য-শিল্পের সার্থকতার জন্য কেবল প্রয়োজনকেই মুখ্য বিবেচনা করার পক্ষেও তিনি নন। বরং আমরা কোনো কোনো পর্যায়ে আহমদ শরীফকে ‘সৌন্দর্য’ চেতনার গুরুত্ব দিয়ে কেবল প্রগতির নামে সাহিত্য-শিল্পের ক্ষতিসাধনের সমালোচনাও করতেই দেখি। ‘বঙ্কিম মানস’ প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ তাঁর অভিমত তুলে ধরে লিখেছেন–

> সংস্কার বশে আমরা সাহিত্যের ব্যবহারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি পেতে চাই বটে, কিন্তু তা সাহিত্যসৃষ্টির বা পাঠের মূল লক্ষ্য নয়। তার প্রমাণ আমরা কাজের কথা কেজো করে না বলে প্রত্যক্ষ্যকে পরোক্ষ করে, ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে ও রসিয়ে বলি। সৌন্দর্য আমাদের প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনে কাজে আসে না। সাহিত্য সৃষ্টির ও পাঠের পেছনেও কোনো প্রয়োজনের প্রেরণা থাকতে পারে না। আমাদের দেশে তাই সাহিত্যও একটি ‘কলা’ এবং নন্দনতত্ত্বের অন্তর্গত। কিন্তু আমরা তো কেবল সৌন্দর্যচর্চায় বাঁচিনে। আমাদের রয়েছে জীবন, সমাজ ও ধর্ম। তাই আমাদের বিষয়বুদ্ধি ‘সৌন্দর্যের’ সঙ্গে ‘প্রয়োজন’কেও পেতে চায়। কেননা সৌন্দর্য-পিপাসা অল্পেতে এবং ক্ষণিকে মেটে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনবোধের শেষ নেই। এ কারণেই পুরোনো সাহিত্যে আমরা সৌন্দর্যের সাথে নৈতিক বা ধার্মিক আদর্শের প্রতিফলনও কামনা করেছি। ন্যায়ের জয় ও অন্যায় বা অধর্মের ক্ষয় দেখবার আগ্রহই প্রধানত পাঠক বা শ্রোতাকে সাহিত্যরসিক করে তুলত। এ-যুগের পাঠক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ খোঁজে। আমরা ভুলে যাই যে এ Utility হচ্ছে আনুষঙ্গিক তথা by product। তাই এর উপরই সব গুরুত্ব দিলে সাহিত্য-শিল্প গৌণ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কাঞ্চন ফেলে আঁচলে গেরো দেয়ার বিড়ম্বনাই ভোগ করতে হয়। আজ পাঠক সমালোচক সাহিত্যে সেই বিড়ম্বনা-জালই বিস্তার করছেন। তাই কথায় কথায় পশ্চাৎমুখিতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং প্রগতিবাদিতা সাড়ম্বরে উচ্চারিত হয়। (শরীফ, ২০১০:১৭২)

প্রয়োজনকে অতিক্রম করেই শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি। কথা যেখানে শেষ সেখান থেকেই সুরের শুরু; নকশার বর্ণনা অতিক্রম করে সূচনা হয় সাহিত্যের। আহমদ শরীফ শিল্পকলার তথা মানুষের সৌন্দর্যচিন্তার উৎস বিচার করে লিখেছেন–

> কলা মাত্রেই কৃত্রিম। তুচ্ছকে উচ্চ করে তোলা, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করা, কৌৎসিত্যে লাবণ্য দেয়া, সরলকে জটিল করা ঋজুকে বক্র করে তোলা, সামান্যকে অসামান্যতা দেয়া, অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করা কলা-শিল্পীর দান। যা নেই তা সৃজন করা, যা কাম্য তা পাইয়ে দেয়াই শিল্পীর দায়িত্ব। অতএব, স্বাভাবিকতায় শিল্প নেই। অতিক্রান্ত স্বভাবই শিল্পকলা। তাই শিল্পীমাত্রেই স্রষ্টা এবং স্রষ্টা কখনো অনুকারক হতে পারেন না। অথবা কোনো অনুকারকই স্রষ্টার সম্মান পান না। অতএব সৃষ্টি মাত্রেই মৌলিক।
> যা আছে তা নয়, যা থাকা উচিত, যা শ্রেয় কিংবা প্রেয়, এমনকি যা প্রয়োজন তার স্বপ্ন দেখা, অন্যের মনে সে-স্বপ্ন জাগিয়ে তোলাই শিল্পীর ব্রত। এই অর্থে সাহিত্যাদি কলা একাধারে জীবন-স্বপ্নের উৎস, আধার ও প্রতিচ্ছবি। অতএব, শিল্পকলা চিরকালই জীবন-স্বপ্নের রূপায়ণ ঘটিয়েছে, জীবনের প্রয়োজনই মিটিয়েছে। (শরীফ, ২০১০:২৭৩)

এভাবে প্রয়োজন অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠা পায় সৌন্দর্য। তাতে মনে হতে পারে ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ কথাটিই উপযুক্ত। কিন্তু এই প্রয়োজনাতিরিক্ততার মধ্যেও সমাজজীবনের প্রায়োজনিক যোগসূত্র অস্বীকার করা যায় না। কারণ কোন কিছুই প্রয়োজন-নিরপেক্ষ হতে পারে না, কোন প্রয়োজনই জীবনসংগ্রাম-বিবিক্ত নয়। মানুষের কর্ম বা আচরণ তার মানস ও ব্যবহারিক জগতের কোনো-না কোনো প্রয়োজনাপেক্ষ বলেই আহমদ শরীফ ‘শিল্পের জন্য

শিল্প' প্রস্তাবনার বিরোধী। তিনি প্রয়োজন ও কর্মের সাথে সৌন্দর্য ও আনন্দের যোগসূত্রে উদ্ভূত শিল্পকলায় আস্থাবান। তাঁর মতে 'Art for art's sake ' কথাটা বাজে এবং তাতে ইতিহাসের সমর্থন বা শিল্পবোধের পরিচয় নেই।

প্রকৃতপক্ষে আদি মানব সমাজে যা ছিল জীবন ও জীবিকার স্থূল অবলম্বন, তা-ই মানবীয় শক্তি ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় মানস প্রয়োজনে উন্নীত। মানুষের জীবিকা ও জীবনসংগ্রামের উপকরণের সাথে সমাজের বাস্তব রূপ এবং তার মানস-সম্পদের যোগসূত্রই সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল কথা–

> সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে ও দর্শনে জীবনবোধের ও জীবনদৃষ্টির প্রকাশ বিচিত্র ও বহুধা। এজন্যেই শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনকে জাতীয়, ধর্মীয়, নৈতিক কিংবা সামাজিক রূপ দেয়ার নির্দেশ দান নির্বুদ্ধিতায় পরিচায়ক। কেননা জীবনবোধ ও উপযোগবুদ্ধি ফরমায়েশে তৈরি হয় না। চেতনানুসারেই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম অভিব্যক্তি পায়। ফলে কেউ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, কেউ ধর্মীয় বোধে অনুপ্রাণিত, কেউ সমাজচিন্তায় বিব্রত, কেউবা জীবনের নৈতিক গুরুত্বে আস্থাবান। তাই সবাইকে নির্দেশে নিবর্ণ করার অভিপ্রায় শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মননের দৈন্যপ্রসূত। মানুষ মেশিন নয়, কাজেই তার কাছে অভিন্ন ভাব-চিন্তা-কর্মের পৌনপুনিকতা কিংবা অভীষ্ট রূপ বা ফল, আশা করা বাতুলের দিবাস্বপ্ন মাত্র। (শরীফ, ২০১০:২৭৩)

আহমদ শরীফের মতে, জাতীয় সাহিত্য পরিচয়ে কোন সাহিত্য কাঙ্ক্ষিত নয়। বরং প্রয়োজনের সঙ্গে মানুষের অবিকল্প সম্বন্ধ শিল্প-সাহিত্য-সৌন্দর্যান্বেষার নিয়ন্ত্রক। তিনি মনে করেন, সমাজবদ্ধ মানুষের দুঃখ নিবারণ, স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন, উন্নততর মানসাভিযাত্রা সবই আধুনিক শিল্পপ্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত। তাই শিল্পীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর অভিমতে তিনি ভবিষ্যতের জন্য নতুন সৃষ্টিক্ষম শিল্পীর কামনা করেছেন। যেহেতু 'মানুষের চিন্তা-ভাবনা পুরাতনকে স্বরূপে ও স্বস্থানে ধরে রাখার জন্যে নয়, পুরাতনের প্রয়োজন মতো বর্জন, শোধন ও নতুনের প্রতিষ্ঠার জন্যেই।' অতএব 'শিল্পীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও প্রসারণ। পুরোনো সমাজকে ভেঙ্গে–অতিক্রম করে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন জাগানো, পরিকল্পনা প্রদান; চালু সংস্কৃতির মানোন্নয়ন ও নতুন সংস্কৃতি সৃজন; যে-ঐতিহ্য প্রগতির অন্তরায়, অনুপ্রেরণা দানে অক্ষম, তা পরিহার করে নতুন ঐতিহ্যের সন্ধান ও সৃজন প্রভৃতিই হবে শিল্পী, সাহিত্যিক ও দার্শনিকের আদর্শ, লক্ষ্য ও ব্রত। (শরীফ, ২০১০: ২৭৪) অর্থাৎ শুধু বাস্তবাবস্থার নকশা বা সমাজসত্য রূপায়ণ নয়, ভবিষ্যতের কাম্য নির্দেশনাও সাহিত্যিক ও শিল্পীর দায়িত্ব। দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির এই অভিন্ন অবস্থান গড়ে তুলতে হলে শিল্পীমনে প্রীতি ও প্রত্যয়ের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। কারণ প্রীতিহীন হৃদয়ে মানবকল্যাণ, সমাজগঠন ও ভবিষ্যত-কল্পনা অসম্ভব –

> সাহিত্যে সমাজচিত্র দেয়া মানে যা আছে, কেবল তাই চিত্রিত করা নয়– যা হওয়া উচিত তারই সংকেত দেয়া– প্রেরণা দেয়া, নইলে রচনা নকশাই থেকে যায়। তেমনি ভাষা ও বাক-ভঙ্গি যেমনটি আছে তেমনটিই রক্ষার প্রয়াসেই লেখকের কর্তব্য সীমিত রাখলে চলে না, তার উন্নয়ন ও বিকাশের চেষ্টাও করতে হয়। সংস্কৃতিও যা আছে তা নয়, যা কাম্য তারই দিশা দান সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
>
> অতএব দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচর্যা ও দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবনের যোগসাধন মানে দেশের সমাজ-সংস্কৃতির বর্তমান স্বরূপ তুলে ধরা নয়, বাঞ্ছিত সমাজ-সংস্কৃতির রূপ এঁকে দেয়া। এজন্যে বাক্‌জাল বিস্তার কিংবা কাল্পনিক অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির ও চরিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন নেই। বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির অসঙ্গত, অসুন্দর ও অকল্যাণপ্রসূ দিক উদঘাটিত হলেই এ উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হয়। প্রীতি ও প্রত্যয়ই এ কর্মে সাফল্যের সম্বল। কেননা প্রীতিহীন হৃদয় ও প্রত্যয়হীন কর্ম দু-ই অসার্থক। (শরীফ, ২০১০:২৭৫)

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন মনুষ্যত্ব ও মানবতা বিকাশের সহায়ক। মনুষ্যত্বের ও মানবতার অনুশীলন ও বিকাশ সাধনের জন্যে এগুলোর চর্চা ছিল প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে-প্রয়োজন ও দায়িত্ব স্বীকার করেনি কখনো। সাহিত্য শিল্পের সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক সবসময় সহজ ও স্বাভাবিক হয় না। কারণ–

> সাধারণ মানুষের কাছে আত্মা কেবলই পারত্রিক জীবনের প্রয়োজন মেটায়। তাই সমাজ-ধর্ম নির্দেশিত পাপ-পুণ্যবোধেই তাদের আত্মাতত্ত্ব সীমিত। জীবনের গভীর তাৎপর্য-সচেতন যারা তারাই কেবল আত্মার সন্ধানে ব্যপৃত থাকে। তারা জানে সাহিত্য-দর্শন-শিল্প পরিমার্জিত ও পরিস্রুত জীবন-চেতনায় উদ্ভূত হয়। একই বৃন্তে ফুটে ওঠে মানবতা ও মনুষ্যত্বের ফুল। তাই সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কিংবা দর্শন চিরকালই গুটিকয় মানুষের সাধ্য-সাধনায় সীমিত। (শরীফ, ২০১০:২৮২)

আত্মার দর্পণে বিম্বিত ও পরিগণিত বলেই আহমদ শরীফ মনে করেন আত্মার জগতে কোন দেশ-কাল-জাত-ধর্ম নেই। যে আত্মার পরিতৃপ্তি দেয় সে-ই আত্মীয়। তাই সাহিত্য-শিল্পে স্বাতন্ত্র্যসাধনা ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা সমর্থন করেন না তিনি– এমনকি তা জাতিগত বা দেশগত হলেও নয়। শুধু থাকতে পারে 'ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য' কারণ 'প্রত্যেক শিল্পীর সৃষ্টি স্বতন্ত্র অর্থাৎ অনন্য ও মৌলিক' (শরীফ, ২০১০:৫২৮)। কারণ সাহিত্যরস দেশ-কালের উর্ধ্বে সর্বমানবিক। সৎসাহিত্য মানুষকে ভাবায়, পরিস্রুত করে চিত্তবৃত্তি এবং অনুভবের জগৎ করে প্রসারিত।

'কেজো ও অকেজো সাহিত্য'[৭৪] প্রবন্ধেও আহমদ শরীফ উপযোগবাদ ও কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্যের তুলনা করেছেন 'কেজো-অকেজো' বাকচাতুর্যে। তিনি উপযোগমুখ্য তথা 'কেজো' সাহিত্যের বিপরীতে সৌন্দর্যসৃষ্টির অভীপ্সায় রচিত তথা রসমুখ্য 'অকেজো' সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে সাহিত্যের কোন প্রকারকেই অস্বীকার বা বাতিল করেননি, শুধু উপযোগবাদী সাহিত্যের প্রসারের ব্যাপকতার যুগে কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্যের মহিমা বর্ণনা করেছেন–

> মানুষের ভাব-চিন্তা-অনুভূতি বাহ্য প্রয়োজন, প্রেরণা বা উত্তেজনা জাত– তা স্থূলও হতে পারে, আবার এমন সূক্ষ্মও হয়, যা সচেতভাবে ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু অবচেতনার প্রভাবে অভিভূতি আনে। যা স্থূল তা বাহ্য প্রয়োজন মিটায়। যা সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ তা দিয়ে ব্যবহারিক জীবনের কোনো কাজই হয় না হয়তো। যেমন– কেজো কিছু হয় না ফুল বা পাতাবাহারের গাছ দিয়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সাহিত্যও দুই প্রকার– কেজো আর অকেজো।
>
> অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বোঝানো সহজ নয়, তেমনি অকেজো সাহিত্যের কার্যকারিতা দেখানো কঠিন। তবে বলা যায়, জীবনে সুন্দরের যে-স্থান, মনে অকেজো সাহিত্যেরও সে-চাহিদা। আজ স্বার্থবুদ্ধির ফেরে পড়ে দুনিয়ার লোক কেজো সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে উঠেছে। (শরীফ, ২০১০:৭)

জীবনধারণের প্রয়োজনে সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম যেমন অপরিহার্য সামগ্রী সে অর্থে সাহিত্য অপরিহার্য সামগ্রী নয়। কিন্তু কেজো জীবনের বাইরে আমাদের যেমন অনেক কিছুই থাকে, সাহিত্যও তেমনি। তবে তার মধ্যেও সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রাদর্শ ও ধর্ম-প্রচার, রাষ্ট্রগঠন, মতবাদ গড়ে তোলা, বিপ্লব-বিদ্রোহে, সাংস্কৃতিক জাগরণে কেজো সাহিত্যের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা। কেজো সাহিত্য এসব ব্যাপারে অব্যর্থ অস্ত্রের মতো কাজ করে। তাই একে প্রচার সাহিত্যও বলা হয়। তবে আহমদ শরীফ মনে করেন–

ক. কেজো সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য নয়।
খ. কেজো সাহিত্য নিতান্ত কেজো বলেই মহৎ নয়।
গ. কেজো সাহিত্য সৃষ্টি করাই কারো ব্রত হওয়া উচিত নয়।

সুতরাং কেজো সাহিত্যও প্রকৃত আদর্শ সাহিত্য বা উৎকর্ষের মানদণ্ড হতে পারে না। 'যে-কারণে ফটো চিত্রকলা নয়, নক্সা সাহিত্য নয়, সে-কারণেই কেজো সাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়' (শরীফ, ২০১০:৯)। উত্তীর্ণ বা ব্যর্থ শিল্পের নিয়ামক সেই কারণগুলো ব্যাখ্যা করে কেজো সাহিত্যের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করেছেন আহমদ শরীফ–

> কেজো সাহিত্যের বড় দোষ তার স্থূলতা ও বাস্তবানুরক্তি। আমরা এ-কথা হয়তো সবাই মানি যে প্রত্যক্ষকে পরোক্ষ করে তোলা এবং খণ্ড, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছকে সমগ্রতার মর্যাদা ও গুরুত্ব দানই সাহিত্যের কাজ। কাজেই জীবনের রোজনামচা যেমন জীবন নয়, সত্যকথার পদ্যরূপ যেমন সাহিত্য নয়, তেমনি কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজন-মিটানো স্থূলতা এবং সাময়িকতাও অকেজো

সাহিত্যের অবলম্বন হতে পারে না। কেননা অকেজো সাহিত্য যে-মনের খোরাক, তার সম্পর্ক পরিবেষ্টনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ নয়– পরোক্ষ। (শরীফ, ২০১০:৯)

আহমদ শরীফ কেজো-অকেজো উভয় সাহিত্যের স্বকীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন- 'কেজো সাহিত্য বেগুন-ক্ষেত আর অকেজো সাহিত্য ফুলবাগান'– অর্থাৎ দুটির-ই প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে অকেজো সাহিত্য হতেই পারে না (শরীফ, ২০১০:৯-১০)।

সাহিত্যে নানা বিভাজন সমর্থন না করলেও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে আহমদ শরীফ সাহিত্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার চিহ্নিত করেছেন 'সাহিত্যের দ্বিতত্ত্ব' প্রবন্ধে, যদিও এসব বিভাজন বা প্রকার নতুন নয়। এগুলো উপযোগ, সৌন্দর্য, স্বাতন্ত্র্য, আদর্শ ইত্যাদি মূলে পৃথক। কেজো ও কলাবাদী সাহিত্য, জাতীয় ও বিজাতীয় সাহিত্য, বুর্জোয়া ও গণসাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন নাম ও বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত সাহিত্য থাকলেও সাহিত্যে সর্বোপরি মানবিকতাই কাম্য, মানুষই বিবেচ্য। সাহিত্যের রূপভেদ যা-ই হোক না কেন, মানবিক বোধ ও আদর্শচেতনাই স্বার্থবুদ্ধির প্রভাবযুক্ত মন ও মননের ভিন্নতায় সমানুভূতির অনুপ্রেরণা হতে পারে। আমাদের সমাজ বুর্জোয়া সাহিত্যের আনন্দোপকরণে মুগ্ধ কিংবা গণমানুষের সংগ্রামী সাহিত্যে প্রবুদ্ধ থাকতে পারে, তবে ভিন্নতা থাকলেও সাহিত্যের দুই রূপই রসময়– একটি উপভোগের জন্য অপরটি উপলব্ধির। আহমদ শরীফের ভাষায়–

> সাহিত্যাদি কলায় সুন্দরের অনুধ্যান ও আনন্দের অভিব্যক্তি যেমন থাকবে; হাভাতের হাহাকার, আর্তের চিৎকার, বঞ্চিতের অভিশাপ, নির্যাতিতের ক্ষোভ, শোষিতের সংগ্রামী কণ্ঠও তেমনি ধ্বনিময় হয়ে উঠবে। কাজেই বুর্জোয়ার আনন্দের সাহিত্যের পাশাপাশি পরাধীন নির্যাতিত শোষিত মানুষের বেদনা, বিক্ষোভ ও সংগ্রামের সাহিত্যও থাকবে। (শরীফ, ২০১০:৫৩১)

সাহিত্য কেন বা কখন প্রয়োজন, জীবনের জন্য সাহিত্যের অপরিহার্যতা কতখানি– এসব প্রশ্নেও আহমদ শরীফ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন অনেকটা আত্মজিজ্ঞাসার স্বগতোক্তির মতো। আহমদ শরীফের মতে, সাহিত্যের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বাস্তবজীবনের সাথে নয়, মনোজগতের সাথে সম্পর্কিত। বাস্তব সত্য যেমন সত্য আবার ভাবসত্যও সত্য– অনুভবের সত্য। মানুষের মনোজগত সেই ভাবসত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না বলেই কল্পনার মাধ্যমে তা সাহিত্যে রূপ পায়। অর্থাৎ সাহিত্য ব্যবহারিক প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে না ঠিক তবে ব্যবহারিক জীবনের উর্ধ্বে যে প্রয়োজনে মানুষ আজও মহৎ সাহিত্য ও সাহিত্যিককে মনে রেখেছে তা অস্বীকার করতে পারে না। আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> এক হিসেবে সাহিত্য-মাত্রেই অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর। কারণ সাহিত্য হচ্ছে মূলত ভাবলব্ধ সত্য– অনুভূতি ব্যতিরেকে বাস্তবে প্রতিচ্ছবি পাওয়া অসম্ভব এবং সাহিত্য কোনো বাস্তব-প্রয়োজন প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধ করে না। আর এক হিসেবে সাহিত্য– মনুষ্য জীবনে অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য। যে প্রেরণায় যে অব্যক্ত প্রয়োজনে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, সে-প্রয়োজন পরিহার করে চলা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন, কালিদাস, ভবভূতি, ব্যাস, বাল্মীকি, ফেরদৌসী-রুমী-জামীকে স্মরণে রেখেছি, তাঁদের রচনা পড়ে চলেছি– তা-ই আমাদের প্রয়োজনের যথেষ্ট প্রমাণ নয় কী? (শরীফ, ২০১০:৪৪)

৩.৩.৪

চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা যাঁর আরাধ্য সেই আহমদ শরীফের চেতনায় 'আদর্শের আনুগত্য' অসহ্য হতে বাধ্য। মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে তা পরিহার করে চলাই আবশ্যক। বাস্তবে কাজে লাগলেও প্রচার সাহিত্য বা কোজো সাহিত্যে এই সুযোগ সীমিত। কারণ আদর্শানুগত্য স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করে। আহমদ শরীফের ভাষায়–

> আদর্শানুগত্য মহৎ সৃষ্টির তো বটেই, ভালো সৃষ্টিরও পরিপন্থী। মন যাঁর মুক্ত নয়, চিন্তা তাঁর স্বাধীন হতে পারে না। আর স্বাধীন চিন্তা যেখানে অসম্ভব, সেখানে অনুভূতি খণ্ড আর উপলব্ধি পঙ্গু হবেই। কাজেই তাঁকে সত্য, সমগ্র ও সুন্দর ধরা দেয় না। তেমন লেখক, জাতীয় কবি হতে পারেন, সমাজ-দরদী ঔপন্যাসিক হতে পারেন, জনপ্রিয় মনীষীও হতে বাধা নেই, কিন্তু মানুষের

> আত্মিক মিলন-ময়দানে তাঁর স্বীকৃতি নেই– সেখানে তিনি অচেনা– অবাঞ্ছিতও। পারিবারিক জীবনে ব্যক্তিক স্বার্থচেতনা যেমন পরিবারের অশান্তি ও বিপর্যয় ঘটায়, তেমনি স্বাজাত্য ও স্বারাষ্ট্রবোধ দেশে দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত জিইয়ে রাখে। আজকের দুনিয়ার বারো আনা দুঃখের উৎস এটিই। (শরীফ, ২০১০:১০)

তাছাড়া আদর্শ বিকৃতির ভয়ে উপলব্ধির সত্য প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। জাতীয় নয় আন্তর্জাতিকতাই এ যুগের সাধনা কারণ পৃথিবীর মানুষের রাজ্য-গোত্র-সীমা ও নানা ভৌগোলিক বাধা উঠে যাচ্ছে; সকল বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নিয়েই পৃথিবী এক ও অখণ্ড। তাই প্রগতির সকল বাধা দূর করাই আধুনিক মানুষের সাধনা হওয়া উচিত। আদর্শবাদীদের মতো, মনের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাতে আত্মপ্রতারণা থাকে। আদর্শানুগত্য সাহিত্য একদিকে যেমন কাজে লাগার প্রয়োজনানুসারে কেজো সাহিত্য সৃষ্টি করে, যার অপর নাম প্রচার সাহিত্য; আবার চিন্তার স্বাধীনতাহরণকারী প্রগতিবিমুখতাও পুষ্ট করে।

কিন্তু আদর্শানুগত্য পরিহার করার অর্থ আদর্শহীনতা নয়। জনচিত্ত ও সমাজমানসে প্রভাব বিস্তার করে দেশকে দিশা দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হয় মহৎ সাহিত্যের। তাই আদর্শ প্রতিফলিত হবে পরোক্ষে, শিল্পকে অক্ষুণ্ণ রেখে। বিক্ষোভজাত উচ্ছ্বাস সংযম ও রসদৃষ্টি ব্যহত করে, ফলে তা সার্থক সৃষ্টির জন্য ক্ষতিকর। এধরনের সৃষ্টি হয় গীতাত্মক বা বিবৃতিধর্মী। সার্থক সৃষ্টির জন্য শান্ত, সমাহিত অথচ সহানুভূতি ও সংবেদনশীল মনোভঙ্গির প্রয়োজন। পরিমিত দূর থেকে বা উপর থেকে দেখার মাধ্যমে বস্তু বা ঘটনার সামগ্রিক রূপ দৃষ্টিগোচর হয়।
মানুষের মনোজগতের শ্রান্তি মনুষ্যজাতির জন্য বড় সঙ্কট। এই অস্থিরতা, অতৃপ্তি, অস্বস্তি সবমিলিয়ে যে এক নৈরাশ্যবাদী পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তা থেকে মানুষকে মুক্ত করে আশাবাদ জাগাতে হবে। কারণ–

> সাহিত্য শুধু জনচিত্তের বিশ্লেষণ করবে না, প্রচলিত সমাজ-চিত্র দেবে না, সমাজকে নিয়ন্ত্রিতও করবে, দিশাও দেবে পরোক্ষভাবে, প্রভাবিত করবে অতি সন্তর্পণে। কিন্তু তাই বলে উগ্র ও প্রত্যক্ষ আদর্শবাদ থাকবে না। এটুকু আদর্শবাদ ও রোমান্টিকতা প্রচ্ছন্ন না থাকলে, সাহিত্যের উদ্দেশই যাবে ব্যর্থ হয়ে। কেননা শুধু বাস্তব দিয়ে চিত্র হতে পারে, শিল্প হবে না। রচনায় শিল্পীর মনের রঙ-রস ও চিন্তা মেশাতেই হবে। কিন্তু কোনো আদর্শবাদই জৈবধর্ম বা প্রাণধর্ম বা পরিবেশের প্রতিকূল হলে চলবে না। তথাপি এ যুগে লেখকদের হতে হবে জীবন-শিল্পী। আদর্শবাদ থাকবে প্রচ্ছন্ন। মহৎ সৃষ্টির এ-ই লক্ষণ।
> (শরীফ, ২০১০:২০)

শিল্পীর স্বাধীনতা যাতে কোনোভাবে লঙ্ঘিত না হয় সার্থক সাহিত্য-পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এটি প্রধান শর্ত। লেখকের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সাহিত্য সৃষ্টির উৎসমুখ আখ্যা দিয়ে আহমদ শরীফ স্বাধীনতাকে সাহিত্যের জন্য আবশ্যক গণ্য করেছেন। তাঁর মতে যা রসায়ত্ত, যা অন্যজনকে প্রভাবিত করে তা যে মতেরই হোক না কেন টিকে থাকবে। ‘সাহিত্যে আদর্শবাদ বা অর্ডিন্যান্স’ প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি–

> সাহিত্যিকের সৃষ্টির মূলে রয়েছে একাগ্র ধ্যান, অবিচলিত নিষ্ঠা, একান্ত বিশ্বাস এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। মনন ও প্রকাশের স্বাধীনতা জীবনের অন্যক্ষেত্রে স্বীকৃত না হলেও হয়তো তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই-ই হচ্ছে সৃষ্টির উৎসমুখ। এই স্বাধীনতা যদি না থাকে, তবে সাহিত্য-সৃষ্টি অসম্ভব।.... সেজন্যেই সাহিত্যে যে-কোন মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং বিশেষ আবশ্যক–তা ঈশ্বরবাদ হোক, অথবা ব্যক্তিবাদ, সমাজবাদ, রাষ্ট্রবাদ বা ধর্মবাদ হোক! এর মধ্যে যা রসায়ত্ত, যা সাহিত্য তা টিকে থাকবে, অন্য দশজনকে প্রভাবিতও করবে; যা নিঃসার তা যাবে–আবর্জনার মতোই লোকচক্ষুর আড়ালে ঢাকা পড়বে, তার জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কারো নিজের বিশ্বাস ও খেয়ালখুশিমতো বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানবকে কোনো বিশেষ নিয়ম-নিগড়ে বাঁধতে যাওয়া শুধু বাতুলতা নয়, অদূরদর্শিতা এবং মুর্খতাও বটে। (শরীফ, ২০১০:৪৬-৪৭)

মানুষের মনোজীবনে সুপ্ত অবস্থায় থাকা মানবিক-বোধকে বলা হয় মৌল মানবিকতা–মনুষ্যত্ব যার ফল। দেশ, কাল ও জাতিচেতনার ঊর্ধ্বে সর্বমানবিক এই বোধ মানুষকে করে জীবনরসিক, খণ্ডকে সমগ্ররূপে দেখতে শিখায়, আনন্দ আর সুন্দরকে উপাদান বা স্তর নির্বিশেষে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত উপলব্ধি করে, সর্বোপরি পৃথিবীকে ভালবেসে ভালবাসা আর প্রেমধর্ম দিয়ে জীবনকে উপভোগ করে। তাই মহৎ সাহিত্যিককে হতে হয় জীবনরসিক। তাঁর লক্ষ্য

ও ব্রত জগত ও জীবন সম্পর্কে এক সূক্ষ্ম অনুভূতি ও উপলব্ধির স্তরে উপনীত হওয়া। আদর্শের অনুগত না থেকেও মহৎ আদর্শ রূপায়ণে, সৌন্দর্যান্বেষী হয়েও সামাজিক দায়িত্ব উপেক্ষা না করে, বাস্তবসত্য ও ভাবসত্য উভয়কে স্বীকৃতি দিয়ে, আত্মোন্নয়নের মধ্য দিয়েই দেশ-কাল-জাতিচেতনার উর্ধ্বে উঠে সর্বমানবিকতার সমগ্রকে রূপায়িত করার মাধ্যমে প্রকৃত মহৎ সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩.৩.৫

মধ্যযুগের বাংলাসহিত্য, বিশেষত মুসলিমরচিত সাহিত্য নিয়ে আহমদ শরীফ গবেষণায় ব্রতী হন পিতৃব্য আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের মানসাভিযাত্রার পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে।[৭৫] এই গবেষণায় মনোনিবেশ করেই তিনি ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ও কৃতী শিক্ষক হয়েও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস ও দর্শন।[৭৬] ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা থেকেই *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের স্বচিন্তিত যুগবিভাগ পেশ করেছেন। প্রথাগতভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ এই তিনভাগে বর্ণনা করার কারণ ও ভিত্তি, আহমদ শরীফের মতে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নিহিত। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও মুখ্যত রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফল। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর বা রূপান্তর কিংবা বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য কোনো-না-কোনোভাবে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রভাবজাত। যেমন- প্রাচীন যুগ বলে চিহ্নিত মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন আমল প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন শাসনামল নয়, সবদিক থেকেই আলাদা। গুপ্ত ও সেনরা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী, পালেরা ছিল বৌদ্ধ, মৌর্যরা ছিল বৌদ্ধ। তাদের আদি বাসস্থান ও রাজ্যও অভিন্ন ছিল না। আবার গুপ্তরা ছিল উত্তর প্রদেশাগত, সেনরা এসেছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে, মৌর্যরা ছিল মগধের। ফলে প্রাচীন যুগেই বাংলায় এসে মিশেছিল ভিন্ন ভিন্ন ভাষা,ধর্ম ও সংস্কৃতি। এভাবে মধ্যযুগ চিহ্নিত হয়েছে তুর্কি বিজয়ের কাল থেকে তথা বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রভাবে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপ থেকে। আধুনিক কালকেও চিহ্নিত করা হয়েছে পলাশী যুদ্ধে বিজয়ী ব্রিটিশ শক্তির ঔপনিবেশিক শাসনের কাল থেকে। বাংলার রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসকে বিবেচনায় নিলে কতিপয় লক্ষণীয় দিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার্য। যেমন–

- আধুনিক ভৌগোলিক বাংলা কোনো এক নামে পরিচিত ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলের নাম ছিল ভিন্ন, ছিল গোত্রীয় শাসন।
- জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যমত গ্রহণের পূর্বে আধুনিক অর্থে কোনো ধর্ম এখানে ছিল না।
- বাঙালি সবসময়ই ছিল বিদেশিশাসিত, পরাধীন, নির্জিত। সার্বভৌম স্বশাসন বা বাঙালি রাজার কোনো নিশ্চিত অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। শশাঙ্ক-গোপাল-দিব্যকদেরকে নিশ্চিত বাঙালি বলা যায় না। তবে ইতিহাসে তারাই একমাত্র বাঙালি বলে কথিত স্বাধীন রাজা।
- মৌর্য যুগ থেকে সেন আমল পর্যন্ত জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের পীড়নে বৌদ্ধদের সাম্য ও নির্বাণের সমাজ বর্ণাশ্রম প্রথায় রূপান্তরিত হয়। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার মানবিক অধিকারসমূহ অস্বীকৃত হয়। উত্তর ভারত অর্থাৎ আর্যাবর্ত থেকে আর্যব্রাহ্মণ কৌলিন্য প্রথার প্রচলন হয় বাংলায়। সর্বত্র যে গণ-অধিকার প্রচলিত ছিল তা প্রশাসনিকভাবে অপহৃত হয়।
- বাঙলাদেশ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহিত্য-চৈত্য-আচার-অনুষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল সেন আমলে। তবু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রে আচার-অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র-দেহতত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে দৃঢ়মূল হয়ে রইল লৌকিক দেবতার সংস্কারের মধ্য দিয়ে। অভিজাতরা অনেক লৌকিক দেবতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেছিল পৌরাণিক শ্রেষ্ঠত্বের চাতুর্যের মধ্য দিয়ে। তাই বাংলায় সব দেবতারই দুই রূপ– লৌকিক ও পৌরাণিক। তুর্কি বিজয়ের মাধ্যমে এই লৌকিক দেবতাই পূর্ণ উদ্যমে

স্বমহিমা-মাহাত্ম্য নিয়ে ফিরে এসেছিল গান-পাঁচালি-গাথায়। মধ্যযুগের বাংলায় লৌকিক ও লিখিত সাহিত্যের উদ্ভব এখান থেকেই।

কিন্তু আহমদ শরীফ লিখিত ভাষার প্রাচীন নিদর্শন ধরেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যুগবিভাগ ও যুগান্তর নিরূপণ করেছেন। তবে যুগবিভাগের ক্ষেত্রে আহমদ শরীফের এই প্রতিপাদ্য গুরুত্বপূর্ণ যে 'যে কোন সাহিত্যেরই– বাঙলা সাহিত্যেরও দেয়ালতোলা যুগবিভাগ সম্ভবও নয়, স্বাভাবিকও নয়, এমন কি বাঞ্ছিতও নয়' (শরীফ, ১৯৭৮:১৯১)। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের পরিচয় নিতে হলে রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে বাঙালির মুখের ভাষার পরিচয় নিতে হবে ভাষার বিবর্তন-ধারা থেকেই তা বোঝা যায়। রাজনৈতিক ইতিহাস এর সহযোগী হতে পারে, তবে লিখিত আকারের সাহিত্যই প্রধানত বিবেচ্য। আহমদ শরীফ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছেন–

এক. আমাদের সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে প্রাচীন অস্ট্রিক-মঙ্গোলীয় সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রভিত্তিক দেবতা ও তত্ত্ব, জীবনচেতনা, জগৎভাবনা ও আচারপার্বণ বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য আবরণে স্থানিক ও কালিক রূপান্তরে আজো বিদ্যমান। তাই বাঙলা সাহিত্য আলোচনায় বৌদ্ধপ্রভাব ও তার গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সে-পথে পথিকৃৎ।[৭৭] (শরীফ, ১৯৭৮:৩৮)

দুই. লিখিত পালি-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠের শৌরসেনী প্রাকৃতভিত্তিক। কাজেই কাহ্নপা-সরহ-শান্তির দোঁহা কিংবা চর্যাগীতি এবং আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় লিখিত বাঙলা মাগধী প্রাকৃত-অবহট্‌ঠও বিবর্তিত রূপ নয়, বরং শৌরসেনী প্রাকৃত-অবহট্‌ঠের অনুকৃত রূপ। (শরীফ, ১৯৭৮:১৯২)

ধর্মমত প্রচারের বা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোনো বুলিই লেখা-সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। সে হিসেবে বৌদ্ধ ও জৈন মত প্রচারের বাহনরূপেই প্রথম দুটো বুলি– 'পালি' ও 'প্রাকৃত' সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। এরপর অনেককাল ভাষায় কোনো ধর্ম বা প্রশাসনিক প্রয়োজনের ছাপ অঙ্কিত হয়নি। তাই বাংলায় বৌদ্ধ-জৈন ভাবান্দোলনকে শুধু ধর্মীয় নয়, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাথেও তুলনা করা যায়।

সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত কোনো স্ব-উদ্ভাবিত তত্ত্ব আহমদ শরীফের নেই, কেবল ইতিহাস বর্ণনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও করণকৌশল আছে। ইতিহাস-তত্ত্ব তাঁকে আকৃষ্ট ও ভাবিত করেছিল তাঁর প্রমাণও পাওয়া যায়। ইতিহাস রচনায় তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রয়েছে *কালিক ভাবনা* গ্রন্থভুক্ত 'ইতিহাস-তত্ত্ব', *গণতন্ত্র সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা* গ্রন্থভুক্ত 'ইতিহাস কী' ইত্যাদি প্রবন্ধে। 'মানুষের চিন্তা-ভাবনার কিংবা কর্মপ্রয়াসের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের বা ক্রমবিবর্তন ধারার তথ্যই ইতিহাস' (শরীফ, ১৯৭৪:২১)–একথা বললেও আহমদ শরীফ ইতিহাসকে শুধু তথ্যের সংকলন বা পরিসংখ্যান মনে করেন না, তাঁর মতে ইতিহাসকে হতে হবে বিশ্বসংলগ্ন। ইতিহাস রচয়িতা ও পাঠকের যোগ্যতা সম্পর্কে আহমদ শরীফের প্রস্তাব সাহিত্যের ইতিহাস-তত্ত্বের জন্যও বিবেচ্য হতে পারে–

> ইতিহাস রচকের ও পাঠকের কেবল ইতিহাসজ্ঞ হলেই চলবে না। তাঁকে আনুষঙ্গিক তথা প্রাসঙ্গিক বিষয়েও অবহিত থাকতে হবে। কেবল সত্যসন্ধ ও তথ্যপ্রিয় হলেই ইতিহাস পড়ার বা লেখার যোগ্যতা বর্তাবে না, সে সঙ্গে তাঁকে দেশকালগত সামাজিক, ধার্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আর্থিক, প্রশাসনিক চিন্তা-চেতনা এবং লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ও নৈতিক নিয়ম-রেওয়াজ সম্পর্কেও সচেতন থাকতে পারে। এককথায় সামগ্রিক জীবন প্রবাহের পটভূমিকায় সত্যসন্ধ তথ্যনিষ্ঠ প্রজ্ঞাবান ও কারণ-করণ বিশ্লেষণ-বুদ্ধি সম্পন্ন বিদ্বানই কেবল ইতিহাস রচনার ও আলোচনার যোগ্য। তেমন মানুষই শুধু ইতিহাস পাঠের ফলশ্রুতি মানবিক সমস্যার সমাধানে সুপ্রয়োগ করতে পারেন। (শরীফ, ১৯৭৪:২২-২৩)

উপর্যুক্ত চিন্তার মতই 'সমন্বয়ী ভাবনার ফসল' আহমদ শরীফের দুই খণ্ডে রচিত *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। যদিও তা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগেই নিবদ্ধ তথাপি–

> উদারপন্থা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ প্রকাশ এই রচনা। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-গোষ্ঠী নির্বিশেষে বঙ্গভূমিতে বসবাসকারী সকল বাংলাভাষীই বাঙালি। এই সর্ববাঙালির রসানুভূতি, মনোভাবনা, আবেগ ও মননচিন্তার শিল্পিত ভাষারূপই বাংলা সাহিত্য। (কবির, ২০১৩:৭৮)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মতো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যও যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালির মিলিত সাহিত্য তা স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেয় *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য*। এই তাৎপর্যে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে এটিই 'পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ ইতিহাস' (কবির, ২০১৩:৭৮)।

আহমদ শরীফ বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাজনের ক্ষেত্রে মধ্যযুগকেই নিবিড়ভাবে বিন্যাস্ত করেছেন। এ সূত্রে তিনি পূর্বসূরীদের মতো ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান এবং নৃতাত্ত্বিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অন্যান্য উপাদানের সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের যুগবিভাগের ধারায়[৭৮] তিনিও প্রাক-তুর্কীবিজয়ের কালকে প্রাচীনযুগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন ক্ষমতা দখলকে আধুনিক যুগের সূচনা ধরে নিয়ে মধ্যবর্তী সময়কে স্বকীয় ধারায় নিম্নবর্ণিতভাবে বিন্যাস্ত করেছেন–

প্রথম যুগ : ১৩-১৪ শতক– সৃজ্যমান লোকায়ত সাহিত্যের কথকতার যুগ
দ্বিতীয় যুগ : ১৫ শতক– লিখিত লৌকিক দেবসাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের যুগ
তৃতীয় যুগ : ১৬ শতক– ভাব-বিপ্লব যুগ বা রেনেসাঁস যুগ
চতুর্থ যুগ : ১৭ শতক– লোকায়ত পীর-দেবতাদের যুগ
পঞ্চম যুগ : ১৮ শতক– অবক্ষয় যুগ (১৭৬০-১৮২০)

বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত যুগবিভাগে 'অন্ধকারযুগ' বলে কথিত দেড়-দুইশ বছরে বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে আহমদ শরীফের মনে হয়েছে– 'চর্যাগীতি যে বাঙলা এ বিশ্বাস থেকেই সাহিত্যে 'তামস যুগ' এর উদ্ভব' (শরীফ, ২০১০:৮২)। চর্যাপদের কাল থেকে মধ্যযুগে, মুসলিম শাসনের কালে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত, সময়ের হিসেবে যা প্রায় একশ পঞ্চাশ বছর, বাংলা ভাষায় কোনকিছু রচিত না হওয়ার কালকে 'তামস যুগ' নামে অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য, এ সময়ে তুর্কি শাসন বাংলায় বিস্তার লাভ করে বলে একশ্রেণির ঐতিহাসিক এই শূন্যতার জন্য তুর্কি শাসকদের অত্যাচার-নিপীড়নকে দায়ী করেন। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তথ্য নিয়ে আহমদ শরীফ প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, ঐতিহাসিকদের এই প্রচারণা ইতিহাসের অপব্যাখ্যা এবং বিভ্রান্তিকর, সাম্প্রদায়িকও বটে।[৭৯] প্রকৃত সত্য এই যে, বাংলাভাষার গঠন যুগ তথা স্বরূপ প্রাপ্তির যুগ তেরো-চৌদ্দ শতক; তার আগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার রেওয়াজই ছিল না। এই প্রতিপাদ্য প্রমাণে আহমদ শরীফ দুদিক থেকে তার যুক্তি ও প্রমাণ-অনুমান সাজিয়েছেন–

প্রথমত– তুর্কি পীড়নের ইতিহাস মেনে নিলেও, সময় বা অঞ্চলের দিক থেকে তুর্কি শাসনের বাইরে হিন্দু রচিত সাহিত্য না-থাকার যুক্তি?

দ্বিতীয়ত – আবার দেশজ বাঙালি মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাংলা তবু দুশো বছরে বাংলায় কোনো সাহিত্যের নিদর্শন না-থাকার যুক্তি?

এই সবকিছু একটি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে, চর্যাগীতি রচনার কাল, খ্রিস্টীয় সাত থেকে এগারো সালে বা মতভিন্নতায়[৮০] বারোশ সালে বাংলা ভাষার কোনো লিখিত রূপ ছিল না, ছিল মাগধী প্রাকৃতের ও শৌরসেনীর। তাই এ সময় বাংলাভাষায় রচিত কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন দলিল ‘চর্যাপদ’[৮১] সম্পর্কে আহমদ শরীফ তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন ‘বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়াচিত্র’ নামক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য প্রবন্ধে। তিনি অনুমান করেন, ‘চর্যাগীতি লিখিত রচনাও নয়, বাঙলাও নয়– অর্বাচীন গৌড়ী-মাগধী অবহট্‌ঠ এবং মৌখিক রচনা’ (শরীফ, ২০১০:৮৩)। এই অনুমানের পেছনে আহমদ শরীফ বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন-এর উল্লেখে জানিয়েছেন যে, চর্যাগীতির উপর অসমীয়ার দাবিও অযৌক্তিক নয়, কারণ ষোড়শ শতক অবধি বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় বিশেষ তফাত ছিল না। তবে অধিকাংশ চর্যাগীতি বাংলাদেশের আবহে এবং বাঙালির রচিত তাতে সন্দেহ নেই।

তবে লিখিত সাহিত্যের অনেক আগে থেকেই গাথা, ছড়া, প্রবাদ, ডাক ও খনার বচন, উপকথা, রূপকথা, ব্রতকথা ইত্যাদি মুখে মুখে প্রচলিত ছিল– আঞ্চলিক বা গোত্রীয় ভাষায়। মূলত সব বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও শিল্প-সংস্কৃতির জন্ম হয় আঞ্চলিক প্রতিবেশপ্রসূত জীবন-চেতনাও জীবিকাপদ্ধতি থেকেই। তাই বৈষয়িক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবিকা পদ্ধতি এবং পরিবেষ্টনীজাত ভূয়োদর্শন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রবাদ-প্রবচনাদি আপ্তবাক্যের এবং শৈল্পিক সুষমার। (শরীফ, ২০১০:৪৩০)

৩.৩.৬

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আহমদ শরীফের বিপুল সৃষ্টিকর্ম পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অসম্পূর্ণ স্বপ্নপুরণের শ্রমসাধ্য অভিযাত্রা।[৮২] ‘প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষণায় তার সাফল্য কিংবদন্তীতুল্য’ (বিশ্বজিৎ, ২০০১:২১৪)। বাংলাভাষী বিদ্বজ্জনের নিকট আহমদ শরীফের এই স্বীকৃতি একাধারে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও পেশাগত প্রয়োজনের সঙ্গে তাঁর আশৈশব দীক্ষা ও দক্ষতার ফল। পুথির পাঠোদ্ধারে সহজাত মমতা ও ক্ষমতা এবং গভীর ঐতিহ্যপ্রীতি থেকে তিনি অর্জন করেছেন এ সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গবেষকের খ্যাতি। তাঁর গবেষণা ও সৃষ্টিশীল প্রবন্ধের সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে আছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদান। বাঙালির সামাজিক ও রাজনীতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও আহমদ শরীফ মধ্যযুগের মুসলিম সমাজ ও শাসকগোষ্ঠীর সময়কেই প্রধানত আলোচনায় গ্রহণ করেছিলেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তুর্কি প্রভাবের তিনটি অবদান চিহ্নিত করেছেন আহমদ শরীফ। এগুলো নিম্নরূপ–

এক. বাংলায় লৌকিক ও পৌরাণিক দেবতা বিষয়ে বাংলা ভাষায় মৌখিক ও লিখিত সাহিত্য সৃষ্টি শুরু। উদারহণ– বড়ুচণ্ডীদাস, মালাধর বসু, কানাহরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই ইত্যাদি রচনা।

দুই. নতুন শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রতিবেশে হিন্দু-মনে নতুন জীবন-স্বপ্নের উন্মেষ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সমাজের সংস্কার প্রয়াস। উদাহরণ– কোরান-পুরাণ-শাস্ত্র-সংহিতার অনুবাদ।

তিন. উত্তরভারতিক সন্তধর্মের অনুকরণে-অনুসরণে-পরিবর্তনে-মৌলিকত্বে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা। উদাহরণ– রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, চরিতসাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী।

ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বিধর্মী-বিজাতীয় একেশ্বরবাদীদের প্রভাবে বাংলার ভাবজগতে পরিবর্তনসূচিত হয়। সেন আমলের অবসানে কঠোর ব্রাহ্মণ্যশাসনের বর্ণবাদী জাতাকলে পিষ্ট শোষিত-পীড়িত-নির্জিত-নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে শাস্ত্রী-সমাজপতিদের ভীতির কারণে শাস্ত্র-ধর্মাচারের বিধিনিষেধ উবে যেতে থাকে। এই মানসমুক্তিই ছিল সময়ের সবচেয়ে বড় বিপ্লব। তুর্কি আধিপত্যের আগে, শাস্ত্র-সাহিত্য-দর্শন-পুরাণাদি সর্ব প্রকার বিদ্যা বা জ্ঞানচর্চার মাধ্যম ছিল–এক কথায় শিক্ষিত লোকের ভাষা ছিল সংস্কৃত। কাজেই, ‘বৈদিক-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ হয়ে আসা বাঙলা বুলি যে সাহিত্যের ভাষা হওয়ার যোগ্য বা তাকে সাহিত্য-শিল্পেরও

বাহন করা বাঞ্ছনীয়, তা সেকালের [প্রাক-তুর্কি তথা সেন আমল] কোন শিক্ষিত লোকের মনে জাগেনি' (শরীফ, ২০১০ক:১৮৪)। ফলে বাংলার আনাচে-কানাচে ফিরে আসে লৌকিক দেবতার আরাধনা, রচিত হতে থাকে দেবতামঙ্গল ও পাঁচালী। মধ্যযুগে লিখিত বাংলার আগে বিলীয়মান বৌদ্ধ দেবগাথাগুলোই মুখে মুখে পাঁচালিতে রূপ লাভ করেছিল। এ সময়ে লিখিত বাংলা সাহিত্যের সর্বজনস্বীকৃত আদি নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য, যার রচনাকাল আনুমানিক চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ বা পনের শতকের প্রথমার্ধ। যদিও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের তথ্য ও অনুমান থেকে শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা'কে আদি বাংলা কাব্য হিসেবে দ্বিধান্বিত উল্লেখ আহমদ শরীফের মন্তব্যে পাওয়া যায়; তথাপি ভাষার প্রাচীনত্বের কারণে আহমদ শরীফের স্বীকৃতি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দিকেই তা বোঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা ছন্দোবদ্ধ হয়েছে তা মহাভারতের নয়, আভীর জাতির লোকগাথার নায়ক কৃষ্ণ কালে লোকস্মৃতিতে মহাভারতের কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পৌরাণিক আদলে লৌকিক প্রণয়কাহিনী। এরপর মধ্যযুগে আমরা পাই আধুনিক বাঙালি হিন্দুর সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মননের উৎস কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী। ব্যক্তিজীবনের ভয়-ভরসা সম্পর্কিত লৌকিক দেবতার কৃপা-রোষ বিষয়ক পাঁচালিগুলি সভ্যতা-সংস্কৃতির, জীবনোৎকর্ষের কোনো প্রগতি বা সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারেনি, কোনো উন্নততর সংস্কৃতি বা জীবনবোধের বাহনও এগুলি নয়, বরং 'পুরোনো বিশ্বাস সংস্কারের ক্ষতিকর লালনের সহায়ক' (শরীফ, ২০১০ক:১৮২)। তবু এ সময়েই প্রথম মৌখিক 'বুলি'র বাংলা ভাষা পেল সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠার কৃতিত্ব ও গৌরব। শাস্ত্রগ্রন্থ ও বিদেশি প্রণয়োপাখ্যানের অনুবাদ, পাঁচালি, মঙ্গলকাব্য, পুরাণসহ সবধরণের সাহিত্যই হাজার বছরের শোষিত-নির্জিত-পীড়িত-বঞ্চিত নিম্নবর্ণের অচ্ছুৎ হিন্দু বা আতরাফ শ্রেণির ধর্মান্তরিত মুসলমান, যাদেরকে আহমদ শরীফ দেশজ বাঙালি মুসলমান[৮৩] বলে চিহ্নিত করেছেন, তাদের কথকতা-গানে-চর্চায় স্থান করে নেওয়ায় শুরু হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনকালীন নবপর্যায়।

এখান থেকেই উদ্ভূত হয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে আহমদ শরীফের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য, যার মূল কথা– মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যই বাংলাভাষার প্রথম 'জনসাহিত্য বা জনতার সাহিত্য'। 'সাহিত্য ও জনতা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ এর কারণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, এই সাহিত্যের মান ছিল নীচু, তাই বোধগত ছিল অনেকেরই। তাছাড়া মধ্যযুগে শিষ্টসাহিত্য আর লোকসাহিত্যের শ্রোতায়-কথকে তেমন পার্থক্য ছিল না। ১৮১৮ সালে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশনা ও তজ্জাত নতুন শহুরে জীবনচেতনা বাঙালিকে সাহিত্যক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছিল। মানুষ শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম্য-শহুরে, নতুন ও পুরোনো– এই দুই শ্রেণিতে ভাগই করল না কেবল মধ্যখানে তুলে দিল বিচ্ছিন্নতার চিরস্থায়ী প্রাচীর, অপরিচয়ের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আর অনাত্মীয়ের দুস্তর ব্যবধান। তাই আজো যারা শহুরে তারাই সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্য ও লোক সাহিত্যে বিভাজিত করে। নিরক্ষর, নিম্নমানের আর্থিক অবস্থানের, অমার্জিত রুচির ও বুদ্ধির প্রাকৃতজনকে 'লোক' আখ্যা দিয়ে তাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য রক্ষা করার বা চর্চা করার অভিপ্রায়ে যে নির্মমতা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন আহমদ শরীফ। নিজেদের শ্রেণি-অবস্থানের কারণে শহুরে সাহিত্যরসপিপাসুরা নিজেদের জন্য যা কামনা করে না, তা-ই দেখতে চান প্রাকৃতজনের 'লোক' হয়ে থাকার মধ্যে (শরীফ, ২০১১:৯৭,৯৮)।

এ বক্তব্য প্রামাণ্য যে, বাংলা ভাষা কখনও রাজ্যশাসনের ভাষার মর্যাদা না পাওয়ায় বাংলা সাহিত্য চিরকালই লৌকিক পুথি-পাঁচালির ওপর ভর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সেই মৌর্য শাসনামলেও যেমন 'প্রাকৃত' ছিল রাজ-দরবারের ভাষা তেমনি তুর্কি বা ঔপনিবেশিক আমলেও শতকরা নব্বইভাগেরও বেশি অধিবাসীর ভাষা বাংলা পায়নি রাজদরবার বা প্রশাসনের ভাষার মর্যাদা। উপরন্তু রাজশক্তি সবক্ষেত্রেই ভিন্নধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির অনপনেয় ছাপ গায়ে মেখে নিতে বাধ্য হয়েছে বাংলা ভাষাই। কিন্তু বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস সেই রাজশক্তির সাহিত্য-শিল্পবোধকে ধারণ করে দূরে ঠেলে দিয়েছে বাঙালির হাজার বছরের ভাষিক-সাহিত্যিক-শৈল্পিক

মনোজগতকে। আহমদ শরীফ সেই শোষিত, নির্জিত, পীড়িত মানুষের পরাজয়ের ইতিহাস থেকেই তাঁদের সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা করতে উৎসাহী। এক হিসেবে আহমদ শরীফ বর্ণিত এই ইতিহাসকে সাত-আট দশকের ইয়োরোপের র‍্যাডিকেল সামাজিক ইতিহাস রচয়িতাদের 'তল থেকে দেখা ইতিহাস'[৮৪] এর মতো বলা যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ রাজত্বকাল ১৩৩৯ সাল থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত স্বাধীন সুলতানি আমল। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ-এর মতো স্বাধীনচেতা ও সাহিত্যনুরাগী সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় চর্চা হয়েছিল বাংলাভাষায় পুরাণ-কোরাণ-শাস্ত্রের বঙ্গীয়রূপ। উত্তর ভারত থেকে আসা সুফিতত্ত্বের প্রভাবে ও চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় ভাবান্দোলন, আহমদ শরীফ যাকে 'বিপ্লব' ও 'বাংলার রেনেসাঁস' বলেছেন (শরীফ, ২০১০ক:১৮৬) সেই বৈষ্ণব মতাদর্শের প্রসার– বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা সর্বত্র। এই প্রথম চরিতসাহিত্য, বৈষ্ণব পদ ও গীতিকা প্রভৃতি সৃষ্টিসম্ভার বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ জুড়ে এক অভিন্ন ধর্মীয়-লৌকিক-ভাষিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলে।

এ-সময় উত্তর ভারতের আওয়াধী হিন্দি কাব্যচর্চার প্রভাবে বাংলায় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় একদিকে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলো অনূদিত হতে থাকে, অন্যদিকে রচিত হয় হিন্দুদের মঙ্গলকাব্যও। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ইসলামের একেশ্বরবাদ শোষিত-নির্বিত্ত-নিম্নবর্ণের অবজ্ঞেয় মানুষের মনে জাগিয়েছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আত্মমর্যাদার দাবি ও দ্রোহের সাহস। জন্মসূত্রের চেয়ে আত্মপরিচয়-আত্মশক্তি ও কর্মকুশলতায় জীবন-জীবিকা নির্বাহের এবং সামর্থ ও অভিপ্রায় অনুসারে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারের সম্ভাবনা উন্মুক্ত থাকার অনাস্বাদিতপূর্ব ব্যবস্থা মধ্যযুগের দেবদ্বিজনির্ভর সমাজের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ইসলামের প্রভাবে বর্ণহিন্দু শাস্ত্রী ও সমাজপতিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে লৌকিক দেবতার মাহাত্ম প্রচার করতে গিয়ে স্বল্প শিক্ষিত লোকেরাই বাংলাকে লেখ্যভাষায় রূপ দিতে থাকে। এ কারণে শাস্ত্রগ্রন্থে অনধিকার চর্চাপ্রসূত কুণ্ঠা ও ভীতির উদারহণও কম নয়। এ-সময়ে ইসলামের একেশ্বরবাদিতার প্রভাবের উদাহরণ মনসামঙ্গলের শৈবসাধক দ্রোহী চাঁদ বেনে, ধর্মমঙ্গলের ধর্ম-নিরঞ্জন (শরীফ, ২০১০:১৮৫)।

আহমদ শরীফের মতে, বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রতি প্রবল অবহেলা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের ঐতিহাসিক কারণ প্রথমে ব্রাহ্মণ্য শাসন, পরে মুসলিম শাসনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। বৈদিকযুগে সংস্কৃতের জাড্য চাপিয়ে দেয়া হয়। মুখের বুলিকে, যা ছিল মূলত শাস্ত্রানুবাদ বা তত্ত্বপ্রকাশ, সাহিত্যে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ বাংলা যাদের মুখের 'বুলি' সেই শূদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে বাংলা ভাষার বিকাশকে রহিত করা হয়। অতঃপর মুসলিম শাসনামলে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মুসলমান কবিগণ আধুনিক অর্থে বিশুদ্ধ-সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করলেও সেখানেও সংস্কৃতের স্থান দখল করে ফারসি ও হিন্দুস্তানি ভাষাই, বাংলা নয়। এ কারণে–

> সুলতান-সুবাদারের প্রবর্তনা সত্ত্বেও সাধারণভাবে অনেক কাল অভিজাতরা বাঙলাভাষার প্রতি বিরূপ ছিল। হয়তো 'বুলি' বলেই এ অবজ্ঞা। ফলে উনিশ শতকের আগে বাঙলা কোনদিন শক্তিমানের পরিচর্যা পায়নি, তাই অন্তত দশশতক থেকে বাঙলাভাষায় সৃষ্টিকর্ম শুরু হলেও তা সময়ের অনুপাতে অগ্রসর হতে পারেনি। শেক্সপিয়র যখন তাঁর অমর নাটকগুলো রচনা করছিলেন, তখন আমাদের ভাষায় মুকুন্দরাম ও সৈয়দ সুলতানই শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রতিভার অভাব হেতুই আমাদের হিন্দু-মুসলমানের রচনা পুচ্ছগ্রাহিতায় তুচ্ছ। (শরীফ, ২০১০:৩০৮)

কিন্তু বাঙালির গ্রহণ-আত্মীকরণ-দ্রোহের প্রকৃতিপ্রদত্ত 'বৈতসী'-ক্ষমতাবলে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর আদি মৈথুনতত্ত্বের বিকাশে সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র প্রভৃতির অনুশীলনে নানা ধর্মমতের চাপে-কর্ষণে এমনকি ইসলাম বরণ করেও তাঁদের সুপ্রাচীন প্রত্ন-কাঠামোর দেহাত্মবাদী, নিরীশ্বর ও ঐহিকতাবাদী বিশ্বাস-সংস্কার পরিহার করেনি। যথাসময়ে কালক্রমে স্ব-স্ব বিশ্বাস-সংস্কারই আবার জীবনে-মননে রূপায়িত করেছে প্রায় অলক্ষ্যে ও অবচেতন

প্রেরণায়। ফলে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য থেকে ইসলাম পর্যন্ত কোনো ধর্মই অবিকৃত থাকেনি– লৌকিক রূপ লাভ করেছে। সাহিত্যেও পড়েছে এই 'বৈতসী' স্বভাবের দ্রোহী চেতনা।

গাথা-গীতিকাগুলোও একদিক থেকে দ্রোহী মানুষের কাহিনী। কারণ এগুলোর প্রধান বিষয় কাম-প্রেম– দুটোই শাস্ত্র ও সমাজদ্রোহী বৃত্তি-প্রবৃত্তি। এসব ঘটনা ও চেতনা প্রচলিত শাস্ত্র-সমাজ, নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ বহির্ভূত জীবন-জিজ্ঞাসা এবং প্রাণধর্মপ্রসূত। মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের হৃদয়ানুভূতির অকৃত্রিম শব্দাবলি ধারণ করে গাথা তাই বাংলার বিপ্লবী গণসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। গাথা সম্পর্কে আহমদ শরীফের মন্তব্য–

> শাস্ত্রচেতনা, সমাজভীতি ও প্রয়োজন বুদ্ধি উপেক্ষা করে সবকিছুর ওপরে হৃদয়বৃত্তিকে প্রাণের আকুতিকে, প্রাণের চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়া, হৃদয়ের মূল্য-মর্যাদাকে শাস্ত্রের ও সমাজের ওপরে ঠাঁই দেয়া, পারত্রিক জীবনের চেয়ে ঐহিক জীবনের অধিক গুরুত্ব, মূল্য ও মহিমা স্বীকার করা, জীবনে মাটির ও মানুষের, কামের ও প্রেমের, নীতিবোধের ও আদর্শচেতনার ক্ষমার ও ত্যাগের, লোভের ও রিরংসার, দ্বেষের দ্বন্দ্বের, ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব ও বাস্তবতা এই লোকগাথাতেই প্রথম অসংকোচ অভিব্যক্তি পায়। সংস্কৃত কিংবা বাঙলা লিখিত সাহিত্যে এমনটি দেখা যায় না, শাস্ত্র ও সমাজকে তুচ্ছ জেনে এ গণমানুষেরা উচ্চ করে তুলে ধরেছিল হৃদয়বৃত্তিকে। শাস্ত্রীরা সেদিন এ অঞ্চলে হার মেনেছিল গণমতের ও গণরুচির কাছে। গাথাগুলো মুখ্যত হৃদয়ানুভূতির ওপর নিষ্ঠুরতম পীড়ন-নির্যাতনের ইতিকথা। (শরীফ, ২০১০ক:২১৯)

মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্যে যখন মানবিক প্রণয়কাহিনী বিস্তার লাভ করে, বাংলার রক্ষণশীল হিন্দু তখনও দেবতা ও অতিমানবের জগতে আবদ্ধ। ভাষাকে ধর্মপ্রচারের বাহন বিবেচনা এবং মুখের বুলিতে সাহিত্য রচনার সীমাবদ্ধতাই এর কারণ। ভাষায় দেবত্ব আরোপ না হলেও ধর্মীয় গুরুত্ব আরোপ করার ঐতিহ্য মুসলমানদের মধ্যেও অটুট ছিল। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানবরসাশ্রিত সাহিত্যধারা প্রবর্তনে ইরানি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। এ সময়ের সাহিত্য প্রসঙ্গে আহমদ শরীফের বিশ্লেষণ ও মনোভাব[৮৫] 'বাংলাভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব' প্রবন্ধের নিচের উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয়েছে–

> মধ্যযুগে হিন্দুদের বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না। লৌকিক ধর্মের প্রচারই লক্ষ্য ছিল। এর এক কারণ এ হতে পারে যে শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত। কাজেই শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করত। তাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টির গরজ কেউ অনুভব করেননি। তাঁরা অশিক্ষিতদেরকে ধর্মকথা শোনানোর জন্যে ধর্ম-সংপৃক্ত পাঁচালী রচনা করতেন। তাতে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের অনুসৃতি ছিল। পরে সংস্কৃতের প্রভাব কমে গেলেও এবং বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পেলেও পূর্বেকার রীতির বদল হয়নি আঠারো শতক অবধি। আঠারো শতকেই আমরা কয়েকজন হিন্দু প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি।
>
> বাঙলাদেশের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান। তাই বাঙলা সাহিত্যের উন্মেষ যুগে সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষণ পেয়ে কেবল হিন্দুরাই বাঙলায় সৃষ্টি করেননি; মুসলমানরাও তাঁদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন এবং মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, দেব ধর্মপ্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্যে তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধসাহিত্য পেয়েছি তাঁদের হাতেই। কাব্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্রদানের গৌরবও তাঁদেরই। কেননা, সবরকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনায় অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা এই মানবরসাশ্রিত সাহিত্যধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের একই সূত্রে এবং একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও স্বীকরণে তাদের সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে ছয়শ বছরেও তা সম্ভব হয়নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন, হিন্দু লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহমুক্ত হতে পারেননি। যদিও এই দেবভাব একান্তই পার্থিব জীবন ও জীবিকা সংপৃক্ত।
>
> মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা–যা মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই নির্দেশ করে বাহুবল, মনোবল আর বিলাসবাঞ্ছাই সে-জীবনের আদর্শ। সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে-জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এককথায়, সংঘাতমত বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে অভিব্যক্ত। (শরীফ, ২০১০:৩০৯)

আঠারো শতকে পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক শৈথিল্য, রাষ্ট্রিক ভাগ্য-বিপর্যয় এবং নীতি-নিষ্ঠাহীন বাঙালির অবনতি-প্রবণ সমাজের বিকৃতির অভিব্যক্তিস্বরূপ হিন্দু রচিত 'কবি গান', 'পীর পাঁচালি' এবং মুসলমান রচিত 'দোভাষী পুথি'গুলি পাওয়া যায়। হিন্দুকবি রচিত পীর পাঁচালির অনেকগুলোই দোভাষী পুঁথির অন্তর্গত। বাঙালির সামাজিক রুচিবিকৃতি ও নৈতিক অধঃপতনের দিনে মানসিক বিপর্যয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের সুযোগে নতুন বন্দর কলকাতা এবং পুরোনো শহর মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের উক্ত দু-ধারার সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। হিন্দুদের যেমন ধর্মসম্পৃক্ত কবিগান, সত্যনারায়ণ পাঁচালি, মুসলমানদেরও তেমনি হামজা-হোসেন-হানিফা প্রভৃতি জেহাদ কাহিনী ও সত্যপীর পীর-দরবেশের উপকথা নিয়ে গড়ে ওঠে এ সাহিত্য।

তবে আহমদ শরীফ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চায় ও সাফল্যে হিন্দু-মুসলমান যৌথ অবদানের প্রেক্ষাপট নিয়েই অধিকতর মনোযোগী। তাঁর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যচর্চায় বাঙালি মুসলমানের অবদান অনুসন্ধানের গবেষণালব্ধ ফল বিধৃত হয়েছে দুই খণ্ডে রচিত *বাঙালী ও বাঙলাসাহিত্য* (১৯৭৮ ও ১৯৮৩) গ্রন্থে। ইতিহাসভিত্তিক এই অনুসন্ধান গড়ে উঠেছে শ্রেণি, অঞ্চল, সম্প্রদায় এবং শাস্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে। কারণ 'আমরা যে সাহিত্যের ইতিকথা রচনা ও পাঠ করতে চাই, সে সাহিত্য সব বাঙালির সম্পদ নয়। এ সাহিত্যে রয়েছে শ্রেণীর রূপ, রয়েছে আঞ্চলিক রূপ, রয়েছে সাম্প্রদায়িক ও শাস্ত্রিক রূপ' (শরীফ, ১৯৭৮:২৪)। আহমদ শরীফ বর্ণিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব এখানেই।

৩.৩.৭

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় বিজাতীয় ব্রিটিশ বণিকের মানদণ্ড যেদিন রাজদণ্ডে রূপ নিল সেদিন থেকেই আধুনিক যুগের শুরু। তার আগের পঁচিশ বৎসর পলাশীর বিজয়ী বেনেবুদ্ধি সিদ্ধান্তই নিতে পারেনি, এদেশে তাদের শাসনের রূপ কেমন হবে– শাসন, শোষণ নাকি দুই-ই। অবশেষে বিশ্বব্যাপী প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাজদণ্ডের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ম-নিগড়ে বাধা পড়ে বাংলার ভাগ্য পরবর্তী দেড়শ বছরের জন্য। যদিও ষোড়শ শতাব্দীতেই পর্তুগিজ বণিকদের সংস্পর্শে এসেছিল চট্টগ্রামসহ বাংলার দক্ষিণাঞ্চল কিন্তু মধ্যযুগের প্রথানুরাগী-শাস্ত্রনির্ভর-স্থবির জীবনপ্রবাহে চাঞ্চল্য ও পরিবর্তনসূচিত করার জন্য বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা ভাষার সংঘাতের আবশ্যিকতা ছিল কারণ ভিন্ন ভাষার সাথে সংঘাতে সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির নতুন প্রবাহ। সেজন্যই ইংরেজি শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাঙালির মানসবিপ্লবের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়, সমাজব্যবস্থায় সৃষ্টি হয় প্রবল প্রকম্পন। আহমদ শরীফের ভাষায় 'প্রথম স্বশিক্ষিত' বাঙালি মনীষী রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) থেকে এর যাত্রা শুরু (শরীফ, ২০১০ক:২৪৫)। অতঃপর রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-মনীষার মননে-সৃজনে নতুন চেতনাস্পৃষ্ট বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্যের অগ্রযাত্রা।

ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ছিল শাসক-শাসিতের, কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু-মুসলমান হল প্রতিবেশী। কিন্তু আচরণে সহমর্মী নয়, ঈর্ষাপরায়ণ। আহমদ শরীফ এই প্রতিবেশী অথচ প্রতিদ্বন্দ্বী চেতনায় বিদ্বিষ্ট জাতিদ্বয়ের নৈকট্য ও দূরত্বের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন–

> ভৌগোলিক পরিবেষ্টনীগত জীবনের ও প্রয়োজনে অস্বীকৃতিতে হিন্দু আত্মত্রাণের প্রেরণা খুঁজেছে স্বধর্মে ও উত্তরভারতের বৈদিক, রাজপুত ও মারাঠা ঐতিহ্যে এবং মুসলমানও ত্রাণ সন্ধান করেছে তার স্বধর্মে ও আরব-ইরানে। এটির নাম স্বাধর্ম্য– প্যান হিন্দুইজম ও প্যান ইসলামইজম। ফলে মধ্য ও উচ্চবিত্তের হিন্দু-মুসলমান নানা কাজে একত্রিত হয়েছে কিন্তু তাদের মিলন হয় নি। যদিও তারা একই হাটে বেচা-কেনা করেছে একই বাটে হেঁটেছে, একই মাঠে ফসল তুলেছে, একই বন্যায় পীড়িত হয়েছে এবং মরেছে একই মহামারীতে। তারা পাশাপাশি বসেছে, ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়েছে,– বাইরে সর্বত্র মিলেছে, সহযোগিতা করেছে, অন্য সব কিছুই দেয়া-নেয়া করেছে, মনটাই কেবল দেয়া-নেয়া করে নি, তারা মনটা ফিরিয়ে রেখেছিল দেশবহির্ভূত ধর্মের ও ঐতিহ্যের আনুগত্যবশে। ওটার নাম স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধর্ম্য যার অপর নাম দেশকালহীন আদর্শিক জাতীয়তা। কিন্তু এই আদর্শিক জাতীয়তা কোন শ্রেয়সের সন্ধান দিয়েছে! (শরীফ, ২০১০:২৭১-২৭২)

এই 'দেশ বহির্ভূত ধর্মের ও ঐতিহ্যের আনুগত্য' এবং 'দেশকালহীন আদর্শিক জাতীয়তা' বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দুর মধ্যে জাগ্রত হয় ব্রিটিশ শাসকদের বিভাজন নীতির সফল প্রয়োগে, অর্থনৈতিক-শৈক্ষিক-সামাজিক সুবিধাপ্রাপ্ত ও বঞ্চিত মনোবিকলনে। বাংলা-বাঙালি ও বাঙালিত্ব নিয়ে আহমদ শরীফের সমগ্র প্রবন্ধচর্চায় এটি অন্যতম গুরুত্বপ্রাপ্ত ক্ষেত্র। এ বিষয়ে এবং সমগ্র ইংরেজ শাসনামলে হিন্দু-মুসলিম স্বাজাত্য ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা অখণ্ড বাঙালি জাতীয়তাবোধ উন্মেষে কীভাবে প্রতিবন্ধক ও প্রতিবর্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় গদ্যচর্চার মধ্য দিয়ে শুরু হল বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ। আধুনিক যুগের আলোচনায় বাংলা ভাষায় বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুর সাহিত্যসাধনার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন আহমদ শরীফ। বিশেষত বাংলা সাহিত্যের সমন্বয়বাদী ধারাকে হাজার বছরের বাঙালির জীবনচেতনা-মেধা-মনন-সৃষ্টিশীলতা ও বোধের উজ্জ্বলতম কীর্তি হিসেবে প্রমাণ করেছেন তিনি। এজন্য ভাষা ও সাহিত্যের ওপর যে-কোনো সাম্প্রদায়িক দাবি বা আগ্রাসনের, সাম্প্রদায়িক সংস্কার চাপানো সমালোচনাও করেছেন। বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সমন্বিত চেতনাধারা বা ঐক্যের প্রয়াস ছিল রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, চৈতন্যের মধ্যে। অষ্টম শতকে মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যে শঙ্কর-রামানুজের উপনিষদাশ্রিত ভক্তিবাদ প্রসার লাভ করে, ইসলামের প্রভাব থেকে স্বধর্ম রক্ষার প্রতিক্রিয়ায় এবং একেশ্বরবাদিতার প্রভাবে। একইভাবে উত্তরভারতে ইসলামের সুফিবাদের প্রেমধর্মের প্রভাবে কবীর-দাদু এবং তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বাংলায় চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভাবান্দোলন পূর্ণতা লাভ করে। আহমদ শরীফ মনে করেন, চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে সংঘটিত বৈষ্ণব ভাবান্দোলনই বাংলার প্রকৃত রেনেসাঁ। বাংলা ভাষা এই একবারই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহিত্যের ও ধর্মীয় বাণী-বাহক হয়ে শ্রেণি-বর্ণ-বৃত্ত-বিত্ত নির্বিশেষে আপামর বাঙালির মুখে মুখে ছড়িয়েছিল বৃহত্তর বাংলার গ্রামে-গঞ্জে। তথাপি এই ভাবান্দোলনও কালক্রমে মনীষীদের সাধনা হিসেবেই চর্চিত; বাস্তবে এই সাধনা অশিক্ষা ও অদূরদর্শিতার জন্য সমাজে স্থায়ী রূপ পায়নি বা সচেতনভাবে কার্যকর হয়নি। অধিকাংশের গোঁড়ামির ফলে স্বল্পসংখ্যক উদারতার ধারা ক্ষীণ বা লুপ্ত হয়ে গেছে। তারপরও বাংলায় চিরকালই আন্তরিকভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য সমন্বয়ের সাধনা চলেছে, নজরুলের মধ্যে যার শেষ প্রয়াস লক্ষ করা যায় বলে আহমদ শরীফ মনে করেন (শরীফ, ২০১০:৫১) ।

ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রথম তিন দশক, ১৭৯০ থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত ছিল বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয়িত যুগ, এসময় পুথিঁ ও কবিওয়ালাদের পুরনোর পুনরাবৃত্তিময় সৃষ্টির কাল। আঠারো শতকের শাসনতান্ত্রিক শৈথিল্যের, রাষ্ট্রিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের এবং নীতি-নিষ্ঠাহীন বাঙালির অবনতি-প্রবণ সমাজের বিকৃতির অভিব্যক্তি স্বরূপ আমরা হিন্দু রচিত কবি-গান, পীর-পাঁচালি এবং মুসলমান রচিত দোভাষী পুথিগুলো পাই। হিন্দু কবির রচিত অনেক পীর পাঁচালিও দোভাষী পুথির অন্তর্গত। এ সময় নির্বীর্য বাঙালির সামাজিক রুচিবিকৃতি ও নৈতিক অধঃপতনের দিনে মানসিক বিপর্যয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের সুযোগে নতুন বন্দর কলকাতা এবং পুরোনো শহর মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে গড়ে উঠে উক্ত দু-ধারার সাহিত্য। হিন্দুদের যেমন ধর্মসম্পৃক্ত কবিগান, সত্যনারায়ণ পাঁচালি, মুসলমানদেরও তেমনি হামজা-হোসেন-হানিফা প্রভৃতি জেহাদ কাহিনী ও পীর-দরবেশের উপকথা নিয়ে গড়ে ওঠে এ সাহিত্য। দোভাষী পুথির উদ্ভব সম্পর্কে আহমদ শরীফের বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, বিভাগোত্তরকালে পাকিস্তানবাদী 'তহজিব-তমুদ্দুন' গড়ে তোলার শক্ত ভিত্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল পুথির ভাষা ও রচনারীতি।[৮৬] উপরন্তু বাঙালি মুসলমান পুথির ভাষায় আত্মপরিচয়ের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিফলন দেখতে পায়। পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকগণ বাঙালি মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যিক-উত্তরাধিকার বলতে পুথি সাহিত্য ও তার ভাষাকে নির্দেশ করতে শুরু করলে[৮৭] প্রতিক্রিয়ায় আহমদ শরীফ একাধিক প্রবন্ধে তাঁর গবেষণালব্ধ মতামত তুলে ধরেন। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তাচেতনা সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্যচেতনা পরিস্রুত। তাঁর মতে দোভাষী সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা না করে বিশেষত

বাঙালি মুসলমানের জন্য পৃথক বিবেচনায় ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করা অবিবেচনাপ্রসূত। তার কারণ, এ সাহিত্য শুধু যে বিদেশাগত মুসলমানদের চর্চায় সৃষ্ট তা নয়, এর উদ্ভবও হিন্দুর সাহিত্যে সুতরাং ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রশ্নেও নিরঙ্কুশ মুসলিম সাধনার ভাষা এ নয়। আহমদ শরীফের ভাষায় দোভাষী পুথির বৃত্তান্ত পাই–

> নবাবী আমলে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা শহরে, শহরতলীতে ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে সিপাহী, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং আরো নানা পেশার অবাঙালিক লোক-লস্কর এস বসবাস করেছে! উর্দু-হিন্দি তথা হিন্দুস্তানীই ছিল তাদের মাতৃভাষা, স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবে ও দেশীলোকের প্রভাবে বিকৃত হয়ে গেল তাদের বুলি। ঐ ভাষা এদেশে অবজ্ঞার্থে খ্যাত হল 'খোট্টাভাষা' নামে। এসব খোট্টাভাষী বিদেশীরা প্রাত্যহিক জীবনের গরজে এদেশীয় লোকের ভাষাও আয়ত্ত করল অপটুভাবে। ফলে যে-কারণে [অর্থাৎ প্রয়োজনানুরূপ শব্দসম্পদ আয়ত্ত করতে না পারার ফলে] ফরাসি-হিন্দির মিশ্রণে উর্দুর সৃষ্টি হল, অনুরূপ কারণে খোট্টাদেরও একটি বাঙলাভাষার উৎপত্তি হল। এর বিশেষত্ব হচ্ছে বাঙলা শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও এবং অপরিমেয় হিন্দুস্তানী শব্দের ব্যবহার ও বাক্‌ভঙ্গির প্রয়োগ। এ ভাষা এখনো চালু রয়েছে উক্ত শহরগুলোতে। ...
>
> সুতরাং খোট্টা বাঙালির শহুরে বাঙলায় যে-সাহিত্য পলাশীযুদ্ধের পাঁচ-সাত বছর পর থেকে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে রচিত হতে থাকে, তার সাথে বাঙালির কোনো যোগ ছিল না। চৌদ্দ-পনেরো শতক থেকে বিশুদ্ধ বাঙলায় যে-সাহিত্য রচিত হচ্ছিল এরা সে ভাষাশৈলীই সাম্প্রত কাল পর্যন্ত অনুসরণ করে চলেছে। দোভাষী পুথির কোনো প্রভাব যে পল্লীবাসী মুসলমানদের উপর পড়েনি, তার প্রমাণ এদের রচিত পুরোনো বা নতুন গানে, গাথায়, ছড়ায়, রূপকথায়, কাহিনী-কাব্যে সে ভাষার কোনো নিদর্শন নেই। আমাদের উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে হারামণি, ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রবাদ-সংগ্রহে এবং পাঁচালিগুলোতে। ....
>
> পল্লী অঞ্চলে দোভাষী পুথি বহুলপঠিত হত বলে বিশ্বাস করবারও কারণ নেই। চকবাজার ও শহুরে বস্তিতে এর উদ্ভব ও প্রচার সীমাবদ্ধ বললে সত্যের বিশেষ অপলাপ হবে না। ঊনিশ-বিশ শতকের দোভাষী উপাখ্যানগুলো কারা, কাদের আদেশে, কোনো প্রেরণায় রচনা করেছেন ও করছেন তার উল্লেখ অনেক পুথির সামাপ্তিভাগে রয়েছে–বটতলার প্রকাশকের আদেশ, আর্থিক প্রেরণা এবং খোট্টা পাঠকদের চাহিদাই রয়েছে এগুলো রচনার মূলে। অতএব এ-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির আন্তর বা বাহ্য যোগ কোথায়? অবশ্য বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত ছাপা পুথির অভাবে গাঁয়ের লোকেরাও দোভাষী পুথি পড়েছে–শুনেছে কিন্তু সে-ভাষা অনুকরণ করেনি। (শরীফ, ২০১০:৬০)

উর্দু, হিন্দুস্তানি, আরবি বা ফারসি কোনো ভাষার কাছেই বাংলা ঋণী নয়, এমনকি বাংলাকে বিকৃত উচ্চারণে বলা 'খোট্টা'র কাছেও নয়। অভিজাতদের মুসলমান বা অবাঙালি মুসলমানের কাছেও বাংলার কদর ছিল না, এমনকি স্বাতন্ত্র্যপ্রত্যাশী স্বল্পসংখ্যক দেশজ মুসলমানও বাংলার চেয়ে ফারসি বা বড়জোর 'মুসলমানী বাংলা'কেই নিজের ভাষা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। কাজেই, দোভাষী পুথি সম্পর্কে আহমদ শরীফের গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত– 'দোভাষী পুথিসাহিত্যের ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারের প্রশ্নই অবান্তর' (শরীফ, ২০১০:৬০)– আমাদেরকে অনেক ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে।

'ইংরেজ আমলে মুসলিম মানসের পরিচয়সূত্র' নামক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন, ওয়াহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় দেশজ মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামির বৃদ্ধি ঘটে, ফলে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অনীহ হয়ে ওঠে তাঁরা। বাংলায় ওয়াহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলন প্রবল হলেও সর্বশ্রেণির লোকের এতে সমর্থন ছিল না, বিশেষত উচ্চবিত্তের অভিজাত মুসলমানদের ভূমিকা ছিল দুর্লক্ষ্য। ফলে ধর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের দারিদ্র্য-মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হয়নি। বরং ইংরেজবিদ্বেষ মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের অন্তরায় হয়েছিল। তাছাড়া তাদের মধ্যে আরবি বা ফারসি শিক্ষারও কোনো ঐতিহ্য ছিল না। উত্তরভারত ও বিহার ওয়াহাবি আন্দোলনের কেন্দ্র হলেও সেখানে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল। বাংলার উচ্চবিত্তের অভিজাত মুসলমানরা ও রাজসরকারের পদস্থ কর্মচারীরা ছিল অবাঙালি যাদের অধিকাংশই সিরাজউদ্দৌলা-মীরকাশেমের পতনের পর উত্তর ভারত ও বিহারে চলে যায়। যারা নানা কারণে রয়ে গেল তাঁরা গোড়া থেকেই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে দেশীয় মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

আহমদ শরীফের জন্ম হয়েছিল ঔপনিবেশিক ভারতে। তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তান আন্দোলন দেখেছেন এবং সেই রাষ্ট্রের অধিবাসীও ছিলেন। আবার সেই ধর্মরাষ্ট্রের ধ্বংস্তূপ থেকে বাঙালির একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়ও দেখেছেন, হয়েছেন সেই স্বপ্নভূমির গর্বিত নাগরিক। তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে দুটি বৈপ্লবিক ঘটনার সাক্ষী আহমদ শরীফ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর দৈনন্দিন সবকিছু ইসলামিকরণের প্রবল জোয়ারে কতকটা স্রোতের টানেই আহমদ শরীফ লিখলেন– 'ধর্মবোধ সামাজিক প্রয়োজনে অপরিহার্য' (শরীফ, ২০১০:৫৪)। আবার মুসলিম তমুদ্দুনবাদী সাহিত্যের আলোড়নেও 'প্রকৃত ইসলামমুখী কর্মপ্রেরণা ও সাহিত্য সাধনার অভাব ঘোচেনি' বলেছেন সাবধানতার সঙ্গে। যেন বুঝে নিতে চাইছিলেন, ধর্মীয় উন্মাদনা আর উদার চিন্তার সমীকরণ মিলাবেন কীভাবে। সময়ের সেই বাধ্যতায় ইসলামিকরণের প্রতি মৃদু নমনীয় থেকেই প্রকৃত ইসলামিচেতনার মধ্যে যুক্তি-জিজ্ঞাসার আড়াল রেখে লিখলেন–

> জাতি ও শ্রেণীসংগ্রামে আজকের পৃথিবী জর্জরিত ও মুমূর্ষু। যে-দেবতা বর দিতে পারে না, তার পূজা হয় না। আজকের অধার্মিকতা আস্থাহীনতার জন্য তত নয়, যতটা ক্ষোভ, নৈরাশ্য ও জেদজাত। এই সব কারণেই ইসলামমুখী সাহিত্য-সাধক আজ দেশে নিতান্ত বিরল। (শরীফ, ২০১০:৫৪)

আহমদ শরীফ বাংলাদেশের বিভাগোত্তর তথা মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সাহিত্যে প্রকৃত ইসলামমুখী সাহিত্য-সাধক যেমন দেখেননি তেমনি নিরবচ্ছিন্ন ইসলামমুখিতার নিদর্শনও পাননি। তিনি এ সময়ের ইসলামমুখী ধারার সাহিত্যকে ইসলামি ঐতিহ্য ও ইসলামি জাতীয়তাবাদী প্রেরণাজাত– দুই ধারায় প্রবহমান বলে উল্লেখ করেছেন। ইকবাল ও তালিম হোসেন দ্বিতীয় ধারার কবি, পক্ষান্তরে ফররুখ আহমদ ও সৈয়দ আলী আহসান প্রথমোক্ত ধারার সাহিত্যিক। আবার মধ্যযুগে ও নজরুলপূর্ব যুগে এ-ধারা মুখ্যত ধর্মানুরাগজাত, নজরুলের সম-সময়ে তা ছিল প্রধানত সমাজবোধানুষঙ্গিক এবং পরবর্তীকালে জাতীয়তা, সমাজবোধ ও উপনিবেশ-মুক্তির প্রেরণাপ্রসূত। আবার উপনিবেশ-উত্তর যুগে এই সাহিত্য শুধু রাষ্ট্র ও সমাজাদর্শের বাহন।

অতএব, আহমদ শরীফের প্রতিপাদ্য হচ্ছে– আপাতদৃষ্টিতে বিষয়সাদৃশ্যে যাকে আমরা ইসলামমুখী ধারা নামে অভিহিত করে থাকি, বিভিন্ন যুগে এ সাহিত্যের ভাবগত মৌলিক ঐক্য নেই, কালান্তরে এর প্রেরণা, ব্যঞ্জনা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

৩.৩.৮

মুখের বুলি চিরকাল অপূর্ণ ও ত্রুটিবহুল এবং তা ঘন ঘন বদলায়। কিন্তু গদ্য ভাষার জন্য প্রয়োজন ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ শব্দবহুল সুগঠিত কাঠামোর। তাছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি করা না হলে ভাষা মার্জিত ও শালীন হয়ে উঠতে পারে না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের অংশগ্রহণে বাংলা গদ্য সৃষ্টির প্রাক্কালে মুসলমান আমলের দলিল-দস্তাবিজে, চিঠিপত্রে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত বাঙলা গদ্যের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু আহমদ শরীফ মনে করেন 'চিঠিপত্র বা দলিল-দস্তাবিজের অসাহিত্যিক ভাষার দ্বারা কোনো ভাষার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে যাওয়া অসমীচীন।' এবং যাঁরা মনে করেন 'কেরী-বিদ্যাসাগরী প্রচেষ্টার পূর্বে বাঙলা সাহিত্যের ভাষা আরবি-ফারসি মিশ্রিত হবার প্রবণতা লাভ করেছিল' তাঁদের ধারণাও তথ্যভিত্তিক নয় এমন কথাও বলেন (শরীফ, ২০১০:৫৮)। এ অবস্থায় বাংলা গদ্যের প্রাথমিক রূপ তৈরিতে কেরি-রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন প্রভৃতি সবাই সংস্কৃতের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা 'মূল-না-জানা ঐতিহ্য ও ব্যঞ্জনাবিহীন' আরবি-ফারসি বা ইংরেজি ভাষার কতগুলো বোবা শব্দের সাহায্য না নিয়ে 'প্রাকৃতজাত বাঙলাকে জ্ঞাতিত্ব সূত্রে তার প্র-প্র-প্রমাতামহী সংস্কৃতের উত্তরাধিকারিণী দাঁড় করিয়ে তাঁরা বাঙলা ব্যাকরণ ও শব্দসম্পদ সংস্কৃতানুগ করে তুললেন' (শরীফ, ২০১০:৫৮)। এবং আহমদ শরীফের মতে, তা না করলে বাংলা ভাষাকে একটি সার্বজনীন ও শালীন রূপ দেয়া অসম্ভবই ছিল। তবে, একথাও

মানতে হয় যে, 'সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আর সংস্কৃত রীতির আমদানি যে এক কথা নয়, তা' প্রথম দিককার লেখকগণ সহজে বুঝে উঠতে পারেনি' (শরীফ, ২০১০:৫৮)।

বাংলা গদ্য নির্মাণে বিভাষার গ্রহণ-বর্জনে আহমদ শরীফের প্রতিপাদ্য কিছুটা এমন হয়–

> বাঙলাভাষার গদ্যে ও পদ্যে একটা নিজস্ব রীতি বা শৈলী ছিল। তাতে মাত্র দুবার বিপর্যয় আসে–একবার দোভাষী রীতির প্রচলনে, আর একবার সংস্কৃত ব্যাকরণানুগ গদ্য রচনার ফলে। সৌভাগ্যবশত কোনোটাই স্থায়ী হয়নি। (শরীফ, ২০১০:৫৮)

অবশ্য পরবর্তীকালে দোভাষী পুথির ভাষারীতির প্রতি খানিকটা যৌক্তিক পক্ষাবলম্বন ও নমনীয়তা প্রদর্শন করে আহমদ শরীফ এই রীতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও বিশেষত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। কারণ বাংলা ভাষার বা বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনায় 'এছলামী বাংলা' সৃষ্টির 'মহৎ প্রয়াস' ও 'জাতীয় স্বপ্ন'[৮৮] ব্যর্থ হওয়ার ইতিবৃত্ত থাকাও আবশ্যক। বিরূপ শিক্ষিত মনের কাছে অমার্জিত রুচির অশ্লীলতা ও স্থূলতা-দোষে দুষ্ট দোভাষি সাহিত্য যারা সৃষ্টি করেছেন তারা প্রাকৃতজনের কবি। তাদের কাছে কাব্যোৎকর্ষের চেয়ে বক্তব্যের অনর্গল প্রকাশই ছিল মুখ্য। 'অসম্পূর্ণ শিক্ষার দরূণ নীতিবোধ ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি লোকায়ত স্থূলবোধের প্রতিচ্ছবি এদের রচনায় থাকা স্বাভাবিক' (শরীফ, ২০১০:৭০) তবে আহমদ শরীফ এই সাহিত্যিক প্রয়াসের ঐতিহাসিক-সামাজিক তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে লিখেছেন–

> আঠারো-উনিশ শতকী দোভাষী সাহিত্য আমাদের নগর-বন্দর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসের তথা জীবনচর্যার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিভূ! এ সাহিত্যই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ অবধি, শতকরা নিরানব্বইজন বাঙালি মুসলমানের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী জীবন ও ঐতিহ্য চেতনা। সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি সমাজকল্যাণ হয়, তাহলে মানতেই হবে দোভাষী সাহিত্যই গত একশ বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানের জগৎ ও জীবন ভাবনার নিয়ামক। এই দিক দিয়ে এ সাহিত্যের সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিমেয়! এ ভাষাও দাখিনী উর্দু ও উত্তরভারতীয় উর্দুর মতো একটি মুসলিম ভাষা হতে পারত–এ উল্লাসবোধ, কিন্তু হল না–এ ক্ষোভই দোভাষী রীতি চিরকাল জাগিয়ে রাখবে স্বজাতি ও সংস্কৃতিপ্রিয় মুসলিম ঐতিহাসিকের মনে। (শরীফ, ২০১০:৭০)

ইসলামি জীবন ও ঐতিহ্য চেতনার আস্বাদনে বা সমাজকল্যাণের উপযোগে পুথির ভাষার গুরুত্ব মেনে নিলে সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার স্বীকার না করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাজগতে আত্যন্তিক ধর্মীয়চেতনা হাজার বছর ধরে চর্চিত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করলে সংস্কার–ভীতি-প্রলোভন-প্রতিবাদবশে বাঙালি সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন তৈরি হয়। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকেও ধর্মের ভিত্তিতে গ্রহণ-বর্জনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ঐতিহ্যানুরাগী প্রগতিশীল বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগণ। এসময় আহমদ শরীফও নীরব ছিলেন না। ঐতিহ্য ও ধর্মের সমন্বয়ের মাধ্যমে কীভাবে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণ করে জাতীয় ঐতিহ্য ও সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় তিনি তার উপায় সন্ধান করেছিলেন। ঐতিহ্য সচেতনতার ও পুরোনো সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবই পাকিস্তানবাদী জাতীয় সাহিত্যের অপূর্ণতা ও দীনতার অন্যতম কারণ এমন মনোভাব ব্যক্ত করে শিক্ষিত সাধারণ্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পঠন-পাঠন বাড়ানোর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন আহমদ শরীফ (শরীফ, ২০১০:৭২)। তিনি জাতীয় জীবনের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রভাবের উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন–

> চলমান জীবনে আর উত্তরাধিকারের মতো সাহিত্যের উত্তরাধিকারও বিশেষ মূল্যবান সম্পদ। ঐতিহ্যের স্বরূপ স্পষ্টভাবে বিধৃত থাকে সাহিত্যে। তাই জাতীয় জীবনে সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রভাব অসামান্য। গ্রীকদের উপর হোমারের ইলিয়াড-ওডেসির প্রভাব, ইরানিদের জীবনে শাহ্নামার গুরুত্ব আর পাক-ভারতের হিন্দুর আচারিক ও মনো-জীবনে রামায়ণ-মহাভারতের প্রেরণা অপরিমেয়। (শরীফ, ২০১০:৭১)

সৈয়দ আলী আহসান, মীর মশাররফ হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ফররুখ আহমেদের সাহিত্যসৃষ্টির উদাহরণ দিয়ে আমাদের পুথি-সাহিত্যের আধুনিক রূপায়ণের বিপুল সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন

আহমদ শরীফ। পুথির নবরূপায়ণের মোড়কে পুরোনো সাহিত্যের নব রূপায়ণ, ঐতিহ্যকে ব্যবহার করার আহ্বান ও আশা ইত্যাদি বিষয় আহমদ শরীফের পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের প্রতি সাময়িক অনুরাগ যা তাঁর উত্তরকালের সাহিত্যচেতনার সাথেও মানানসই নয়। তবে ধর্মীয় ঐক্যসূত্রে পাওয়া বিদেশি ঐতিহ্যের চেয়ে পূর্বপুরুষের অর্জন ও কৃতির ফসল পুথিকে ব্যবহার করার যে যুক্তি আহমদ শরীফ দিয়েছেন, তা-ও উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ–

> আশার কথা, আমাদের অনেক লিখিয়েই সচেতন হয়েছে এ ব্যাপারে এবং পুথির উপাদান নিয়ে লিখতে হয়েছেন উদ্যোগী। তবে মনে রাখতে হবে, আমরা পুরাতনের উদ্বর্তন চাইনে, পুরাতন সামগ্রী নিয়ে নয়া ইমারত তৈরি করে নতুনের আবাহন ও প্রতিষ্ঠাই কামনা করি তাতে। কিন্তু জীবন যে মুখ্যত মৃত্তিকা-আশ্রয়ী তা ভুললে চলবে না। স্বদেশের আবহাওয়ায় গড়ে ওঠে জীবন। প্রাণ-রস পায় মানুষ দেশের ঐতিহ্য থেকেই। কেননা, এ ঐতিহ্য হচ্ছে তারই পূর্বপুরুষের অর্জিত বা সৃষ্ট কিংবা কৃতির ফসল। ধর্মীয় জীবন হচ্ছে বাইরের থেকে পাওয়া আদর্শের কৃত্রিম রূপায়ণ। তাই দেশী ঐতিহ্যকে অবহেলা করে কেবল ধর্মীয় কিংবা ধর্মীয় ঐক্যসূত্রে পাওয়া বিদেশী ঐতিহ্যের প্রয়োগে সাহিত্য সৃষ্টি করলে তা হবে তাসের ঘরের মতো অকেজো ও অসার্থক। তা কখনো হবে না প্রেরণার কিংবা অনুভবের উৎস। (শরীফ, ২০১০:৭৩)

জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ঐতিহ্যের ব্যবহার ও গ্রহণ-বর্জন নীতি সম্পর্কে 'সাহিত্যে জাতীয় ঐতিহ্য' প্রবন্ধে আরও স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন আহমদ শরীফ–

> আমাদের দেশের একশ্রেণীর লেখক ও পাঠকের ঐতিহ্যানুরাগ আরবি-ফারসি শব্দ প্রীতিতেই অবসিত। অথচ তাৎপর্য-চেতনা নিয়ে বিষয় নির্বাচন ও তার রসাত্মক প্রকাশের মধ্যেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব জাতীয় সত্তার স্বরূপ। এতে জাতির আশা-আদর্শের রূপায়ণও হবে সহজ। মননের ব্যাপ্তি, চিন্তার দীপ্তি, কর্মের প্রেরণা ও আদর্শের ঔজ্জ্বল্য এভাবেই আসা সম্ভব ও সহজ। জাতীয় গৌরব-গর্ব, জাতীয় সংহতি ও জাতীয় জাগরণ আসবে এ পথেই। (শরীফ, ২০১০:৭৪)

এজন্য করণীয়ও ব্যাখ্যা করেছেন আহমদ শরীফ–

> আগে খুঁজব দেশজ কাহিনী বা ঐতিহ্য, তারপরে সন্ধান নেব স্বধর্মীর ঐতিহ্যের। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিদেশীর বা বিজাতির বলে গ্রহণবিমুখ হব না। অভিমানবশে প্রয়োজনকে ও কল্যাণকে অস্বীকার করব না কখনো। (শরীফ, ২০১০:৭৫)

অর্থাৎ ইট-পাথর-সুড়কি যেখান থেকেই আসুক তাজমহল রচনার গৌরব থাকবে আমাদেরই– 'সমন্বয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য'ই হল মূল কথা (শরীফ, ২০১০:৭৫)।

৩.৩.৯

সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি, মানবমনের সন্তান, ব্যক্তিক ও জাতীয় জীবনের মুকুর। মানুষের মনোভঙ্গি যখন যেমন তখনই তা প্রতিফলিত হয় তার সৃষ্ট-সাহিত্যে। আহমদ শরীফ সাহিত্যে মানুষের মনোবিবর্তনের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। তাঁর অভিমত, আধুনিক সাহিত্যের লক্ষ্য হবে গণমানুষের আত্মিক উন্নতির; একান্তভাবে ব্যক্তিসত্তায় আস্থাবান মানুষের জন্যই হবে এ সাহিত্য–সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য নয়। অর্থাৎ ব্যক্তির আত্মোন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে সাহিত্যচর্চা গুরুত্বপূর্ণ। 'কথাসাহিত্যে সমস্যা ও এর বিষয়বস্তু' প্রবন্ধে তাঁর ভাষ্য–

> মানুষের অজ্ঞতার ক্রমবিদূরণ, জীবনবোধের প্রসার, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধির ক্রমবিকাশ, হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অভিজ্ঞতালব্ধ ক্রমোন্নতি প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত হয়েছে এসব সাহিত্যে। বিস্ময়াবিষ্ট অজ্ঞ মানুষের সাহিত্য ছিল ভূত-প্রেত-দেও-পরী-রাক্ষসের লীলা, তারপরের যুগে পেলাম রাজা বাদশাহ্‌র জীবন-বিলাস চিত্র। তারপরে পেয়েছি ন্যায়নীতি আদর্শবাদ-পুষ্ট ইহ-পারলৌকিক জীবনের মোহনীয় ও বিভীষিকাময়ী কাহিনী। মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে মনোভঙ্গি যেমন বদলেছে, জগৎ ও জীবন জিজ্ঞাসা-পদ্ধতি যেমন বিবর্তিত হয়েছে, সাহিত্যেরও তেমনি সমভাবে রূপান্তর ঘটেছে আদর্শে, রূপকল্পে ও রসকল্পে। বিবর্তিত হয়েছে ভাষা, পাল্টে গেছে ভঙ্গি, পরিবর্তিত হয়েছে রস-রুচিবোধ। বিষয়বস্তুও হয়েছে বহুবিচিত্র। আজকের সাহিত্যকে তাই পুরনো নিয়ম-নীতির নিরিখে যাচাই করা চলবে না। আজকের সাহিত্যের সাধারণ নাম 'রস সাহিত্য' নয়– গণসাহিত্য। আজকের সাহিত্য-শিল্প কুশলতা মাত্র নয়, গণমানবের আত্মিক উন্নতির জন্যেই সাহিত্য। সমাজের জন্যে নয়, রাষ্ট্রের জন্যেও নয়– একান্তভাবে ব্যক্তিসত্তায় আস্থাবান মানুষের জন্যেই হবে এ সাহিত্য। মানুষ– অবিশেষের মর্যাদা ও অধিকার-বোধ জাগানো ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই রচিত হবে সাহিত্য। প্রতি মানুষের জীবনের মর্যাদা ও মূল্যমান যথার্থভাবে বুঝিয়ে দিয়ে মানুষকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তুলবার সাধনার অবলম্বন ও বাহন হচ্ছে এ সাহিত্য। তাই আজকের

> সাহিত্য অবসরবিলাসীর চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়, কেজো মানুষকে প্রেরণা ও প্রতিষ্ঠা দানের জন্যেই। হালকভাবে বললেও স্বীকার করতে হবে যে : 'যার খায় তার গুণ গাইতে হয়।' এককালের লেখকেরা ধনীর আশ্রয়-নির্ভর ছিলেন, তাই সাহিত্যে স্তুতি গেয়েছেন ধনীমানবের। আজ গণমানবই তাদের খোরপোশ যোগায়। কাজেই আজ সাহিত্য সৃষ্টি হবে গণমানুষের স্বার্থে ও কল্যাণে, সেকালের ধনীদের স্তুতিকার হবেন একালের গণমানবের চাটুকার। (শরীফ, ২০১০:১৭)

আধুনিক সাহিত্য ইউরোপ-বাহিত কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থা ইউরোপীয় সমাজ থেকে কোনকিছুই অর্জন করে নিতে পারেনি, অনুকরণ করেছে মাত্র। এ বিষয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> সাহিত্যের আধুনিক রূপকল্প হচ্ছে য়ুরোপের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ফল। তাই তাদের কাছে যা স্বতঃস্ফূর্ত, আমাদের কাছে তা অনুকৃতি মাত্র। আর অনুকৃতি মাত্রেই কৃত্রিম। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার শক্তি যেমন আমাদের জন্মায়নি, অথচ আমরা পূর্ণ যান্ত্রিক সেবা ও সুবিধে গ্রহণ করছি; ওদের তৈরি যন্ত্রের অনুকরণে আমরাও অনুরূপ যন্ত্র তৈরি করে নিচ্ছি, কিন্তু নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারছিনে। সাহিত্য শিল্পে আর আদর্শেও তেমনি আমাদের অনুরূপ অক্ষমতা ও অনুকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। প্রতীচ্য সংস্কৃতি বরণে ও ধারণে আমরা ভুঁইফোড় বলেই আমাদের স্বীকরণ ক্ষমতা জন্মায়নি। এসব গুণ আহরণ করা চলে না, অন্তর্নিহিত শক্তিবলে অর্জন করতে হয়, স্বোপলব্ধ হওয়া চাই। ফলে অশিক্ষিত লোক স্যুট পরলে যেমন তা তার দেহে খাপ খায় না, আমাদের মনের সঙ্গে য়ূরোপীয় ভাবধারাও তেমনি মিশে যেতে পারছে না। তাই আমাদের আত্মবোধ যত প্রবল, গণবোধ তত সাবলীল নয়। এজন্যেই শিক্ষা-প্রবুদ্ধ ও সংস্কৃতিপরায়ণ য়ূরোপে যা সহজেই সম্ভব হয়েছে, নতুন শিক্ষিত আমাদের কাছে তা-ই উঠেছে সমস্যা হয়ে। (শরীফ, ২০১০:১৮)

ইউরোপবাহিত আধুনিকতার নামে কেবল মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণই আধুনিক সাহিত্যের বিষয় হতে পারে না বলে আহমদ শরীফ সতর্ক করেছেন কারণ কিংবা ইট-পাথর-সুড়কির মধ্যেই আধুনিক সাহিত্যের উপাদান নিহিত নেই। আধুনিক সাহিতস্রষ্টাদের তাকাতে হবে নিজের ঐশ্বর্যের দিকে, তাহলে উপাদানের অভাব কোনোদিনও হবে না। আহমদ শরীফ মনে করেন এজন্য রূপায়ণশক্তি প্রয়োজন–

> বাস্তব অভিজ্ঞতা, দেখবার চোখ, বুঝবার বুদ্ধি, অনুভব করবার হৃদয়, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, মানব-মনের রুচি, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, সামগ্রিক জীবনবোধ— সর্বোপরি রূপায়ণশক্তি সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে অপরিহার্য। এজন্যে সাধনা আবশ্যক। (শরীফ, ২০১০:২৩)

গণসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য বা সাম্প্রত সাহিত্যকে একসূত্রে গ্রন্থিত করেছেন আহমদ শরীফ, উল্লেখ করেছেন নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্বে কথা যা সাধারণত ঘটে সাহিত্যে আধুনিকতার মর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে । এই দ্বন্দ্ব ধর্ম-দর্শন-সমাজ-সাহিত্য সবক্ষেত্রেই চিরকালই চলে আসছে। প্রবীণের যা প্রজ্ঞা, তা আসলে সংস্কার; অভিজ্ঞতার প্রতি তাঁদের নির্ভরতা আসলে সংস্কারান্ধতা। একারণেরই গণসাহিত্যের নতুন রসাভাসকে তাঁরা রসোত্তীর্ণ সাহিত্য বলতে রাজি নন। তাঁদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সাহিত্য 'রসসাহিত্য নয়– অভিযানের বাণীবাহক প্রচারপত্র বিশেষ'। এ সাহিত্যে কল্পনা ও হৃদয় প্রাধান্য পায় না, তাই মানবমনের চিরন্তন হৃদয়ানুভূতি ও প্রেরণা নিহিত নেই এতে। অন্যদিকে তারুণ্য তার প্রাণধর্মের প্রাচুর্যের কারণে দ্রোহী ও শক্তিময়। তাই আধুনিক সাহিত্য যে নতুন আঙ্গিক ও মূল্যবোধ নিয়ে হাজির হয়েছে তাতে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন ও চিন্তাজগত গুরুত্ব পায়। আহমদ শরীফ মনে করেন গণসাহিত্য বা কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্য যা-ই হোক-না কেন 'রসসাহিত্য বা চিরন্তন আবেদনের সাহিত্যসৃষ্টিতে বিষয়বস্তু বা আদর্শ বড় কিছু নয়, লেখকের শক্তিই আসল' (শরীফ, ২০১০:২৬)। তাঁর যুক্তি–

প্রথমত- দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ সাহিত্য নেই এবং সাহিত্যের কোনো বিষয়ই চিরন্তন নয়। সাহিত্যের চিরন্তনতা বা স্থায়িত্ব নির্ভর করে মূলত শিল্পীর গৌরব ও শিল্পকৌশলের উপর।

দ্বিতীয়ত- দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে আর শ্রেণিতে শ্রেণিতে যখন অধিকারবোধ তীব্র হয়ে উঠেছে, মানুষের ব্যবচহারিক জীবন অভাব-অনটন আর ধন-বৈষম্যে হয়ে উঠেছে জর্জরিত, বেঁচে থাকাই হয়ে উঠছে দুঃসাধ্য তখন মনুষ্যত্ব বিকাশক সুন্দর-বৃহৎ-মহতের সাধনায় আত্মনিয়োগ অসম্ভব। ফলে ব্যক্তিসত্তায়

সংগ্রামী বীজ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গণচিত্ত করেছে বিক্ষুব্ধ, বিস্রস্ত। তাই বুনিয়াদী শিল্পকলা ও রুচিসৌন্দর্যে মানুষের অনুরাগ প্রদর্শন কঠিন হয়ে পড়েছে।

আহমদ শরীফ এই বিশ্লেষণের আলোকে লিখেছেন–

> আধুনিক গণসাহিত্যকে প্রচারপত্রিকা বলে উপহাস করবার কারণ নেই। এ আদর্শে রচিত কোনো রচনা যদি পাঠক-হৃদয়ে সাড়া না জাগাতে পারে, তবে বুঝতে হবে, লেখক অক্ষম– প্রতিভাহীন। আদর্শ ছোট নয়– বিষয়বস্তুও সাহিত্যের উপাদান হবার অযোগ্য নয়। (শরীফ, ২০১০:২৬)

নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্বে, আধুনিক ও প্রাচীনের দ্বৈরথে আহমদ শরীফ নতুনের পক্ষ নিয়ে প্রাচীনকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে, এই দুয়ে আসলে কোনো অনৈক্য নেই, রূপ আলাদা। মানুষের সমাজে এই দুয়ে যত অনৈক্য, বিরোধ থাকুক না কেন পরিণামে ঐক্যই সর্বত্র বিদ্যমান, উদ্দেশ্যগত কোনো বিরোধ তাদের নেই। উভয়ই একই সমাজবিকাশের পথযাত্রী– প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কার পাল্টালেও মানুষ চিরদিন সামাজিক জীবই থাকবে। আধুনিক সাহিত্যের মানবিক বিবেচনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি আস্থাবান আহমদ শরীফ সাহিত্যের পরিবর্তনকে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন–

> শিক্ষা-সভ্যতার প্রসারের ফলে মানুষের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলো অধিকতর বিকাশ লাভ করছে, বেহেস্ত-দোজখের শান্তি-শাস্তি নিরপেক্ষ সহজ মনুষ্যত্বের প্রেরণায় মানুষের মানবতাবোধ ও সুরুচি মানুষকে বিবেচক ও ন্যায়ানুরাগী করে তুলতে বাধ্য, যা আগের যুগে আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক শক্তির দোহাই কেড়েও সম্ভব হয়নি। (শরীফ, ২০১০:২৭)

৩.৩.১০

আধুনিক সাহিত্যকে প্রচার সাহিত্য, বিপ্লবী সাহিত্য অথবা গণসাহিত্য নামে আখ্যা দিয়েছেন আহমদ শরীফ। মানুষের জীবন ক্রমাগত বস্তুতান্ত্রিক ও জটিলতর হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে এই সাহিত্য সৃষ্টি। মন্ময় ও তন্ময় উভয় সাহিত্যই তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেন। কারণ যাঁরা কেবল সাহিত্যের উপযোগিতার কথা বলে তারা যেমন ভুলে যায় 'সৌন্দর্য সৃষ্টিটা সবসময়েই ব্যবহারিক প্রয়োজনের বাইরে।... বস্তুত জৈব প্রয়োজন যেখানে শেষ, সেখান থেকেই আসল জীবনের চাহিদা আরম্ভ হয়। ... তাঁরাও বক্তব্য বিষয়কে উপমা-অলঙ্কার সহযোগে সুন্দর (অর্থাৎ সাহিত্য) করে তুলতে চান' (শরীফ, ২০১০:২৯)। মূলই বৃক্ষের জীবন, কিন্তু মূলের সমস্ত চেষ্টাই অন্তিমে ফুল ফোটানোর দিকে; একইভাবে যে মাটির ওপর তাজমহলের দাঁড়িয়ে তার গুরুত্ব কম নয় অথচ সেই মাটির পরিচয় তাজমহলের ভিত্তি বলেই– এভাবে প্রচার সাহিত্য ও আদর্শভিত্তিক সাহিত্য অথবা গণসাহিত্য ও রসসাহিত্যের সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন আহমদ শরীফ। উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টিতে উভয়ের গুরুত্বই ব্যাখ্যা করেছেন অলঙ্কৃত শব্দচয়নে–

> বস্তুত গণসাহিত্যবাদী আর রসসাহিত্যপন্থীদের উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন– তা হচ্ছে জীবনকে নির্বিঘ্নে উপভোগ করা। অতএব গণসাহিত্যবাদীদের ডাল-ভাতের সংগ্রাম সেই মনো-জীবন বা মনন-জীবনকে স্বচ্ছন্দে-নির্বিঘ্নে উপলব্ধি ও উপভোগ করবার জন্যেই। তারা আজ means (উপায় বা উপলক্ষ) এর জন্যেই সংগ্রামরত, এই means যে end- এ (সিদ্ধিতে) পৌঁছাবে, তা অনুভূতির জীবন বা মনন-জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলবে। সুতরাং তাদের গণসাহিত্য অস্থায়ী সংগ্রামী সাহিত্য মাত্র– স্থায়ী রসসাহিত্য নয়। (শরীফ, ২০১০:৩০)

এভাবেই গণসাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট তৈরি হলো, যখন বিপুলা পৃথিবীর ভোগ্যসামগ্রীতে টান পড়ল, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানুষের সম্পর্ক নিরূপণ করতে শুরু করল, মানুষ ভোগেচ্ছু ও ভোগী, ধনী ও গরিব এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। ভোগেচ্ছু-বিক্ষুব্ধ দলবদ্ধ বঞ্চিত জনগণ মহৎ-নামের আবরণে সমবিত্ত ও সমভোগের জন্য তাদের লালসা বা আকাঙ্ক্ষার মনোবৃত্তিকেই মহিমময় করে তুলে ধরেছে মানবতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, জীবনবাদ প্রভৃতি বুলির আবরণে। গণসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

মানবতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, গণজীবনে শ্রদ্ধা ও দরদ, প্রচলিত সমাজ-ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবজ্ঞা, বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ এসব সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। বাস্তবে জীবনায়ণের গৌরবে মানবতার বাণী প্রচারের দম্ভে, জীবন ও জীবিকার অভিন্ন স্বরূপ উদ্ঘাটন-গর্বে, জগৎ ও জীবনের যথার্থ সূত্র আবিষ্কার ও অকৃত্রিম সংজ্ঞা প্রয়োগ-গৌরবে এ সাহিত্য আজ বিশ্বনন্দিত ও গণবন্দিত। এ সাহিত্যের মহান আদর্শ হচ্ছে–'মানুষের জন্যে, জীবন-জীবিকার জন্যে, মানবতাবোধ প্রসারের জন্যে, মানবকল্যাণের জন্যে, সমাজ-উন্নয়নের জন্যেই সাহিত্য।' মূলত ইর্ষা, ভোগেচ্ছা, বঞ্চিত বুকের বিক্ষোভ ও অভিযোগ সম্বলিত এ সাহিত্যও রোমান্টিক। এ রোমান্টিকতা আকাশচারী নয়–ভূমি-নির্ভর, কল্পনাসর্বস্ব নয়–ক্লেদাক্ত কামনাপুষ্ট বাস্তব জীবনভিত্তিক। মহিমময় বুলির আবরণে এরই জয়গানে আমরা মুখর।

মানুষের সাহিত্য মানুষের মন-মননেরই প্রতিচ্ছবি–মানুষের আন্তর্জীবনেরই বাগ্-বন্ধ রূপ। এ অর্থে সাহিত্য চিরদিনই বাস্তব-জীবন ও বাস্তববোধ-ভিত্তিক। কাজেই সাহিত্য কোনোকালে কৃত্রিম অবাস্তব অলৌকিক ছিল না। মানুষের জীবনবোধ যে-যুগে যেমনটি ছিল, সাহিত্যে তেমনটিই বিবৃত হয়েছে। (শরীফ, ২০১০:৩৪)

রসকল্পের তথা সাহিত্যের আধেয় বা বিষয়ের বিবর্তনের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে রূপকল্প তথা আধার বা বিষয়ীর বিবর্তন স্বাভাবিক বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। এ প্রসঙ্গে নতুন-পুরাতনের গ্রাহ্যতা-অগ্রাহ্যতার দ্বন্দ্ব উত্থিত হয় স্বভাবতই। আহমদ শরীফ বরাবরের মতো নতুন রূপকল্পকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন, 'মানুষ যতটা পশ্চাৎমুখী, সে পরিমাণে সম্মুখদৃষ্টিসম্পন্ন নয়। তাই ইতিহাসের সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ চিরকাল নতুনকে অভিনন্দিত না করে পুরাতনকে বন্দনা করেছে' (শরীফ, ২০১০:৩৫)। ধর্ম-রাষ্ট্র-সাহিত্য সব ব্যাপারেই মানুষ নতুনকে বিদ্রোহী জেনেই প্রতিহত করতে চেয়েছে, তবু নতুনের প্রতিষ্ঠা রোধ করা যায়নি। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে মানুষের বুদ্ধি-বোধ ও যুক্তিবাদী মনের বিকাশ সাধিত হয়। বহুকাল ধরে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও আচারনিষ্ঠতা দ্বারা লালিত কাব্যকৌশল নিয়ে দেখা দিল সন্দেহ। রূপকথা, উপকথা, পুরাণ-কাঠামো যে-উপাদানে তৈরি, মানুষের মন থেকে মুছে গেল সে-সব। মানুষের যুগযুগান্তর লালিত বিশ্বাস ও সংস্কার ভেঙ্গে চুরমার হল। তাই আজকের দিনে আর রূপকথা তৈরি হয় না, উপকথা বলবার লোক নেই, পুরাণ শুনবার ধৈর্য নেই। আদি বা মধ্যযুগের সে-জগৎ নেই, তাই সে-জীবনও নেই, তাতেই সে-সাহিত্য-শিল্প আর ধর্মবোধও নেই। ফলে শিল্প-সাহিত্যের রূপকল্প তথা আঙ্গিকেও এলো পরিবর্তন। আহমদ শরীফের ভাষায়–

স্থানিক, কালিক আর পাত্রিক বিবর্তনে সাহিত্যের রসকল্পে নয় শুধু, রূপকল্পেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। বলেছি, মানুষের জীবনের তথা সাহিত্যের আদি ও মধ্য স্তর ছিল অজ্ঞতার যুগ; তাই কল্পনা, বিস্ময় এবং উচ্ছ্বাসই ছিল সাহিত্য-দেহের হাড় ও প্রাণ। কল্পনায় ভাটা পড়লে কল্প-সৃষ্ট বস্তুর মূল্য কমে যাবেই, বিস্ময় উবে গেলে বিস্ময়ের অবলম্বনও বাজে হয়ে যায়, আর কল্পনা-রূপ আধার না থাকলে আধেয় বিস্ময়ও পায় লোপ, কাজেই বিস্ময়জাত উচ্ছ্বাসের জন্ম উৎসই যায় শুকিয়ে। আর এসবকিছুর উৎস ছিল হৃদয়বৃত্তি এবং তজ্জাত বোধি। মুক্তবুদ্ধি পাত্তা পায়নি সে যুগে।... মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ হৃদয়বৃত্তির আশ্রয় ত্যাগ করে বুদ্ধি-বৃত্তির নিশ্চিত স্মরণ নিয়েছে। আজকের মানুষের বুদ্ধিনির্ভর। হৃদয়-ধর্ম জল-শোধন যন্ত্রের মতো বুদ্ধিকে আশ্রয় করে, বলা যায়–বুদ্ধির দ্বারা শোধিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এভাবে মিতালি ঘটেছে মন-মস্তিষ্কের। আবেগও তাই উদ্বেগ বলে ভ্রম জন্মায়। (শরীফ, ২০১০:৩৭)

পুরানো বিশ্বাস মিথ্যে হয়ে গেলে পুরনো রূপপ্রতীকও আবেদন হারায়। বিজ্ঞান, যুক্তি-বুদ্ধি মানুষের রুচির বিকাশে সূক্ষ্মতর মাত্রা ও নিয়ন্ত্রিত-উচ্ছ্বাসের আবহ সঞ্চার করে। একারণে একই প্রতিবেশ-পরিমণ্ডল থেকে উপমা-প্রতীক আহরণ সত্ত্বেও আগের রূপপ্রতীকের সাথে আধুনিকের এত পার্থক্য। তবে আহমদ শরীফ পুরনো রূপপ্রতীকের মধ্যেও চিরনতুন উপমা আছে বলে মনে করেন, যা সময়ান্তরেও পুরনো হয় না। আসল বিষয় মানুষের মনে আনন্দ ও সাড়া জাগানোর ক্ষমতা। নতুন অনুভব যে রূপপ্রতীকের আশ্রয়ে মানুষের উপভোগ্য হয় তা-ই গ্রহণীয়। কারণ–

পৃথিবীটা পুরোনো বটে, কিন্তু তার জনপ্রবাহ নতুন। তাই তার অধিবাসীদের চোখে এ ভুবন চিরনতুন। জীবনযাত্রায় তারা নতুনভাবে আবিষ্কার করে জগৎকে, অনুভব করে জীবনকে, রচনা করে ভুবন, বিকশিত হয় জীবন। এ চলার পথের উল্লাস কিংবা যন্ত্রণা, জিজ্ঞাসা কিংবা অভিজ্ঞতা অভিব্যক্তি পায় তাদের কাজে, কথায় অথবা লেখায়। অতএব মানুষের মনটি তাজা আর

> অনুভূতি মাত্রই চিরনতুন।... নতুন তাৎপর্যে জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি ও উপভোগ করা না গেলে চকিত ও চমৎকৃত করার অসামর্থ্যে পুরোনো পৃথিবী মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। (শরীফ, ২০১০:৪০)

৩.৩.১১

আহমদ শরীফের বঙ্কিম-বিবেচনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে ও পরে প্রায় দুই দশক কালপরিধিতে বিচার্য। ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্তি-দর্শনপরিস্রুত চিন্তাচেতনার অধিকারী, উদার মানবতাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৯-১৮৯৪) আহমদ শরীফের মনোযোগ ও চেতনার নৈকট্য দুই-ই আকর্ষণ করেছিল প্রধানত 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তা' হিসেবে। কিন্তু সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানবাদী ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি নির্মাণ-নির্দেশনার প্রাবল্য ও পরিচর্যার কালে, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেয়ার বাদ-প্রতিবাদের মুখে, সর্বোপরি পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে প্রথম প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্বলতা ও নেতিবাচক দিকগুলোই প্রধান হয়ে উঠেছিল আহমদ শরীফের কাছে। বঙ্কিমের ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস্নাত উদার মানবতাবাদী চিন্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে 'বঙ্কিম মানস' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন–

> তিনি অন্তরে যত য়ূরোপমুখী, বাইরে তাঁর বিরূপতাও তত অধিক। এমন অবস্থায় সাধারণত দু-কূল রক্ষা করা যায় না। বুদ্ধিমানের চোখে বঙ্কিমচন্দ্রের এই দুর্বলতা ঢাকা রইল না। তাঁর কৃষ্ণ উনিশ-শতকী আদর্শ রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর প্রভাবজ সৃষ্টি। তাঁর সাম্যবাদে দু-কূল রক্ষার অপচেষ্টা প্রকট এবং তাঁর ধর্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য Rationalism -এর অপপ্রয়োগ দুষ্ট।...
>
> বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় প্রত্যয়দৃঢ়তা ও উদারবিস্তার নেই; অসামঞ্জস্য আছে অনেক। তিনি খিড়কি দোর দিয়ে য়ূরোপের প্রসাদ লুট করতে চাইলেন, কিন্তু সদর দরজা দয়ে স্বাভাবিকভাবে কিছু গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। (শরীফ, ২০১০:১৭৩)

এমনকি, বঙ্কিমের মনন-দৈন্যের উদাহরণে জাতীয় প্রয়োজন ও ডাকে সাড়া না দেয়ার সমালোচনাও করলেন–

> তিনি[বঙ্কিম] নিজে প্রগতিবাদী ও জাতিগত-প্রাণ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় উন্নয়নমূলক কোনো কাজে বা আন্দোলনে তাঁর সমর্থন ও হযোগিতা মেলেনি বরং বিরূপতা দেখিয়ে নিজের ওজন হালকা করেছেন। (শরীফ, ২০১০:১৭৩)

অথচ, 'বঙ্কিম বীক্ষা : অন্য নিরীখে' প্রবন্ধে বর্ণিত বঙ্কিম 'স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ, দিগন্তবিসারী দৃষ্টি'র অধিকারী যাঁর 'জগতের ও জীবনের অন্ধি-সন্ধি, সূক্ষ্ম, নির্ভুল ও নিরপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করবার দুর্লভ সামর্থ্যও ছিল।' (শরীফ, ২০০৬:১৪৮) এই বঙ্কিমকেই 'নব্য য়ুরোপের মানস-সন্তান' (শরীফ, ২০০৬:১৬১) আখ্যা দিয়েছেন আহমদ শরীফ। প্রথম প্রবন্ধে বঙ্কিম মুসলিম বিদ্বেষী ও পক্ষপাতদুষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধে শিল্পী-বঙ্কিম মুসলিম চরিত্রের প্রতি বিদ্বেষী নন। আহমদ শরীফ একবার অভিযোগ করেছেন 'বাঙলাদেশে মুসলমানকে বাদ দিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুর স্বাধীনতা-বাঞ্ছা যে পূর্ণ হবার নয়–এ বাস্তব বুদ্ধি তাঁর [বঙ্কিমের] কাছে প্রশ্রয় পায়নি' (শরীফ ২০১০:১৭৫)। আবার বঙ্কিমকেই পথিকৃৎ মেনেছেন কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলিমদেরও উন্নতি না হলে গোটা বাঙলার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হবে না (শরীফ, ২০১২:১৬৫)।

পুনর্মূল্যায়নে অবশ্য বঙ্কিমের মুসলিম চরিত্রগুলো সমালোচকদের কাছে যথার্থ গুরুত্ব না পাওয়ার কারণকে 'রাজনৈতিক' বলেছেন আহমদ শরীফ। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিতে সত্যতা পাওয়া যায়–

> রাজনৈতিক কারণে এতকাল অস্বীকৃত হলেও মানতেই হবে যে বঙ্কিম-সাহিত্যে মুসলিম চরিত্র মাত্রই (আমাদের মতে বিতর্কিত জেবউন্নিসাও) সাধারণভাবে অনিন্দ্য নয় শুধু, এদের কেউ কেউ উঁচুমানের অনন্য মানুষ। আয়েষা, ওসমান, কৎলু খাঁ, মেহেরুন্নিসা, সেলিম, মহম্মদ আলী, মীরকাসিম, দলনী, মবারক, দরিয়া, আওরঙ্গজেব, জেবউন্নিসা, চাঁদ শা– এদের মধ্যে আয়েষা, ওসমান, মহম্মদ আলী, দলনী, মবারক, দরিয়া অনন্য। (শরীফ, ২০০৬:১৫৭-৫৮)

ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গির স্ববিরোধী ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজগৎ' প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধের একাংশে আহমদ শরীফের অভিমত–

> ব্যক্তি বঙ্কিমের কোন ইংরেজপ্রীতি ছিল না, ইংরেজের তথা য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন ইতিহাসই তাঁর মন হরণ করেছিল। বঙ্কিম ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ওপরঅলা ইংরেজের সঙ্গে কখনো সদ্ভাব রাখেননি, তেমনি তাঁর সাহিত্যেও ইংরেজকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করেছেন। (শরীফ, ২০১৪:১৪৭)

অথচ 'বঙ্কিম বীক্ষা : অন্য নিরীখে' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন অন্য কথা–

> কেবল ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নন, প্রাবন্ধিক বঙ্কিমও ইংরেজশাসনের স্থায়িত্ব চান-"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরম উপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। সেইসকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। (শরীফ, ২০১০ক:১৫২)

আমাদের বিবেচনায়, আহমদ শরীফের বঙ্কিম-মূল্যায়নের এই ব্যবধান-বৈপরিত্ব[৮৭] রাজনৈতিক কারণে, রাজনৈতিক বাস্তবতা-সাপেক্ষ। সাতচল্লিশোত্তর ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র থেকে একাত্তর-পরবর্তী ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক ও স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের মানসমুক্তির ফল।

আহমদ শরীফ প্রথম থেকেই শিল্পী বঙ্কিম ও রাষ্ট্রচিন্তক বঙ্কিমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের এবং পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণের প্রয়াসী ছিলেন। বঙ্কিমের মধ্যে শিল্প আর সঙ্কল্পের বিরোধের নিরসন কখনও হয়নি, তবে প্রায়ই শিল্পী বঙ্কিমের জয় হয়েছে বলেই মনে করেন আহমদ শরীফ (শরীফ, ২০০৬:১৪৯)। একথাও অনস্বীকার্য যে, বঙ্কিম প্রসঙ্গে সমালোচক হিসেবে আহমদ শরীফের অনেক প্রত্যয়ই শেষাবধি অটুট ছিল, বিশেষত বঙ্কিম-মানসের সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের পরিণতি এবং সাম্প্রদায়িক হিসেবে বা মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকে ভুল প্রমাণ করতে আহমদ শরীফ প্রথম থেকে শেষাবধি তাঁর অবস্থান থেকে বিচ্যুত হননি, বরং 'বঙ্কিম মানস' প্রবন্ধের পর বঙ্কিমচন্দ্র মূল্যায়নে আহমদ শরীফের উপলব্ধির গভীরতা, যুক্তি ও বিশ্লেষণে স্বচ্ছতা অনেক বেশি; স্বমতে তাঁর অবস্থানও দৃঢ়। উনিশ শতকের কলকাতাবাসী নব্য-শিক্ষিত শহুরে যুবকদের চোখে 'পড়ে পাওয়া ইয়োরোপীয় চিন্তা-চেতনা'র 'বাইরের আবরণ নয়, ঐশ্বর্য ও পৌরুষ'ই (শরীফ, ২০০৬:১৫৯) শুধু ধরা পড়েছিল, বঙ্কিম-মানসকে এমন পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করেছেন আহমদ শরীফ–

> প্রতীচ্যের বুর্জোয়ার উদার মানবতা ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শন স্বাধীনতাপ্রীতি ও স্বাতন্ত্র্যবোধ, যুক্তিবাদ ও স্বাধিকার-চেতনা শিক্ষিত বাঙালীকে স্বাপ্নিকে ও বাক্‌পটু করে তোলে। কিন্তু পড়ে-পাওয়া সমকালীন য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনার স্বরূপ কিংবা তাৎপর্য ছিল তাদের অনায়ত্ত। তাই ফরাসি বিপ্লবের মর্মকথা তারা মুখে ব্যাখ্যা করত, কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখত না, য়ুরোপের দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তার দৃষ্টান্ত তাদেরকে বিকৃতভাবে স্বধর্মীর জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ তাদের শাস্ত্রে ও আচারে বিজ্ঞান ও যুক্তিসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। অসামান্য মনীষাধর বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং হলেন এ বিভ্রান্তি ও বিকৃতির শিকার। হিন্দু জাতিসত্তা নির্মাণে ও হিন্দুত্বের আদর্শ নিরূপণে বঙ্কিম আত্মনিয়োগ করেন, তাই বারোশ থেকে উনিশশ অবধি গোটা মধ্যযুগ হয়েছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের বিষয়বস্তু। (শরীফ, ২০১২:১৫৪)

তাছাড়া বঙ্কিম 'ব্রিটিশাশ্রিত দ্বিতীয় স্তরের বা দ্বিতীয় প্রজন্মের লোক' যারা 'প্রাচ্য-দ্বেষণা ও প্রতীচ্য-এষণা তথা প্রাচ্যে অবজ্ঞা ও প্রতীচ্যে শ্রদ্ধা নিয়েই প্রথমজীবনে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ শুরু করেছেন; কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে আবার এঁরাই হলেন কিছুটা স্বস্থ ও সুস্থ সনাতনী এবং স্বাদেশিক-স্বাজাতিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনার অনুশীলনে নিষ্ঠ। (শরীফ, ২০০৬:১৪৭)

এই মানস-গঠনের মধ্যেই, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয় প্রজন্মের' সকল মনীষীর মধ্যেই লক্ষ্যযোগ্য, বঙ্কিমের বিরুদ্ধে মুসলমানকে 'নিন্দাগাল' দেয়ার অভিযোগেরও জবাব খুঁজে পান আহমদ শরীফ–

> হিন্দু-মহিমার উদ্গাতা বঙ্কিম কাহিনীর মধ্যে আত্মবিস্মৃত, সংকল্পবিচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মানব-মনোবৃত্তির গতি-প্রকৃতিজিজ্ঞাসু শিল্পী বঙ্কিমে পরিণত হন। তখন লীলাচঞ্চল জীবন তাঁকে মুগ্ধ ও অভিভূত রাখে। তাই কেবল উদ্দেশ্যদুষ্ট সচেতন অশিল্পী বঙ্কিমই (বিক্ষুব্ধ হিন্দুর হয়ে) কাহিনি বহির্ভূত মন্তব্যের মধ্যে মুসলমানের [তথা মুঘলের, তুর্কিরও নয়-রাজসিংহে, আনন্দমঠে, দেবী চৌধুরানীতে] অশ্লীল-অসংযত ভাষায় নিন্দা করেছেন। (শরীফ, ২০০৬:১৫১)

তুর্কি-মুঘলের জ্ঞাতিত্বগর্বী দেশি মুসলমান অকারণে এই ‘নিন্দাগাল’ নিজেদের গায়ে মাখে বলেই আহমদ শরীফের ধারণা, তাই ‘মুসলমান স্থলে মুঘল লিখে দিলে হয়তো তাদের গায়ে এতটা লাগত না’ বলেই মনে হয় (শরীফ, ২০০৬:১৫৬)।[৯০]

‘বঙ্কিমের মনোজগৎ’ ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ ‘মানববাদী বঙ্কিম’ ইত্যাদি প্রবন্ধেও আহমদ শরীফের সর্বশেষ অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি। আহমদ শরীফের সর্বশেষ মূল্যায়নেও বঙ্কিমচন্দ্র দেশকাল-সচেতন, প্রগতিকামী, মৌলবাদী। বিবেকানন্দের মত সনাতন ধর্মের আধুনিক মনন-যুক্তিগ্রাহ্য সর্বকালীন সত্য ও প্রয়োগসাফল্য প্রচারকও তিনি। বঙ্কিমের চিন্তা সর্বক্ষেত্রেই ছিল পরিবেষ্টনী ও ইতিহাসাশ্রিত। মানুষ সম্পর্কে ছিল তাঁর অপার আগ্রহ। বঙ্কিমই প্রথম সম্বিৎসাবশে সুবা-ই-বাঙ্গালা বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি তথা বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যাকে স্বদেশ এবং তার অধিবাসীকে স্বজাতিরূপে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে আবিষ্কার করেন। এসবই সত্য, তবে বঙ্কিম-কল্পিত এই দেশমাতা যে কেবল হিন্দুর ছিল না; ‘বন্দেমাতরম্’ ছিল না কেবল তিন কোটি মানুষের গান, ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সাত কোটি মানুষের প্রাণের কথা– এই সত্যটি তিনি জীবনের শেষদিকে এসে বিস্মৃত হয়েছিলেন। বঙ্কিমের এ উপলব্ধিও ছিল অনন্য যে, বিধর্মী বিদেশির দুরভিসন্ধিজাত ইতিহাসে বাংলা বা বাঙালিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাঙালি সত্তার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য লিখতে হবে বাঙালির ইতিহাস। এই ইতিহাসচেতনাই বঙ্কিমের মানস-সম্পদ। তবে আহমদ শরীফ মানেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটে সংস্কারমুক্ত জিজ্ঞাসু ‘মানুষ’ হিসাবে এবং তাঁর তিরোভাব ঘটে একজন খাঁটি ‘হিন্দু’ হিসেবে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উদ্গাতা ছিলেন বলে যে অভিযোগ প্রচারিত হয় সেটি আহমদ শরীফ গ্রহণ করেন না (শরীফ, ২০০৬:১৬৩)। কারণ বঙ্কিমের সময়–

> ‘সম্প্রদায়’ কেবল দল, গোষ্ঠী, গুরুর শিষ্য সমাজ নির্দেশক ছিল। কাজেই বঙ্কিম যদি হিন্দু জাতি গঠনে প্রয়াসী হন কিংবা হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন ও প্রণোদনা দানে প্রয়াসী হন, তা হলে তাঁকে ‘সাম্প্রদায়িক’ বলা যাবে না। (শরীফ, ২০১৪:১৪৬)

তাছাড়া বঙ্কিমের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগও যথাযথ নয় বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। যুক্তি হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতে সাত কোটি মানুষের উল্লেখকে–

> আমরা জানি সমকালীন কোন মুসলিমের প্রতি তাঁর বা অন্য কোন হিন্দু লিখিয়ের কর্মে-আচরণে কোন বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। কেননা উনিশ শতকে মুসলমানরা কোন ক্ষেত্রেই হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না বরং সামাজিক রীতি অনুসারে চাষী-মজুরের প্রতি ছিল তাদের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য। রামা কৈবর্তে ও হাসিম শেখে তাঁর সুপ্ত বা ব্যক্ত পার্থক্য চেতনা ছিল না। বন্দে মাতরম সঙ্গীতের সাত কোটিতে হিন্দু মুসলিম-খ্রীস্টান সবাই আছে। তিনি এ-ও জানতেন বাঙলার মুসলমানরা বাঙলা ভাষায় তাদের মন-মনীষার অভিব্যক্তি না দিলে বাঙলার সামগ্রিক সামূহিক ও সামষ্টিক উন্নতি হবে না।(শরীফ, ২০১৪:১৪৮)

বঙ্কিমসাহিত্যে মুসলিম বিদ্বেষবাহী উপাদান বঙ্কিমের অসদুদ্দেশের সংযোজন নয় বলেই মনে করেন আহমদ শরীফ। তাই এই দায় কখনও ইংরেজের ‘চাকুরে বলে পদচ্যুতির ভয়জাত’[৯১] আবার কখনও উনিশ শতকের সমাজে ‘মুসলিমদের প্রতি বাঙালি হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গি’র[৯২] লেখকসুলভ প্রকাশের ওপর অর্পিত হয়। ‘মানববাদী বঙ্কিম’ প্রবন্ধে শাস্ত্র-ভক্তিকে প্রগতির বিপক্ষে রাখা আহমদ শরীফ শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমকে ‘আধুনিক অর্থে মৌলবাদী মাত্র’ বলেন। হিন্দুত্বগর্বী বঙ্কিমের নিকট থেকে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে তিনি পৃথক করে রাখেন। আবার বঙ্কিমমানসে এই ‘আকস্মিক হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ’[৯৩] এর কারণেই যে উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ বিঘ্নিত হয়েছিল এই ঐতিহাসিক সত্য উচ্চারণ করেন নির্দ্বিধায় (শরীফ, ২০১৪:১৫৩)।

আহমদ শরীফের বঙ্কিমচন্দ্র মূল্যায়ন নানা বৈপরিত্ব সত্ত্বেও প্রথম থেকেই তিনি যাকে বঙ্কিমের ‘স্থায়ী কলঙ্ক’[৯৪] বলে উল্লেখ করছিলেন শেষাবধি তাকেই বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছেন–

> পঁয়তাল্লিশোত্তর জীবনে বঙ্কিম একেবারে অন্য মানুষ। সে-মানুষ 'সাম্য' রচনার জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত এবং পুনর্মুদ্রণে নারাজ। "একসময় মিলের আমার উপর প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে। -সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।" এর মুখ্য কারণ-যে-সনাতন শাস্ত্রের মহিমা প্রচারে তিনি বদ্ধপরিকর, সেই শাস্ত্র-শাসিত সমাজে বর্ণভেদ-প্রসূত পীড়নের কথা ছিল 'সাম্যে'। এখন পূর্বনিন্দিত শাস্ত্র-সমাজের বন্দনা রচনাকালে পূর্ব-নিন্দন-স্মৃতি লোপ করতেই হয়। এমনিতেই মানুষের জীবনে স্ববিরোধিতা থাকেই, তাছাড়া উনিশ শতক ছিল নব্যবঙ্গের অস্থিরতার ও স্ববিরোধের কাল। শেষ দশ বছরের বঙ্কিম 'যতি'। যখন তিনি 'চিত্তশুদ্ধি' নামক অমৃতের সন্ধানী। কেননা "যাহার চিত্ত শুদ্ধি নাই, তাহার কোনো ধর্ম নাই। এই চিত্তশুদ্ধি আসে ধর্মবোধ ও ধর্মভাব থেকে। তাই তাঁর মতে "মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম।" তাই "কেবল হিন্দু ধর্মই সম্পূর্ণ ধর্ম"। -ইনি কি সেই বঙ্কিম যিনি একদিন উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, "বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস। যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু!" কয়েক বছর আগেকার বঙ্কিম জানতেন, "সমগ্র বাঙালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোনো মঙ্গল নাই," (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯ সন)। একদিন এ বঙ্কিমই 'সাম্যে' মানবপ্রেমিক সাম্য-সংস্থাপক বলে বুদ্ধ, যিশু ও রুশোর প্রশস্তি গেয়েছিলেন। (শরীফ, ২০১২:১৬১)

বঙ্কিমের চিন্তা-চেতনার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে[৯৫] আহমদ শরীফ বড় প্রতিভার 'জানা-বোঝায় ভুলত্রুটি'র (শরীফ, ২০১৪:১৪৮) মতো লঘুত্বে বিবেচনা করেছেন। বঙ্কিমের হিতবাদী থেকে ভাববাদীতে পরিণত হওয়া যুগধর্ম; বঙ্কিম ধর্মে বিশ্বাসী হলেও আর দশজনের মতো নন, ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যাপ্রবণ; বঙ্কিমের যে শাস্ত্রে আস্থা তাও সাধারণ নয়, 'টীকাভাষ্যযুক্ত শাস্ত্র' (শরীফ, ২০১৪:১৫৩)। এমনকি বঙ্কিমের হিন্দুয়ানিকে পঁয়তাল্লিশ-উত্তর বয়সের শারীরিক অসুস্থতা, সাংসারিক-পারিবারিক বিরোধ, সন্তানহীনতার হতাশা-ব্যর্থতা উদ্ভূত বলে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, আঠারো শতকের নওয়াব-প্রশাসকদের নিন্দা করা 'বিক্ষুব্ধ দেশপ্রেমী বঙ্কিমের' কাজ। এসবই বঙ্কিম-মানস বিশ্লেষণে আহমদ শরীফের প্রশংসাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুরাগবাহী চিন্তাকেই প্রতিফলিত করে। ফলে এ প্রতিপাদ্য অযৌক্তিক হবে না যে, শেষ পর্যন্ত আহমদ শরীফ শিল্পী-মনীষী-মানববাদী বঙ্কিমের অকুণ্ঠ অনুরাগী এবং নাস্তিক-বিজ্ঞানমনস্ক-জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমের জন্য সন্তপ্ত ও হতাশাদীর্ণ।

৩.৩.১২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্যকর্ম ও মননশীলতা সম্পর্কে আহমদ শরীফের বিশ্লেষণও কালিক প্রয়োজনে বা পরিবর্তনে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। কেবল ভাবালু বা মুগ্ধ দৃষ্টি নয়, সুস্থ বিতর্কের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে কালোপোযোগী করে উপস্থাপনের প্রয়াস আহমদ শরীফের রবীন্দ্র-বিবেচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই বিতর্ক আহমদ শরীফ নিজেই শুরু করেছিলেন স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে 'রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জন্য আদর্শ বা সম্পদ হতে পারে না' এমন আপাত-রবীন্দ্রবিরোধী মন্তব্যের মাধ্যমে। যদিও আহমদ শরীফই আবার ছয়ের দশকে রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদযাপনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সামরিকজান্তা ও দেশীয় সহযোগীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদমুখর, রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ। উল্লেখ্য যে, বাঙালির ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর নানামুখী আক্রমণের এক দুঃসময় চলছিল তখন; সেই দুঃসময়ে 'রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখতে উৎসাহী ও অনুরাগী লোকের অভাব ছিল বাংলাদেশে' (কবির, ২০১০:৬৭৬)।

স্বাধীনতা-পূর্ব কালে প্রকাশিত *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮) এবং *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা* (১৯৬৯) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধে[৯৬] আহমদ শরীফের রবীন্দ্র-বিবেচনা বিধৃত হয়েছে। *বিচিত চিন্তা*-র 'সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের লক্ষ্য রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় দেওয়া, তবে 'সতর্কদৃষ্টি ও অবিচলিত মন ও মননের' প্রয়োজনীয়তা মনে রেখে। রবীন্দ্র-মানসের বিচারবোধ, প্রেরণা ও সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার উৎস-প্রেক্ষিত বিবেচনা করে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন– 'খণ্ড-ক্ষুদ্রকে সামষ্টিক সমগ্রতায় উপলব্ধি করার জন্যে দৃষ্টি ও মননের যে-প্রসার

প্রয়োজন', অনেকের যা পরিশীলনেও সম্ভব হয় না' রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা প্রায় অনায়াসলব্ধ (শরীফ, ২০১০: ১৮০)। প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যানুভূতির প্রকাশ রবীন্দ্র-প্রতিভার বাল্য-শৈশব-জ্ঞান থেকে আহৃত, তাই–

> এরই বিকাশে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একত্ব ও একাত্ম অনুভব করেছেন; আর এরই বিস্তারে তাঁর ব্যবহারিক জীবনে তথা সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বোধে মানবিকতা, মানবতা, সর্বমানবিকবাদ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা পায়। তাঁর এই মানবধর্মের সমর্থন রয়েছে বলেই উপনিষদ তাঁর প্রিয়। আর ঐক্যতত্ত্বের বিরলতার দরুনই স্মৃতি, পুরাণ ও গীতায় তাঁর অনুরাগ সীমিত। (শরীফ, ২০১০:১৮১)

আহমদ শরীফ যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, রবীন্দ্র-মানসের সৌন্দর্যানুভূতির উৎস বিশ্বমানবের ঐক্য। এটি ঠিক বুর্জোয়া মানবতাবাদীর কল্যাণচিন্তা নয়–

> বিশ্বপ্রকৃতিতে তিনি বৈচিত্রের মধ্যে যে-ঐক্যের কল্যাণচিহ্ন ও সুষম সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিল, সে-তত্ত্ববুদ্ধিই দ্বন্দ্ব-সংঘাত-স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও মানুষের একত্বে ও একাত্মতায় বিশ্বাস রাখতে অনুপ্রাণিত করেছিল; এ অভিন্ন সত্তাবোধে উৎসাহিত হয়েই তিনি বিশ্বমানব ঐক্যে আস্থা রেখেছিলেন। (শরীফ, ২০১০:১৮৩)

ঔপনিষদিক বিশ্বচিন্তা আর গৌতম বুদ্ধের করুণা ও মৈত্রী-তত্ত্ব মিলিত হয়ে এই চেতনা পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং রচনা করেছেন স্বকীয় কাব্যভুবন। আহমদ শরীফের ভাষায়–

> এ বোধের অঞ্জন চোখে মেখেই তিনি প্রাচীন ভারতের দিকে তাকিয়েছিলেন, ফলে সেকালের সমাজে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দ্রোহ কিছুই তাঁর চোখে পড়েনি; তিনি দেখেছেন বহুত্বেও একের অবয়ব, স্বাতন্ত্র্যেও সামঞ্জস্য, শ্রেণীসমন্বিত ও বর্ণেবিন্যস্ত সমাজে প্রীতিপ্রসূত কর্তব্য ও দায়িত্ব-সতেন ব্যষ্টি। তাঁর এ দৃষ্টিতে ইতিহাস চেতনা নেই, কিন্তু সৌন্দর্যবুদ্ধিজাত আদর্শিক প্রেরণা আছে। (শরীফ, ২০১০:১৮৩)

বুর্জোয়া সমাজের আত্মিক ও আর্থিক ঐশ্বর্যের পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ লালিত। বুর্জোয়ার প্রাণময়তা, উদারতা, সংস্কৃতিবানতা ও বিলাস-বাঞ্ছা শহুরে বাঙালির হৃদয়-মন হরণ করেছিল, রবীন্দ্রনাথের পরিবার তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু পিতা দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতা, অধ্যাত্মবুদ্ধিচালিত হলেও রবীন্দ্রনাথ পিতা থেকে উদারতার কিংবা প্রতীচ্য প্রাণময়তার দীক্ষা পাননি। আহমদ শরীফ যথার্থই চিহ্নিত করেছেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক জীবনে স্বাদেশিক, স্বাজাতিক ও স্বধর্মীয় গোঁড়ামি প্রশ্রয় পেয়েছে' –এমনকি উগ্র স্বাজাত্যগর্বী জ্যেষ্ঠদের প্রভাবমুক্তও তিনি ছিলেন না (শরীফ, ২০১০:১৮২)। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার অনন্যতা এখানেই যে, তাঁর ব্যবহারিক জীবন ও শিল্পী জীবনের মধ্যে বিরোধ বাধেনি কোথাও। দেশ-জাত-ধর্মের খোলসমুক্ত হয়ে বিশ্বমানবিক হতে তাঁর লেগেছে পঁয়তাল্লিশ বৎসর।

রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ ও সৌন্দর্যচেতনা একান্তই নিজস্ব। অদ্বৈতবাদী তথা বিশ্ব-ঐক্যে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের বৃহতের সাধনা থেকেই তাঁর স্বাদেশিকতা বিশ্বচিন্তায় এবং জাতীয়তা আর্ন্তজাতিকতায় পরিণত, আর ব্রহ্মচর্যাশ্রম উন্নীত হয়েছে বিশ্বভারতীতে। 'ফাঁকির দ্বারা কোনো ফাঁক পূরণ ছিল তাঁর আদর্শ-বিরোধী' (শরীফ, ২০১০:১৮৪)। তাই–

> দেশের স্বাধীনতার চেয়ে সমাজ-গঠনকে তিনি জরুরি ভেবেছেন, সরকারি সাহায্যের চেয়ে আত্মশক্তির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন, আর ঐশ্বর্যের চেয়ে মর্যাদাবোধের এবং সচ্ছলতার চেয়ে সততার দাম তাঁর কাছে বেশি ছিল। এজন্যেই খেলাফত আন্দোলনকালে গোঁজামিলে হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রতিষ্ঠার নিন্দা করেছেন তিনি, গান্ধীর যন্ত্র ও যন্ত্রশিল্প-বিমুখতা পছন্দ করেননি, পারেননি য়ুরোপীয় শিক্ষা বর্জনে সায় দিতে। (শরীফ, ২০১০:১৮৩)

রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপ থেকে পেয়েছেন ঔদার্যবোধ, এর সাদৃশ্য ও সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন উপনিষদে, বুদ্ধের বাণীতে, মধ্যযুগের সন্তদের সাধনায় ও বাউলের কণ্ঠনিঃসৃত গানে। কারণ মনুষ্যত্ব ও মানবমহিমা ঘোষণাই ছিল তাঁর ব্রত। কিন্তু এর সবকটিই ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার জ্ঞানচর্চায় পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার মধ্যে ছিল বিশুষ্কপ্রায়। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় 'আধুনিক য়ুরোপীয় জীবনচেতনা প্রাচীন ভারতীয় কাহিনীর মাধ্যমে

আজকের বাঙালির উদ্দেশ্যে পরিব্যক্ত' করলেন (শরীফ, ২০১০:১৮৩)। পুরনোই উঠলো নতুন হয়ে, নতুনের জন্য।

'সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্র মনীষা', 'রবীন্দ্র-মানসের স্বরূপ সন্ধানে', 'রবীন্দ্রনাথ', 'অতীন্দ্রিয় লোকে রবীন্দ্রনাথ' সবগুলিতেই আহমদ শরীফ ব্যক্তি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মন-মনীষা ও প্রেরণার নানাপ্রান্ত উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। ফলে রবীন্দ্রমানসে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে ভাব ও শিল্পদর্শনের প্রতিফলিত রূপটি কেমন ছিল তার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় এসব প্রবন্ধে। কিন্তু 'পঁচিশে বৈশাখে', 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গে' প্রভৃতি প্রবন্ধে সমকালীন রবীন্দ্রপাঠকের চিন্তা-চেতনায় আলোড়িত আহমদ শরীফ। সময়ের জিজ্ঞাসাকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয়চেতনা, জাতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্র-বিচারে ব্রতী হয়েছেন তিনি।

'পঁচিশে বৈশাখে' প্রবন্ধে পাকিস্তান সরকারের রবীন্দ্রসাহিত্য ও সংগীতবিরোধী নানা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আহমদ শরীফ রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করেছেন 'পৃথিবীর আত্মীয়-সমাজে আমাদের পরমাত্মীয়' বলে। রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের চিত্তদূত' আখ্যা দিয়ে তিনি লিখেছেন–

> [রবীন্দ্রনাথ]– মানবতার দিশারী, আমদের সামনে এক আলোকবর্তিকা, এক অভয়শরণ, এক পরম সান্ত্বনা। আমার ভাষাতেই তাঁর বাণী শুনতে পাই, তাঁর ভাষাতেই আমার প্রাণ কথা কয়– আমার এ সৌভাগ্যের তুলনা নেই। (শরীফ, ২০১০:২৮৫)

সুযোগসন্ধানী রবীন্দ্রবিরোধীদের সমালোচনা[১৭] করে তাদের অপতৎপরতার মোক্ষম জবাব দিয়েছেন–

> সম্প্রতি জাতির হিতকামী কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী, রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাবের মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে শঙ্কিত, আতঙ্কিত কিংবা দুর্ভাবনাগ্রস্ত। রবীন্দ্রসাহিত্য নাকি আমাদের সংস্কৃতিধ্বংসী। অন্য কোনো বিদেশী সাহিত্যের কু-প্রভাব কিংবা কুফল সম্বন্ধে কিন্তু চিন্তিত নন তারা। অন্তত তাঁদের কর্মে ও আচরণে এখনো প্রকাশ পায়নি সে-ত্রাস। নইলে ইসলামী রাষ্ট্রের মুমীন নাগরিকের উপর চীন-রাশিয়ার ধনসাম্যবাদী নাস্তিক্য সাহিত্যের প্রভাবের মধ্যে নিশ্চয়ই অমঙ্গল দেখতেন তাঁরা এবং শঙ্কিত হতেন মার্কিনী যৌন ও গোয়েন্দা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা দেখে। এ বিষয়ে হিতবুদ্ধিপ্রসূত কোনো অসন্তোষও তাঁদের মুখে প্রকাশ পায় নি কিংবা প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা করেছেন বলেও আমাদের জানা নেই। (শরীফ, ২০১০:২৮৩)

প্রতিবাদ বা বাদানুবাদ নয়, সুচিন্তিত সমালোচনায় রবীন্দ্রবিরোধীদের দল-দিশা-লক্ষ্য চিনিয়ে দেয়াই 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। এখানেও রবীন্দ্রমানসের উদার মানবিকতা, সৌন্দর্যচিন্তা, শ্রেয়োবোধ, বিশ্বঐক্যচেতনার সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> তিনি মানুষ অবিশেষের প্রতি প্রীতির অনুশীলনে সাফল্য লাভ করেছিলেন। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ মানুষের মানবিক গুণে ও আত্মিক উৎকর্ষে আস্থা রাখতেন, অনুকূল আবহাওয়ায় মানুষের সদ্বুদ্ধি ও সৌজন্যেই পীড়ন ও পাপমুক্ত সামজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবে– এ ধারণা বশেই তিনি জাগতিক সব অন্যায়-অনাচারের ব্যাপারে মানুষের বিবেক ও বোধের কাছেই আবেদন জানিয়েছেন। কোনো বাস্তব পন্থায় সমাধান প্রয়াস তাঁর কাছে হয়েতো মনে হয়েছে কৃত্রিম ও জবরদস্তিমূলক– যা স্বতঃস্ফূর্ত নয় বলেই টেকসই নয়। (শরীফ, ২০১০:২৮৭)

কিন্তু যারা রবীন্দ্র-সাহিত্যে মতবাদের আলোকে বিচার করেন তাদের উদ্দেশ্যে আহমদ শরীফের এই বিবেচনা অব্যর্থ মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীলতা 'মহাপ্রাণতাজাত– সমস্যা-বিব্রত দেশকর্মীর নয়'; তিনি কর্মী নন, দার্শনিক (শরীফ, ২০১০:২৮৯)। পীড়নমুক্ত মনুষ্যসমাজের জন্য আকুল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তেমন সমাজ গঠনে বাস্তবপন্থা গ্রহণ বা অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন না– মতবাদে বিশ্বাসীদের কাছে এটাই বিরোধিতার প্রধান অস্ত্র। এ কারণেই তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ অনাদৃত ও অবমূল্যায়িত – একদলের পক্ষে পরিত্যাজ্য বুর্জোয়া সাহিত্য বলে, অপর দলের কাছে অশ্রদ্ধেয় হিন্দুয়ানী বলে। 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ এই অভিযোগের কথা লিখেছেন–

> রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী ছিলেন না, তাঁর রচনা এই সংগ্রামী প্রেরণাপ্রসূত নয়। তাঁর মানবতাবোধ ও মানবপ্রীতি বুর্জোয়া উদারতার প্রসূন মাত্র। কাজেই রবীন্দ্রসাহিত্য কালপ্রবাহে দেশের মৃত ঐতিহ্য মাত্র। এর মূল্য ইতিহাসের উপাদান হিসেবে– জীবনের উপকরণ রূপে নয়। অতএব বামপন্থীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনো উপযোগ মূল্য নেই। এক্ষেত্রে মুসলিম তমদ্দুনবাদীদের মতও স্মরণীয়। তাদের কাছেও রবীন্দ্রসাহিত্য তাদের সংস্কৃতিবিধ্বংসী। একদলের পক্ষে পরিত্যাজ্য বুর্জোয়া সাহিত্য বলে, অপর দলের কাছে অশ্রদ্ধেয় হিন্দুয়ানী বলে। তাদের ধারণায় রবীন্দ্রনাথ যুগের সৃষ্টি ও যুগধর– যুগোত্তর কিংবা যুগ প্রবর্তক নন। (শরীফ, ২০১০:২৮৯)

কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের চিন্তানায়ক ও বিপ্লবীদের চেতনায় শ্রেণিসংগ্রাম ও ধনবৈষম্যের কথা নয়, বরং গুরুত্ব পেয়েছিল মানবতা, সৎ বুদ্ধি, প্রীতি ও নীতির প্রতিষ্ঠা– মতবাদীর রবীন্দ্র-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে আহমদ শরীফের জবাব। তাই যুগানুগত ও মানবতাবাদী জীবনদর্শনই শ্রেয় বলে মানেন আহমদ শরীফ। শোষিতের সংগ্রাম চিরন্তন অথবা কষ্টভোগ থেকেই সংগ্রামের শুরু এই তত্ত্বে সত্য নেই বলেই তাঁর অভিমত–

> চিরকাল মানবিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা বা সংগ্রাম করেছেন মানবতাবাদীরাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শোষিত দরিদ্ররা এত প্রচারণার পরেও আত্মস্বার্থে ধনসাম্যতন্ত্রে তথা সমাজতন্ত্রে আজো উৎসাহবোধ করছে– না এটিই কি শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের অনুপস্থিতির বড় প্রমাণ নয়! এতে বোঝা যায় মানবতাবোধ, মানবপ্রীতি, সংবেদনশীল মন, সংগ্রামী প্রেরণা প্রভৃতি আবেগযুক্ত হলেই ব্যক্তিবিশেষ শোষণ-পীড়ন ও দারিদ্র্যমুক্ত মনুষ্য-সমাজ বাঞ্ছা করে কিংবা গঠনে উদ্যোগী হয়। (শরীফ, ২০১০:২৯০)

একারণে আমরা দেখি বিশ্বের সর্বকালের সকল মহৎ-হৃদয় মনীষী একই লক্ষ্যে কাজ করে এসেছেন, পার্থক্য কেবল পথ ও পদ্ধতির। সবাই মানবদরদী ও মানবতাবাদী। এই ঐতিহাসিক ধারায় রবীন্দ্রনাথও মানবতাবাদী। উদার মানবতাবাদকে বুর্জোয়া ধ্যানধারণাজাত মতবাদ না ভেবে, মানবকল্যাণমুখী চিন্তার প্রসার ভাবাই আহমদ শরীফের মতে যুক্তিযুক্ত। মতবাদীকে তিনি বারাবার স্মরণে করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'কবি-মনীষী– কর্মী নন', আরও জানিয়েছেন–

> তাঁর কর্তব্য ছিল মানুষকে আত্মিক চেতনায় প্রবুদ্ধ করা– বাস্তবে রূপায়ণ নয়। আবহমান কালের ধারায় তিনি যুগপ্রতিনিধি। তাঁর আবেদন মানুষের সদ্বুদ্ধি ও বিবেকের কাছে।... রবীন্দ্রনাথ নিজের সুদীর্ঘ জীবনে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র তিনটেই স্বচক্ষে দেখেছেন– বুঝবার শক্তিও তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন আত্মিকবোধ না জন্মালে বাহুবলে আর্থিকসাম্য স্থাপনে স্থায়ী হতে পারে না। বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের যোগ না ঘটলে তা স্বভাবে পরিণতি পায় না। স্বেচ্ছা সম্মতি আর জবরদস্তির 'সায়' এক বস্তু নয়। কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাবান করে তুলবার সাধনাই করেছেন, কল্যাণ ও সদ্বুদ্ধিপ্রসূত স্বেচ্ছাসম্মতি দানে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন মানবকল্যাণকামী স্বেচ্ছা-সৈনিক। তাঁর এই জীবন-দৃষ্টিকে বুর্জোয়া উদারতা ও দাক্ষিণ্য বলে উপহাস করা অসৌজন্য। (শরীফ, ২০১০:২৯০)

'রবীন্দ্র প্রসঙ্গে' প্রবন্ধেও আহমদ শরীফ রবীন্দ্র-ভাবনায় নিজের অনপেক্ষ ও সুমিত অবস্থান বজায় রেখে রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে রাষ্ট্রিক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছেন। প্রতিবাদ করেছেন 'রবীন্দ্রসাহিত্য সংস্কৃতি-বিধ্বংসী' এমন দুরভিসন্ধিমূলক অপপ্রচারের। আহমদ শরীফ প্রশ্ন তুলেছেন 'ইমরুল কয়েস থেকে হাতেম তাই সব আরব-ইরানি কাফেরই আমাদের শ্রদ্ধেয় কেবল দেশী কাফের রাম থেকে রবীন্দ্রনাথকেই আমাদের ভয়' (শরীফ, ২০১০:২৯১)। তবে তাদের সমালোচনাও আহমদ শরীফ করেছেন যারা অতি-উৎসাহী হয়ে এসবের জবাবে, রবীন্দ্রসাহিত্য যে আমাদের সংস্কৃতির জন্য অকল্যাণকর নয় বরং মানবতাবোধ ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক– এ কথা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে নানা তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করে রবীন্দ্রনাথকেই অপমানিত করেন। প্রকৃতপক্ষে শাসক শ্রেণির কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্যই রবীন্দ্রনাথকে তারা মুসলিম সংস্কৃতি-ঘনিষ্ঠ, 'প্রায় তৌহিদবাদী ও আধা-মুসলমান' বানিয়ে তুলেছিলেন (শরীফ, ২০১০:২৯২)।

ইদানীং আমরা গ্রন্থভুক্ত ''রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ', '১৩৯০ সালে আমার চেতনায় রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন'– প্রবন্ধসমূহ একসূত্রে গাঁথা প্রতিটিই একান্তভাবে সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক দুরাচার, দুর্দশার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজাত এবং মার্কসবাদী শিল্পাদর্শের প্রেরণাপ্রসূত। এসব প্রবন্ধে আহমদ শরীফের রবীন্দ্রবিবেচনা স্বাধীনতা পরবর্তী এক দশকের নতুন বাস্তবতায় ভিন্নধর্মী। বিশেষত 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' প্রবন্ধটি ''প্রমত্ত ভ্রান্তি'র অবিশ্বাস্য ও আশ্চর্য দলিল', 'কলংকিত কাজ' ইত্যাদি তাৎক্ষণিক সমালোচনায় বিদ্ধ হয়।[৯৮] এই প্রবন্ধে আহমদ শরীফ ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ সীমাবদ্ধতা ও নেতিবাচক দিক সংকলন করেছেন অনেকটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই। এমনকি কৃতিত্ব বা যোগ্যতাকে উল্লেখ করেছেন অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা হিসেবে। আহমদ শরীফ 'রবীন্দ্রনাথ ও গণমানব' প্রবন্ধেও এর পুনরাবৃত্তি করেছেন অনেকটা একইভাবে। হুমায়ুন আজাদের মন্তব্য এক্ষেত্রে যথার্থ মনে হয়– 'প্রবন্ধটি নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক নয়, এতে ত্রুটিগুলোকেই বড় করে তুলেছেন তিনি। এমনকি রবীন্দ্রনাথের অনেক গুণকেও দোষ হিশেবে গণ্য করেছেন।' আসলে 'তিনি যেন চারপাশের রবীন্দ্রভক্তদের অন্ধ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন তাদের আরাধ্য দেবমূর্তিটিকে' (হুমায়ূন, ১৯৮৭:১২)।

'আমাদের প্রেরণার উৎস সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথ নন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, সম্পদ নন।' (শরীফ, ২০১০ক:১০৫)– স্বাধীনতার পরপরই টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করে আহমদ শরীফ তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন।[৯৯] পরবর্তীকালে আহমদ শরীফকে এমন মন্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল; যে পরিপ্রেক্ষিতে এমন মন্তব্য তিনি করেছিলেন তার স্মৃতিচারণ স্থান পেয়েছে ''রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ' প্রবন্ধে। এসময়ের কয়েকটি প্রবন্ধের রবীন্দ্রবিবেচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আহমদ কবিরের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়–

> পাকিস্তানী আমলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখালেখির প্রকাশের কালে ডক্টর আহমদ শরীফ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিল্পোৎকর্ষের অনুরাগী প্রধান লেখক; কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে সেই রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হলেন ডক্টর শরীফ, কেননা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্য হিসেবে থাকতে পারে, কিন্তু তিনি সম্পদ নন। সেদিন ডক্টর শরীফের বক্তব্য রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে লিখলেনও। সেদিনের কথা স্মরণ করেছেন ডক্টর শরীফ ''রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ' প্রবন্ধে, তৃতীয় প্রজন্মের পাঠক রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে গ্রহণ করতে পারে সেটিও বললেন 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' প্রবন্ধে। (কবির, ২০১০ক:৪০৬)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্য মূল্যায়নে আহমদ শরীফের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদী সাহিত্যবিশ্লেষকদের অনুসারী। যারা জানে ও মানে যে উৎপাদনে-বণ্টনে বৈষম্যই মানুষের অপনোদনের, দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন যাদের কাম্য। আহমদ শরীফের মতে, রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছে মহান ঐতিহ্য বা সম্পদ নয়, জীবন-চেতনার পুঁজিও নয়– গণমানবের বাঞ্ছিত সমাজ ও জীবন গড়ার পথে মোহমুক্ত থাকতেই তাদের রবীন্দ্রসাহিত্যের যাদুস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হয়, কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের উপযোগ-বুদ্ধি বিস্মৃত হলে তাদের চলে না। আহমদ শরীফের এই মন্তব্য মতবাদীর রবীন্দ্র-বিচারের মূলনীতি বলা যায়।[১০০] এই মূলনীতির সূত্র ধরেই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিপ্রেক্ষিতে আহমদ শরীফের রবীন্দ্রবিচারে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। এর মূল গণমানবের উপযোগভিত্তিক সাহিত্য-প্রাধান্য। উৎপাদন-যন্ত্রের তথা হাতিয়ারের পরিবর্তনসূত্রে বৃত্তিজীবী মানুষের জীবন ও সমাজভাবনার রূপ-রূপান্তরকে শিল্পসাহিত্যের উপজীব্য করার মাধ্যমে সামাজিক-বিপ্লবের সহযোগী হয়ে ওঠার দায় থেকে রচিত গণসাহিত্য আহমদ শরীফের এ সময়ের বিবেচনায় প্রকৃত মর্যাদায় অভিষিক্ত। রবীন্দ্রসাহিত্যে নির্বিত্ত-ভূমিহীন ক্ষুদ্র-তুচ্ছ-নিম্ন শ্রেণিপেশার সাধারণ মানুষের দুর্লভ উপস্থিতি প্রমাণ করে তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত অন্তরের গভীরে প্রোথিত সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়াচেতনা ও স্বার্থবোধ শেষাবধি পরিহার করতে সমর্থ হননি। এমনকি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে বৈশ্বিকচেতনায় উত্তরণ সত্ত্বেও তাঁকে শোষিতের পক্ষে লড়াই দূরে থাক্‌, সহানুভূতি প্রকাশেও সামিল হতে দেখা যায়নি। আহমদ শরীফ মনে করেন, শ্রেণিস্বার্থের অচেতন কিংবা সচেতন বাধার কারণেই গণমানবের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অংশ নিতে পারেননি।[১০১] এমনকি ষাটোর্ধ্ব রবীন্দ্রনাথের 'আঙুলে গোণা যেসব কবিতায়' গণমানব সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় আহমদ

শরীফ তাকে 'কলকাতায় মার্কসবাদ চর্চার হাওয়া বুঝে' লেখা বলে অভিযুক্ত করেন এমনকি অন্য লেখায় এমন বিচ্ছিন্ন উদাহরণ থাকলে তা আকস্মিক এবং কৃত্রিম বলে নাকচ করেছেন (শরীফ, ২০১০ক:৪০০)।

রবীন্দ্রনাথের মানসজগৎ ও সাহিত্যসৃষ্টিতে সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণির প্রভাব সুস্পষ্ট। পারিবারিকভাবেই তিনি চিন্তা-চেতনা-মন-মেজাজে এই ঐতিহ্য বহন ও লালন করেছেন। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্ষীয়মাণ সামন্ত ও বিকশমান বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে সময়ের টানাপোড়েন, যুগসন্ধির দ্বিধা-দ্বৈরথ তাঁর সাহিত্যে সুপ্রকট। প্রাচীন রীতিনীতি-আচার-বিশ্বাসে ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল ভাববাদী সামন্ত। সুশাসন চাইতেন তবে স্বাধীকার বা স্বশাসন তাঁর কাম্য ছিল না (শরীফ, ২০১০ক:১০৫)। তবু ভাববাদী, আস্তিক ও সামন্তিক চেতনাপ্রবণ বুর্জোয়া ভাবধারার মানুষের কাছে সুন্দর-সুশোভন-মহৎ কর্মে, পরার্থপরতায়, ত্যাগের মহিমায়, মানবতাবোধের চর্চায় রবীন্দ্রসাহিত্য, আহমদ শরীফের শব্দে, 'বুর্জোয়াদের বেদ' (শরীফ, ২০১০ক:১০৬) হয়ে থাকবে।

আহমদ শরীফের রবীন্দ্রবিবেচনায় নিন্দা ও প্রশংসা, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, শূন্যতা ও পূর্ণতার ভাষা স্বাধীনতা-পূর্ব ও উত্তর বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরবিরোধী। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্র-বিবেচনায় আহমদ শরীফের পরের অবস্থানের বীজ তাঁর আগের প্রবন্ধগুলোতেই নিহিত ছিল। 'সৌন্দর্যান্বেষা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের শুরুতেই আহমদ শরীফ রবীন্দ্রবিবেচনায় 'সতর্ক' 'ভক্তি-দ্বেষমুক্ত' অবিচলিত মনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। বুর্জোয়া আভিজাত্য নিয়ন্ত্রিত পারিবারিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের শিল্পী ও ব্যবহারিক জীবনের দ্বৈরথকেও তিনি চিহ্নিত করেছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার ভারে অবক্ষয়িত প্রাচ্য দর্শনের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সামাজিক 'দ্বেষ-দ্বন্দ্ব চোখেই পড়েনি' এমন যুক্তিও আহমদ শরীফ তৈরি রেখেছিলেন আগেই। তাছাড়া ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সামন্তস্বভাব,ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির উল্লেখও করেছেন আহমদ শরীফ অনেকবার। তবে নিছক উল্লেখ এবং রবীন্দ্রসমালোচনায় ব্যবহারে যে পার্থক্য তা পরবর্তীকালের প্রবন্ধগুলি থেকে অনুমান করা যায়। শুধু যথাযথ কারণে সেগুলোকে গুরুত্ব দেয়া-না-দেয়ার মধ্যেই সমালোচনার সেই পার্থক্য নিহিত। আহমদ শরীফ 'রবীন্দ্রনাথ ও গণমানব' প্রবন্ধের মধ্যেই সেই যথাযথ কারণটি ব্যাখ্যা করেছেন–

> রবীন্দ্রনাথসম্পৃক্ত আবেগের কাল অপগত।... আজ আত্মকল্যাণেই, আত্মবিকাশের ও প্রগতির প্রয়োজনেই ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও অনাসক্ত মন নিয়ে যুক্তি-বুদ্ধি-চিন্তা-চেতনা প্রয়োগে সমাজ-সদস্য ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মন-মেজাজ, সামাজিক-নৈতিক কর্ম ও আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কারচালিত রুচি ও স্বভাব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যোগে জানতে ও বুঝতে হবে।.... তখন ব্যক্তি কবি স্রষ্টা ও চিন্তানায়ক মনীষী রবীন্দ্রনাথের দোষ-ত্রুটি-অপূর্ণতা-সীমাবদ্ধতাও দেখতে পাব, তখন তিনি দোষে-গুণে-শক্তিতে-সামর্থ্যে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেকার আপনজন হয়ে উঠবেন ও হবেন প্রিয় ও পরিচিত। দোষেগুণে মানুষ। (শরীফ, ২০১০ক:৪০১)

কেবল মার্কসবাদের কিতাবি-অনুশাসনে আস্থা থেকেই আহমদ শরীফ যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে গিয়ে[১০২] একপর্যায়ে রীতিমত বিদূষক হয়ে উঠলেন এমন ভাবা অসংগত মনে হয়। কারণ *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* গ্রন্থের 'বাঙলাসাহিত্যে জীবনদৃষ্টির বিবর্তন' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের রবীন্দ্রবিবেচনাও তাঁর মুগ্ধ ও মুক্তদৃষ্টির রবীন্দ্রবিতর্কের মধ্যে অন্যতম যৌক্তিক অবস্থান–

> তুচ্ছ ব্যতিক্রম বাদ দিলে রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা বুর্জোয়া উদারতার ও মানবতার শ্রেষ্ঠ আর মহত্তম বিকাশ ও প্রকাশ দেখি। রবীন্দ্রনাথ যদিও ভাববাদী এবং আস্তিক ও ব্রাহ্ম, তবু সাতচল্লিশোত্তর বয়সে তিনি আদর্শচেতনাবশে নির্বিশেষ মানবধর্মে ও মানবমর্যাদায় আস্থাবান ছিলেন। যদিও এখানকার বৌদ্ধ সুপ্রাচীন এবং বৈষ্ণব ঐতিহ্যও সুপরিজ্ঞাত, তবু এ জীবনদৃষ্টি ঐতিহ্যও এদেশে তাঁর পূর্বে দুর্লভ ছিল। রবীন্দ্রনাথের মানস-বিচরণের ক্ষেত্র ছিল প্রাচীন ভারত ও আধুনিক য়ুরোপ। তাই তাঁর জীবনদৃষ্টি কালোপযোগী বাস্তব ও ব্যবহারিক ছিল না, তিনি ছিলেন হিতকামী স্বাপ্নিক ও তাত্ত্বিক। (শরীফ, ১৯৭৯:১৭০)

তাছাড়া কেবল বিদ্বেষবশত বিদূষণ আহমদ শরীফের চারিত্র্যানুগ নয়। বরং বলা যায় একদিকে রবীন্দ্রবিরোধীদের সমস্বরে রবীন্দ্রস্তাবকতা অন্যদিকে 'ভক্তি গদগদ' রবীন্দ্রানুরাগীদের বাড়াবাড়ি[১০৩] দুয়ে মিলে আহমদ শরীফকে

প্রভাবিত করেছিল ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অনুল্লেখিত ও অনুচ্চারিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে সামনে নিয়ে আসতে। নতুন প্রজন্মের কাছে সুস্থ বিতর্কের মধ্য দিয়ে দোষে-গুণে যে রবীন্দ্রনাথ তাকে উপস্থাপন করতে। সেদিক থেকে তিনি অনেকখানি সফল বলে আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রমানসের কালিক-প্রাতিবেশিক সীমাবদ্ধতা-দুর্বলতা যেগুলো তিনি হয়তো অতিক্রম করতে পারতেন নতুন প্রজন্মের রবীন্দ্রানুরাগীদের সামনে তুলে ধরতে অনেকটাই সফল হয়েছেন আহমদ শরীফ কারণ ইতিপূর্বে বাংলাদেশে এই জিজ্ঞাসাই উত্থাপিত হয়নি।

৩.৩.১৩

আহমদ শরীফের নজরুল-বিবেচনায় বঙ্কিম-রবীন্দ্র-বিবেচনার মতো স্ববিরোধিতা পাওয়া যায় না। প্রথম থেকেই তিনি নজরুলের প্রতিভা ও ক্ষমতা, লেখার সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর সেই যুক্তি-প্রমাণ ও অবস্থান শেষপর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। বিচিত চিন্তা গ্রন্থেই তাঁর এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক প্রবন্ধে এবং তিনি সমালোচিত হয়েছিলেন।[১০৪] কাজী নজরুল ইসলামের গানের সুরবৈচিত্র্য এবং তাঁর কবিতায় দ্রোহ ও উদ্দীপনার স্বর– এই দুয়ের মধ্যেই আহমদ শরীফ নজরুল সাহিত্যের সার্থকতা পেয়েছেন। বিভিন্ন গ্রন্থভুক্ত 'বাংলা সাহিত্যের ইসলামমুখী ধারা', 'নজরুল-মানস', 'যুগন্ধর কবি নজরুল' 'নজরুলের কাব্যসাধনার লক্ষ্য', 'নজরুল ইসলাম : এক বিরূপ পাঠকের দৃষ্টিতে' ইত্যাদি প্রবন্ধ ছাড়াও *একালে নজরুল*[১০৫] নামে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে আহমদ শরীফের নজরুল-মূল্যায়ন বিধৃত হয়েছে।

'বাংলা সাহিত্যের ইসলামমুখী ধারা' প্রবন্ধে নজরুলের লেখার সাথে ইসলামকে সম্পর্কিত করে একটি প্রচলিত বিভ্রান্তির জবাব দিতে এগিয়ে আসেন আহমদ শরীফ। নজরুল ইসলামের ইসলাম বিষয়ক গান এবং কবিতা থেকে অনেক মুসলমান পাঠক-লেখকের ইসলামি প্রেরণা লাভ করে বলা হয়। কিন্তু আহমদ শরীফ জানাচ্ছেন এসবই নজরুলের স্বদেশপ্রেম ও মানবনিষ্ঠার প্রসূন,ইসলামি চেতনার বহিঃপ্রকাশ নয়–

> নজরুল ইসলাম প্রথমত বাঙালি তথা ভারতীয় জাতীয়তায় (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) বিশ্বাসী ছিলেন। দ্বিতীয়ত তাঁর মধ্যে বিশ্বমুসলিম জাতীয়তাবোধ ছিল না। তাঁর কারণ, তাঁর কাব্য-প্রেরণার উৎস ও লক্ষ্য ছিল মানবনিষ্ঠা। তাঁর ধর্মবোধও ছিল মানবনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন একান্তভাবে স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতি (ভারতবাসী)-নিষ্ঠ ও নিপীড়িত মানবতার দরদী কবি। (শরীফ, ২০১০:৫৩)

তাই নজরুলের ইসলামি কবিতা ও গানগুলো আসলে স্বদেশ ও মানবনিষ্ঠ কাব্যসাধনার আনুষঙ্গিক ফল বলেই মনে করেন আাহমদ শরীফ। এসব রচনা অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা ও প্রেরণার দিক থেকেও ইসলাম-প্রীতিপ্রসূত নয় বরং তীব্র স্বাধীনতাস্পৃহা ও মানবতাবোধের পরিচয় ও পরিপূরক।

'নজরুল-মানস' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ নজরুলের সীমাবদ্ধতাকেই প্রশংসার স্বরে, অনেকটা ব্যাজস্তুতির মতো বর্ণনা করেন। আহমদ শরীফের মতে নজরুলের কাব্যে দর্শন নেই, তত্ত্ব নেই কারণ সরল মানুষের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে চাওয়া ও পাওয়ার দাবিই সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে বেশি। আবার নজরুলের মানুষকে অকপট ভালবাসতেন কিন্তু ভালোবাসার পথে বাধা পেলে মারমুখো হতেন। অর্থাৎ এ হচ্ছে সরল হৃদয়ের অনুভূতিজাত উত্তেজনা, চিন্তাপ্রসূত বিক্ষোভ নয়। তাই নজরুলের রচনায় ভাঙার গান আছে, গড়ার পরিকল্পনা নেই। আহমদ শরীফের বিবেচনায় নজরুলের কাব্যে দর্শন নেই, সমাজতত্ত্বও নেই, নতুন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ও নেই। তাঁর প্রাণময়তা-প্রাণশক্তি অফুরন্ত, হাসি-কান্না-আনন্দ-অভিমান অনিয়ন্ত্রিত, উচ্চকিত।

নজরুল যা চেয়েছেন তা তাঁর প্রেমিকহৃদয়ের চাহিদা। এজন্যেই তাঁর কাব্যে দর্শন নেই, সমাজতত্ত্ব নেই, নতুন সমাজ গড়ার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। কেবল যা চেয়েছেন তা পাননি বলে, প্রবল উত্তেজনায় সুমুখে যাকে পেয়েছেন তাকেই আক্রমণ করেছেন; কার্যকে ভেবেছেন কারণ, আর 'কারণ'-এর খোঁজ পাননি বড় একটা।

'যুগন্ধর কবি নজরুল' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের অভিমত– 'নজরুল ইসলাম আসলে রবীন্দ্রনাথেরই পরিপূরক।' কারণ 'সুন্দরকে গড়ার ভার ছিল রবীন্দ্রনাথের। ঘুণে-ধরা পুরোনোকে ভাঙার দায়িত্ব পড়ল নজরুলের উপর। রবীন্দ্রনাথের মনীষা (brain), আর নজরুলের হাত (action)।' এই দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি অবহেলা করা যায় না। এভাবে আহমদ শরীফ নজরুল-রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় আদর্শ ও প্রেরণার সহায়ক হিসেবে উপস্থাপন করলেন–

> অপ্রেম-অসুন্দরই নজরুলকে করেছে সংগ্রামী। বোধিপুষ্ট রবীন্দ্রনাথের ছিল সইবার ও অপেক্ষা করবার ধৈর্য। কিন্তু তারুণ্য নজরুলকে করেছিল অসহিষ্ণু ও বিদ্রোহী। আর জীর্ণ আবর্জনা সরিয়ে না ফেললে নতুন ইমারত গড়ে তোলা যে দুঃসাধ্য এ বাস্তববোধ রবীন্দ্রনাথের ছিল। যা তিনি পারছিলেন না বলে অস্বস্তিবোধ করছিলেন, তা-ই করবার ব্রত নিয়ে একজনের সদম্ভ আবির্ভাব দেখে রবীন্দ্রনাথ উল্লাস ও অভিনন্দন না জানিয়ে পারেননি। রবীন্দনাথের চিন্তায় আর নজরুলের কর্মে বাঙালির রেনেসাঁস পূর্ণতা পেল। (শরীফ, ২০১০:২১১)

তবু আহমদ শরীফ নজরুলের সংগ্রাম ও মানবিকতায় আকস্মিকতা দেখলেন। কারণ নজরুল ইসলামের বলশেভিকবাদ কিংবা অন্য কোনো ইজমে আনুগত্য ছিল না। তাঁর ব্যক্ত মানবতাবোধ মানুষের সুপ্ত মানবিকতারই বিমূর্ত প্রকাশ–তাই এর গতি দুর্বার, এর আবেদন ঋজু এবং আকস্মিক।

নজরুল-মানবতাবাদ ও জাতীয়তাচেতনার পরিপূর্ণ পরিচয় আহমদ শরীফ দিয়েছেন 'নজরুলের কাব্যপ্রেরণার উৎস' প্রবন্ধে। তিনি বুঝেছেন নজরুল নারীপুরুষ, কৃষকমজুর, এমনকি বারাঙ্গনাকেও সমান উদারতায় মর্যাদা দিতে পেরেছেন, শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছেন মানুষ নির্বিশেষকে অকুণ্ঠচিত্তে কারণ নজরুল স্বদেশকে ও স্বজাতিকে ভালোবেসেছিলেন। পতিত স্বদেশ ও নির্যাতিত স্বজাতিকে ভালোবাসতে গিয়ে কবি বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিত মানবতাকে ভালবেসেছেন। নজরুলের কণ্ঠস্বরে বিশ্বমানবতার অনুরণনকে যারা বিশ্বমুসলিম জাতীয়তাবাদী বা Pan Islamism-এ বিশ্বাসী বলে মনে করেছেন তাঁদের এ বিশ্বাসে গলদ ধরিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন– 'তাঁর মুসলিম দেশ ও বীর-প্রশস্তি বিষয়ক কবিতাগুলো মুসলিম প্রীতির চেয়ে দুঃখীর প্রতি সমপ্রাণতার পরিচয়ই যেন বেশি বহন করছে' (শরীফ, ২০১০:২১৩)।

আবার নজরুলের সাম্যবাদকে একদল মতবাদী মার্কসবাদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে যা ভুল বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। কারণ নজরুলের সাম্যবাদের গোড়ার কথা হচ্ছে– মানুষ এক আদমের সন্তান, সুতরাং মানুষ মাত্রেই ভাই ভাই। অর্থাৎ ভালোবাসাই নজরুলকে সাম্যবাদী করেছে–করেছে বিদ্রোহী, করেছে বিপ্লবী।

> নজরুল সাম্যের বাণী প্রচার করেছেন কিন্তু শ্রেণীবিলুপ্তির কথা তাঁর বাণীতে নেই। তিনি চেয়েছেন স্ব-স্ব অধিকার, বিত্ত ও বৃত্তি বজায় রেখে স্বাধিকারে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিসত্তা ও মর্যাদার পূর্ণ স্ফূরণ; চেয়েছেন এমন ব্যবস্থা যাতে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা ও বৃত্তি বজায় রেখেও মানুষ 'যেখানে আসিয়া সমবেদনায় সকলে হয়েছে ভাই।' আইন করে চাপানো ধনসাম্য নয়–প্রীতি-বন্ধত্বের সাম্য তথা সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সাম্যই কবির কাম্য। (শরীফ, ২০১০:২১৫)

'নজরুলের কাব্যসাধনার লক্ষ্য' প্রবন্ধে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-শরৎচন্দ্র সবার মানবতাবোধের নিরিখে নজরুলের সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব ও অনন্যতার সমর্থন পাওয়া যায়। আহমদ শরীফের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য–

> বঙ্কিমচন্দ্র শুধু হিন্দুর কথা ভেবেছেন, প্রতিবেশী মুসলমানকে তিনি আপনজন ভাবতে পারেননি। স্বামী বিবেকানন্দও মুচি, মেথর, চণ্ডাল ভারতবাসীকে ভাই বলেছেন, কিন্তু মুসলমানকে ভাই বলে বরণ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রও এ ত্রুটি থেকে মুক্ত নন। নজরুল ইসলামই একমাত্র লেখক– যিনি ভুলেও কখনো বিধর্মীকে বিদ্বেষ বা বিদ্রুপ করেননি। পক্ষান্তরে বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সব হিন্দু-লেখকের লেখায় অল্প-বিস্তর মুসলমান-বিদ্বেষ বা বিদ্রুপ প্রকাশ পেয়েছে। (শরীফ, ২০১০:২১৭)

'নজরুল ইসলাম : এক বিরূপ পাঠকের দৃষ্টিতে' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ রবীন্দ্র-বিতর্কের মতো নজরুল-বিবেচনার সবচেয়ে নেতিবাচক ও অপ্রিয় কথাগুলো সন্নিবেশিত করেছেন। সেখানে নজরুল জীবনের বিতর্কিত ও অনালোচিত নানা অধ্যায়, নানা প্রশ্নে উপস্থাপিত হয়েছে– নজরুল প্রতিভার প্রকৃত মাহাত্ম্য উদ্ধারের স্বার্থে। তবে তিনি যখন বলেন 'রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করতে হলে নজরুলকেও রাখা চলে না' (শরীফ, ২০১০:২২০)। তখন আমাদের উপলব্ধ হয় যে, এই সমালোচনার ভাষাও অনেকটা স্বাধীনতাপূর্বকালে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক বিবেচনায় রবীন্দ্র-বিরোধিতার রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজাত। বিষয়টির অধিকতর স্পষ্টতা নিচের উদ্ধৃতিতে–

> জীবনচর্যায় নজরুলে মুসলমানী যতটুকু আছে, হিন্দুয়ানী আছে তার চেয়েও বেশি। তিনি মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাস রাখেননি। তাঁর আস্থা ছিল হিন্দু-মুসলিম জাতীয়তায়। রবীন্দ্রনাথ তবু মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বার্থ স্বীকার করেছেন, নজরুল তাও করেননি। অবশ্য নজরুল ছিলেন বাঙালি ও মুসলমান। বাঙালি হিসেবে দেশী প্রাচীন ঐতিহ্যে ছিল তাঁর জন্মগত অধিকার। আর ধর্মীয় ঐক্যের সুবাদে আরব-ইরানের ঐতিহ্যে জন্মেছে তাঁর আকর্ষণ। তাই তাঁর মধ্যে আমরা হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি সমান আগ্রহ লক্ষ্য করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালি আর ভারতের বাইরে হিন্দু নেই। কাজেই তাঁর দেশী ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ছিল অভিন্ন এবং দুটোই আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুয়ানী। একের প্রশংসা ও অপরের নিন্দার কারণ ঘটেছে এভাবেই। ভুল বোঝাবুঝির অবকাশও মিলেছে এখানেই। (শরীফ, ২০১০:২২০)

'নজরুল ইসলামের ধর্ম' প্রবন্ধেও একই বিশ্লেষণের পুনরাবৃত্তি করে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন যে, নজরুল ইসলাম বুদ্ধি ও প্রজ্ঞানির্ভর নন, দার্শনিক তিনি ছিলেন না, তিনি একান্তভাবেই হৃদয়নির্ভর কবি। সাহিত্য-সাধনায় নজরুলের ইসলামপ্রীতি ধার্মিকতাপ্রসূত নয়– মানবতা ও ব্যক্তি নিষ্ঠাজাত। তাছাড়া আদর্শের সাধনার অনুকূল উপাদান নজরুল যেখানেই পেয়েছেন, গ্রহণ করেছেন। নজরুলের ধর্মবোধ স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি জাগায় না। এ ধর্ম কল্যাণ ও মিলনকামী। এ ধর্ম মোক্ষের সহায় নয়– জীবনের অবলম্বন।

'জাতিবৈর ও বাঙলা সাহিত্য' প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সাহিত্য-সাধনার পরস্পরবিরোধী ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন, উভয় ক্ষেত্রেই ধার্মিকগণই এমন বিদ্বেষের কারণ। মুসলমানগণ রবীন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করেন, স্বজাতির মুসলমানদের সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকার জন্য। তারা নজরুলকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অসূয়ামুক্ত উদার সাহিত্যিকের আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করে এবং নজরুল হিন্দু-মুসলমান ও তাদের ঐতিহ্যকে সমভাবে ভালবেসেছেন এমন যুক্তিও উপস্থাপন করে থাকে। আহমদ শরীফের মতে এগুলো 'অপযুক্তি', কারণ–

> তাঁরা ভুলে যান যে মুসলমানেরা দেশগত পরিবেষ্টনীর প্রভাব এড়াতে পারেননি, তাই মুসলমানমাত্রেরই রচনায় দেশীয় ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মিশ্রণ ঘটেছে। মধ্যযুগ থেকে বিশ শতকের প্রথম পাদ অবধি মুসলমানদের রচনায় এ মিশ্রণ দৃশ্যমান। হিন্দুর দেশ ও ধর্ম অভিন্ন অঞ্চলের, তাই যা দেশী তা ধর্মীয়ও বটে। এইজন্যেই হিন্দুর রচনা পুরোপুরি হিন্দুয়ানী বলে চিহ্নিত করা যেমন সহজ; তেমনি কঠিন নয় মুসলিম মনের উদারতা ও গ্রহণশীলতা প্রমাণ করাও। উভয়েই ভেদ বুদ্ধির উর্দ্ধে মানবতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও নজরুল ইসলামের অবচেতন উদারতার কারণ এই তত্ত্বেই নিহিত এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির হিন্দুয়ানীর রহস্যও এ-ই। (শরীফ, ২০১০:২৮০)

'নজরুল সমীক্ষা : অন্য নিরীখে' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ নজরুলের সৃষ্টিকর্মের উদাহরণ দিয়ে নজরুলের প্রকৃত দুর্বলতা ও শক্তিকে প্রামাণ্য রূপ দিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি নজরুল বিষয়ে আহমদ শরীফের অন্যতম সংগঠিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ। তিনি প্রথমেই নজরুল বিবেচনায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, নজরুল-বিচারে বাঙালি আবেগপ্রিয় বলেই অব্যর্থ নয়। নজরুল কোনো একক মতে নিষ্ঠ ছিলেন না, বারোয়ারি দাবী মিটিয়েই তাঁর আনন্দ, তাঁর মধ্যে নতুনত্বও কিছু ছিল না। কারণ এক্ষেত্রে পূর্বসূরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং যতীন্দ্রনাথ। তাঁর পূর্বসূরীরা যতটা তাত্ত্বিক ছিলেন ততটা বাস্তব ছিলেন না। অন্যদিকে নজরুলের দৃষ্টি ছিল বাস্তব, ভঙ্গি ছিল অভিনব। তাঁর প্রয়াস ও প্রভাব উত্তেজনার মুহূর্তে গণমানসের চাহিদার আনুপাতিক। তাই নজরুল গণমন অধিনায়ক ও গণ-বুদ্ধিগ্রাহ্য।

প্রথম দিককার সংগ্রামী কবিতাগুলোতে (*অগ্নি-বীণা*, *বিষের বাঁশী*, *ভাঙ্গার গান* কাব্যে) নজরুল ধর্মীয় চেতনার আশ্রয়ে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বাণীর আবরণে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর মানবতা শাস্ত্রীয় ন্যায় ও করুণাভিত্তিক; জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সমঅধিকারের অঙ্গীকারপ্রসূত নয়। তবে নজরুল কবিচিত্তে বন্ধন মুক্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট। গোঁড়ামিমুক্ত উদার দৃষ্টি যা সম্প্রদায়-ভেদনীতি মিথ্যা বলে মানে, তাতে নজরুলের আস্থা। নজরুলের আত্মশক্তি ও সৃষ্টির এই-ই উৎস। তবে এ পর্যায়ে তাঁর প্রেরণা নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং চেতনামূলক। দ্বিতীয় পর্বে তাঁর *সাম্যবাদী*, *সর্বহারা*, *ফণিমনসা*, *জিঞ্জির*, *সন্ধ্যা* ও *প্রলয় শিখা* কাব্যগ্রন্থ নজরুলের 'দ্বৈতসত্তায় দিশাহারা'। এতে সমাজবাদের প্রভাব থাকলেও আহমদ শরীফের মতে তা মার্কসীয় বা লেনিনীয় সমাজ বিন্যাসে আস্থাপ্রসূত নয়। তিনি স্বধর্মপ্রিয় বুদ্ধিজীবীর মতো কমিউনিজম গ্রহণ করতে নারাজ কিন্তু তার সুব্যবস্থায় ও প্রভাবে বিচলিত; ইসলাম ধর্মের মধ্যে কমিউনিজমের নীতি ও আদর্শের মিল আবিষ্কারক। তাঁর কাব্যে সমাজ ভাঙার গান আছে, গড়ার পরিকল্পনা নেই। নজরুল সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার প্রচারক, অভাবিতপূর্ব মহৎ আদর্শের উদ্ভাবক নন। তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলন সাধনা করেছিলেন কারণ স্বদেশের স্বাধীনতা তাঁর কাম্য ছিল। এজন্য তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন, সাধনা করেছেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের। তবে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই ঐক্য কামনা করেছেন। আচারিক ধর্মের নিন্দা করেছেন, আহ্বান জানিয়েছেন ধর্মের অবিকৃত সারবাণী অনুসরণের। আহমদ শরীফ কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্টত নজরুলের মধ্যে দ্বৈতসত্তা ও স্ববিরোধিতা লক্ষ করেছেন। যেমন, নজরুল Pan-Islamist ছিলেন না অথচ ধর্মীয় জাতীয়তায় তাঁর আস্থা ছিল; তিনি শাস্ত্রানুমোদিত অথচ কিছুটা মার্কসবাদ সমর্থিত আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন যা আহমদ শরীফের মতে 'একপ্রকার গোঁজামিলে দুকূল রক্ষার প্রয়াস' (শরীফ, ২০১০:৬১০)। আহমদ শরীফ তাঁর ভাষায় নজরুলের এই দ্বৈতাবস্থানের বর্ণনা দিয়েছেন–

> স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সন্ত্রাসবাদ এবং শোষণ মুক্তির জন্যে সাম্যবাদ তাঁর প্রিয় হলেও তিনি একাধারে নিয়মতান্ত্রিক, গান্ধীপন্থী, কামালপন্থী, গণবিপ্লবী, সমাজ-সংস্কারক, চরকা-মাহাত্ম্য প্রচারক, লীলাবাদী আধ্যাত্মিক ও মরমী, সর্বসংস্কারমুক্ত, ভৌতিক বিশ্বাসে অভিভূত, স্বধর্মনিষ্ঠ ও না'তে আসক্ত এবং শ্যাম-শ্যামা সঙ্গীতে আগ্রহী। এমনকি তিনি কোরআনের মুমীন অনুবাদক এবং রসুলজীবনের ভাষ্যকারও। (শরীফ, ২০১০:৬১০)

আহমদ শরীফের মতে, নজরুলের ভাব ও ভাষার মধ্যে আধুনিক জীবনচেতনার অপরিশোধিত পরিণতির মুখ্য কারণ শিক্ষাগত ও আবেগসঞ্জাত। ফারসি সাহিত্য ও ভারতীয়-পুরাণে নজরুলের ব্যুৎপত্তি যথেষ্ট থাকলেও আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট করেনি বলেই আহমদ শরীফ মনে করেন। ফলে সাহিত্যে ও জীবনে নজরুল কোনো মহত্তর বোধে উত্তরিত হয়নি, থেকে গেছে অপরিমিত আবেগের মৌহূর্তিক প্রকাশে। অবশ্য ছন্দ ও গানে নজরুলের সৃষ্টিশীলতা বাংলা ভাষা ও সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে বলে মনে করেন আহমদ শরীফ।

আহমদ শরীফ মনে করেন নজরুল তাঁর মন ও মস্তিষ্কের অদ্বয় সহযোগিতা পাননি কোনোদিন, আবেগমথিত হৃদয়বৃত্তিই ছিল তাঁর সম্বল। তাঁর প্রেমভাবনাও বৈচিত্র্যবিহীন; কোনো সূক্ষ্ম ও মহৎ দর্শন তাতে নেই। কিন্তু নজরুলের প্রেমের গান ও কবিতা রচনার মধ্যে প্রকট দ্বৈতসত্তা আবিষ্কার করেও এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন–

> একই কালে তিনি শোষণ, পীড়ন, ভণ্ডামি, পরাধীনতা, কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ চিত্তে সংগ্রামী কবিতা যেমন লিখেছেন, তেমনি নরীপ্রেমের কোমলকান্ত পদও রচনা করেছেন, তেমনি লিখেছেন না'ত কিংবা শ্যাম-শ্যামাসঙ্গীত। অথচ একভাব কোন ক্রমেই অন্যভাবকে প্রভাবিত করেনি, লঙ্ঘন করেনি, করেনি আচ্ছন্ন। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, কবির আশ্চর্য দক্ষতার স্বাক্ষর এবং আমাদের কাছে বিস্ময়কর সংবাদ।(শরীফ, ২০১০:৬১৩)

নজরুল-প্রতিভার অন্তঃস্থিত বৈশিষ্ট্যকে ‘বৃক্ষ’ নয়, ‘গুল্মজাতীয়’ আখ্যা দিলেও আহমদ শরীফ মনে করেন, সাধারণ পাঠকের কাছে নজরুল প্রাণময়তার উৎস অম্লান সূর্য। কারণ নজরুলের ছিল তাজা, তরুণ ও উচ্ছল প্রাণ। এই উদ্দীপনা নিবন্ধ রচনাকালে এমনকি বর্তমানেও অটুট কারণ তিনি যে পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তা অবিলুপ্ত। আহমদ শরীফ নজরুলের মধ্যে, তাঁর ভাষায়, সংকীর্ণ[১০৬] অর্থে হলেও মানবতাবাদের শক্তি ও প্রেরণা স্বীকার করেছেন।[১০৭]

নজরুলের অনেক কবিতায় বীর ও বীরত্বের আদর্শ সুপ্রকট। তিনি রাজনৈতিক জটিলতা বুঝতেন না তবে তাঁর বৈপ্লবিক চেতনা ছিল গভীর ও তীব্র। রক্তপিচ্ছিল সহিংস বিপ্লবই তাঁর প্রিয় ছিল, তবে তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সব পদ্ধতি প্রয়োগ-প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর কবিতা ও গানে অজস্র বীরত্বব্যঞ্জক বাক-প্রতীমা ও প্রতীক স্থান পেয়েছে বিপ্লব-দ্রোহ-উদ্দীপনাকে দুর্নিবার করতে। আহমদ শরীফের ভাষায়–

> তাঁর কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়েছে রণ, রক্ত, রুদ্র, শক্তি, ঝড়, সূর্য, বহ্নি, মৃত্যু প্রভৃতি অবলম্বনে। এগুলোকে তিনি বল-বীর্যে প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন। তেমনি ন্যায়, কল্যাণ ও অধিকারের প্রতীক হয়েছে সত্য। আর সবকিছুর গোড়ায় রয়েছে অহংবোধ– আমিত্ব তথা আত্মপ্রত্যয়। এটিই তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠর সংগ্রামে দিয়েছে প্রবর্তনা। (শরীফ, ২০১০:৬১৮)

একালে নজরুল গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ‘নজরুল ইসলাম : কবির মনোজগৎ’, ‘পাঠক সমালোচকদের চোখে নজরুল সাহিত্য’, ‘কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ’, ‘নজরুলের কবি-স্বভাব : শক্তিপূজা’, ‘নজরুলের কবি-স্বভাব : প্রেম-তৃষ্ণা’, ‘নজরুলের কবিভাষা : পুরাণ ও প্রকৃতি’ শীর্ষক ছয়টি প্রবন্ধে আহমদ শরীফের নজরুল বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে, তবে পূর্বানুমিত ও বিশ্লেষিত প্রত্যয়ের বাইরে নতুন সংযোজন বা ভিন্নমত পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বৈশ্বিক রাজনীতিক-বৌদ্ধিক পটপরিবর্তনের নানামুখী প্রভাবে বাংলার সমাজকাঠামো এবং শিল্প-সাহিত্যাঙ্গনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর মানসসন্তান। তাই আহমদ শরীফ নজরুল-মূল্যায়নে যুগস্বভাব, প্রভাব-প্রবণতা ও সামাজিক রূপ-রূপান্তরকে বিশেষ গুরুত্বে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে হিন্দু-মুসলমান স্বাজাত্যচেতনা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রভাবে সমাজে শ্রেণিস্বার্থ ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের উন্মেষ, মননজগতে ডারউইন-মার্কস-ফ্রয়েডতত্ত্বের গভীর প্রতিক্রিয়া, প্রয়োজনতত্ত্ব ও বাণিজ্যবুদ্ধির আগ্রাসনে শহর-নগরে মধ্যবিত্তের জীবনচেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন– এই সবই সময়ের উপাদান হিসেবে নজরুলের মানসগঠনে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। নজরুল প্রতিভায় এর ছাপও দুর্লক্ষ্য নয়–

> বলতে গেলে বাঙলা সাহিত্যাঙ্গনে তিনিই প্রথম পুরোপুরি কবি, রাজনীতিক, সংগ্রামী, গণবাদী ও সাম্যবাদী। সাহিত্য, শাস্ত্র ও সমাজ-সংস্কারমূলক রচনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য বা ব্রত। গোড়া থেকেই গানে কবিতায় নাটকে উপন্যাসে প্রবন্ধে সাংবাদিকতায় রাজনীতিক, আর্থ সামাজিক আর শাস্ত্রিক মতাদর্শ প্রচারব্রতী কোন লিখিয়ে পূর্বে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে সক্রিয় রাজনীতিকরূপে আবির্ভূত হননি। নজরুলের পূর্বে কোন লেখক নাকি রাজদ্রোহের জন্য কারাবাসও করেননি। যদিও লেখা বাজেয়াপ্ত করা শুরু হয় উনিশ শতক থেকেই।এজন্যই নজরুলের লেখার বিষয় হয়েছে জাত, ধর্ম, বর্ণ, জীবন, শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, শাসন, শোষণ, পীড়ন, সংগ্রাম, বিপ্লব, বিদ্রোহ, স্বাধিকার, স্বাধীনত প্রভৃতি। অতএব কবিতা ও গানকে সংগ্রামের হাতিয়াররূপে ঐকান্তিক প্রয়োগের গৌরব নজরুল ইসলামের প্রাপ্য। এ সঙ্গে সমকালীন জনসমাজ-মানসের অস্থিরতা, উন্মাদনা, স্ববিরোধ আর অতৃপ্তিও নজরুল সাহিত্যে সুপ্রকট। (শরীফ, ২০১৪:১৬৩)

নজরুল জীবনে ও সাহিত্যে ধর্ম-সম্প্রদায়, নারী ও প্রেম এবং সাম্যবাদের ভূমিকা ও বিস্তার অনুসন্ধান করে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন– নজরুল মুখ্যত অচরিতার্থ শরীরী প্রেমের কবি, গৌণত সেই প্রেম হৃদয়সংবেদী। মনোজগতে কোনো সুনির্দিষ্ট মত-পথের অনুসারী তিনি নন, কোনো স্থির-অচঞ্চল বিশ্বাসে নন স্থিত।[১০৮] বন্ধনভীরু-অসহিষ্ণু-

আত্মপ্রত্যয়ী ও জেদী নজরুল শোষিত নির্যাতিত মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তি লক্ষ্যে স্বদেশসহ পরাধীন জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ও স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্রোহের, বিপ্লবের, সংগ্রামের ও রক্তঝরা লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন। অমিত উচ্ছ্বাস, অপরিমিত আবেগ নজরুলের সৃষ্টিকে গভীরতায় ও শৈল্পিক লাবণ্যে উৎকর্ষমণ্ডিত করেনি। কিন্তু শিল্পের সুনির্মিতির চেয়ে যুগের চাহিদা নজরুলে পূর্ণতা পাওয়ায় তিনি যুগের কবি, আহমদ শরীফ লিখেছেন–

> তাঁর এ কালোচিত ভূমিকাই তাঁকে ইতিহাসে করল অমর, জাতিকে করল কৃতজ্ঞ, সাহিত্যকে করল গণসাহিত্যমুখী, সাহিত্য যে আকাশচারিতা নয়– বাস্তব জীবনসমস্যাসম্পৃক্ত হাতিয়ারও তা নজরুল সাহিত্যই বাঙলা ভাষায় বাঙালীর কাছে নুতন করে প্রমাণ করে দিল। কাজেই সাধারণ অর্থে জাবীনতাত্ত্বিক মহৎ কবি না হলেও নজরুল ইসলাম যুগের কবি, দেশকালের প্রয়োজন-চেতনার কবি, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের, আনন্দ-বেদনার সহ ও সমমর্মী কবি। তাঁর কাব্যের আবেদন ইন্দ্রিয়ের কাছে, হৃদয়ের কাছে– মস্তিষ্কের কাছে নয়। (শরীফ, ২০১৪:১৭৬)

নজরুলের বক্তব্যে বিষয় ও চেতনার সমকালীনতা, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বাঙালি বা ভারতবাসীর স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সক্ষোভ-সখেদ-সহিংস উচ্চারণ, হিন্দু-মুসলিম পুরাণ-ঐতিহ্য-ভাষার বিপুল অথচ সুষম প্রয়োগ, ভঙ্গির বলিষ্ঠতা ও পৌরুষ তাঁকে দিয়েছে রবীন্দ্র-সমকালেই বিরল জনপ্রিয়তা।

নজরুলের আচরণ-বিচরণে, যাপিত-যাচিত জীবনে কতিপয় অসঙ্গতি-বৈপরীত্ব ও স্ববিরোধিতার কথাও উল্লেখ করেছেন আহমদ শরীফ। আবার নজরুল-মানস ও তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির বাস্তব কারণও বর্ণনা করেছেন–

> নজরুলের ছিল খোরপোষের প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর দায়, তাই তাঁর পক্ষে ধীরে লেখা, ভেবে লেখা, যত্নে লেখা বাস্তব কারণেই ছিল অসম্ভব। (শরীফ, ২০১৪:২৪৬)

আবাল্য অসহ্য দারিদ্র্যের শিকার ছিলেন বলে চিরকালই অসহায়-শোষিত-নির্যাতিত দীন দুঃখী মানুষের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। বাংলা ভাষায় সমকালীন মাটিলগ্ন জীবন-জগত-প্রতিবেশের তিনিই প্রথম কবি হলেও নিজকে সে শ্রেণির একজন কখনও ভাবতে বা রাখতে চাননি। তাঁর কবিতায় সাম্যবাদের কথা উচ্চারিত হলেও তিনি তাতে বিশ্বাস করতেন না। রুশ বিপ্লব তাঁকে অনুপ্রাণিত করলেও তা কখনও অন্তরের সত্য হয়ে উঠতে পারেনি।[১০৯] (শরীফ, ২০১৪:১৬৬) তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবাদ যেমন কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা পায়নি, তেমনি সাম্প্রদায়িকতা ঘৃণিত হলেও ধর্মীয় ভাবমাহাত্ম্য হয়নি উপেক্ষিত। তথাপি নজরুলের কাব্যের আবেদন অনিঃশেষ চিরকালের মুক্তিকামী গণমানুষের কাছে; মানববাদীদের সংগ্রামী প্রেরণা ও প্রণোদনার আকর তিনি।

নজরুল সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন আবেগ-অনুরাগ ও পূর্বসংস্কারবশে অধীকৃত বা নির্ধারিত চিন্তাচেতনাপ্রসূত নয়। বিশ্লেষণে তিনি নজরুল জীবন ও আচার-অভ্যাসের সময়-প্রতিবেশের সমান্য-প্রামাণ্য, কিঞ্চিৎ-বৃহৎ সকল উপাদানকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাই আপাত স্বচ্ছলতায় নজরুলের বিলাস-ব্যাসনে থাকার স্বল্পমেয়াদী আয়োজনের মনস্তাত্ত্বিক কারণও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তিনি। এমনকি প্রতিটি নারী-সম্পর্কে নজরুলের জড়িয়ে পড়ার কারণ-ধরনও অনালোচিত থাকে না। নজরুল মূল্যায়নে সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তিন ধরনের প্রবণতা লক্ষ করেছেন আহমদ শরীফ–

এক. ঐতিহ্য ও প্রভাব পরম্পরায় নজরুল সাহিত্যের বিশেষত্ব আলোচনা ।

দুই. অনুরাগ ও গুণমুগ্ধতার অবস্থান থেকে মূল্যায়ন।

তিন. নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে নজরুল সাহিত্যের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা উভয়ই তুলে ধরা।

আহমদ শরীফ নিজে তৃতীয় ধারার সমালোচক। তবে তিনি মনে করেন, তুলনামূলক আলোচনা জ্ঞান ও জিজ্ঞাসার ব্যাপ্তি ঘটালেও তা মূল্যায়নে সহায়ক নয়। কারণ স্বকাল-সমাজের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে লেখককে বিচারে পক্ষপাতী আহমদ শরীফ ঐতিহ্য-পরম্পরা ও প্রভাবতত্ত্বে আস্থাবান নন–

> সমমর্মিতাজাত সাদৃশ্য মাত্রই প্রভাব নয় বরং বলা যায় অভিন্ন প্রতিবেশে সমরুচির মানুষ অভিন্ন সমস্যার ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে মাত্রাভেদ থাকলেও অভিন্ন রূপ আচরণ করে। এ হচ্ছে মননশীল হলেও মানুষ প্রজাতির প্রাণিসুলভ স্বাভাবিক আচরণ। এক প্রকার মানবিক অভিব্যক্তি, প্রভাব নয়। (শরীফ, ২০১৪:১৯১)

আমরা এটিকে সমালোচক হিসেবে আহমদ শরীফের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানরূপে বিবেচনা করতে পারি। নজরুল বিষয়ে পঁচিশ জন সমালোচকের আলোচনা সন্নিবেশিত করে আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন এসবে অনুরাগ, ভক্তির স্তাবকতা প্রভৃতির প্রকাশ যতটা ঘটেছে, নজরুল কাব্যের বা তাঁর সামগ্রিক দানের প্রকৃত মূল্যায়ন প্রয়াস ততটা হয়নি।

ব্রিটিশ বিতাড়ন এবং দারিদ্র্য দূর করার পন্থা হিসেবে রাজনৈতিক মঞ্চে প্রতিবাদমুখর ও আবির্ভূত হওয়া নজরুল সাম্যবাদ, স্বরাজ ও সহিংসতার কথা লিখতেন তবে এসবের কোনো তাৎপর্যচেতনা তাঁর ছিল না বলেই আহমদ শরীফ মনে করেন। বিপ্লবের এষণা তাঁর ছিল, শাস্ত্রিক-সামাজিক কুসংস্কার ও জীবনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ্যও ছিলেন তবে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের নৈতিকতা ও বিবেক অথবা বিচারবুদ্ধির কাছে আবেদন-নিবেদন না করে নজরুল বেছে নিয়েছিলেন শ্লোগানের মাধ্যমে উদ্দীপনা তৈরি করার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পথ (শরীফ, ২০১৪:২২২-২৩)। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাথে নজরুলের রাজনৈতিক বোধ-বিবেচনায় স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। আহমদ শরীফ এই স্বাতন্ত্র্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব চিহ্নিত করেছেন–

> ‘কুহেলিকা’র নায়ক সন্ত্রাসবাদী আর ‘মৃত্যুক্ষুধা’র নায়ক সাম্যবাদী, সাম্যবাদ-সন্ত্রাসবাদ দুটোই হয়েছে নজরুলের হাতে নন্দিত। যা ‘ঘরে বাইরে’র ও ‘চার অধ্যায়ে’র রবীন্দ্রনাথের কিংবা ‘পথের দাবী’র শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজন সাহিত্যে এ প্রথম আভাসিত হল এবং সে পরিবর্তন আনবে সর্বহারা চাষী-মজুরেরা। (শরীফ, ২০১৪:২৪৩)

শক্তির প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি ছিল নজরুলের। আহমদ শরীফের মতে তিন প্রকার শক্তি প্রতীকায়িত হয়েছে এই বিখ্যাত কবিতায়– প্রকৃতি, প্রাণ আরোপিত গুণ বা প্রতীক এবং প্রাণী-দেবতা ও মানুষ। তবে শক্তির প্রতীকে সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়ই প্রেরণা পেয়েছে। ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মধ্য দিয়ে তার চূড়াস্পর্শী প্রকাশ। ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় আত্মোপলব্ধি রচনায় মোহিতলাল মজুমদারের ‘আমি’ কিংবা তারও আগে ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘অভয়ের কথা’র প্রভাব অস্বীকার করে আহমদ শরীফের অভিমত গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য–

> ‘আমি’ দর্শন আর ‘বিদ্রোহী’ কাব্য। কাজেই দুটোই মৌলিক রচনা। যে-অর্থে ‘আমি’ অভয়ের কথা দ্বারা অনুপ্রাণিত, সে-অর্থেই কেবল ‘বিদ্রোহী’ কবির চিত্তলোক পরোক্ষ ‘অহং’ অনুরণিত। তাই ঘটেছে ‘আমি’ শোনায় ও বিদ্রোহী রচনায় প্রায় বছরকালের ব্যবধান। অনুকারী এত দীর্ঘকাল একটি রচনার প্রভাবের আবেগ ধরে রাখতে পারে না। এ ‘আমি’ বিস্মৃতির পরেরকার রচনা। (শরীফ, ২০১৪:২৪৮)

নজরুল-বিবেচনায় আহমদ শরীফ অনেকাংশে আবেগশূন্য নিরপেক্ষতা বজায় রেখে, দায়িত্ব ও জ্ঞানানুসন্ধী অবস্থান থেকে আলোচনা করেছেন। কারও মতে, তাঁর ‘নজরুল বিবেচনা কখনও একদেশদর্শী মনে হয়’ কারণ তিনি তাঁর আলোচনায় নজরুল সাহিত্যের স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কয়েকবার অথচ ১৯৯০ সালে প্রকাশিত একালে নজরুল গ্রন্থে ‘সময় ও সমাজের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে’ নিজের মত পরিবর্তন করে উপযোগ-বিচারে নজরুল-সাহিত্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির কথা বলেছেন (সৌমিত্র, ২০০১:২১৩)। নজরুল সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ তাঁকে প্রভাবিত করেছে বিরূপ মন্তব্যের জন্য, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলকে নিয়েও স্তাবকতা বা মুগ্ধতার বাড়াবাড়ি তাঁকে তীক্ষ্ণ ও প্রখর সমালোচনার বিপরীত প্রান্তে নিয়ে যেতে পারে বলে

মনে হয়। বিশেষত নজরুলের ধর্মবোধ বা বিশ্বাস এবং প্রেমভাবনার শৈল্পিক রূপায়ণের চেয়ে আহমদ শরীফ উৎসাহী ছিলেন ব্যক্তি নজরুলের অসংগত-অসংযত জীবনাচারের বর্ণনায়। এতে অবশ্য তাঁর রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিবেচনার মত নজরুল নিয়েও কিছু নতুন জিজ্ঞাসার জন্ম হয়েছে, পুরোনো বিশ্বাস ও প্রত্যয়গুলি হয়তো একটু টলেও গেছে; আহমদ শরীফের মূল্যায়নের সার্থকতাই এখানে।

৩.৩.১৪

'মধুসূদন ও স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আধুনিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আহমদ শরীফ। কারণ মধুসূদনকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ বলা হলেও ভাবে-ভাষায়-ছন্দে-আঙ্গিকে কিংবা চেতনায় মধুসূদন যে ইয়োরোপকে অনুসরণ করেছেন তা আঠারো শতকের, এমনকি তাঁর সমকালীন বা ঈষৎ পূর্বকালীন স্বদেশ-সমাজও নয়। এমনকি তিনি বাঙালির চেতনা-জগত থেকে মধ্যযুগ অপসারণ করে সাহিত্যে যে নতুনত্বের স্বাদ এনেছিলেন তা-ও কোনো অর্থেই আধুনিক নয় কারণ তা সমকালীন ইংরেজি বা ফরাসি সাহিত্যের আবেদনকেও স্পর্শ করেনি। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য থেকে সতেরো শতকের জন মিল্টন অবধি মধুসূদনের বিচরণ। নাটকে শেক্সপিয়রই তাঁর সীমা, কবিতায় অনুপস্থিত প্রেম-প্রকৃতির প্রেরণা, ইতিহাস বা দর্শনেও তাঁর আগ্রহের কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। আহমদ শরীফের ভাষায়-

> মধুসূদনের আবাল্য আকাঙ্ক্ষা ছিল কেবল দেশদুর্লভ কালোত্তর অমর কবি হওয়া, আর কিছুই নয়, তাতে সমকালীন কিংবা স্বাদেশিক শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি বা জীবন-জীবিকা সংপৃক্ত কোন স্বোপলব্ধ বক্তব্য কিংবা লোকহিতকর চিন্তা-চেতনা ছিল না। (শরীফ, ২০১০ক:১০২)

তবে উচ্চাভিলাষ ও আত্মপ্রত্যয়ে তিনি ছিলেন স্বসৃষ্ট রাবণের মতো। আত্মপ্রতিষ্ঠার অনমনীয় চেষ্টা তাঁকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন মানুষে পরিণত করেছিল।

ইদানীং আমরা গ্রন্থের 'কালান্তরে শরৎবীক্ষা' এবং 'কালিক প্রত্যয়ের আলোকে শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের শরৎ-মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে, শরৎচন্দ্র দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়েও সাম্যবাদী, সমাজবাদী বা বিপ্লবী নন। তাঁর সাহিত্যে গণমানব নেই–আছে মধ্যবিত্তের ও উচ্চবিত্তের ভদ্রলোক। তাঁর দৃষ্টি কেবল নারীর প্রতি নিবদ্ধ ছিল বলেই তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা ও জগৎ-চেতনা ছিল সংকীর্ণ। বিস্তৃত পরিসরে জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী ছিলেন না। শরৎ-সাহিত্যের আবেদন হৃদয়বানের কাছে, বুদ্ধিমানের কাছে নয়। আহমদ শরীফের ভাষায় শরৎ-সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা হল,'শরৎ সাহিত্যে মন আছে মনন নেই, আবেগ আছে যুক্তি নেই, সদিচ্ছা আছে, সাফল্য নেই, উপচীকির্ষার ব্যাকুলতা আছে উপকারের প্রমাণ নেই' (শরীফ, ২০১০ক:১২২)। তবে শরৎ-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা অস্বীকার্য নয়, এর কারণ সম্পর্কে আহমদ শরীফের অভিমত–

> বিষয়ও নয়, বক্তব্যও নয়, শরৎ-সাহিত্যকে জনপ্রিয় করেছে এক যাদু। সে-যাদুর আধার তিনটে– ভাষা, ভঙ্গি ও সংলাপ। এসবও হয়তো বাহ্য। মূলে ঐ হৃদয় নিঃসৃত করুণা ও প্রীতি এবং বক্তার ও শ্রোতার আত্মীয়তা ও একাত্মতা সাধক কোমল-পেলব অনুভূতি জাগানো ভাব– পরকে আপন করা বাক-ভঙ্গি। এমন মন-মজানো হৃদয়-কাড়া সুপ্রযোজ্য অন্তরঙ্গ বাগ্বিন্যাস, এমন ললিত মধুর অথচ সরল সুনিপুণ অনন্য কথকতা বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অতুল্য অবদান। (শরীফ, ২০১০ক:১২৭)

'মাটিলগ্ন মানুষের দরদী কবি : জসীমউদ্‌দীন' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ কবি জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ হলেও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। তিনি যথার্থই চিহ্নিত করেছেন যে, জসীমউদ্‌দীন শিক্ষিত ও শহুরে হয়েও মাটিলগ্ন, গৃহগত, অপরিশীলিত, অনক্ষর, গেঁয়ো মানুষের-চাষী-মজুরের ও অবজ্ঞেয় তুচ্ছ বৃত্তিজীবী মানুষের সঙ্গে মানসিকভাবে জীবনের অবসান মুহূর্ত অবধি একাত্মতা ও সমমর্মিতা নিষ্ঠার সঙ্গে লালন করেছিলেন। পদ্মাপারের গাঁয়ের ভাষার আধুনিকায়ন জসীমউদ্‌দীনের বিস্ময়কর দান। তাঁর উপন্যাস 'বোবা কাহিনী', আত্মচরিত

'জীবনকথা' বা 'স্মৃতির পটে'র সাধুরীতি গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট। একের পর এক মন্তব্যের মালা সাজিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন, পল্লীর উপাদান ব্যবহার করলেও জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যও শিক্ষিত লোকপাঠ্য শহুরে শিক্ষিতের রচনা। তবে তাঁর রচনায় কোনো উঁচুমার্গের দর্শন নেই। তিনি গণমানুষের দরদী কবি– 'পল্লীকবি' নন (শরীফ, ২০১৪:৫৩৬)। জসীমউদ্‌দীন গাঁয়ের হয়েও শহুরে, শহুরে হয়েও গাঁয়ের কবি। আবার আধুনিক হয়েও আধুনিক নন। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে আকাশচারিতা নেই, তাঁর কাব্য কুমড়া-ফুটি-তরমুজ লতার মতোই মাটিলগ্ন, সহজ, সুন্দর কিন্তু অননুকরণীয় (শরীফ, ২০১৪:৫৩৭)।

'এঁরা শক্তিমান জনপ্রিয় কবি, তবে প্রগতিপন্থী কি?'[১১০] এমন একটি প্রশ্ন উত্থাপন ছাড়া বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার বাহক ত্রিশের কবিকূল সম্পর্কে আহমদ শরীফ প্রায় নীরব। সে তুলনায় একটি প্রবন্ধে হলেও আহমদ শরীফের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কবি জসীমউদ্‌দীন। মুসলিম সাহিত্যসমাজের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও উদার মানবতাবাদ এবং আবুল হোসেনের প্রজ্ঞা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, এ-ছাড়া অন্য কারো বিষয়ে তিনি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন না মূলত সময়ান্তরে ধর্মীয় অনুশাসনে ভক্তির কারণে, যাকে তিনি রামমোহনের পরোক্ষ-প্রভাব বলে উল্লেখ করেছেন এক সাক্ষাৎকারে। আবুল ফজল[১১১] ও কাজী আবদুল ওদুদের আস্তিকতা, প্রতিষ্ঠাভিলাষী আপোষকামিতা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ বলেই তিনি তাঁদের সম্পর্কে উৎসাহী নন।

৩.৩.১৫

'বাংলাদেশের প্রবন্ধ-সাহিত্য' নামে এক প্রবন্ধে আহমদ শরীফ নিজের প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন–

> গুণাগুণ যা-ই হোক আমিও তিনশতাধিক প্রবন্ধ লিখেছি। আমার লেখার একমাত্র লক্ষ্য লৌকিক, অলৌকিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, নৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারের ও নীতিনিয়মের দেয়াল ভাঙা। (শরীফ, ২০১৬:৪৪৫)

প্রকৃতপক্ষে আহমদ শরীফের এই মন্তব্য আত্মবিশ্লেষণের অকৃত্রিম শব্দাবলি। তাঁর সাহিত্যভাবনায়ও একই প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। আহমদ শরীফের সাহিত্যভাবনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনটি বিষয়কে সমান গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন, এগুলি হলো– গণমানব, সেক্যুলারিজম এবং মানবতাবাদ। তাছাড়া সাহিত্যালোচনার শুরু থেকেই তিনি উপযোগবাদী এবং শ্রেয়োবাদী; তবে প্রথম পর্যায়ে সাহিত্যের উপযোগের চেয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টিকে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়াস ছিল। ক্রমশ তিনি কেবল সৌন্দর্যনির্মাণের ফাঁকি থেকে সরে গিয়ে গুরুত্ব দিতে থাকেন প্রয়োজনমুখ্যতাকে, কিন্তু প্রয়োজন শেষ হলেই যে শিল্পের শুরু এই আবশ্যকতাকেও মান্যতা দেন। নিজের লেখায় জগৎ-জীবন সম্পর্কে নির্বিশেষ মন্ময়ভাবনা থেকে সরে গিয়ে দ্বেষ-দ্বন্দ্বময় সবিশেষ বস্তুপৃথিবীর হিতচিন্তাকেই প্রাধান্য দিতে থাকেন। আহমদ শরীফের রচনার এই পরিবর্ত প্রক্রিয়া ও প্রবণতা ব্যাখ্যা করে আহমদ কবির লিখেছেন–

> তাঁর প্রবন্ধ-চিন্তা ক্রমশ সাহিত্যের তত্ত্ব, সৌন্দর্য ও ইতিহাস বিশ্লেষণের এলাকা অতিক্রম করে দেশ ও সমাজের সমস্যা ও সংকট কিংবা সমকালীন চালচিত্র উন্মোচনে অধিক প্রবণতা দেখিয়েছে। ডক্টর আহমদ শরীফ সমাজতান্ত্রিক শ্রেয়োবাদী চিন্তার লোক। গণমানবের কল্যাণ ও মুক্তি তাঁর কাম্য। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় নানা সমস্যা ও সংকট উদ্ভূত হওয়ার জন্য তিনি গণবিরোধী দেশি বিদেশি অশুভ চক্রকেই দায়ী করেছেন এবং এইসব নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তীব্র ভাষায়- কখনো বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে, কখনো দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার কলামে। (কবির, ২০১৩:৩২)

মার্কসবাদ আহমদ শরীফের প্রেরণা ও শক্তি হিসেবে কাজ করেছে সর্বত্র কিন্তু সেখানে বাঁধা পড়েননি কখনও। তার চেয়ে নাস্তিক্যেই তাঁর আস্থা ছিল বেশি। তাই মার্কসবাদে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী যা-ই হোক ধর্মীয় বিশ্বাসে স্থিত তথা আস্তিক যে-কেউ আহমদ শরীফের ভৎর্সনা ও বিদ্রূপ সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে

মুসলিম সাহিত্যসমাজের লেখকগণও এই বিবেচনা থেকে বাদ পড়েননি। সাহিত্যের সাথে সাহিত্যিকের পরিপ্রেক্ষিতের যোগসূত্র আহমদ শরীফের সাহিত্যবিচেনায় এতটাই কর্তৃত্ব করে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-প্রাধান্যে সাহিত্যবিচার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কোনো কোনো সমালোচক আহমদ শরীফের সাহিত্য সমালোচনার ধরনকে 'চরমপন্থা' এবং 'একমাত্রিক ও খণ্ডিত' বলে মনে করেন। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন 'কোন একটি ধারণা বা আদর্শকে মানদণ্ড ধরে কবি বা স্রষ্টাকে বিচার করা আহমদ শরীফের সাহিত্যবিচারের মৌল প্রবণতা। শুধু সৃষ্টি নয় স্রষ্টাকেও তিনি একীভূত করে নেন তাঁর ঐ-আদর্শ বা ধারণার সাথে'[১১২] (আজম, ২০০১:৮০)। আমাদের বিবেচনায় সমগ্রতাসন্ধানী সমালোচক স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টিকর্মের সবদিক থেকে সূত্র নিয়ে সেগুলিকে যুক্ত করে তবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আহমদ শরীফ অতিদ্রুত সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যান বলেই সামগ্রিক চিত্রটি অস্পষ্ট থাকে, মন্তব্য হয়ে যায় প্রধান, ধারণাকে খণ্ডিত মনে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে আহমদ শরীফের 'বক্তব্যে অপূর্ণতা থাকতে পারে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর পূর্ণতাপ্রয়াসী' (কাসেম, ২০০৫:১০৯)। আহমদ শরীফের প্রবন্ধে এমন উদাহরণ বিস্তর, এজন্য অনেকেই তাঁর বিরূপও হয়েছেন। কোনো সাহিত্য সমালোচনাতত্ত্ব নেই আহমদ শরীফের, কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বে তাঁর আস্থাও নেই। এমনকি সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে, তাঁর ভাষায়, 'প্রভাব-তত্ত্ব'[১১৩]ও তিনি অস্বীকার করেন; উপযুক্ত মনে করেন না তুলনামূলক আলোচনার ধরনও। কারণ সেখানেও 'বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা ও গভীরতাজাত মূল্যায়ন' অবহেলিত হয় বলে (শরীফ, ২০১৪:১৯৫)। পাশ্চাত্যের আধুনিক সাহিত্য সমালোচনাতত্ত্বের বিশ্লেষণাত্মক বা প্রায়োগিক কোনো রূপ নিয়ে আলোচনাও তাঁর শুধু বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল বিবেচনায় নয়, আহমদ শরীফ নিজের মত খণ্ডন করে নতুন অভিমত দিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময়-সমাজ-পরিপার্শ্ব, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এসব পরিবর্তন হয়েছে, উদাহরণ– মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ও পরের রবীন্দ্র-বঙ্কিম-নজরুলবিবেচনা, গণসাহিত্য-জাতীয়সাহিত্য, কেজো-অকেজোসাহিত্য চিন্তার বিবর্তন। তবে নিজের পরিবর্তিত মত প্রকাশে কোনো দ্বিধা রাখেননি, সংকোচও করেননি কখনও। বিবেকের কাছে এই সততার পরীক্ষায় তিনি সবসময়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

আহমদ শরীফ সাহিত্যকর্মের গুণ-শৈলী-উপাদানগত বিশ্লেষণে খুব কমই উৎসাহী ছিলেন যতটা তৎপর ছিলেন বিষয় ও ব্যক্তির সাথে সমাজসংগঠনের সম্পর্ক-দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা ও ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধানে তিনি উদ্যোগী ছিলেন বেশি। সময় ও ইতিহাসের গভীরতা আহমদ শরীফের আয়ত্তে ছিল। বিষয়ের অন্তস্তল-গভীরতা পর্যন্ত সবকিছুকে তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টিতে যাচাই ও বাছাই করে নিতে পারতেন। এ কারণে দ্রুত সংশ্লেষণ ও সমীকরণে পৌঁছে যাওয়াই হল তাঁর লিখনশৈলী, এজন্য অনেক সময় প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও বর্ণনাও পরিহার করেন আহমদ শরীফ। তবে আহমদ শরীফের সাহিত্য সমালোচনায় সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্যিক প্রধান হয়ে যায় বলে অনেক সময় তা প্রকৃত সাহিত্যগুণ বিচারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব ক্ষেত্রে তিনি হয়তো জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে জ্ঞান-চাঞ্চল্য তৈরি করতে পারেন সহজেই কিন্তু বিঘ্নিত হয় রসাস্বাদনের আনন্দ। তাই আহমদ শরীফ সবসময়ই অনুসন্ধানী ও মতভিন্নতা-উৎসুকী পাঠকের স্বস্তির আনন্দ।

৩.৪

আহমদ শরীফের কাছে সাহিত্য চর্চা উদ্দেশ্য নয়, বক্তব্য পৌঁছে দিতেই তিনি ছিলেন বেশি উৎসাহী। মধ্যযুগ নিয়ে তাঁর বিপুল গবেষণার মধ্যে তিনি নিমজ্জিত থাকতে চাননি। তেমনি উদারনীতি-ঐতিহ্য-জাতীয়তাবাদে বা সমাজতন্ত্রেও তিনি ছিলেন না মীমাংসিত-প্রাণ। সর্বক্ষণ নতুনকে পরিগ্রহণের মাধ্যমে নতুন প্রত্যয়ের সাথে পুরনোর সংঘর্ষে-সংঘাতে নতুন চিন্তাস্ফুলিঙ্গ জন্ম দেয়ায় তিনি ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধপুরুষ। জন্মকাল থেকেই দেখে এসেছেন পুথি, 'দেহের চারদিকে–ঘরের চারদিকে–মনের চারদিকে' (আহসান, ২০০৭:৩৫)–অথচ তাঁর মানসজগত পুথি জীর্ণতা নয় পূর্ণতা নিয়ে হাজির হয়েছিল। 'মূর্তিমান মধ্যযুগ' শ্লেষের মধ্যেও তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন

মননচৈতন্যে-সর্বার্থে শুভ্র আধুনিক হিসেবে। কারণ মধ্যযুগ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আহমদ শরীফ পণ্ডিত হয়েছিলেন আর সমকালীন মানুষের মুক্তির জন্য মুক্তচিন্তা তাঁকে দার্শনিকে পরিণত করেছে (রফিকুল, ২০০১:১৯৩)।

সমাজ-প্রকৃতি-জীবন সম্পর্কে আহমদ শরীফের চিন্তাভাবনা অনেকক্ষেত্রে দার্শনিক প্রজ্ঞা অর্জন করেছিল। যে-কোনো বিষয় ও প্রসঙ্গের অন্তর্গত কার্যকারণশৃঙ্খলা অবলম্বনে নিজস্ব মানদণ্ড নির্ধারণ করে তার সমর্থনে যুক্তির শৃঙ্খলা তৈরির মাধ্যমে স্বকীয় অবস্থান নেয়ার প্রাবন্ধিকসুলভ দক্ষতা আহমদ শরীফের ছিল। বিরুদ্ধমত বা ভিন্নমতের প্রতি তাঁর গ্রহণশীলতাও ছিল প্রশ্নাতীত। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আহমদ শরীফের 'সাময়িক প্রতিকারে গুরুত্ব দেয়া' এবং 'Anti-thesis অবলম্বনে' বা 'নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি'তে কাজ করাকে কেউ কেউ সমর্থন করতেন না।[১১৪] ব্যক্তির মন-মনীষাকে তিনি বিশ্লেষণ করতেন সময়-সমাজ-প্রতিবেশের সামগ্রিকতায়। আবার সমাজ-বিশ্লেষণের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন ব্যক্তির জীবন-জীবিকার সংগ্রামে পরিবর্তমান যুগোপোযোগী উপায় ও অবলম্বনের সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে। সমাজের উপরিকাঠামোর সাথে ভিত্তিকাঠামো তথা উৎপাদন যন্ত্র ও ব্যবস্থার যে-সম্পর্ক তাকে সংস্কৃতির উৎস বিবেচনা করে গণমানবের গণসংস্কৃতি, গণসাহিত্য ও গণচেতনার রাষ্ট্র ও সমাজ কামনা করেছেন আহমদ শরীফ।

আহমদ শরীফের সমালোচনা পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক হলেও ষোল আনা সত্য বা অব্যর্থ তা তিনি নিজেও স্বীকার করেন না, ভুল স্বীকারের মানসিকতা তাঁর সহজাত।[১১৫] স্বকাল-সমাজ-স্বদেশের ইতিহাস-ঘটনা তিনি বিশ্লেষণ করেন স্তরবহুল কার্যকারণসম্বন্ধসূত্রে। তাঁর ভাষায়–

> কোন ঋজু একক কারণে প্রায় কিছুই ঘটে না। তাই কারণ বলতে কারণ-পরম্পরা বুঝতে হবে। এবং সে কারণ সন্ধান কিংবা আবিষ্কারও কোন একহারা বিদ্যার কাজ নয়। দেশকালের পরিমণ্ডলে থাকে নানা জটিল কারণ-ক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত। সেজন্যে আজকাল যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উদঘাটন লক্ষ্যে বিচার-বিবেচনায় শারীরবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান প্রয়োগে আর্থিক নৈতিক-শাস্ত্রিক-সামাজিক-শৈল্পিক পরিবেশে বিশ্লেষণ করতে হয়। পদ্ধতিটির নাম অবশ্য বৈজ্ঞানিক হলেও উদঘাটিত তথ্য ষোলআনা সত্য হবে না– কারণ মানুষ যন্ত্রও নয়, জড় পদার্থও নয়। বর্ণিত পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগের সাধ্যও আমাদের নেই। (শরীফ, ২০১৪:১৬০)

মার্কসীয় সাহিত্যবিচারের মূলনীতি আহমদ শরীফ অনুসরণ করেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এর মূল কথা। প্রভাবতত্ত্বে অস্বীকার, আর্থসামাজিকরাজনীতিক কার্যকারণ পরম্পরার বহুতল বিন্যাস পূর্ণাঙ্গ বিচারের জন্য আবশ্যক, যদিও যথেষ্ট নয়। তাই তাকে আন্তর্বিদ্যক (Interdisciplinary), মার্কসীয়, আন্তরবাচনিক সমালোচনা পদ্ধতির অনুসারীও বলা যায়।[১১৬] যদিও এসব বিশ-শতকী সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিবেচনা বা বিবেচনার উৎসাহ তাঁর ছিল এমন মনে হয় না।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আহমদ শরীফের প্রবন্ধে সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনীয়তা বারবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কখনও স্পষ্টভাবে কখনও পরোক্ষে প্রবন্ধের বিষয়ে প্রাধান্য পেয়েছে সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার গলদ ও অন্তঃসারশূন্যতা। তিনি যে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় আস্থাশীল হয়ে উঠছিলেন তার প্রধান কারণ দেশের বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন, গণমানুষের গণজীবন ও সংস্কৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সর্বাবস্থায় মানবিকতার প্রতিষ্ঠা। একাজে একমাত্র মার্কসবাদীরাই যোগ্য বলে মনে করতেন আহমদ শরীফ। আহমদ শরীফের নাস্তিক্য ও শাস্ত্রবিরোধিতার প্রধান কারণও তা। ধর্মবিশ্বাসী তথা আস্তিক যতই উদার হোক অপর ধর্মের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ-বিরোধ-ঘৃণা পুষে রাখে মনে, হীন বা নীচ তো মনে করেই– এমন বিশ্বাস ছিল আহমদ শরীফের। তাই তরুণ বয়স থেকেই তিনি ধর্মের ওপর আস্থা হারাতে থাকেন[১১৭] তবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে তা প্রবলতর হয়। সমাজে ধর্মীয় মৌলবাদ ও গোঁড়ামির বিস্তার, ধর্মকে ব্যবহার করে

রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের প্রতিযোগিতা এবং শাস্ত্রানুগত্য যত বাড়তে থাকে আহমদ শরীফও তত সমালোচনামুখর হতে থাকেন এবং একপর্যায়ে তিনি নাস্তিক্যকেই বিশ্বাসে পরিণত করেন।[১১৮] তাঁর এই বিশ্বাস এতটাই সংহত হয়েছিল যে, নাস্তিক্যকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন সকল হিতসাধন এবং হিতৈষণার উপরে। সাহিত্য-বিবেচনা, নারীমুক্তি, সমাজ-সংস্কার, দেশপ্রেম, জাতীয়তা– সকল চিন্তাক্ষেত্রে নাস্তিক্যই প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। তবে আহমদ শরীফ মূলত শাস্ত্রানুগত্যের বিরোধী, ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার বিরোধী নন।

আহমদ শরীফের ধর্মবিরোধিতা বা নাস্তিকতা রূপলাভ করেছিলো মূলত যুক্তি ও বিজ্ঞান ঘিরে। অলৌকিকতার তিনি ঘোর বিরোধী। আহমদ শরীফ শাস্ত্র বিরোধী ছিলেন, তবে সব ধর্মের সাধারণ মূলনীতি প্রতিপালনে তাঁর সমর্থন ছিলো। তাঁর শাস্ত্রবিরোধিতাও মূলত মানুষের অজ্ঞতা, অন্ধত্ব, বিজ্ঞান ও যুক্তিহীন বিশ্বাসে আঘাত হানার প্রতিক্রিয়ায়। এই বিরোধিতা আরও প্রকট হয়েছে শাস্ত্র নির্ভর মানুষের দ্বারা সর্বদা মানবতার অবমূল্যায়নের কারণে। আস্তিকতা বা ধর্মবিশ্বাস মানুষকে স্বধর্মীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ও পরধর্মের প্রতি অবহেলা-অবজ্ঞা-বৈষম্যবিদ্ধ করে, তা সেই আস্তিক মানুষ যতই মানবতাবোধ দ্বারা চালিত হোক না-কেন। নাস্তিক্য বলতে আহমদ শরীফ শুধু যে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাস বোঝাতেন তা নয়, শ্রেণি-জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বমানবিকতা অর্জনের মাধ্যমও মনে করতেন। তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা রামমোহন রায়ের আস্তিকতা শাস্ত্র ও সমাজসংস্কারের প্রয়োজনে 'শাস্ত্রে আস্থাহীন হয়েও শাস্ত্রাশ্রিত'[১১৯] হওয়ার মতো দ্বন্দ্ব-জটিল বলে ব্যাখ্যা করেন আহমদ শরীফ। তাঁর সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা মনে রেখে বলা যায় ঐহিকতাই মর্ত্যমানবপ্রীতি ও মানবতাবোধ অর্জনের সহায়ক।

রাষ্ট্র, সমাজ, মানুষ, নীতি, ঈশ্বর, আস্তিক্য, নাস্তিক্য, জাতি, জাতীয়তা, সংস্কৃতি– সবকিছুকে ধাবমান সময়ের মাপে-মাত্রায় বাঁধাই করার, সূত্রবদ্ধ করার, সংজ্ঞায়নের সহজাত দক্ষতা প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফের অনন্যতা। মানুষের জীবন-সমাজ-চৈতন্যের সকল উপাদান, অভিজ্ঞতা, প্রতিবেশ-প্রকৃতির সাথে সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে নিয়োজিত থেকে যে নতুনতর চেতনা ও সত্যে উপনীত হয়, পরিবর্তমান সময়-পৃথিবীতে সেই দ্বন্দ্ব অনিঃশেষ বলেই প্রগতির পথ চলিষ্ণুতায়-নতুনত্বে স্বীকৃত, বরেণ্য– আবার বন্ধুরও। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে আহমদ শরীফ ছিলেন প্রগতির পথে সবচেয়ে গতিষ্মান এবং অবিশ্রান্ত পরিব্রাজক। হয়তো এ কারণে আহমদ শরীফের রচনায় বক্তব্যের পুনরাবৃত্তির অভিযোগ অমূলক নয়, তবে সকলক্ষেত্রে তা মান্যও নয়। কারণ চল্লিশটি সামাজিক-পেশাগত-বুদ্ধিবৃত্তিক-স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের গঠনে-নেতৃত্বে-পৃষ্ঠপোষকতায়-কর্মসম্পাদনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আহমদ শরীফ সমকালীন অনেক বিষয়ে তাঁর মতামতকে বক্তৃতা-বিবৃতি-উপসম্পাদকীয়-কলাম ইত্যাদি গণযোগাযোগভিত্তিক নানা আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন আবার বিশ্লেষণাত্মক-গবেষণামূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে তা সমাজের চিন্তাশীল বিদগ্ধজনের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাই বক্তব্য বিষয়ের পুনরাবৃত্তি থাকলেও প্রেক্ষণবিন্দুর বহুমাত্রিকতা, ভিন্নতা, সমকালীনতা ও বৈচিত্র্য দৃষ্টি এড়ায় না। যেমন– সংস্কৃতি, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, মানুষের অভ্যাস আচরণ, নাস্তিক্যের পৌনপুনিক উল্লেখ বা ব্যাখ্যা থাকলেও তা যে নানামুখী চিন্তাস্রোতের ফল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাছাড়া বিষয়কে নৈর্ব্যক্তিক দূরত্বে থেকে বিচার করে যুক্তি-জিজ্ঞাসার শৃঙ্খলায় উপস্থাপনের স্বকীয় ভঙ্গি আহমদ শরীফের পুনরাবৃত্তিদুষ্ট রচনাতেও পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করে। অনেকক্ষেত্রে শিরোনাম বা প্রস্তাবনাও এই কৌতূহলের কারণ হয়, বিষয়ের পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও অনুভবের নতুনত্বে তা বিবেচ্য। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, পত্রিকার কলাম, অনুবন্ধ ইত্যাদি আহমদ শরীফের সামগ্রিক প্রবন্ধ সম্ভারের বিবেচনায় বর্ণন-বাহুল্যে, চিন্তার শৈথিল্যে ও বিষয়রিক্ততায় বর্জিত হতে পারে।

বাংলা, বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিচারে আহমদ শরীফ সাবঅল্টার্ন গবেষকদের মতো সমাজের প্রান্তিক বা উপেক্ষিত অন্তজ শ্রেণির সাধারণ মানুষকে কেন্দ্রে স্থাপন করেন। এই প্রয়াস অধুনা-বিশ্রুত নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার ধারণার খুব নিকটবর্তী। বিশেষ করে নিম্নবর্গ-উচ্চবর্গ ক্ষমতাসম্পর্কের ধারণাই তিনি ব্যবহার করেছেন ঊনজন-অধিজন পরিভাষায়। এই ধারণা সত্তরের দশকে মার্কসবাদের প্রভাবে ইয়োরোপের সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদের 'তল থেকে দেখা'র দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ। আহমদ শরীফের জিজ্ঞাসার সাথে তা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে–

> বাঙালীর সত্যকার ইতিহাস জানা ও জানানো দরকার। পরশাসিত বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাস নেই মেনে নিলে বাঙালীর ইতিহাস রচনা কষ্টসাধ্য নয়। বাঙালীর চিন্তার চেতনার ও কৃতির ইতিহাসরে উপকারণ আজো বিলুপ্ত হয়নি। আমরা জানি ঘটনার সুবিন্যাস ইতিহাস নয়, চেতনার অনুসরণ ও চিত্রণই ইতিহাস। কারন মন ও মননই মানুষের কর্মে ও আচরণে অভিব্যক্তি পায়। ইতিহাসের লক্ষ্য সামষ্টিক মনের ও মননের সমান্যিকৃত অভিব্যক্তির স্থানিক ও কালিক আবর্তন-বিবর্তন কিংবা অনুবর্তনের ধারায় অনুধাবন ও বিশ্লেষণ। (শরীফ, ১৯৭৮:১৪)

যাদের ইতিহাস তিনি লিখতে চেয়েছিলেন অথবা ভবিষতে লেখা হবে বলে আশ্বস্ত হতে চেয়েছেন[১২০] তারা হল নিম্নবর্গের মানুষ–

> যারা এই দেশের অধিবাসী- সেই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, বাগদী- যারা শূদ্র, অস্পৃশ্য- তাদের কথা তো বাঙলাদেশের ইতিহাসে লেখা হয়নি, তাদের কোনো অস্তিত্বও তো আজো পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। বাঙালীর ইতিহাস পূর্ণ অবাঙালী বহিরাগতের বিবরণ দিয়ে। বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি-বিধর্মী যারা এখানে পরাক্রম হয়ে এসেছে, যারা এখানে ধর্ম নিয়ে এসেছে, তাদেরই রাজত্বের কথা- তাদেরই বিদ্যাবুদ্ধির কথা- তাদেরই জ্ঞান-গৌরবের কথা, তাদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা আমরা আমাদের বলে দাবি করে গর্বে বুক স্ফীত করছি। (শরীফ, ২০১০:৭৫)

ইতিহাস রচনায় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে নিরপেক্ষ বস্তুবাদী দৃষ্টি প্রয়োগ করাকে মানবিক দায়িত্ব বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। বাংলার প্রাচীন সমাজও যেমন এককভাবে হিন্দুর নয়, তেমনি মধ্যযুগের সমাজও নয় মুসলমানের এই সত্য উপলব্ধি করার মধ্যেই রয়েছে ইতিহাসের পাঠ থেকে সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্তির উপায়।[১২১]

তাঁর স্ববিরোধিতার কথাও উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন সময়। কালান্তরে *বিচিত চিন্তা*-র অনেক ধারণা-বিশ্বাস-উপলব্ধি থেকে সরে নতুন সময় ও প্রেক্ষাপটে নতুন বোধ ও প্রত্যয়ে স্থিত হয়েছেন আহমদ শরীফ– যেমন ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশেষত সাহিত্যের ঐতিহ্য লালনকে তিনি একসময় জাতি ও জাতীয় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। কিন্তু পরে ঐতিহ্যের প্রতিপালনকে তিনি অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক বিধায় ক্ষতিকর এবং বাতিল করেন। এভাবে প্রথম জীবনে আদর্শানুগত্য সাহিত্যের জন্য ক্ষতিকর মনে করলেও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সুকান্তের সাহিত্যকে আদর্শের কারণে রবীন্দ্রনাথের ওপর স্থান দিতে চেয়েছেন। প্রথম জীবনে নাস্তিক্য এতটা প্রাধান্য না পেলেও পরবর্তী জীবনে প্রগতিশীল মানুষ বলতে তিনি নাস্তিককেই বুঝতেন। এসবই প্রগতিবাদী চিন্তাশীল মানুষের, পরিবর্তমান সমাজ-প্রতিবেশের সাথে নিরন্তর মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রামের ফল। যদিও আহমদ শরীফ তাঁর পরিবর্তিত মত প্রকাশেও ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক। স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁর স্বভাবজাত– মত প্রকাশে, আড্ডায়, বিবৃতিতে, শ্রেণিকক্ষে এমনিক প্রবন্ধের ভাষায়। যদিও স্বতঃস্ফূর্ততার কারণে সৃষ্ট বিচ্যুতি তাঁর চোখে পড়েনি, দোষগুলোও থাকেনি আড়ালে। তাঁর কথার 'উল্টোরকম বোঝার লোকদেরকে'[১২২] কোনোরকম গুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্বিধায় অকপটে মত প্রকাশ করার প্রবণতা আহমদ শরীফকে পরিচিত করেছে তাঁর সময়ের সবচেয়ে দ্রোহী সমাজসেবকে। তাঁর গবেষণার প্রক্রিয়া অথবা লেখার যুক্তি-পদ্ধতি নিয়ে সন্দেহ ছিলো[১২৩], তাঁর নাস্তিক্য নিয়েও ছিলো প্রবল বিরুদ্ধতা তথাপি তাঁর সাহসী সত্যভাষণ নিয়ে কারো মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই। কারও মতে তিনি non-conformist বা প্রথাবিরোধী, কারও মতে anarchist[১২৪] বা নৈরাজ্যবাদী, কারও মতে 'উজান স্রোতের যাত্রী'[১২৫], আবার কারো মতে তিনি 'যশোলিপ্সু'[১২৬]। এ প্রসঙ্গে ১৯৮০-র ও ১৯৯০-র জনপ্রিয় ঘটনাগুলোর

নির্মোহ, নিরাসক্ত, সত্যসন্ধ বিশ্লেষণ ও পুনর্বিচার প্রত্যাশা করে আবুল কাসেম ফজলুল হকের মন্তব্য আহমদ শরীফকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ–

> তাঁর [আহমদ শরীফ] চিন্তাধারা বিবেচনার সময়ে ঐতিহাসিক পটভূমি, তাঁর সাংগঠনিক সংযোগ, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা এবং বক্তৃতা-বিবৃতিকেও বিবেচনায় ধরতে হবে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বিচার করতে হবে। সমকালীন প্রচারমাধ্যমের ভূমিকাকেও বিচারের মুখোমুখী করতে হবে। প্রচারমাধ্যম অধ্যাপক আহমদ শরীফকে যেভাবে উপস্থাপন করেছে, তাঁকে দিয়ে যেসব কথা বলিয়ে নিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সৃষ্টিশীল আহমদ শরীফের পরিচয় কিভাবে কতটা রূপায়িত কিংবা বিকৃত হয়েছে তা বুঝতে হবে। তাঁকে যতই আমরা জানতে চেষ্টা করব ততই দেখব, তাঁর সম্পর্কে আমরা যা ধারণা করি, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রম-সত্ত্বেও তিনি তার চেয়ে বড়। (কাসেম, ২০০১:৩১১)

আহমদ শরীফের সারা জীবনের জ্ঞান-সাধনা, মুক্তচিন্তা ও মানবিকতার পক্ষে অনমনীয় অবস্থান, 'ক্ষতি স্বীকারে অকুণ্ঠতা' সকল সময় প্রথাবিরোধিতা এবং বৈপরীত্বে-প্রতিকূলতায় চলার দৃঢ়তার সাথে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে 'রিপ্রেজেন্টেশেন্স অব ইন্টেলেকচুয়ালস্' গ্রন্থে একালের শীর্ষ পণ্ডিত এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাইদের মন্তব্য মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় আহমদ শরীফ বুদ্ধিজীবী হিসেবে গ্রামসি-র সংজ্ঞা অতিক্রম করে সাইদের উত্তর-আধুনিক চেতনার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। সাইদ বলছেন–

> বুদ্ধিজীবীদেরকে জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে হয়। ঐ সমস্ত পবিত্র দর্শন বা পুস্তকের রক্ষাকর্তাদের সাথে যাদের শক্তিশালী ক্ষমতা কোনো মতানৈক্যতা এবং সুস্পষ্টভাবে কোনো বিভিন্নতা সহ্য করতে পারে না। মতামত এবং প্রকাশভঙ্গির অদম্য স্বাধীনতাই বুদ্ধিজীবীদের প্রধান রক্ষাকবচ। এই রক্ষাব্যুহ পরিত্যাগ করলে অথবা এর ভিত্তির উপর কোনো বিকৃতি সহ্য করার পরিণামে বুদ্ধিজীবীর পরিচয় কলঙ্কিত হয়। (সাইদ, ২০০৯:৬৮)

কোনো ধরনের দলীয় সাংগঠনিক পদ-পদবীর সূত্রে আহমদ শরীফ কমিউনিস্ট বা সমাজতন্ত্রী ছিলেন না। কিন্তু তিনি মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রে আস্থাবান ছিলেন, কিন্তু কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে আস্থা রেখেছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। 'তাঁর সারা জীবনের বিশেষ করে ১৯৯০ সালের শেষার্ধ থেকে অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-ফিচার প্রভৃতির আনুমানিক পঁচাত্তর শতাংশের মূল বক্তব্য হচ্ছে মাটিলগ্ন সাধারণ মানুষের সমস্যা-সংকট থেকে মুক্তি অন্বেষণ' (প্রথমা, ২০০৬:২২২)। ছিলেন কঠোর সমালোচকও। হুমায়ূন আজাদকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আহমদ শরীফ মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রে তাঁর আস্থার কারণ সম্পর্কে জানিয়েছেন–

> আমি যখন লিখতে শুরু করি তখন দেখি যে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ব কম্যুনিজমের কথা বললেই চারদিকের মানুষ চটে ওঠে, অথচ এ যুগে বণ্টনে বাঁচা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বণ্টনে বাঁচতে হলে রীতি-নীতি-আইন-কানুন-শাস্ত্র সম্পর্কে নতুন ধারণা করতে হবে, পুরোনো দিয়ে হবে না। সেজন্য দরকার সমাজতন্ত্র। মানুষের সর্বশেষ আবিষ্ক্রিয়া সমাজতন্ত্র, সর্বশেষ বলেই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর গরিব দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট। সেজন্যই আমি সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। কিন্তু সমাজতন্ত্র বললেই মানুষ ক্ষেপে যায়, তার কারণ হল শাস্ত্র। মানুষ বিশ্বাস-সংস্কার অনুসারে চলে। তাদের ভূতে ও ভগবানে বিশ্বাসেরর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ওই বিশ্বাসই তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, তারা নিয়তিবাদী হয়, অদৃষ্টবাদী হয়। নতুন ব্যবস্থার জন্যে তাই আঘাত করা দরকার বিশ্বাসের দুর্গে। প্রথম লেখা থেকে আজ পর্যন্ত আমি মানুষের পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-নিয়ম-শাস্ত্র-প্রচলিত আইন-কানুন সব কিছুকেই আঘাত করেছি। (শরীফ, ২০০১:৩০৫)

বলা হয়ে থাকে, ভাববাদ-মানবতাবাদ-মার্কসবাদের এক বিক্ষুব্ধ মিশ্রণ ডক্টর আহমদ শরীফ। (হুমায়ূন, ২০০১:২৯১) কিন্তু মানুষের জন্য একটি অভিন্ন মিলন ময়দানের সন্ধানে তিনি ভাববাদীকেই সবার আগে বর্জন করেছেন। আহমদ শরীফের ব্যাখ্যায় তার কারণ–

> ভাববাদীরা বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানীর সব বস্তুগত অবদান নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার করে বাস্তব ও বাহ্যজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম ভোগ-উপভোগ করে বটে কিন্তু অনাস্থায় অবজ্ঞায় উপহাসে পরিহারে বর্জন করে বিজ্ঞানকে ও বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তত্ত্বকে তথ্যকে ও সত্যকে। তারা স্রষ্টাতে বিশ্বাস, আস্থা ও ভরসা রাখে (belief, faith, trust) জন্মে, জীবন মৃত্যুর ও মৃত্যু-উত্তরকাল পরিসরে যা ঘটে বা ঘটবে সব কিছুর স্রষ্টা, নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রকরূপে। (শরীফ, ২০১৬:৭৬-৭৭)

সুতরাং ভাববাদে আহমদ শরীফের অনাস্থা প্রমাণিত ও সর্বজনবিদিত। বরং আহমদ শরীফ, প্রকৃতপক্ষে, যুক্তিবাদী-মানবতাবাদী-প্রগতিপন্থী–এই অভিধায় স্বচ্ছন্দে চিহ্নিত হতে পারেন। কারণ তিনি মার্কসবাদকে অবলম্বন করেছিলেন প্রগতি ও মানবতার স্বার্থে, কমিউনিজমকেও তিনি আংশিক সমর্থন করতেন একই কারণে। কিন্তু সবসময় প্রগতির সহায়ক নয় বলে তিনি সেটাতেও সন্দেহ পোষণ করেছেন।[১২৭] তাঁর নাস্তিক্যও যুক্তিবাদে অটল আস্থার কারণেই। যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানার কারণেই তিনি বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী এবং দুটির সমন্বয়কে সুবিধাবাদ বা ভণ্ডামি মনে করেন। অর্থাৎ তিনি মুখ্যত এই তিন আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক সব মতবাদ বিশ্বাস বা ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন– তা যতই আধুনিক বা জনপ্রিয় হোক। হুমায়ুন আজাদের উপলব্ধি এক্ষেত্রে অনেকাংশে প্রতিনিধিত্বমূলক–

> তিনি মেজাজে ছিলেন প্রচণ্ড, নিজেকে প্রকাশ করতেন তীব্রভাবে, চেতনায় তিনি ছিলেন প্রগতিশীল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, ছিলেন অতীত, প্রথা ও ধর্মবিমুখ। তাঁকে আমার মনে হতো মানবতাবাদ, সাম্যবাদ আর রোম্যান্টিসিজমের এব তীব্র মিশ্রণ। (হুমায়ূন, ২০০১:৩৯৩)

আহমদ শরীফের লেখায় আমরা পাই জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বের পরিচয়, মুক্ত উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত প্রকাশের অদম্য স্বাধীনতা, পাই– 'না' বলার সাহস। বাঙালি জাতিকে যোদ্ধার ইতিহাস না-হোক, নিদেনপক্ষে দ্রোহী-সংগ্রামীর ইতিহাসে স্বস্থ করার আজীবন প্রয়াস ছিল তাঁর। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-নজরুলের মধ্যে আসলে দ্রোহী জিজ্ঞাসুকে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি– তাঁর নিজের মতো জেদি এবং উদ্ধত[১২৮]। তিনি বাঙালির ঘৃণার বিষয়গুলোও উচ্চারণ করেছেন নির্দ্বিধায়, আত্মপরিচয় থেকে আত্মসংশোধনের স্বার্থে। উপনিবেশবাদের পর উত্তর-আধুনিকতার পুঁজিবাদী ছকে মার্কসবাদের ইতিহাসচেতনা-আন্তর্জাতিকতা-সার্বজনীনতা-আদর্শবাদ যখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র-বিভক্ত হয়ে ব্যক্তির ইতিহাস, ব্যক্তির বাস্তবতা, ব্যক্তির ঈশ্বরে পরিণত হয় তখন আমাদের সমাজে আধিপত্যবাদ নতুন আঙ্গিকে ও বৈশিষ্ট্যে মাথাচাড়া দেয়। সমাজে নানা প্রকার আধিপত্যবাদী চলক ক্রিয়াশীল থাকলেও পুঁজিবাদী প্রচারযন্ত্র সেগুলোকে কখনও গণমানবের স্বার্থে উন্মোচিত করে না। 'এসব প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য সর্বজনীনতা ও আদর্শবাদকে দুর্বল প্রতিপন্ন করা। যা তথাকথিত উত্তর-আধুনিকতার প্রবক্তারা বেশ পারঙ্গমতার সাথে করছেন' (সিরাজুল, ২০০৬:২৬)। এসব কার্যকলাপকে সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদ বলে চিনিয়ে দেয়ার মতো কেউ থাকে না সমাজে। কারণ তার জন্য ভিক্ষুকের সাজ ত্যাগ করে যোদ্ধার সাজ গ্রহণ করতে হয়।[১২৯] আহমদ শরীফ শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষ ছিলেন বলেই ভিক্ষুকের আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ন্যূব্জপৃষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাঁর কাছে ঘৃণ্য। আহমদ শরীফ সেই কাজটি একাই কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন বলে তাঁর সকল নঞর্থকতা-নেতিবাচকতার মধ্যেও মানবতার স্বার্থে গরল পানে 'নীলকণ্ঠ' হওয়ার উদাহরণ অযৌক্তিক হবে না।

টীকা:

[১] আহমদ শরীফের জন্ম ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার, পটিয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। মৃত্যু ১৯৯৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায়। তাঁর পিতা: আব্দুল আজিজ (১৮৮০-১৯৪৬), মাতা: সিরাজ খাতুন (১৮৮৮-১৯৮৩)। তাঁর পিতা ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের কেরানি। আহমদ শরীফ পিতামাতার চতুর্থ সন্তান ও তৃতীয় পুত্র। পুত্রহীন দম্পতি পিতৃব্য আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) ও ফুফু বদিউন্নিসা (১৮৭৩-১৯৫৩)-র পোষ্যপুত্ররূপে অত্যধিক স্নেহে ও আদরে লালিত-পালিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম.এ ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৫০ সাল ঐ বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে চাকুরি শেষে যথারীতি ১৯৮৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

আহমদ শরীফ সম্পাদিত *লাইলী মজনু* (১৯৫৭) বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ এবং তাঁর সম্পাদিত *পুঁথি-পরিচিতি* (১৯৫৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

[২] এ সংখ্যাটি আহমদ শরীফ নিজেই উল্লেখ করেছেন আবুল আহসান চৌধুরীকে দেয়া সাক্ষাৎকারে। দেখুন– আহসান (২০০৭:৩৬)।

[৩] প্রথম প্রবন্ধ বিচিত চিন্তা-য়(১৯৬৮) প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ এর মধ্যে প্রকাশিত।

[৪] 'বাঙালি হিন্দুর সুবিধা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন– 'প্রতীচ্যের বুর্জোয়ার উদার মানবতা ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শন স্বাধীনতাপ্রীতি ও স্বাতন্ত্র্যবোধ, যুক্তিবাদ ও স্বাধিকার-চেতনা শিক্ষিত বাঙালীকে স্বাপ্নিকে ও বাক্‌পটু করে তোলে। কিন্তু পড়ে-পাওয়া সমকালীন য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনার স্বরূপ কিংবা তাৎপর্য ছিল তাদের অনায়ত্ত। তাই ফরাসি বিপ্লবের মর্মকথা তারা মুখে ব্যাখ্যা করত, কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখত না, য়ুরোপের দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তার দৃষ্টান্ত তাদেরকে বিকৃতভাবে স্বধর্মীর জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ তাদের শাস্ত্রে ও আচারে বিজ্ঞান ও যুক্তিসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। ... আবার বলি এটি রেনেসাঁস নয়- য়ুরোপীয় চিন্তার অভিঘাতে নিদ্রাভঙ্গ মাত্র। মধ্যযুগের অবসান ঘোষিত হল মাত্র। অনুকৃত সূর্যের আলোয় কিছুটা দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে ও অস্পষ্টতায় আত্মদর্শনের ও আত্মগড়নের আগ্রহ জাগল মাত্র' (শরীফ, ২০১২:১৫৪)। তবে 'পড়ে-পাওয়া ইয়োরোপীয় আদর্শ'-ধারণাটি আরও অনেক প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

[৫] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০৬:২০)।

[৬] হাবিব রহমান (১৪০৮:১২৬)।

[৭] কাজী আব্দুল ওদুদ ও তাঁর সংগঠন যে রকম মানুষ সমাজে দেখতে চেয়েছিলেন তাকে 'অভিপ্রেত' বলে চিহ্নিত করে আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন। (শরীফ, ২০০৮:৯৬)

[৮] ১৯৮২ সালে সামরিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খান প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি(১৯৮২)তে প্রথম শ্রেণি থেকে আরবি এবং দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে ইংরেজি শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। এর প্রতিবাদে ঐ বৎসর ২৩ শে সেপ্টেম্বরের দৈনিক 'বাংলার বাণী'তে প্রকাশিত হয় আহমদ শরীফের বিবৃতি। এই বিবৃতি সেসময় মজিদ খান শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। দেখুন– ড. ইসরাইল খান (২০০১:২৬৯-৭০)।

[৯] সেলিনা হোসেনের অভিমত উল্লেখ করা যায়– 'এই সমাজব্যবস্থায় নারীমুক্তির জন্য নাস্তিক হওয়া কঠিন কাজ। এটা কারো ভাবনাতেও আনা অসম্ভব। দু'চারজন ভাবতে পারেন। কিন্তু নিরানব্বই ভাগই শাস্ত্রের শিকলে বাঁধা– তা তিনি শিক্ষিত বা নিরক্ষর যাই হোন না কেন। এই শিকল ভাঙতে কতদিন লাগবে কে জানে! এখানেই প্রফেসর শরীফের বিশিষ্টতা, তিনি গভীর মুলে নাড়া দিয়েছেন। বড় শক্ত নাড়া,এটাকে কার্যকর করতে হয়তো হাজার বছর লাগবে, নাকি এ শতাব্দীতেই সম্ভব। তবে নারীমুক্তির প্রশ্নের এই ধারণাটিকে ধীরে কিন্তু অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে নিতে পারলে সমাজের নীচতলা থেকে একটি পরিবর্তনের সূচনা আসবে' (২০০১:২৫৯)।

[১০] দেখুন– আহমদ শরীফ (২০০৮:৪২৪)।

[১১] যথাক্রমে– *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০), *কিছু বিশ্বাসের বাহ্যিক পুনর্বিবেচনা*(২০০০), *কালোচিত কিছু বিবেচ্য বিষয়*(২০০০) ।

[১২] 'বাঙালাদেশের সাম্পতিক চালচিত্র' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের বক্তব্য স্মরণ করা যায়– 'অন্য বুর্জোয়া তথা দক্ষিণপন্থী দলগুলো নির্বাচন মাধ্যমে কিংবা সেনানী নায়কের সহযোগী রূপে রাষ্ট্র-ক্ষমতা আয়ত্তকরণ লক্ষ্যে রাজনীতি করে। ... গুরুদায়িত্ব থাকে কেবল বামপন্থীদের। কেননা তথাকথিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে স্বদেশী স্বজাতি মুৎসুদ্দী সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে হয় জান-মালের, সুখ-স্বস্তির বিনিময়ে' (শরীফ, ২০০৮:২৭৩)।

[১৩] 'সমস্যা সঙ্কটের মূলে' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন, তন্মধ্যে একটি –'দেশজ বাঙালি মুসলমানের সকল সঙ্কটের মুলে আত্মপরিচয় সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি। দেশজ বাঙালি মুসলমানের প্রথম ভুল ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবে 'স্টেটস্' এর 'স' ১৯৪৬ সালের দিল্লী কনভেনশনে বাদ দেয়ার প্রস্তাবে সম্মতি দেয়া এবং সোল্লাসে মেনে নেয়া। নেতা হল উর্দুভাষী রইসেরা, নীতি হল বিবেচনাহীন উচ্চশিক্ষিত বাঙালাভাষীরা' (শরীফ, ২০১২:২৯৭)। এই সঙ্কটকেই 'চেতনা সঙ্কট' নামে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। এই চেতনার ভ্রান্তির বিরুদ্ধে আহমদ শরীফ ছিলেন সর্বদা সরব। মুসলমান মানতে চায় না যে, মুসলমানবাঞ্ছিত ইসলামি

মানবতা ও ভ্রাতৃত্ব অমুসলিমের চোখে নির্বর্ণ সর্বজনীন ও সর্বকালীন নয়। একারণে ইয়োরোপীয়রাও বিগত পাঁচশ বছর ধরে মুসলমানের এই মানসিকতা লালনে উৎসাহ যুগিয়েছে যাতে তার মধ্যে কোন দেশ-কাল-জাতের ও পরিবেষ্টনীজাত স্বাতন্ত্র্যচেতনা মনে উপ্ত না হতে পারে। তার জন্যই সারা বিশ্বের মুসলমানের 'ইসলামী' শব্দের বহুল প্রয়োগে (হোটেল, সেলুন, দোকান,নাচ, গান, শিল্প, ব্যাঙ্ক, পোশাক) উৎসাহ দেয় তারা। দুনিয়ার আর কোন ধর্ম বা জাতির ক্ষেত্রে এসব নামের মধ্যে কোন বিশেষ পরিচিতি থাকে না। (শরীফ, ২০১২:৩০৭)। শাস্ত্রানুগত্যকে জীবনমানোন্নয়নের ভিত্তি মনে করার ঐতিহাসিক ভ্রান্তি বাঙালি মুসলমানের সকল দুর্দশার অন্যতম কারণ। একেই চেতনা সঙ্কট বলেছেন আহমদ শরীফ।

[১৪] 'যাদু, যুক্তি ও আধিমুক্তি' নামক প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন–' চিন্তাচেতনায় যুক্তির, জ্ঞানে বিজ্ঞানের তথ্যের এবং জীবিকায় প্রযুক্তির আনুগত্য অঙ্গীকার না করলে সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে পারেন না' (শরীফ, ২০১২:৪০৮)। উত্তরকালে আহমদ শরীফ নাস্তিক্যের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়লে তাঁর সংস্কৃতিভাবনাতেও তা প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতিবান এবং নাস্তিক সমার্থক হয়ে ওঠে।

[১৫] আরও দেখুন– আহমদ শরীফ (২০১০:১৪৯)।

[১৬] আহমদ শরীফের একই বক্তব্য দেখুন– 'স্বাতন্ত্র্য' (২০১০:১৩৫), 'দেশ জাত ও ধর্ম' (২০১০:১৪৬), 'স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর' (২০১০:১৩৯), 'বিশ্বের নাগরিক' (২০১০:১৬২)।

[১৭] একই মত- দেশ, কাল, ভাষা, ধর্ম, রাষ্ট্র, কোনটাই এককভাবে সংস্কৃতির জনক নয়, পরিচায়ক নয়, নিয়ায়মকও নয়। সবকিছুর দানে, প্রভাবে ও মিশ্রণে সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব। কাজেই সংস্কৃতি কখনো অবিমিশ্র হতে পারে না। সৃজনে-গ্রহণে, বরণে-বর্জনে, সংস্কৃতি চিরকাল ঋদ্ধ ও দেশ-কালের উপযোগী হয়েছে।' (শরীফ, ২০১০:৩৬২)।

[১৮] আরও দেখুন–আহমদ শরীফ (২০১০:১৫৩)।

[১৯] ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মতিউর রহমান পঞ্চম স্মারক বক্তৃতামালা'য় প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতায় আহমদ শরীফ সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর পরিণত চিন্তার সাক্ষর রেখে গেছেন। বক্তৃতাগুলি ঐ বছরই 'সংস্কৃতি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

[২০] আহমদ শরীফের অভিমত– 'বাঙলাদেশের রাজার এবং বাঙালীর ইতিহাস অভিন্ন নয়' (২০১২:১২)।

[২১] দেখুন– 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে বঙ্কিম চন্দ্রের মন্তব্য (১৪১৭:২৯১)।

[২২] দেখুন– 'দেশকাল' আহমদ শরীফ (১৯৭৮:১)।

[২৩] দেখুন– 'বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে', আহমদ শরীফ (১৯৭৮:১২৪)।

[২৪] বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধান যে কারণে প্রয়োজন, তা যেন আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানের মতোই আহমদ শরীফ তালিকাবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে আত্মপরিচয় সন্ধানী বাঙালিকে বুঝতে হবে যে–

ক. আর্য-গর্ব ও অনার্য-লজ্জা অহেতুক এবং স্বাধীন বিকাশের পরিপন্থী।
খ. আভিজাত্যবোধ কিংবা হীনমন্যতা মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ-বিকাশের প্রতিকূল।
গ. জন্মসূত্রে নয়,-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-কর্ম ও আচরণ সূত্রেই মানুষ ছোট বা বড় হয়।
ঘ. গোত্র, শাস্ত্র বা স্থানভিত্তিক মানুষের সংকীর্ণ গোষ্ঠীচেতনা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এবং দুর্বলের উপর পীড়নের ও অপ্রেমের কারণ।
ঙ. সর্বপ্রকার জুলুম মুক্তিতেই দেশ-দুনিয়ার ব্যক্তির ও সমষ্টির নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিহিত। মানুষের জ্ঞানের, প্রজ্ঞার, মানবিক গুণের ও শ্রেয়োবুদ্ধির বিকাশ সাধন হবে ভবিষ্যৎকালে, অতীত তাকে আর কিছুই দেবে না, তার কল্যাণ সামনে, পেছনে নয়।
চ. সবার উপরে মানুষ ও মনুষ্যত্বই মানুষের অভয় শরণ, নির্বিশেষ মানব-চেতনাতেই মানবিক সমস্যার সমাধান নিহিত, এবং মানুষের দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-লাভ-লোভের ইতিকথা এ শিক্ষাই দেয়- তা জানাবার বুঝবার জন্যেই এই আলোচনা আবশ্যিক। (শরীফ, ২০১২:৩১)

[২৫] দেখুন– 'বাঙালির ইতিহাস সন্ধানে' (শরীফ, ১৯৭৮:১২৪), 'দু'হাজার বছর আগের গ্রামীণ সমাজ' (শরীফ, ২০১২:৯)।

[২৬] ইতিহাসে স্বাধীন বাঙালি রাজা বা অধিপতির অস্তিত্ব কতিপয় সন্দেহসাপেক্ষে মাত্র কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ–রাজা অশোক, রাজা গোপাল, কৈবর্ত নেতা দীব্যক এবং রাজা প্রতাপাদিত্য। এমনকি পাল বা সেনদের কেউ বাঙালি ছিলেন বলে প্রমাণিত নয়।

[২৭] আড়াই হাজার বছর আগেই বৌদ্ধযুগে রাঢ় অঞ্চলে দুটো ক্ষুদ্র সামন্ত বা স্বাধীন রাজ্য ছিল। একটি শিবিরাজ্য-টলেমি বর্ণিত সিব্রিয়াম, অপরটি চেতরাজ্য। শিবিরাজ্য ছিল এখনকার বর্ধমান জেলার অনেকখানি জুড়ে, আর এর রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগর (মঙ্গলকোটের নিকটে শিবপুরী)। এর দক্ষিণে ছিল চেতরাজ্য, এর রাজধানী চেতপুরীই সম্ভবত বর্তমান ঘাটাল মহকুমার 'চেতুয়া' এলাকা। দুটি রাজ্যই ছিল কলিঙ্গরাজ্যের সীমান্তে। দেখুন– আহমদ শরীফ (১৯৭৮:১৮-২৩, ২০১২:২৩)

[২৮] 'ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালী' প্রবন্ধের আহমদ শরীফের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য– 'কোনো কোনো অনার্য গোত্র বিশেষত দ্রাবিড়েরা আর্যদের চেয়েও সভ্য ও উন্নত ছিল। তার প্রমাণ-কেবল মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও কোটাদিজির আবিষ্ক্রিয়ায় নয়- আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পাচ্ছি। ঋগ্বেদের আলোকে উত্তরকালের আর্য শাস্ত্র গ্রন্থ গুলো যাচাই করলে আমরা দেখতে পাব, সেখানে শুধু যে অনার্য দেবদেবীরাই ভিড় জমিয়েছে তা নয়-জ্ঞান ও ভক্তিবাদ, যোগ আর সাংখ্যদর্শনও গড়ে উঠেছে, যা একান্তভাবে অনার্য-প্রভাব প্রসূত। (শরীফ, ২০১২:১১৮)

[২৯] এই বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন- 'নর্ডিক আর্যরক্তের মানুষ বাঙলায় বিরল- নেই বললেই চলে। নর্ডিক আর্য-রক্ত বাঙলায় বিরল বটে, বৈদিক আর্যরা সুরের এবং তাদের নিকট জ্ঞাতি ইরানি আর্যরা অসুরের পূজারী। পূজ্যদেবতা নিয়েই হয়তো এক এক সময়ে তাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, যখন তারা মধ্য-এশিয়ার আমু ও শিরদরিয়ার উপত্যকতায় বাস করত। তারও আগে একসময়ে উভয় দলের পূজ্যদেবতা ছিল অসুর (অহোর)। পরে ইরানিরা অসুর (অহোরামজাদা) এবং ভারতীয় বৈদিক আর্যরা 'দেইবো' দেইব' বা 'দেব' পূজারী হয়। ফলে ইরানির কাছে দেব (দেও) হলেন অরি ও অপদেবতা এবং তেমনি অসুর হলেন ভারতীয়দের অরি ও অপদেবতা। তা ছাড়া জেন্দাবেস্তার এবং ঋগ্বেদের ভাষায় মিলও তাদের অভিন্নত্বের প্রমাণ। কোনো বিদ্বানের মতে অসুরপন্থীরা ছিল কৃষিজীবী ও উন্নতরুচিসম্পন্ন এবং স্থাপত্য ভাস্কর্যে নিপুণ, আর সুরপন্থীরা ছিল যাযাবর, দুর্ধর্ষ ও অপরিশীলিত রুচির। অসুরপন্থীদের অন্য প্রধান দেবতা বরুণ আর সুরপন্থীদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। অহিপ্রতীক বৃত্র (বেতরো) উভয় পক্ষেরই শত্রু' (শরীফ, ২০১২:২৬)।

[৩০] আহমদ শরীফের মন্তব্য– 'চিন্তাজগতে বাঙালী চিরবিদ্রোহী।' (শরীফ, ২০১২:৩৫)। অন্যত্র–

'বাঙলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি– 'বাঙালী গণমানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে–বারবার বিদ্রোহ করেছে-স্মরণাতীত কাল থেকে করেছে। পূর্ব বাঙলার বাঙালীরা করেছে পশ্চিম বাঙলার বাঙালীরা করেছে–অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু এই বাঙালীর বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে যারা বিজাতি, বিভাষী, বিদেশীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তারাই বাঙালীর সর্বনাশ করেছে। বিদ্রোহী বাঙালী পরাজয় মেনে নেয়নি। সাধারণ বাঙালী শাসিত হতে পারে, কিন্তু দাসত্ব মানেনি– তার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকিয়ে দেয়নি। এই যে বিদ্রোহী বাঙালী, তার জয়ের সম্ভাবনা অফুরন্ত।' (শরীফ, ২০১১:৫০)

[৩১] বেদ ও ব্রাক্ষণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রচার, তাদের দেবদ্বিজবেদ-বিদ্বেষ এই ধর্মের দ্রুত প্রসার থেকে অনুমান করা চলে যে, এই ধর্মান্দোলন ব্রাক্ষণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামাজিক অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল। তাই আহমদ শরীফ একে অনার্য অভ্যুত্থান বলেছেন। তবে– 'চৈতন্যমতবাদ ও ইসলাম' প্রবন্ধে ব্রাক্ষণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে উত্তরভারতের কবীর, দাদু, রবিদাস, ধর্মদাসের বিদ্রোহকে বিশ্বের প্রথম 'শ্রেণিসংগ্রাম' আখ্যা দেয়া সঙ্গত মনে করেছেন। (শরীফ, ২০১০ক:৩৩২)

[৩২] বাঙালির নিন্দার্থে একই উপমায় আহমদ শরীফের আরও মন্তব্য দেখুন– (২০০১:৮১,১৩১)।

[৩৩] একই অভিমতের জন্য আরও দেখুন– 'সংস্কৃতির মুকুরে আমরা' (২০১০:৩৬১), 'বাঙলা ও বাঙালি' (২০১০:৩৭০), 'ইতিহাসের ধারায় বাঙালি' (২০১০:৩৭৫)।

[৩৪] দেখুন– ১৯৯৬ সালে কেশব মুখোপাধ্যায়কে দেয়া সাক্ষাৎকার (শরীফ, ২০১২:৩৮৪)।

[৩৫] 'বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন– 'দেশজ লৌকিক ধর্মই কালে কালে বাঙালীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাঙালীর স্বাধীনতাপ্রীতি, স্ব-জাত্যবোধ ও সঙ্ঘশক্তির সাক্ষ্য নগন্য বটে, কিন্তু তার মাটি ও মর্তাপ্রীতি সর্বত্র সুপ্রকট। আদিতে তারও ছিল কৌম জীবন। বাহ্যত কর্মবিভাগ সে স্বীকার করেছে, সমাজে কর্মগত সহযোগিতা ও সংহতির গুরুত্বও কখনো অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রবণতা ও আত্মরতি ছাপিয়ে উঠেছিল তার সহমর্মিতা ও সহধর্মিতার বন্ধনকে' (শরীফ, ২০১২:১৮)।

[৩৬] 'বাঙালির সংস্কৃতি' প্রবন্ধেও একই বোধ ও বিশ্লেষণ পাই (শরীফ, ২০১০:৩৬৬-৬৭)।

[৩৭] একই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে 'স্বদেশ, স্বভাষা, স্বাজাত্য' (শরীফ, ২০১০:১২৬)।

[৩৮] 'বাঙলা ভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন- 'মধ্যযুগে হিন্দুয়ানী ভাষার প্রতি মুসলমানদের বিরূপতা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস প্রসূত। কিন্তু উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে সে বিরূপতাও রাজনৈতিক যুক্তিভিত্তিক হয়ে আরো প্রবল হবার প্রবণতা দেখায়। (শরীফ, ২০১০:৩১২)

[৩৯] বাঙলা ভাষার প্রতি সেকেলে লোকের মনোভাব প্রবন্ধে – 'মধ্যযুগে নিরঞ্জনের রুষ্মাতেই প্রথম বৌদ্ধ-হিন্দুর বিদ্বিষ্ট সম্পর্কের সংবাদ পাই। বিজয়গুপ্ত প্রভৃতির মনসামঙ্গলে, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, লোচনদাস প্রভৃতির চৈতন্যচরিত গ্রন্থে, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, কৃষ্ণরামের অন্নদামঙ্গলে, সহদেব চক্রবর্তীর অনিল পুরাণ প্রভৃতিতে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ, বিদ্রুপ বা অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। আবার জায়নুদ্দীনের রসুলবিজয়ে, শাবারিদ খানের রসুলবিজয়ে ও হানিফার দিগ্বিজয়ে, সৈয়দ সুলতানের 'জয়কুম রাজার লড়াই'-এ, গরীবুল্লাহ্‌র সোনাভানে, সৈয়দ হামজার জৈগুনের কিস্‌সাতে এবং কোনো কোনো পীরপাঁচালীতে হিন্দু ও হিন্দুয়ানীর, কাফের ও পৌত্তলিকতার প্রতি অবজ্ঞা-অসৌজন্য সুপ্রকট' (শরীফ, ২০১০:২৮০)।

[৪০] *কালের দর্পণে স্বদেশ* গ্রন্থের 'জাতি দ্বেষণা ও সহাবস্থান' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ সাম্প্রদায়িকতাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁর মতে,সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল কারণ আর্থিক-বৈষয়িক। কারণ অর্থে-বিত্তে ও সংখ্যায় নগণ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিযোগী কোন সম্প্রদায়ের বা শ্রেণির বিরুদ্ধে দাঙ্গার নজির নেই। এজন্য প্রবল সম্প্রদায়ের আর্থনীতিক উচ্চাভিলাষও দায়ি। উদাহরণ– উত্তর ভারতে সংখ্যাল্প অথচ বিত্তবান মুসলমান ও সংখ্যাগুরু অথচ স্বল্পবিত্ত হিন্দুর দাঙ্গা প্রায় নিয়মিত ঘটনা। এক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব অর্থ ও পেশার। আসামে জমির লোভে মুসলমান-বিতাড়ন বা দাঙ্গা ঘটে। বাংলাদেশের সামর্থবান বিত্তশালী হিন্দুরা ভারত চলে যাওয়ায় মুসলমান অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়লো– দাঙ্গাও হল বিরল ঘটনা।

আহমদ শরীফ এর সমাধান চিন্তাও করেছেন মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে– অধিকাংশ মানুষ নাস্তিক হলে আর সমাজবাদী বা সমাজতন্ত্রী হলে দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা অবসান ঘটবে।

[৪১] ওয়াহাবী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকে বাঙালি মুসলমানের জন্য 'আঁধারযুগ' আখ্যা দিয়েছেন আহমদ শরীফ। সময়কাল মোটামুটি ১৮৭০ থেকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ। এরপর থেকে 'মুসলিম স্বার্থ ও মুসলমানী স্বাতন্ত্র্য' সংরক্ষণচেতনা জাগ্রত হতে থাকে। (শরীফ, ২০১০:১৭৪, ১৭৫)।

[৪২] *সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা* গ্রন্থের 'তমদ্দুন-সংস্কৃতি-কালচার' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ (২০১৪:৪৫৪) এবং রমিলা-হরবংশ-বিপন (১৯৭৬:১৪)।

[৪৩] *দিলরুবা* পত্রিকায় আগস্ট ১৯৫৫-তে প্রকাশিত, পরে *বিচিত চিন্তা (১৯৬৮)*-য় সংকলিত।

[৪৪] সংস্কৃতভাষার সাহিত্য 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'-এ উল্লেখিত।

[৪৫] প্রয়োজন মূলত ধর্মপ্রচার, এবং ইংরেজদের শাসন কার্যে সহায়তা করার জন্য সীমিত বাংলা-ইংরেজি চর্চা।

[৪৬] উদ্ধৃত– আহমদ শরীফ (২০১০:৬৫)।

[৪৭] দেখুন– আহমদ শরীফের প্রবন্ধ 'ভাষার কথা' 'স্বদেশ স্বভাষা ও স্বাজাত্য' ইত্যাদি।

[৪৮] বাংলা একাডেমির আয়োজনে ১৯৬৯ সালের সাহিত্য সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে ভাষাদ্বন্দ্ব বিষয়ে মতামতে এই দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। দেখুন– সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৬৯:৯৬-৯৯) ।

[৪৯] নওয়াব আব্দুল লতিফ বলেছিলেন– 'বাঙলার মুসলিম ছোটলোকদের ভাষা বাঙলা'। উদ্ধৃত– আহমদ শরীফ (২০১০:৩১৩)।

[৫০] আহমদ শরীফের এ বক্তব্যের সমর্থন পাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যেও–

> বাঙলা ভাষার উৎপত্তির আগে বাঙলা দেশে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন মানব বংশের বা মূল জাতির লোক এসে বাস আরম্ভ ক'রে দেয়। তাঁদের বংশগত উৎপত্তি ছিল আলাদা, মূল ভাষা ছিল আলাদা, ধর্ম সভ্যতা সংস্কৃতি রীতিনীতি রহন-সহন চাল-চলন সব আলাদা আলাদা ছিল। খ্রীষ্টজন্মের কাছাকাছি সময়ে এদের নিজ নিজ পৃথক অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের পরে, প্রায় হাজার বছরের মধ্যে সব উলট-পালট হয়ে গেল। আর্য-ভাষা মাগধী প্রাকৃত আর মাগধী অপভ্রংশ, পশ্চিমের বিহার অঞ্চল থেকে বাঙলা দেশে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে – খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেকার কয়েকশত বৎসর করে এই আর্য্য-ভাষার প্রসার বাঙলা দেশে হ'তে থাকে। পরে এই মাগধী প্রাকৃত আর তার পরেকার রূপ মাগধী অপভ্রংশ, বাঙলা দেশে বাঙলা রূপ নেয় খ্রীষ্টজন্মের পরে ৮০০-১০০০ বৎসরের মধ্যে। দেশের প্রায় তাবৎ বিভিন্ন জাতির আর ভাষার লোকেরা এই নবজাত বাঙলা ভাষাই গ্রহণ করে, ভাষায় ভাবে এক ধরনের হয়ে যেতে থাকে; পরে তারা সকলে বঙ্গভাষী 'গৌড় জন' বাঙালী জাতিতে পরিণত হয়। বর্ণভেদ, বৃত্তিভেদ, উচ্চ-নীচ স্তর-ভেদের জন্য বঙ্গভাষী জনগণের বিভিন্ন স্তরের বা দলের মধ্যে সবক্ষেত্রে বৈবাহিক আদান-প্রদান চলত না, কিন্তু তাতে এক-জাতীয়তার –এক-জনতার–অভাব হয় নি। ভাষা-ই হ'ল এক্ষেত্রে প্রধান বাঁধন।' (সুনীতিকুমার, ২০০৫:২৭)

[৫১] বিস্তারিত– হুমায়ুন আজাদ (২০০০:১-১৩)।

[৫২] আহমদ শরীফ (২০১০ক: ৪০৬)। উদ্ধৃত– আহমদ কবির 'পরিশিষ্ট' (২০১০ক:৪০৬)।

[৫৩] নমুনা : 'গোজাশ্‌তা এশায়াতে আমরা অতীতে বাংলা ভাষার নানা মোড়পরিবর্তনের কথা মোখ্‌তাসারভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল সকলকে স্বীকার করতেই হবে, যে শৈশবে বাংলা ভাষা মুসলমান বাদশাহ্‌ এবং আমীর ওমরাহদের নেকনজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারে শান-শওকত হাসিল করেছিল।' এমন আরও নমুনা দেখুন– আহমদ শরীফ (২০১০ক:৪২) ।

[৫৪] বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নিয়ে একই মন্তব্য বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও শব্দসম্ভারে আহমদ শরীফ ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি– ' আজো তারা কি মুসলিম বাঙালী, বাঙালী-মুসলিম, বাঙলাদেশী মুসলিম, মুসলিম বাঙলাদেশী কিংবা দেশ-কালহীন কেবলই 'মুসলিম' তার মীমাংসা করতে পারেনি। কারণ ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের প্রভাবে মুসলিমেরা দেশকালহীন এক মানসজগতে কেবল স্বধর্মীর বৈশ্বিক সমাজে বাস করে। ফলে তারা থাকে স্বদেশেও প্রবাসী– যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে তা তার সারা জীবন নিয়ন্ত্রণ করলেও তাকে সে মনের

মধ্যে আপন বলে গ্রহণ করে না।তাই বাস্তব-অবাস্তবের দ্বৈত বা দ্বৈধ সত্তায় (split personality) বা দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিত্বে ভোগে' (শরীফ, ২০১০ক:৭)।

[৫৫] আহমদ শরীফের মতে, দেশজ মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলেই ধর্মভিত্তিক জাতপরিচয় শুরু হয় এবং তা মুঘল আমলেই প্রচলিত হয়। ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের শুরু তখন থেকেই। (শরীফ, ২০১০:৩৯১)

[৫৬] 'ইতিহাসের আলোকে আত্ম-দর্শন' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন–'দেশী মুসলমান যে বাদশাহর জাত ছিল না এবং মুঘল-শাসনের অবসানে তারা যে রাজ্যহারাও হয়নি, এ সত্য যতদিন উপলব্ধি না করবে, ততদিন তারা আত্মস্থ হবে না এবং আত্মত্রাণ, আত্ম-নির্মাণ ও আত্মোন্নয়নের সত্য ও সুষ্ঠু পথও তারা খুঁজে পাবে না' (শরীফ, ২০১০:৩৯২) ।

[৫৭] ইতিহাসের আলোকে আত্মদর্শন প্রবন্ধে আহমদ শরীফের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি–'তুর্কী-মুঘল ও আরব-ইরানীয় জাতিত্ববোধ মধ্যবিত্ত দেশী মুসলমানের সমূহ ক্ষতি করেছে। তারা নিজেদের চিরকাল স্বদেশ প্রবাসী ভেবেছে তারা অনুকরণ করেছে বলখী-বোখারীর, স্বপ্ন দেখেছে আরব-ইরানের, অনুসরণ করেছে দেশ-কাল-প্রতিবেশহীন জীবন-পদ্ধতি। ...এই পদ্মা-কোকিলের দেশের মানুষ চোখ-কান বন্ধ করে রূপ দেখে বসোরাই গোলাপের, গান শোনে নাইসাপুরীর বুলবুলের। বিন্ধ্য-হিমালয়ে তাদের মন ভরে না, হেরা-সিনাই-তুরে তাদের আকর্ষণ, আম-কলা-কাঁঠালে তাদের রুচি নেই, আরবি খেজুরে তাদের লোভ, দেশের শ্যাম-নীলিমায় তারা ক্লান্ত, সাহারা তাদের মন ভোলায়। অমুসলিম হাতেম-নওশেরোয়াঁ-রুস্তম তাদের আত্মীয়, পর হল কর্ণার্জুন-যুধিষ্ঠির।' (শরীফ, ২০১০: ৩৯১)

[৫৮] এ নামে যে প্রবন্ধটি *যুগ-যন্ত্রণা* (প্রথম প্রকাশ:২০০৬) গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত তার বিষয়ও বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় ও জাতীয়তার সংকট এবং মুক্তির পথ। দেখুন– আহমদ শরীফ (২০০৮:২৬-৩৪)

[৫৯] আহমদ শরীফ ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জাতীয়তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে 'বাঙালি হিন্দুর সুবিধা ও সমস্যা' প্রবন্ধে লিখেছেন– 'ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুরাও কিন্তু য়ুরোপের গোত্রীয় কিংবা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাকে স্বধর্মীর সংহতি-চেতনার নামান্তর বলেই গ্রহণ করল। ফলে রামমোহন থেকে যে হিন্দু চেতনার শুরু, তা-ই কালে পূর্ণতা পেল। কংগ্রেসের সভায় ধর্মীয় জাতীয়তা অস্বীকারের চেষ্টা থাকলেও ভারতের হিন্দু-মুসলমান কারো মনে-মননে কখনো দৈশিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ ঠাঁই পায়নি। অথচ আমেরিকা মহাদেশের সর্বত্র তাঁদের সমকালে দৈশিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল ও দৃঢ়মূল হয়েছিল' (শরীফ, ২০১০: ১৫৭)।

[৬০] ওহাবী ও ফরায়েজি আন্দোলনের কেন্দ্র উত্তর ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করেনি মুসলমান এই উদাহরণ দিয়ে আহমদ শরীফ 'ইংরেজ আমলে মুসলিম-মানসের পরিচয়-সূত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন–'ওহাবী ও ফরায়জী আন্দোলন প্রবল হলেও সর্বশ্রেণির লোকের এতে সমর্থন ছিল না, বিশেষত উচ্চবিত্তের অভিজাত মুসলমানদের ভূমিকা ছিল দুর্লক্ষ্য। ফলে ধর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের দারিদ্র্য-মুক্তি ও আযাদী স্বপ্ন সফল হয়নি। বরং ইংরেজবিদ্বেষ মুসলিম মধবিত্তের ঘরে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের অন্তরায় হয়েছিল। তাছাড়া তাদের মধ্যে আরবি বা ফারসি শিক্ষারও কোন ঐতিহ্য ছিল না। উত্তরভারত ও বিহার ওহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র হলেও সেখানে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল। বাংলার উচ্চবিত্তের অভিজাত মুসলমানরা ও রাজসরকারের পদস্থ কর্মচারীরা ছিল অবাঙালি যাদের অধিকাংশই সিরাজউদ্দৌলা-মীরকাশেমের পতনের পর উত্তর ভারত ও বিহারে চলে যায়। যারা নানা কারণে রয়ে গেল তারা গোড়া থেকেই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে দেশীয় মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তবে চট্টগ্রাম বিভাগে মৌলানা কেরামত আলী, ইমামুদ্দিন প্রমুখের কারণে আররি শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। ' (শরীফ, ২০১০:২৭১)

[৬১] একই মন্তব্য – 'ইংরেজ আমলে মুসলিম-মানসের পরিচয়-সূত্র' (শরীফ, ২০১০:২৭১)।

[৬২] দেখুন– সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী(১৯৬৯:৯৬-৯৭)।

[৬৩] *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮) গ্রন্থের 'স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর' আহমদ শরীফ ২০১০:১৩৯।

[৬৪] যেমন *বিচিত চিন্তা (১৯৬৮)*-র 'ঐতিহ্যবোধ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' প্রবন্ধে –'নানা ধর্ম ও জাতি অধ্যুষিত এবং মতবাদ আকীর্ণ আজকের রাষ্ট্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর গুরুতর অপরাধ (শরীফ, ২০১০:১৪২) ,'স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর' প্রবন্ধে– 'আজকের জাতীয়তা রাষ্ট্রভিত্তিক হতেই হবে। নইলে কল্যাণ নেই। নিজেদের এ বোধের অভাবেই জার্মানিতে ইহুদীরা নির্যাতিত হয়েছিল ' (শরীফ, ২০১০:১৩৯)।

[৬৫] আরও দেখুন– আলাপচারী আহমদ শরীফ (আহসান, ২০০৭:৯৫-৯৬), 'জরুরী ভাবনার কথা : জাতীয়তা' (শরীফ, ২০১৪:৫৭১)।

[৬৬] দেখুন–'জরুরী ভাবনার কথা : জাতীয়তা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের মন্তব্য (২০১৪:৫৭৩)।

[৬৭] আহমদ শরীফ (২০১২:১৭০)।

[৬৮] আহমদ শরীফ (২০১৬:৫০৬-১৪,৫২১-২২) ও (২০১৪:৯১-৯৫)।

[৬৯] *প্রগতির বাধা ও পন্থা* গ্রন্থে এমন দলের রূপরেখা তিনি উপস্থাপন করেছেন।

[৭০] দেখুন– আহমদ শরীফের প্রবন্ধ 'বিকাশের পথে মানবতা' (২০১০:১৩০) ও 'স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর' (২০১০:১৩৯;)।

[৭১] আহমদ শরীফ (২০১০:১৩৯)।

[৭২] *বিশ্বাসবাদ-বিজ্ঞানবাদ-যুক্তিবাদ-মৌলবাদ* (২০০০) গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত 'ধর্ম-জাতীয়তা-গণতন্ত্রের সহাবস্থান সম্ভব' (২০১৬:৩৯৩) প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত ।

[৭৩] আহমদ শরীফের প্রথম রচনা 'ভাষা বিভ্রাট' (১৯৪০-৪১ সালে চট্টগ্রাম কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত) একটি প্রবন্ধ হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় গল্প লেখায় উৎসাহী হন তিনি। প্রথম গল্প 'কয়েদীর গল্প', প্রকাশিত হয় *মাসিক মোহাম্মদী*-তে ১৯৪৬ সালে। এরপর আরও কিছু কবিতা, গল্প, কথিকা, নকশা, রম্যরচনা, অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যের পাতায় ও সাহিত্য সাময়িকপত্রে । কিন্তু উত্তরকালে তাঁর বিপুল গবেষণা, প্রবন্ধের সম্ভার ও পত্রিকার কলাম-নিবন্ধের ভারে চাপা পড়ে যায় সৃষ্টিশীল মৌলিক সাহিত্য রচনার প্রেরণা। বিস্তারিত– (কবির, ২০১৩:২৮-২৯)।

[৭৪] ১৯৬০ সালে ঢাকা হল ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে *বিচিত-চিন্তা*(১৯৬৮) গ্রন্থভুক্ত।

[৭৫] দেখুন– *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* গ্রন্থে আহমদ শরীফের ভূমিকা।

[৭৬] দেখুন–আবুল আহসান চৌধুরীকে দেয়া সাক্ষাৎকার। (শরীফ, ২০০৭:৯৭)

[৭৭] 'বাঙলার রাজনীতিক ইতিকথা' প্রবন্ধ থেকে চর্যাগীতির কালে বাংলায় বৌদ্ধ বিলুপ্তি ও বিবর্তিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্পর্কে আহমদ শরীফের মন্তব্য– 'সাত শতকের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ পীড়ন প্রসঙ্গে য়ুয়ান চোয়ঙ বৌদ্ধ বিলুপ্তির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তেমনি বৌদ্ধ পাল আমলে বৌদ্ধরা স্বধর্মীর শাসনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে তারা তখন আত্ম-প্রত্যয়হারা এবং শঙ্করাচার্যের নব জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদ নির্জিত বৌদ্ধমতের পক্ষে মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়ায়– যার ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্তি প্রায় সম্পন্ন হয়ে এল। এই সময়েই নিম্নবিত্ত ও সমাজবহির্ভূত বৌদ্ধরা পীড়ন ভয়ে হিন্দু সমাজে আত্মগোপন করে প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্ম রক্ষা করে। নাথযোগী, ধর্মঠাকুরের পূজারী, সহজিয়া বৈষ্ণব-বাউল ও শৈব নাথপন্থীরা– সবাই ব্রাহ্মণ্যসমাজভুক্ত ঐ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' (শরীফ, ২০১২:৮৫-৮৬)।

[৭৮] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যের ইতিহাস না লিখলেও 'বাঙালির উৎপত্তি' প্রবন্ধে তিনি বাঙালির উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্ব মীমাংসার জন্য ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং এটাই পরবর্তীকালে সবচেয়ে বেশি অনুসৃত হয়েছে। এর পর রমেশচন্দ্র, যদুনাথ সরকার বাংলার ইতিহাস রচনা করেছেন যা মূলত রাজনৈতিক ইতিহাস। নীহার রঞ্জন রায়ের বিখ্যাত *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব* (১৯৪৯)- গ্রন্থেই প্রথম ভাষা-সাহিত্য-শিল্পকলা-স্থাপত্য-নৃতত্ত্ব ইত্যাদি আন্তঃবৈষয়িক রূপ পাওয়া গেল। পরবতীতে দীনেশ চন্দ্র সেন (হিন্দুবৌদ্ধযুগ-গৌড়ীয় যুগ-চৈতন্যযুগ-সংস্কারযুগ ইত্যাদি), ড. এনামুল হক (প্রাকতুর্কি যুগ-তুর্কি আমল-স্বাধীন মুসলিম বাঙলা ইত্যাদি), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. সুনীতিকুমার সেন (ভাষার বিবর্তনভিত্তিক), ড. সুকুমার সেন (শতকের কাঠামোভিত্তিক), ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথমপর্ব:আদিযুগ-দ্বিতীয়পর্ব:প্রাকচৈতন্যযুগ-চৈতন্যপর্ব ইত্যাদি) ইতিহাস রচনায় নিজস্ব বিবেচনায় যুগবিভাগ দেখিয়েছেন। বিস্তারিত – আহমদ কবির (২০১৩:৭১-৭৫)।

[৭৯] তুর্কি শাসনামলে হিন্দু প্রজা-পীড়নের ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বলেই মনে করেন আহমদ শরীফ । এসময়কে 'রক্তঝরানো' উল্লেখ করা এবং একারণে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি না হওয়ার যে-কথা বলা হয় আহমদ শরীফের মতে তা ভিত্তিহীন, কারণ– 'রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দুকে শত্রু করে রেখে, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সৈন্যও নিয়ে (যেমন তুঘান খান ১২৭২-৮১) যুদ্ধাভিযান সম্ভব নয়' আবার 'রাজ্যের স্থায়িত্বের গরজেই হিন্দু নির্যাতন সম্ভব ছিল না' তাছাড়া 'প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন মুসলমান, তখন এরূপ ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুর উপরই পীড়ন হওয়ার কোন কারণ নেই' (শরীফ, ১৯৭৮:৪৮)।

[৮০] চর্যাগীতিগুলো রচিত হয়েছিল সুনীতিকুমারের মতে দশ থেকে বারো শতকের মধ্যে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, এই সময় সাত থেকে এগারো শতক।

[৮১] *চর্যাপদ* নেপাল রাজদরবার থেকে উদ্ধার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী, ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'হাজার বছরের পুরোনো বাঙালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে । এর মূল গন্থের টীকাকার মুনিদত্ত প্রদত্ত নাম *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়*। সংকলনকালে এতে পদ ছিল ৫১টি। মুনিদত্ত একটি বাদ দিয়ে ৫০টি সংকলিত করেছিলেন। তবে প্রাপ্ত পুথিতে তিনটি পদ পাওয়া যায়নি এবং একটি পদ ছিল খণ্ডিত। ফলে উদ্ধারকৃত পদসংখ্যা ধরা হয় সাড়ে ছেচল্লিশটি যার রচয়িতা ২৩ জন পদকার।

[৮২] *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য* গ্রন্থের ভূমিকায় আহমদ শরীফের নিবেদন স্মরণীয়– 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্যের পরিচিতিমূলক একখানা ইতিহাস রচনার প্রবল আগ্রহ জেগেছিল জীবনের অন্তিমলগ্নে পিতৃব্য আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের। ভূমিকা স্বরূপ 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিক্রমা ' নামের একটি প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন তিনি। বিরাশি বছরের জীবন-পরিসরে ষাট বছরের লেখক জীবনে বিভিন্ন কবি ও কাব্যের পরিচিতমূলক পাঁচশতাধিক প্রবন্ধও ছিল তাঁর আয়ত্তে। কাজেই দেহ বার্ধক্যজীর্ণ না-হলে এবং প্রকাশকের সন্ধান পেলে হয়তো কাজ শুরু করে দিতেন,; কিন্তু বহু চেষ্টায়ও সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'র প্রকাশক না-পেয়ে তিনি এ বাসনা ত্যাগ করেন। ১৯৫৩ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর অপূর্ণ অন্তিম বাসনা আমাকে অনুপ্রাণিত করে এবং অক্টোবরের মাসেই তাঁর আবিষ্কৃত কবি ও কাব্যের পরিচিতমূলক ইতিহাস রচনা আরম্ভ করি।' (শরীফ, ১৯৭৮:নিবেদন)

[৮৩] দেশজ বাঙালি মুসলমানের পরিচয় দিতে গিয়ে আহমদ শরীফ এ দেশে যারা ইসলাম বরণ করেছিল তাদেরকে দুই দলে ভাগ করেছেন – এক. যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পিতৃপুরুষের ধর্মে অশ্রদ্ধাবশত ও নতুন ধর্ম গ্রহণ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভের জন্য ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল, দুই. যারা শাস্ত্রবিশ্বাসে শিথিল, অজ্ঞ, অক্ষম, নিঃস্ব-নিরন্ন এবং পীর-দরবেশদের কৃপা-করুণা লাভের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে দ্বিতীয় দলের দীন দুর্বল মুসলিমরা অজ্ঞতাবশেই দেশের মাটির ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল চিরকাল, এরাই লোকজ বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণ নির্ভর তথাকথিত আজলাফ বা অনভিজাত আতরাফ। এরাই স্থানিক লোক-ঐতিহ্যের, লোক-সংস্কার-সংস্কৃতির ধারক, বাহক, প্রচারক ও স্রষ্টা।.... এরা মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে, প্রাণের তৃষ্ণাকে, জীবনের চাহিদাকে শাস্ত্রের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। (শরীফ, ২০১০ক:২৫৩)

[৮৪] ধারণাটি ব্যবহার করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (পার্থ, ১৯৯৮:১৫)। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের বর্ণনার বিপরীতে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের ধারা অনুসরণ করে ইতিহাস রচনার প্রয়াস ইয়োরোপে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তীকালের 'সাব অল্টার্ন স্টাডিজ'র সাথে এই ধারার মিলও রয়েছে বেশ। এই ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে আহমদ শরীফের ইতিহাস চিন্তায়। বিস্তারিত দেখুন– (পার্থ, ১৯৯৮:১৫)

[৮৫] একই বিষয়ে আলোচনা *বাঙালী ও বাঙলা সহিত্য* (শরীফ, ১৯৭৮:১৪৭)।

[৮৬] পুথি সাহিত্যের ইতিকথা প্রবন্ধে আহমদ শরীফ 'দোভাষী পুথি' থেকে 'পুথিসাহিত্য' নামকরণের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে লিখেছেন– 'বাঙলা ভাষা সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য-সূত্র আবিষ্কারের প্রেরণাবশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজে এবং 'আজাদ' পত্রিকা-অফিসে গড়ে ওঠে 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। এখানেই শুরু হয় পুথির চর্চা। তাঁরাই মুসলিম রচিত আধুনিক সাহিত্য থেকে দোভাষী পুথির পার্থক্যজ্ঞাপক 'পুথি-সাহিত্য' নামটি চালু করেন। এর প্রয়োজন ছিল। কেননা এ ভাষাকেই বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা তথা ঘরোয়া আটপৌরে ভাষা বলে প্রচার করলেন তাঁরা! কাজেই 'দোভাষী পুথি' বলার আর উপায় ছিল না, সেক্ষেত্রে তাঁদের আন্দোলন ও উদ্দেশ্য দু-ই হত ব্যর্থ!' (২০১০:৬৫)

[৮৭] দেখুন– হুমায়ুন আজাদ (২০০১:৪-৫)।

[৮৮] 'পুথি সাহিত্যের ইতিকথা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন–'রেজাউল্লাহ (১৮৬১), মালে মুহম্মদ, বেলায়েত ও দানিশ ভাই দোভাষী রীতিকে বলেছেন 'এছলামি বাঙলা', কেউ অভিহিত করেছেন 'চলিত বাঙলা' বলে, আর এর বিকাশ ও বিস্তারকাল হল ইংরেজ আমল। যা উচ্চবর্গের অভিজাতের পরিচর্যার অপেক্ষা রাখত, তা-ই নিম্নবিত্তের স্বল্পশিক্ষিত লোকের অনুশীলনে টিকে রইল শহরের সংকীর্ণ-সীমায়। এ যেন দুধের প্রত্যাশায় ঘোলের সাধনা অথবা দুধের সাধ ঘোলে মিটানো। কেননা এ সাধনায় যাঁরা ব্রতী রইলেন, তাঁদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা ও অপরিস্রুত শিল্পরুচি যোগ্য ছিল না কোনো সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করার। সামর্থ্য ছিল না তাঁদের লক্ষ-চেতনা মনে জাগিয়ে রেখে এগিয়ে যাবার। এভাবে ব্যর্থ হল একটি জাতীয় স্বপ্ন, একটি ইঙ্গিত সম্ভাবনা ও একটি মহৎ প্রয়াস।' (শরীফ, ২০১০:৬৮)

[৮৯] উল্লিখিত দুটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আহমদ শরীফের বিচার-ব্যাবধান ও স্ববিরোধিতা সম্পর্কে আরও দেখুন– সৈয়দ আজিজুল হক (২০০১)।

[৯০] 'বঙ্কিম মানস' প্রবন্ধেও একই মন্তব্য পাই– 'হিন্দু-মুসলমান কি কোনোকালে একজাতি ছিল যে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়া যাবে? বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিজাতি-বিদ্বেষী। সাধারণভাবে বিচার করলে এতে অন্যায়-অস্বাভাবিকতা কিছুই পাওয়া যাবে না। কেননা বঙ্কিম যে-মুসলমানকে গাল দিয়েছেন, তারা তুর্কি-মুঘল শাসকগোষ্ঠী। (শরীফ, ২০১০:১৭৫)

একই মন্তব্য 'বঙ্কিমের মনোজগৎ' প্রবন্ধে – 'বঙ্কিম সাহিত্যে এখনো যদি 'মুসলমান' কেটে মুঘল কিংবা পাঠান বসানো হয়, তাহলে তাঁকে মোটেই মুসলিম বিদ্বেষী বা সাম্প্রদায়িক বলা সম্ভব হবে না।' (শরীফ, ২০১৪:১৪৭-৪৮)

[৯১] আহমদ শরীফের ব্যাখ্যা– 'মুসলিমদের নেড়ে, যবন ইত্যাদি অপমানকর শব্দে [আনন্দমঠ] বিশেষিত করার বিভ্রান্তি দূর করতে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন 'আনন্দমঠের পত্রিকায় প্রকাশনাকালে যেসব স্থানে ইংরেজ নির্দেশক শব্দ ছিল সেগুলো গ্রন্থাকারে মুদ্রণ কালে নেড়ে, যবন, ম্লেচ্ছ রূপ ধারণ করে। লেখক চাকুরে বলে পদচ্যুতির ভয়জাত এ পরিবর্তন, –মুসলিম বিদ্বেষের পরিচায়ক নয়।' (শরীফ, ২০১৪:১৪৭-৪৮)

[৯২] শেক্সপিয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'এর উদাহরণ দিয়ে বঙ্কিম যুক্তি দিয়েছেন সে নাটকে শাইলকের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ইহুদিদের প্রতি যে বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে তা সমকালীন ভেনিসিয়ান খ্রিস্টানদের, শেক্সপিয়ারের নয়। তেমনি 'বঙ্কিমসাহিত্যও এ দৃষ্টি ও মন দাবি করে' (শরীফ, ২০১৪:১৪৭) কারণ 'কাহিনীর প্রতিপাদ্যের প্রয়োজনে পাত্র-পাত্রীর মুখে যা বসানো হয়, তা লেখকের মত বলে মনে করা অনুচিত!' (শরীফ, ২০১৪:১৫৪)। সুতরাং মুসলিমদের প্রতি বাঙালি হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গিকে বঙ্কিমের ভেবে নেয়া অনুচিত হবে। বঙ্কিমের সৃজনশীল সাহিত্য বহির্ভূত অন্যান্য রচনা থেকে উদাহরণ দিয়ে আহমদ শরীফ প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন যে, বঙ্কিম মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন না। দেখুন– আহমদ শরীফ (২০১৪:১৫৪-৫৫)।

[৯৩] 'মানববাদী বঙ্কিম' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন– 'তাঁর অঙ্গীকৃত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ ও অবলম্বিত ভক্তিবাদ-দুটোরই উদ্ভব আকস্মিক-সুপরিকল্পিত নয়, আবেগ প্রসূত-যুক্তিজাত নয়। (শরীফ, ২০১৪:১৫৬)

[৯৪] 'বঙ্কিম মানস' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ (২০১০:১৭৩) লিখেছেন– 'বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের এই উগ্রতা ও একগুয়েমি তাঁর স্থায়ী কলঙ্ক।'

[৯৫] বিধবা বিবাহে অসম্মতি বা বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচারে বিরোধিতা– এগুলোকে অবশ্য আহমদ শরীফ ত্রুটি বিচ্যুতি বলতে রাজি নন। দেখুন– আহমদ শরীফ (২০১৪:১৪৯)।

[৯৬] *বিচিত চিন্তা* গ্রন্থভুক্ত– সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্র মনীষা, রবীন্দ্র-মানসের স্বরূপ সন্ধানে, রবীন্দ্রনাথ, অতীন্দ্রিয় লোকে রবীন্দ্রনাথ; *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা* গ্রন্থভুক্ত– 'পঁচিশে বৈশাখে', 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গে'।

[৯৭] একই মতামত পাই 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে। দেখুন–আহমদ শরীফ (২০১০:২৯১-২৯২)।

[৯৮] যথাক্রমে হায়াৎ মামুদ ও সৈয়দ শামসুল হকের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন হুমায়ূন আজাদ (১৯৮৭:১৩) *মুক্ত ও মুগ্ধদৃষ্টির রবীন্দ্র বিতর্ক* গ্রন্থের ভূমিকায়।

[৯৯] ''রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ এই মন্তব্যের পটভূমি বর্ণনা করে যা লিখেছেন সংক্ষেপে তা হল– ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার আগে যারা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেও ক্ষেপে যেতেন, তারাই স্বাধীনতার পর রবীন্দ্র-অনুরাগী এবং আমাদের স্বাধীনতার প্রেরণার উৎস বলে চারদিকে শোরগোল তুললেন। এমতাবস্থায় ১৯৭২ সালে রবীন্দ্রজন্মদিনে টেলিভিশনের শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠানে আহমদ শরীফ মন্তব্য করেন যে, 'আমাদের প্রেরণার উৎস সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথ নন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, সম্পদ নন।' রবীন্দ্র-স্তাবক ও সুবিধাবাদীদের এহেন আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ এই মন্তব্য করেছেন সরাসরি না বললেও তিনি প্রতিবাদী কণ্ঠে আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক রবীন্দ্রাদর্শের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন তা উল্লেখ করেছেন। (শরীফ, ২০১০ক:১০৫)

[১০০] বিস্তারিত– আহমদ শরীফ (২০১০ক:১০৯,১১৭)।

[১০১] 'বাঙলা সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে গণমানবের স্বার্থবিরোধী এমন কিছু উদাহরণ যুক্ত করেছেন আহমদ শরীফ–

তিনি [রবীন্দ্রনাথ] কখনো স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখেননি, তিনি চাইতেন আপোসে বোঝা-পড়ার ভিত্তিতে শাসক-শাসিতের সহাবস্থান, এক কথায় তিনি সুশাসন সুপোষণ চাইতেন, স্বদেশীর স্বশাসন কামনা করতেন না। জমিদারীর ক্ষেত্রেও তিনি ন্যায্য দেনা-পাওয়ার সম্পর্কে আস্থা রাখতেন ও আশ্বস্ত থাকতেন। এ জন্যেই ঘরে বাইরেও চারঅধ্যায় উপন্যাসে কিংবা কালের যাত্রা (বা রথের রশি) নাটিকায় রাজনীতিকদের নিন্দিত করেছেন। রক্তকরবী, অচলায়তন, মুক্তধারা, তাসের দেশ কিংবা প্রায়শ্চিত্ত সহজেই হতে পারত গণ-আন্দোলন উদ্দীপক নাটক। বিপ্লব বিরোধী বলেই তিনি মহৎকথার ও গুঢ়চেতনা প্রলেপে সেগুলোকে নির্বিষ সর্পের মতো নিষ্ফল-নির্লক্ষ্য করে সমাপ্তি দান করেছেন। অমনোযোগী পাঠকেরও এ তথ্য দৃষ্টি এড়ান না যে রবীন্দ্র মনে-মানসে সামন্তসুলভ আভিজাত্য গর্ব ও অভিজাত-সুলভ বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়তা ছিল। দেবতা-রাজরানী-জামিদার-অভিজাতরাই তাঁর রূপক-সাংকেতিক রচনার অবলম্বন। (শরীফ, ২০১০ক:২৫৯)

[১০২] অবশ্য 'রবীন্দ্রবিরোধী' অভিধায় চিহ্নিত হতে আহমদ শরীফের আপত্তির কথা একটি সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়। তিনি মুক্ত ও মুগ্ধ দৃষ্টির রবীন্দ্রবিতর্কের উদগাতা বলাই সঙ্গত। দেখুন- কেশব মুখোপাধ্যায়কে দেয়া সাক্ষাৎকার। *সমাজ সংস্কৃতির স্বরূপ* (সম্পা. নেহাল করিম)-এ সংকলিত (শরীফ, ২০০৮:৩৯৫)

[১০৩] আহমদ শরীফ আবুল আহসান চৌধুরীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে – 'তাঁর স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা হিসেবে উল্লেখের হিড়িক পড়ে। এমনকি শেখ মুজিবও যখন এই ঘোষণা দিলেন তখন আহমদ শরীফ সত্য উচ্চারণ করলেন, 'রবীন্দ্রনাথ জীবনে কখনও স্বাধীনতা বা স্বশাসনের পক্ষে বলেন নি, তিনি সুশাসন চেয়েছিলেন'। এভাবেই তাঁর রবীন্দ্রবিরোধিতার শুরু। দেখুন– (আহসান, ২০০৭:১১৮)

[১০৪] 'বাংলা সাহিত্যের ইসলামমুখী ধারা' প্রবন্ধটি *মাসিক মোহাম্মাদী* পত্রিকায় প্রকাশিত (শ্রাবণ ১৩৫৯) হওয়ার পর 'আজাদ' পত্রিকায় ওই প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখেছিলেন ফররুখ আহমদ ও তালিম হোসেন। অন্যদিকে 'সংবাদ' পত্রিকা প্রতিবাদের বিরুদ্ধে লেখা ছাপায়। (কবির, ২০১০:৬৭৪)

[১০৫] আহমদ শরীফ ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক' হিসেবে যে ছয়টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সংকলন। প্রকাশকল ১৯৯০।

[১০৬] আহমদ শরীফের মতে নজরুলের মানবতাবোধ 'স্বস্বার্থে সংগ্রাম এবং জৈবিক উত্তেজনা প্রসূত, তাই তমঃগুণজাত। এতে দূরদৃষ্টি নেই– স্থায়ী সমাধানপন্থার নির্দেশ অনুপস্থিত।' -২০১০:৬১১

[১০৭] 'সীমিত ও সংকীর্ণ অর্থে নজরুলও মানবতাবাদী ও মানবপ্রেমিক। তাঁর বিদ্রোহের জড় রয়েছে এই মানবতাবোধে। মানবপ্রীতিই তাঁকে বিদ্রোহী করেছিল। (শরীফ, ২০১০:৬১৪-৬১৫)

[১০৮] *নজরুল ইসলামের কবিস্বভাব : শক্তিপূজা* প্রবন্ধে আহমদ শরীফ নজরুল-মানস ও তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির বাস্তব কারণ বর্ণনা করে লিখেছেন– 'নজরুলের ছিল খোরপোষের প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর দায়, তাই তাঁর পক্ষে ধীরে লেখা, ভেবে লেখা, যত্নে লেখা বাস্তব কারণেই ছিল অসম্ভব।' (শরীফ, ২০১৪:২৪৬)

'নজরুল রচনার ত্রুটিবিচ্যুতি আবিষ্কার এখন আর নিন্দা অবজ্ঞার অভিব্যক্তি নয়, বরং প্রিয়জনের অভাবিত ব্যর্থতায় অপ্রত্যাশিত আকস্মিক অসাফল্যে যে বেদনাবোধ ও ক্ষোভ জাগে, এ তারই প্রকাশ, এ সহানুভূতিরই অন্যনাম ও অন্যরূপ।' (শরীফ, ২০১৪:২৪৬)

[১০৯] কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রবন্ধে নজরুলের সাম্যবাদে বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন আহমদ শরীফ–

> 'মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের বাণীর দূরাগত ধ্বনির প্রভাবে তিনি জুলুম-জালিমবিহীন শোষণ-পীড়নমুক্ত মানুষের সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তাচেতনার ও বোধ-বুদ্ধির জগতে মার্কসবাদ কোন সুস্পষ্টরূপ পায়নি, ফলে তার উচ্চারিত সাম্যের আবেদনে, শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-মুক্তির সংগ্রামে ঐহিকতাসর্বস্ব বল-বুদ্ধি-বিবেক নির্ভরতা ছিল না, ছিল আল্লাহ-ভগবানের দোহাই, ছিল ধর্মধ্বজী কপট মোল্লা-পুরুত-পাদরী-ভিক্ষুক কবলমুক্ত বিশুদ্ধ শাস্ত্রানুগত্য।' (শরীফ, ২০১৪:২৩১)

[১১০] ত্রিশের কবিদের সম্পর্কে আহমদ শরীফ বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এবং কচিৎ দু-একখানা প্রবন্ধে সাধারণ মন্তব্য করেছেন। 'বাঙলা সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার ধারা' প্রবন্ধ থেকে উল্লেখ দেয়া হল–

> 'পুরোনো দৃষ্টিতে এরা [ত্রিশের কবিরা] বাস্তবতার নামে অশ্লীলতা, নতুন বিষয়েরও ভাষা-ভঙ্গির প্রয়োগের নামে উচ্ছৃঙ্খল অরুচিকর কর্ণনার ও বক্তব্যে উপস্থাপন, অশ্লীল শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি যোগে রবীন্দ্রপন্থীদের উত্তেজিত করতে থাকেন। এঁদেরই অভিহিত করা হয় ১৩৩০-উত্তর কবি সাহিত্যিক। এঁদের কারো কারো প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ অশ্লীলতার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ অনেকেই রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির সাধনা করেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত তিরিশের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬১), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৭) প্রমুখের রচনায় দেশ-কাল-মানুষ ও সমাজচেতনা প্রবল ও প্রত্যক্ষ নয়। এমনকি পরাধীন দেশের এসব কবি-গাল্পিক-ঔপন্যাসিকের রচনায় স্বাধীনতার কামনা ও প্রয়াস কখনো অভিব্যক্তি পায়নি। এঁরা অন্তর্মুখী কবি। বিষ্ণু দে (১৯০১-৮৩) বরং গণ-মানবের প্রতি তাঁর দায়িত্ব কৃচিৎ কখনো পালন করেছেন। এঁরা শক্তিমান জনপ্রিয় কবি, তবে প্রগতিপন্থী কি?' (শরীফ, ২০১০ক:২৬৩)

[১১১] 'মুক্তমনের ঔচিত্যবাদী আবুল ফজল' প্রবন্ধে আহমদ শরীফের অভিমত–আবুল ফজল 'উদাসীন আস্তিক'। তিনি স্বদেশ-স্বসমাজের সমকালীন নতুন ও প্রবল চিন্তা সম্পর্কে সচেতন থাকতেন। নিজের মতামত প্রকাশে দ্বিধাহীন তবে 'তাঁর চিন্তা-চেতনা মাঝারি ও সাধারণ, কৃচিৎ চমকপ্রদ কিংবা দ্রোহমূলক' (২০১৪:৫৩০)। আবুল ফজলের প্রবন্ধ সাংবাদিকতাসুলভ বর্ণনাধর্মী। নাটক-গল্প-উপন্যাসে রোম্যান্টিক এবং শিল্পমানে, ভাষায়-শৈলীতে সফল নন– মাঝারি মানের। সমাজের মানবিকতা ও হিতচেতনা জাগানোই এসব আঙ্গিকে তাঁর উদ্দেশ্য। (শরীফ, ২০১৪:৫৩২)

[১১২] আহমদ শরীফের রবীন্দ্রবিবেচনাকে অবলম্বন করে তাঁর সাহিত্যবিশ্লেষণের মৌল প্রবণতাকে সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন মোহাম্মদ আজম–

প্রক্রিয়াটি সুবিধাজনক কারণ এতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সূত্রবদ্ধ করা যায় কোন মহান স্রষ্টার সৃষ্টি ও ব্যক্তিসত্তাকে। ...কিন্তু এই ভঙ্গিটির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই লুকিয়ে থাকে এক চরমপন্থা– অন্য অনেককিছুকে বাদ দিয়ে এতে গুরুতর করে তোলা হয় একটি মাত্র অনুষঙ্গকে, কিংবা অন্যান্য সূত্রকে বিকৃত বা দমিত করে সাবয়ব হয়ে ওঠে একটি ধারণা।... ফলে সিদ্ধান্তটি হয়ে ওঠে একমাত্রিক ও খণ্ডিত। (আজম, ২০০১:৮০)

[১১৩] কোনো লেখকের লেখাকে বিভিন্নভাবে এর-তার প্রভাব হিসেবে দেখানোর সমালোচনাপদ্ধতিকে তিনি 'প্রভাব-তত্ত্ব' অভীধায় চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে 'সমমর্মিতাজাত সাদৃশ্য মাত্রই প্রভাব নয়' (শরীফ, ২০১৪:১৯১) এসবে গুরুত্ব দিলে 'আদমের কাল থেকে পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু হয়েছে প্রতিটির প্রভাব জন্মকাল থেকে প্রতিটি মানুষের উপর পড়েছে তা-ও উল্লেখ করতে হবে' (শরীফ, ২০১৪:১৯০)।

[১১৪] আহমদ শরীফের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতভিন্নতার কারণ সম্পর্কে আবুল কাসেম ফজলুল হক এমন মন্তব্য করেছেন। দেখুন– আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০০১ক:১৭৭,১৭৮)

[১১৫] নিজের ত্রুটি সহজে মেনে নেয়ার স্বভাব আহমদ শরীফের ছিল। স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন তাঁর ছাত্র অধ্যাপক মনসুর মুসা (মুসা, ২০০১:২৮৩)।

[১১৬] দেখুন– আফজালুল বাসার (২০০১:২৯০)।

[১১৭] আহমদ শরীফের মনে নাস্তিক্যবোধের উদয় অন্তত চল্লিশের দশকের শেষে হয়েছিল– বলেছেন তাঁর সন্তান নেহাল করিম। দেখুন–নেহাল করিম (২০০৬:১৫৮)।

[১১৮] এ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম ফজলুল হকের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–'অদৃষ্টবাদকে তিনি মানবজীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাধি ও চরম শত্রু গণ্য করেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে তিনি দেখেছেন অদৃষ্টবাদের গ্রাসে অসহায়। সেই সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছেন, আধিপত্যবাদী ও শোষণবাদীরা। নিজেদের কর্তৃত্ব ও ঐশ্বর্যের তাগিদে গণমানুষের মধ্যে অদৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠিত রাখতে তৎপর। তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, অদৃষ্টবাদের প্রধান অবলম্বন অলৌকিকে বিশ্বাস। সেজন্য প্রচলিত অলৌকিক সকল ধারণার যৌক্তিকতা ও বস্তুভিত্তি তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। এ ধারায় তিনি যত অগ্রসর হয়েছেন, বিশ্বাস ততই তাঁর মন থেকে মুছে গেছে' (কাসেম, ২০০১:১৭৪)।

[১১৯] দেখুন– আহমদ শরীফ (২০১৪:১৩১)।

[১২০] তাঁর মতে, 'দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীর ও রোমিলা থাপার-এর দৃষ্টি নিয়ে প্রাচীন ভারতের; তারাচাঁদ, সতীশচন্দ্র, রামশরণ শর্মা, হরবংশ মুখিয়া, বিপিনচন্দ্র, ইরফান হাবিব প্রমুখের মনোভঙ্গি নিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের এবং আধুনিক কালের ইতিহাস রচনা করা বাঞ্ছনীয়।' (শরীফ, ২০১১:৬৮)

[১২১] প্রাচীন-মধ্য ও আধুনিক যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োগ-কৌশল-প্রবণতা সম্পর্কে আহমদ শরীফ সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে যে লেখদের রচনার তিনি প্রশংসা করেছেন তেমন একটি গ্রন্থ –*সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা*, রমিলা থাপার-হরবংশ মুখিয়া-বিপন চন্দ্র, (অনুবাদ- তনিকা সরকার), কেপি বাগচী, কলকাতা, ১৯৭৬।

[১২২] আবুল কাসেম ফজলুল হকের মতে– 'তাঁর কথার কদর্থ করার জন্যও যে বাংলাদেশে লোকের অভাব নেই, তিনি যা বোঝাতে চান তা না-বুঝে উল্টো রকম বোঝার লোক-ও যে বাংলাদেশে অনেক আছেন, সে-কথা তিনি আদৌ চিন্তা করেন না– রচনায় সে-বিষয়ে তাঁর কোনো সতর্কতার পরিচয় লক্ষ করা যায় না। তাঁর রচনায় কোথাও কোথাও আবগ ও স্বতঃস্ফূর্ততা কিছু বেশি। অনেক বিষয় তিনি এত সংক্ষেপে স্পর্শ করে যান যে, পাঠকের কাছে সেগুলো মোটেই স্পষ্ট হয় না। তাঁর কতিপয় প্রবন্ধ খুবই সুসংবদ্ধ, গোছানো, দৃঢ়পিনদ্ধ; কিন্তু এমন অনেক প্রবন্ধও আছে তাঁর, যেগুলো 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' হারিয়েছে– সেগুলো স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-অনুভূতির কিংবা মতের প্রকাশ মাত্র।' (কাসেম,২০০৬:৩৬১)

[১২৩] দেখুন– আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০০১) ও মনসুর মুসা (২০০১)

[১২৪] দেখুন– সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০৬:৩০)।

[১২৫] অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদের শব্দ-বন্ধ উদ্ধৃত করেছেন মনসুর মুসা। দেখুন– 'আমার শিক্ষক আহমদ শরীফ', আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি, ইউপিএল, ২০০১:২৭৯)

[১২৬] দেখুন– আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০০১:১৭৬-৭৭)।

[১২৭] কমিউনিস্ট ও কমিউনিজমে সমালোচনা আছে 'প্রগতির একটি তাত্ত্বিক সংজ্ঞা' (২০১৪: ৪২৮), 'সংস্কৃতির রূপান্তর প্রসঙ্গে' (২০১৪:৩৪৯-৫০)-সহ অনেক প্রবন্ধে ।

[১২৮] 'জন্মদিনে স্মৃতিবুদ্বুদ' নিবন্ধে নিজকে নিয়ে লিখেছেন আহমদ শরীফ (২০১৪:৬১২)।

[১২৯] 'কেউ থাকে যুদ্ধে কেউ চলে ভিক্ষায়' প্রবন্ধে 'ভিক্ষুক এবং যোদ্ধা' এই দুটি প্রতীকের দ্বারা আহমদ শরীফের মধ্যে এক যোদ্ধা-স্বভাব প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাওয়া যায় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখায়। দেখুন– সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০৬:১৭)।

চতুর্থ অধ্যায় : আহমদ ছফা

৪. সমাজভাবনা

আহমদ ছফার[১] (১৯৪৩-২০০১) সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল ধর্মীয় রক্ষণশীল অথচ অসাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলে[২] এবং ততোধিক উদার গুরু-ব্যক্তিত্ব প্রযত্নে[৩]। তাই আহমদ ছফার একগুঁয়ে, বন্ধনহীন, ডানপিটে, উদ্ধত মন পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল; পারিবারিক পিছুটান-প্রাবল্য বা আর্থিক অনটন[৪] প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। বাল্যকালে বিদ্যালয়-শিক্ষকের উৎসাহে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলালের কবিতাপাঠ; রাম বা মধুসূদনকে অবলম্বন করে কবিতা রচনা তাঁকে স্থানীয় লোক-বিশ্বাসে 'আলাওল' হওয়ার সামাজিক সম্মান ও অহংকার অর্জনের পথে সাহিত্যচর্চার মহৎ সাধনায় ব্রতী হতে উৎসাহিত করতে পারে[৫]। অনুমান করা যায়, এ কারণে কবিতা লিখেই ছফার সাহিত্যচর্চা শুরু[৬]। ইতিহাসের মধ্য থেকে হয়ে-ওঠার[৭] সেই প্রস্তুতিপর্বে, কৈশোরেই তাকে আকৃষ্ট করে গ্রাম্য পুথি, রামায়ণ আর 'পদ্মাবতী'র সুরসংগত আবৃত্তি। কৈশোরেই পিতার উৎসাহে কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক-সমিতির রাজনীতিতে হাতেখড়ি[৮] এবং বিপ্লবী রাজনীতিতে সক্রিয়তার এক পর্যায়ে সহিংস আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ট্রেনলাইন উপড়ে ফেলা, ফলে আত্মরক্ষার্থে গৃহত্যাগ ছফা-মানসে গভীর রেখাপাত করেছিল বলে ধারণা পাওয়া যায়[৯]। পারিবারিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত পরহিতব্রত ও কৃষকসমাজের প্রতি গভীর একাত্মতা ছফা-মানসের অন্যতম প্রভাবক।[১০] পূর্বপুরুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সামাজিক পরিচিতি ও সম্মান ছফার মনোজগতে গভীর রেখাপাত করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১১] অনমনীয় আত্মসম্মানবোধ ও প্রবল আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ বিচারবোধ, আবেগময় আত্মাভিমান ছফা-মানস অনুধাবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[১২] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর সকল চিন্তা-সৃজনশীলতা-আবেগ-উৎকণ্ঠা-পরিকল্পনার উৎসমূল। কিন্তু সেই মুক্তিযুদ্ধই তাকে আমৃত্যু এমন এক মানসিক অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল যা থেকে তিনি মৃত্যুর আগ-পর্যন্ত মুক্ত ছিলেন না। ছফা-মানস প্রকারান্তরে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের প্রাপ্তি ও পরিণতির মতোই এক অপূর্ণ যাত্রা।[১৩]

৪.১

আহমদ ছফার সমাজভাবনার রূপ-রূপান্তর ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবন করতে হলে তাঁর মানসগঠনের কতিপয় বিশেষত্ব মনে রাখা প্রয়োজন। ছফা যে সামাজিক পরিবেশে শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করেছেন তা ছিল ধর্মীয়ভাবে উদার। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে সামাজিক সহনশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের কথা আহমদ ছফা তাঁর স্মৃতিচারণে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।[১৪] কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রতি কৈশোর থেকেই তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন অসহায় কৃষকের সেবার উদ্দেশ্যে এবং তাতে পিতার পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল বলে জানিয়েছেন।[১৫] তাঁর চিন্তায় যুক্তি ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এই রাজনৈতিক চর্চার মধ্য দিয়ে।[১৬] কৃষক সমিতির রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে কৈশোরেই ফেরারি আসামি হয়ে বাড়ি থেকে পালাতে বাধ্য হওয়া এবং সেসূত্রে পার্বত্যাঞ্চলে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার বিরল অভিজ্ঞতা[১৭] আহমদ ছফাকে অল্প বয়সেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বাস্তবিক ও আত্মনির্ভর মূল্যায়ন তথা দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করে। প্রথম প্রবন্ধ 'কর্ণফুলীর ধারে'[১৮] রচনা থেকেই প্রমাণিত হয় শ্রমজীবী নির্যাতিত মানুষের প্রতি আহমদ ছফার সংবেদনশীল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক নিরূপণে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা কতটা প্রখর।[১৯] কৈশোরের সীমিত পরিসরে বৈপ্লবিক কর্মচিন্তা তাঁকে যৌবনে পরিচালিত করেছে বৃহত্তর আঙ্গিকে দেশ ও জাতিগঠনের মহাযজ্ঞে। তাঁর তারুণ্যদীপ্ত সময়ে জাতীয় জনযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, দেশের প্রয়োজনেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন কলম-সৈনিকের ভূমিকায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর দাসত্ব ও শৃঙ্খলমুক্তির স্বপ্নযাত্রা– আহমদ ছফা এই স্বপ্নযাত্রায় সক্রিয় সারথি। দেশ এবং দশ আহমদ ছফার সমাজভাবনার মূল ক্ষেত্র। 'কর্ণফুলীর ধারে' থেকে শুরু করে 'লেখক সাহিত্যিকদের একটি প্রতিবাদমঞ্চে সমবেত হওয়া প্রয়োজন' শীর্ষক প্রবন্ধ-নিবন্ধ পর্যন্ত

বিবেচনায় নিলে প্রায় ছত্রিশ বৎসরব্যাপী[২০] নিরলস সমাজকর্মীর মতো স্বসমাজ ও স্বজাতির গৌরব-গ্লানি, সম্ভাবনা-ব্যর্থতা, প্রগতি-প্রতিক্রিয়াশীলতাকে রূপায়ণ, বিশ্লেষণ ও চিহ্নিত করেছেন আহমদ ছফা। এই সমাজভাবনায় বিধৃত বিষয়সমূহকে ছফাচিন্তার প্রকৃতি ও প্রবণতার সাথে সম্পর্কিত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়:

এক. ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বাঙালি মুসলমান সমাজের উন্মেষ ও স্বাতন্ত্র্য;

দুই. মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সমাজবিন্যাসের ধরন ও প্রবণতা; এবং

তিন. বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ।

এসব সামাজিক পর্ব-পর্বান্তর ও প্রকৃতি-প্রগতিতে সময়ের বিবর্তনে ক্রিয়াশীল ছিল বিচিত্র উপাদান। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার, ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, উপমহাদেশের আঞ্চলিক সামাজিক সম্পর্কের স্বার্থসংশ্লিষ্টতা, বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি আর্থ-বাণিজ্যিক-ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক বিষয়াবলি আলোচিত সমাজগঠনে কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমরা জানি উৎপাদনযন্ত্রের সাথে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম জন্ম দেয় সমাজ-সংস্কৃতির। আবার উৎপাদনের ওপর মানুষের অধিকার ও সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে একটি সমাজের বিকাশ ও সমৃদ্ধি। সমাজের প্রাথমিক ও অন্যতম উপাদান মানুষ। সীমিত সম্পদের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা জন্ম দেয় প্রভাব, ক্ষমতা ও বৈষম্যের। মানুষের আচরণ ও সামাজিক সম্পর্কও এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটিও রাজনীতি তবে প্রকাশ্য নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের যৌথ সৃষ্টি একধরনের অরাজনৈতিক রাজনীতি।[২১] রাষ্ট্র ও সমাজ এই পাটাতনে এক হয়ে যায়। আহমদ ছফার সমাজভাবনাকে আমরা এই পাটাতন-উদ্ভূত বলতে পারি। তিনি প্রথাগত রাজনৈতিকসূত্রে আবদ্ধ না হয়ে, সামাজিক মানুষকে তাঁর সকল আলোচনায় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। কারণ কোনো এক সময়ে তিনি শুধু রাজনীতিই করতে চেয়েছিলেন, মানুষের সেবা ও উপচীকির্ষা তাঁকে তীব্রভাবে সমাজসচেতন মানুষে পরিণত করেছে। তাঁর সমাজভাবনার কেন্দ্রবিন্দুও মানুষ ও মানবিকতা তথা প্রেমধর্ম। কারণ সমাজ বা রাজনীতি উভয়েরই মূল লক্ষ্য মানুষ। আবার উভয়েরই চরম উৎকর্ষের বহিঃপ্রকাশ সংস্কৃতি। তাই আহমদ ছফার সমাজভাবনা ও সংস্কৃতিভাবনা পরস্পর পরিপূরক হিসেবে বিচার করাই যুক্তিযুক্ত। তাঁর সমাজভাবনার সাথে রাজনীতি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন নিচের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়–

> উন্নততর সাংস্কৃতিক বিপ্লব উন্নততর রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্ম দেবে। সুন্দর সমাজই রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রাণ কথা। একটা পর্যায়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিক কর্মীদের সাংস্কৃতিক কর্মীর ভূমিকা পালন করতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীদের রাজনীতিসচেতন হতে হবে। সমাজকে সুন্দর করা রাজনীতি ও সংস্কৃতির যৌথ দায়িত্ব। (ছফা, ২০০৮চ:২১৯)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আহমদ ছফার সমাজভাবনার কেন্দ্রে মানুষ; সংগত কারণেই সেই কেন্দ্রের পরিধি সামাজিক মানুষের নির্মাণ করা সংস্কৃতি। যতদূর পরিধিঅঞ্চল বিস্তৃত ততদূর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রবিহারী মানুষের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব বা বিজয়। তাই একটি উন্নত সংস্কৃতি নির্মাণের জন্য আহমদ ছফার আকাঙ্ক্ষা জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিচল দেখতে পাই। যে সমাজের জন্য তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা উৎসারিত হয়, হতে পারে সেটি মুখ্যত বাঙালি মুসলমান সমাজ, সে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত নির্যাতিত মানুষ এমনকি সবচেয়ে প্রান্তিক 'অচ্ছুৎ' শ্রেণি পর্যন্ত সেই আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতি। তবে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কল্যাণচিন্তার কথাও ছফার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, যখন বাঙালি বললে মহামানবের তীরে এক মহাজাতির সম্ভাবনা উদ্ভাসিত হয়। আহমদ ছফা এর পেছনে স্পষ্ট যুক্তি সাজিয়ে রেখেছেন–

> আমি যে সমাজ থেকে এসেছি সে বাঙালি মুসলমান সমাজটিকে যদি ন্যায়-নীতির দিকে, মানবতার দিকে, অসাম্প্রদায়িকতার দিকে এবং বিজ্ঞানদৃষ্টির দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করি, তাহলে আমার কর্তব্য অধিকতর ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারব। বাঙালি মুসলমান সমাজের বাইরে আরো একটি বৃহত্তর বাঙালি সমাজ রয়েছে, তাঁর প্রতিও আমার একটা দায়িত্ব এবং অঙ্গীকারবোধ যেটি আমার পক্ষে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমি ভেবে পাইনে আমার আপন সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা না করলে বৃহত্তর বাঙালি সমাজ কিংবা অধিকতর ব্যাপক অর্থে বিশ্বসমাজের কল্যাণ কি করে আমি সম্পন্ন করতে পারি।

> আমি আমার সমাজের কল্যাণ এবং উন্নতি কামনা করি, কিন্তু সেটা অন্য সমাজের কিংবা অন্য সম্প্রদায়ের কল্যাণের বদলে নয়। (ছফা, ২০০৮গ:২৪৯)

আহমদ ছফার সমাজভাবনা বিশ্লেষণের সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি ঐতিহাসিকভাবে নির্যাতিত একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে তাঁর সত্তার গভীরে ধারণ করেন। তারা বাঙালি নামে চিহ্নিত ছিল; পরে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান পরিচয়ে স্থিত হয়েছে। এই সমাজের সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 'স্ট্রাগল' তথা সংগ্রামের কথা তাঁর যেসব প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য– 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস', 'তথাকথিত তপসিলী সম্প্রদায়', 'কৃষি-বিপ্লব প্রসঙ্গে', 'বাঙালি মুসলমানের মন', 'সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস', 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'(দ্বিতীয় খণ্ড), 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা', 'বাংলাদেশ : দেশ ও জাতি', 'বঙ্গভূমি আন্দোলন, রাষ্ট্র ধর্ম, মুক্তিযুদ্ধ:বাংলাদেশের হিন্দু ইত্যাকার প্রসঙ্গ', 'বাংলাদেশকে যেভাবে দেখি', 'ধনতন্ত্রের নবপর্যায় ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা বর্তমান', 'ভেবে দেখতে বলি', 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শোভাযাত্রা', 'বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র' প্রভৃতি।

৪.১.১

আহমদ ছফা যাদেরকে 'বাঙালি মুসলমান' বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন তারা ইতিহাসে 'বাঙালি' নামে পরিচিত এমন এক নির্যাতিত জনগোষ্ঠী যারা সাম্প্রদায়িকতার আদি উৎস বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত হয়ে প্রাচীনকাল থেকেই জাতিগত দুর্দশায় পতিত এবং কালক্রমে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে ধর্মান্তরণের মাধ্যমে 'বাঙালি মুসলমান' পরিচয়ে স্থিত। একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য বাঙালি মুসলমানের সংগ্রাম বারবার ব্যর্থ হয়েছে, তবু সে প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। সেই দীর্ঘ পথচলার এক পর্যায়ে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটে। সংস্কৃতির সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিষয়টি প্রথম প্রতিভাত হয়। বাঙালি মুসলমানের 'পলিটিক্যাল উইল' জন্ম নেয় ভাষাকে আশ্রয় করে। একথা কেবল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের রচিত পুথিসাহিত্যও সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকেই জন্ম নিয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াশীলতাই যথাযথ সময় ও সামাজিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি মুসলমানের চিত্তবৃত্তিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। এর ফলে ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই এই অঞ্চলের নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানবগোষ্ঠীর প্রতিবাদের নানা উপায়কে ধারণ করে আছে তার ভাষা ও সংস্কৃতি। এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে ধর্ম। রাজশক্তি বা আগ্রাসী শক্তির নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় বারবার ধর্ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আদিম কৌমসমাজভুক্ত মানবগোষ্ঠী আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান করেছে। ইতিহাসে এই মানবগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে বৌদ্ধধর্মের জীবপ্রেমের আশ্রয়ে মুক্তি সন্ধান করেছে, আবার নির্বাণসাধনার ওপর বর্ণবাদী নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে একই মানবকূল সদলবলে গ্রহণ করেছে শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম। কিন্তু পেশা ও উৎপাদনব্যবস্থায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন না ঘটায় প্রতিবারই তাঁর গৃহকোণ থেকেছে অপরিবর্তিত। জীবনযাপন প্রণালীতে কিছু মোটা দাগের অভ্যাসের বদলে ভিন্ন কয়েকটি স্থূল অভ্যাস গ্রহণ করায় সাংস্কৃতিক ভাববিশ্বে মৃদুকম্পন অনুভূত হলেও সমাজব্যবস্থায় লক্ষণীয় কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটেনি। এতসবের মধ্যেও বাঙালি তাঁর সংস্কৃতিকে নির্বাসন দেয়নি বরং সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস সর্বমানবতাবাদে দীক্ষা নিয়েছে, লোকবিশ্বাসের সাথে নতুন ধর্মের মিলিত স্রোত লোকধর্মে সমন্বিত হয়েছে। টিকে থাকার বিস্ময়কর শক্তি জুগিয়েছে বাঙালির পরিগ্রহণ ও আত্তীকরণ ক্ষমতা। একটি মানবিক সমাজ গঠনের অভীপ্সা রূপ লাভ করেছে, ধর্মের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে উদ্ধার পাবার আশায়। বাউল-বৈষ্ণব-সুফি সাধকদের প্রেমধর্ম ও মানবতাবাদী দর্শন এই সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাঙালি-সমাজে যে বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয় তা

ইতিহাসের যে কোনো সময়ের তুলনায় ব্যাপক ও গভীর। বাঙালি সমাজের যে অংশটি ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান করেছিল তাঁরা ঐতিহাসিকভাবেই নির্যাতিত জনগোষ্ঠী, বঞ্চিত কিন্তু বিদ্রোহী।

পুথি রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান আত্মপরিচয় অন্বেষণের সূচনা করেছে– মূলত এই প্রস্তাবনা থেকেই আহমদ ছফার জাতিসত্তা সন্ধানের সকল অভিক্ষেপগুলো উৎসারিত। তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতিচিন্তা কিংবা সমাজভাবনায় ইতিহাসের আলোকে নির্ধারিত নির্যাতিত বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বৃহত্তর প্রেক্ষাপট হলেও, মূলত নিবদ্ধ বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যসূচক স্তরে উন্নীত হওয়ার মধ্যেই। পুথি রচনার মতো ঐতিহাসিক সৃজনাভিজ্ঞতা বাঙালি মুসলমানের সামষ্টিক চৈতন্যে যে বহুস্তরবিশিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক-জাগতিক ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করেছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় ক্রমশ সমাজ-সচেতন হতে শুরু করে এই নির্যাতিত শ্রেণি। বাঙালি সমাজের যে শ্রেণিটি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন নতুন ধর্ম গ্রহণ করার দরুণ এবং রাজশক্তি মুসলমান হওয়ার কারণে 'তাদের মানসে যে একটি বলবন্ত সামাজিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল তাঁদেরই রচিত পুথিসাহিত্যসমূহের মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। কাব্য-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার অনুসারে হয়ত এ সকল পুথির বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজের নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় এসবের মূল্য যে অপরিসীম সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না' (ছফা, ২০০৮ক:১০৪)।

রাজসভার কবিদের বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্য ছিল, ছিল না সামাজিক আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার। তাই নবগঠিত মুসলিম সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার হৃৎস্পন্দন অনুভব করেছিল পুথি লেখকরাই। সামাজিক আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভের পেছনে সাহস বা নির্ভরতা যুগিয়েছিল মুসলিম রাজশক্তির ক্ষমতারোহণ। অবশ্য এই ক্ষমতা ছিল প্রধানত বিদেশি তথা অবাঙালি মুসলমানদেরই হস্তগত। এই সমাজ-দেহে ছিল দীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনা ও বর্ণাশ্রম প্রথার যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার দগদগে ঘা, দেব-দেবীর পূজারিদের অত্যাচারের দুঃসহ স্মৃতি আর ছিল বারবার ধর্ম পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট শূন্যতা। ফলে নতুন ধর্মে দীক্ষিত নতুন সমাজকে তারা সত্বরই নিজস্ব নায়ক, বীর বা কাহিনী উপহার দিতে চেয়েছেন। আমীর হামজা, রুস্তম, ইমাম হাসান, হযরত আলীসহ আরো অনেকে এ তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ছাড়াও পুথি রচনার পেছনে নতুন সামাজিক আকাঙ্ক্ষার প্রযোজনা ছিল। ছিল সামাজিক প্রয়োজনও। আহমদ ছফা অন্তত তিনটি উপাদানের উল্লেখ[২২] করেছেন যেসব দিকে লক্ষ্য রেখে সামাজিক প্রয়োজন মিটানো যেত–

এক. সামাজিক আদর্শ প্রচারের লক্ষ্য বাঙালি মুসলমান সমাজের লোক-সাধারণের সাংস্কৃতিক চেতনার মান;
দুই. বিমূর্তভাবে নতুন সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করার মতো মানসিক সাবালকত্ব; এবং
তিন. পূর্বের প্রাগ্রসর শিল্পাদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং সেই ধারার সামাজিক উপযোগিতাকে ভিন্নখাতে নেয়ার ক্ষমতা।

কিন্তু এগুলোর একটিও পুথি রচয়িতাদের অনুকূলে ছিল না। ফলে ইতিহাসের নির্যাতিত মানবগোষ্ঠী ধর্মের নামে উদ্ভট রসসিক্ত কিছু সামাজিক রূপকথাকেই বিজয়ীর চিহ্ন বলে তাদের মনোজগতে স্থান দিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নিগৃহীত এই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলো অন্তত সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় অন্বেষার সুযোগ পেল যা পরবর্তীকালে বিপুল সামাজিক আলোড়নের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। ছফা লিখেছেন– 'মুসলমান পুথিলেখকেরা সচেতনভাবে এক সামাজিক আদর্শ থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটি সামাজিক আদর্শ, এক শিল্পাদর্শের বদলে আরেকটি শিল্পাদর্শ নির্মাণের প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন' (ছফা, ২০০৮ক:৯৬)। নিজের সমাজ, আদর্শ, ঐতিহ্য বা শিল্প সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা না থাকায় একদিকে 'বাইবেলের অরিজিন্যাল সিন' বা আদি পাপের ধারণার মতো অপমানজনক দূরস্মৃতিকে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান, অপরদিকে নিজস্ব বীর ও নায়ক নির্মাণের তাগিদ, একদিকে শ্রেণি অবস্থানের অসহায়ত্ব অপরদিকে উন্নত আদর্শ ও সভ্যতার প্রতি অপরিচ্ছন্ন, অন্ধ,

অকেলাসিত আবেগ সবকিছুর সমন্বিত প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল পুথিসাহিত্য। পুথি সংলগ্ন কাল ও লেখকদের মনস্তত্ত্বকে ছফা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–

> যে সময় ওগুলো রচিত হয়েছিল, সে সময়কার মুখ্য-গৌণ বিবদমান, বর্ধিষ্ণু যে সকল সামাজিক ধারা. ধারাসমূহের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে, আবার কোথাও সুস্পষ্টভাবে পুথিসাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে তুর্কি আক্রমণের ফলে আরেকটি নতুন সমাজ জন্মলাভ করেছে এবং সমাজের জনগণের একাংশের মধ্যে নতুন চলমানতার সঞ্চার হয়েছে, সেই নতুনভাবে চলমানতা অর্জনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বিকাশ করার উদ্দেশ্যেই পুথিলেখকেরা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। (ছফা, ২০০৮ক:৯৩)

এই নতুন সামাজিক আকাঙ্ক্ষার মূল লক্ষ্য স্বজাতির জন্য 'উন্মত্ত গর্ববোধ', ধর্মের সারল্য ও সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করা। ছফা যুক্তি দিয়েছেন–

> যেহেতু সংখ্যার দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন অনেক, উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন এবং রাজশক্তি সময়ে অসময়ে আদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন, এই সকল কারণের দরুণ তাঁদের মধ্যে দ্রুত একটা সামাজিক আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করেছিল। পুথি সাহিত্যের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ দৈর্ঘ্যে মুক্তি লাভ করেছে। (ছফা, ২০০৮ক:৯৮)

অন্যদিকে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় *রামায়ণ*, *মহাভারত*-সহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহের বাংলায় অনূদিত হওয়ায় সুবাদে নির্যাতিত বাঙালি হিন্দুর শ্রবণে-পঠনে অনধিগম্য শাস্ত্রজ্ঞান সহজলভ্য হয়ে উঠলে সমাজের সর্বত্র, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষ, যে বিলোড়ন ও গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয় তার প্রভাবও ছিল সুদূরপ্রসারী।[২৩] বর্ধিষ্ণু মুসলমান সমাজের সঙ্গে সংঘাতে বাঙালি হিন্দুর আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই সামাজিক বিলোড়নের সাথে একাত্ম হয়ে নতুন মূল্যচেতনা ও প্রতিক্রিয়া দেখাতে হয়েছে। তাই ছফা মনে করেন–

> পুথিসাহিত্য হল দুটি পাশাপাশি সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে মুসলমান জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে তারই প্রতিফলন। মুসলমান জনগণের মত হিন্দু জনগণও আরেকরকমভাবে এই সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিয়েছেন, মঙ্গলকাব্যসমূহ এবং বৈষ্ণবসাহিত্যে ঘটেছে তার প্রকাশ। (ছফা, ২০০৮ক:৯৩)

বাঙালি মুসলমান এবং হিন্দু উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে নিজ নিজ সমাজের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এসব কাহিনী রচনা করেছে। একটি সমাজে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ধর্মাচার ও লোকাচার, উৎসব-উদযাপন, জন্ম-মৃত্যু, প্রাত্যহিকতা-পার্বণ যখন তাঁর মননশীলতায় ছাপ ফেলতে থাকে তখন তা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের স্তরে উপনীত হয়। এভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজ তাঁর সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা পুরণের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক অভিলাষ বপণ করেছে এবং ক্রমান্বয়ে সুদৃঢ় করেছে মধ্যযুগের ধর্মশাসিত সামন্তসমাজব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থান। কিন্তু মুসলমান সমাজের আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন এসময়ে পরিস্ফূট নয়। রাজনৈতিক বিচারে যারা মুসলমান সমাজের শাসক ছিলেন তারা ছিলেন বিদেশি। রক্ত ও ভাষাগত দিক থেকে স্থানীয় জনগণের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। এই তথাকথিত ও স্বঘোষিত উঁচুকোটির মুসলমানগণ স্থানীয় নিম্নশ্রেণির কৃষক-জেলে-তাঁতি বা শ্রমজীবী নিপীড়িত মুসলমানদের স্বাভাবিক নেতা ছিলেন কিন্তু আসলে ছিলেন সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন। তাই বাংলার স্থানীয় মুসলমানগণ শুরু থেকেই, রাজশক্তি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও, শাসকবর্গের সান্নিধ্যে কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব বা কাজকর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়নি। তার প্রধান কারণ হিসেবে ছফা উল্লেখ করেছেন– 'একটি রাজশক্তির সঙ্গে সহায়তা করার জন্য যে পরিমাণ নিরাপদ আর্থিক ভিত্তির প্রয়োজন বাঙালি মুসলমানের তা ছিল না' (ছফা, ২০০৮ক:৯৮)। তবে, অস্বীকার করা যায় না যে, আর্থিক ভিত্তির সাথে শিক্ষার অভাবও এজন্য দায়ী। এসময়ের বাঙালি মুসলমানের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ছফার বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায় –

> মুসলিম রাজশক্তি এই দেশের সমাজ-কাঠামোর মধ্যে অতি সামান্যই রূপান্তর এনেছিলেন। তাঁরা অনেকটা নির্বিবাদেই পূর্বতন সমাজ-কাঠামোকে গ্রহণ করেছিলেন। পরিবর্তন ততটুকুই করেছিলেন, যতটুকু তাঁদের প্রয়োজন। অর্থাৎ পূর্বেকার শাসক নেতৃশ্রেণির শূন্যস্থানটি তারা পূর্ণ করেছিলেন। মুসলিম শাসনের পূর্বে যে সমাজ ব্যবস্থাটি চালু ছিল, পরেও সেই একই ব্যবস্থা চালু থেকেছে। তার মধ্যে কোন মৌলিক রূপান্তর বা পরিবর্তন তারা আনতে পারেননি। তাই নতুন ধর্ম গ্রহণের পরেও স্থানীয়

> মুসলমানেরা ইংরেজ আমলের দেশি খ্রিস্টানদের মত একটা উন্মত্ত গর্ববোধ ছাড়া ইসলাম কিংবা আর্য-সংস্কৃতির কিছুই লাভ করতে পারেনি। (ছফা, ২০০৮ক:৯৮)

সুতরাং বোঝা যায় যে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শাসক-শোষক-নেতা সবাই ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের বিকাশের প্রতিকূলে। এ অবস্থায়, পুথির সূচনাকাল হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দী অথবা পাশ্চাত্যশিক্ষাভিত্তিক হিন্দু-পুনর্জাগরণের উনবিংশ শতাব্দী, কোনো পর্যায়েই বাঙালি মুসলমানের পক্ষে আধা-সামন্ত ও ঔপনিবেশিক সমাজ-কাঠামোর মধ্যে কোনো প্রাগসর আন্দোলন গড়ে তোলা ছিল অসম্ভব। ধর্মীয় পুনর্জাগরণভিত্তিক কতিপয় ডাকে তারা সাড়া দিয়েছিল বটে, তবে তা আত্মোন্নয়নের লক্ষ্যে নয়, হিন্দুর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্রতিপক্ষে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যকে আরও শাণিত করে তুলতে।

বাঙালি মুসলমান সমাজের মানুষেরা সামাজিক-রাজনৈতিক বহু তরঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে গেলেও কোনো পরিবর্তনই তাঁদের একত্র করতে পারেনি। তারা 'অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ'-এর মতো নিজের ভেতরেই বিচ্ছিন্ন এক সত্তা। সামাজিক লক্ষ্যের দ্বি বা ত্রি-মুখীনতাই এর কারণ বলে মনে করেন ছফা। বাঙালি মুসলমান ভাষার ক্ষেত্রে হীনমন্যতায় ভোগে, জাতীয়তার প্রশ্নে উন্মূল-উদ্বাস্তুর মতো আত্মবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে দোদুল্যমানতায় নিক্ষিপ্ত হয়, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয় ট্যাবু দ্বারা; সর্বোপরি স্বাধীন চিন্তাকেই সবচেয়ে ভয় পায়। জাতিগত আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত হতে পারে না বলে বাঙালি মুসলমান শিল্প-সাহিত্যে চর্বিতচর্বন আর অনুকরণপ্রিয়তাকেই প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের সৃষ্টিশীলতার দৈন্যও প্রকট। সে 'বিমূর্তভাবে চিন্তা করতেই জানে না এবং জানে না এই কথাটি ঢেকে রাখার যাবতীয় প্রয়াসকে তার কৃষ্টি-কালচার বলে পরিচিত করতে কুণ্ঠিত হয় না' (ছফা, ২০০৮ক:১০৮)। এসব কারণে এ যাবত বাঙালি মুসলমান পরিণত সমাজকাঠামো সৃষ্টি করতে পারেনি। মানসিক ভীতি ও সংস্কারাচ্ছন্নতায় ভর করে একটি অনুন্নত আদিম কাঠামোর মধ্যেই এই সমাজ চালিত হচ্ছে। বাঙালি মুসলমানের নির্জ্ঞান মনোজগতে এই অধস্তন সামাজিক অবস্থাকেই সুদীর্ঘকালের ঐতিহাসিক পদ্ধতি হিসেবে ছফা উল্লেখ করেছেন। তবে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সুস্পষ্ট পথরেখা তিনি চিহ্নিত করতে পারেননি। যদিও তাঁর ধারণা 'বাঙালি মুসলমানের মনের ধরন-ধারণ এবং প্রবণতাগুলো নির্মোহভাবে জানার চেষ্টা করলে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়ত পাওয়াও যেতে পারে' (ছফা, ২০০৮ক:১০৮)। জাতিগত আকাঙ্ক্ষার পথ ধরে তার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেই চেষ্টাই ছফা করেছেন। সুদূরাতীতকাল থেকে বাংলার নির্যাতিত-শোষিত জনগোষ্ঠী সামাজিক মুক্তির আশা ও অন্বেষায় ক্রমাগত সংগ্রাম করে দীর্ঘ ঐতিহাসিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মুক্তির জাতিগত আকাঙ্ক্ষায় উপনীত হয়েছিল। সেই জনগোষ্ঠী বাঙালি না মুসলমান, বাংলার না বাংলাদেশের তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাদের সুদীর্ঘ সংগ্রাম। ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরায় তারা বাঙালি মুসলমান বলেই ছফা সেই সমাজকে আপন মনে করেন। ছফা-বর্ণিত বাঙালি মুসলমান সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে সলিমুল্লাহ খানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য–

> বস্তুত আহমদ ছফাই তখনকার একমাত্র বাঙালি মুসলমান লেখক যিনি বাঙালি মুসলমানের সংজ্ঞা অতিক্রমের সাধনা করেছিলেন। বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমানের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে–এমন কথা আহমদ ছফা নানা জায়গায় বলেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি টের পেয়েছেন, এ রাষ্ট্র তাঁকে প্রতারিতও করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র বাঙালিরও নয়, মুসলমানেরও নয়। এ রাষ্ট্র– আহমদ ছফার বাকরীতি ধার করে বলা যায়– একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির ফল।
> (সলিমুল্লাহ, ২০১০:৪৬)

পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজের গভীরে প্রথম সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোড়ন তুলেছিল ওয়াহাবি এবং ফরায়েজি আন্দোলন।[২৪] তন্মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর বংশীয় উত্তসুরীদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ফরায়েজি আন্দোলন প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের আনাচে-কানাচে মুসলমানদেরকে মূল ইসলামী অনুশাসন পালনে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে এক বিশাল সচেতন জনগোষ্ঠী সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। মূলত ধর্ম-সংস্কার

আন্দোলন হিসেবে কর্মকাণ্ড শুরু করলেও ফরায়েজি আন্দোলন কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজ শাসন, জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে তৎপরতা চালাতে থাকে। ফলে ধর্মীয় সংস্কারের লক্ষ্যে শুরু হলেও সামাজিক আন্দোলন হিসেবেই এগুলো দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ছফার বিশ্লেষণ থেকে প্রায় এক শতাব্দী কালপরিসরের বাঙালি মুসলমান সমাজ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়–

> বাঙালি মুসলমান বলতে যাঁদের বোঝায়, তাঁরা মাত্র দুটি আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিলেন এবং অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার একটি তিতুমীরের অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত ওহাবি আন্দোলন। অন্যটি হাজি দুদুমিয়ার ফারায়েজি আন্দোলন। এই দুটি আন্দোলনেই বাঙালি মুসলমানেরা মনে-প্রাণে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু উঁচু শ্রেণির মুসলমানেরা এই আন্দোলন সমর্থন করেছেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসলেও কৃষক জনগণই ছিলেন এই আন্দোলন দুটির হোতা। আধুনিক কোন রাষ্ট্র কিংবা সমাজদর্শন এই আন্দোলন দুটিকে চালনা করেনি। ধর্মই ছিল একমাত্র চালিকাশক্তি। সে সময়ে বাংলাদেশে আধুনিক রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্পর্কিত বোধের উন্মেষ ঘটেনি বললেই চলে। সমাজের নিচুতলার কৃষক জনগণকে সংগঠিত করার জন্য ধর্মই ছিল একমাত্র কার্যকর শক্তি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই আন্দোলন দুটির ভূমিকা প্রগতিশীল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাতগামী ছিল, তাতেও কোন সংশয় নেই। এই আন্দোলন দুটি ছাড়া অন্য প্রায় সমস্ত আন্দোলন হয়ত উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, নয়তো হিন্দুসমাজের উদ্যোগ এবং কর্মপ্রয়াসের সম্প্রসারণ হিসেবে মুসলমান সমাজে ব্যাপ্তিলাভ করেছে। সমাজের মৌল ধারাটিকে কোনকিছুই প্রভাবিত করেনি। তার ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের মনটিতে একটু রং-টং লাগলেও কোন রূপান্তর বা পরিবর্তন হয়নি। (ছফা, ২০০৮ক:১০৬-১০৭)

প্রায় অচলায়তনের মতো একটি সমাজে একটু রং-টং লাগিয়ে রূপান্তর ঘটানোর মতো উপাদান পাওয়া গেল দুটি– একটি ভাষা, অপরটি ধর্ম। মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের উন্মেষলগ্নে যা ছিল অপ্রকাশিত বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত তাই প্রবলতর রূপে বাঙালি মুসলমানের স্বাজাত্যবোধকে জাগিয়ে দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু এসব ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন মুসলমানদের আত্মোন্নয়নের পথে দীর্ঘমেয়াদী পশ্চাৎপদতা তৈরি করে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত হিন্দু-মধ্যশ্রেণির সামাজিক জাগরণের কালেও বাঙালি মুসলমানদের আত্মবিবরকামী অবস্থার অবসান হয়নি। আর্থিক বিপর্যয়, মানসিক বিমূঢ়তা ও সিপাহী বিদ্রোহসহ ওয়াহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনে ব্যর্থতার হতাশা কাটিয়ে উঠে মুসলমানদেরকে মৃত্তিকালগ্ন বাস্তবচিন্তায় মনোযোগী হতে সময় লাগে প্রায় পঞ্চাশ বছর। ফলে এ শতাব্দীর শেষদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মাতে থাকে বাঙালি মুসলমান সমাজে এবং বিশ শতকের গোড়া থেকেই শিক্ষিত মুসলমানগণ কোম্পানির চাকরি-ব্যবসাতে, সরকারের নানা পদে নিজেদেরকে প্রার্থী হিসেবে উপস্থিত করে। এই সচেতনতা থেকেই বাঙালি মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম বলে মনে করেন আহমদ শরীফ। কারণ–

> আগে সচেতন ছিল না বলে জ্বালা অনুভব করেনি। ইংরেজি শিক্ষার বদৌলতে ব্রিটিশ শাসনে তারা তাদের দৈন্য সম্বন্ধে ভুল তথ্যের ও তত্ত্বের প্ররোচনায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হল মাত্র। এবং এতকালের প্রতিবেশী ব্রিটিশ-কৃপাপুষ্ট হিন্দুকেই তাদের দুঃখ-বঞ্চনা-শোষণ-নিঃস্বতার জন্যে দায়ী বলে জানল, বুঝল এবং মানল। সেদিন থেকেই হিন্দু হল কাঙ্ক্ষী মুসলিমদের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, পয়লা নম্বরের শত্রু। (শরীফ, ২০০১:১৬৫)

এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ক্ষোভ উদ্গীরণের পেছনে প্রকৃত তথ্যের অভাব এবং শ্রেণিভেদাভেদজাত বাস্তবজ্ঞানের অভাবকেও দায়ি করা যায় সমানভাবে। কারণ মুসলমানগণ নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য যেভাবে আত্মসমালোচনার পরিবর্তে ঈমানের শৈথিল্য, মুঘল-রাজত্বের অবসান, বর্ণহিন্দুদের প্রতি ইংরেজদের পক্ষপাতিত্ব, পূর্ববৈরিতাবশত হিন্দুদের মুসলমানদলন, অর্থ-বিত্ত-শিক্ষার সম্প্রসারণে মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার প্রয়াস ইত্যাদি কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল, হিন্দু সম্প্রদায়ও একইভাবে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য প্রতিপক্ষ মুসলমানদেরকেই দায়ী করেছিল।
এভাবে মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও এই সমাজের মানবিক উদারতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সাংস্কৃতিক পরিগ্রহণ, সমন্বয়বাদিতা ক্রমশ কমতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাঙালি মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে শুরু করে

স্বাধীনতার দাবি পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক দাবি-দাওয়া হিন্দু-মুসলমান জাতিভেদের অমোচনীয় বিভাজনরেখায় বিভক্ত হয়ে যায়। ভাষা ও ধর্মের পথ ধরে যে বাঙালি মুসলমান ষোড়শ শতক[২৫] থেকেই সংগ্রামমুখর ও স্বাতন্ত্র্যআকাঙ্ক্ষী, ১৯৪৭ সালে তারাই রাজনৈতিকভাবে বিলীন হলো দ্বিজাতিতত্ত্বের মোহন পঙ্কে, ঘোষিতভাবে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান মেনে নেয়ার মাধ্যমে।

৪.১.২.

কিন্তু তারপরও ইতিহাসের নির্যাতিত গোষ্ঠী বাঙালি মুসলমানের নিজস্ব সমাজগঠনের আকাঙ্ক্ষা যে পুরোপুরি অবসিত হয়নি সেই স্ফূলিঙ্গ জ্বলে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। যে ধর্মীয় মোড়কে বাঙালি মুসলমান তার স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়েছিল তা পুনরুদ্ধারের লড়াই শুরু হয় ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমানের চিত্তবৃত্তিতে চাঞ্চল্য জাগানো ভাষাবোধ, আবারও ভাষার প্রণোদনাতেই অস্তিত্বের শিকড় খুঁজে পেল। কিন্তু এ সময়ের বাঙালি মুসলমান সমাজ অনেক বিবর্তিত, স্বাতন্ত্র্যসন্ধানী ও জটিল। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার সঙ্গে সংস্কৃতি ও সমাজকাঠামোর ব্যবধান যে অসংলগ্ন, বিষম ও বিভঙ্গ সমাজ বাস্তবতার জন্ম দিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়, আহমদ ছফার 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রবন্ধে। ভাষা-আন্দোলন-পরবর্তী সামরিক শাসনকালে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে যে স্থবিরতা, উদ্যমহীনতা চলছিল ছফা তার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেছেন। সর্বত্র শিক্ষক-সাংবাদিক-লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী মধ্যে সুবিধাভোগী আত্মবিক্রিত দায়িত্বজ্ঞানহীনদের প্রতাপ ও প্রভাব সমাজে অনুকরণীয় আদর্শ নিঃশেষিত করে ফেলেছিল। সাধারণ মানুষের অবস্থা নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছলেও একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী-শিক্ষক-সাংবাদিক সরকারি সুযোগ-সুবিধার লোভে, সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব এড়িয়ে আত্মবিক্রয় করলেন; জনগণের ওপর শোষণের ব্যবস্থাটি চেপে বসতে সহায়তা করলেন। এর ফলে যে সামাজিক ক্ষতি সংঘটিত হল ছফা তার বর্ণনা দিয়েছেন–

> লেখক সংঘ, বিএনআর, রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে কতিপয় ব্যক্তি যে শুধু নষ্ট হয়েছে তা নয়– এসবের মাধ্যমে আইয়ুব খান একটি যুগের বিবেককে হত্যা করেছে, চিন্তাকে কলুষিত করেছে। তরুণ সমাজের সামনে শ্রদ্ধা করার মত কোন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিল না– এখনো নেই। কাউকে শ্রদ্ধা করতে না পারা যে কত বড় অভিশাপ একমাত্র ভুক্তভোগীই উপলব্ধি করতে পারেন। (ছফা, ২০০৮চ:২০৪)

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবিতার স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে সামাজিক অস্তিত্বের শিকড়ে পৌঁছাতে চেয়েছেন ছফা। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, চিন্তা ও কর্ম, বিবেক ও ব্যস্ততা মধ্যে যে দূরত্ব তা সমাজকে বিপন্ন করে তুলেছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশের সমাজ একটি দোলাচলের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেও এই শ্রেণির বুদ্ধিজীবী-লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিরাপদ অবস্থান থেকে অবলোকন করেছেন; ক্ষেত্র বিশেষে সমর্থন করেছেন কিন্তু করেছেন ঠিক উল্টো কাজ। আবার এরাই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সভা-সমিতিতে উৎসবে-অনুষ্ঠানে চতুর্মুখে স্বাধীনতা, সাংবিধানিক চারস্তম্ভের জন্য সর্বোচ্চ স্বরে হাঁকডাক দিয়েছেন। স্বাধীনতার আগ থেকেই চিহ্নিত এই মানুষগুলো সমাজ-সংস্কৃতির পুরোধা হয়েই বসবাস করেছে। ব্যক্তির অবক্ষয়ের সামাজিক বিস্তৃতি আরও ভয়াবহ। একটি ব্যাপক জনযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির মহত্তম কীর্তি বাংলাদেশ অর্জনের পরও এই শ্রেণির সামাজিক অভ্যাস ও অবস্থানের কোনো বদল হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর কালে রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও এক অসঙ্গত পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল সর্বত্র। উন্নত সংস্কৃতি ও উন্নত সমাজসৃজনের জন্য যে শ্রেণিকে নেতৃত্ব দিতে হয়, ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সেই শ্রেণির চাটুকারিতা, সুবিধাবাদিতা, মেধাশূন্যতা ও বাগাড়ম্বরসর্বস্বতা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রেনেসাঁ-সম্ভাবিত সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্বলতায় পরিণত হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যচেতনা স্বাধীনতা-পরবর্তী সমাজবাস্তবতায় সংকটের মুখে পতিত হয়। এসময় বুদ্ধিজীবীদের ব্যর্থতায় আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে বাঙালির সর্বাত্মক ঐক্য যথার্থতা লাভ করেনি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াসকে আরো অনিশ্চিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছিল একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী। যুদ্ধোত্তর সমাজের নানা অপূর্ণতা, উত্তেজনা, অসুবিধা এবং ভুল বুঝাবুঝির মধ্যেও নতুন সমাজগঠনের সম্ভাবনাটি অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিন্তু সমাজে জ্ঞান ও নৈতিকতার চর্চার অভাবে এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় সুবিধাবাদের প্রসার ঘটেছে, 'রাবারস্ট্যাম্প মার্কা' বুদ্ধিজীবীদের আস্ফালনে দেশপ্রেমিক লেখক-সাংবাদিক সামাজিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন– ফলে কিছুদিন পরই দেখা গেল 'আমাদের সমাজের যে নতুনতর মানবসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, যে নতুনতর মূল্যবোধের অঙ্কুরণ করার কথা এবং দৃষ্টিতে নতুন ভঙ্গি আসার কথা, তার লক্ষণগুলো ক্রমশ সুদূরে বিলীয়মান হচ্ছে। চারদিকে চিন্তাশূন্যতার নৈরাজ্য এবং চাটুকারিতার চক-চকানি। এরই মধ্যে আমাদের সৃজনশীলতা রেশমের ফাঁসে আটকা পড়েছে' (ছফা, ২০০৮চ:২০৯)। ছফার বর্ণনকালীন সমাজ আত্মভুক বুদ্ধিজীবিতা, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, মানসিক দাসত্ব, সুবিধাবাদী মধ্যশ্রেণির বর্ণচোরা চরিত্র এবং সাম্প্রদায়িকতার শেকড়গাড়া বৃক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আহমদ ছফা বারবার নতুন আশাবাদের কথা বলেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে যে অসম্পূর্ণ জাগরণের চিত্র পাওয়া যায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম হয়ে উঠতে পারত সব ধর্ম-বর্ণ-পেশা ও সাংস্কৃতিক বিভেদ নির্বিশেষে।

সামাজিক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলাকে বিপ্লবের পশ্চাৎভূমি গণ্য করে এর মধ্যেই একটি সুন্দর সংস্কৃতিবান সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব। কারণ সংকট ও বিপ্লবের দ্বান্দ্বিকতার পথ ধরে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতায় দেশগঠনের উত্তুঙ্গ আবেগ ও উজ্জীবিত স্বপ্ন হৃদয়ে ধারণ করে আরও অনেক তারুণ্য-উদ্দীপ্ত দেশপ্রেমিক নাগরিকের মতো আহমদ ছফাও শোষণমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন মানবিক সমাজের আশায় বুক বেঁধেছিলেন। তাই তাঁর সমাজভাবনা কেন্দ্রীভূত ছিল সমাজবিপ্লবের লক্ষণ ও মূল্যবোধসম্পন্ন একটি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদার, মানবতাবাদী সমাজ বিনির্মাণে; পরবর্তীকালে একই লক্ষ্য কিছুটা পরিমার্জিত হয়, কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উপযোগী একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা যাচাইয়ের মাধ্যমে।

৪.১.৩

বাঙালির ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের অসম্পূর্ণতাকে[২৬] ব্যাপ্তি এবং গভীরতায় আরও পরিপূর্ণ করে তোলার যে সম্ভাবনা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল তাঁকে বৃহত্তর রেনেসাঁর সাথে তুলনা করা যায়। পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে একটা নতুন সমাজ জন্ম নেয়ার মধ্য দিয়ে রেনেসাঁর আভাস সূচিত হয়েছিল। নতুন-পুরাতনের সংঘাতের ফলে অনেকগুলো সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, শুধু প্রাদেশিকতা-স্বাদেশিকতা বা আবহমান-বর্তমানের সংঘাত এটি ছিল না, ছিল জাতীয়-আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আত্মপরিচয় বিমুক্ত করার নতুন সংগ্রামও; ছফা বর্ণনায় সেই সম্ভাবনার চিত্র পাওয়া যায়–

> আবহমানকালের ঐতিহ্যভিত্তিক স্থবির প্রায় বাঙালি সমাজ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আন্তর্জাতিকতা অভিমুখী বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির সংঘাতটাও বড় বেশি মুখিয়ে উঠেছে। শেষোক্ত সংঘাতটাকে বাঙালি জনগণের মুক্তি-সংগ্রামই সুনির্দিষ্ট আকার দান করেছে এবং সঞ্চারিত করেছে তাতে বেগ আর আবেগ। নিজেদের কিছুকে অস্বীকার না করে বিশ্বের যা কিছু মহীয়ান, গরীয়ান তা গ্রহণ করা এবং একই সঙ্গে নিজেদের যা কিছু অস্বাস্থ্যকর এবং জীবনবিরোধী মনে হবে, বর্জন করার মধ্যেই আমাদের জাতীয় রেনেসাঁর ভবিষ্যৎ সংগুপ্ত রয়েছে।
>
> রেনেসাঁর মূলকথা মানুষের জীবন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের নতুন মূল্যায়ন এবং বাস্তবসম্মত উপায়ে কি ব্যক্তিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে স্বীকার করে নেয়া। এই কাজটিতেই প্রয়োজন জ্ঞানের। যখনই আমাদের সমাজে স্বীকৃতি পাবে জ্ঞানই শক্তি, তখনই আমাদের দেশে সম্ভাবিত হয়ে উঠবে একটি রেনেসাঁ। সমাজের মুখ্য অংশে জ্ঞানের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বশর্ত একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক পদ্ধতি যা ব্যক্তির অন্তজীবনের মহিমা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের অনন্যতা স্বীকার করবে। একই সঙ্গে সামাজিক

জীবনের দাবির প্রতি সচেতন থাকবে। এই ধরনের একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি সৃষ্টি করার কাজ সহজসাধ্য নয়– বিশেষত আমাদের এই দেশে। তার কারণ, আমাদের মানুষ অশিক্ষিত এবং কুশিক্ষিত, কুসংস্কারে তাদের চিন্তা-চেতনা আবদ্ধ। (ছফা, ২০০৮চ:২৩৭)

অতএব 'সামাজিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত সমাজের মুখ্য অংশে জ্ঞানের শাসন প্রতিষ্ঠা করা'; মানুষের চিত্তবৃত্তির উন্নতি, চিন্তাধারার পরিবর্তন তথা জ্ঞানের বিকাশ ছাড়া একটা সমাজ ভেঙে আরেকটা সমাজ গড়তে যাওয়া 'জবরদস্তির' সমান যা মোটেই কাম্য নয় (ছফা ২০০৮চ:২৩৭)। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে' শীর্ষক প্রবন্ধে সমাজ পরিবর্তনের সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন ছফা। তাঁর মতে, শ্রেণি-বিভক্ত সমাজ অজ্ঞানতার উপরই দাঁড়িয়ে থাকে পুরোপুরি। কারণ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুখ্য অংশ, যাঁরা সকল উৎপাদনের সাথে জড়িত, তারা ধরেই নেয় সংখ্যাল্প কিছু মানুষ তাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকবে, যা চূড়ান্ত অজ্ঞানতা। সমাজে জ্ঞান বিস্তারই পারে এই কৃত্রিমতা ও মিথ্যাকে প্রতিহত করতে, ছফা লিখেছেন–

জ্ঞানের প্রথম কাজ হল এই সমাজ ব্যবস্থা যে মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা দেখিয়ে দেয়া। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী, জ্ঞানকে মানবসমাজের মূল্যবান সম্পদ মনে করেন তাঁদের কাজ হওয়া উচিত অজ্ঞানতার উপর যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তা ভাঙ্গার কাজে অংশগ্রহণ করা। কেননা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্যাপক হারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চল হলেও সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান শ্রমিক-কৃষককে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করে। শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকরা শোষক শ্রেণির সেবাদাসে পরিণত হতে বাধ্য হয়। (ছফা, ২০০৮খ:২০০,২০১)

মননজগতের এই বিপ্লবকে ছফা নাম দিয়েছেন 'মানসবিপ্লব', প্রতিটি রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে একটি মানস-বিপ্লবও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা না হলে সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে থেকে যায় অসম্পূর্ণতা।

একটি জাতির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্পর্কসমূহের যে পুনর্গঠন সম্ভব হয় তা ইতিহাসের এক দুর্লভ সুযোগ; কারণ সমগ্র জাতিকে পরিণামমুখী সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধকরণ এবং তা থেকে বিজয়ের গৌরব ছিনিয়ে আনার কৃতিত্ব গলায় পরতে পেরেছে খুব কম জাতি। এই বিজয় নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ ও রাষ্ট্রাদর্শের বিজয়, বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্য–ভাষা-জীবনযাপন সম্বলিত সমাজ প্রতিষ্ঠার বিজয়। ছফা লিখেছেন–

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জনযুদ্ধের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক আদর্শের বদলে আরেকটি রাজনৈতিক আদর্শ, এক ধরনের রাষ্ট্রের পরিবর্তে আরেক ধরনের রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রভাব আমাদের সংস্কৃতিতে আসতে বাধ্য। পাকিস্তানি সংস্কৃতির স্থলে নতুন প্রাণবন্ত এবং সৃজনশীল বাঙালি সংস্কৃতির মহীরুহ শতশত মুকুল মেলবে। এটা প্রত্যাশা করা একটুও অস্বাভাবিক নয়। যদি তা বাস্তবে পরিণত না হয়, তাহলে আমরা কোনোদিন মনে-প্রাণে স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা তুলতে পারব না। একটি যুদ্ধোত্তর সমাজের নানা অসুবিধা, অপূর্ণতা, উত্তেজনা এবং ভুল বুঝাবুঝির মধ্যেও নতুন সংস্কৃতির বুনিয়াদটি ভেতর থেকে সৃজিত হচ্ছে কিনা তার প্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। (ছফা, ২০০৮চ:২০৮-৯)

বাঙালি জাতির সামনে সুযোগ এসেছিল তাঁর পরাধীনতা ও ঔপনিবেশিকতার সমস্ত চিহ্ন জাতির পরিচয়-স্বাতন্ত্র্য থেকে মুছে ফেলার। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধ-সম্পন্ন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাগ্রে। সবক্ষেত্রেই স্বাধীন দেশের শক্ত-সমর্থ নীতি ও আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন আশা করা হয়েছিল। প্রয়োজন ছিল রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে নতুন সেতুবন্ধ রচনা করে সমাজকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা। আহমদ ছফা একটি নতুন সমাজে নতুন আকাঙ্ক্ষায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শের ভিত্তিতে সমাজের সকল ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবীচেতনার অঙ্কুরোদগম ও প্রসার আশা করেছিলেন। তা না হলে পুরনো ধ্যান-ধারণাকে সমূলে উৎপাটন সম্ভব নয়। আবার সর্বত্র বিরাজমান যে ওলট-পালট অবস্থা, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্যের ব্যাপ্তি তাকেই নতুন সমাজ সৃজনের পূর্বশর্ত বা যর্থার্থ সময় বলে ধরে নেয়া যায়। এই নৈরাজ্য ও স্থবিরতাকে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে আলোকিত আঘাত' করে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব সূচিত করার প্রয়োজনীয়তা ও আশাবাদের কথা উচ্চারণ করেছিলেন ছফা –

আমাদের সামাজিক এই যূথবদ্ধ স্থবিরতাকে নানান দিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে আলোকিত আঘাত করতে হবে। সে পথেই আমাদের সমাজে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব সূচিত হবে। উন্নততর সাংস্কৃতিক বিপ্লব উন্নততর রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্ম দেবে। সুন্দর সমাজই রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রাণ কথা। একটা পর্যায়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিক কর্মীদের সাংস্কৃতিক কর্মীর ভূমিকা পালন করতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীদের রাজনীতিসচেতন হতে হবে। সমাজকে সুন্দর করা রাজনীতি এবং সংস্কৃতির যৌথ দায়িত্ব। (ছফা, ২০০৮চ:২১৯)

শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-জ্ঞানচর্চা সর্বত্রই বিপ্লবী কর্মীগোষ্ঠী গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, কারণ–

আধুনিক চিন্তাসমৃদ্ধ বিরাট কোন পুরুষের অভিভাবকত্বের অভাবে বাঙালি সমাজের ভেতর থেকে ধর্মীয় ডগমা বা বদ্ধমত এবং সামাজিক আচারের জঞ্জাল ভেদ করে কোন বিরাট মানুষ প্রবল প্রাণশক্তির তোড়ে মাথা তুলতে পারেনি। তার ফল দাঁড়িয়েছে ধর্মীয় বদ্ধমত এবং সামাজিক সংস্কারের কোলঘেঁষা অন্ধকার সামাজিকভাবে কাটিয়ে ওঠা এখনো সম্ভবপর হয়নি। (ছফা, ২০০৮চ:২২০)

নতুন সমাজ সৃজনের জন্য নতুন চিন্তাভাবনা ভাষার গায়েও ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। কারণ 'সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো ভাষার অস্তিত্ব নেই, এই মানুষের সমাজ যখন সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য সংগ্রাম করে তখনই ভাষাকেও হাতিয়ারের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়' (ছফা, ২০০৮খ:১৯৬)। বস্তুত আহমদ ছফা মনে করেন, সকল স্তরে, সর্বত্র বাংলাভাষা ব্যবহারের আন্দোলন থেকেই কাঙ্ক্ষিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব ত্বরান্বিত হতে পারে। এজন্য সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার তথা ভাষাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথাও ভেবেছিলেন আহমদ ছফা। 'বাংলাভাষা: রাজনীতির আলোকে' প্রবন্ধে ভাষার অমিত শক্তি ব্যবহার করে এই পরিবর্তনের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন ছফা–

প্রকৃত গণমুখী শিক্ষা, বাংলাভাষার মাধ্যমে সকল স্তরে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান, সকল সরকারি বেসরকারি কর্মে মাতৃভাষার ব্যবহারের জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন অপরিহার্য। সেই আন্দোলনের লক্ষ্য হবে সকল শোষিত এবং নির্যাতিত মানুষকে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান, অতীতের ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ বাংলাদেশের মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং বিদেশি শোষকদের স্থলে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদী শক্তির সহায়তায় স্বদেশি শোষকরা শাসন করে যাচ্ছেন, সেই শ্রেণীভিত্তিক সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলা এবং শোষিত মানুষদের সাংস্কৃতিক চেতনার মান উন্নত করে তাদের সামনে একটি সমৃদ্ধ সমাজের ছবি তুলে ধরা; যাতে করে এই পচা ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলার জন্য শরীরে মনে পূর্ণ প্রস্তুতি তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন। (ছফা, ২০০৮খ:১৯৫)

ধর্মীয় বদ্ধমত ও সংস্কারকে সমাজের অগ্রগতির পথ থেকে বিতাড়িত করতে বাঙালি মুসলমান লেখককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ছফা। এজন্য মূঢ়তা, স্থূল অন্ধ বিশ্বাস, পুরনো মূল্যবোধ, অসার রীতি-নীতি-সংস্কারকে সজ্ঞান মেধাবী চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো মহত্তর চিন্তা করতে পারে এমন লেখক প্রয়োজন। রাজনীতিকেরা জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে রাজনীতিই সমাজের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি নির্ধারণের নিয়ামক কিন্তু সাহিত্যিক-লেখক-শিল্পী এর সাথে সমাজের মেলবন্ধন ঘটাবার দায়িত্ব কতখানি পালন করছেন তা বিবেচ্য। বিপ্লবী সাহিত্য গড়ে তোলার জন্য এই বিবেচনা জরুরি। কারণ 'মনুষ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং মানুষের প্রতি মমতাহীন কবি, সাহিত্যিক কিংবা সমাজসংস্কারক কারো কোন দাম নেই' (ছফা, ২০০৮চ:২২০)। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তি সর্বমানবতাবাদ ও মনুষ্যত্ববোধকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই সামাজিক সাম্য ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। ছফা লিখেছেন–

সমাজতন্ত্রের মূলকথা মানুষেকে ভেতর থেকে আত্মশক্তিতে আস্থাশীল করা, সৃজনীশক্তিতে এবং সহযোগিতায় বিশ্বাস করা। মানুষের সৃষ্ট সমস্ত কৃত্রিম বিভেদকে গুঁড়িয়ে ফেলে মানুষে মানুষে মিলনের পথ প্রশস্ত করা; সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মানুষী সত্তা যা সভ্যতার প্রাণবস্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন এবং আপন ক্ষেত্রে স্থিত করা। (ছফা, ২০০৮চ:২৩০)

তবে ছফা মনে করেন, ধর্মীয় জাড্য ভেঙে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও ভাবতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের কথা; ভাবতে হবে তাদের সংস্কারান্ধতার কথা, ধর্মীয় অনাচার ও বদ্ধমতের বিরুদ্ধে তাঁদের অসহায়তার কথা। এমনকি বর্ণহিন্দু বা সাঁওতাল, মগ, গারো, হাজংসহ অন্যান্য ধর্মবর্ণের মানুষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করে সম্প্রদায়গত বদ্ধমতের আবরণ ফেলে মানুষ হিসেবে সকল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো সমাজ তৈরি করতে হবে। যা কিছু মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আবদ্ধ রাখে তার বিরুদ্ধে না দাঁড়ানো কপটতা। বিপ্লবে কপটতার স্থান নেই। মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয়কে চিহ্নিত করার সর্বাত্মক প্রয়াসই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল কথা। কারণ–

> মানুষের মন দিয়েই মনের পরিবর্তন সম্ভব। বাহ্যিক সমস্ত প্রচেষ্টা মনের জাগরণ, চৈতন্যের উদ্বোধন ছাড়া ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেউ কেউ বলেন, ধন বন্টনের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে ওসব থাকবে না। কিন্তু সাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তো সর্বপ্রথম সংস্কারমুক্তি প্রয়োজন। ধর্মীয় সংস্কার এমন জিনিস যা সোজা জিনিসকে বাঁকা দেখতে বাধ্য করে। এই বাঁকা দেখতে বাধ্য হয়েছিল বলেই ভারত দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে। (ছফা, ২০০৮চ:২২১,২২২)

স্বাধীনতা-উত্তর আহমদ ছফার চেতনাজগতে সমাজতন্ত্র কখনও সুদূরপরাহত আবার কখনও উজ্জ্বল সম্ভাবনায় আবির্ভূত বলে মনে হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি আর হতাশাকে পুঁজি করলে কিংবা মানুষের মর্যাদাকে অনিশ্চিত-অবহেলায়, লাঞ্ছনায়, নিগ্রহে অপমানিত করলে জাতি হিসেবে আমাদের কোনো সম্মানই থাকবে না বিশ্ববাসীর কাছে তাই স্বাধীন দেশের মানুষের সম্মান আদায়ের জন্যই নতুন সমাজবাস্তবতায় স্বনির্ভরতা অর্জনই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন ছফা। এর সাথে বুদ্ধিজীবীদের দায় জাতির উন্নত পরিচয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কর্তব্য পালন–

> আমাদের দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য হওয়া উচিত আমদের জনগণের মধ্যে ইতিহাসের এই গতিধারাটির বোধ চাড়িয়ে দেয়া এবং যে সকল সংস্কার বিশ্বাস ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথে বাধা রচনা করে, সে সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করবে কি করে, তার বিষয়ে ওয়াকেফহাল করা। মানুষের বোধকে উন্নত করা, রুচিকে পরিশীলিত করা, সংগ্রামী মানবতার প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাশীল এবং কায়িক, মানসিক শ্রমের প্রতি যত্নশীল করে তোলাই এ পর্যায়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাজ। (ছফা, ২০০৮চ:২৩৫)

কিন্তু এটাও সত্য যে, বুদ্ধিজীবীরা যে জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষায়-মেধায় লড়াই করে যাবেন সেই জ্ঞানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু রাজনৈতিক পদ্ধতি। বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই বিভিন্ন দেশের আনুগত্য ও মুগ্ধতা নিয়ে নিজভূমে পরবাসীর মতো জীবনযাপন করেন। মূলত সে-সব দেশের জ্ঞানচর্চার পদ্ধতি ও আদর্শের প্রতি অনেক বুদ্ধিজীবীরই রয়েছে দুর্বলতা, মানুষে-মানুষে সমতার আদর্শ বাস্তবায়নে অনেক দেশের পদ্ধতিগত সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়েও অনেক বুদ্ধিজীবী নিজস্ব লক্ষ্য স্থির করেছেন। কিন্তু দেশ-বহির্ভূত মানসিক আনুগত্যের কারণে দেশের বিপুল ক্ষতির বিষয়ে ছফা সতর্ক করেছেন। মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলন যেমন 'দেশবহির্ভূত এবং না-ধর্মী' প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সমাজতান্ত্রিক দেশের রাজধানীর দিকে মোহাবিষ্টতাও অনাসৃষ্টি। বুদ্ধিজীবীদের এই বিদেশমুখিতা বাংলাদেশের সমাজপরিবর্তনে কাঙ্ক্ষিত গতি আনার জন্য ক্ষতিকর। একে পলায়নী মনোবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন ছফা, যেখান থেকে রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে লেজুড়বৃত্তির জন্ম হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি একরকম অতীতচারিতা; সমাজের জন্য পশ্চাৎপদতা।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজে যে বিপুল অসঙ্গতি ও নৈরাজ্যের বিবরণ ছফা দিয়েছেন তার অন্তরালে একটি সূর্যকরোজ্জ্বল সমাজবিপ্লবের আভাসও পাওয়া যায়। সমাজবিপ্লবের জন্য মননশীলতার যে পরিবর্তন প্রয়োজন তা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মানসবিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত হয়, রাজনৈতিক বিপ্লব এসবকিছুকে সম্ভাব্য করে তোলে। সামাজিক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেই একটি সুন্দর সংস্কৃতিবান সমাজগঠনের বীজ অঙ্কুরিত হয়। তাই আত্মভুক বুদ্ধিজীবিতা, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, মানসিক দাসত্ব, সুবিধাবাদী মধ্যশ্রেণির বর্ণচোরা চরিত্র এবং

সাম্প্রদায়িকতার শেকড়গাড়া শক্তি সত্ত্বেও আহমদ ছফা বারবার আশাবাদের কথা বলেছেন। সমাজে একটি নতুন রূপরেখার আভাস কোন ভিত্তিতে উদ্ভাসিত হবে অথবা এর বাস্তবতা কোথায় সে সম্পর্কে ছফার অনুধাবন দেশাত্মবোধের গভীরতা-উদ্ভূত। তিনি দেশের জন্য সেই প্রাণভরা ভালবাসা এবং উদ্যম দেখেছেন সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে; যাঁরা ছফা-মানসের অপরাজেয় মহানায়ক। অনির্দেশ্য কপট রাজনীতি, ন্যুব্জ ও পরাঙ্মুখ শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজ ও রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শবিহীন সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপকতা দেখেও ছফা শ্রেয়োচেতনায় উত্তরণে উদ্বুদ্ধ করেন আমাদেরকে –

> [বিদ্রোহের জন্য] প্রয়োজন সুন্দরতম ধৈর্য, মহত্তম সাহস, তীক্ষ্মতম মেধা এবং প্রচণ্ড কূলছাপানো ভালবাসা, যার স্পর্শে আমাদের জনগণের কুঁকড়ে যাওয়া মানসিক প্রত্যঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগবে এবং সাহস ফণা মেলবে। (ছফা, ২০০৮চ:২২৭)

সমাজ থেকেই এসবের প্রাণবীজ আহরিত হয়। প্রাচীন চর্যাপদের কাল থেকেই হাঁড়িতে ভাত নেই যে জাতির, হাজার বছর ধরে মানুষ আর প্রকৃতির লড়াইয়ে দুঃখ-দুর্দশা, দৈব-দুর্দৈব, দুর্বিপাক-মড়ক-মহামারীতে বারবার পতিত হয়ে যে জাতি পশুর চেয়েও নিম্নমানের জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে, তারপরও এই গঙ্গা-যমুনা-আত্রাই অববাহিকার মানুষের চিরকালীন সংগ্রামী চরিত্রই তাদেরকে ইতিহাসে অবিনাশী প্রাণশক্তির জাতিত্বে চিহ্নিত করেছে। একটি নতুন সমাজগঠনের জন্য এরকম সংগ্রামী চরিত্রের মানুষ অমূল্য সম্পদ।

আহমদ ছফার বিপ্লবী সমাজভাবনায় প্রথম স্তরে বিপ্লবী কর্মী তৈরির জন্য প্রয়োজন সমাজের মুখ্য অংশে জ্ঞানের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। একটি উন্নত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই বিপ্লবী কর্মীরাই একটি মানসবিপ্লব সম্পন্ন করবে বলে মনে করেন ছফা। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একটি বিপ্লবী সমাজ গঠিত হবে যে সমাজ সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত হবে সামাজিক সম্পর্কগুলোকে নতুন চেতনায় নতুন আলোকে পুনর্নির্মাণের জন্য। এই পরিবর্তন সূচিত করতে এগিয়ে আসবে একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তি। রাজনৈতিক বিপ্লবই চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে এই তাত্ত্বিক ছকের বাইরে গিয়ে ইতিহাসের নির্যাতিত বাঙালি মুসলমানের সমাজ নিয়েও আহমদ ছফার ভিন্ন পর্যবেক্ষণ ছিল। ঔপনিবেশিক সমাজ ভেঙে সেখানে আন্তর্জাতিকতার সুর ধ্বনিত হবে তা তিনি আশা করেছিলেন। এই আশা তাঁর সমগ্র সমাজভাবনার মৌলিক অবস্থান। তাই এমনকি, বাংলার সামন্তসমাজের কৃষিনির্ভরতাকে পেছনে ফেলে আধুনিক সমাজকে অবলম্বন করতেই ছফার আগ্রহ ছিল বেশি। তাঁর অভিমত–

> [এই সমাজের] প্রধান ধারাটি হবে এ দেশীয় হয়েও আন্তর্দেশীয়, বাংলাদেশের মানুষের হয়েও সর্ব মানুষের। এই ধারাটি এখন প্রমত্তা পদ্মার মত ফুলে ফুলে উঠার কথা– এবং এই ধারাস্রোতে অবগাহিত হয়ে বাংলার এই অংশে জন্ম নেবে নতুনকালের রবীন্দ্রনাথ, নতুন কালের বিদ্যাসাগর, নতুন কালের জগদীশচন্দ্র বসু এবং নতুন কালের নজরুল ইসলাম। (ছফা, ২০০৮চ:২৩৯)

আহমদ ছফার সমাজভাবনা বিপ্লবকেন্দ্রিক; তা সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক যে ক্ষেত্রেই সংগঠিত হোক না কেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বিপ্লব ছাড়া বাংলাদেশের মানুষের শোষণমুক্তি সম্ভব নয়। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী দল এবং বিপ্লবী কর্মী। ছফার বিশ্বাস ছিল, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলোরই আছে একটি মহান বিপ্লব সংঘটিত করার ক্ষমতা। শুধু প্রয়োজন, অতীতের ভুল শুধরে নিয়ে সামনে তাকানোর মতো যোগ্য নেতৃত্বের। যদিও ছফার এ অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে একটি ধনবাদী গণতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর স্বপ্নে স্থিত হয়েছিল আশির দশকেই। কিন্তু সেখানেও ছফার চিন্তাচেতনায় ছিল ভিন্নতা।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের বিভিন্ন প্রবন্ধে[২৭] ছফা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন বাংলাদেশে যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজ পুনর্গঠনের অনুকূল পরিবেশ কাজে লাগিয়ে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতার প্রতি। একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলো অনুসন্ধানেও তৎপর ছিলেন আহমদ ছফা। ফলে সামাজিক সম্পর্কসূত্র, শ্রেণিবিভাজন, উৎপাদনযন্ত্র, জীবিকা ও পেশাভিত্তিক পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া,

সর্বহারার চারিত্র্য ইত্যাদি মার্কসীয় সূচক-পরিমাপক নিয়ে ছফার নিবিষ্ট অনুশীলনের প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি প্রবন্ধে। তন্মধ্যে 'বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লব'[২৮] প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। এতে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুকূল-প্রতিকূল উপাদানসমূহ অন্বেষণ এবং এক্ষেত্রে বিশেষত বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মতভিন্নতা বিশ্লেষণ করে আহমদ ছফা তাঁর অভিমত দিয়েছেন।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি-বলয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করলেও, কেবল মুখের ঘোষণায় বা যথাযথ প্রস্তুতিসম্পন্ন প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ দেশের জন্য ক্ষতিকর বলে আহমদ ছফা ছিলেন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার। ছফা মনে করেন, মাওৎ সে তুং যেমন সবসময় সোভিয়েত-পরামর্শ না মেনে নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ কৌশল ও পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চীনকে বিপ্লবের সুফল এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ সেই উদাহরণ কাজে লাগাতে পারে; অর্থাৎ বাংলাদেশে একটি নিজস্ব পদ্ধতির বিপ্লব সংঘটনের ক্ষেত্র রয়েছে (ছফা, ২০০৮ছ:২৬৫)। কারণ কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের কৃষক সমাজে ক্রমাগত বাড়ছে কৃষিভিত্তিক সর্বহারার সংখ্যা। জমির ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা বেশি কিন্তু জমির স্বল্পতা প্রকট বলেই হচ্ছে এমনটা। এ পরিস্থিতি থেকে অচিরেই পরিত্রাণের সম্ভাবনাও নেই। অথচ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী বিপ্লবী দলগুলো কৃষকদের অংশগ্রহণে বিপ্লবের কথা ভাবতেই পারেনি কারণ উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন কতকগুলি ঐতিহাসিক ভ্রান্তিপাশে আবদ্ধ। ছফা মনে করেন– 'নেতৃত্বের ত্রুটি, প্রকৃত বিপ্লবী কর্মীর অভাব এবং কৃষকদেরকে প্রগতি পরিপন্থী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবার ফলই তাদের এই ব্যর্থতা' (ছফা, ২০০৮ছ:২৭০)। এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে কৃষিবিপ্লবের প্রতি মনোযোগী হওয়াই প্রকৃত বিপ্লবী দলের কাজ বলে মনে করেন ছফা।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ থেকে আহমদ ছফা আশাবাদী ছিলেন যে, বাংলাদেশে আগামী দিনের বিপ্লব সংঘটিত হবে কৃষি ক্ষেত্রে। যে রাজনৈতিক দল শ্রেণি সংগ্রামের ভিত্তিতে সামাজিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে তাদের কর্তব্য হবে সময়ের সবচেয়ে নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণিকে চিহ্নিত করা এবং তাদের প্রশিক্ষিত, উন্নত রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ কর্মী বাহিনী দিয়ে সেই শ্রেণিটিকে একটি শোষণমুক্ত উন্নত জীবনমহিমা অর্জনে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। উল্লেখ্য এ কাজে মধ্যশ্রেণির বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল বা তাদের কর্মীদের সামর্থ্য বা যোগ্যতার ওপর ছফার কোনো আস্থা ছিল না। তাঁর আশা ছিল স্বাধীনতা-উত্তর 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে তেমন একটি জঙ্গী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন সর্বাধিক, যে দলটি অন্ধবিশ্বাসের বদলে জাগ্রত বিবেক এবং চিন্তাশীলতাকে ঊর্ধ্বে স্থান দেবে। ফ্যাসিবাদী জঙ্গী মনোভঙ্গীর স্থলে মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের ব্রত গ্রহণ করবে' (ছফা, ২০০৮ছ:২৭২)।

৪.১.৪

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ঘনঘন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে আহমদ ছফার সমাজভাবনাতেও কোনো স্থির লক্ষ্য বা পরিকল্পনার চিহ্ন পাওয়া যায় না। সামাজিক বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য বা এ-লক্ষ্যে পরিচালিত মৌলিক কোনো পরিবর্তন বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের; সেই নেতৃত্ব যখন ভঙ্গুর বা অস্থিতিশীল, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা ও মানুষের দৈনন্দিন জীবন যখন অনিশ্চয়তার চোরাবালিতে সঙ্কটাপন্ন তখন বিবেকবান, সংবেদনশীল ও সচেতন মানুষের পক্ষে কোনো সুস্থির সুবিন্যস্ত সমাজের কথা ভাবা দুরূহ। বিভিন্ন দৈনিক বা সাময়িকীতে খণ্ডকালীন বা স্বেচ্ছাধীন কর্মসূত্রে আহমদ ছফাকে নিয়মিত জাতীয়-আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক-দৈশিক-বহির্দেশীয় বা আর্থ-রাজনীতিক নানাবিষয়ে মন্তব্য-প্রতিবেদন লেখায় মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। একারণে

সমাজজীবনের অনেক চাঞ্চল্যকর বা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা-দুর্ঘটনা, সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বা বিষয় ছফার বিভিন্ন প্রবন্ধে-নিবন্ধে স্থান করে নিয়েছে। তবে এসবের মধ্যেও কয়েকটি লেখায় বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আহমদ ছফার গভীর চিন্তা-ভাবনার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস', 'বাঙালি মুসলমানের মন', 'শতবর্ষের ফেরারি:বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', 'বাংলাদেশ:দেশ ও জাতি', 'বাংলাভাষা:রাজনীতির আলোকে' প্রবন্ধসমূহে তাঁর সমাজভাবনার বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে।

১৯৮২ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ : দেশ ও জাতি' প্রবন্ধে ছফা, পরিবর্তিত জাতীয় ও বিশ্বপরিস্থিতিতে, আধা-পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা এবং সমাজের সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের পর ১৯৮২ সালের ২৪ জুন সামরিক আইন জারির প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ছফার দেশভাবনা স্থান পেয়েছে এ প্রবন্ধে। বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র তখন অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছিল। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সবক্ষেত্রেই অবস্থা করুণ। ক্রমশ বাড়ছিল ভূমিহীনদের সংখ্যা, কমছিল কৃষিজমি। অর্থাৎ এ সময় বাংলাদেশে কয়েক দফায় সামরিক-বেসামরিক সরকার পরিবর্তন ও রাষ্ট্রীয় বিলোড়নের কারণে জাতীয় জীবনে চরম অস্থিরতার সময় চলছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল ও অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে কোনো সুস্থিরতা বা স্পষ্টতা না থাকায় সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনে নেমে এসেছিল গভীর হতাশা। বাঙালির সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দুঃখ-দুর্দশা-অভাব-অনটন থেকে মুক্তির কোনো উদাহরণ বা স্বস্তিকর সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। এই গভীর সংকটকালেও আহমদ ছফা আশাবাদের শব্দবয়ন করে আমাদের সাহস যোগান–

> যত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যয় পরিবর্তন-রূপান্তর ইত্যাদি ঘটুক না কেন, জাতি হিসেবে আমাদের টিকে থাকতে হবে। কথাটা প্রাকৃতিক সত্যের মতই অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ, ইচ্ছে করলেও আমরা একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারিনে। জাতি হিসেবে আমাদের একভাবে না একভাবে বেঁচে থাকতেই হবে, এর কোন অন্যথা নেই। (ছফা, ২০০৮গ:২১৪)

এসময় থেকেই ছফার সমাজচিন্তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক কক্ষপথ অনুসরণ করে ধীরে ধীরে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে নমনীয় হচ্ছিল। যে সামাজিক নৈরাজ্যের প্রক্রিয়া চলছিল দীর্ঘদিন ধরে তা থেকে মুক্তি পেতে বাংলাদেশে একটি বড় রকমের সামাজিক রদ-বদলের প্রয়োজনীয়তা ছফা উপলব্ধি করেছিলেন। এই পরিবর্তন যে তথাকথিত সংস্কার দিয়ে সম্ভব নয় সে সম্পর্কে ছফার যুক্তি– পুঁজিবাদীদের ভূমিসংস্কার, কৃষিসংস্কার ইত্যাদি সংস্কার প্রচেষ্টা আসলে একধরনের সামাজিক জোড়াতালির চেষ্টা। এতে 'পুরনো সামাজিক সম্পর্কের বাতিল সূত্রগুলোও টিকে থাকে এবং পুঁজিবাদী বিকাশও নিশ্চিত করা যায়' (ছফা, ২০০৮গ:২১৫)। যারা সংস্কারের কথা বলেন তাঁরা আসলে সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনকে ভয় পান। তাই গতানুগতিক সংস্কার পদ্ধতিতে ছফার কোনো আস্থা ছিল না; ছিল বিপ্লবে তাঁর অবিচল আস্থা। কারণ তৎকালীন বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ষাটজন মানুষ, যারা ভূমিহীন, সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে যাঁদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা নেই, কোনোরকমের সামাজিক অধিকারবোধ বিবর্জিত এই সকল মানুষ তাঁদের অস্তিত্বের দাবিতেই যে-কোনো সময়ে যে-কোনো রকমের লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে তুলতে পারেন ছফার এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না। সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় ছফা বাংলাদেশে শত চেষ্টাতেও পুঁজির বিকাশ সম্ভব নয় বলে মনে করেছিলেন। কারণ পুঁজির বিকাশের জন্য যেসব শর্তের প্রয়োজন তার উপস্থিতি তখনও বাংলাদেশের সমাজে দৃষ্ট ছিল না, সেখানেও ষাট শতাংশ ভূমিহীনের অবস্থিতি ছিল বড় বাধা। এজন্য আশির দশকের প্রেক্ষাপটে আহমদ ছফা বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কয়েকটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছিলেন, 'বাংলাদেশ : দেশ ও জাতি' প্রবন্ধ থেকে সূত্রাকারে সংকলন করা যায়–

এক। পুঁজির সামাজিকীকরণ ছাড়া বাংলাদেশে বিপুল বেকার সমস্যার সমাধান করে পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে আধুনিক যুগে প্রবেশ সম্ভব নয়। সামাজিক উন্নয়নই সামাজিক বিপ্লবের সবচেয়ে প্রশস্ত পথ।

দুই। সামাজিক সুবিচার দিতে হলে বাংলাদেশের জনগণ বোঝে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে এমন একটি সরল, জটিলতামুক্ত, কার্যকর শাসনব্যবস্থা উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

তিন। সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রয়োজন যার দ্বারা পরিবর্তনের রূপরেখা অর্থাৎ কার জন্য পরিবর্তন, পরিবর্তনের লক্ষ্য, জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে এর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। সামাজিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় সর্বকালেই 'এলিটরা ততটুকু সামাজিক রূপান্তর এবং পরিবর্তন চাইবেন যেটুকু না করলে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ইচ্ছামতো এবং পছন্দমতো শাসনদণ্ড পরিচালনা করা অসম্ভব না হয়' (ছফা, ২০০৮গ:২১৫)।

চার। শতকরা পঁচাশি ভাগ মুসলমানের সমাজে ইসলামকে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই। তাই নির্যাতিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির সনদ যে ইসলাম, মানুষে মানুষে সাম্য ও সৌহার্দ্যের দীক্ষা দেয় যে ইসলাম তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসবাদের শিক্ষার সাথে ইসলামের শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে সমাজে নতুন চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীলরা ইসলমাকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির রথের ধ্বজা হিসেবে যেভাবে ব্যবহার করে আসছে তা থেকে ইসলামকে রক্ষা করে, জুলুমবাজ ধনীকশ্রেণির বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন জেহাদের আহ্বানকে সামনে আনতে হবে। প্রকৃত ইসলামে সমাজে মানবসম্পর্কের যে ধরণ তা উদ্ঘাটন করার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যাঁরা ইসলাম নিয়ে ভাবেন অথবা যাঁরা মার্কসের একনিষ্ঠ অনুসারী তাঁদের উভয়েরই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার সংকট কাটিয়ে জনগণমুখী হওয়া দরকার। কারণ 'যারা ধর্মের কথা বলেছেন তাঁরা জনগণকে ঠকিয়েছেন। আর যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেন, শোষিত মানুষের মুক্তির কথা বলেন, তাঁরাও জনগণকে ঠকিয়েছেন'(ছফা, ২০০৮গ:২১৮)।

এসব প্রাক-যোগ্যতা অর্জন বা প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সমাজবিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। যার ছয় দফা রূপরেখা দিয়েছেন আহমদ ছফা[২৯], তাঁর ভাষায় বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণের তরফ থেকে–

প্রথমত. নিষ্পেষিত কর্মজীবী শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা

দ্বিতীয়ত. এমন শাসনপদ্ধতি ও নেতৃত্ব প্রবর্তন করা যা জনগণের নাগরিক জ্ঞান ও বোধ উন্নয়নের দায়িত্ব নেবে।

তৃতীয়ত. সামাজিক উৎপাদন-কর্মকাণ্ড নিশ্চিত এবং পরনির্ভরশীলতা দূর করে স্বয়ংসম্পূর্ণ সমৃদ্ধ সমাজের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করা

চতুর্থত. জীবনের নতুন লক্ষ্য, নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নীতি গ্রহণ করা।

পঞ্চমত. আধুনিক ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র সম্পর্কে মানুষের বোধ ও উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে।

আশির দশকের শুরুতে আহমদ ছফা যে-ঘুণে ধরা সমাজ দেখে প্রবল হতাশায় ব্যাপক পরিবর্তনের রূপরেখা উপস্থাপন করেছিলেন, নব্বইয়ের মাঝামাঝিতে সেই একই সমাজে গণতন্ত্রের শোভাযাত্রার মধ্যেও কোনো গুণগত উন্নতি বা পরিবর্তন তাঁর চোখে পড়েনি। নির্যাতিত মানুষের পক্ষে সমাজ পরিবর্তনের এই রূপরেখার অনেকাংশই আজও অধরাই রয়ে গেছে। আমাদের অজানা নয় যে, আট-দশকের সমাজ এসব পরিবর্তন সম্পাদনের অনুপযোগী হলেও সময়ান্তরে বাংলাদেশে পুঁজির বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু সেই পুঁজি যে পশ্চিমা গণতন্ত্রের হাত ধরে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তা ছিল উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া, জনগণের মধ্য থেকে উঠে আসা নয়।[৩০] এ সময়

সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উল্টোটা অর্থাৎ 'দুষ্টের পালন, শিষ্টের দলন' নীতিই বিস্তার লাভ করেছিল, ছফার শব্দে 'দুষ্টলোকদের একচ্ছত্র মৃগয়াক্ষেত্র' হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক অঙ্গন। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৩১)

আশির দশকের শুরু থেকেই বাংলাদেশের চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক ও অন্যান্য কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন মেধাবী তরুণরা বিদেশে পাড়ি জমাতে থাকে; 'মেধা ও কৃৎ কৌশল পাচারের কাহিনী' শীর্ষক প্রবন্ধে আহমদ ছফা সময়ের এই বিশেষ সামাজিক প্রবণতাকে গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণভাবে সেসময় মানুষের ধারণা ছিল যে– দেশের দারিদ্র্যের কারণে মেধাবী ছেলে-মেয়েরা কাঙ্ক্ষিত চাকুরি বা আয়ের নিশ্চয়তা না পেয়েই বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। আবার এ যুক্তিও প্রামাণ্য যে, বাংলাদেশের তৎকালীন বাস্তবতায় বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন মেধাবীদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগের যথাযথ ক্ষেত্রও ছিল অনুপস্থিত। অর্থের হাতছানির কথা স্বীকার করেই ছফা লিখেছেন, দেশের সর্বত্র সুবিধাবাদী, দালাল, ফড়িয়া, মধ্যস্বত্বভোগী, তোষামোদকারী ও রাজনীতিকদের পদলেহনকারী ব্যক্তিদের বিপুল দৌরাত্ম্যে এবং প্রশাসন ও সরকারের সকল পর্যায়ে অযোগ্যদের দাপটে মেধাবী পেশাজীবী, প্রযুক্তিবিদগণ আত্মসম্মানবোধের তাড়নায় নীরব দেশত্যাগে উৎসাহিত হয়েছিল। বিদেশাগত যেসব মেধাবী বাঙালি দেশগড়ার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলেন তারাও ফিরে যাচ্ছিলেন হতাশা নিয়ে। এজন্য সে-সময়ের সরকারই দায়ী বলে মনে করেন ছফা। কারণ বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে সরকারের প্রণোদনায় দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক রপ্তানির যে জোয়ার বইছে তাতে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার ছেলেমেয়েরা শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই বিদেশে পাড়ি জমানোর মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকে। তাই ছফার অভিমত–

> মধ্যপ্রাচ্যে দক্ষ এবং অল্প দক্ষ শ্রমিকেরা আমাদের দেশের সমস্ত সম্মানবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে মানবেতর পদ্ধতিতে জীবনযাপন করে যে টাকা আয় করে এবং দেশে পাঠিয়ে হঠাৎ করে নব্যধনী সাজে তা দিয়ে আমাদের সমাজের ক্ষতি বৈ লাভ কিছুই হচ্ছে না। কেননা, শুধু টাকা একটা দেশের আর্থিক সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের কোন ভূমিকাই পালন করতে পারে না। এটা পাগলেরও বুঝা উচিত। মন-প্রাণ, জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা-সংস্কৃতি সবকিছু দিয়েই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে দেশের আর্থিক সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। (ছফা, ২০০৮ছ:৩২২)

অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যা দেশের জন্য মঙ্গলজনক ও সরকারের সাধু উদ্যোগ বলে মনে হচ্ছে তা প্রকৃতবিচারে দেশের 'ভাবী পুনর্গঠনের মূলে কুঠারাঘাত' বলেই মনে করেন ছফা। কারণ মেধাবী এসব তরুণদের দেশত্যাগের কারণে শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সবক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে তা বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার পূর্ণ করেও অর্জন করা সম্ভব নয়। তদুপরি হঠাৎ ধনী হওয়া অদক্ষ শ্রমিকের টাকা দেশের সমাজব্যবস্থায় যে অস্থিরতা ও অসুস্থতা সৃষ্টি করছে তার প্রতিক্রিয়াও সুদূরপ্রসারী। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে যাচাই করে বোঝা যায়, আশির দশকে মেধা পাচারের ফলে বাংলাদেশের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বা সম্পদ আহরণের জন্য প্রযুক্তি ও কারিগরী সক্ষমতা আজো অর্জিত হয়নি। স্বাস্থ্যখাতে সংক্রামক ব্যাধি দূর করা বা শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর মতো ন্যূনতম সেবা নিশ্চিত করার জন্য এদেশ আজও লড়াই করছে, অথচ রাজনীতি-সমাজ-পরিবার আক্রান্ত বা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পুঁজির প্রতাপে। তাই ছফা মনে করেন, সামরিক সরকার পরিকল্পিতভাবেই মেধার পাচারকে উৎসাহিত করছে 'দেশ এবং সমাজগঠনের মূল স্থপতিদের দৃষ্টি দেশের মাটি থেকে সরিয়ে ভাবী সুষ্ঠু রাজনৈতিক বিকাশের পথরুদ্ধ করার জন্য' (ছফা, ২০০৮ছ:৩২২)।

১৯৮৮ সালে লেখা 'রাজনৈতিক কালচার' প্রবন্ধে সময়ের হতাশজনক ও নির্মম সত্যভাষণ পাওয়া যায়। ছফা বর্ণনা দিয়েছেন– প্রতিদিনের অনিশ্চিত জীবন, আত্মস্বার্থপরায়ণ মধ্যবিত্তের মতো খোলসবদ্ধ একাকিত্ব–এসবের মধ্যে দেশ-রাজনীতি-সমাজের চেয়ে মানুষের ব্যক্তিজীবনই প্রাধান্য পাচ্ছে। গা বাঁচিয়ে চলাই যেন শ্রেয়। তবু রাজনীতিতে জড়াতে হয় মানুষকে। কারণ এর বাইরে সে থাকতে পারে না। বাংলদেশে দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা এতসব সমস্যার পরও রাজনীতিতে জড়ানো মানুষ বা রাজনৈতিক দল কোনোটাই কমে না, বরং বাড়তে থাকে– এ

নিয়েই ছফার প্রশ্ন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো কিসের ভিত্তিতে রাজনীতি করে, এত মানুষই বা রাজনীতিতে করে কেন– এমন প্রশ্নের ব্যঙ্গরসাত্মক উত্তর খুঁজেছেন ছফা–

> কোন দল বলবে আমরা ক্ষমতায় আছি সেজন্য রাজনীতি করি। কোন দল বলবে যেহেতু আমরা অতীতে ক্ষমতায় ছিলাম সেজন্য রাজনীতি করি। আবার কোন দল বলতে পারে যেহেতু আমরা ক্ষমতায় যেতে চাই সেজন্য রাজনীতি করি। এই আত্মপক্ষ সমর্থনের ফিরিস্তি যত দীর্ঘ হতে থাকবে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে বিচিত্র সব জবাব আসতে থাকবে। কোন দল বলবে যেহেতু আমরা কস্মিনকালেও ক্ষমতায় যাব না সেজন্য রাজনীতি করছি। কোন কোন দলের পক্ষে ওটা বলাও অস্বাভাবিক নয়, আমাদের চাকুরি-বাকরি ব্যবসা তেজারতি চাষবাস খুন জখম কিছুই করার নেই বলে রাজনীতি করছি। (ছফা, ২০০৮ছ:৪০৮)

এমন সরস বক্রোক্তি থেকে শ্লেষ ও দ্বেষ দুটোই পাওয়া যায় তবে সবচেয়ে বড় যে সত্যটি উন্মোচিত হয় তাহল, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা দলগুলোর ক্ষমতালিপ্সা। নব্বইয়ের স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের পর বাংলাদেশের সমাজ গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য আশান্বিত হলেও রাজনৈতিক দলগুলো আবারও জনগণের প্রত্যাশার সাথে প্রতারণা করায় একটি উন্নত সমাজ গড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে। এ সময় রচিত ‘বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শোভাযাত্রা’[৩১] প্রবন্ধে তিনি সেই হতাশার কথা লিখেছেন–

> এখানকার রাজনৈতিক দলগুলোর দেশ এবং সমাজ গঠন করার কোন আদর্শভিত্তিক পরিকল্পনা এবং বক্তব্য নেই। খুবই নিকৃষ্ট অর্থে ক্ষমতা দখলই হল রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। কোন আদর্শ এবং মানবিক দায়িত্ববোধ, সমাজবোধ বাদ দিয়ে রাজনীতি যখন শুধুমাত্র ক্ষমতার ক্রিয়াক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়, সমাজে হাজারো রকমের অত্যাচার অনাচার বাসা বাঁধতে থাকে। সেগুলো বাংলাদেশের সমাজেও ঘটেছে এবং ঘটছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ছত্রছায়ায় সন্ত্রাস এখন রাজনীতির একটা মস্ত বড় নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৩০)

বাংলাদেশের প্রচলিত গণতন্ত্রের চর্চায় ক্ষমতার সুবিধাভোগী শহুরে মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, ছাত্র ও টাউটশ্রেণির মানুষের প্রভাব বেশি। সন্ত্রাসীকে ব্যবহার না করলে এদের কেউ ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারবে না বলেই মানবিক দায়িত্ববোধ ও সমাজবোধ আশা করা এক্ষেত্রে অকল্পনীয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই বলেই তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর। ফলে পশ্চিমা দেশগুলোর চাপিয়ে দেয়া গণতন্ত্র বাংলাদেশে এসে গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারে রূপান্তরিত হয়েছে কারণ তা সমাজের মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেনি কখনও। এমনকি সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও সেই স্বেচ্ছাচারেরই অংশ বলে মনে করেন আহমদ ছফা।

সমাজের সর্বত্র অসার-অসুস্থ মানসিকতার রাজনীতি চর্চার বিস্তৃতি এবং প্রতিপালন দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ছফা। রাজনীতি এবং সমাজের মধ্যে ওতপ্রোত-সম্পর্ক। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনীতির প্রতি সাধারণের অনুগত থাকতেই হয় কিন্তু সমাজ ও রাজনীতির মাঝে সেতুবন্ধের কাজ করেন যে রাজনীতিবিদগণ তাঁদের অবিমৃষ্যকারিতায় ধ্বংস হয় সকল সম্ভাবনা। তাই ছফার এই মন্তব্য সকল কালের রাজনীতিবিদ ও সমাজচিন্তকদের জন্য সাবধান বাণীর মতো শোনায়–

> সমাজ যখন রাজনীতিকে চালায় তখন রাজনীতি সুস্থ থাকে। কিন্তু রাজনীতি যদি সমাজের চালক হয়ে বসে সমাজ অসুস্থ এবং বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। সুতরাং এই ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ভয়ংকর রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। রাজনীতি সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করলে ব্যক্তির বিকাশের কোন সুযোগ সেখানে থাকে না। (ছফা ২০০৮ঘ:২৪২)

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক মানুষের জ্ঞান, চিন্তা ও সৃজনক্ষমতারই প্রতিরূপ রাজনীতি। তাছাড়া রাজনীতি হল সমাজের উপরিকাঠামো। এ ব্যাপারে ছফার হতাশা গভীর। তিনি মনে করেন, রাজনীতির ধরন পরিবর্তনের ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই, সরকার পরিবর্তন করে রাজনীতিকে দূষণমুক্ত করাও সম্ভব নয়; সুতরাং

রাজনীতিকেই বদলে দিতে হবে। সমাজবদলে বিশ্বাসী ছফা সাধারণ মানুষের ক্ষমতায় চূড়ান্তভাবে আস্থাশীল। তাই রাজনীতির ধরন পরিবর্তনের পেছনে সাধারণ জনগণের ইচ্ছা ও অভিরুচির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি তা ছফা অনুধাবন করেন। রাজনীতির পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে সমাজ থেকেই।

রাজনৈতিক দলগুলোর সন্ত্রাসের লালনক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, ছাত্র রাজনীতিই হল এর মূল উৎস। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসের প্রকোপ ঘটছে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস:একটি রাজনৈতিক পাপ', 'ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে এ বিষয়ে ছফা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যার মূলকথা – 'রাজনীতিকে আশ্রয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং বিরাজমান রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসকে টিকিয়ে রেখেছে' (ছফা, ২০০৮ঙ:১৭০)। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ও গুণগত মান প্রসঙ্গে ছফার এই মন্তব্য। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম ছাড়াও জাতীয় পর্যায়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ছিল সুনাম, অবদান এবং অংশগ্রহণ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জ্ঞানচর্চার এক গৌরবময় পরিবেশ সমাজের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ প্রসঙ্গে আহমদ ছফার একটি পর্যবেক্ষণ উল্লেখ্যযোগ্য –

> ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল এ সময়সীমার মধ্যে সন্ধান করলে একটা জিনিস পরিস্কার ধরা পড়বে, '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর যে একদল লেখক-সাহিত্যিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জন্ম নিয়েছিলেন তার আগে সাতাশ, আটাশ বছেরের সময়সীমার মধ্যে মুসলমান সমাজের মধ্যে তেমন একজন মানুষও জন্ম নেননি। (ছফা, ২০০৮ঙ:১৬৫)

অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটেছিল তা সামগ্রিকভাবে গভীর ও দ্রুত প্রভাব বিস্তার করেছিল সমাজের গুণগত মান ও সৃজনীচেতনায়। অপরদিকে স্বাধীনতার পর থেকে এক দশকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জ্ঞান বিতরণের পরিবেশ বদলে গিয়ে ক্রমশ সন্ত্রাসের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি সমাজেও চলছিল সন্ত্রাসের লালন ও তোষণ। এর কারণ অপরাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য এবং মুখ্যত ছাত্র-রাজনীতি হল বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের মূল উৎস। আবার রাজনৈতিক দলগুলো সেই সন্ত্রাসের প্রতিপালক বা পৃষ্ঠপোষক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তারা বাফারস্টেটের মতো নিজেদের মধ্যে শক্তি প্রদর্শনের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ ছিল না বলেই সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটেছিল সহজে। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে সামাজিক মূল্যবোধও অনেকটা বদলে গিয়েছিল। যেমন– আগে মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা দেখলে বিস্মিত হতেন, বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা মনে করতেন। কিন্তু ক্রমাগত সন্ত্রাস-খুন-জখমের ঘটনা বাড়তে থাকায় এটি মানুষের কাছে আর কোনো প্রশ্ন বা আতঙ্ক নয়– হতাশার বিষয়। সেই হতাশাও সামাজিক গুরুত্ব হারিয়ে অভ্যাসের অন্তরালে বিলীন। ছফার বর্ণনায় সময়ের ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে–

> মুখে যা-ই বলুন না কেন, সব দল খ্যাতনামা সন্ত্রাসীদের নিজ নিজ দলের বীর হিসেবে গণ্য করে সম্মান এবং শিরোপা দিয়ে থাকে। আ্মাদের দেশে গোটা রাজনৈতিক পদ্ধতিটাই সন্ত্রাসের ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসের মাধ্যমে একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, একই দলের অভ্যন্তরে স্বার্থসম্পর্কিত কারণে, কোটারিগত কারণে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে। (ছফা, ২০০৮ঙ:১৭১)

এসব ঘটনা সমাজজীবনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করতে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্থূল স্বার্থের জন্য আদর্শগত বৈরিতা ভুলে এক টেবিলে এমনকি সংসদেও বসতে পারে, বিদেশ থেকে পাজেরো জীপ আনার সুবিধা একযোগে গ্রহণ করতে পারে কিন্তু সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য কোনো সমন্বিত উদ্যোগ নিতে পারে না। ছফা মনে করেন, যদিও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারাই তবুও এমনকি সংখ্যায় অধিক হয়েও তাদের পক্ষে সন্ত্রাস নির্মূল সম্ভব নয়। তারা কেবল 'নোংরা পঙ্কিল স্বার্থবাদী রাজনীতির শিশুশ্রমিক' (ছফা, ২০০৮জ:১৩৬)। এর জন্য প্রয়োজন প্রধানত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ গড়ে তুলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর আকাঙ্ক্ষা। অতঃপর জনমত ও সম্মিলিত প্রতিরোধ

সৃষ্টির মাধ্যমে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। যেখানে সমাজের সচেতন জনগোষ্ঠীর নৈতিক ও সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে।

আহমদ ছফা সমাজ-বদলের মার্কসীয় ব্যাখ্যায় গভীর আস্থাশীল। মার্কসবাদীদের মতো ছফাও মনে করেন, প্রকৃত পরিবর্তন অনুভূত হয় একেবারে ভিত্তি-কাঠামোর ভেতর থেকে; ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো পরিবর্তনই কাজে আসে না। আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তন স্থায়ী হয় না, সমাজেরও কোনো উপকারে আসে না। তাই ছফাও যে কোনো বড় পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়োজনে প্রধানত তার জন্য দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও সম্মিলিত শক্তিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিশ্ববিদ্যালয় বা সমাজ যেখানেই হোক না কেন সন্ত্রাস থেকে পরিত্রাণের জন্য সামাজিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ছাত্রদের সাথে নিয়েই সন্ত্রাসবিরোধী আন্দোলন শুরু করতে হবে।

৪.১.৫

একটি আদর্শ সমাজতান্ত্রিক সমাজ অথবা বিপ্লবী সমাজব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা থেকে নয়,[৩২] দেশের কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হিসেবে পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতির বাস্তবতায় আহমদ ছফা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সময়ের অবিকল্প পছন্দ বলে মনে করেছেন। অথচ ছফা বরাবরই একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকেই আমাদের দেশের কৃষক-শ্রমিক-জনতার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করতেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে তিনি তা-ই চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রাদর্শে সমাজতন্ত্র গৃহীত হলেও আকাঙ্ক্ষিত নীতিবাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এবং পরবর্তীকালে শেখ মুজিবের হত্যার মাধ্যমে কয়েকদফা সামরিক শাসনের অধীনে থাকায় বাংলাদেশে ধীরে ধীরে একটি পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষত ১৯৯১ থেকে বাংলাদেশে পাশ্চাত্যধারার, ছফার শব্দে 'খুবই নিম্নমানের', গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের পতনের পর আঞ্চলিক ও আন্তঃদেশীয় অর্থলগ্নিকারকদের কাছে দরিদ্র অনুন্নত দেশসমূহের নিরুপায় আত্মসমর্পণ প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই শোষিত, নির্যাতিত, নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন মানুষের অবলম্বনের জন্য হলেও অবিলম্বে একটি ধনবাদী বিকল্প উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে অর্থনীতি রক্ষা করে অন্তত সৎ, দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়া তৈরি করতে হলেও বিকল্প উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা জরুরি। সেজন্য অবাধে বিদেশি পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানানোর পক্ষেও ছফা লিখেছেন; দেশের মেরুদণ্ড সোজা হওয়ার জন্যই তা দরকার বলে তিনি মনে করেন। তবে ছফার অভিমত, সেজন্য সরকারকে জাতীয় পুঁজি বিকাশের পথ সৃষ্টি করতে হবে, যথাযথ নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে বিদেশি পুঁজির সঠিক ব্যবহার ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে, যাতে পুঁজি শোষণের হাতিয়ারে পরিণত না হয়। ১৯৯৬ সালের মে-মাসে *দৈনিক বাংলাবাজার*-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ছফা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন – 'আমি ব্যক্তিগতভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যেই জাতীয় অগ্রগতির চিন্তা করি। আমাদের এখানে আগামী বিপ্লব হল বুর্জোয়া বিপ্লব। আপাতত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা নেই' (ছফা, ২০১১:২২৬)।

ধনতন্ত্রের সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও কুফলের প্রতি সচেতন থেকেও ছফা মনে করেন, সমাজতন্ত্রের পতন ও পুঁজিবাদের জয় হলেও বাস্তবতা হল, পৃথিবী একটি নতুন কক্ষপথে প্রবেশ করেছে; ফলস্বরূপ পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নতুনভাবে নির্ণিত হবে, এমনকি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মানবসমাজও এর অভিঘাতে অনেকখানি বদলে যাবে। বাস্তবতা হল, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের পরীক্ষা ব্যর্থ হওয়ার পর এককেন্দ্রিক পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায়ও তৈরি হয়েছিল অনেকগুলো ভরকেন্দ্র। রাষ্ট্রগুলো মনোযোগী হয়েছিল নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক-আর্থনীতিক-সামরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট জোটগঠনে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আগ্রাসন ও উন্নয়নের

নানা মডেল থেকে নিজকে রক্ষা করতে বাজার অর্থনীতির পাল্টা কৌশল ব্যবহারের নানা উপায়-পন্থা খুঁজছিল সক্ষম রাষ্ট্রগুলো। তাই ছফার অভিমত, তাত্ত্বিকভাবে এককেন্দ্রিক বিশ্ব আসলে বাস্তবতায় বহুপাক্ষিক। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের কোন্ মডেল গৃহীত হবে বা বিকল্প উন্নয়ন কৌশল কেমন হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আহমদ ছফা বিভিন্নভাবে তাঁর মতামত দিয়েছেন। 'এনজিও প্রসঙ্গে কিছু কথা', 'ধনতন্ত্রের ভবিষ্যত কি?', 'ধনতন্ত্রের নবপর্যায় ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা বর্তমান', 'বিকল্প উন্নয়ন কৌশল', 'বাংলাদেশের উঁচুবিত্ত শ্রেণি এবং সমাজবিপ্লব প্রসঙ্গ' ইত্যাদি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন এ বিষয়ে। এই আলোচনা থেকে আমরা ধারণা করতে পারি সামগ্রিকভাবে আহমদ ছফার চিন্তাভাবনা 'জাতীয় বুর্জোয়া' তৈরির পক্ষে। কারণ– প্রথমত, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে অর্থনীতিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে; অন্তত বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত আছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে উপর্যুপরি সামরিক শাসনের ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে ক্রমাগত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাই দৃঢ়মূল হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে বুর্জোয়া শোষণ, লুণ্ঠন দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়াদের যে 'সেন্স অব বিলংগিং'[৩৩] থাকে, তা আমাদের দেশের নব্য-বুর্জোয়াদের মধ্যে নেই। তাই তাদের দ্বারা একটি বিকশিত অর্থনীতির ভিত নির্মাণ করা অসম্ভব। কিন্তু পুঁজির বিকাশের জন্য এমন কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন যাতে তা শোষণের হাতিয়ারে পরিণত না হয়। ছফার অভিমত, বাংলাদেশে কোন্ দেশের পুঁজি কীভাবে আসবে তার জন্য নিজস্ব একটি পছন্দবোধ, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচি থাকা উচিত, যাতে তা ভারত-পাকিস্তানের অনুগত অর্থনৈতিক এলাকায় পরিণত না হয়। উপরন্তু ধনতন্ত্র চক্রবৃদ্ধি হারে শোষণের প্রসার ঘটায় একথা মনে রেখে কোনো পুঁজিকেই শিকড় সংগ্রথিত করার সুযোগ না দেয়া। কারণ–

> যে সমাজে বা রাষ্ট্রে এই পুঁজি অনুপ্রবেশ করে শোষণের হাতিয়ার হয় সে সমাজের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাটি যদি এই অনুপ্রবিষ্ট পুঁজির পথ গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করার একটা পদ্ধতি বেঁধে না দেয়, সেখানে পুঁজি আসবে, শোষণ চলবে। কিন্তু সমাজের পুঁজিতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটবে না। (ছফা, ২০০৮ঙ:২০৮)

সমাজের ধনবাদী উত্তরণ ছফা কামনা করেন, এমনকি এনজিও ধরনের পুঁজির বিকাশ হলেও তিনি বাংলাদেশের জন্য ধনতান্ত্রিক সমাজকেই সময়ের সবচেয়ে উপযোগী অর্থব্যবস্থা মনে করেন। এজন্য তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও কর্মসূচি নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়–

> আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের পুঁজি যেভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে তা অবাধে প্রবেশ করতে দেয়া এবং পুঁজি অনুপ্রবেশের সবগুলো প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা। এটা জানা কথা, ধনতন্ত্র কায়েম হয়ে বসলে চক্রবৃদ্ধি হারে শোষণের ঝুরি প্রসারিত করে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কাজ হবে এই ঝুরিগুলো যেন কাণ্ডে পরিণত হয় সেকরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ঝুরিগুলো কাণ্ডে পরিণত হলে সেটা দেশীয় এবং জাতীয় ধনতন্ত্রে রূপ নেবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই কাণ্ডগুলো কারো পক্ষে এখান থেকে মূলশুদ্ধ উপড়ে নেয়া সম্ভব হবে না। যেমন সম্ভব হয়নি কোরিয়া, তাইওয়ান বা সিঙ্গাপুরে। (ছফা, ২০০৮ঙ:২০৯)

৪.১.৬

আহমদ ছফার সমাজভাবনায় বিশেষ গুরুত্ববহ সংখ্যালঘু জনগণের অধিকার ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন। তিনি জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্পর্কে তাঁর অভিমত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন তন্মধ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া কতিপয় বিবেচনা', 'পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি : সাম্প্রতিক পরিস্থিতি রেফারেন্ডাম দেওয়া হউক', 'শান্তিচুক্তি যেভাবে দেখি', 'বঙ্গভূমি আন্দোলন রাষ্ট্রধর্ম মুক্তিযুদ্ধ : বাংলাদেশের হিন্দু ইত্যাকার প্রসঙ্গ', 'পূজা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রশ্নে', 'তথাকথিত তপসিলী সম্প্রদায়', 'এখনই ঘুরে দাঁড়াবার সময়', 'অর্পিত(শত্রু) সম্পত্তি আইন' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য।

আহমদ ছফা পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সাথে তাঁর একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। সাধারণভাবে বাংলাদেশের মানুষের ধারণা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করার জন্য রাঙামাটিতে কাপ্তাই বাঁধ দেয়ার ফলে বিপুল সংখ্যক পাহাড়ির উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়ার কারণে ক্ষোভ ও হতাশা থেকেই পাহাড়িদের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। কিন্তু ছফা প্রথমেই এই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করতে শত বৎসর ধরে পাহাড়ীদের বঞ্চনার ইতিহাসকে সামনে নিয়ে এসেছেন। বহু বছর ধরে একটু একটু করে পাহাড়িদের সাথে বাঙালিদের আচরণ-সামাজিকতা-ব্যবসা-বাণিজ্যের দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। এর সাথে প্রথমে পাকিস্তান আন্দোলন পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যুক্ত হয়ে একগুচ্ছ রাজনৈতিক ঘটনাবলীরও অবতারণা হয় যার প্রতিক্রিয়ায় ফাটল সৃষ্টি হয় পাহাড়ি-বাঙালি সম্পর্কে । আহমদ ছফা অত্যন্ত যৌক্তিক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পাহাড়িদের দাবি, তাদের সংগ্রাম ও ত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। পার্বত্য অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য পার্বত্যবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন জরুরি বলে ছফা মনে করেন। ‘পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া কতিপয় বিবেচনা’ প্রবন্ধে ছফার ভাবনা উল্লেখযোগ্য–

> পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ওপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে অর্থনৈতিক নিস্পেষণ চালান হয়েছে তাই-ই সেখানকার জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্নবাদ এবং বিদ্রোহের পথে ধাবিত করে নিয়ে গেছে। অর্থনৈতিক নিস্পেষণ, জাতিগত নিস্পেষণের জন্ম দিয়েছে, জাতিগত নিস্পেষণ সাংস্কৃতিক নিস্পেষণের পথ প্রশস্ত করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। পার্বত্য চট্টগামে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, কলকারখানা, দোকানপাট ইত্যাদিতে যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত আছে, তার শতকরা পাঁচভাগ মূলধনও পার্বত্য চট্টগামের অধিবাসীদের কাছ থেকে আসেনি। পার্বত্য এলাকার লোকদের হাতে যদি পর্যাপ্ত মূলধন থাকত, তাঁরা যদি বাঙালিদের মত সমগ্র বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারতেন, নিজেদের অবহেলিত, বঞ্চিত এবং প্রতারিত ন ভাবতেন, তাহলে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ক্যান্টনমেন্ট রাখার প্রয়োজন হত না। (ছফা, ২০০৮ঙ:৩০১)

‘তথাকথিত তপসিলী সম্প্রদায়’ প্রবন্ধে ‘সিডিউল কাস্ট’ বা অবর্ণ-পতিত তথা তপসিলী সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করে ছফা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, এরাই এ-ভূখণ্ডের ‘সাক্ষাৎ সন্তান’। প্রসঙ্গত ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির সময়ে তপসিলী সম্প্রদায়ের পাকিস্তান সমর্থনের ঐতিহাসিক কার্যকারণ তাৎপর্যপূর্ণ। ছফা মনে করেন, তাদের অচ্ছুত বা পতিত হয়ে যাওয়ার পেছনে যে ইতিহাস রয়েছে, তা হাজার বছর ধরে চলা ব্রাহ্মণ্যবাদ বা মনুপ্রবর্তিত পেশাগত শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মর্মমূলে প্রোথিত। আর্যদের কাছে পরাজিত জাতি বা জনগোষ্ঠীর পরিণতিই ছিল পতিতশ্রেণির কলঙ্ক নিয়ে বংশপরম্পরায় দাস হয়ে বেঁচে থাকা–সমাজের তথাকথিত উঁচু শ্রেণির সেবাদাস। আর্যদের ঘোষিত ধর্মীয় অনুশাসন আর তাদেরই প্রতিষ্ঠিত ভগবানের ইচ্ছার মন্ত্রবলে এই অনার্যরা চিরকালের শোষিত শ্রেণি হয়ে সমাজে টিকে আছে; এই পরাজয়ের অভিশাপ তাদের বহন করতে হয়েছে হাজার বছর ধরে এমনকি বারবার ধর্মত্যাগ করেও তারা মুক্তি পায়নি। তবে তাদেরই মধ্যে অনেকেই যে বিভিন্ন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার সুযোগে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে শ্রেণিচরিত্র বদলে ফেলেছিল তার প্রমাণ ইতিহাসে সহজলভ্য। কিন্তু তারা সমাজের প্রতিপত্তিশালীদের স্তরে উন্নীত হয়েই আবার ‘সিডিউল কাস্ট’কে সেই একই দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য ও ধর্মীয় ব্যাখ্যায় পতিত শ্রেণিভুক্ত করতে কুণ্ঠিত হয় না; যে বিভাজন-অমানবিকতাকে সে নিজেই একসময় ঘৃণা করত। অথচ নৃতাত্ত্বিকভাবে নিচু বা উঁচু বর্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে–

> এই তথাকথিত সিডিউল কাস্টরাই বাংলার সাক্ষাৎ-সন্তান। প্রকৃত বাঙালি বলে কেউ যদি গর্ব করতে পারে সেই অধিকার পুরোপুরি এই সম্প্রদায়ের। প্রাচীন মধ্যযুগের ঐতিহাসিকেরা বাঙালির অনমনীয় স্বাধীনতার স্পৃহারূপ, যে সমস্ত ঘটনা, বিপ্লব, উপপ্লব, বিরোধের উল্লেখ করে থাকেন তার অধিকাংশই সংঘটিত হয়েছে এই সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারাই।
> (ছফা, ২০০৮ছ:২৫৩)

বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শতকরা সত্তরভাগই ঐতিহাসিকভাবে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী। ভারতে এদের সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর পাঁচভাগের একভাগ। তাই ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু হলেও দ্বিজাতিতত্ত্বের পাকিস্তানকে তাদের

একাংশ সমর্থন করেছিল ধর্মীয় শোষণের ঐতিহাসিক প্রলম্বিত থাবা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু কার্যত তারা মুক্ত হতে পারেনি। জাত ভেঙে নতুন জাত হলেও, 'সিডিউল কাস্ট' বা পতিত জাত পতিতই থেকে গেছে। এমনকি বৃটিশ শাসনামলে বা উপনিবেশোত্তর কালেও ধর্মনিরপেক্ষতার আধুনিক ধ্যান-ধারণাগুলো 'সিডিউল কাস্টে'র মুক্তির প্রশ্নে মুখথুবড়ে পড়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত ভারতেও ধর্মীয় কারণে পতিতদের সামাজিক বঞ্চনা বা লাঞ্ছনার কোনো বিশেষ প্রতিকার হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশেও তা-ই দেখা যায়। কিন্তু সভ্য সমাজ তাকেই বলা যায় যেখানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে। সামাজিক বিপ্লবের সাফল্যের মাপকাঠিও তা-ই– নির্যাতিতের সুযোগসুবিধা নিশ্চিতকরণ। কিন্তু কেবল সাংবিধানিক অধিকার বা স্বীকৃতিই এই সুদীর্ঘকালের সমস্যার রাতারাতি সমাধান নয় কারণ তথাকথিক 'সিডিউল কাস্ট' বা তপসিলী সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকারহীনতা ও নিপীড়নের লালন ক্ষেত্র আমাদের সমাজ। তাই আহমদ ছফার মনে করেন, বাঙালি জাতি সেইদিন সত্যিকার উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে যেদিন তপসিলী সম্প্রদায় এবং আদিবাসী সমাজের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হবে এবং প্রতিটি জাতি, প্রতিটি সম্প্রদায় তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে, সেদিন এই কৃত্রিম বিভেদ ভেঙে ফেলে বাংলাভাষী জগতে একটা সমৃদ্ধ সমাজসৃজনের প্রয়াস স্ফুরিত হবে।

ঐতিহাসিকভাবে বঙ্গীয় সমাজব্যবস্থায় বৈচিত্র্যময় জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতির অবস্থান এই সমাজকে বহুত্বে বর্ণিল করে তুলেছে। আবার বিভিন্ন সময় শাসকশ্রেণির সাথে ধর্মান্ধদের স্বার্থসম্মিলন ও ক্ষমতালিপ্সা এই ভূখণ্ডে জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করে জন্ম দিয়েছে মানবতাবিনাশী দাঙ্গা-সংঘাতের। আর্য-আগ্রাসন থেকে শুরু করে শঙ্কারাচার্যের বৌদ্ধদলন, তারও পরে সেনরাজাদের বর্ণাশ্রম প্রথার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে দেশান্তরী হয়েছে বহুসংখ্যক মানুষ, যদিও সে তুলনায় মুসলমান রাজশক্তির ধর্মীয় নিপীড়নের ইতিহাস দুর্লভ। ইতিহাসের নানা পর্বে তাই এই বিস্তীর্ণ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় আঞ্চলিক পরিযায়ী এবং পরিব্রজ মানুষের বিপুল উপস্থিতি। বারবার বাস্তুহারা বা অবস্থানান্তরিত শরণার্থী মানুষের অসহায় ক্রন্দন এই ভূখণ্ডের বাতাসে মিশে আছে। এরকম এক ঐতিহাসিক পরিযায়ণ ঘটতে দেখি ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট ভারত-পাকিস্তানে। ধর্মীয় কারণে ভারতে অবস্থানরত বাঙালি মুসলমান এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত বাঙালি হিন্দুর অভিবাসন চলছিল **১৯৪৭** সালের পর থেকেই। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর দুটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হলে শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে দুদেশের মধ্যে দেশত্যাগী এবং উদ্বাস্তুর যে বিশাল যাওয়া-আসা চলেছিল ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তারপরও কয়েক কোটি মুসলমান ভারতে এবং কোটিখানেক হিন্দু পাকিস্তানে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ের এই দোলাচলের মধ্যেই **১৯৬৫** সালের পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালি হিন্দুকে নিজভূমে পরবাসী বানিয়ে দেয়। যুদ্ধের পরপরই বাংলাদেশের হিন্দুদের সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি'[৩৪] ঘোষণা করে এই সম্প্রদায়ের মানুষকে পাকিস্তান ত্যাগ করতে একরকম বাধ্য করা হয়। কিন্তু **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র অস্বীকার করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থার উন্মেষ ঘটলে বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দুর স্বস্তি ফিরে আসে। বাংলাদেশের হিন্দুদের দেশত্যাগ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে যে ভ্রান্ত ধারণা[৩৫] প্রচলিত আছে তার অবসান স্বাধীনতার পরও হয়নি। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় উভয় দেশেই সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়া হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত সামষ্টিক চৈতন্যে যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তা ছফার বিশ্লেষণে উন্মোচিত হয়েছে। ভারতের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ততদিনে পাকিস্তান নামক ধর্মীয় রাষ্ট্রে অভিবাসনের আকাঙ্ক্ষা অবসিত হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষিত সমাজের ওপর নির্ভরতা ফিরে আসেনি। মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও হিন্দুরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সবরকম অধিকার ও সম্মান তারা পাননি। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকার ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেও সমাজের সর্বত্র ঘটতে থাকা অনাচার, সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার ও গুজবের[৩৬] কোনো প্রতিকার করতে পারেনি এবং বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে

ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ সমাজদেহে সঞ্চালিত করার প্রয়াস নেয়নি। এমন অবস্থার পেছনে যে সামাজিক চাপ, সচেতনতার অভাব অথবা সচেতন-ইন্ধন ক্রিয়াশীল ছিল তা যথাযথভাবে নির্দেশ করেছেন ছফা 'বঙ্গভূমি আন্দোলন রাষ্ট্রধর্ম মুক্তিযুদ্ধ : বাংলাদেশের হিন্দু ইত্যাকার প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে। স্বাধীনতার পরও যে নির্মম বাস্তবতা হিন্দু সমাজকে কতটা বিপন্ন করে তুলেছিল তা নিচের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়–

> বাংলাদেশ না হয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ওটা তো কাগজ-কলমের ঘোষণা। যে গ্রামে তিন হাজার মুসলমান এবং তিনশত হিন্দু বসবাস করে, সেখানে হিন্দুদের কোন পরিস্থিতিতেই কি মুসলমানদের বিরোধিতা করা সাজে? কাগজে ঘোষণা তো তাদের বাস্তব জীবনের নিরাপত্তা দিতে ছুটে আসবে না। (ছফা, ২০০৮জ:১১২)

আহমদ ছফা মনে করেন, ১৯৭১ সালের পরও যখন বাংলাদেশ থেকে ভারতে হিন্দুদের নীরব দেশত্যাগের ঘটনা ঘটতে থাকে তখন অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে সংখ্যালঘুদের জন্য এক নিরাপত্তাহীন দুঃসহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে অসাংবিধানিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন হয় এবং সামরিক শাসনের ছত্রছায়ার মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধানের মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাদ দিয়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামের একটি সাম্প্রদায়িক রূপ দেখা দেয়। এর ফলে মুসলিম বাদে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে তৈরি হল এক চূড়ান্ত অনিকেত মনোভাব, হতাশায় মিলিয়ে গেল তাঁদের মান-সম্মানের অবশিষ্টটুকুও – 'হিন্দু এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেয়া হল' (ছফা, ২০০৮জ:১২১)।

এসব ঘটনা বা উদ্যোগ, রাষ্ট্রীয় হোক বা সামাজিক, বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এটি ক্রমাগত একটি সামাজিক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে যার আশঙ্কা ছফা দেড় দশক আগেই করেছিলেন, 'এখনই ঘুরে দাঁড়াবার সময়' নিবন্ধে সে পরিচয় পাওয়া যায়। হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বসবাস করা এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের হাল আমলের সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়েন তিনি স্পষ্ট ভাষায় সবাইকে জানাতে দ্বিধা করেননি–

> আমাদের বিচ্ছিন্নতার বোধটি এতবেশি বিস্তৃত হয়ে পড়ছে, আমরা একে অন্যের সঙ্গে হয়ত মামুলি সম্পর্কটাও রক্ষা করতে পারব না। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিকভাবে হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পারস্পরিক উদাসীনতা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিয়েছে তার পেছনে নিশ্চয়ই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একগুচ্ছ কারণ বর্তমান।(ছফা, ২০০৮ঘ:২৫৭-৫৮)

ছফা তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ঝগড়া-রাগ-অভিমানের সম্পর্কে যান্ত্রিকভাবে ভদ্রতা রক্ষার আবরণ পড়েছে; যে অনুভূতিগুলো সৎ ভাবে প্রকাশ করা যেত তা আগের মতো অকপট নেই। তিনি আশংকা প্রকাশ করে লিখেছেন, হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সম্পর্কসূত্রগুলো শিথিল হয়ে আসছে। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কমে যাচ্ছে আন্তরিকতা, গভীরতর হচ্ছে আড়ষ্টতা, উদাসীনতা ও অস্বস্তি। এর সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কারণ থাকতে পারে কিন্তু সাধারণভাবে এই দূরত্ব কমিয়ে আনার প্রধান উপায় আমাদেরই সন্ধান করতে হবে। আমরা উভয় সম্প্রদায় বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে একই ভূখণ্ড এবং ইতিহাসের সমান অংশীদার হিসেবে নিজেদেরকে মেনে নেয়ার মানসিক প্রস্তুতি না নিলে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি আরও মারাত্মক হতে পারে। সমাজে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের নানা আয়োজনকে সামাজিক কল্যাণ সাধনের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মনে করেন ছফা। তাই এসব প্রয়াস আসলে কোনো কাজেই আসছে না। তাঁর মতে, সমাজের মর্মমূল থেকে সম্প্রীতির বোধ ও উপলব্ধি জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবক্ষেত্রে সকল ধর্মের মানুষের পারস্পরিক অংশগ্রহণ ছাড়া একটা সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই অংশগ্রহণ ও সমাজনির্মাণের 'পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়াগুলো একটা অন্যটাকে প্রতিহত করছে বলেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথটিও ক্রমাগত কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠছে' (ছফা,

২০০৮ঘ:২৫৮)। এটাকে প্রতিহত করতে এখনই সকলকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে সম্প্রীতিপূর্ণ ও পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে। আমাদেরকে একই দেশে বসবাস করতে হবে এই বোধ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীরভাবে অনুভূত হওয়া প্রয়োজন। একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থাই ছফার চূড়ান্ত প্রত্যাশা। এ লক্ষ্যে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের ধর্মীয় মূল্যচিন্তায় সংস্কারসাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, তবে তা ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মতো নয়; রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপের 'এনলাইটেনমেন্ট'-এর মতো। কারণ সমাজের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য যখন পরিবর্তিত হয়ে প্রাগ্রসর চিন্তা-কর্মে নিয়োজিত হয় তখন তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমাজকাঠামো-ধর্ম-সংস্কৃতি-রাজনীতি সবকিছুরই সংস্কার সাধন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তনের স্রোত যেভাবেই আঘাত করুক না কেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবিক সমাজই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। তাই ছফা, এক সাক্ষাৎকারে এ-ও বলেছেন, 'আমাদের দেশে একজন হিন্দুও যদি না থাকে, তবুও সাম্প্রদায়িক মোল্লাদের নিয়ে আমরা বাঁচতে পারব না' (২০০৮জ : ৪২৯)।

ছফার স্বপ্ন এমন একটি সমাজ, যেখানে ধর্ম ও সংস্কৃতি পরস্পর এক অভূতপূর্ব সাম্য সৃষ্টি করবে, এজন্য কেবল ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলার সমাজের কথা মুখে বললে বা কাগজে লিখে রাখলেই তা অর্জিত হয় না। কারণ 'ঘোষণা দিলেই একটি রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় না। একটি দরিদ্র কৃষিপ্রধান দেশ কিছুতেই এক লাফে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করতে পারে না। সে একটা সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার' (ছফা, ২০০৮ঙ:৩৯৯)। এই প্রক্রিয়া শুরু করার দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীদের। কিন্তু 'শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধের প্রকাশকাল ১৯৯৭ পর্যন্ত ছফার উপলব্ধি 'বাংলাদেশের অগ্রগণ্য প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগই বাঙালিয়ানার নামে পশ্চিমবাংলার কোলকাতাকেন্দ্রিক চিন্তাচর্চার চর্বিত চর্বণ' করেছেন (ছফা, ২০০৮ঙ:৩৯৯), যদিও এই ধরনের চর্বিত-চর্বণসর্বস্ব চিন্তা সম্পর্কে বিস্তারিত ছফার কোনো রচনাতেই পাওয়া যায় না। মুসলিম প্রধান একটি সমাজে বাঙালিয়ানার প্রচার ঘটাতে হলে বাঙালিয়ানার একটা নতুন সংজ্ঞা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ছফা সেই সমন্বয়ধর্মী বাঙালিয়ানা নির্মাণের পদ্ধতির মধ্যে দুটি বিষয় সবিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনার কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে–

প্রথমত,

> ধর্মশাসিত বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মতান্ত্রিক সামন্তচিন্তার একচ্ছত্র প্রতাপের অবসান ঘটাতে হবে। যে জাড্যতা, যে বদ্ধমত, যে কূর্মবৃত্তি এই সমাজমানসকে সঙ্কুচিত, অসহিষ্ণুতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া শুরু করা না হলে, বাঙালি মুসলমান সমাজ আধুনিক বিশ্বের সামনে নির্ভয় চিত্তে কখনো দাঁড়াতে পারবে না। বাংলাদেশে মুসলমান ছাড়া আরো নানা সম্প্রদায় রয়েছে। তথাপি মুসলমান-সমাজের কথা বললাম এ কারণে যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষ স্বেচ্ছায় যদি নিজেদের মানস পরিবর্তনের পথটি অনুসরণ না করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে বেশি কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাঙালি মুসলমানের মানস-ভুবনের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে মধ্যযুগ এখনো রাজ্যপাট বিস্তার করে আছে। মধ্যযুগীয় মানস-পরিমণ্ডলে আধুনিক যুগের আলো বিকিরণ করা সহজ কাজ নয়। বাঙালি মুসলমান নিজের ভারেই নুইয়ে আছে। (ছফা, ২০১৪:১৭৫)

দ্বিতীয়ত,

> ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির যে পাটাতনটি সৃষ্টি করেছে সম্পূর্ণরূপে নতুনভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে একটি গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড আবিষ্কার করা। বাঙালি সমাজের নানামুখী জাগরণের এই স্তরটি অবহেলা করা যেমন আমাদের সম্ভব হবে না, তেমনি নির্বিচারে গ্রহণ করাও উচিত হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মধ্যবিত্তের জাগরণের সমস্ত বীজতলাটাই ছিল হিন্দু সমাজের অধিকারে। বাঙালি সংস্কৃতিতে এই শ্রেণিটি অনেক উৎকৃষ্ট কিছু সংযোজন করেছেন, কিন্তু পাশাপাশি তাঁদের সম্প্রদায়গত প্রবণতাসমূহও চারিয়ে দিয়েছেন। (ছফা, ২০০০:৫০)

এমন সাংস্কৃতিক পাটাতন সৃষ্টি করতে হলে মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে অনেকগুলো সামাজিক আন্দোলন উত্থিত হওয়া প্রয়োজন বলে ছফা মনে করেন।

৪.১.৭

আহমদ ছফার সমাজভাবনায়ও রাজনীতিই মুখ্য। মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, চোরাচালানির অর্থনীতি বা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, আর্সেনিক দূষণ বা বইমেলার উদ্বোধন, এনজিও কর্মকাণ্ড বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যক্তিত্ব-মূল্যায়ন বা সম্পর্ক-বিশ্লেষণ সকল ক্ষেত্রেই মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ ও রাজনীতি-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে ছফা তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সমাজকে পর্যালোচনা করেছেন বিজ্ঞাননিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে। আহমদ ছফার চিন্তায় সমাজের মানুষ, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আবর্তন-পরিবর্তন-বিবর্তন সবকিছুই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে গ্রথিত। কারণ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সমাজ অগ্রসর হয়। এমনকি মানুষের রাজনৈতিক অভিলাষ-মোহ-মুগ্ধতাও কোনো-না-কোনোভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকারণের সাথে সম্পৃক্ত। সমাজ, রাষ্ট্র বা রাজনীতি– সবকিছুর মধ্যে মানুষ মুখ্য বলেই 'ইনডিভিজুয়াল' হওয়ার সাধনা অর্থাৎ ব্যক্তির চিন্তা, মানসিকতার উৎকর্ষ, নৈতিকতাকে ক্রমাগত প্রখর ও শাণিত করে তোলাকেই বাঙালির প্রধান তাড়না হওয়া উচিত বলে ছফা মনে করেন। কারণ 'সমাজ বলে তো কোন জিনিস দাঁড়িয়ে নেই– আছে ব্যক্তি, তাদের খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টা দিয়ে সমাজকে সমৃদ্ধ করে' (ছফা, ২০০৮গ:৪১৫)। এখানেই প্রশ্ন আসে নেতৃত্বের মানের সাথে ব্যক্তির উৎকর্ষ ও সমাজের সম্পর্ক নিরূপণের। একটি সমাজের নেতৃত্বের মানের সাথে ঐ সমাজের মানুষের মূল্যবোধ ও সামাজিক অবস্থার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। তাই এ বিষয়ে ছফা সমাজের মধ্যে মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার চর্চার মাধ্যমে একটি উন্মুক্ত উদার স্বস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে ব্যক্তির 'ইনডিভিজুয়ালিজম' তৈরি হয়। ছফা লিখেছেন –

> নেতৃত্ব তো অবশ্য হাওয়া থেকে জন্মায় না। নেতৃত্ব হচ্ছে– জাতীয় মনীষা, জাতীয় স্বাধীনতার স্পৃহা, মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি তার কমিটমেন্ট এগুলো থেকেই জাতীয় চরিত্র তৈরী হয়। কিন্তু যেখানে সমাজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অর্গলবদ্ধতা সেখানে যে নেতৃত্ব স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে তৈরি হয় ওগুলো 'ডেসপোটিজম' হয়ে দাঁড়ায়। এই ডেসপোটিজমের অবস্থার মধ্যে স্বাধীনতা চর্চা করার ক্ষমতা না থাকলে কোন কিছু বিকশিত হয় না। মুক্তবুদ্ধি, মুক্তচিন্তা, মুক্তচেতনা এবং প্রশ্ন করার ক্ষমতা, চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা না থাকলে কোন কিছু বিকশিত হয় না। (ছফা, ২০০৮গ:৪১৪)

সুতরাং সমাজকে অর্গলমুক্ত করতে হলে নেতৃত্বের 'মহারাজা কালচার'[৩৭] অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে নতুন প্রজন্মের যোগ্যতা ও দক্ষতাকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ না করলে প্রকৃত পরিস্থিতি উপলব্ধি করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে, একটি বিকশমান সমাজের উপযোগী রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে ছফার বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–

> আসলে একটা সমাজকে সাবালক করা, সমাজের প্রতিটি নর-নারীকে বিচারশীল, শিক্ষিত, স্বাধীনতাপ্রিয় করে তোলার মধ্যে একটা সমাজের নির্বাণ থাকে। মহামানব আসার মধ্যে নয়। এ নির্বাণের জন্য প্রয়োজন সমাজের মধ্যে ব্যাপক চলমানতা তৈরি করা, নতুন তৃষ্ণা তৈরি করার মধ্য দিয়ে। এ তৃষ্ণাটা তৈরি করা একটি জেনারেশনের কাজ। একটি পুরো জেনারেশন নতুন শতাব্দীর জন্য কাজ করবে। পুরো জেনারেশন পূর্বসূরীদের রিজেক্ট করতে পারলেই জেনারেশনের সামনে প্রকৃত পরিস্থিতি ধরা পড়বে। (ছফা ২০০৮গ:৪১৫)

৪.২ সংস্কৃতিভাবনা

শিল্প-সাহিত্য বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগের মাধ্যম– সংস্কৃতি তার প্রাণ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পদ্মা-মেঘনা-যমুনার কোল ঘেঁষে আবহমানকাল ধরে যে জনবসতি গড়ে উঠেছে তারা নদীবিধৌত উর্বর পলল-সমভূমির মানুষ। ভৌগোলিকভাবে এই জনগোষ্ঠী বন্যা-ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-নদীভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের ভেতর বেঁচে থাকার উপকরণ সংগ্রহ করে। মৌসুমী বায়ু আর বর্ষার জলমগ্ন উর্বর মৃত্তিকা এই জনগোষ্ঠীকে দিয়েছে অনায়াস ফসলের সম্ভার, করেছে কর্মবিমুখ। আবার জালের মতো জলবতী নদীর স্রোত, নদী-পাড়ের নিরন্তর ভাঙা-গড়ার অনিশ্চয়তায় মানুষ হয়েছে জীবনের প্রতি উদাসীন, আবেগপ্রবণ। মাটি, নদী আর মৌসুমী জলবায়ুর গভীর আলিঙ্গনে এই ভূখণ্ডের ভূমিপুত্রের জীবনযাপন প্রণালীর সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে গেছে প্রকৃতি। এ কারণেই, বাংলার উত্তর ও পশ্চিমে, ইতিহাসে যাকে করতোয়া-আত্রাই অববাহিকা বলে তার বৈশিষ্ট্য হয়েছে একরকম আর দক্ষিণ-পূর্বের বাংলার ভিন্নরকম। দু'ধরনের প্রকৃতি গড়ে দিয়েছে ভিন্নতর স্বভাব-সংবেদনশীলতায় সমৃদ্ধ মানুষ। হুমায়ুন কবির তাঁর *বাংলার কাব্য*-তে এ বিষয়টি চিহ্নিত করে পূর্ব বাংলার সৃষ্টিশীলতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন–

> রাঢ়-বরেন্দ্র অঞ্চলের সুস্থির প্রকৃতি ও প্রায় নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত জীবনযাত্রার তুলনায় সমতট ও বঙ্গের অস্থির-প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে 'জীবনের চঞ্চল লীলা' যে অনিশ্চয়তা ও সংগ্রামী চেতনার জন্ম দেয় তা দুই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ভাবসম্পদে বিশেষত্ব সৃষ্টি করেছে। (হুমায়ুন, ১৩৬৫:১১-১২)

প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক জীবন-জীবিকার, বেঁচে থাকার উপায় ও উপকরণের। তাই জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে প্রকৃতির সাথে মানুষ যেভাবে অভিযোজিত হয়, সংগ্রামে লিপ্ত হয় সেটাই তাঁর সংস্কৃতি। সংস্কৃতি প্রবহমান, নদীর স্রোত যেমন কূল-সংঘর্ষে গতিচঞ্চল তেমনি সংস্কৃতিও সংস্কারের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন রূপ পায়। মানুষ ও প্রকৃতি যেমন পরিবর্তিত হয় সংস্কৃতিও তেমনি পরিবর্তিত হয় এবং পরস্পর-পরস্পরকে পরিবর্তিত করে। মানুষের সাথে প্রকৃতির সংগ্রামের উপায় ও উপকরণ সময়ান্তরে বদলায় বলেই জীবিকার সাথে সম্পর্কিত অন্যসকল বিষয়ও বদলায়; প্রবৃত্তি প্রেরণা ও মানসজগত বিকশিত হয়। এসব কারণেই প্রাণীর কোনো সংস্কৃতি নেই, আছে মানুষের। প্রাণীর মানসসম্পদ নেই, মানুষেরই আছে। যে কাণ্ডটিতে সেই ভাব-সম্পদের ফুল ফোটে তাকে আমরা বলি সমাজ। সংস্কৃতি তার ভিত্তি, শেকড়। প্রকৃতির সাথে মানুষের চিরায়ত মিলন-সংঘর্ষের মাধ্যমে অস্তিত্বের যে-শিকড় মাটিতে গেঁথে যায় তার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজের কাণ্ড। সেখানে বর্ণিল সুবাসিত ফুল-ফলের অপূর্ববস্তু-সমারোহ শেষপর্যন্ত শিকড়ের অস্তিত্ব-উৎকর্ষই ঘোষণা করে। সমাজের উপরিতলে শিল্প-সাহিত্য-সংগীত তথা সকল মনোমুগ্ধকর সৃজনশীলতা সেই সমাজের মানুষের জীবনাচার-জীবনাভিজ্ঞাকেই আসলে প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে যায়। অন্যথায় প্রমাণিত হয় সংস্কৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তিমূলের দুর্বলতা তথা শিকড়-বিচ্ছিন্নতা।

আহমদ ছফার সংস্কৃতিভাবনা আলোচনা করতে গেলে মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের কাঠামো-উপরিকাঠামো দ্বান্দ্বিক-বিন্যাস বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। কারণ ছফা একটি সুন্দর সমাজ গঠনের রূপরেখা ও স্বপ্ন উজ্জীবিত করতে রাজনীতি-সংস্কৃতি-সমাজের ওতপ্রোত সম্পর্ক প্রাধান্য দিয়েছেন–

> উন্নততর সাংস্কৃতিক বিপ্লব উন্নততর রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্ম দেবে। সুন্দর সমাজই রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রাণ কথা। একটা পর্যায়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিক কর্মীদের সাংস্কৃতিক কর্মীর ভূমিকা পালন করতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীদের রাজনীতিসচেতন হতে হবে। সমাজকে সুন্দর করা রাজনীতি ও সংস্কৃতির যৌথ দায়িত্ব। (ছফা, ২০০৮চ:২১৯)

ছফা-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু– বাঙালি মুসলমান, বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং জাতিসত্তার রূপরেখা। তাঁর সমস্ত সৃষ্টিশীলতা ও কর্মোদ্দীপনা আবর্তিত হয়েছে এই ভরকেন্দ্র আশ্রয় করে। দেশ, দেশের মানুষ, ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজসংগঠনের সমস্ত অস্থিরতা সর্বান্তঃকরণে ধারণ করে প্রতিনিয়ত চিন্তার যে স্ফুলিঙ্গ তিনি ছড়িয়েছিলেন তা সময়ের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বাঙালি জাতিসত্তার হাজার বছরের পথপরিক্রমায়, ইতিহাসের পরতে পরতে যে নিগূঢ় নির্দেশনা রেখাঙ্কিত ছিল ছফা সেখান থেকে সূত্রের পর সূত্র উন্মোচন করে জানিয়েছেন বাঙালির, মূলত বাঙালি মুসলমানের, আত্মপরিচয়। সকল পশ্চাৎপদতা, গোঁড়ামি বা অধঃপতনের ঐতিহ্য মেনে নিয়েও বাঙালি মুসলমান-ই তার অভিনিবেশের বিষয় কারণ বাঙালি মুসলমান সমাজ তো পৃথিবীর সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাকে, ছফা মনে করেন, 'ওউন' না করলে প্রকৃতপক্ষে নিজকে ভিন্ন একটি কালচারে 'গ্রাফট' করা হয় (ছফা, ২০০৮গ:৩৮৪)।

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে মুসলমান পরিচয়কে পৃথকভাবে তুলে আনার কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা ছফা নিজেই দিয়েছেন। বাঙালি মুসলমান বলতে তিনি কাদেরকে বোঝান সেই ব্যাখ্যা তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন–

> যারা বাঙালি এবং একই সঙ্গে মুসলমান তাঁরাই বাঙালি মুসলমান। এঁদের ছাড়াও সুদূর অতীত থেকেই এই বাংলাদেশের অধিবাসী অনেক মুসলমান ছিলেন– যাঁরা ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যানুসারে ঠিক বাঙালি ছিলেন না। (ছফা, ২০০৮ক:১০২)

সুতরাং বাংলাদেশের মুসলমান অথবা সকল বাঙালি মুসলমানই ছফা-অন্বিষ্ট 'বাঙালি মুসলমান' শ্রেণিভুক্ত নয়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক, যারা ছিল রাজশক্তির সহযোগী, সামাজিক-রাজনৈতিক সুবিধাভোগী এবং উঁচুকোটির প্রভুত্বশীল মুসলমান তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবেচনায় রাখেননি ছফা। কারণ এই শ্রেণি সবসময়ই দেশের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সাথে দূরত্ব রক্ষা করে চলেছে। এমনকি যারা নির্যাতিত বাঙালি মুসলমান সমাজের হয়েও 'নানা ফাঁকফোকর গলে' অর্থে-বিত্তে-প্রভাবে ক্ষমতাশালী হতো এবং সে-সুবাদে নিজ শ্রেণির সাথে সম্পর্ক 'চুকিয়ে দিত' তাদেরকেও ছফা 'বাঙালি মুসলমান' সমাজের অন্তর্ভুক্ত করেননি। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান বলতে ছফা ধর্মীয় পরিচয়কে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন ততটাই দিয়েছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শোষক-শোষিতের সম্পর্কের ওপর। তাই আরো সুনির্দিষ্ট করে জানিয়েছেন যে, বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশই আদিম কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের মানুষ, আর্য বা ব্রাহ্মণ্য শক্তির কাছে পরাজিত জনগোষ্ঠী, যারা এই ভূমির 'সাক্ষাৎ সন্তান' এবং 'ইতিহাসের আদি থেকেই নির্যাতিত একটি মানবগোষ্ঠী। এই অঞ্চলে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পরে সেই যে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তিত হলো, এঁদের হতে হয়েছিল তার অসহায় শিকার। যদিও তাঁরা ছিলেন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তথাপি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রশ্নে তাঁদের কোনো মতামত বা বক্তব্য ছিল না। একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাঙলা মৃত্তিকার সাক্ষাৎ সন্তানদের এই সামাজিক অনুশাসন মেনে নিতে হয়েছিল' (ছফা, ২০০৮ক:১০৩-১০৪)। এই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করে ছফা সংক্ষেপে জানিয়েছেন, বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী মূলত নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত; তারচেয়ে বড় সত্য হল, এরা সমাজের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানবগোষ্ঠী।[৩৮]

মৃত্তিকালগ্ন সমাজ গঠন করেও এই ব্রাত্য-শোষিত মানুষগুলো কখনও ভূমির ওপর ন্যায্য অধিকারটুকুও পায়নি। অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে তারা বারবার ধর্ম পরিবর্তন করেছে; এবং এই পরিবর্তনের মধ্যেই যাবতীয় প্রতিবাদ ও ক্ষোভ মুদ্রিত রেখেছে। তাই এ কথা অনস্বীকার্য, 'নতুন ধর্ম গ্রহণ ছিল একটি নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীর আত্মরক্ষার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যবহারিক পদক্ষেপ'(ছফা, ২০০৮ক:৯৬), আজ পর্যন্ত বাঙালির আত্মরক্ষা ও প্রতিবাদের সবচেয়ে বড় ব্যবহারিক দিক।[৩৯] ঐতিহাসিকভাবে মনে করা হয়, বাংলার প্রাচীন অনার্যভাষী অস্ট্রিক নৃগোষ্ঠী

ধর্মবিশ্বাসে ছিল সর্বপ্রাণবাদী,[৪০] কোনো একক 'ডগমা' বা ধর্মবিশ্বাস কৌমসমাজভুক্ত মানুষের ছিল না। অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভোট চীনা নৃ-গোষ্ঠীর যৌথ পদচারণায়[৪১] যে আদি-কৌম সমাজ গড়ে উঠেছিল তার ভাল-মন্দ মিশানো সংস্কৃতিই বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতি। নিষাদ, কিরাত, শবর, ডোম, হাড়ি, চণ্ডাল ইত্যাদি প্রাচীন কৌম জনগোষ্ঠীর ভিন্ন-ভিন্ন লোকবিশ্বাস-সংস্কৃতি থাকলেও তাদের ভাষায় খুব একটা পার্থক্য ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন না।[৪২] পরবর্তীকালে আর্যদের কাছে বাহুবলে পরাজিত হয়ে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মঙ্গোল রক্তসঙ্কর কৌম জনগোষ্ঠীর একাংশ[৪৩] বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেলেও অপর অংশ ক্রমাগত দীর্ঘমেয়াদে সাংস্কৃতিক ও ধর্ম-সামাজিক আগ্রাসনের স্বীকার হয়। আর্যরা যাদেরকে বাহুবলে একবার পরাজিত করেছে তাদেরকেই পতিত ও ধর্মচ্যুত আখ্যা দিয়ে নিক্ষেপ করেছে জন্ম-জন্মান্তরের দাস ও অপকৃষ্টতার চক্রে। আবার শক, হুন, মঙ্গল ইত্যাদি বিজয়ীদেরকে দিয়েছে অভিজাতের তকমা। প্রাচীন বঙ্গ পর্যন্ত আর্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হতে অন্তত এক হাজার বছর লেগেছিল বলে মনে করা হয়, তা-ও বঙ্গের দক্ষিণ পর্যন্ত আসার আগেই হয়ে পড়ে শিথিল ও দুর্বল। এভাবে সময়ান্তরে ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যাঁতাকলে নিপতিত হয়ে দাসানুদাসে পরিণত হলেও বাঙালির সংস্কৃতিতে আর্য প্রভাব নিতান্তই কম বলে আরো অনেক পণ্ডিতের[৪৪] মতো ছফাও (ছফা, ২০০৮গ:৩৫২) মনে করেন। এর পেছনে ভৌগোলিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানই একমাত্র কারণ নয়, বাঙালির আদি কৌম সমাজ-ব্যবস্থার কঠোর অনুশাসন ও সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসও অন্যতম প্রতিবন্ধক।[৪৫]

ছফাও এই ঐতিহাসিক সত্যকে মান্য করেন যে, বাঙালির জাতিগত ইতিহাসের মধ্যেই অত্যাচার ও নিপীড়নের ইতিহাস বিধৃত। নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ত্যাগ করে বুদ্ধের অহিংসধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল বাঙালি জনগোষ্ঠী; কিন্তু পরবর্তীকালে সেন রাজাদের আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে তারা দলে দলে দেশত্যাগে বাধ্য হয় কিংবা বজ্রযান, সহজযান, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি আশ্রয়ে সংগুপ্ত থেকে রক্ষার চেষ্টা করে নিজকে।[৪৬] কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। ভারতের কর্ণাটক থেকে আগত সেন রাজাদের আমলে বর্ণাশ্রমপ্রথারূপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ফিরে এলে অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। বাংলায় সেন রাজত্বের আগে ব্রাহ্মণ্যবাদ, তান্ত্রিক ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং কিছু স্থানীয় অনার্য লোকদেবতার পূজা– এই তিনটি ধর্মীয় আচারব্যবস্থার অভিক্ষেপ সর্বপ্রাণবাদী লোকধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে অভিজাত ধর্মের একটি ক্ষীণধারা তৈরি করেছিল।[৪৭] সেন রাজাদের আমলে সেই ধারার সাথে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের জাতিগর্ব যুক্ত হয়ে এক অলজ্ঘনীয় ধর্ম-সামাজিক ভেদরেখা তুলে দিল। ধর্ম পরিবর্তন ছাড়া তখন অস্পৃশ্য-বর্ণহীন-ব্রাত্য সমাজের শোষিত মানুষগুলোর আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না। এ পর্যায়ে বাংলায় রাজদণ্ড নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব। এর ফলে দলে দলে নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করল শুধু তাই নয়, বর্ণভেদপ্রথায় বিপর্যস্ত হিন্দু ধর্মের মূল ধরে প্রবল টান পড়ল। কিন্তু কার্যত 'মুসলিম শাসনের পূর্বে যে সমাজ ব্যবস্থাটি চালু ছিল, পরেও সেই একই ব্যবস্থা চালু থেকেছে। তার মধ্যে কোন মৌলিক রূপান্তর বা পরিবর্তন তারা (মুসলিম রাজশক্তি) আনতে পারেননি' (ছফা, ২০০৮ক:৯৮)। ইসলামের উন্নতধারার সভ্যতা ও মহীয়ান সংস্কৃতি মধ্যপ্রাচ্যে যে সামাজিক বিপ্লব সাধন করেছিল বাঙালি মুসলমানের মধ্যে তার কোনো রেখাপাত ঘটেনি এর অন্যতম কারণ ব্যাখ্যায় ছফার এই বয়ান তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই ভূখণ্ডে সুফীসাধকদের মাধ্যমে যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল তা গৌণ; রাজনৈতিকভাবে লোদি, খিলজি, চেঙ্গিস খানের বংশধরের অশ্ব ও অস্ত্রের মাধ্যমে যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সেটাই বাংলায় ইসলামিকরণের মূলধারা।[৪৮] ফলে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এদেশে প্রবেশাধিকার পায়নি বলে ছফার মত। তবু ইসলামধর্ম গ্রহণ করে তথা আবারও ধর্ম পরিবর্তনের মধ্যেই ইতিহাসের সেই নির্যাতিত বাঙালি আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান করেছে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, বাঙালির বারবার ধর্ম পরিবর্তন কেবল অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে নয়, বাঙালি চিরকালই স্বাতন্ত্র্যসন্ধানী বলেই নতুন নতুন ধর্ম গ্রহণে তাঁর অনাগ্রহ ছিল না। এ কারণে কোনো ধর্মই বাঙালি অবিকৃত রাখেনি, তার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে সবধর্মের নতুন নতুন লৌকিকরূপ সে আবিস্কার করে নিয়েছে।[৪৯] তবে এটি এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ যে ঠিক কোন সময় এবং কোন অঞ্চল থেকে বাংলার প্রান্তিক

কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। সাম্প্রতিক গবেষণার সূত্রে শুধু এটুকু নিশ্চিত করা যায় যে, বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে গ্রাম পর্যায়ে কৃষিজীবী-মৎস্যজীবী-তন্তুবায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের প্রসার ঘটেনি।[৫০]

৪.২.১

বারবার ধর্মপরিবর্তনের পরও বাঙালি জনগোষ্ঠীর হৃদয় থেকে সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস সম্পূর্ণ অপসারিত হয়নি। বৈষ্ণব, বাউল বা পীরতন্ত্রের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলাম ধর্মের বাঙালি-নির্মিত সর্বমানবতাবাদী ও লৌকিক রূপ প্রচ্ছন্ন রূপে বিদ্যমান। মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে, কী হিন্দু বা মুসলিম, তন্ত্র-মন্ত্র, তুকতাক বা নানা অশরীরী শক্তিতে বিশ্বাস অথবা এখনও এর প্রভাব প্রমাণ করে এই প্রাচীন সংস্কারের কথা। দেখা যায়, যখনই কোনো বিশ্বাস বা ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থা বাঙালির স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা ও প্রাণশক্তিকে চেপে রেখেছে তখনই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে ভাবজগতে। মহাবীর বা বুদ্ধের বাণী আর্য ধর্ম ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সামাজিক বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিল এ কথা ড. আহমদ শরীফের (শরীফ, ২০০১:১১৯,১২০) মতো ছফাও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত বাংলার মৃত্তিকা থেকে উদ্ভূত বাঙালির এই অনার্য-অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের স্বভাবেই ছফার আগ্রহ অধিক। বাঙালি মুসলমানকে একটি সংগ্রামী জাতির ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত করতে ছফা প্রায়ই 'নির্যাতিত'ও 'প্রতিবাদী' শব্দ দুটিকে ব্যবহার করেছেন। বাঙালি মুসলমানের জাতিগত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে এই শব্দদ্বয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

বিশেষত পুথি রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান আত্মপরিচয় অন্বেষণের সূচনা করেছে। বাঙালি মুসলমানের এই সচেতন প্রয়াসের মধ্যে ধরা পড়েছে তার সামষ্টিক নির্জ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ছফার ভাষায়–

> বাঙালি সমাজের যে শ্রেণীটি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করার দরুন, তাদের মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটেছিল, সেই শ্রেণীটিতেই ছিল পুঁথিসাহিত্যের আদর সীমাবদ্ধ। তাঁরাই এর লেখক, পাঠক এবং সমঝদার। (ছফা, ২০০৮ক:৯৫)

ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ছাড়াও পুথি রচনার পেছনে নতুন সামাজিক আকাঙ্ক্ষার প্রযোজনা ছিল। একদিকে 'বাইবেলের অরিজিন্যাল সিন' বা আদি পাপের ধারণার মতো অপমানজনক দূরস্মৃতিকে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান অপরদিকে নিজস্ব বীর ও নায়ক নির্মাণের তাগিদ, একদিকে শ্রেণি অবস্থানের অসহায়ত্ব অপরদিকে উন্নত আদর্শ ও সভ্যতার প্রতি অপরিচ্ছন্ন, অন্ধ, অকেলাসিত আবেগ– সবকিছুর সমন্বিত প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল পুথিসাহিত্য। পুথিসংলগ্ন কাল ও লেখকদের মনস্তত্ত্বকে ছফা ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে–

> যে সময় ওগুলো রচিত হয়েছিল, সে সময়কার মুখ্য-গৌণ বিবদমান, বর্ধিষ্ণু যে সকল সামাজিক ধারা. ধারাসমূহের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে, আবার কোথাও সুস্পষ্টভাবে পুঁথিসাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে তুর্কি আক্রমণের ফলে আরেকটি নতুন সমাজ জন্মলাভ করেছে এবং সমাজের জনগণের একাংশের মধ্যে নতুন চলমানতার সঞ্চার হয়েছে, সেই নতুনভাবে চলমানতা অর্জনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বিকাশ করার উদ্দেশ্যেই পুঁথিলেখকেরা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। (ছফা, ২০০৮ক:৯৩)

বাঙালি মুসলমান এবং হিন্দু উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে নিজ নিজ সমাজের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এসব কাহিনী রচনা করেছে। এই সাহিত্যিক রূপায়ণের মধ্যে বিস্তর কাণ্ডজ্ঞানহীনতা[৫১], অকেলাসিত আবেগ ও উদ্ভট রসের ছড়াছড়ি থাকলেও তা একেবারে অভিনব নয়– বৌদ্ধ জাতক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মঙ্গলকাব্যসমূহেও এমন উদাহরণ বিস্তর। এমনকি আধুনিক 'প্রোপাগান্ডা লিটারেচার'ও এই শ্রেণিভুক্ত সাহিত্য বলে ছফা মনে করেন (ছফা, ২০০৮ক:৮৯)। এসব পুথি শিল্পমানে যতই পশ্চাৎপদ এবং অপরিস্রুত হোক না কেন একথা মানতেই হয়, পুথি লেখকরা যে সমাজের অধিবাসী সেই সমাজেরই চাহিদার জবাব এসব পুথি। তাই এর সীমাবদ্ধতাও সেই

সমাজেরই সীমাবদ্ধতা। ভাষাগত শ্রেণিবিভক্তি[৫২] ছাড়াও সমাজের সাংস্কৃতিক চেতনার মান, বিমূর্ত ভাব ধারণের মতো মানসিক সাবালকত্ব এবং বিদ্যমান অগ্রসর শিল্পাদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এই তিন মৌল উপাদানের কোনোটিই পুথি লেখকদের ছিল না (ছফা, ২০০৮:৯৫-৯৬)। ফলে 'শহীদে কারবালা' পুথিতে কারবালা থেকে দামেস্ক যাওয়ার পথে ধু ধু মরুপ্রান্তরে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণের উপস্থিতি কিংবা 'জঙ্গনামা' পুথিতে হযরত আলীর হাতে গদা বা তলোয়ারের আঘাতে কাফেরদের ইসলাম গ্রহণের দৃশ্যসহ আরও অনেক ক্ষেত্রে যে অতিশয়োক্তি তা পুথি লেখকদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার অপরিপক্ক প্রকাশ। এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার আরও কিছু উদাহরণ ছফার ভাষায় উদ্ধৃত করা যেতে পারে –

> আমির হামজা হাজারখানেক যুদ্ধে বিজয়ী বীর, দেশ-দেশান্তরে তাঁর তো অবারিত গতায়াত, এমন কি দৈত্যের দেশ কো-কাফে গিয়েও অসম সাহসিক কাজ সমাধা করে এসেছেন। এতেও পুঁথিলেখক তৎকালীন সমাজের প্রচলিত সংস্কার এবং শিল্পরুচির ব্যবহার করেছেন। হিন্দু-সমাজের বীরেরা যদি পাতাল বিজয় করে বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে পারেন, আমির হামজা দৈত্যের দেশে গমন করে তাদের শায়েস্তা করে আসতে পারবেন না কেন? ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে মুহম্মদ হানিফার মূল কাণ্ড কিছু নেই বলেই তো সুবিধে। কল্পনা যেভাবে ইচ্ছে বিচরণ করতে পেরেছে। হিন্দুদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে ষোলশত গোপবালা নিয়ে লীলা করতে পারেন, মুহম্মদ হানিফার কি এতই দুর্বল হওয়া উচিত যে মাত্র এ কয়টা ব্রাহ্মণকন্যাকে সামলাতে পারবেন না! (ছফা, ২০০৮ক:৯২)

এ কারণে ছফার এই অনুসিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে– 'মুসলমান রচিত পুঁথিসাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীলতা আসলে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতারই সাহিত্যিক রূপায়ণ' (ছফা, ২০০৮ক:৯৭)। এই প্রতিক্রিয়া যে একটি নতুন সমাজে জনমনে সৃষ্ট নতুন আকাঙ্ক্ষার অভিক্ষেপ তা পূর্বের কয়েকটি অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ছফা আরও জিজ্ঞাসা ও ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ করেছেন যে, প্রায় একশ বছর পরেও ''শহীদে কারবালা'র ব্রাহ্মণ আজর ঊনবিংশ শতাব্দীর মীর মোশাররফ হোসেনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু'তেও একই স্থানে, একই পোশাকে, একই চেহারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মধ্যিখানে কয়েক শতাব্দীর পরিবর্তন কোনো ভাবান্তর আনতে পারেনি' (ছফা, ২০০৮ক:১০৭)। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী গদ্য লেখক মীর মশাররফ হোসেনের মতো শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে কীভাবে মেনে নিয়েছেন তার উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে ছফা এটিকে উল্লিখিত প্রতিক্রিয়ার সদূরপ্রসারী জের বলে মীমাংসা টেনেছেন এবং এমনকি 'বিংশ শতাব্দীতেও এই মনের বিশেষ হেরফের ঘটেনি।' (ছফা, ২০০৮ক:১০৭) বলে আমাদের চিন্তাকে প্রসারিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

মীর মশাররফ হোসেনের কালে এসেও বাঙালি মুসলমানের চিন্তার এই বিশেষ স্থবিরতাকে শুধু প্রতিক্রিয়ার জের বলে মানতে চাননি ছফা। 'বাঙালি মুসলমানের মনের ওপর সুদীর্ঘকালব্যাপী একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির দরুণ বিস্তারিত গাঢ় মায়াজাল'-কে জাতির রূপকথার[৫৩] সাথে তুলনা করে লেখা যায়, বাঙালি মুসলমানের সামষ্টিক নির্জ্ঞান স্তরে এই রূপকথা 'এক ধরনের ইচ্ছাপূর্ব বা ইচ্ছাতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা' আরোপ করে রেখেছে। তাই ছফার ভাষায় 'মানসিক ভীতি'তে নিমজ্জিত বাঙালি মুসলমান এই বাধ্যতার বাইরে পা রাখতে সাহস করে না (ছফা, ২০০৮ক:১০৭)।

৪.২.২

'বাঙালি মুসলমানের মন' প্রবন্ধে আহমদ ছফা একজন অনুসন্ধানী সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বাঙালির সমাজমানস ও সৃষ্টিশীল মননবিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন। মানুষের অপার সম্ভাবনা এবং সৃষ্টিশীলতার কথা বারবার অনুরণিত হয়েছে তাঁর বাক্যে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তির পথে তিনি আস্থা রেখেছেন। দেশ-জাতি-সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে কল্যাণময় বিশ্বচিন্তা তার স্বপ্নকে চির জাগরুক রেখেছে। বাঙালি জাতিসত্তার নৃতাত্ত্বিক ভিত্তিমূল থেকে আহৃত প্রাণশক্তিকে আহমদ ছফা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন এ গ্রন্থের প্রায় সবগুলো প্রবন্ধে। তবে মানুষের ক্ষমতা

ও সম্ভাবনাকে বিশ্বপরিমণ্ডলে বিস্তৃত করে একটি সর্বমানবীয় কল্যাণভাবনায় বিকশিত শোষণমুক্ত সমাজগঠনের আকাঙ্ক্ষাই তার চেতনার মূলভিত্তি। বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে একটি অখণ্ড জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত করার এই প্রেরণা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাজাত, ফলে মুক্তিযুদ্ধপূর্ব ও অব্যবহিত পরের রচনাগুলোতে এই বোধ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। যেমন 'একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশ শ' বাহাত্তর' প্রবন্ধে সদ্যস্বাধীন দেশকে নিয়ে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য এবং আত্মপরিচয় ঘোষণার গর্বিত উচ্চারণ থেকে এই উপলব্ধি চিহ্নিত করা যায়–

> ইতিহাসে এই প্রথম বাঙালি জাতি নিজে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিল, ইতিহাসে বাংলাভাষা এই প্রথম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেল। এটা আপনি আপনি ঘটেনি। যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে স্মরণকালের ইতিহাসে তার জুড়ি নেই। এজন্য বাংলার প্রতিটি মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কারণেই গর্ববোধ করতে পারে। এই গর্ববোধই বাংলাদেশে নবযুগ এবং নবজাগরণের গতি-প্রকৃতি বেগ আবেগ সঞ্চার করবে। (ছফা, ২০০৮ক:১৪৮)

বাংলাদেশ রাষ্ট্র একটি 'ঐতিহাসিক পদ্ধতির ফল' এবং এই রাষ্ট্রটি 'বাঙালিরও নয় মুসলমানেরও নয়' আহমদ ছফার এমন মন্তব্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরিচয় এবং এ রাষ্ট্রের অধিবাসীর জাতিসত্তার বিষয়টি জটিল করে তোলে। বাঙালি মুসলমানের যে ধারাবাহিক উত্থান ও আত্মআবিষ্কারের ইতিবৃত্ত ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নির্যাতিত মানুষের ঐতিহাসিক ঐক্য ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সময়োপযোগী মেলবন্ধনই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম সম্ভব করে তুলেছিল। ছফার দৃষ্টিকোণ থেকে সেই নির্যাতিত জনগোষ্ঠী নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর বাঙালি মুসলমান পরিচয়ে স্থিত হয়েছে। তারাই এই ইতিহাসের মুখ্য অংশ এবং এই ধর্মীয় পরিচয়টি, ছফার বিবেচনায় চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক পদ্ধতির ধারাক্রম অনুসরণ করলে পাকিস্তান আদায়ের আন্দোলন এবং পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আন্দোলন উভয়ই ছফার নিকট গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আন্দোলনও বোঝান তিনি।

বাঙালি মুসলমানের সামষ্টিক নির্জ্ঞান স্তরে যে ঐতিহাসিক ভীতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা শতশত বৎসর ধরে পুঞ্জিভূত হয়েছে তার প্রথম উৎসারণ এবং উৎক্রান্তি সংস্কৃতিতেই পরিলক্ষিত হয়। আহমদ ছফা বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ও প্রতিক্রিয়ার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন, এখানেও বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত এবং প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীল। সমাজ ও জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন ঘটানোর মতো কোনো সক্রিয়তা মুসলমানদের মধ্যে ছিল না। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কতিপয় মুসলমান যে পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন তা-ও মূলত ক্ষমতা হারানোর যন্ত্রণাতাড়িত প্রতিক্রিয়াই বলা চলে; যার সম্পর্ক উচ্চশ্রেণির মুসলমানের পাওয়া না-পাওয়ার সাথে। বাঙালি মুসলমানের এই নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ 'ধর্মীয় বদ্ধমত এবং সংস্কারকে আঘাত করে এমন কোনো সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে জেগে উঠতে পারেনি। মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত প্রায় সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ড এই ধর্মীয় পুনর্জাগরণভিত্তিক' (ছফা, ২০০৮ক:১০৬) এ কারণেই কেবল ওয়াহাবি এবং ফরায়েজি আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানের সক্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া মুসলমানদের সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের ইতিহাস যতটুকু তা হিন্দু সমাজের উদ্যোগ ও আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত।

৪.২.৩

সংস্কৃতি জাতির সামাজিক বা রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার অনির্বাণ বাতিঘর। ছফা মনে করেন, উপমহাদেশের সকল বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী নিশ্চিতভাবেই বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গজ সন্তান। বাংলাদেশের মানুষ একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে যে-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে তা কয়েক শতাব্দী আগে ইউরোপে গঠিত বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের অনুরূপ যেগুলোর মধ্য দিয়ে ইউরোপের স্থানীয় ভাষাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। নানা

ঐতিহাসিক কারণে উপমহাদেশে এই বোধটি অনেক পরে বিকশিত হওয়ায় একথা নির্দ্বিধায় বলতে চান যে, উপমহাদেশের সবচেয়ে আধুনিক রাষ্ট্রাদর্শের নাম বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে দেশ ও জাতীয়তার প্রশ্নে ছফা-মানসে আবেগ ও প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লিষ্ট হয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন রচনা *জাগ্রত বাংলাদেশ*(১৯৭১) থেকে যে গৌরবময় গন্তব্যের সুন্দর ইশারায় তাঁর অগ্রযাত্রা, স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতার ঘাত-প্রতিঘাতে সেই স্বপ্ন অনেকটাই বিবর্ণ, বিস্রস্ত। এ সময়ের রচনা 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস', 'তথাকথিত তপসিলী সম্প্রদায়', 'কৃষি-বিপ্লব প্রসঙ্গে', 'বাঙালি মুসলমানের মন', 'সাম্প্রতিক বিবেচনা','বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'(দ্বিতীয় খণ্ড), 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা', 'পেশাজীবীরা রাজনীতিতে আসে না কেন','বাংলাদেশ : দেশ ও জাতি', 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল : একটি সেন্টিমেন্টাল মূল্যায়ন','বঙ্গভূমি আন্দোলন', 'রাষ্ট্র ধর্ম, মুক্তিযুদ্ধ : বাংলাদেশের হিন্দু ইত্যাকার প্রসঙ্গ', 'শেখ মুজিবুর রহমান', 'তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান', 'বাংলাদেশকে যেভাবে দেখি', 'ধনতন্ত্রের নবপর্যায় ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা বর্তমান', 'একাত্তর : মহাসিন্ধুর কল্লোল', 'ভেবে দেখতে বলি', 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শোভাযাত্রা', 'বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র', 'ভারতীয় দৃশ্যপট' ইত্যাদি প্রবন্ধে ছফার রাজনৈতিক বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও পরিকল্পনা-প্রত্যাশা প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রবন্ধের মূলসুরে কোনো না কোনোভাবে গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চালচিত্রের অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ, ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধ-জাতীয়তাবাদ-জাতিসত্তা এবং উপমহাদেশীয় আঞ্চলিক রাজনীতিক চালচিত্র ।

১৯৮০ সালে রচিত 'বাংলার চিত্র ঐতিহ্য : সুলতানের সাধনা' প্রবন্ধের উপসংহারে মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণির অবসিত সৃজনক্ষমতা ও লক্ষ্যহীন শূন্যতার পরিণতিকে আহমদ ছফা একটি অসামান্য চিত্রকল্পে বিন্যাস্ত করেছিলেন। তার আগে সেই সময়ের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতের স্থবিরতাকে চিহ্নিত করে ছফা লিখলেন–

> ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নতুন আরেকটি শ্রেণীর ডাক পড়েছে। কিন্তু বিশ্লিষ্ট হয়ে সে শ্রেণীটি কোন আকার লাভ করেনি। মধ্যশ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা পরস্পর বিজড়িত হয়ে রয়েছে, কার লক্ষ্য কোথায় স্থির করা হয়নি। প্রথম শিল্প সাহিত্যেই তার প্রভাবটা বড় বেশি তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হতে থাকল। (২০০৮ক:১৭৪)

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫-এ বাঙালির অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যু, বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা, সদ্যস্বাধীন দেশকে নিক্ষেপ করে অপরিণত জন্মের বিপৎসংকুল বাস্তবতায়। এমন পরিস্থিতিতে ছফার সেই চিত্রকল্প নির্মম অথচ সত্য –

> বাঙালির দোদুল্যমান জাতীয়তার বোধটি আরো দুলিয়ে দিয়ে তাঁদের নায়ক শেখ মুজিবকে সপরিবার নিরস্তিত্ব করে দিল নিষ্ঠুর সময়। জাতি অর্ধেক ভূমিষ্ঠ হল, অর্ধেক রয়ে গেল ইতিহাসের জরায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে। (২০০৮ক:১৭৩)

এই চিত্রকল্প শুধু আলঙ্কারিক নয়, ইতিহাসের বিমূর্ত রেখাঙ্কনও। অনিষ্পন্ন, দোদুল্যমান এবং অপরিজ্ঞাত জাতীয়তার ফাঁপা উত্তেজনা সংবেদনশীল মানুষের চেতনা ও অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে অতৃপ্তি ও অনির্দেশ্যতার জন্ম দিতে বাধ্য। সময়ের এই স্তরবহুল ও প্রশ্নসংকুল বাস্তবতাকে এড়িয়ে আত্মবিবরবাসী, কলাকৈবল্যবাদী কোনো মন্ময় শিল্প-সাধক হওয়া আহমদ ছফার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই জন্মলগ্নের অসম্পূর্ণতার কারণ অনুসন্ধানে জীবনব্যাপী কষ্টকর এক সত্তাসন্ধানী-অভিযাত্রা অব্যাহত ছিল তাঁর। তিনি বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন সংস্কৃতির প্রবহমানতায়, ভাষার গর্ভে, ধর্মের আশ্রয়ে সর্বোপরি জীবনসংগ্রামের দৃঢ়তায়। বাঙালির জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিহিত তার ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায়– শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্তার মধ্যে।

বাঙালি মুসলমানের সামাজিক আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ দেখা যায় পুথি সাহিত্যের মধ্যে, ছফার চিন্তাসূত্রে বিষয়টি আগেই গ্রন্থিত ছিল। দেশবিভাগের পূর্বেই মুসলিম মনীষীগণ দীর্ঘদিনের দুর্বলতা ও আবেগের তারল্য ঝেড়ে ফেলে হীনম্মন্যতাবোধমুক্ত, গতিশীল সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন কিন্তু বিভাগ-পরবর্তী কালে এসব সাহিত্যিকদের

একাংশ, যারা বাংলাদেশে তথা পূর্ব বাংলায় চলে আসেন, তাদের সৃষ্টিশীলতায় বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয় (ছফা, ২০০৮গ:১৬৫)। এ প্রসঙ্গে *সংস্কৃতির জীয়নকাঠি* প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জসীম উদ্‌দীন, আব্বাসউদ্দীন এবং জয়নুল আবেদীনের মতো যশস্বী মনীষীদের সৃষ্টিকর্ম পূর্বাপর তুলনা করে ছফার জিজ্ঞাসা–

> সমস্ত সৃষ্টিশীল প্রতিভাগুলো বাংলাদেশে এসে হঠাৎ করে এমন ভাবহারা, কল্পনাহারা, তেজহারা হয়ে পড়লেন কেন? সৃষ্টিশীল শিল্পীর জীবনের সঙ্গে আর্থিক সচ্ছলতার বিনিময় করে তাঁরা তুষ্ট হতে পেরেছিলেন কি ?

এবং জিজ্ঞাসার সরাসরি উত্তর –

> পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির একটা অঘোষিত দ্বন্দ্ব রয়েছে। সে দ্বন্দ্বের প্রভাবেই এককালের বাংলার সৃষ্টিধর শিল্পীরা ঐতিহ্যের কোল থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছিলেন। (ছফা, ২০০৮গ:১৬৫)

এই অঘোষিত দ্বন্দ্বের ফলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক গতিধারা বারবার রুদ্ধ ও আক্রান্ত হয়েছে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি দ্বারা। তথাপি 'সংস্কৃতির আশ্রয়েই বাংলাদেশে নতুন জাতীয় সত্তার বিকাশ, পুষ্টি এবং সমৃদ্ধি, বাংলার ঐতিহাসিক অহং-এর চৈতন্যোদয়, বাঙালির অন্তর্লোকের অচিন্তিত-পূর্ব জাগরণ।' (ছফা, ২০০৮গ :১৬১) এই সত্য অনুধাবনে বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রসর অংশ ব্যর্থ হয়নি। তাই বাঙালি সংস্কৃতি নির্মূলকরণের ষড়যন্ত্রে এদেশের সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু আরেক শ্রেণির শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিবেক ও নৈতিকতাকে বিক্রয় করে শোষকদের এই হীন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিল, যারা, ছফার ভাষায়) 'রবার স্ট্যাম্প মার্কা ব্যক্তিত্ব' (ছফা, ২০০৮গ:১৭৫। বিভাগপূর্ব কালের সফল সাহিত্যিক ও মনীষীগণ এই ঐতিহাসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে একরকম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। পাকিস্তানি শাসকদের দুরভিসন্ধি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কে, কতটা সহযোগিতা করবেন তার উপর ভিত্তি করে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে বিনির্মিত সুবিধাবাদিতার মেরুকরণ থেকেই জন্ম তথাকথিত পাকিস্তানবাদী সাহিত্য এবং 'তমুদ্দুন'-এর।

সে তুলনায়, বাঙালির সাংস্কৃতিক বিকাশ ও সমৃদ্ধি অর্জনে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিকে আরও উদার এবং সহায়ক মনে করেন ছফা কারণ বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে স্বীকৃত যে সময় তা ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রত্যক্ষ পরিচর্যায় লালিত। এদিক থেকে ছফা-মানসে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙালি মনীষীদের অধিকাংশের চিন্তাধারা ও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ঢাকাকেন্দ্রিক 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মনীষীদের ভাবনার প্রভাব সুস্পষ্ট–

> ইউরোপীয় কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অধীন উপনিবেশের সংস্কৃতিতে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের মত হস্তক্ষেপ করেছে, তার প্রমাণ নেই। বাংলা-সাহিত্যের যে সময়টিকে আমরা স্বর্ণযুগ বলে ভাবতে অভ্যস্ত ব্রিটিশ শাসনামলেই তার উন্মেষ এবং বিকাশ, বলতে গেলে ইউরোপীয় সংস্কৃতির হাত ধরেই বাংলার সংস্কৃতি পূর্ণতার পথে ধাবিত হয়েছে।
> (ছফা, ২০০৮গ:১৬৫)

কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী 'ঐতিহ্যের কোল থেকে সবলে ছিনিয়ে এনেছে বাংলার সংস্কৃতি এবং সকল সময় চেয়েছে একটি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক খাতে গোটা জাতির চেতনা প্রবাহিত হোক' (ছফা, ২০০৮গ:১৬৫)। এ সময়ে সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িকতার মোড়ক দিতে হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যকে তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্ভট প্রচেষ্টা শুরু হয়। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে জাতীয়সাহিত্য সৃষ্টির উন্মাদনায় রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেয়ার আয়োজন শুরু হয়, এমনকি নজরুলের লেখাও সাম্প্রদায়িকতার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। পাঠ্যপুস্তকেও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা ছাপ ফেলে যায়; ভারতীয় মিথ এবং হিন্দু লেখকদের সাহিত্য বর্জন বা গুরুত্বহীন করার আত্মবিনাশী আয়োজন চলতে থাকে। পাশাপাশি ফররুখ আহ্‌মদ এবং তার অনুসারী একশ্রেণির সাহিত্যিক বাঙালি চেতনাকে বাংলার আলো-জল-হাওয়া থেকে উষর মরুভূমিতে ঠেলে দেবার চর্চা করেছেন নিষ্ঠার সাথে; ইতিহাসবোধকে লাঞ্ছিত করে পাললিক মৃত্তিকালগ্ন কৃষিজীবী মানুষের সংস্কৃতিকে আরব-ইরানের পতাকাবাহী শেকড়বিচ্ছিন্ন এক উদ্ভট জগাখিচুড়ি সংস্কৃতিতে রূপ দেয়ার প্রয়াস রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় চলতে

থাকে। এরপরই ভাষা আন্দোলনের চৌ-মোহনায় উপস্থিত হয় বাঙালি। বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতি যুগপৎভাবে হিন্দু-মুসলমানের সৃষ্টি– এই সত্য চেতনার মশাল হয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নাগরিক-গ্রামীণ মানুষের হৃদয়ে যে সাংস্কৃতিক মুক্তির আলোক বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিল তা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। এতে সমাজের চিন্তাশীল অংশের সুচিন্তিত নেতৃত্বের কোনো বালাই ছিল না বলে মনে করেন আহমদ ছফা (২০০৮গ:১৭৪)। তার মতে এ আন্দোলন বা এর নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে সমুদ্রগর্ভে প্রবালদ্বীপের মতো ধীরে ধীরে কিন্তু সংহত রূপে। সমুদ্রগভীর জনতা সময়ের প্রয়োজনে নেতৃত্ব ঠিক করে নিয়েছে।

মাতৃভাষাই সংস্কৃতির জীয়নকাঠি। তাই ভাষা-আন্দোলনকে 'বাঙালি জাতির ইতিহাসের নবযুগের প্রবেশপথের তোরণদ্বার' আখ্যা দিয়ে আহমদ ছফা লিখেছেন–

> যেদিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতি মধ্যযুগীয় বোধ, বিস্মৃতি এবং মোহনিদ্রা থেকে জেগে মজ্জাগত শৌর্যে স্থিত হয়ে আপন জাতীয় অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং বিকাশ কামনা করেছে। গোড়ার দিকে এ আন্দোলন শিক্ষিত নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র তরুণদের মধ্যে সীমিত থাকলেও একে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক সংগ্রামের চৌ-মোহনা বলা যেতে পারে। ভাষা আন্দোলনের রক্তস্নানে স্নাত হয়ে বাংলাদেশে সংস্কৃতিতে প্রতিবাদের রক্ত-মুকুল দল মেলেছে। (ছফা, ২০০৮গ:১৬৯)

স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক-রাষ্ট্রিক 'আইডেনটিটি' কে বাঙালির সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনের ধারায় একটি স্বতন্ত্র উৎসমূল থেকে প্রবহমান স্রোতের মতো দেখেছেন আহমদ ছফা। বাঙালি মুসলমান তাঁর মনের আদিম সংস্কার ও মানসিক ভীতি ত্যাগ করে স্বাধীন চিন্তায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে। তবে গোড়া থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে বাঙালির অঘোষিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত *সংস্কৃতির জীয়নকাঠি*[৫৪] প্রবন্ধে ছফা লিখেছেন–

> পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই বাংলার সংস্কৃতিকে ইসলাম এবং মুসলমানিত্বের ছাঁচে ফেলে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট করার একটা অতন্দ্র প্রচেষ্টা চলতে থাকে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম-পাকিস্তান একটা সংস্কৃতির অন্তর্বর্তী এলাকা বলে চালাবার জন্য শাসকগোষ্ঠী মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেন। (ছফা, ২০০৮গ:১৬৫)

এই চেষ্টার নানা হীন ও ঘৃণ্য কর্মপন্থা একশ্রেণির বাঙালি মুসলমান, ছফার শব্দে যারা 'পাকিস্তানি জগাখিচুড়ি সংস্কৃতির অফিসার', সক্রিয় সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু এতকিছুর পরও ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সেই হীন প্রচেষ্টা রুখে দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিজয় সূচিত হয়। ছফা লিখেছেন–

> উনিশ শ' বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলন বাঙালি জাতির ইতিহাসের নবযুগের প্রবেশপথের তোরণদ্বার। যেদিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতি মধ্যযুগীয় বোধ, বিস্মৃতি এবং মোহনিদ্রা থেকে জেগে মজ্জাগত শৌর্যে স্থিত হয়ে আপন জাতীয় অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং বিকাশ কামনা করেছে। গোড়ার দিকে এ আন্দোলন শিক্ষিত নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র তরুণদের মধ্যে সীমিত থাকলেও একে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক সংগ্রামের চৌ-মোহনা বলা যেতে পারে। ভাষা আন্দোলনের রক্তস্নানে স্নাত হয়ে বাংলাদেশে সংস্কৃতিতে প্রতিবাদের রক্ত-মুকুল দল মেলেছে। (ছফা, ২০০৮গ:১৬৯)

এখানে সেই 'ঐতিহাসিক পদ্ধতি'র ধারা ও 'মানসিক ভীতি' থেকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাঙালি মুসলমানের, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যাদেরকে ছফা এই নামে চিহ্নিত করেছেন তাদের, চিরায়ত প্রতিবাদী চারিত্র্যও এসময় প্রকাশিত হয়েছে। একারণে ছফা মনে করেন 'বাঙালি মুসলমানের পলিটিক্যাল উইলটা কখনো জন্মায়নি। ২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্য দিয়ে যেটা জন্মেছে সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল উইল। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নয়, এটা পৃথিবীর দিকে অগ্রযাত্রা।'[৫৫] (ছফা, ২০০৮গ:৩৮৮)

প্রথমে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের সামষ্টিক চৈতন্যে একটি সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বোধোদয় ঘটে। এই আত্ম-উদ্বোধন ও জাতিগত এষণা ক্রমশ স্বাধীকার চেতনার জন্ম দেয়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের সামষ্টিক সজ্ঞায় যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল তা-ই ক্রমশ প্রতিরোধের পথ বেয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নেয় ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে। ঔপনিবেশিক অখণ্ড-বাংলার দীর্ঘ রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, ভারতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতির বহুমাত্রিক বহুপাক্ষিক বিভক্তি, ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব-বাংলার সাথে ভারত ও পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক সম্পর্কে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক ও ঐতিহ্যিক গুরুত্ব-দূরত্ব ইত্যাকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত-জটিলতাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে যে গণচেতনা ও সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয় তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে ছয় দফা আন্দোলন থেকে ৭০-এর নির্বাচন পর্যন্ত। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে এ সময় স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক চেতনাই যে এর চালিকা শক্তি তা বারবার প্রমাণ করেছে এ দেশের জনগণ। এ সময়ের রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'সিকি শতাব্দীরও কম সময়ে' প্রবন্ধে আহমদ ছফা লিখেছেন-

> হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি জনগণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থনে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হলেন। বাংলাদেশে ইসলাম- মার্কা, পাকিস্তান-মার্কা রাজনৈতিক দলের অভাব ছিল না। তাঁরা নির্বাচনী প্রচারে পাকিস্তানের অখণ্ডতার কথা তারস্বরে ঘোষণাও করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তাঁদের কথা বিশ্বাস করেননি। তাছাড়া আরো রাজনৈতিক দল ছিল – তাঁদের রাজনৈতিক, সামাজিক প্রাগ্রসর কর্মসূচিও ছিল। তবে উপস্থিত মুহূর্তে বাঙালি উদারনৈতিকতাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বনাম পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অঘোষিত যুদ্ধে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। জাতীয়তাবাদ প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদের সমর্থন করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করতেন। এটা ভুল কি নির্ভুল ছিল সেকথা বড় নয়। আসল কথা হল জনগণের আস্থা তাঁরা পাননি। তাই বাংলার জনগণ বাংলার গণতান্ত্রিক দাবির নামে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করেছেন। (ছফা, ২০০৮গ:১৬১)

অন্যদিকে অনেকটা আত্মপক্ষ সমর্থনের স্বরে আহমদ ছফা লিখেছেন, পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক জান্তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অখণ্ডতার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল, 'মুজিবুর রহমান এবং তার দল আওয়ামী লীগের অঘোষিত লক্ষ্য যা-ই থাকুক, কখনো তাঁরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। ছয়দফায় বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায্য দাবির কথাই বলা হয়েছিল'; আওয়ামী লীগ কেবল 'বাংলার ইতিহাসের অহংকে পুষ্ট করে তুলেছিলেন' (ছফা, ২০০৮:১৬০,১৬১)। এভাবে জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্নে ইতিহাস-বাহিত এক অহংপুষ্ট জাতিসত্তার সূত্র ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে এবং তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় ইতিহাসের বহু জঞ্জাল ও জড়তা, ভীতি ও নিষ্ক্রিয়তাকে। পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামো বা এর রূপরেখার মধ্যে এই চেতনাকে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। ছফা মনে করেন এই চেতনা হল, একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষার সাথে একটি উন্নত-দীপ্ত ধারার সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়ে মুক্ত-স্বাধীন ও শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার চেতনা। কিন্তু এই চেতনার বাস্তবায়ন যে-মুক্তিযুদ্ধে, সেই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আহমদ ছফার দৃষ্টিভঙ্গি যুদ্ধকালীন বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাজারিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নতুন বাস্তবতায় নতুন সমাজসৃজনে সাফল্য-ব্যর্থতা ও প্রত্যাশা-প্রাপ্তির সম্পর্ক নিপণে নিয়োজিত ছিল। তাই ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত *বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা* প্রবন্ধে ছফা মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ও বিশ্বের, বিশেষত ভারতের, রাজনীতির প্রকৃতি-প্রবণতার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে একদিকে দেশ-বিভাগোত্তর কালে পূর্ব-বাংলার পরিবর্তমান আভ্যন্তরীণ সমাজ ও রাজনীতির জারণ-বিজারণে বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ, স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব, যুদ্ধ পরিচালন, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে অপরদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির গতি-প্রকৃতি, কূটনৈতিক তৎপরতা, আন্তর্জাতিক বিশ্বে সম্পর্কের সমীকরণ তথা ঐতিহাসিক বন্ধুতা-বৈরিতার পালাবদল আহমদ ছফা উদ্ঘাটন করেছেন নিবিষ্ট পর্যেষণায়।

পাকিস্তান নামক একটি বিসংগত রাষ্ট্র গঠনের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলো মুখ্যত বাঙালি মুসলমান জনগণ। হয়ত এ কারণেই ছফা বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের মূলে পাকিস্তান সৃষ্টি ও ভাঙার বা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য বাঙালি মুসলমানের আকাঙ্ক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এ যুদ্ধ 'পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ারও সংগ্রাম'[৫৬] এমন উপপত্তির মধ্যে ইতিহাসের নতুন কোনো ঘটনা বা পুরনো ঘটনার নতুন তাৎপর্য উপস্থাপিত না হলেও এতে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন থাকে বলেই হয়ত ছফা এমন শব্দে আস্থা রেখেছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গে ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও অভিজাত বাঙালি-অবাঙালি মুসলমানের শ্রেণিস্বার্থ একবিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছিল আবার ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রহিত হলে বর্ণহিন্দুর শ্রেণিস্বার্থ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই দুয়ের মাঝে যা ঢাকা পড়ে যায় তাহল বাঙালির ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। *বাংলাভাষা:রাজনীতির আলোকে* প্রবন্ধে ছফা জানিয়েছেন তার কারণ–

> একথা বলা পুরোপুরি ঠিক হবে না যে তৎকালীন বাংলায় ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনার উন্মেষ আদৌ ঘটেনি। ব্রিটিশ সরকারের বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রতিবাদে শিক্ষিত বাঙালি জনগণ যে ব্যাপক অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলনের সূচনা করেন, চরিত্রের দিক দিয়ে তাতে ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু তা ঠিক খাতে প্রবাহিত হতে পারেনি। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ দুটি পরস্পর মিলেমিশে গিয়েছিল। কোনটাই নির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে পারেনি। তাই হৃদয়াবেগ এবং প্রাণ-ধর্মের দিক দিয়ে বাঙালি হয়েও বাংলার মনীষীবৃন্দ জাতীয়তার আসল সংজ্ঞা কি তা ধারণা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। (ছফা, ২০০৮খ:২২০)

তার কারণ, ছফাই জানিয়েছেন, মুসলিম ও ইংরেজ পূর্ববর্তী দুই দীপ্র ও সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব অতিক্রমের সামর্থ্য বাঙালি মনীষার হয়নি (ছফা, ২০০৮খ:২২০)। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭-এ দ্বিতীয়বার বাংলা ভাগ হওয়ার প্রেক্ষাপটে বাঙালি হিন্দুর জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙালি মুসলমানের জন্য পূর্ববাংলা হল বাসভূমি। এই নির্মম সত্যই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতায় 'হিন্দু বাংলা' ও 'মুসলিম বাংলা' ভেদরেখায় পর্যবসিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'কে 'মুসলিম বাংলা' ধারণার অন্য নাম বলেছেন কেউ কেউ[৫৭]। আবার স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের পরও স্বাধীন বাংলাদেশে উপর্যুপরি বঞ্চনার প্রেক্ষিতে চিত্তরঞ্জন সুতারের নেতৃত্বে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' নামে বাঙালি হিন্দু সাম্প্রদায়িক অঞ্চল-ভাবনাও উদ্ভূত হতে দেখা যায়। তাই আহমদ ছফা মনে করেন, বাঙালি মুসলমানের মূল সংকট আসলে জাতিসত্তা চিনতে না পারার সংকট। কিন্তু এই, অসংজ্ঞায়িত জাতিসত্তাই যখন পাকিস্তানের ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল তখনই বাঙালি মুসলমান বিদ্রোহ করেছে। এই সচেতনার মূল উৎস সংস্কৃতি, যা ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পল্লবিত হয়েছিল। তবে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সাথে অর্থনৈতিক মুক্তির সম্পর্ক জড়িয়ে যে স্বাধীকারচেতনার জন্ম হয় তার মধ্যে ভাষার ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেকথা ছফার বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়–

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা হাতে-নাতে প্রমাণ করেছে, আদতে ভাষা এবং সংস্কৃতির সংগ্রাম জাতীয়তার সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়। ভাষাগত অধিকারের দাবিতে এর প্রারম্ভিক অভ্যুত্থান ঘটলেও পরিধি অনেকদূর প্রসারিত। অর্থনীতির মধ্যেই নিহিত তার আসল কার্যকারণ সম্পর্ক। ভাষা এবং সংস্কৃতির দাবি অর্থনীতিক স্বায়ত্তশাসনের পূর্বশর্ত। (ছফা, ২০০৮খ:২২১)

সুতরাং ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ থেকেই জাতীয় চেতনা থেকে ধীরে ধীরে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার যে-অঙ্কুরোদ্গম বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে শতদল-বিকশিত হয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সংহত রূপ লাভ করেছিল তা ছফার বর্ণনাতেই পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দুই অর্থনীতি প্রবর্তনে বাঙালি অর্থনীতিবিদদের প্রস্তাবকেও জাতীয়তাবোধের উৎসারণ বলা অযৌক্তিক হয় না। কারণ 'দুই অর্থনীতি তত্ত্বকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় কর্মসূচি ছয়দফা প্রণয়ন করে' (ছফা ২০০৮ঙ:২৪২)। উপরন্তু এসময়ের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসারে বামপন্থী রাজনীতির সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধিতা, সমাজতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ব্যাপক ভূমিকা

রাখে[৫৮]। তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল সাহিত্যও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এসব তরুণদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে[৫৯]। কিন্তু আহমদ ছফা জানালেন–

> বাঙালি জনগণ যে আলাদা একটি জাতিসত্তা– এখানকার ডান-বাম কোন রাজনৈতিক দলের ঘোষণাতেই তাঁর সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি মেলে না। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই বাঙালি জাতিসত্তা নিজেকে উন্মোচিত করেছে। মনীষা ও প্রজ্ঞার বলে সচেতন বুদ্ধি খাটিয়ে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির নিরিখে এই জাতিসত্তার অস্তিত্ব কেউ আবিষ্কার করেনি। না কোন দল, না কোন নেতা। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪২)

অথচ তাঁর এ বক্তব্যের আগেই তিনি বাঙালি মুসলমানের মধ্যে জাতিসত্তা প্রস্ফূটনের দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন–

> যে পদ্ধতিতে অখণ্ড ভারতের বিকাশমান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে একটি অনতিদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান হারে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমান জনগণের একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন, সেই একই পদ্ধতি বাংলাদেশ সৃজনের পেছনেও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪২)

অর্থাৎ বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনেও ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক-আর্থিক যুক্তিসমূহ, ছফা যাকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলে প্রায়শই উল্লেখ করেছেন, নানা ঘাতপ্রতিঘাতে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু মধ্যশ্রেণিউদ্ভূত জাতীয়তাবাদীদের মতো সামন্ত-অধিপতি-শ্রেণিভুক্ত পাকিস্তানি শাসক-গোষ্ঠীরও যে 'আর্যামির ভড়ং' ছিল একথা প্রমাণিত সত্য। উপমহাদেশে ইসলামের গোড়াপত্তন থেকেই সমাজে যে উচ্চ-নীচ তথা আশরাফ-আতরাফ ভেদ দেখা যায় তা যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ইসলামী রূপ সেকথাও অমূলক নয়। কারণ আমরা জানি, বারবার ধর্মপরিবর্তন করেও নিম্নবর্ণের নির্যাতিত বাঙালি, তা সে হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক, সামাজিক অবস্থান ও পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা পায়নি। সেই ভেদপ্রথাই পাকিস্তানি সামন্ত-শোষকগণ আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল মাত্র। তাই একথা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করা যায় যে বাঙালির, ছফার শব্দে বাঙালি মুসলমানের, জাতিসত্তা উদ্বোধনের জন্য উল্লেখিত ঐতিহাসিক পদ্ধতি সচেতন বুদ্ধিমত্তা ও চৈতন্যেরই সমষ্টিগত বহিঃপ্রকাশ। এ কারণেই যখন ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলন, শ্রমিকদের আন্দোলন এবং বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলার জাতিসত্তা দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠছিল, তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের শ্রেণিগত দোদুল্যমানতা ও সঙ্কীর্ণতা থাকা সত্ত্বেও 'সে বিকশিত জাতিসত্তার চাপে তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক ভূমিকার চাইতে একটু অধিক যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। জনমতের প্রবল চাপ তাঁদেরকে ইয়াহিয়া বা ভুট্টো– কারো সঙ্গে কোন রকমের আপোস নিষ্পত্তিতে আসতে দেয়নি' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪৩)।

নবগঠিত পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় এই দলের ত্যাগী-আত্মবিশ্বাসী-প্রজ্ঞাবান কর্মীগণ কৌশলে প্রচলিত বুর্জোয়া উদার গণতান্ত্রিক দলগুলোর মধ্যে নিজেদের কর্মপন্থা অনুযায়ী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। এসময়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রস্তুতিপর্বে, উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভাগোত্তর জটিল বাস্তবতায় মৃত্তিকাবিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃজনের নামে, ছফার ভাষায়, 'অঞ্চল-বহির্ভূত রাজনৈতিক অন্ধ-আনুগত্যের'(ছফা, ২০০৮ঙ:২৪০) মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকলে যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয় সময়ের প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ সেই শূন্যতা পূরন করেছিল। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবি পর্যন্ত সর্বত্রই এই দলটির দ্বিধান্বিত সুবিধাবাদিতা কারও অজানা ছিল না। এসময়ের বামপন্থী রাজনীতির সিদ্ধান্তহীনতা ও অদূরদর্শিতা সম্পর্কে ছফা লিখেছেন–

> ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মস্কো-সমর্থক অংশ তাঁদের মন্ত্রগুরুদের নির্দেশে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পাশ কাটিয়ে টেকনাফ থেকে খাইবার পাস অবধি বিস্তৃত ভূখণ্ডে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃজনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ যে স্বতন্ত্র একটি জাতিসত্তার অধিকারী, শুরুতে যে কথা আভাসে-ইঙ্গিতে বলে আসছিলেন এবং সেজন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ঘনঘন বিচ্ছিন্নবাদীতার অভিযোগ আনা হত, সেকথা একরকম বিস্মৃত হয়েছিলেন সেই সময়। অবশ্য এজন্য ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে উভয় দলের নেতা উপনেতাদের কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়েছিল। মস্কো-সমর্থক অংশের নেতা

উপনেতাবৃন্দ সমাজতন্ত্রের মস্কো ঘুরে আসতে পেরেছেন। পিকিং-সমর্থকরা পিকিং। দু-দেশের পুস্তক অবাধে আমদানির সুযোগ দিয়ে স্বায়ত্তশাসন-কর্মীদের প্রকৃত লক্ষ্য এবং দাবির কথা ভুলিয়ে একেবারে বিপ্লবের স্বপ্নে মজিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। এইভাবে আইয়ুব খান তাঁর সবচেয়ে প্রতিস্পর্ধী শত্রুর তূণ থেকে সবচেয়ে অব্যর্থ তীরটি চুরি করে নিয়েছিলেন। অঞ্চল-বহির্ভূত রাজনীতির অন্ধ-আনুগত্যের এমন বেদনাদায়ক নজির বোধ করি দুনিয়ার ইতিহাস সন্ধান করলেও অধিক পাওয়া যাবে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবিদার দুটি দলই যখন পরস্পর আত্মকলহে রত এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মোহে বিভোর, সেই সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবি নিয়ে জাতির সামনে আবির্ভূত হলেন।উভয় দল তাঁকে ছি ছি করল এবং অভিহিত করল মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদের এক নম্বর অনুচর হিসেবে। কিন্তু এরই মধ্যে দুটি দলের পায়ের তলায় মাটি সরে গিয়েছে। গোটা পাকিস্তানকে ভিত্তি করেই তারা নীতি নির্ধারণ করেছেন, রণকৌশল নির্ণয় করেছেন, কিন্তু সেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটার যায় যায় দশা। বাঙালির যে একটি আলাদা জাতিসত্তা রয়েছে, যার কথা শুরু থেকেই তাঁরা বলে আসছিলেন, অথচ আশানুরূপ সমর্থন লাভ করতে পারেননি, সেটি যে কখন জেগে উঠেছে তাঁরা টেরও পাননি। দুটি উপদলই যখন আদি অবস্থানে ফিরে আসতে চেষ্টা করল, ততদিনে ঘাটের জল অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তাঁদের ভাল কথাও কে শোনে? (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪০)

তালুকদার মনিরুজ্জামানের *বামপন্থী রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় গ্রন্থে*[৬০] অনুরূপ বক্তব্য পাই–

‘আইয়ুব খানের শাসনের শেষ দশকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উচ্ছ্বাস দ্রুত বিস্তার লাভ করে। কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের প্রভাব অধিক বিস্তৃতিতে এটা সবচেয়ে বড় বাধা ছিল। মার্ক্সীয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের প্রধান একটি মতাদর্শিক ঘাটতি হলো– ইতিহাস পরিবর্তনে জাতীয়তাবাদী শক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করা। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তি নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নিয়োজিত থেকে কৌশলগত পন্থার সমাধান উদ্ভাবনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট বিপ্লবীরা শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদকে বিবেচনায় আনতে ব্যর্থ হয়। ১৯৬০-এর মাঝামাঝিতে বিদেশ নীতিতে আইয়ুবের চীনাপন্থী অবস্থানের কারণে পিকিংপন্থী কম্যুনিস্টরা আইয়ুব খানের পক্ষ নেয়। এমনকি ছয়-দফা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের বিরোধিতা করার প্রয়োজন অনুভব করে যা শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দেয়। পিকিংপন্থী বামদের থেকে আলাদা হবার পর মস্কোপন্থী বামরা ইপিএএল’র ছয়-দফা কর্মসূচিতে তাদের সমর্থন দেয়। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের কাছ থেকে নিতে পারে নি। (তালুকদার, ২০০৭:৪১)

পূর্ববাংলার বিকশমান বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের দল আওয়ামী লীগ ‘নিজের স্থিতি এবং সংবর্ধনের জন্য যতদিন পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থাকা প্রয়োজনীয় ছিল, ততদিন পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃশ্রেণীর সঙ্গে দলটি অকুণ্ঠভাবে সহাবস্থান করেছে’ তবে যখন থেকেই দলটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে ‘পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকে তাদের শ্রেণীগত আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা সম্ভব নয়’ তখন থেকেই ‘আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি-দাওয়াসমূহকে নিজেদের দলীয় দাবিতে রূপান্তরিত করেছে’ (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪২)। এই ন্যায্য দাবি-দাওয়া, যা মূলত পূর্ব-বাংলার মধ্যবিত্তের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার দাবি, ছয়-দফার মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ায় আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণির একাংশ এবং জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিল।[৬১] কিন্তু ছফা মনে করেন, যুক্তফ্রন্টের বিজয় থেকে ছফ দফা পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিটি আন্দোলনের মধ্যেই ভারতীয় শাসকবর্গ পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের বীজ অঙ্কুরিত হতে দেখে উৎফুল্ল হয়েছে, অভীষ্ট সিদ্ধির পথ অথবা নিজের স্বার্থটি খুব বড় করে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪৮)।[৬২] প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় গণমাধ্যম ও শাসক কংগ্রেস দল ভারতীয় জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ের জন্য ব্যাপক প্রচারণার সুযোগ গ্রহণ করেছিল যার মূলেও সম্পর্কিত ছিল বৃহৎ পুঁজির দেশ ভারতের মধ্যবিত্তের শ্রেণিস্বার্থ; এমনকি ছফার মতে, ছয়দফার মধ্যেও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থের জন্য অনুকূল শর্ত ছিল (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪৮)।[৬৩] উভয় দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণিস্বার্থ এক হয়ে যাওয়াতেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অংশগ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রণাঙ্গনে একাধিক দল-উপদলের জটিল সমীকরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকাকে বামপন্থী আন্দোলন ও নেতৃত্বের ব্যর্থতা বলে মনে করেন ছফা; এই ব্যর্থতাই আওয়ামী লীগকে বাঙালির নেতৃত্বে নিয়ে আসে কারণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রথম উত্থাপন করেও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতৃত্ব বামপন্থীদের নানা উপদল ও মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ প্রথম দিকে বিরোধিতা করলেও দাবীর জনসম্পৃক্ততা ও সময়োপযোগিতা এবং বামপন্থীদের জনবিচ্ছিন্নতা উপলব্ধি করে তা নিজেদের করে নিতে তৎপর হয় এবং ছয় দফার মাধ্যমে অতি দ্রুত বাংলাদেশের মানুষের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

'ভারতীয় দৃশ্যপট' মূল শিরোনামে লেখা চারটি ভিন্ন ভিন্ন উপ-শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে ছফা ভারতীয় বাম রাজনীতি, বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার সংকট বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে দুদেশের বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের শ্রেণিস্বার্থ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে একবিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছিল। ছফার মতে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ বহুবিধ সংকট থেকে রক্ষা করে ভারতের বুর্জোয়া রাজনীতিকে এবং দুদেশেই বুর্জোয়া অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রতিভূ-শক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। এ কারণেই এই যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ ছিল ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে; পশ্চিমবঙ্গে পিকিংপন্থী সশস্ত্র-বিপ্লব প্রতিরোধের জন্য। ভারতে শাসক কংগ্রেস এবং বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ছিল এক্ষেত্রে অবিকল্প পছন্দ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষে ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়া পর্যন্ত এই বুর্জোয়া শ্রেণির সক্রিয়তার কথা আহমদ ছফা তাঁর একাধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। এভাবে বাম-বিপ্লবী রাজনীতির বিলোপ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে ছফা যে প্রতিপাদ্যে সংগ্রথিত করেছেন তা হল–

> বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তানে যে যুদ্ধ ঘটে যায়, তাতে পাকিস্তানি সৈন্যের পরাজয় এবং বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার কায়েম করার ফলশ্রুতিতেই যুদ্ধ পরবর্তীকালীন নির্বাচনে প্রায় সবগুলো ভারতীয় রাজ্যে ইন্দিরা কংগ্রেস নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং কথাটা দাঁড়াল এই যে, ভারতবর্ষের বুর্জোয়া গোষ্ঠী ভারতীয় রাজ্যসমূহে বামপন্থী রাজনীতির প্রসার ঠেকিয়ে নিজেদের আসন অটুট রাখার জন্য সব সময়ে বাংলাদেশে একটা অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, যে সরকারের চরিত্র এমন হতে হবে যে, কখনো ভারতীয় বুর্জোয়ার শোষক চরিত্রের বিরোধিতা করবে না। তাই ভারতীয় বুর্জোয়া এখানে একটা অনুগত সাম্প্রদায়িক সরকারের অস্তিত্বকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু কোনোক্রমেই প্রগতিশীল বামপন্থী সরকারকে বরদাশত করবে না। (ছফা, ২০০৮ছ:২১৮)

এভাবে ছফা-মানসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দর্পনের প্রতিবিম্বরূপেই চিত্রিত হয়েছে। ছফা গভীর পর্যবেক্ষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগ এবং ভারতের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ, প্রত্যাশা-প্রাপ্তির সমীকরণ মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের অনেক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট-সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল। তাই যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অনির্দেশ্যতা ও সমস্যাকে ছফা 'মূলত জাতিসত্তা চিনতে না পারারই সঙ্কট' বলে অভিহিত করেছেন (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪২)। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ছফার ভাষায় 'জাতির মহান স্থপতি' ও 'মহান পুরুষ' (ছফা, ২০০৮ছ:১৬১) শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড, রাষ্ট্রপরিচালনায় উপর্যুপরি সামরিক হস্তক্ষেপ এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সাংবিধানিক মূলনীতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে 'বাংলাদেশ আত্মপরিচয়ের অভাবের যন্ত্রণায় ভুগছে এবং একটি রাষ্ট্রাদর্শের সন্ধান করছে' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৭৯)। এসব রাজনৈতিক সঙ্কট মূলত মুক্তিযুদ্ধের সময় সৃষ্ট কতিপয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থসংশিষ্ট টানাপোড়েনের ফল। ছফা বিভিন্ন প্রবন্ধে এসব বিষয় তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ :

এক। জাতিসত্তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যথাযথ মনীষা ও প্রজ্ঞার অভাব ছিল:

বাঙালি জাতিসত্তার প্রেক্ষিত ও স্বরূপ সম্পর্কেও তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের বা বুদ্ধিজীবীদের কোনো ধারণা ছিল না। এ বিষয়ে ছফার বহুল ব্যবহৃত উপপত্তি উল্লেখ্য [৬৪]–

> বাংলাদেশের জাতীয়তাকে কিছুতেই মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্বের ভুল সংশোধন বলা যাবে না। বরঞ্চ একথা বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে বাংলাদেশের জাতীয়তার সংগ্রাম ভারতবর্ষের বহু জাতীয়তার সংগ্রামের পূর্বাভাস মাত্র। (ছফা, ২০০৮ছ:১৫২)

জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্বের আগেই গিরিলাল জৈন *দ্যা হিন্দু ফেনমেনন* গ্রন্থে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বলে জানিয়েছেন ছফা। অর্থাৎ ভারত ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আকাঙ্ক্ষায় ও স্বার্থে। তাই যে ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পেছনেও সেই ধর্মের দ্বারা বিভাজিত পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশকে ভারত বা পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যর্থতা হিসেবে না বিবেচনা করে ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনার দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে। তাই ছফা বাংলাদেশকে এ অঞ্চলের সবচেয়ে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এই প্রতিপাদ্যের সম্পূরক অনুসিদ্ধান্ত হল– বাংলাদেশের জন্মের প্রক্রিয়াই তার অহংপুষ্ট অবস্থান ও অস্তিত্ব নিশ্চিত করবে। এর বিশদ ব্যাখ্যাও বিভিন্ন প্রবন্ধে ছফা দিয়েছেন। ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশই উপমহাদেশে প্রথম। সেই বিবেচনায় ভারত যেহেতু একটি রাষ্ট্র নয়, অধিরাষ্ট্র তথা অনেকগুলো রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাহার। তাই বাংলাদেশকে এই প্রবল প্রতিবেশির পাশে সসম্মানে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে নিজের জাতিত্ব ও ভাষা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রগুলো স্পষ্ট তো করতে হবেই; প্রতিবেশি দেশের নিপীড়িত-নির্যাতিত জাতির পাশেও নিজকে উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দুই। নেতৃত্বদানকারী দলের দোদুল্যমানতা ও প্রস্তুতির ঘাটতি যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে দিয়েছিল:
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কোনো পূর্ব-পরিকল্পনাই ছিল না। উপরন্তু 'আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে তাঁরা সত্যি সত্যি পাকিস্তানি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বাংলাদেশকে বের করে আনার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন। তাদের দৃষ্টি যদি পূর্ব থেকে স্বচ্ছ থাকত তাহলে সে সম্বন্ধে পূর্বপ্রস্তুতিও তাঁরা গ্রহণ করতেন।' এর কারণ, ছফা মনে করেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিল এবং 'মুক্তিযুদ্ধ পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করতে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হল।'[৬৫] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে যাওয়াতে মুক্তিযুদ্ধের চরিত্রই পাল্টে গিয়েছিল বলে ছফার অভিমত।[৬৬] মুক্তিযুদ্ধ এমন একটি ঘটনা যা ঘটনার নিয়মে ঘটে গেছে। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪৪)

এই প্রতিপাদ্যের অনেকগুলি অনুসিদ্ধান্ত বিবেচনায় আসে, তন্মধ্যে প্রধান– মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব এবং আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধকালীন নেতৃত্ব । বিষয়টি ছফা তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করলেও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক চারিত্র্য ও সাফল্য-ব্যর্থতা উদ্ঘাটনে অন্তত তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ [৬৭] রচনা করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ব্যক্তি শেখ মুজিবকে অনুধাবনের জন্য যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিন। ভারতীয় মধ্যশ্রেণির স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অর্জনই মুক্তিযুদ্ধ ত্বরান্বিত করেছে:
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর অর্জন ভারতের জন্য, ভারতের স্বার্থে এবং ভারতের দ্বারা প্রাপ্ত অথবা কংগ্রেসের ইচ্ছায়, কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত। শুধু তাই নয় এ যুদ্ধ ভারতে কংগ্রেস সরকারের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার কারসাজি। আওয়ামী লীগ উপলক্ষ মাত্র।[৬৮]

এই প্রতিপাদ্যেরও কিছু সম্পূরক দিক পাওয়া যায় ছফার আলোচনায়, তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি– ফারাক্কাসহ অন্যসকল অভিন্ন নদীশাসন নিয়ে ভারতের আঞ্চলিক ভৌগলিক স্বার্থ, ভারতীয় পুঁজির সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশকে পশ্চাৎভূমি হিসেবে ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়। ভারতের রাজনীতিতে ক্ষমতাকেন্দ্রের পালাবদল, বিভিন্ন রাজ্যে সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার উন্মেষ-জাগরণ, সর্বভারতীয় পুঁজির গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ছফার বিশেষ আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ ছিল।

চার। একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের আদর্শগত দূরত্ব ও কোন্দল প্রশমন করতো:
মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদল তৈরি হয়ে পরস্পরবিরোধী লড়াই চলছিল যা যুদ্ধের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ যুদ্ধকে গণযুদ্ধের আকারে সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করার কতিপয় বাস্তবতা সেসময় উপস্থিত ছিল। বিষয়টিকে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার বা ভারতের শাসক দলের জন্য আভ্যন্তরীণ সংকট ও সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করলেও এর গুরুত্ব দ্ব্যর্থহীন মনোভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন ছফা –

> বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচার এবং স্বাধীনতার প্রতি দুর্দমনীয় স্পৃহায় ছোট ছোট প্রতিরোধবাহিনী জন্মলাভ করেছিল। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন যথেষ্ট রকমের মুষ্টিমেয়, চরিত্রে অনেক বেশি দৃঢ় ও প্রত্যয়সমৃদ্ধ এবং সমাজদর্শনের দিক দিয়ে অনেক বেশি প্রাগ্রসর। তাঁরা নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উপর ছোটখাট হামলা পরিচালনা করছিলেন। দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যের বর্ণনাতীত অত্যাচারের মুখে তাঁদের সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধিলাভ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যেমন, তেমনি ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিরোধিতা করতেন। অনেকগুলো স্থানে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে। যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছিল, ততই তাঁদের সংখ্যা বাড়ছিল। এভাবে যুদ্ধটি যদি গণযুদ্ধের আকারে ভিয়েতনামের মত ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে ভারতের সমূহসর্বনাশ। জনগণের অন্তর থেকে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি একেবারে মুছে যাবে। এমনকি একসময় চীন তাদের পিছনে মদদ নিয়ে দাঁড়াতে পারে। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৬০)

অন্যদিকে ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ নিয়ে 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা' প্রবন্ধে আহমদ ছফার বর্ণনা –

> যে সকল তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ভারতের নানাস্থানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত, ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের হাতে কোন ভারি অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করত না। কংগ্রেস সরকার সব ব্যাপারে একটা সংযম রক্ষা করে আসছিল, যাতে করে আলোচনার মাধ্যমে একটা আপোস-নিষ্পত্তির পথ বন্ধ হয়ে না যায়। হালকা যন্ত্রপাতি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গামছাবাঁধা কয়েকটা গ্রেনেড এবং রাইফেল জাতীয় কিছু যন্ত্রপাতি সম্বল করে এপারে এসে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষ কোন ক্ষতিই করতে পারত না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধরা পড়ে প্রাণ দিতে হত তাঁদের। যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁরাও বিপদে পড়তেন। এই অবস্থা পৌনঃপুনিক চলতে থাকলে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ তাদের ছেঁকে ধরে– হয়ত ভারত সরকারের পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন অভিপ্রায়ই নেই। মাঝখানে তাদের প্রাণগুলো বলতে গেলে একরকম অকারণেই খোয়াচ্ছে। তাদের মধ্যেও হতাশার হিমেল হাওয়া সঞ্চারিত হচ্ছিল। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৫৮)

মঈদুল হাসানের লেখায়[৬৯] ছফার এই বর্ণনার পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে একথাও অমূলক নয় যে–

> সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান রাজনৈতিক যন্ত্র। কাজেই সেই যন্ত্রকে বিভক্ত ও নিষ্ক্রিয় করে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমূহ ক্ষতিসাধনের জন্য পাকিস্তানের প্রবল ক্ষমতাশালী পৃষ্ঠপোষকের পক্ষে এক অন্তর্ঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করা অস্বাভাবিক ছিল না। (মঈদুল ২০১০:৮৫)

এই সমস্ত চরম অন্তর্কোন্দল প্রতিবিধানের আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কিছুদিনের জন্য দ্বন্দ্বের উপাদানগুলো কেবল অবদমিত হয়ে রইল সুযোগ-সময় মতো আঘাত হানার অপেক্ষায়। তাই এ কথা অযৌক্তিক নয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড ও পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের সঙ্কটের উদ্ভব যুদ্ধকালেই। ছফা একে আত্মপরিচয়ের সঙ্কট বা জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা বলে চিহ্নিত

করেছেন। তাঁর ভাষ্যে, একটি দীর্ঘস্থায়ী মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হলে 'বাংলাদেশের নানামতের নানা-ভাবাদর্শের মানুষের খণ্ডিত জীবনদৃষ্টি যুদ্ধের আগুনে গলিত হয়ে একটি উদার একমুখী রূপ গ্রহণ করত। সেটা হয়নি বলেই এ সঙ্কটের উৎপত্তি ঘটেছে' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৮০)।

একদিক থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার পেছনে জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের অদূরদর্শিতা, প্রস্তুতিহীনতা ইত্যাদিকে দায়ি করেছেন ছফা[৭০]
অপরদিকে সেই মুক্তিযুদ্ধকেই ভারত কেন নিজের অভিভাবকত্বে নিজের কাঁধে তুলে নিল তারও কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। সেই কারণগুলোর মধ্যে একটি, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের অভ্যন্তরীন সঙ্কট-উত্তরণের প্রয়াস; অন্য কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল, ভারতের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের কাঠামোকে শিথিল ও দুর্বল করা, ভেঙ্গে দু'টুকরো করা নয়। এর পক্ষে ছফার যুক্তিও অত্যন্ত শাণিত –

> ভারত কখনও কামনা করতে পারেনি তার এলাকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভাষাভিত্তিক একটা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। বহুভাষী এবং বহুজাতিক ভারত রাষ্ট্রের একেবারে প্রান্তসীমায় ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র ভারতের ঐক্যের পক্ষে যে মূর্তিমান হুমকি তা ভারত সরকারের অবিদিত থাকার কথা নয়। পাকিস্তানের প্রতি যতই আক্রোশ থাকুক, ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রতি তারা কম সজাগ ছিল, একথা মনে করলে ভুল করা হবে। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৫৫)

অর্থাৎ বাংলাদেশের মতো 'ভাষা, সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের দাবি সরলরেখায় প্রবাহিত হতে পারলে ভারতীয় রাজ্যসমূহের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি ঊর্ধ্বে উঠে আসতে বাধ্য।'[৭১] কারণ 'ভারত ঠিক একটি দেশ নয়, পাশাপাশি অনেকগুলো দেশের সমাহার' এবং ভারতীয় জাতীয়তা, ঐক্য ও ঐতিহ্য, শিবনারায়ণ রায়কে উদ্ধৃত করে ছফা লিখেছেন 'উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৫৬)।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এমন অনেক জিজ্ঞাসা ও চিন্তার উৎক্ষেপকে যেমন 'স্বাভাবিক বিতর্ক'[৭২] হিসেবে ছফা সামনে নিয়ে এসেছেন তেমনি একথাও অকপটে উল্লেখ করেছেন যে, 'আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের যতই দুর্বলতা থাকুক, তার উজ্জ্বল দিকটিই প্রধান। আমাদের জনগণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, সংগ্রাম করেছেন এবং পেয়েছেন।' এই অর্জনকে রক্ষার জন্য ছফা রাজনীতি এবং সংস্কৃতি দুদিক থেকেই সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, দুই স্তরেই চিহ্নিত গোষ্ঠীর পরিচয় দিতে গিয়ে *সাম্প্রতিক বিবেচনা:বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* প্রবন্ধে ছফা লিখেছেন–

> কিছু সংখ্যক মানুষ রাজনীতিতে সংগ্রামীদের কাতারে ছিলেন। অথচ তাদের মনমানসিকতা, শ্রেণিভিত্তিক লোভ এসবের কোনও পরিবর্তন হয়নি। তাই তারা স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সমাজতন্ত্র ইত্যাদির শ্লোগান দিয়ে প্রকৃত সমাজতন্ত্র এবং জনগণের দাবির বিরোধিতাই করেছেন। (ছফা, ২০০৮চ:২১৪)

অন্যদিকে 'কিছুসংখ্যক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যাদের মন-মানস পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গঠিত হয়েছে এবং নতুন সাংস্কৃতিক দিগন্তের উন্মোচনের বিদ্যাবুদ্ধি, সদিচ্ছা এসবের কোনোটিই নেই, তারাই আমাদের সংস্কৃতির চালক হয়ে বসেছেন। তাঁরা নতুন বাঙালি-সংস্কৃতির কথা বলেই নতুন বাঙালি-সংস্কৃতির বিরোধিতা করছেন' (ছফা, ২০০৮চ:২১৪)। তাই ছফা সতর্ক করেছেন, এই দুই শ্রেণির সুবিধাবাদী সাংস্কৃতিক মোড়লদের মানসিক সন্নিহিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন এবং যে রাজনৈতিক পদ্ধতি এঁদেরকে টিকিয়ে রেখেছে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে ভালভাবে না জানলে কল্যাণকর কোনোকিছু করা সম্ভব নয়।

৪.২.৪
মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষকে দুটি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছিল– একটি তাঁর আত্মপরিচয়, অপরটি তাঁর রাষ্ট্রের আদর্শ। 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা' প্রবন্ধের উপান্তে, পঁচাত্তর পরবর্তীকালের প্রেক্ষাপটে, এসে ছফা জানিয়েছেন 'প্রথমটির মীমাংসা হয়ে গেছে। বাংলাদেশে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই বাঙালি; হিন্দুত্ব, মুসলমানিত্ব এবং উপজাতিত্ব এখানে প্রধান নয়' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৮২)। বাঙালি জাতিসত্তার বাইরে ছফা এদেশে আর কোনো জাতি-উপজাতির অস্তিত্বই স্বীকার করেননি যা এক মহাজাতির[৭৩] সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এই সম্ভাবনা ছফার ভাষাতেই অনেকটা জওহরলাল নেহরু-কল্পিত বৃহত্তর ভারতীয় জাতির মতো; নেহরু 'মনে-প্রাণে আসমুদ্রহিমাচল প্রসারিত বৃহত্তর ভারতের স্বপ্ন দেখতেন এবং এই স্বপ্নকে তিনি ভারতের শাসক নেতৃশ্রেণির মনে ভাল করে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। জার্মানদের ফাদারল্যান্ড এবং ইহুদিদের হোলিল্যান্ডের মত বৃহত্তর ভারতের স্বপ্নও ভারতীয় নেতৃশ্রেণির মর্মের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪৬)। তবে আত্মপরিচয়ের এই সঙ্কট এখানেই মীমাংসিত হয়নি বলেই ছফা বিষয়টির অধিকতর সমাধান উপস্থাপন করেছেন 'বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র' প্রবন্ধে–

> এ দেশটিকে সত্যিকার অর্থে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করার চ্যালেঞ্জ যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে এর বাংলাদেশ নাম সার্থক হবে। নতুন করে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। এ দেশের প্রায় আশি শতাংশের মত মুসলমান। শুধু আশি শতাংশ নয়, শতকরা এক শ' ভাগ মুসলমানও যদি এদেশে বসবাস করে থাকে তারপরেও আমাদেরকে একটি সেক্যুলার সমাজ, একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র তৈরি করার চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করতে হবে। (ছফা, ২০০৮জ:১৮২)

অবশ্য এজন্য যে প্রজ্ঞাবান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন তার অভাব ছফা বরাবরই অনুভব করেছেন। আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, এই চ্যালেঞ্জটি কেউ গ্রহণ করেনি। বরং শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত রাষ্ট্রাদর্শ বদলে ফেলা হল। *তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান* প্রবন্ধে ছফা লিখেছেন –

> একজন বা একাধিক ব্যক্তির শারীরিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটা রাজনৈতিক মিশনকে হত্যা করা যায় না। কারণ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে, কিন্তু আদর্শের মরণ নেই। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু পরবর্তী বাংলাদেশে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল ? তখন আওয়ামী লীগ দেশের সবচাইতে বড় দল। তাছাড়া সহায়ক শক্তি ছিল ন্যাপ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি। এ ছাড়াও ছিল অনেক বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী। সেদিন একটি কণ্ঠও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেনি। পরবর্তী পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসৃত রাষ্ট্রাদর্শটি সম্পূর্ণভাবে অকেজো ঘোষণা করে নতুন একটি রাষ্ট্রদর্শন এখানে চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা আমাদের জনগণের অধিকাংশের কখনও কাঙ্ক্ষিত ছিল না। (ছফা, ১৯৮৯:৩১-৩২)

এরপরই 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' ও 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' প্রতীকগুলোর মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যে বৈরিতা, বুদ্ধিবৃত্তিতে অসততা ও রাষ্ট্রাদর্শে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ। ছফা অবশ্য মনে করেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখলে এদের মধ্যে 'বৈপরীত্ব আবিষ্কার করা সত্যি অসম্ভব'। একাধিক প্রবন্ধে এ বিতর্ককে সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষী প্রয়াস বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর মতে 'সংখ্যাধিক্য জনগোষ্ঠীর মুসলমানিত্বের পরিচয় বাঙালিত্বের পরিচয় খারিজ করে না' এবং যদি 'জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, অঙ্গীকার এবং অধিকারবোধ এগুলোর মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে এ দেশটি আমরা সত্যিকারের সেক্যুলার বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে পারি। প্রতিটি সম্প্রদায় প্রতিটি ধর্মের অনুসারী মানুষ তাদের পারস্পরিক ধর্মীয় সামাজিক এবং নৃতাত্ত্বিক দূরত্ব সত্ত্বেও যখন সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুভব করবে আমরা এ রাষ্ট্রের নাগরিক এবং নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এ রাষ্ট্রটি আমরা তৈরি করেছি, তখন আমরা বাংলাদেশি কি বাঙালি, বাঙালি না বাঙালি মুসলমান, এ জাতীয় যে সকল বিতর্ক মাঝে মাঝে জাতিকে বিভক্ত করে ফেলে সেগুলোর অস্তিত্ব থাকবে না' (ছফা, ২০০৮জ:১৮৩)।[৭৪]

রাষ্ট্রীয় আদর্শ বিবেচনায় ছফার দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমতকে সংশ্লেষিত করে সলিমুল্লাহ খান ব্যাখ্যা করেছেন–

> আহমদ ছফার বিশ্লেষণে ভর করে আমরা দেখব বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কিভাবে পরাজিত হল। ছফার ধ্যান অনুসারে এর প্রধান দায় জাতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির দল আওয়ামী লীগের। আমরা এ বিশ্লেষণের সঙ্গে বেশির ভাগই একমত। আমরা শুদ্ধ যোগ করব– ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি তুলে দেওয়ার পথে 'জাতীয়তাবাদ' মূলনীতির ভূমিকাও ছোট নয়। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' নামক মতাদর্শ প্রথমে জাতিনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি বর্জন করার চেষ্টা করে। সেই সদর রাস্তা ধরেই পরে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' মতাদর্শের আগমন। এ মতাদর্শই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় নীতি অবসান করার সুযোগ পেয়েছে। এই মতবাদ– শুদ্ধ এই কারণেই– সাম্প্রদায়িক এবং বেহাত বিপ্লবের মূল কারিকা। (সলিমুল্লাহ, ২০১০:১৩৩)

অর্থাৎ একটি জাতিনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার ছিদ্রান্বেষণ করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। তিনি আরও লিখেছেন, যে-'জাতীয় চেতনা' মুক্তিযুদ্ধ সম্ভব করেছিল তাকে বলা যায় 'জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনা'; অন্যদিকে যে-'জাতীয়তাবাদ' রাষ্ট্রাদর্শে স্থান পেয়েছে তাকে বলা যায় 'জাতীয় একনায়কত্ব' বা 'জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা'। ফলে গণতন্ত্রের মূল প্রেরণা অবসিত হয়ে সেখানে সম্পদায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রতিফলিত হয়। (সলিমুল্লাহ, ২০১০:১৩২) এভাবে জাতীয়তাবাদ নিজেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিস্পর্ধী শক্তিতে পরিণত হতে পারে। সারা জাতি যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে ছফা তাকে সঙ্গত কারণেই 'জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনায়' উদ্বুদ্ধ 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করে ছোট করেছেন বলে তিনি মনে করেন[৭৫]। কিন্তু লক্ষণীয় যে, জাতীয়তাবাদের প্রথাগত সংজ্ঞায় এই চেতনা সর্বাত্মক পরিস্ফূট নয়। বাঙালি জাতির একটি বৃহত্তর চিত্র, এক মহাজাতিরূপ, ছফার চেতনায় সবসময়ই জাগরূক ছিল। ছফা নিজেই উল্লেখ করেছেন, জাতীয় জীবনে এসব সঙ্কটের সৃষ্টি 'সমস্ত বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীকে একটি জাতীয়তার মধ্যে দীক্ষিত করার অক্ষমতা' থেকে এবং এই জাতীয়তাবাদের মূল শক্তি একক ভাবে ধর্মের মধ্যেতো নয়ই ভাষার মধ্যেও নয়[৭৬], বরং বলা যায় 'বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠার পেছনে ভাষা যেমন তেমনি ধর্মও একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ক্রিয়াশীল থেকেছে'(ছফা, ২০০৮জ:১৮৩)। তবে ছফা যে 'সত্যটির গুরুত্ব সর্বাধিক' বলে চিহ্নিত করেছেন তা-হল নির্যাতিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির ঐক্যবদ্ধ আকাঙ্ক্ষা। ছফার বহুল উচ্চারিত প্রত্যাশার ভাষারূপ হল –

> মার্কসবাদীরা নির্যাতিত শ্রেণির রাষ্ট্র বলতে যে জিনিসটি বুঝিয়ে থাকেন অত কড়াকড়ি ভাবে না হলেও বাংলাদেশকে সে ধরনের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ শুরু থেকেই এ অঞ্চলের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ইতিহাসের নানা পর্যায়ে নান ঘূর্ণিপথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে আমাদের সময়ে এসে একটি রাষ্ট্রসত্তার আকারে বিকশিত হয়েছে। সে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী তারা মুসলিম হোক, হিন্দু হোক, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ কিংবা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিবাসী হোক সকলের জন্যে সমান অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। (ছফা, ২০০৮জ:১৮৪)

ইতিহাসের যে পর্বে বাঙালি একটি রাষ্ট্রসত্তা নির্মাণের সূচনা করেছিল তার সেই প্রেরণার ভিত্তি সন্ধান করতে গিয়ে ছফা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন বাঙালির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষাকে। ভাষা আন্দোলনে আত্মদানের মাধ্যমে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা সেই আকাঙ্ক্ষার পথে প্রত্যয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে বাঙালিকে। এছাড়া সাংস্কৃতিক ঐক্যের মাধ্যমে সেই আকাঙ্ক্ষার পথে বাঙালির দীর্ঘ অভিযাত্রা একই সূত্রে সংগ্রথিত হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষার সম্মিলিত ঐক্যের পেছনে ক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক উপাদানটি হল শোষণ-মুক্তি। ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই নির্যাতন ও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক চিত্তবৃত্তিতে এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জিভূত হতে থাকে। ইতিহাসের নানাপর্যায়ে সেই আকাঙ্ক্ষা নানা বিচিত্র উপায়ে পথ খোঁজার চেষ্টা করেছে; বারবার ধর্ম পরিবর্তন করে, কৌম সমাজের বৃত্তে মুখ লুকিয়ে অথবা নতুন কোনো উপায়ে। সেই মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার এক পর্যায়ে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান আন্দোলনকেও বাঙালি তার ঐতিহাসিক বঞ্চনার সমাপ্তি ও মুক্তির উপায় মনে করেছিল। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। অবশেষে ইতিহাসের এই নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, হিন্দু-

মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান যেকোন ধর্মের বা যেকোন জাতিসত্তার হোক না কেন, নানা ঘূর্ণিপথ অতিক্রম করে মুক্তি পেয়েছিল একাত্তরের জনযুদ্ধে, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রগঠনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের পরিচয় ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র। তবে যারা প্যাকিস্তান সৃষ্টিকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি ধরে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাকেই গুরুত্ব দেয় বেশি তাদের ভ্রান্তি-মোচনে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে বলেন ছফা যার সারকথা হল, ইতিহাসের ধারায় জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে। ছফার (২০০৮জ:১৮৩) ভাষায়–

> এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা এক সময়ে ধর্মীয় মোড়কের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমানে আমরা যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পেয়েছি, তার পরিপূর্ণতা এবং সার্থকতা অর্জনের জন্যে অবশ্যই অর্থনৈতিক প্রশ্নটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিন্তা করতে হবে।

সুতরাং বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পেছনে জনগণের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করাও অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাই বাংলাদেশের অস্তিত্ব অর্থনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার সাথে সম্পর্কিত।

৪.২.৫

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আদর্শে 'সমাজতন্ত্র' অন্তর্ভুক্তি শোষণ-মুক্তির লক্ষ্য অর্জনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হলেও তা মধ্যশ্রেণির দল আওয়ামী লীগের ঘোষিত নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিষয়টি কিভাবে সম্ভব হল তার ব্যাখ্যাও ছফা দিয়েছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের প্রধানত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সমর্থক হলেও ১৯৬৫ সালের পর এই দলটির মূল শক্তি হয়ে দাঁড়ায় চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর তরুণ-যুবা-ছাত্রগোষ্ঠী যাদের বড় অংশই একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের দাবি অকুণ্ঠচিত্তে উচ্চারণ করতেন। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য 'সমাজতন্ত্র' শব্দটিকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হল আওয়ামী লীগকে (ছফা, ২০০৮ঙ:২৭১)। অবশ্য তার আগেই ছাত্রদের এগারো দফায় সম্মতি দিয়ে দলটি এপথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল।[৭৭] কিন্তু আরও কয়েকটি বিষয় যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রাদর্শে সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করতে প্রভাবিত করে; তন্মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও রাশিয়ার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সমর্থন এবং যুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্য দ্রুত একটি আর্থিক নীতি অনুমোদন অন্যতম। সুতরাং ছফার মতে, একদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব না চাইলেও রাশিয়ার চাপে পড়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতিতে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি যোগ করতে হয় (ছফা, ২০০৮ঙ:২৬৪), আবার আওয়ামী লীগের তরুণ ছাত্র-যুবা অংশের দাবির প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রভাগে না হলেও একপাশে স্থান করে নেয় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি (ছফা, ২০০৮ঙ:২৭০)। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এ চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হলেও ছফার ভাষায়, তিনি তখনই অনুমান করেছিলেন 'একটা বিপত্তি ঘনিয়ে আসছে' কারণ 'বাংলাদেশের তৎকালীন সমাজের বাস্তব অবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শের ফাঁকা বুলির মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ এত অধিক ছিল যে এক বছর সময়ের মধ্যেই তার মনে হয়েছিল 'এ জিনিস চলবে না, চালানো যাবে না' (ছফা, ২০০৮চ:১৫৯)। আমরা জানি পরবর্তী ইতিহাস বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের এই চার আদর্শ নিবর্তনের ইতিহাস। এ বিষয়ে সলিমুল্লাহ খান ইতালির ভাষাবিদ আন্তনিও গ্রামসির শব্দ-সংকেত ব্যবহার করে যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ– ''গণতন্ত্র' ও 'জাতীয়তাবাদ' পদ দুটি বাংলাদেশের মূলদলিলে এখনো বহাল। তবে তাদের 'পদার্থ' এখন অন্য। একই কথা কিন্তু বলা চলছে না 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বা 'সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে। সেই জায়গায় এখন অন্য পদার্থ মাত্র নয়, অন্য পদও এসেছে। কিভাবে সম্ভব হলো এই বিপ্লব? এই

চোরা পরিবর্তনের অপর নাম 'প্যাসিভ রেভল্যুশন', বেহাত বা হস্তান্তরিত বিপ্লব। এই পাল্টা বিপ্লবের গোড়ার কথা অনেক দিগন্তপ্রশস্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বিশদ করেছিলেন মহাত্মা আহমদ ছফা' (সলিমুল্লাহ, ২০১০:১৩২)।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের সংবিধানে চারমূলনীতি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার অপর নামই 'বেহাত বিপ্লব'। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণের সংগ্রাম ও বিজয়ের ফল বুর্জোয়াশ্রেণির হাতে পৌঁছে যাওয়ার অপর নামও 'বেহাত বিপ্লব' কারণ ' মধ্যবিত্তশ্রেণির দ্বিধার মধ্য দিয়েই জনগণের 'মুক্তিযুদ্ধের' পরাজয় ও বুর্জোয়াশ্রেণির 'স্বাধীনতা সংগ্রামের' বিজয় সূচিত হচ্ছিল। প্রকৃত কোনো পরিবর্তন সাধন না করেও জনগণের মধ্যে পরিবর্তনের আপাতস্বাদ এনে দেওয়ার নামই ইতালীয় দার্শনিক আন্তনিয়ো গ্রামসির দৃষ্টিতে বেহাত বিপ্লব' (সলিমুল্লাহ, ২০১০:১৪৩)। মুক্তিযুদ্ধের অর্জন বেহাত হয়ে জাতি, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার সূচনা অসম্ভব করে তুলেছিল। সলিমুল্লাহ খান আরও লিখেছেন–

> এই বেহাত বিপ্লবের প্রথম বলি অবশ্যই খোদ মুক্তিযুদ্ধ। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির বেশিরভাগই বাংলাদেশ রাষ্ট্র চায় নাই। জন্মলগ্নে বাংলাদেশের অঙ্গীকার ছিল ধর্মনিরপেক্ষ জাতি এবং জাতীয় শোষণমুক্ত গণতন্ত্র। এই শত্রুরা এসব আদর্শ ঘৃণা এবং অস্বীকার করেন। (সলিমুল্লাহ, ২০১০:১৪৩)

বাংলাদেশের জন্মকে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয় বললে আংশিক সত্য উচ্চারণ করা হয়। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পক্ষ-বিপক্ষ সমীকরণ এতটাই স্বার্থবুদ্ধিচালিত জটিল রূপ ধারণ করেছিল যে, রাশিয়া বা ভারতের মতো দেশ যারা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিল বলে ইতিহাস-সমর্থিত তাদেরকেও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে কখনও সরব আবার কখনও নীরব থাকতে হয়েছিল। ভারত-পাকিস্তান-চীন-রাশিয়া-আমেরিকার মধ্যে কূটনৈতিক জয়-পরাজয়, অর্থনৈতিক-সামরিক প্রভাববিস্তার এবং মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব মীমাংসা করেই বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিতে হয়েছিল। মনে রাখা প্রয়োজন, যে-কারণে ভারতের পক্ষে তার সীমান্তে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নেয়া সহজ ছিল না সেই একই কারণ সোভিয়েত রাশিয়ার কাঠামোর মধ্যেও সংগুপ্ত ছিল; তাছাড়া উভয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেয়ার আভ্যন্তরীন বিপদ তো ছিলই, উপরন্তু সেটা রাষ্ট্রাদর্শেরও বিরোধী ছিল। তা-ই এ বিষয়ে ছফার চূড়ান্ত উপপত্তি আমাদের কাছে বৈপরীত্বপূর্ণ মনে হলেও অসম্ভব মনে হয় না–

> যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন, বাংলাদেশে একটি মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। রাশিয়া চায়নি, আমেরিকা চায়নি, ভারত চায়নি, চীন চায়নি, পাকিস্তান চায়নি বাংলাদেশে বাঙালিদের একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। তথাপি বাঙালি জনগণের দাবি অনুসারে এখানে একটি যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে সে যুদ্ধের ফলাফল অপরে আত্মসাৎ করেছে।
> (ছফা, ২০০৮ঙ:২৮২)

একটি জাতির চূড়ান্ত ত্যাগের ফলাফল 'আত্মসাৎ' হয়ে যাওয়ার মতো দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি দুদিক থেকে সম্পন্ন হয়েছিল–

এক. বাংলাদেশের সমগ্র জনগণের যুদ্ধ হলেও সুবিধাবাদী মধ্যশ্রেণি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে জয়ের সুফল তুলে নিয়েছিল; এবং

দুই. ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি নতুন রূপে আবির্ভূত হয়ে সাংবিধানিক মূলনীতি বদলে দিয়েছিল।

এই আত্মসাৎকর্ম সম্পাদনে উল্লিখিত শ্রেণিগোষ্ঠী ছাড়াও সহযোগী হয়েছিল ভারতশাসক উচ্চশ্রেণি এবং বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণিনির্ভর বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও চিনা শাসকশ্রেণির নীতি (সলিমুল্লাহ ২০১০:১৪৫)। যে ধর্মীয় সাম্পদায়িক শক্তির বেশিরভাগই বাংলাদেশ রাষ্ট্র চায়নি, ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার যারা ঘৃণা করে; যাদের 'মনের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব এমনভাবে গেঁথে আছে যে সে পাকিস্তানটি ভেঙ্গে গিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলেও অবচেতনেও তাদের স্বীকার করতে বাধে' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৮০)। তাদের পুনরুত্থান বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক আদর্শে ধর্মের ব্যবহার সম্ভব করে তোলে। সমাজদেহে

রাষ্ট্রাদর্শের ভিত্তি মজবুত করার পরিবর্তে শাসকশ্রেণির দুর্নীতি-লুটপাট-অরাজকতার বিস্তার ঘটতে থাকে এবং এ সুযোগেই নিষিদ্ধ-ঘোষিত ধর্মীয় রাজনীতি সকলের অগোচরে বহুবিধ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ ছড়িয়ে দেয়।[৭৮] এই বিষ প্রশমনের পরিবর্তে তাতে উপর্যুপরি তীব্রতা সংযুক্ত করে মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলেছিল বামপন্থী রাজনীতির একাংশ, ছফার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রয়োজন–

> বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও সমানে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের দুই সহযাত্রী মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি এবং তারা যে শক্তির সাহায্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে সেই ভারত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে। সোভিয়েত রাশিয়া অনেক দূরের দেশ, সুতরাং বিদ্বেষটা একা ভারতের উপরই পড়ল। মস্কোপন্থী দল দুটোতে এবং আওয়ামী লীগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অধিক। কিন্তু ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মের অধিকার ছিল না। তাই তারা গোপনে বুভুক্ষু অশিক্ষিত জনগণকে একরকম বিশ্বাসই করিয়ে ফেলল যে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহকারী দল দুটো সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে দিন দিন ধর্মের সর্বনাশের পথটি প্রশস্ত করে চলেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যে-কোন ভাল পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও জনমনে তার খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়। বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ সে সময় একটা কঠিন নৈতিক সঙ্কটে নিপতিত হয়েছিল। যেহেতু বাংলাদেশের জন্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের বেশিরভাগই কোন ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং জনগণকে তাদের পেছনে সংগঠিত হওয়ার ডাক দিয়ে আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করার মানসিক নিশ্চয়তা অনেকেরই ছিল না, তাই বেশ কটি উপদলই কৌশল হিসেবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উসকে ভারত এবং ভারতমুখী রাজনৈতিক দল তিনটিকে অপ্রিয় করার চেষ্টায় মেতে রইল। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রকাশিত 'হক কথা' এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা জনগণের ভারত-বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই পরিপোষণ করেছে। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৭৬)

এই পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের জন্য সঠিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে ব্যর্থতা, সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতার অভাব এবং মুক্তিযুদ্ধের তরুণ-বিপ্লবী অংশের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের তীব্র বিরোধিতা। পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যেতে থাকলে শেখ মুজিবুর রহমান সমস্ত ক্ষমতা একক কতৃত্বে কেন্দ্রীভূত করে তিনটি ব্যতীত সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করলেন এবং অচিরেই সপরিবার নিহত হলেন। শেখ মুজিবকে এই কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা বা প্রতিরোধ করার মতো রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর। অথচ ছফার শব্দে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'জলদেবতা', 'কৃষক সমাজের স্বার্থের অতন্দ্র পাহারাদার' অথবা 'প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং প্রগতিশীলতা পরস্পর গায়ে গায়ে হেলান দিয়ে অবস্থান করেছে ' (ছফা, ১৯৮৯:৩৯,৪১), যাঁর মধ্যে সেই আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (রাজনৈতিক মনীষা ও প্রজ্ঞার প্রতি ছফার আস্থা না থাকলেও) কাছে ছফার প্রত্যাশা ছিল ভিন্নরকম–

> একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে ডান-বাম সমস্ত শক্তি যখন নান ঘাত-প্রতিঘাতে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে, সেই সময় তিনি একটা নেতৃত্ব রচনা করেছিলেন। অন্য অনেকের কথ বাদ দিলেও অন্তত বর্ষীয়ান জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই কাজটা করতে পারতেন। কারণ তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নানা ব্যাপারে সহযোগিতা করতে কসুর করেননি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইতিহাস এ নিয়ে একদিন প্রশ্ন উত্থাপন করবে এবং পরবর্তী বংশধর সকলকে সমানভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করবে। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৭৯)

৪.২.৬

জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতায় সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ঘটতে পারে ছফার এ আশঙ্কা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অমূলক নয়[৭৯]। তবে এ যুক্তিও কোনো কোনো মনীষী দিয়েছেন যে, জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রদায়িকতা বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা যতটা, জাতীয়তাবাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার অবলোপনের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি। তবে এ জাতীয়তাবাদ প্রকৃতপক্ষেই ভবিষ্যতমুখী, উদার ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন। ছফার চেয়ে অন্তত সিকি শতাব্দী আগে মোতাহের হোসেন চৌধুরীও এমন এক বৃহত্তর জাতীয়তার স্বপ্ন বুনেছিলেন যা বিকশিত হবে ভবিষ্যতের গর্ভে।[৮০] তাঁর মতো আহমদ ছফাও চিন্তা-চেতনায় এমন এক আদর্শ জাতীয়তার রূপ লালন করতেন

যা মূলত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বর্ণিত শোষিতের ঐক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনিও এক মহাজাতির স্বপ্ন দেখেতেন মহামানবের তীরে; অতীতের নয় ভবিষ্যতের জাতীয়তা। ক্ষুদে বা বৃহৎ শোষক শ্রেণির নয়, সাম্রাজ্যবাদীরও নয়–শোষিতের জাতীয়তাবাদ।[৮১]

জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার গভীর সম্বন্ধসূত্র এক ঐতিহাসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য সম্প্রদায়ের সাহিত্য; তাতে জাতীয়তাবোধ অনুপস্থিত ঐতিহাসিক কারণেই। আবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রচিন্তার যে সূচনা তা-ও 'বাস্তবতাকে খুন' করে বাংলা ও ভারতের ইতিহাসকে 'বিকলাঙ্গ অগ্রগতির খাত' ও 'কানাগলির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে' (ছফা, ২০০৮ঙ:৩৬৭)। কারণ পাশ্চাত্য-শিক্ষিত আধুনিক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও *আনন্দমঠ*, *দেবী চৌধুরাণী*, *কৃষ্ণচরিত* উপন্যাসের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র যে রাষ্ট্রাদর্শ প্রচার করেছিলেন তা হিন্দু বা আর্য রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি। অথচ 'যে পটভূমিটির ওপর দাঁড়িয়ে বঙ্কিম হিন্দুরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছিলেন, তার সমস্ত কুশীলব হিন্দু ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলিতভাবেই ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর স্বপ্ন নির্মাণের সময়ে মুসলমান সমাজকে ইতিহাসের অধিকার থেকেই বঞ্চিত করলেন' (ছফা, ২০০৮ঙ:৩৬৮)। তাই এই ইতিহাস যেমন এই জাতীয়তাবোধও খণ্ডিত। 'শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধে ছফা এই বুদ্ধিবৃত্তিক সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেছেন। ছফা মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়ের অন্যতম কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক ও স্বচ্ছ-ইতিহাস-চিন্তাঋদ্ধ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর ভাবাদর্শ ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তা সৃষ্টির মূলে কুঠারাঘাতস্বরূপ।[৮২] কেন বঙ্কিমচন্দ্র একটি সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন না দেখে ইহুদিদের হোলিল্যান্ড বা খ্রিস্টানদের অরিজিনাল সিনের অনুসরণে একটি ধর্মতান্ত্রিক হিন্দুরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখলেন তার কারণ 'রাষ্ট্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশ তিনি সেটি মানতে রাজি ছিলেন না এবং সেই জিনিসটি সমস্ত গণ্ডগোলের অংশ' (ছফা, ২০০৮ঙ:৩৬৮)।[৮৩] বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুরাষ্ট্র চিন্তার অভিঘাতেই আরেকটি স্বতন্ত্র মুসলিমরাষ্ট্র গঠনের চিন্তা মুসলমানসমাজের মধ্যে স্ফূরিত হয় এবং উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা স্থায়ী রূপ পায়। অবধারিতভবেই ঔপনিবেশিক কাঠামো ও চিন্তাসূত্রে আবদ্ধ থাকার কারণ দুই সম্প্রদায়ের চিন্তা ও রাষ্ট্রাদর্শের বিকাশ বিকলাঙ্গ, একপেশে, অপরিণত হতে বাধ্য। পরবর্তী রক্তাক্ত ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয়।

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক, সামাজিক বৃত্তটির মধ্যে কখনো স্বেচ্ছায় ধরা দেননি। বরাবরই বাইরে থাকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অপরিসীম সৃষ্টিশক্তি এবং কল্পনাবৃত্তির শুদ্ধতা বারবার তাঁকে একটি মানবিক আদর্শ সন্ধান করে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।' তিনি ঔপনিবেশিক সমাজের হিন্দু-মুসলিম ব্যবধান ও বিভেদাত্মক পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে 'ভিন্নরকম একটা মানবিক আদর্শ খাড়া করার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের কথা যখনই এসেছে তিনি বারবার বুদ্ধদেবের কথা স্মরণ করেছেন। বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করে কবিতা, নাটক এবং গীতিনাটক রচনা করেছেন। মারমুখী হিন্দুসমাজ আদর্শের প্রতাপ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সন্ত কবীর এবং বাউল দর্শন আঁকড়ে ধরে তাঁর ভিন্নরকম অবস্থানটি নানাভাবে স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন' (ছফা, ২০০৮ঙ:৩৯৩)। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দূরদর্শিতার কারণেই ঔপনিবেশিক পাটাতনের মধ্যে সৃষ্ট মধ্যশ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর আস্থা না রেখে পরিবর্তে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাধীনতার দাবিকে প্রকৃত তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করতে প্রত্যয়ী ছিলেন। জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বুদ্ধিবৃত্তিক অভিঘাত তুলনা করে ছফা লিখেছেন–'বঙ্কিমের অভীষ্ট ছিল একটি হিন্দুরাষ্ট্র সৃষ্টি করা। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিবেশিক সমাজের বদলে একটি স্বদেশী সমাজ সৃষ্টি করাই ছিল লক্ষ্য' (ছফা, ২০০৮ঙ:৩৯৫)

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠা জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর সেই জাতীয়বাদের পরাজয় ঘটেছে বলে ছফা মনে করেন। তাঁর এই অভিমত অনেকটা সরলীকৃত হলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, 'একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে একটি জাতির সমগ্র জনগণের জাগ্রত আকাঙ্ক্ষার যখন পরাজয় ঘটে, তখন স্বভাবতই এটা স্পষ্ট হয়ে যে, তাঁরা যে আদর্শের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্ন দেখছিলেন সে ভিতটিই ছিল নাজুক, নড়বড়ে. দোদুল্যমান এবং দুর্বল' (ছফা, ২০০৮জ:৩৪০)।

যেভাবেই চিহ্নিত হোক না কেন জাতীয়তাবাদের সবগুলো সম্ভাবনা ও শক্তির জায়গা বিকশিত করতে যেসব পদক্ষেপ নেয়া জরুরি ছিল স্বাধীনতার আগে বা পরে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ও আওয়ামী লীগ সরকার তা গ্রহণে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল এটাই ছফা বিভিন্ন লেখায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আরেক আলোচিত প্রবন্ধ 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। মধ্য ও চরম দক্ষিণপন্থী অথবা সামরিক-স্বৈরাচারী শক্তি উভয়ই জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রচেতনা-বিরোধী – তাদের লক্ষ্যই থাকে জাতীয়তাবাদের বিলোপসাধন। অথচ স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন সময় এই শক্তিবলয়েই আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা। শেখ মুজিব হত্যার পর দক্ষিণপন্থী ধর্মীয় মৌলবাদ পক্ষবিস্তার করেছে, সামাজিক মূল্যবোধ ও শ্রেয়োচেতনার পরিবর্তে ধর্মীয় নৈতিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা সমাজদেহে প্রভাব বিস্তার করেছে ক্রমাগত [৮৪]।   তবে ছফা এক্ষেত্রে যথেষ্ট আশাবাদী যে, ধর্মধ্বজী শক্তি বাংলাদেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করে শেষপর্যন্ত উল্টা পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে না কোনোদিন। তাঁর আশাবাদ বিস্তৃত হয় এজন্য যে,

> বর্তমানে চারদিকে যে মৌলবাদী তৎপরতা এবং তাণ্ডব লক্ষ করা যাচ্ছে এটা তাদের শক্তি নয় পরাজিত মানসিকতারই অধিক পরিচায়ক। যেহেতু তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে এবং আমাদের জনগণের ন্যায্য-সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে ঘরশত্রু বিভীষণের ভূমিকা পালন করেছে, সেই লজ্জা, সেই কলঙ্ক, সেই গ্লানি ঢাকার জন্য তারা তড়িঘড়ি কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলে পরাজিত বিবেকের কলঙ্কচিহ্ন ঢেকে দিতে চাইছে। ইতিহাসে ভ্রম সংশোধনের অবকাশ আছে। কিন্তু নতুন ভ্রম দিয়ে পুরনো ভ্রম ঢাকা দেয়ার কোন অবকাশ নেই। (ছফা, ২০০৮জ:৩৪৪)

যে-জাতীয়তাবাদ ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে পরাজিত হয় তাকে ছফা আদর্শ জাতীয়তাবাদ না বলে 'আওয়ামী লীগের ধরনের অনুসৃত জাতীয়তাবাদ' বলে উল্লেখ করেছেন। দলীয় সংকীর্ণ রূপের মধ্যে আবদ্ধ জাতীয়তাবাদ জনগণের আকাঙ্ক্ষা পুরনে ব্যর্থ হলেও বৃহত্তর জাতীয়তার নতুন রূপনির্মাণের স্বপ্ন টিকে ছিল ছফার চেতনায়। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে বর্তমানে রাষ্ট্রব্যবস্থার যে রূপ গড়ে উঠেছে তাতে জাতীয়তাবাদের একটি অংশ হিসেবেই ধর্মকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে বলে মনে করেন ছফা–

> বাংলাদেশে ধর্ম, ধর্মের ইতিবাচক দিকসমূহ অবশ্যই জাতীয়তাবাদের একটা মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটা জনগোষ্ঠীকে তার বিশ্বাস, রুচি, সংস্কার, আচার, অনুষ্ঠান থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং তা করার চেষ্টাও সঙ্গত নয়। এসব আমাদের জাতির দুর্বলতা নয়, শক্তির এবং স্থিতিরও পরিচয় বহন করে। জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহের তথাকথিত ধারক-বাহকেরা অনেক সময় এই জলজ্যান্ত বাস্তবতার প্রতি আস্থা স্থাপন করতে চান না। (ছফা, ২০০৮জ:৩৪৫)

অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশসমূহের পাশ্চাত্যবিরোধী জনমত ও আন্দোলন সংহত রূপ পাওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় আধিপত্যের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে, আমাদের জনগণ ধর্মপ্রাণ বলেই ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার বানানোর বিরোধিতা করবে। ছফা কথিত সময়ে, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের আন্দোলনের মধ্যেও যেভাবে বিভিন্ন গতি-প্রকৃতির লক্ষণ দেখা গেছে তেমনিভাবে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও পড়েছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে। সেখানেও আন্তর্জাতিক পটপরিবর্তন নতুন পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। ফলে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যেও বিরাজ করছে হতাশা। সর্বত্র নতুন-পুরাতনে, বিজ্ঞান-বহুমতে, সামন্ত প্রভুত্ব এবং জনদাবির মধ্যে যে সংঘাত চলছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তা থেকে ভিন্ন নয়। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়ার বিস্তার ঘটেছে বলে ছফা যে ধারণা দিয়েছেন তার প্রমাণ

অবশ্যই সমকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর নগ্ন ক্ষমতালিপ্সার মধ্যেই পাওয়া যায়। রাজনীতিতে চিন্তাশীলতা এবং মনীষার অনুপস্থিতি এই বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে। ছফা যথার্থই চিহ্নিত করেছিলেন যে, এই অন্তঃসারশূন্য রাজনীতির সাথে জনগণের আর্থসামাজিক জীবনপ্রণালীর কোনো সম্পর্ক নেই, নেই দেশের মাটির সাথে গভীর আত্মিক সম্পর্কও–

> বাংলাদেশের জনজীবনের এখনো কোন আর্থিক সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের যুক্তি ব্যক্তিরেকেই অপরের অধিকার ছিনিয়ে নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রবল প্রতিশোধাত্মক মনোভাব ক্রিয়া করে যাচ্ছে। যাঁরা ভারতে গেছেন তাঁদের মধ্যে এবং যাঁরা বাংলাদেশে পাকিস্তানের বীজটি বপন করতে চাইছেন তাঁদের মধ্যে এই মনোভাব সমান সক্রিয়। একদল ভারতের উপর নির্ভর করে ক্ষমতায় চড়তে চাইছেন, আরেক দল ভারতবিরোধিতা করে ক্ষমতা হস্তগত করতে চাইছেন। দু'রকমের মনোভাবই বাংলাদেশের জন্য সমূহমঙ্গল বয়ে আনবে। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৮১)

এতসব প্রতিকূলতা ও আশঙ্কা সত্ত্বেও জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে বলে ছফা মনে করেন। তবে এজন্য জাতীয় ক্ষেত্রে দুষ্টক্ষত ও বিরোধ-বৈপরীত্বগুলো চিহ্নিত করে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেই রকম কিছু পদক্ষেপের ধারণা 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা' প্রবন্ধের মাধ্যমে, আমরা লক্ষ করি, সেই ১৯৭৭ সালেই ছফা দিয়েছিলেন; যা বিস্ময়করভাবে আজও এদেশের রাজনীতিতে অনুসরণীয় হতে পারে–

প্রথমত, ছফা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে উচ্চারণ করেছেন, এ দেশের চিরকালের শোষিত জনগণ যেভাবে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠন করেছে সেই সংগ্রামে ভারতের শোষিত-নির্যাতিত জাতিসত্তাসমূহকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে অর্থাৎ 'তাদের শোষণের অবসান ঘটানোর একটা প্রক্রিয়া করতে হবে'; এ অঞ্চলে মাথা উঁচু করে টিকে থাকতে হলে, ছফার শব্দে , বাংলাদেশের 'তৃতীয় কোন পথ খোলা নেই' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৮২)।[৮৫]

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রাদর্শগত ভিত্তি ঠিক করে 'বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের মূল দ্বন্দ্ব যেখানে সেটিকেই শাণিয়ে তুলতে হবে'(ছফা, ২০০৮ঙ:২৮১)। অর্থাৎ যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার স্বাতন্ত্র্যের ভেতরে ভারতের বিপরীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রাদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা নিহিত সেটাকেই জাগিয়ে তুলতে হবে। বিষয়টি কেবল ভাষাগত নয়, জাতিগত দ্বন্দ্বের সাথেও সম্পৃক্ত। বাংলাদেশকে ভারতের নির্যাতিত জাতিসমূহের দায়িত্ব নিতে হবে। রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভারতীয় আধিপত্য বা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আত্মস্বার্থ ও আত্মসম্মান রক্ষার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতির চর্চা করতে হলে অন্ধ ভারতবিদ্বেষ থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। ছফা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন 'সাম্প্রদায়িকতার যে প্রকোপ বাংলাদেশে প্রবল ফুৎকারে জাগিয়ে তোলা হয়েছে, তা একদিন বাংলাদেশকে মারাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৮১)।

চতুর্থত, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় বর্ণিত সময়ে 'একটা ব্যাপকতম সামাজিক রদবদল' প্রয়োজন বলে ছফা মনে করেছিলেন। এই বাস্তবতা এখনও অবিকল বর্তমান। ছফা আশঙ্কা করেছিলেন, ভারতীয় শাসক-শোষকশ্রেণি বাংলাদেশে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার বিরোধিতা করবে এটা নিশ্চিত, তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে – 'মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শ। মুক্তিযুদ্ধকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেই' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৮১,২৮২)।

৪.২.৭
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার উত্থান-বিস্তৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক দায়-প্রশ্রয় এবং প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে আহমদ ছফার দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক জিজ্ঞাসা যা বৃহত্তর অর্থে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হচ্ছিল; জাতিগত বিভাজন-রেখা যা ক্রমশ বড় বড় ফাটল-রূপ লাভ করছিল সেই সম্পর্কে ছফা অভিমত দিয়েছেন 'সাম্প্রতিক বিবেচনা', 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'[৮৬] এবং 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (দ্বিতীয় খণ্ড)' তিনটি প্রবন্ধে।

স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে যেসব বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কর্মসূচি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ধারক-বাহক হিসেবে চিহ্নিত ছিল তারাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতি পুনর্গঠনের দায়িত্ব পেলেন। তখন থেকেই মূলত বাংলাদেশে সুবিধাবাদের রাজনীতি, লুণ্ঠন ও মেরুদণ্ডহীনতার অর্থনীতি এবং আত্মপরিচয়হীন সংস্কৃতির যাত্রা শুরু। এই যাত্রা অব্যহতভাবে বাংলাদেশের শিরা-উপশিরায় পৌঁছে গেছে পরবর্তী পঁচিশ বছরে। ছফা মনে করেন, আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ধারণ ও পুনর্গঠনের ব্যর্থতাই সকল নৈরাজ্যের কারণ। তাঁর অভিমত–

> এই কাঠামোহীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের নাটবল্টু ঘোরাবার দায়িত্ব পেয়ে গিয়েছিলেন, দ্রুত ধনী হওয়ার মানসিকতা তাঁদেরও চরিত্রলক্ষণ হয়ে দাঁড়াল। পরোক্ষে তারাও লুণ্ঠনের অর্থনীতির ফায়দা তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সরকারি আমলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবীসহ সাদা পোশাকের পেশাজীবীদের বেশিরভাগেরই চরিত্র থেকে মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা একেবারেই বিদায় নিল। এই ধরনের একটি লোভ-লাভের সার্বিক পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীরা কখনো ঋজু শিরদাঁড়ার অধিকারী হতে পারেন না। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা যে বেশিরভাগ চরিত্রভ্রষ্ট তার মূল কারণ লুণ্ঠনের অর্থনীতির মধ্যেই নিহিত। (ছফা, ২০০৮চ:১৬৮)

এই লুণ্ঠনের অর্থনীতির উত্থান ঘটেছিল স্বাধীনতা-উত্তরকালে পরিত্যাক্ত কলকারখান ও ব্যাংক-বীমা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের অনিবার্য পরিস্থিতিতে। এই উপায়হীনতাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ ঘোষণা দেয়ার মধ্যেই একটি বাস্তবসম্মত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভাবনার ইতি ঘটল। ফলে জাতীয় বুর্জোয়ার বদলে তৈরি হল লুটেরা ধনীকশ্রেণি– 'শেখ মুজিবর রহমানের রাজত্বকালে এই কোটিপতিদের জন্ম। জিয়াউর রহমান তাঁদের লালন করেছেন এবং বাড়িয়ে তুলেছেন। এরশাদ সমাজজীবনে তাঁদের আইনগত বৈধতা দিয়েছেন। হাল আমল পর্যন্ত এসে তাঁরা গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটা তাঁদের কব্জার মধ্যে এনে ফেলেছেন' (ছফা, ২০০৮চ:১৬৭)।

এ তো গেল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের কারণ। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্য একধরনের বন্ধ্যাত্ব, সুবিধাবাদ ও তোষামোদের জন্ম দিল। যে সাংস্কৃতিক জাগরণ মুক্তিযুদ্ধের সকল অপূর্ণতা ও জাতিগঠনের সকল পরীক্ষায় আমাদেরকে উত্তীর্ণ করতে পারত তা অসম্ভব হয়ে উঠলো সেই একই বুদ্ধিজীবীদের ব্যর্থতায়। ছফার বিবেচনায় ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণ, ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতি এই তিন উপাদানকে একসুতায় বাঁধতে হলে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ প্রয়োজন তার জন্য প্রস্তুতি বা যোগ্যতা এমনকি মানসিকতা কোনোটাই সেই বুদ্ধিজীবীদের ছিল না। এর কারণ সম্পর্কে ছফার ব্যাখ্যা–

> যে সাংস্কৃতিক নেতৃশ্রেণীটি বাংলাদেশ আমলে জাতির শিরোভাগে চলে এসেছিল পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেই তাদের বিকাশ এবং সংবৃদ্ধি। তাঁদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা পাকিস্তানি শাসকদের সহযোগিতা করতেন, আবার বাঙালি জনগণের উত্থানের সম্ভাবনা দেখে, নিজেদের বাঙালিত্বের পরিচয়টাও তুলে ধরতে চেষ্টা করতেন। এই শ্রেণীর মানসিক দোলাচল-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেরা যখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির অভিভাবক হয়ে বসলেন, দেখা গেল তাঁদের সৃষ্টিশক্তি অবসিত হয়ে গেছে, নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। (ছফা, ২০০৮চ:১৭১)

আবার অন্যদিকে তাঁদেরই কেউ কেউ, যারা হয়ত ক্ষীণস্বরে বাঙালি জাতির মুক্তির কথা বলতেন, স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মতুষ্ট হয়ে একটি নিশ্চিন্ত-নিরাপদ জীবনের বর্মে প্রবেশ করলেন– কৃষক, শ্রমিক, মজুরসহ দারিদ্র্যপীড়িত জনগণ, যারা স্বাধীনতাকে সম্ভব করে তুলেছিল, তাদের কথা বলবার বা ভাববার কেউ থাকল না।[৮৭]

'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রবন্ধে আহমদ ছফা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চারস্তম্ভের মধ্যে 'সমাজতন্ত্র' ও ধর্মনিরপেক্ষতা'র বাস্তবায়নযোগ্যতা নিয়ে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন[৮৮] সিকি শতাব্দীর ব্যবধানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এগুলোই গুরুতর জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছিল, যা ১৯৮৯ সালে 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস(দ্বিতীয় খণ্ড)' এবং ১৯৯৭ সালে 'সাম্প্রতিক বিবেচনা' থেকে ধারণা করা যায়। তন্মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুসরণে বিপত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামাজিক চলকসমূহের অপর্যাপ্ততা বা অনুপস্থিতির উল্লেখ করে পরিবর্তিত এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় একটি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ওপরই জোর দিয়েছেন তিনি। একটি সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ ধনতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের জন্য ছফা বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর চিন্তা সংকলিত করেছেন।

'এনজিও প্রসঙ্গে কিছু কথা', 'ধনতন্ত্রের ভবিষ্যত কি?', 'ধনতন্ত্রের নবপর্যায় ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা বর্তমান', 'বিকল্প উন্নয়ন কৌশল' ইত্যাদি প্রবন্ধে ছফা বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের রূপ কি এবং কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে অর্থনীতি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। অন্তত বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত আছে। উপর্যুপরি সামরিক শাসনের ফলে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাই দৃঢ়মূল হয়েছে। ফলে বুর্জোয়া শোষণ, লুণ্ঠন দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়াদের যে 'সেন্স অব বিলংগিং' থাকে। তা আমাদের দেশের নব্য বুর্জোয়াদের মধ্যে নেই। তাই তাদের দ্বারা একটি বিকশিত অর্থনীতির ভিত নির্মাণ করা অসম্ভব।

ছফা মূলত একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকেই আমাদের দেশের কৃষক-শ্রমিক-জনতার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে তিনি তা-ই চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রাদর্শে সমাজতন্ত্র গৃহীত হলেও আকাঙ্ক্ষিত নীতি বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এবং পরবর্তীকালে শেখ মুজিবের হত্যার মাধ্যমে কয়েকদফা সামরিক শাসনের অধীনে থাকায় বাংলাদেশে ধীরে ধীরে একটি পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের দেশে বামপন্থী আন্দোলনের কোনো রাজনৈতিক অগ্রগতি নেই বলে মনে করেন ছফা। বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের পতনের পর আঞ্চলিক ও আন্তঃদেশীয় অর্থলগ্নিকারকদের কাছে দরিদ্র অনুন্নত দেশসমূহের নিরুপায় আত্মসমর্পণ প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই শোষিত, নির্যাতিত, নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন মানুষের অবলম্বনের জন্য হলেও অবিলম্বে একটি ধনবাদী বিকল্প উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। মধ্যসত্ত্বভোগীদের হাত থেকে অর্থনীতি রক্ষা করে অন্তঃত সৎ দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়া তৈরি করতে হলেও বিকল্প উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা জরুরি। এ পরিস্থিতিতে একটি সুষ্ঠু বিকাশধর্মী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই ছফা স্বাগত জানিয়েছেন। সেজন্য অবাধে বিদেশি পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানানোর পক্ষেও ছফা লিখেছেন, দেশের মেরুদণ্ড সোজা হওয়ার জন্যই তা দরকার বলে তিনি মনে করেন। তবে সেজন্য সরকারকে জাতীয় পুঁজি বিকাশের পথ সৃষ্টি করতে হবে। যথাযথ নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে বিদেশি পুঁজির সঠিক ব্যবহার ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে যাতে পুঁজি শোষণের হাতিয়ারে পরিণত না হয়। ১৯৯৬ সালে *দৈনিক বাংলাবাজার*-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ছফা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন নিজের অবস্থান– 'আমি ব্যক্তিগতভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যেই জাতীয় অগ্রগতির চিন্তা করি। আমাদের এখানে আগামী বিপ্লব হল বুর্জোয়া বিপ্লব। আপাতত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা নেই' (ছফা, ২০১১:২২৬)।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, কৃষি বিপ্লব অথবা বুর্জোয়া বিপ্লব ইত্যাদি নানা অভিধায় ও প্রকৃতিতে ব্যাখ্যা করলেও ছফার চিন্তা আসলে কেন্দ্রীভূত ছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে বাঙালির একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের স্বপ্নচিন্তায়। এই স্বপ্ন বিনষ্ট করার দায় তিনি স্বাধীনতা-উত্তর সব সরকারের কাঁধেই চাপিয়েছেন। দেশের মর্মে মর্মে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের উত্থানকে ছফা কেবল রাজনৈতিক সংকট নয়, আখ্যা দিয়েছেন বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট হিসেবেও। স্বাধীনতার পরপরই স্বাধীনতা-বিরোধী কয়েকটি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল (মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী) নিষিদ্ধ করার ফলে তারা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ওপর ভর করে ধর্মীয় মৌলবাদ প্রচারের কাজটি চালিয়ে যেতে থাকে।[৮৯] এসময় বুদ্ধিজীবীরা আরও একবার ব্যর্থতার পরিচয় দেন এর বিরুদ্ধে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারার কারণে। অন্যদিকে পাকিস্তান সমর্থকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে ভারতের করদ-রাজ্য ঘোষণা দিয়ে মুসলিম বাংলা গঠনের জন্য সারাদেশের নাশকতা ও প্রচারণা চালিয়ে যেতে লাগল। দেশে-বিদেশে এই অব্যাহত প্রচারণা এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের বিপুল অর্থ-সাহায্যে ভর করে ‘সমাজের ভেতর থেকে ঘূর্ণিহাওয়ার মত সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগ্রত হয়ে জনমানসে জীবাণুর মত প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করল’ (ছফা, ২০০৮চ:১৭৪)। এই সমাজবাস্তবতায় শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পরপরই ‘পাকিস্তানপন্থী শক্তি’ ক্ষমতায় এসে একে একে বাংলাদেশের ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র স্তম্ভে কুঠারাঘাত করা শুরু করে। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান থেকে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটি বাদ দিয়ে এবং সামরিক আদেশ বলে ‘বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম’ যুক্ত করে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক দেশে পরিণত করে সেনাশাসক জিয়াউর রহমান এই পশ্চাৎপদতার সূচনা করলেন, পরে একই পথে আরেক সেনাশাসক জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা দিয়ে দেশ ও সংবিধানের ধর্মীয় পরিচয়কে নিশ্চিত করলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রাদর্শ এভাবে ক্রমাগত ‘বেহাত’ হতে দেখেও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোনো সম্মিলিত প্রতিরোধ দেখা যায়নি। ফলে মৌলবাদ ও সাম্প্রাদায়িকতা বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পরিবেশকে বিষিয়ে তুলল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ অধিকতর বিস্তৃত হতে থাকল এবং ‘সংস্কৃতির গতিপথটার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য নিত্যনতুন কৌশলের উদ্ভাবন করা হতে থাকল। বাঙালিত্বের বিপরীতে মুসলমান পরিচয়টা খুঁচিয়ে বের করার জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত রইল না, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে যে দেশটি জন্ম নিয়েছে তার প্রকৃত পরিচয় মুছে দিয়ে দেশটিকে আবার নতুন পাকিস্তানে পরিণত করার সর্বাত্মক পাঁয়তারা করতে থাকল’ (ছফা, ২০০৮চ:১৭২)।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতাকে কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয় সুদীর্ঘ সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসপ্রবাহের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করেছেন ছফা। ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার বুদ্ধিবৃত্তিক দায়-দুষ্টতাও লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। তাই বাংলাদেশে ধর্ম-সাম্পদায়িকতা বিস্তারের কারণ ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন ‘সাম্প্রতিক বিবেচনা’ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে। ছফার পর্যবেক্ষণসূত্রে আমরা দেখতে পাই, স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে সাম্পদায়িকতা ও মৌলবাদ দেশের প্রাণশক্তিকে অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। দেশের অর্থনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থায়ও এই সাম্পদায়িক শক্তির ঘূণ প্রবেশ করেছে শাসকশ্রেণির উৎসাহে অথবা অযোগ্যতা বা ব্যর্থতায়। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা লালনের পিছনে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের ঔদাসীন্য এবং পরবর্তী সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতাকে দায়ী করেছেন তিনি–

> মুজিব সরকারের আমলে শিক্ষা সংস্কারের কথা উঠলেও জনমত বিপক্ষে যায় এই আশঙ্কায় তিনি মাদ্রাসা শিক্ষায় হাত দিতে সাহসী হয়ে উঠতে পারেননি। জিয়ার আমলে এই মাদ্রাসাসমূহকে সরকারের সমর্থন ক্ষেত্রে পরিণত করার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরশাদ আমলে মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে ধর্মীয় রাজনীতি ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে মাদ্রাসাসমূহ যে পরিমাণ সরকারি অনুদান পেয়েছে, তা মাধ্যমিক স্কুলগুলোর জন্য বরাদ্দ অর্থের চাইতে বেশি। (ছফা, ২০০৮চ:১৭৫,১৭৬)

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাহীন দারিদ্র্যপীড়িত একটি সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন ও বোধের ব্যাপক প্রসার অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজে অন্ধত্ব ও জড়তার শিকড় প্রসারিত করে। এছাড়া সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং বাস্তবতাও রয়েছে। পৃথিবীব্যাপী ইসলামি মৌলবাদের উত্থান, দেশে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সমাজে মুক্তচিন্তাবিনাশী রুদ্ধশ্বাস আশাহীনতা সৃষ্টি করছিল। স্বাধীনতার পর নেতৃস্থানীয়রা বাংলাদেশের মানুষের জন্য জাতিগতভাবে কোনো সাংস্কৃতিক মূল্যচিন্তা ও মান নির্ধারণ করতে না পারায় মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল অর্থ-সাহায্য এবং মৌলবাদীগোষ্ঠীর ক্রমাগত অপপ্রচারের ফলে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের অপরিপক্ক ধর্মীয়বোধ সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে থাকে। অন্যদিকে মৌলবাদীদের গড়ে তোলা মসজিদ-মাদ্রাসায় মার্কেটসহ নানা অর্থকরী প্রতিষ্ঠানের লাভের একটি বড় অংশ ব্যয় হচ্ছিল মৌলবাদীদের বেতনভুক্ত কর্মী-প্রতিপালন ও অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে। এভাবে সচেতন বুদ্ধিজীবী মহলের অলক্ষ্যে এবং বিভিন্ন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদীদের একটি অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বা নিশ্চয়তা গড়ে ওঠায় বাংলাদেশে যে-কোন সময়ের তুলনায় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক-রাজনৈতিক সুস্থিরতার মূলে আঘাত করতে শুরু করেছিল এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই। সবচেয়ে বড় কথা, সারাদেশের মসজিদ-মাদ্রাসা-মক্তব-মাহফিলগুলোকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অবস্থান সুসংহত এবং সুসংগঠিত হওয়ার কারণ–

> যাঁরা মৌলবাদী তারা শতকরা একশ ভাগ মৌলবাদী। কিন্তু যাঁরা প্রগতিশীল বলে দাবি করে থাকেন তাঁদের কেউ কেউ দশ ভাগ প্রগতিশীল, পঞ্চাশ ভাগ সুবিধাবাদী, পনের ভাগ কাপুরুষ, পাঁচ ভাগ একেবারে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন।
> (ছফা, ২০০৮চ:১৫৭,১৫৮)

তাই ছফার ভাষায় 'দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল' (অথবা আসল সাম্প্রদায়িক) এবং 'ছদ্মবেশী প্রগতিশীল'দের (অথবা ছদ্মবেশী অসাম্প্রদায়িক, নকল প্রগতিশীল) পরাজিত করতে না পারলে প্রগতিশীল সংস্কৃতি ও রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব।

৪.২.৮

বাংলাদেশে তথা উপমহাদেশে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার আদি উৎস ব্রাহ্মণ্য সমাজের জাতি-বর্ণভেদপ্রথা। আধুনিক বিশ্বে ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিপালন ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে একথা অনস্বীকার্য। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক ব্যবহারের পেছনে রয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি। ছফা লিখেছেন–

> হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথাই এ দেশের সাম্প্রদায়িকতার আদিমতম উৎস। কেউ কেউ অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সাম্প্রদায়িকতার জনয়িতা মনে করেন। তারা ভারতীয় ইতিহাসের অতীতকে শুধু ব্রিটিশ শাসনের দু'শ' বছরের মধ্যে সীমিত রাখেন বলেই এই ভুলটা করে থাকেন। (ছফা, ২০০৮ক:১০৪)

তাই ছফার সমাজ-সংস্কৃতিভাবনায় গুরুত্ব পায় বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় উত্তরাধিকার এবং বাংলাদেশে সংগঠিত বুদ্ধিবৃত্তিক সাম্প্রদায়িকতা। স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সামুষ্টিক প্রত্যাশা যেভাবে উপর্যুপরি আঘাতে আশাভঙ্গের বেদনায় পর্যবসিত হয়েছে ছফা তার উৎসমূল সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে 'পলিটিক্যাল ডিমোরালাইজেশন'[৯০] শুরু হয়েছিল অনেক আগে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকেই।

বিপরীতে, পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাওয়া মুসলমানদের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ভারত-বিভক্তির পর থেকেই যা পাক-ভারত যুদ্ধ শেষে অনেকটা প্রশমিত হয়ে আসে এবং বাংলাদেশের জন্মের পর 'ভারতীয় মুসলমানদের মেনে নিতে হয়েছে যে ভিত্তিভূমির ওপর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, সেটি ধ্বসে গেছে। ভারতকেই স্বদেশ হিসেবে তাদের

গ্রহণ করতে হবে' (ছফা, ২০০৮জ:১২০)। তাই, মানসিক আশ্রয়হীনতা ও নিরাপত্তার গভীর-গোপন শঙ্কা থেকে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানগণ সমর্থন করেননি। একই কারণে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'পলিটিক্যাল ডিমরালাইজেশন' প্রবেশ করেছে। ছফা আরও বিস্তারিত জানিয়েছেন –

> পলিটিক্যাল ডিমোরালাইজেশন গ্যাংগ্রিনের মত, সমাজ-দেহের যে কোন অংশে এর বিষক্রিয়া শুরু হলে অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। সংখ্যালঘুকে আশ্রিত ভেবে করুণা করা, কিংবা ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা উভয়ই ন্যায়ত স্বাধীন মানুষের নাগরিক সত্তার বিরুদ্ধে অপরাধ। ভারত উপমহাদেশের বিভক্তি, পাকিস্তানের জন্ম, পাকিস্তানের ভাঙন আমাদের ইতিহাসের এই সকল ঘটনা একযোগে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে এই পলিটিক্যাল ডিমোরালাইজেশনের জন্ম দিয়েছে। অনুকূল পরিস্থিতিতে সেই ক্ষত শুকিয়ে আসতে থাকে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাতে পুঁজ-রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। (ছফা, ২০০৮চ:১৮০)

তবে বিষয়টিকে কেবল বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মনস্তাত্ত্বিক উন্মূলতার দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে সামগ্রিকভাবে উপমহাদেশের ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের আলোকে দেখাই প্রত্যাশিত, ছফা সেভাবেই বিষয়টি চিহ্নিত করেছেন–

> সুদীর্ঘকালের ঐতিহাসিক সংলগ্নতার কারণে ভারত-বাংলাদেশ, হিন্দু-মুসলমান এই সম্পর্কের ধরনগুলো সরল এবং একমাত্রিক নয়। সেই কারণে ভারত বিরোধিতা এবং হিন্দু বিরোধিতা এক হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনায়াসে হিন্দু বিরোধিতাও ভারত বিরোধিতায় রূপান্তরিত হতে পারে। মুসলিম দেশগুলোতে উত্থিত মৌলবাদের প্রভাব যেমন মুসলিম জনগোষ্ঠীর একাংশকে প্রভাবিত করছে, তেমনি ভারতবর্ষের সঙ্ঘ পরিবারভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর অনুসৃত মৌলবাদ হিন্দু সমাজের একাংশকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। মুসলিম মৌলবাদের পাশাপাশি হিন্দু মৌলবাদও সমাজের গভীরে শেকড় বিস্তার করছে। হিন্দুরা যেহেতু সংখ্যালঘু এবং সামাজিকভাবে নির্যাতিত, মৌলবাদের প্রতি তাঁদের ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। (ছফা, ২০০৮চ:১৭৯)

ছফার এই আশঙ্কার সত্যতা পাওয়া যায় স্বাধীনতার পরপরই– বাংলাদেশে 'মুসলিম বাংলা' প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন গোপন তৎপরতা চলতে থাকে তেমনি ইতিহাসের গতিধারায় বারবার আশাহত হিন্দুরা 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' নাম দিয়ে পৃথক আন্দোলনের ডাক দেয়।[৯১] কিন্তু শাসকশ্রেণির একের পর এক ইন্ধন ও উৎসাহে হিন্দু-জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন ও পীড়নের মাত্রা বেড়েই যাচ্ছিল। তাই বাংলাদেশকে আর নিরাপদ বাসভূমি মনে করা সম্ভব হল না তাদের জন্য, বেড়ে গেল দেশ ত্যাগের মাত্রা। স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে হিন্দু জনগোষ্ঠী প্রায় অর্ধেকে নেমে এল। এমন পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মিলে একটি আদর্শ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা বিপন্ন হতে বাধ্য। এই বাস্তবতা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত জাতীয়তাবাদী চেতনা ও নির্যাতীত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। এই দায় সকলের; সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিক সবাই মিলেই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত মর্মবাণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এটা নিশ্চিত নির্যাতিত, শোষিত ও সংখ্যালঘু মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এক করে না দেখলে বৈষম্য দূর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে; সেটি সাম্প্রদায়িক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক– যে বৈষম্যই হোক।

৪.২.৯

বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির প্রকৃতি-প্রকার, সাফল্য-ব্যর্থতার কার্য-কারণ বিশ্লেষণ 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'এর 'সাম্প্রতিক বিবেচনা'য় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদসহ বাঙালির মানসগঠনে একটি উদার, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রাদর্শের আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত করায় বামপন্থী রাজনীতির উজ্জ্বল ভূমিকার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন আহমদ ছফা । ভাষা আন্দোলনের পর একটি সাংস্কৃতিক সংগ্রামের পথ নির্মাণ করার প্রস্তুতি ও যোগ্যতা কেবল বামপন্থী নেতা-কর্মীদের মধ্যেই ছিল; সেই ধারায় মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পাটাতন তারাই নির্ধারণ করে দিয়েছিল বলে মনে করেন ছফা। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালের রাজনৈতিক নেতৃত্ব একে

সাংস্কৃতিক জাগরণে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থ হয়। তথাপি বাংলাদেশের মানুষকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-পেশা নির্বিশেষে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করা এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণচেতনায় স্বাধীকারাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করার দুরূহ কাজটি বামপন্থী রাজনীতির উজ্জ্বল অর্জন বলে মনে করেন ছফা –

> বামপন্থী রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকেই বাংলাদেশের জাতীয়তার বোধটি প্রথম অঙ্কুরিত এবং মুকুলিত হয়। বাঙালি জাতীয়তার প্রাথমিক সোপানগুলো বামপন্থী রাজনীতির নেতা-কর্মীরাই নির্মাণ করেছিলেন। সেজন্য তাঁদের জেল, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন কম সহ্য করতে হয়নি। সেই সময়ে আওয়ামী লীগ দলটির কাছ থেকেও তাঁদের কম নিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি। পাকিস্তানের সংহতি বিনাশকারী, বিদেশি গুপ্তচর, ইসলামের শত্রু এই ধরনের অভিযোগ বামপন্থী রাজনীতির নেতা এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে হামেশাই উচ্চারিত হয়। এসব লাঞ্ছনা সহ্য করেও বামপন্থী রাজনীতির নেতা এবং কর্মীরা ধনতান্ত্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতরেই একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের ভ্রূণ রোপণ করতে পেরেছিলেন। বর্তমানের বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা যেটুকু সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন, তার পেছনে রয়েছে বামপন্থী রাজনীতির বিপুল পরিমাণ অবদান। বামপন্থী রাজনীতিই শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত, সমস্ত নির্যাতিত মানুষকে অধিকার আদায়ের স্বপ্ন দেখিয়েছে, সংগঠিত করেছে এবং আন্দোলনে টেনে নিয়ে গিয়েছে। (ছফা, ২০০৮চ:১৮১,১৮২)

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির একাংশের সাথে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা ও অবিশ্বাস-সন্দেহের মূল নিহিত। পূর্ব বাংলার বিকশমান মধ্যবিত্তের তরুণ অংশটি সমাজের সুবিধাজনক অবস্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত মধ্যশ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী দল আওয়ামী লীগ শ্রেণি-দোদুল্যমানতাকে ধারণ করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কোনো বিরোধিতায় না-জড়ানোর পথ অবলম্বন করেছিল। ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত, অগ্রসর বামপন্থী তরুণ প্রজন্ম দেশের সুবিধাবাদী ও ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়।[৯২] কিন্তু কালান্তরে এই উজ্জ্বল রাজনৈতিক ধারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে সমসাময়িককালে অত্যন্ত দৈন্যদশায় পতিত, যা ছফাকে ব্যথিত করেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাক্রম চিহ্নিত করেছেন –

এক. আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রশ্নে চীন-রাশিয়া বিরোধ।

দুই. ভারত-চীন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও চীনপন্থী কমিউনিস্ট মেরুকরণ এবং মুসলমান কমিউনিস্ট-হিন্দু কমিউনিস্ট বিভাজন।

তিন. ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। চীন বা রাশিয়াবিরোধী ব্লক গঠনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলনে আবার বিভাজন।

চার. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, নকশালবাড়ি[৯৩] আন্দোলনের ধারায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করা এবং বাকশালে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো।

উল্লেখিত চারটি পর্বে এসে উপমহাদেশ ও বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যার ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে কিংবা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশ পুনর্গঠনের কাজে বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারেনি; পারেনি সত্তর ভাগ দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের দেশে শোষিত মানুষকে বেঁচে থাকার শক্তি ও সাহস জোগানোর নির্ভরতা দিতে। এই স্থবিরতা, অনৈক্য ও ব্যর্থতার কারণগুলো ছফা জাতীয়-আন্তর্জাতিক পুঁজি-প্রবাহ এবং ক্রমবর্ধমান বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর[৯৪] বিভিন্ন তৎপরতার প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন। বামপন্থী রাজনীতির ভুল বা ব্যর্থতার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের কৃষক, শ্রমিক, জেলে; শ্রমজীবী বা সর্বহারা কোটি মানুষ– কেবল শোষিত হওয়া ছাড়া যাদের আর কোনো ভবিষ্যত নেই। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা জয়-পরাজয়ের সমীকরণের চেয়ে ছফার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে মানবিক বিবেচনা; ছফার মর্মযাতনা তাঁদের জন্য যাঁরা ইতিহাসের দলিত-নির্যাতিত-বঞ্চিত মানুষ, ক্ষমতার পালাবদলেও যাঁদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। উত্থানশক্তিরহিত বামপন্থী রাজনীতির কাছ থেকে শোষিত মানুষের প্রেরণা সুদূরপরাহত জেনেই আহমদ ছফা এতসব নেতিবাচকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নির্যাতিত-সর্বহারা

মানুষের শাশ্বত সংগ্রামী চেতনার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। তাঁরা প্রকৃতির সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে লড়াই করে যেভাবে টিকে থাকে, যেভাবে একই শক্তিতে লড়াই করে সামাজিক সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে জানে সব হতাশার মধ্যেও, সেইসব সংগ্রামী মানুষের প্রতি ছফার শ্রদ্ধা-ভালবাসা সবসময় । তাঁর অগাধ আস্থা এই চিরদিনের সংগ্রামী কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি জনতার ওপর।

৪.২.১০

'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রবন্ধের প্রথম বাক্য– 'বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না–এখন যা বলছেন, শুনলে বাংলাদেশের সমাজ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না' (ছফা, ২০০৮চ:১৯৫)– বাংলাদেশের দেশ-সমাজ ও জনবিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে তীব্র-ক্ষুব্ধ মন্তব্য। বাংলাদেশের রাষ্ট্রাদর্শ, জাতীয়তা, গণআন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের স্থিতধী ও সততানিষ্ঠ বিশ্লেষণ যখন অনেকক্ষেত্রেই প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন দেশের লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর আত্মমগ্ন নির্বিকারত্ব অথবা আত্মবিক্রিত সুবিধাবাদ দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে ক্রমাগত দিকচিহ্নহীনতায় প্রক্ষিপ্ত করেছিল। আহমদ ছফা এই নিরর্থক বুদ্ধিজীবিতার স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের শিকড়ে পৌঁছাতে চেয়েছেন, প্রকারান্তরে এটি অস্তিত্বেরই সংকট। তাঁর লক্ষ্য বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ যারা শোষণমুক্তির জন্য সংগাম করেছে। 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'[৯৫]- এর অধিকাংশে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে ও অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণির চেতনাগত অসাধুতা বর্ণিত হয়েছে, কিয়দংশে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও একজন স্বপ্নচারী লেখকের পরিচয় পাই।

ছফার মূল প্রতিপাদ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বাংলাদেশের জনগণ– বুদ্ধিজীবীরা নন; বরং বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবিতা নির্লজ্জ-সুবিধাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকেই এদেশের জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। ১৯৪৭-পরবর্তীকালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকে তারা এই ভূ-খণ্ডের মানুষের জাতীয় পরিচয় অন্বেষণ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে দৃশ্যমান যেসব কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তা একান্তই 'পোশাকী' তথা লোক-দেখানো বলে মনে করেন ছফা। রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও ভাষার ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয়তাকে বিবেচনায় নিলেও প্রশ্ন থাকে যে, এর জন্য আত্মস্বার্থ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ত্যাগ কারো মধ্যেই দেখা যায়নি। বুদ্ধিজীবীরা সমাজের যে মধ্যশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে থাকে সেই শ্রেণিরই সামাজিক পরিচয় ও অবস্থানের দোদুল্যমানতা থেকে তারাও মুক্ত নন। এই দোদুল্যমানতা পরিস্থিতির ভিন্নতায় নিরাপদ স্বার্থসর্বস্বতা অথবা চাতুর্যপূর্ণ সুবিধাবাদের জন্ম দেয়। স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার দাবীর বিভিন্ন পর্বে যে উত্তাল পক্ষ-প্রতিপক্ষ সংঘাত তাতে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া কাউকেই সামাজিক মর্যাদা-পদ-প্রাপ্তি থেকে যেমন বঞ্চিত হতে হয়নি তেমনি পড়তে হয়নি কোনো শাস্তির মুখেও (ছফা, ২০০৮চ:১৯৫)।

বিভাগ-উত্তরকালে পূর্ববাংলার সংস্কৃতিজগতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও আনুকূল্যের প্রলোভনে 'সাংস্কৃতিক এলিট' শ্রেণি সৃষ্টি হতে থাকে। ইসলাম, ইসলামি রাষ্ট্র, মুসলিম জাতীয়তা ইত্যাদি বিষয় রাষ্ট্রীয় দর্শনের সাথে সংগতি বিধান করে মনোহর ভাষাভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করার দক্ষতায় তাদের প্রতিভা ছিল নিয়োজিত। ফলে পশ্চিমা শোষক শ্রেণির পক্ষে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে ভাবতে হয়নি। কিন্তু এদেশের সাধারণ মানুষ ভুল করেনি বলেই তারা ভাষার প্রশ্নে একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এ জাতির প্রাণশক্তিকে চিনিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই সংগ্রামের ফলভোগী হলেন আবার সেই কবি-সাহিত্যিকরাই যারা পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতিকে বাংলার ওপর চাপিয়ে দিতে শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে নানা সুবিধা ভোগ করেছিলেন। ভাষা-আন্দোলন-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে

যে নতুন সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পরই তা হারিয়ে যেতে বসেছিল। কারণ রাজনৈতিক কর্মীদের সাংস্কৃতিক চেতনাহীনতা, ইতিহাস-ভূগোল জ্ঞানের অভাব এবং ফলস্বরূপ একটি উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক জাগরণ-সম্ভাবনাকে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের রক্তস্রোতে প্রবাহিত করতে না পারার ব্যর্থতা। 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' থেকে ছফার মূল্যায়ন উদ্ধৃত করা যায়–

> একটি সমাজের সর্বাঙ্গীণ গতির নাম রাজনীতি এবং সংস্কৃতি রাজনীতির রক্ত-রস, এই বোধে কোন রাজনৈতিক দল কিংবা লোকমান্য নেতার মন সিঞ্চিত হয়েছে, তেমন কোন দল বা ব্যক্তিত্বের নাম আজও জানা হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কৃতিবিমুখতা, কর্মীদের চেতনাহীনতা, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিকে দুটি আলাদা আলাদা ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করল। (ছফা, ২০০৮চ:১৯৮)

এই বন্ধ্যাত্ব, যা পাকিস্তানবাদী একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীর নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা ও সচেতন অপচর্চায় পক্ষ বিস্তার করেছিল, কবি-সাহিত্যিক-অধ্যাপক-সাংবাদিকদেরকে গ্রাস করল ব্যাপকভাবে। তাঁরা মার্কিন দূতাবাসের পছন্দমতো বইয়ের অনুবাদ করে, যেগুলো আবার অধিকাংশই সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রচারণার উদ্দেশ্যে রচিত, তাঁদের বিলিয়ে দেয়া বৈদেশিক মুদ্রা ভাগাভাগি করে নিলেন। আত্মস্বার্থের ক্ষুদ্রতায় জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়ার এমন নজির বিরল মন্তব্য করে ছফার হতাশাদীর্ণ ও ক্ষোভসঞ্জাত উচ্চারণ–

> এটা খুবই দুঃখের কথা যে আমাদের সংস্কৃতির যাঁরা শ্রদ্ধেয় লোক বলে খ্যাত– অনেকেই মার্কিনী অর্থের বিনিময়ে মানসিক দাসত্ব করেছেন এবং তা আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণ-সংগ্রামের বিপক্ষে গেছে। আমেরিকান দূতাবাসের সহজ টাকা না পেলে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মানসিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতেন। তা আমাদের শিল্প-সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মোচন করত। আর অনূদিত বইগুলো মার্কিনীরা জ্ঞান বিতরণের ছল করে স্কুল-কলেজে এবং সাধারণ পাঠাগারসমূহে বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমদের গণ-সংগ্রাম বিরোধী বই অধিক পাঠের ফলে আমাদের জনগণের চেতনা, চিন্তা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। (ছফা, ২০০৮চ:১৯৯)

১৯৮০ সালে রচিত 'পেশাজীবীরা রাজনীতিতে আসে না কেন' প্রবন্ধেও একই সময়ের চিত্র কিছুটা ভিন্নভাবে আরও গভীর বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতার প্রায় এক দশক পরেও পেশাজীবীদের রাজনীতিতে না আসার কারণসমূহ বিশ্লেষণসূত্রে ছফা লক্ষ্য করেছেন যে, ষাটের দশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় আইয়ুব খান বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে মেধাবী লেখক-সাংবাদিক-সাহিত্যিকদেরকে রাজনীতিচর্চা থেকে বিমুখ করেন। এর ফল দেখা যায় ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী ধারাটি বিকশিত হয়ে উঠতে থাকলে জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় বিজ্ঞান, জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য, জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে সুচিন্তিত জনমত গড়ে উঠতে পারেনি। রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা অর্জন না করায় কার্যক্ষেত্রে এর সঠিক কোনো প্রয়োগও ঘটেনি। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারাটি দেশের জ্ঞানী-গুণী-পেশাজীবীদেরকে সংগঠিত করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করার কোনো প্রয়াসও নেয়নি। বুদ্ধিজীবী বা পেশাজীবীদের সুবিধাবাদিতার কথা ছফা বারবার উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, এরা কেবলই শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের চারপাশে সমবেত হওয়া পেশাজীবীর দল। দল হিসেবে আওয়ামী লীগের উত্থানকালে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জাতির নেতৃশ্রেণির সম্পৃক্ততাকে সরকার পরিবর্তনের পূর্বাহ্নে দলবদলের মতো সুযোগসন্ধানী কাজ বলে অভিহিত করেছেন ছফা। যার ফলশ্রুতিতে তিনি প্রকারান্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সম্পৃক্ত বুদ্ধিজীবী-পেশাজীবীদের ওপর বাঙালি জাতীয়তাবাদের দুর্বলতার দায় চাপিয়েছেন; একই কারণে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের নীতি বাস্তবায়নে লক্ষ্যভ্রষ্টতার দায়ও তাদের ওপর বর্তায়। ছফার বিশ্লেষণে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত হয়– পেশাজীবীরা কোনোরকম ত্যাগ বা বাধা-বিপত্তির পথ মাড়িয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হননি বলেই স্বাধীনতার পরই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, আত্মকেন্দ্রিকতার নিরাপদ খোলসে নিজেদেরকে গুটিয়ে ফেলতে তাদের বিলম্ব হয়নি। ছফার লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যায় –

> উনিশ শ' উনসত্তর সালের পর থেকে আওয়ামী লীগের চারপাশে জাতীয় নেতৃশ্রেণীর যে অংশটি জড়ো হয়েছিল সে যোগাযোগের পদ্ধতিটি সঠিক অর্থে রাজনৈতিক ছিল না। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ যখন দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে মাথা

তুলে প্রায় এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির শিক্ষক, সাংবাদিক, সরকারি চাকুরে এবং পেশাজীবী শ্রেণীর একটি অংশ আওয়ামী লীগের পতাকাতলে এসে সমবেত হয়েছেন। প্রতিটি সরকার পরিবর্তনের পূর্বাহ্নে নেতৃশ্রেণীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতার কারণে এই ব্যাপারটিরই পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। কিন্তু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাহ্নের জাতীয় নেতৃশ্রেণী যে একটি বিশেষ সুবিধে পেয়ে গিয়েছিলেন, তা এই যে, তাঁরা নির্বিবাদে জাতীয় সংগ্রামের অংশ হিসেবে নিজেদের পরিচিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিকে ভাবের দিক থেকে, বুদ্ধির দিক থেকে, মণীষার দিক থেকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারেননি। (ছফা, ২০০৮ছ :২৮৯)

ছফা আশা করেন এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে পেশাজীবীদের মধ্য থেকে ভয় দূর করতে হবে; তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও অবদান দুয়ের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদেরকে সাহস ও ভরসা দিয়ে জাতীয় অগ্রগতির পথে সামিল করতে হবে।

৪.২.১১

১৯৭১ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক পেশা ও চর্চার সাথে জড়িত লেখক-সাংবাদিক-শিক্ষক ও গবেষকদের মধ্যে যাঁরা পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির অর্থানুকূল্যে জাতীয় পরিচয় ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য উপেক্ষা করেছেন আহমদ ছফার প্রধান লক্ষ্য তাঁরা। কারণ এই শ্রেণির বুদ্ধিজীবীরাই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে তাঁদের পূর্ববর্তী অপকর্ম ও অপরাধ ঢাকতে, তাদের লেজুড়বৃত্তির পরিচয় আড়াল করতে জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের ছদ্মবেশ নিয়ে সভা-সেমিনার-আলোচনা-সম্বর্ধনায় সবার চেয়ে বেশি তোষামোদি করতে থাকেন। স্বাধীনতার চারস্তম্ভের জন্য জাতীয় মাধ্যম তথা পত্রিকা-রেডিও-টিভিতে তুমুল আড়ম্বরবিশিষ্ট আয়োজন, স্তুতিময় শব্দ-বাক্যবর্ষণে তারাই ব্যস্ত ছিলেন যাঁরা কিছুদিন আগেও বাঙালির স্বাধীন আবাসভূমির স্বপ্ন তো দেখতেনই না এমন কি মুক্তিযুদ্ধের আগে বা পরে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মেও লিপ্ত ছিলেন। স্বাধীন দেশের রূপকল্প নির্মাণে যাঁদের অগ্রণী ভূমিকা থাকার কথা তাঁরা বরাবরের মতো সুবিধাবাদের নিরাপদ প্রকোষ্ঠে আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতার চার স্তম্ভ– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ সমর্থক ও রক্ষাকর্তা বনে যান। গণসংগ্রামের বিরোধিতাকারী, ছদ্মনামে পরিস্থিতির সুবিধা আদায়কারী অথবা আক্রান্ত নিরন্ন শরণার্থীদের প্রাপ্য সাহায্য লুণ্ঠনকারীরাই তারস্বরে প্রকাশ্য মাঠে তিরিশ লাখ শহীদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেছেন। জাতির এতবড় ক্ষতি ও বিপর্যয়কে অতিক্রম করে বাস্তবতার নিরিখে সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচনের প্রয়াস তাদের ছিল না। কিন্তু স্বাধীন দেশে যাঁদের পর্বতপ্রতিম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা, যাঁদের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের গুরুত্ব অনুধাবন করে তরুণসমাজ দেশ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারত তাঁদেরকে দূরে ঠেলে স্বার্থান্ধ, দেশপ্রেমহীন, প্রমাণিত সুবিধাবাদীদের হাতে অঢেল ক্ষমতা ও লুণ্ঠনের সুযোগ তুলে দিয়ে তৎকালীন সরকার যে মারাত্মক ভুল করেছিল তার মাশুল বাংলাদেশকে কিছুদিনের মধ্যেই দিতে হয়েছে, দিতে হচ্ছে আজও; বারবার রক্তাক্ত হয়েও জাতির সেই দুর্ভাগ্য-মোচন আজও হয়নি। এতসব প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ার আগেই স্বাধীন বাংলাদেশে আবারও সেই একই বুদ্ধিজীবী শ্রেণি তাঁদের মুখোশ পাল্টালেন। ফলে আবার সেই পাকিস্তানপন্থী রাজনীতিক-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-শিক্ষকেরই অবস্থান দৃঢ় হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে যখন প্রশ্নাতীতভাবে সামাজিক সম্বন্ধ ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নতুনত্বের অঙ্কুরোদগম হওয়ার কথা তখন সমাজ একটি চিন্তাশূন্য দোলাচলের মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম করছিল; ছফা তাকে ফ্যাসিবাদের সাথে তুলনা দিয়েছেন কারণ–

বর্তমান মুহূর্তে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীরাই হচ্ছেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শ্রেণী। এঁরা চিরদিন হুকুম তামিল করতেই অভ্যস্ত। প্রবৃত্তিগত কারণে তাঁরা ফ্যাসিস্ট সরকারকেই কামনা করবেন। কেননা একমাত্র ফ্যাসিস্ট সরকারই কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী সম্মান শিরোপা দিয়ে পুষে থাকে। অল্পসংখ্যক বাছাই করা লোককে দিয়ে নিজেদের প্রচার প্রোপাগান্ডা

> করিয়ে গোটা দেশের জনসমাজের স্বাধীন চিন্তা এবং প্রাণস্পন্দন রুদ্ধ করেই ফ্যাসিবাদ সমাজে শক্ত হয়ে বসে। চিন্তাশূন্যতা ও কল্পনাশূন্য আস্ফালনই হল ফ্যাসিবাদের চারিত্র্য লক্ষণ। (ছফা, ২০০৮চ:২০৯)।

কিন্তু তারপরও এতসব সুবিধাবাদী, চাটুকারের ভীড়ে, ক্ষুধা-মন্দা, অভাব-দারিদ্র্য, দুর্যোগ-দুর্বিপাকের মধ্যেও জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলার সবচেয়ে উজ্জ্বল সময় ছিল তখন। মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব সমাজজীবনে ছিল বিস্তৃত-গভীর। কারণ– 'একটি জনগোষ্ঠীর যুদ্ধ করে স্বাধীনতা আদায় করার জন্য যে ঐক্য এবং একাগ্রতা প্রয়োজন তা আমাদের জনগণ অর্জন করতে পেরেছিলেন' (ছফা, ২০০৮চ:২১৪)।

স্বাধীনতার পর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের সমাজ শ্বাসরুদ্ধকর, গ্লানিময়, আদিম পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে ছফা মনে করেন। 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি' প্রবন্ধে তিনি সেই পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন যখন বেঁচে থাকার লড়াই বড় কথা, সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিয়ে ভাবনাচিন্তার সুযোগ অলীক অবাস্তব। সামাজিক জীবন যখন বিনষ্টির প্রায় চূড়ান্তে উপনীত তখন শাসকদলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় উগ্র ব্যক্তিসর্বস্বতাবাদ। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, জনমনে হতাশার জন্ম দেয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনেও যেসব সাহিত্যিক-চিন্তাবিদ গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিলেন এমন পরিস্থিতিতে তারাও সৃজনশীলতা হারিয়ে স্তিমিত হয়ে পড়েছেন বলে ছফা মনে করেন। কারণ সমাজদেহ থেকে কোনো অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন না তারা, কোনো বিষয়বস্তু নেই সেখানে। কারণ 'বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্যে যে মানসিক স্বাধীনতার অপরিহার্য প্রয়োজন' সেই সময় সে বস্তুটিরই ছিল ঘোরতর অভাব (ছফা, ২০০৮ছ:২৯৬)। ফলে সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে ছিল দুধরনের লেখক– স্বাধীনতাহীনতার প্রতিক্রিয়ায় 'অসহায়ভাবে প্রতিনিয়ত নীরবহৃদয় দহনের গ্লানিতে দগ্ধ' লেখক অথবা 'পাইকারি হারে মিথ্যা বলিয়েদের দলে নাম লিখানো' লেখক (ছফা, ২০০৮ছ:২৯৬)। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে চলছিল রুচিহীন দলীয়-ব্যক্তিদের প্রাধান্য, 'যে মানসিক স্বাধীনতা সংস্কৃতির প্রাণরস দিনে দিনে তার দুয়ার বন্ধ হয়ে আসছিল' (ছফা, ২০০৮ছ:২৯৬)। যারা পাকিস্তানবাদী সাহিত্য রচনায় সক্রিয় ছিলেন তাদের কেউ কেউ শেরওয়ানী খুলে ফেলে মুজিব কোট পরে সংস্কৃতি পরিবর্তনের সরকারি হাঁকডাক বয়ে বেড়াচ্ছিলেন।[৯৬] তোষামুদে আর সুবিধাবাদী লেখক-সাহিত্যিকের দাপটে মননশীলতা, স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি এবং সত্য সন্ধানের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষকদের স্বাধীনভাবে লেখা বা জ্ঞানচর্চার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। সরকার সমর্থক শিক্ষক ছাড়া অন্য শিক্ষকগণ নিদারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। সংস্কৃতির সঙ্গে স্বাধীন মননশীলতা, স্বাধীন চিত্তবৃত্তি এবং সত্য সন্ধানের যে গভীর সম্পর্ক তা বিচ্ছিন্ন হয়ে এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও বেদনাদায়ক বিষয় হল, এতসব শূন্যতা আর অভাব-দুর্ভিক্ষের মধ্যেও একশ্রেণির সরকার-তোষক বা চাটুকার ঠিকই সবরকম সুযোগসুবিধা ভোগ করছিল। ছফা বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

> এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ভয়ানকভাবে বিরাজমান থাকার ফলে জনগণের দৃষ্টি থেকে অতি দ্রুত কুয়াশা কেটে যাচ্ছে এবং তড়িত গতিতে তাদের মোহমুক্তি ঘটেছে জনগণের সচেতন অংশের মধ্যে বিপরীতধর্মী চিন্তা-ভাবনা প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। সাহিত্যে তার অল্প-স্বল্প রূপায়ণ ইতোমধ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যে অনড়, স্থবির সংস্কৃতি এবং বিগত যুগের মানব সম্বন্ধের গুণগান সরকারের তোষামুদে গ্ল্যামার বয়েরা প্রতিনিয়ত করে থাকে,তা কিছুতেই জনগণের মধ্যে কোন রকমের শিকড় প্রবিষ্ট করাতে পারছে না। (ছফা, ২০০৮ছ:৩০১,৩০২)

এই অনির্দেশ্য, বিস্ফোরণ্মুখ পরিস্থিতিতে ছফা সরকারবিরোধী দলগুলোর মধ্যে শ্রেণিসংগ্রামের রাজনৈতিক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা অনুমান করে 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিঃসংশয়ে শ্রেণিসংগ্রামের দিকেই ধাবিত হচ্ছে' এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন (ছফা, ২০০৮ছ:৩০২)। একই সাথে সমাজে সাংস্কৃতিক মেরুকরণের কাজটিও তখন চলছিল, একটি পরিবর্তনের আশা ও স্বপ্নকে সামনে রেখে। সাহিত্যে তার প্রকাশও ঘটতে শুরু করেছিল, এমন পরিস্থিতিতে, 'অন্ধতামসিক বিশ্বাস জনগণের চেতনা থেকে ঝরা পাতার মতো ক্রমাগত ঝরে

যাচ্ছে। জনগণের সচেতন অংশের চেতনা ক্রমশ ধারাল এবং গভীর হয়ে উঠেছে। সামাজিক- ভাবে ভাল বলে পরিচিত অনেক মানুষের উহ্য পরিচয়ও থলির বেড়ালের মতো বাইরে বেরিয়ে আসছে। একেবারে অপরিচিত অনেক আনকোরা নতুন মানুষ ওপরে আসছে' (ছফা, ২০০৮ছ:৩০২)। এসবই বাংলাদেশের ইতিহাসের ঐ বিশেষ সময়ে সমাজের উপরিতলে অপ্রকাশ্য কূটজাল ও অস্বাভাবিক আন্দোলনের সাক্ষ্য।

কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তথা ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রেণিসংগ্রাম নয়, সামরিক-বেসামরিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কয়েক দফায় সংঘটিত অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক ও অন্তর্ঘাতমূলক হত্যাযজ্ঞ বলে পরিচিত হয়েছিল। আহমদ ছফা শ্রেণিসংগ্রামের স্বপ্নে বিভোর হয়ে জাতির সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ও নৃশংস ঘটনার মধ্যে যে-জনগণের অত্যাসন্ন অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনা দেখেছিলেন সেই জনগণ কতটুকু লাভবান বা মুক্তি অর্জন করেছিল সে প্রশ্নের উত্তর তো পরবর্তী ইতিহাস দিয়েছেই, ছফা বারবার দিয়েছেন। 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে 'সাম্প্রতিক বিবেচনা' ভূমিকাংশ থেকে উদ্ধৃতি[৬৭] –

> উনিশ শ' পঁচাত্তর সালে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হওয়ার পর দেখা গেল, একাত্তরের পরাজিত শক্তিসমূহ আবার মাথা তুলতে আরম্ভ করেছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই সমস্ত শক্তিকে পাতাল প্রদেশ থেকে টেনে তুলে আমাদের সমাজজীবনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন। মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ একে একে ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগল। সমস্ত পরিবেশটা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিষিয়ে তোলা হল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের প্রতাপ অধিকতর বিস্তৃত হয়ে পড়ল। সংস্কৃতির গতিপথটার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য নিত্যনতুন কৌশলের উদ্ভাবন করা হতে থাকল। বাঙালিত্বের বিপরীতে মুসলমান পরিচয়টা খুঁচিয়ে বের করার জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত রইল না, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে যে দেশটি জন্ম নিয়েছে তার প্রকৃত পরিচয় মুছে দিয়ে দেশটিকে আবার নতুন পাকিস্তানে পরিণত করার সর্বাত্মক পাঁয়তারা করতে থাকল। সমাজের ওপর হতে তলা পর্যন্ত পশ্চাৎপদ ধারণা রাজ্যপাট বিস্তার করতে আরম্ভ করল। (ছফা, ২০০৮চ:১৭১-১৭২)

একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সম্ভাবিত হয়ে উঠেছিল এক বৃহত্তর রেনেসাঁ যা বাঙালির ঊনবিংশ শতাব্দীর অসম্পূর্ণ জাগরণে চেয়ে ব্যাপ্তি এবং গভীরতায় আরও বেশি পূর্ণতাপ্রাপ্ত। একটি জাতির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্পর্কসমূহের যে পুনর্গঠন সম্ভব হয় তা ইতিহাসের এক দুর্লভ সুযোগ; কারণ সমগ্র জাতিকে পরিণামমুখী সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধকরণ এবং তা থেকে বিজয়ের গৌরব ছিনিয়ে আনার কৃতিত্ব গলায় পরতে পেরেছে খুব কম জাতি। এই বিজয় নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ ও রাষ্ট্রাদর্শের বিজয়, বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্য–ভাষা-জীবনাযাপন সম্বলিত সমাজ প্রতিষ্ঠার বিজয়। 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' থেকে ছফার শব্দে–

> বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জনযুদ্ধের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক আদর্শের বদলে আরেকটি রাজনৈতিক আদর্শ, এক ধরনের রাষ্ট্রের পরিবর্তে আরেক ধরনের রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রভাব আমাদের সংস্কৃতিতে আসতে বাধ্য। পাকিস্তানি সংস্কৃতির স্থলে নতুন প্রাণবন্ত এবং সৃজনশীল বাঙালি সংস্কৃতির মহীরুহ শত শত মুকুল মেলবে। এটা প্রত্যাশা করা একটুও অস্বাভাবিক নয়। যদি তা বাস্তবে পরিণত না হয়, তাহলে আমরা কোনদিন মনে-প্রাণে স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা তুলতে পারব না। একটি যুদ্ধোত্তর সমাজের নানা অসুবিধা, অপূর্ণতা, উত্তেজনা এবং ভুল বুঝাবুঝির মধ্যেও নতুন সংস্কৃতির বুনিয়াদটি ভেতর থেকে সৃজিত হচ্ছে কিনা তার প্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। (ছফা, ২০০৮চ:২০৮,২০৯)

বাঙালি জাতির সামনে সুযোগ এসেছিল তাঁর পরাধীনতা ও ঔপনিবেশিকতার সমস্ত শৃঙ্খলকে জাতির সকল পরিচয়-চিহ্ন থেকে মুছে ফেলার। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাগ্রে। সবক্ষেত্রেই স্বাধীন দেশের শক্ত-সমর্থ নীতি ও আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন আশা করা হয়েছিল। প্রয়োজন ছিল রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে নতুন সেতুবন্ধ রচনা করে সমাজকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা। আহমদ ছফা আশা করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শের ভিত্তিতে সমাজের সকল ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবীচেতনার অঙ্কুরোদগম ও প্রসার। কারণ তা না হলে পুরনো ধ্যান-ধারণাকে সমূলে উৎপাটন সম্ভব নয়। কিন্তু সর্বত্র যে ওলট-পালট অবস্থা, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্যের ব্যাপ্তি তাকেই

দেশে নতুন সমাজ সৃজনের পূর্বশর্ত বা যর্থার্থ সময় বলে ধরে নেয়া যায়। এই নৈরাজ্য ও স্থবিরতাকে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে আলোকিত আঘাত' করে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব সূচিত করার প্রয়োজনীয়তা ও আশাবাদের কথা উচ্চারণ করেছিলেন ছফা–

> আমাদের সামজিক এই যূথবদ্ধ স্থবিরতাকে নানান দিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে আলোকিত আঘাত করতে হবে। সে পথেই আমাদের সমাজে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব সূচিত হবে। উন্নততর সাংস্কৃতিক বিপ্লব উন্নততর রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্ম দেবে। সুন্দর সমাজই রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রাণ কথা। একটা পর্যায়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিক কর্মীদের সাংস্কৃতিক কর্মীর ভূমিকা পালন করতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীদের রাজনীতিসচেতন হতে হবে। সমাজকে সুন্দর করা রাজনীতি এবং সংস্কৃতির যৌথ দায়িত্ব। (ছফা, ২০০৮চ:২১৯)

শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-জ্ঞানচর্চা-সমাজভাবনা সর্বত্রই বিপ্লবী কর্মীগোষ্ঠী গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল। কারণ–

> আধুনিক চিন্তাসমৃদ্ধ বিরাট কোন পুরুষের অভিভাবকত্বের অভাবে বাঙালি সমাজের ভেতর থেকে ধর্মীয় ডগমা বা বদ্ধমত এবং সামাজিক আচারের জঞ্জাল ভেদ করে কোন বিরাট মানুষ প্রবল প্রাণশক্তির তোড়ে মাথা তুলতে পারেনি। তার ফল দাঁড়িয়েছে ধর্মীয় বদ্ধমত এবং সামাজিক সংস্কারের কোলঘেঁষা অন্ধকার সামাজিকভাবে কাটিয়ে ওঠা এখনো সম্ভবপর হয়নি। (ছফা, ২০০৮চ:২২০)

তুরস্কের কামাল পাশার মতো এসব ধর্মীয় বদ্ধমত ও সংস্কারকে সমাজের অগ্রগতির পথ থেকে বিতাড়িত করা অসম্ভব নয় যদি মূঢ়তা, স্থূল অন্ধ বিশ্বাস, পুরনো মূল্যবোধ, অসার রীতি-নীতি-সংস্কারকে সজ্ঞান মেধাবী চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো মহত্তর চিন্তা বাঙালি মুসলমান লেখক করতে পারে। রাজনীতিকেরা জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে রাজনীতিই সমাজের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি নির্ধারণের নিয়ামক কিন্তু সাহিত্যিক-লেখক-শিল্পী এর সাথে সমাজের মেলবন্ধন ঘটাবার দায়িত্ব কতখানি পালন করছেন তা বিবেচ্য। বিপ্লবী সাহিত্য গড়ে তোলার জন্য এই বিবেচনা জরুরি। ছফার ভাষায়, 'মনুষ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং মানুষের প্রতি মমতাহীন কবি, সাহিত্যিক কিংবা সমাজসংস্কারক কারো কোন দাম নেই' (ছফা, ২০০৮চ:২২০)। এই সর্বমানবতাবাদ ও মনুষ্যত্ববোধকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করাই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তি।[৭৮] ধর্মীয় জাড্য ভেঙে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও ভাবতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের কথা; ভাবতে হবে তাদের সংস্কারান্ধতার কথা, ধর্মীয় অনাচার ও বদ্ধমতের বিরুদ্ধে তাঁদের অসহায়তার কথা। এমনকি বর্ণহিন্দু বা সাঁওতাল, মগ, গারো, হাজংসহ অন্যান্য ধর্মবর্ণের মানুষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করে সম্প্রদায়গত বদ্ধমতের আবরণ ফেলে মানুষ হিসেবে সকল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো সমাজ তৈরি করতে হবে। যা কিছু মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আবদ্ধ রাখে তার বিরুদ্ধে না দাঁড়ানো কপটতা, বিপ্লবে কপটতার স্থান নেই। মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয়কে চিহ্নিত করার সর্বাত্মক প্রয়াসই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল কথা। কারণ–

> মানুষের মন দিয়েই মনের পরিবর্তন সম্ভব। বাহ্যিক সমস্ত প্রচেষ্টা মনের জাগরণ, চৈতন্যের উদ্বোধন ছাড়া ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেউ কেউ বলেন, ধন বণ্টনের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে ওসব থাকবে না। কিন্তু সাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তো সর্বপ্রথম সংস্কারমুক্তি প্রয়োজন। ধর্মীয় সংস্কার এমন জিনিস যা সোজা জিনিসকে বাঁকা দেখতে বাধ্য করে। এই বাঁকা দেখতে বাধ্য হয়েছিল বলেই ভারত দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে। (ছফা, ২০০৮চ:২২১,২২২)

দেশের তৎকালীন বাস্তবতায় ছফার বিবেচনায় সমাজতন্ত্র কখনও সুদূরপরাহত আবার কখনও সম্ভাব্য বলে মনে হয়েছে। 'জাতীয় পেশা ভিক্ষা' আর 'জাতীয় মূলধন হতাশা' হলে (ছফা, ২০০৮চ:২২৯) কিংবা মানুষের মর্যাদাকে অনিশ্চিত-অবহেলায়, লাঞ্ছনায়, নিগ্রহে অপমানিত করলে জাতি হিসেবে আমাদের কোনো সম্মানই থাকে না বিশ্ববাসীর কাছে। তাই বাংলাদেশের পরিবর্তিত সমাজবাস্তবতায় স্বনির্ভরতা অর্জনই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন ছফা। এক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ছফা বিশেষভবে উল্লেখ করেছেন। কারণ বাঙালির জাগরণে অনেকগুলো সাময়িকপত্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান-মেধা-মনন-চিন্তাচর্চার সবচেয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্র। সমাজের

সঙ্গে চিন্তাশীল বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগসাধনের এক পরীক্ষিত মাধ্যম সংবাদপত্র-সাময়িকী। তবে লক্ষ রাখা প্রয়োজন, কলকাতার পত্র-পত্রিকা যেন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত না হয়। সমাজের সাথে প্রত্যক্ষ-সম্পর্কিত বলেই কলকাতার সংবাদপত্র-সাময়িকী বাংলাদেশে নতুন সমাজসৃজনে প্রতিবন্ধকও হতে পারে– যেহেতু দুই সমাজের সমস্যা ও সম্ভাবনা ভিন্ন রকম। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন নিজেদের মূল্যবোধ ও লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টির স্বতন্ত্র সাময়িকী ও প্রকাশনা-ব্যবস্থা। এর সাথে বুদ্ধিজীবীদেরও রয়েছে দায়, রয়েছে জাতির উন্নত পরিচয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কর্তব্য–

> আমাদের দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য হওয়া উচিত আমদের জনগণের মধ্যে ইতিহাসের এই গতিধারাটির বোধ চাড়িয়ে দেয়া এবং যে সকল সংস্কার বিশ্বাস ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথে বাধা রচনা করে, সে সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করবে কি করে, তার বিষয়ে ওয়াকেফহাল করা। মানুষের বোধকে উন্নত করা, রুচিকে পরিশীলিত করা, সংগ্রামী মানবতার প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাশীল এবং কায়িক, মানসিক শ্রমের প্রতি যত্নশীল করে তোলাই এ পর্যায়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাজ। (ছফা, ২০০৮চ:২৩৫)

কিন্তু এটাও সত্য যে, বুদ্ধিজীবীরা যে জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষায়-মেধায় লড়াই করে যাবেন সেই জ্ঞানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু রাজনৈতিক পদ্ধতি। বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই বিভিন্ন দেশের আনুগত্য ও মুগ্ধতা নিয়ে নিজভূমে পরবাসীর মতো জীবনযাপন করেন, যাদেরকে প্রভাব-বলয়ের বিভিন্ন দেশের 'দালাল' নামে অভিহিত করা হয়। মূলত সে-সব দেশের জ্ঞানচর্চার পদ্ধতি ও আদর্শের প্রতি অনেক বুদ্ধিজীবীরই রয়েছে দুর্বলতা, মানুষে-মানুষে সমতার আদর্শ বাস্তবায়নে অনেক দেশের পদ্ধতিগত সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়েও অনেক বুদ্ধিজীবী নিজস্ব লক্ষ্য স্থির করেছেন। কিন্তু দেশ-বহির্ভূত মানসিক আনুগত্যের কারণে দেশের বিপুল ক্ষতির বিষয়ে ছফা সতর্ক করেছেন। মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলন যেমন 'দেশবহির্ভূত এবং না-ধর্মী' প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সমাজতান্ত্রিক দেশের রাজধানীর দিকে মোহাবিষ্টতাও অনাসৃষ্টি। বুদ্ধিজীবীদের এই বিদেশমুখিতা বাংলাদেশের সমাজপরিবর্তনে কাঙ্ক্ষিত গতি আনার জন্য ক্ষতিকর। একে ছফা পলায়নী মনোবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন, যেখান থেকে রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে লেজুড়বৃত্তির জন্ম হয় (ছফা, ২০০৮চ:২৩৬)। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি একরকম অতীতচারিতা। বাংলা সংস্কৃতির উৎকর্ষ যাঁদের অনন্য প্রতিভায় সেইসব বরেণ্য লেখকদের প্রতি মোহমুগ্ধতাকেও ছফা অর্থহীন অতীতচারিতা মনে করেন। জাতীয় সংস্কৃতির স্বার্থে এমন অতীতমুখিতাও বর্জন করার পরামর্শ ছফার। তাহলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজে যে বিপুল অসঙ্গতি ও নৈরাজ্যের অনুপুঙ্খ বর্ণনা ছফা দিয়েছেন তার অন্তরালে একটি সূর্যকরোজ্জ্বল সমাজবিপ্লবের আভাসও পাওয়া যায়। সমাজবিপ্লবের জন্য যে মননশীলতার পরিবর্তন প্রয়োজন তা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মানসবিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত হয়, রাজনৈতিক বিপ্লব এসবকিছুকে সম্ভাব্য করে তোলে।

আত্মভুক বুদ্ধিজীবিতা, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, মানসিক দাসত্ব, সুবিধাবাদী মধ্যশ্রেণির বর্ণচোরা চরিত্র এবং সাম্প্রদায়িকতার শেকড়গাড়া শক্তি সত্ত্বেও আহমদ ছফা বারবার আশাবাদের কথা বলেছেন। সামাজিক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেই যেভাবে একটি সুন্দর সংস্কৃতিবান সমাজগঠনের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে তার সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিও চিহ্নিত। সমাজে একটি নতুন রূপরেখার আভাস কোন ভিত্তিতে উদ্ভাসিত হবে অথবা এর বাস্তবতা কোথায় সে সম্পর্কে ছফার অনুধাবন দেশাত্মবোধের গভীরতা-উদ্ভূত। তিনি দেশের জন্য সেই প্রাণভরা ভালবাসা এবং উদ্যম দেখেছেন সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে; যাঁরা ছফা-মানসের অপরাজেয় মহানায়ক। অনির্দেশ্য কপট রাজনীতি, ন্যুব্জ ও পরাঙ্মুখ শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজ ও রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শবিহীন সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপকতা দেখেও ছফা শ্রেয়োচেতনায় উত্তরণে উদ্বুদ্ধ করেন আমাদেরকে – '[বিদ্রোহের জন্য] প্রয়োজন সুন্দরতম ধৈর্য, মহত্তম সাহস, তীক্ষ্ণতম মেধা এবং প্রচণ্ড কূলছাপানো ভালবাসা, যার স্পর্শে আমাদের জনগণের কুঁকড়ে যাওয়া মানসিক প্রত্যঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগবে এবং সাহস ফণা মেলবে' (ছফা, ২০০৮চ:২২৭)। সমাজ থেকেই তিনি এসবের প্রাণবীজ আহরণ করেন। চর্যাপদের আমল থেকেই হাঁড়িতে ভাত নেই যে জাতির, হাজার

বছর ধরে মানুষ আর প্রকৃতির লড়াইয়ে দুঃখ-দুর্দশা, দৈব-দুর্দৈব, দুর্বিপাক-মড়ক-মহামারীতে বারবার পতিত হয়ে যে জাতি পশুর চেয়েও নিম্নমানের জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে, তারপরও এই গঙ্গা-যমুনা-আত্রাই অববাহিকার মানুষের সংগ্রামী চরিত্রই তাদেরকে ইতিহাসে অবিনাশী প্রাণশক্তির জাতিত্বে চিহ্নিত করেছে। আমাদের সম্ভাবনার সূত্র সেখানে, ছফা তা যথার্থই চিহ্নিত করেছেন।

৪.২.১২

ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সংকট হল 'ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে একটা মেলবন্ধন রচনা করা' (ছফা, ২০০৮ঙ:৩৯৯)। কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ছফা 'নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ' প্রবন্ধে– 'বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মচিন্তা এবং সংস্কৃতিচিন্তার মধ্যে একটা দুস্তর পার্থক্য বর্তমান। ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসার হওয়ার পূর্বে এখানকার যে স্থানীয় সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, তার স্রোতোধারার ভেতরে ধর্মভাবনা পুরোপুরি অবগাহন করতে পারেনি। স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মচিন্তার একটা বিরোধ বরাবর থেকে গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান সমাজে এ ধরনের ঘটনা খুবই কম ঘটেছে' (ছফা, ২০১১:১০৭)। বাংলায় এই সমন্বয় একেবারেই ঘটেনি তা নয়। ওরশ শরীফ, ঈদের জামাত, দরূদপাঠ, মিলাদ মাহফিল, কোরআন খতমের আয়োজন ইত্যাদি বিষয় সংস্কৃতির সাথে অঙ্গীভূত ধর্মচর্চার উদাহরণ। ইন্দোনেশিয়া, ইরানের মতো বৃহৎ মুসলিম দেশে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামের মেলবন্ধনের উদাহরণ দিয়ে ছফা লিখেছেন যে বাংলায় 'ইসলাম ধর্মের অভিভাবকেরা সকল সময়ে স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে শেরক্ এবং মূর্তিপূজার গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন'; এর একটা কারণও অবশ্য তিনি জানিয়েছেন, মুসলমানের সংখ্যা কম থাকায় ক্ষেত্রজ সংস্কৃতিকে সবসময় সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের চোখে দেখা হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ ও গন্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশ এই অভিমতের পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ–

> আমার ধারণা বাংলাদেশি জাতির সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার মুখে প্রধান বাধাটি হল ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে একটি সুষম সমন্বয়ের অভাব। বাংলাদেশি জাতি গঠনের ক্ষেত্রে যদি ধর্মচিন্তাটি মুখ্য এবং প্রবল হয়ে দাঁড়ায়, এই অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসী উপজাতিসমূহ, সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান– এই সকল সম্প্রদায় জাতির মূল ধারাস্রোতের মধ্যে সংস্কৃতির চিন্তাটিকে প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ বেঁকে বসে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যের বশে নিজেদের আকাঙ্ক্ষাটি অন্য সম্প্রদায়গুলোর ওপর চাপিয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠবে। ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে যথাযথ মেলবন্ধনটি যদি ঘটে যায় জাতি সম্পর্কিত যে খণ্ডিত চিন্তাগুলো আমাদের জনগোষ্ঠীর নানা অংশে নানাভাবে ক্রিয়াশীল থাকে সেগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত সক্রিয় থাকলেও এক সময় অবসিত হতে বাধ্য। আমার ধারণা, এই সময়ের প্রধান কর্তব্য হল আমাদের জাতির অন্তর্গত প্রতিটি ধর্ম এবং সম্প্রদায়, প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে সকলকে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যে একটি নতুন ইতিহাস প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে তার অংশীদার করে তোলা।(ছফা, ২০১৫:১৬)

এতে সফল হতে হলে প্রয়োজন অনেকদূর পর্যন্ত মানসিক স্তরের খনন শেষে এমন স্তরে পৌঁছানো যেখানে 'আমরা আমাদের জাতির অন্য সম্প্রদায়, অন্য ধর্ম, অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে বিনা বাধায় মিশতে পারি, মিলতে পারি। অর্থাৎ আমরা কোথায় এক, সর্বপ্রথমে প্রয়োজন সেটা আবিষ্কার করা'(ছফা, ২০১৫:১৭)। যদিও বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা লক্ষ্যগোচর নয়। সমস্যাটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় ও উৎকর্ষ নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুতর। নতুন শিল্পাদর্শের চেহারা, মূল্যচেতনা, গ্রহণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে ধারণা সেই মধ্যযুগের মুসলমান পুথি লেখকদের কাছে যেমন অপরিচ্ছন্ন ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরও নতুন সমাজবাস্তবতায় তা ঠিক একই বাস্তবতায় আবির্ভূত হল। সেই সময়, ১৯৭৪ সালে রচিত 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে' প্রবন্ধে ছফা সেরকমই অভিযোগ তুলেছেন–

> এই দেশীয় কোন কোন পণ্ডিত প্রায়শ বলে থাকেন যে আমরা ঐতিহ্যবোধকে বিস্মৃত হচ্ছি বলেই আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নতি হচ্ছে না। তাঁরা ঐতিহ্য বলতে অতীতের ঠিক কোন জিনিসটিকে বোঝাতে চান, বোধকরি তাঁদের নিজেদের কাছেও খুব স্পষ্ট নয়। বাঙালির ঐতিহ্য বলতে কেউ বোঝাতে চান, সদলবলে গামছা বুনতে লেগে যাওয়া। কেউ মনে করেন

> উদোম গায়ে পরনের লুঙ্গি উঁচিয়ে বকরী নৃত্য করা, আবার কেউ বলেন সকলে মিলে ভাওয়াইয়া গানের তালিম নেয়া বা লোক-সাহিত্যের ঘুঁটে কুড়োনোই খাঁটি বাঙালি ঐতিহ্য। নিজেদেরকে যাঁরা সত্যি সত্যি বিদ্বান ভাবেন তাঁদের মতে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুরুদেব জ্ঞান করা এবং কলকাতার বঙ্গসন্তানদের অনুকরণে কথা বলাই যথার্থ বাঙালির ঐতিহ্য। (ছফা, ২০০৮খ:১৯৬)

ছফার এই বক্তব্যে নির্দিষ্ট শ্রেণি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ এবং আক্রোশের প্রতিধ্বনি থাকলেও একটি বিষয় খুব স্পষ্ট যে, জাতির সাংস্কৃতিক জাগরণের জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল যথাসময়ে তা করা হয়নি। কারণ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার অথবা সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা নির্ধারণে ব্যর্থতা। সাংস্কৃতিক বিপ্লবই পারে এই সংকট থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে। একারণেই একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা ছফা বারবার উচ্চারণ করেছেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সৃজনশীলতা, ছফার ভাষায়, 'বহতা নদীর মত' সহজ ও উপলব্ধিগোচর হওয়া চাই; 'জনগণের চাহিদার সঙ্গে, তাদের সমস্যার সঙ্গে, তার সমাধানের সঙ্গে আন্দোলনের সংযোগ নিবিড় হওয়া চাই' (ছফা, ২০০৮খ:১৯৭)।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রাদর্শ বিবেচনা ও ভবিষ্যত বিনির্মাণে তিনটি উপাদানের গুরুত্বের কথা তিনি সবসময় উল্লেখ করেছেন–

প্রথমত, একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব; আরও সুনির্দিষ্টভাবে, বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম
দ্বিতীয়ত, রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ পেশাজীবী তথা কৃষকশ্রেণির অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব এবং
তৃতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ধর্ম।

শেষোক্ত বিষয়ে সাজ্জাদ শরীফের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ছফা উল্লেখ করেছেন, বাঙালি মুসলমান তাঁর আত্মপরিচয় সমাজ ও ভাষার গায়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুদীর্ঘকাল ব্যাপী যে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালিয়েছে তার পরিণতিতে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যের একটি সাম্প্রদায়িক চরিত্র দাঁড়ালেও তাঁর সাংস্কৃতিক সত্তার সামগ্রিক রূপটি অস্পষ্টই থেকে গেছে কারণ বাঙালি মুসলমান 'নিজেদের ধর্ম এবং সমাজ এগুলো নতুন যুগের আলোকে ব্যাখ্যা করেনি এবং তাদের মধ্যে যেটুকু আধুনিক চিন্তা-চেতনা এসেছে সেটুকু হিন্দু মধ্যবিত্ত চিন্তা-চেতনার উপজাত মাত্র' (ছফা, ২০০৮গ:৩৮৬,৩৮৮) । অস্পষ্টতার আরও কারণ আছে; একই বক্তব্যের অন্যত্র বাঙালি মুসলমানের ধর্ম-সংস্কৃতি-দূরত্ব কেন্দ্রিক সেই একই সংকটের উল্লেখ করে ছফা বলছেন–

> মুসলমানদের মধ্যে সংস্কৃতি আর ধর্মের একটা তফাৎ আছে। এটা বাঙালি মুসলমানের মস্ত বড় একটা প্রবলেম। যেটা বাঙালি হিন্দুর কিছুটা আছে, কিন্তু সেটা অন্যরকম। বাঙালি মুসলমানের ন্যাচারাল এডভান্টেজ আছে, হিন্দু ধর্মের যে প্রকাণ্ড জাতিবিভাগ আছে তা থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজ মুক্ত। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের যে যুদ্ধবিরোধী অহিংস অবস্থান, এটাও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আছে। যেহেতু তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, তখন তাদের যে জীবন-অভিজ্ঞতা এবং জীবন-দৃষ্টি তা আর্টিফিশিয়াল ক্লাসগুলোর কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত এবং এটার যে এডভান্টেজ নেয়ার কথা ছিল তা না করে সবকিছুর নকল করতে আরম্ভ করল। কখনো মক্কা-মদিনার, কখনো পাকিস্তানের। আর এখন, কখনো ইউরোপের, কখনো পশ্চিম-বঙ্গের। এখানকার বুদ্ধিজীবী এলিট এদের সেন্স অফ বিলংগিং নেই। অধিকারবোধ নেই। (ছফা, ২০০৮গ:৩৯০)

বোঝা যায়, মুসলমানের ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে[৯৯] ছফা একটি গুরুত্বপূর্ণ অণুঘটক মনে করেন। তবে বাঙালি মুসলমান সমাজ তিনটি বড় সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বিকশিত হলেও ছফা এটাকে সংস্কৃতির শক্তি ও দুর্বলতা দুই-ই মনে করেন। কারণ সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে যে মেধা ও মনন চর্চা করতে হয় বাঙালি মুসলমান তা কখনো করেনি। এভাবেই হাতছাড়া হয়ে গেছে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, শুধু চিন্তাজগত থেকে নয়, সমাজজীবন থেকেও। সেই জায়গা পূরণ করছে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বদ্ধমত। ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে সব ঐতিহ্যিক সম্পদের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে না পারাকে বাঙালি মুসলমান সমাজের

'মারাত্মক ভুল' বলে ছফা মনে করেন। এ বিষয়ে ১৯৯৪ সালে *শিলাপাঠ* পত্রিকার জন্য মীজানুর রহমান মীজানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ছফার বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক–

> কোরআন হাদিস ওগুলো আমাদের সামাজিক ঐতিহ্য এ কথা সত্য। কিন্তু আমরা বেদ, গীতা, উপনিষদ এগুলোও তো পর মনে করিনে। এই সমস্ত গ্রন্থ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ যে সকল মহারথীরা করেছেন তাদের কেউ রচনা করেননি। এগুলো এই ভারতভূমির মূল্যবান সম্পদ। আমরাও তো এই মৃত্তিকার সাক্ষাত সন্তান। এগুলোর ওপর আমাদের দাবি এবং অধিকার আছে। সেটা তো কেউ খারিজ করতে পারবে না। মুসলমান সমাজের মারাত্মক ভুল হল ঐতিহ্যিক সম্পদের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এই কারণে চারটি প্রধান সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেও মুসলমানেরা বিশেষ লাভবান হতে পারেনি। (ছফা, ২০০৮গ:৩৭৫)

বাঙালি মুসলমানের উত্থান ও প্রাণশক্তিতে অগাধ আস্থাবান ছফা সবসময়ই, জাতীয়তাবাদ বা জাতিসত্তা, রাষ্ট্রাদর্শ বা দর্শন সকলক্ষেত্রেই ধর্মকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনার পক্ষপাতি; তবু সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে, কারো চাপিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে না গিয়ে, নিজেদের সমাজের ভেতর থেকেই সেক্যুলারিজমের বিকাশ দেখতে চান ছফা। কারণ তিনি মনে করেন 'ধর্মীয় মূল্যবোধ একেবারে ফেলনা নয়। কিন্তু ধর্ম যদি সমস্ত জীবনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সেটা হবে মারাত্মক'(ছফা, ২০০৮গ:৩৭৫)।

৪.২.১৩

গত শতব্দীর আটের দশক থেকেই বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ছফার চিন্তা ছিল সর্বক্ষণ নিয়োজিত–'বাংলাদেশের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের একমাত্র হাতিয়ার হল গণতান্ত্রিক চেতনা। গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন মিল নেই কিংবা সঙ্গতি নেই'(ছফা, ২০০৮গ:১৫৫)। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক বাধা-বিপত্তি, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, দীর্ঘ সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের যে চর্চা শুরু হয় তাকে উপমহাদেশের বিশেষ করে ভারতের এবং বিশ্বের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছেন ছফা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের ফলে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের একচ্ছত্র প্রভাব নিশ্চিত করতে সেনাশাসনের মাধ্যমে সরকারগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পুরনো পদ্ধতি থেকে সরে এসে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভোট-বিপ্লবকে গুরুত্ব দেয়া শুরু করে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী বলয়। কিন্তু এই গণতন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে গোড়া থেকেই সন্দিহান ছফা 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শোভাযাত্রা' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> বাংলাদেশে যে গণতন্ত্র অদ্যাবধি কার্যকর রয়েছে তা ততটা বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম থেকে উঠে আসেনি। আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জন কৃষক। কৃষকদের কোন সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নেই। রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজভিত্তিক কোন দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে কৃষকদের কোন অংশগ্রহণ নেই। যে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গণতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত সেখানকার গণতন্ত্র কখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করতে পারে না। (ছফা, ২০০৮ঙ:২২৯,২৩০)

বাংলাদেশের প্রচলিত গণতন্ত্রের চর্চায় ক্ষমতার সুবিধাভোগী শহুরে মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, ছাত্র ও টাউট শ্রেণির মানুষের প্রভাব বেশি। সন্ত্রাসীকে ব্যবহার না করলে এদের কেউ ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারবে না বলেই মানবিক দায়িত্ববোধ ও সমাজবোধ আশা করা এক্ষেত্রে অকল্পনীয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই বলেই তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর। ফলে পশ্চিমা দেশগুলোর চাপিয়ে দেয়া গণতন্ত্র বাংলাদেশে এসে গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারে রূপান্তরিত হয়েছে কারণ তা সমাজের মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেনি কখনও। এমনকি সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও সেই স্বেচ্ছাচারেরই অংশ বলে মনে করেন আহমদ ছফা।[১০০]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আহমদ ছফার পর্যবেক্ষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য পাওয়া যায় 'মাওলানা ভাসানী : ফারাক্কা গৃহদাহের রাজনীতি' প্রবন্ধে। গত শতাব্দীর নয়ের দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে গণতন্ত্রের চর্চা চলে তাকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চাপিয়ে দেয়া গণতন্ত্র মনে করেন ছফা। যার ফলে রাজনীতিতে অর্থ ও পেশিশক্তির দাপট[১০১] বাড়তে থাকে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবী জনগণের হাতে রাজনীতির কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না, থাকে বুর্জোয়াশ্রেণির পরিতোষক সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে। ১৯৯৬-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলা সফরের অভিজ্ঞতা থেকে ছফা লিখেছেন যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে পেশিশক্তি ও অর্থের দাপট এতটাই বিস্তৃত হয়েছে যে নির্বাচনে রাজনৈতিক দল যেমন প্রার্থী বাছাই করে তেমনভাবে এই অশুভ শক্তির দাপটে প্রার্থীও দল বাছাই করার ক্ষমতা পেয়ে যায়। ছফা মনে করেন বাংলাদেশের রাজনীতি শুরু থেকেই একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল যা কালান্তরে বহুগুণে বিবর্ধিত, অর্থ ও পেশিশক্তির বশীভূত এবং গণমানুষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পেশাদার খেলোয়াড়ের ক্লাব বদলানো বা ইজারাদারদের হাট-ঘাট ইজারা নেয়ার মতো বিষয় হয়ে উঠেছে রাজনীতি। তাই শতকরা পঁচাশি ভাগ কৃষিজীবীর দেশের রাজনীতিতে কৃষকের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। ছফার ভাষায়–

> বাংলাদেশের গণতন্ত্র গণতন্ত্রের মত দেখালেও আসলে এটা নিকৃষ্টতম স্বৈরতন্ত্র। বাংলাদেশের কৃষক সমাজের ভেতর থেকে রাজনীতি উঠে শহরে আসছে না। শহরের কালো টাকার মালিকেরা তথাকথিত গণতন্ত্রের কালো হাত প্রসারিত করে কৃষকদের বুকের ওপর চেপে বসেছে। বাংলাদেশের জনগণের সামান্যতম কল্যাণ করার ক্ষমতাও এই রাজনীতির নেই। (ছফা, ২০০৮খ:২৫১)

বাংলাদেশে পঁচাত্তর পরবর্তীকালের রাজনীতিতে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার তাকে বিচলিত করেছে, উদ্বিগ্ন করেছে পেশিশক্তি ও টাকার দৌরাত্মে সুস্থ-স্বস্থ রাজনীতির দুর্দশার চিত্র। ১৯৮৮ সালে রচিত 'রাজনৈতিক কালচার' প্রবন্ধে ছফা 'এত মানুষ রাজনীতিত করে কেন? রাজনীতিতে কী এমন মধু আছে?' বলে যে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন; ২০০০ সালে প্রকাশিত 'রাজনীতি যখন সমাজকে চালায়' প্রবন্ধেও প্রচলিত রাজনীতিতে ছফার সেই বিরক্তি ও হতাশা সম্পূর্ণ অটুট দেখতে পাই। রাজনীতি এবং সমাজের মধ্যে ওতপ্রোত-সম্পর্ক। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনীতির প্রতি সাধারণের অনুগত থাকতেই হয় কিন্তু ছফা লক্ষ্য করেছেন বাংলাদেশে রাজনীতির দুষ্টচক্র সমাজকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তিনি এই সমাজ সম্পর্কে তাঁর সাবধানতা ব্যক্ত করেছেন–

> একজন ভাল কবি হওয়া, একজন ভাল দার্শনিক হওয়া, একজন মেধাবী চিত্রকর কিংবা প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক হওয়া, এগুলো এক ধরনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সমাজে যখন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রবলভাবে চেপে বসে, মানুষের মৌলিক বৃত্তিসমূহের প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে আরম্ভ করে। মানুষের অপকৃষ্ট বৃত্তিসমূহ এমনভাবে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে মানবসমাজ আর মানুষের সমাজ থাকে না, পশুর সমাজে রূপান্তরিত হয়। (ছফা, ২০০৮ঘ:২৪২)

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক মানুষের জ্ঞান, চিন্তা ও সৃজনক্ষমতারই প্রতিরূপ রাজনীতি। তাছাড়া রাজনীতি হল সমাজের উপরিকাঠামো। তাই ছফা মনে করেন, রাজনীতির ধরন পরিবর্তনের ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই, সরকার পরিবর্তন করে রাজনীতিকে দূষণমুক্ত করাও সম্ভব নয়; তাই ছফা মনে করেন রাজনীতিকেই বদলে দিতে হবে। রাজনীতির এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে সমাজ থেকেই।

আহমদ ছফা বাংলাদেশের রাজনীতির পরিবর্তন ও অনুবর্তন, কলুষতা ও অবক্ষয় তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারপরও মানুষকে 'পলিটিক্যাল বিয়িং' উদ্ধৃত করে তিনিই আবার রাজনীতিবিদদের প্রতিই সর্বশেষ আস্থার কথা প্রকাশ করেছন। সকল অভিযোগ ও হতাশা সত্ত্বেও তাঁর আস্থা ও আশাবাদের শেষ বাক্যগুলো বারবার রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে। তিনি অনেকটা নিরুপায় নির্ভরতায় লিখেছেন– 'রাজনীতি ছাড়া

আমাদের ভরসা করার আর কোন জায়গা নেই।'[১০২] বাংলাদেশের রাষ্ট্ররূপ নিয়েও তিনি বিচলিত ছিলেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত। তাঁর চিন্তা অতিক্রম করেছিল বিদ্যমান বহুধা-বিভক্ত রাজনীতির সকল সীমাবদ্ধতা। সকল জাতীয় সংকট ও দুরাবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বিরক্তি, হতাশা ও সন্দেহ প্রকাশে দ্বিধাহীন, সমালোচনামুখর আহমদ ছফার প্রবল আস্থা ছিল তরুণ সমাজের বিপ্লবী চিন্তা-চেতনায়। বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পতনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়লেও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি বলে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন ছফা। এ প্রসঙ্গে সকল সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন টিকে থাকার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেছেন;[১০৩] বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে যা সমাজতন্ত্রের প্রতি তথা বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি ছফার বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। বিপ্লব, তা সে যে-কোনো মূলগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, ছফা সমর্থন করেছেন। অর্থনৈতিক বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, কৃষি বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব এমনকি জাতীয় বুর্জোয়া বিপ্লবও তাঁর আশার প্রদীপে সর্বক্ষণ আলো জ্বালিয়েছে। বিপ্লব বলতে তিনি সবসময় যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধরনে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবের অনুরূপ কিছু বোঝাতেন তা নয়। সমাজে বড় ওলটপালট ও বিরাট আকারের ভাঙচুর ঘটিয়ে সমাজকে নতুনভাবে ঢেলে সাজায় বিপ্লব। সমাজে যখন বৈষম্য থাকে, অন্যায়-অবিচার চলে, দারিদ্র্য এবং হতশ্রী প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে তখন সমাজের ভেতর থেকে যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জন্ম নেয় ছফার ভাষায় তা-ই বিপ্লব; এই বিপ্লবের প্রয়োজন কখনও ফুরিয়ে যায় না বলে ছফার দৃঢ় বিশ্বাস। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের উঁচুবিত্ত শ্রেণি এবং সমাজবিপ্লব প্রসঙ্গ' প্রবন্ধের সমাপনী কয়েকটি বাক্যে ছফা তাঁর বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছেন দৃঢ়তার সাথে–

> আগে সমাজ-বিপ্লবের যে প্রচলিত সংজ্ঞা ছিল সেটি অচল প্রমাণিত হলে বিপ্লবের প্রয়োজন বাসি হয়ে যাবে, সেটা কখনো সত্যি নয়। বাংলাদেশের জনগণকে বাসযোগ্য সমাজ নির্মাণ করতে হলে অবশ্যই একটি সমাজ-বিপ্লবের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য দরকার বিপ্লবের একটি নতুন সংজ্ঞা– সে সংজ্ঞার সঙ্গে পূর্বের পাঠ্যপুস্তকের সংজ্ঞার যদি গরমিল ঘটে যায়, কিছু যায় আসে না। (ছফা, ২০০২:৪১৩)

ছফা বাংলাদেশকে দেখেছিলেন এই অঞ্চলের নির্যাতিত জাতি-গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর ও প্রতিবাদের পৃষ্ঠপোষক এক প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রের মতো করে। সেজন্য তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার দুর্বলতা, অনেক ক্ষেত্রে বিলয়ের মধ্যেই, বাংলাদেশের সাফল্যের সম্ভাবনা দেখতেন। তাঁর বিপুল অভিনিবেশ ও কর্মশক্তি ব্যয়িত হয়েছে ভারত-চর্চায়, অবশ্য একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার স্বার্থেই। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে একটি কনফেডারেশনের সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন; যেমন সংস্কৃতির নৈকট্যের ওপর ভর করে এবং পারস্পরিক প্রয়োজনের নিরিখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তৈরি হয়েছে (ছফা, ২০০৮ঙ:২১৭)। আবার মাওলানা ভাসানী যেমন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসভাতেই দিল্লীর দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য বাংলা-আসাম মিলে একটি পূর্বভারতীয় রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন ছফাও সেই আদলে বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা নিয়ে বৃহত্তর বাংলা গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। নিদেনপক্ষে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ঐক্যে তথা যুক্তবাংলার স্বপ্নে তাঁর বিশ্বাস ছিল আমৃত্যু। এর জন্য আধুনিক 'ইকোলজিক্যাল স্টেট'[১০৪] বা পরিবেশ-রাষ্ট্রের ধারণাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এগুলো সবই ছফার আকাঙ্ক্ষাপুরণমূলক চিন্তার[১০৫] অংশ। এসব ভাবনাকে নেহাত বিক্ষিপ্ত-চিন্তা বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফলও বলা যায় না। কারণ অনেকে 'ইউটোপিয়া' বললেও ইতিহাসে আস্থা রেখে ছফা নিজেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'ইতিহাসে ইউটোপিয়ার মূল্য আছে' (ছফা, ২০০৮ঙ:২১৫)। তাই এমন ইউটোপিয়ার কথা তিনি বারবারই ব্যক্ত করেছেন, বিভিন্ন আলোচনায় বা লেখায়। তারপরও এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হবে না যে, ছফার এসব ভাবনার পেছনে বিরাজমান পরিপ্রেক্ষিত ও পরিস্থিতির সম্পর্ক বা বাস্তবতা ছিল সামান্যই।

৪.২.১৪
বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বিধায় ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা-জারিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান জনগণের আবাসস্থল বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। বাঙালি মুসলমানের এই সামাজিক আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতা মধ্যযুগের পুথির মধ্য দিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে বলে আহমদ ছফা উল্লেখ করেছেন। এরপর পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে ধর্মের নামে যে 'অপরিশোধিত আবেগ' স্ফূলিঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটাও ছিল বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। কারণ যে রাজনৈতিক পাটাতনে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ও পাকিস্তান-আন্দোলনে ভারতবর্ষের মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তার উদ্ভব, লালন ও বিকাশভূমি ছিল তৎকালীন পূর্ব-বাংলা– আজকের বাংলাদেশ। কিন্তু ধর্মই জাতীয়তাবোধের একমাত্র নিয়ামক শক্তি নয় বলেই ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট 'পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন' হওয়া বা 'পাকিস্তান ভাঙার দায়িত্ব'ও বাঙালি মুসলমানকেই নিতে হয়েছে। কারণ আরও পরিণত, অহংপুষ্ট, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে সকল শোষণ-নির্যাতনের জবাব দিতে সমগ্র জাতি ছিল ঐক্যবদ্ধ। এজন্য এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাসের নজিরবিহীন ত্যাগ স্বীকার করে বাঙালি মুসলমান প্রতিষ্ঠা করেছে বাংলাদেশ, লিখিত ইতিহাসে বাঙালির সবচেয়ে বড় অর্জন; বাঙালি জাতির একমাত্র স্বাধীন আবাসভূমি। সুতরাং ভাষা ও জাতিগত একাত্মতাবোধ ছাড়াও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তা-চেতনা বাংলাদেশের মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে এটি অনিবার্য সত্য, তবে আহমদ ছফা এই স্বাতন্ত্র্যকে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতায় সীমাবদ্ধ রাখার বিরোধী। আমরা লক্ষ করি, আহমদ ছফার চিন্তা-চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ, জাতিসত্তা যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে, তেমনি মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা, ধর্মনরিপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িকতাও পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

'বাঁচতে শিখুক' প্রবন্ধে ছফা ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের নিহিতার্থ এবং মানুষের প্রকৃত শুভবোধ ও মনুষ্যত্বের মাধ্যমে এই অন্ধত্ব পরিহারের উপায় সন্ধান করেছেন। নিজে মানুষের মতো বাঁচা এবং একইভাবে অপরকে বাঁচতে দেওয়ার মধ্যেই মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ; সবাইকে নিয়ে বাঁচার মধ্যেই প্রকৃত মানবতার পরিচয়। অথচ ধর্মান্ধ মানুষের মধ্যে এমন কতগুলি অধর্মাচরণ বা অশুভ বোধ ক্রিয়া করে যা তাকে হননপ্রবৃত্তিতে উৎসাহিত করে। এসব আসলে ধর্মের শিক্ষা নয়। ধর্মান্ধতার মূলে যে প্রবৃত্তিটি কাজ করে সেটি হল 'একধরণের অজ্ঞানতা এবং নিশ্চিতিবোধের অভাব' এবং ধর্মীয় কলহ-বিদ্বেষ-হানাহানির মূলে কাজ করে অজ্ঞতাপ্রসূত শ্রেষ্ঠাত্বভিমান। এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে ছফা লিখেছেন–

> প্রায় প্রতিটি ধর্মের লোক কম বেশি মনে করে থাকে– আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ, আমাদের পয়গম্বর শ্রেষ্ঠ, ধর্মগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ, আমরা যে জীবনবিধান মেনে চলি তা শ্রেষ্ঠ, এমন-কি মরবার পরে আমরা যে স্বর্গে যাবার বাসনা রাখি সেই স্বর্গটি অন্যবিধ ধর্মোদ্ভূত স্বর্গের চাইতে অনেক সুন্দর, মজবুত টেকসই এবং আরামদায়ক। জগতে এ পর্যন্ত ধর্ম নিয়ে যত কলহ-বিবাদ, খুন খারাপি, যুদ্ধ এবং দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে তার মূলে অজ্ঞতাপ্রসূত এই শ্রেষ্ঠাভিমানই ক্রিয়াশীল থেকেছে। প্রতিটি ধর্মের মানুষ বিশ্বাস করেছে অন্যদের নিশ্চিহ্ন না করলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সুনিশ্চিত হয় না, যেহেতু আমরা শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত সত্যপথে আছি, তাই অন্যদের ধ্বংস এবং হত্যা করার অধিকার বিলক্ষণ আমাদের আছে। (ছফা, ২০০৮জ:১৫১)

কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা হল, মানুষকে শেষ পর্যন্ত অপর ধর্মের অপর জাতির অপর দেশের মানুষদের সাথে মিলেমিশে বাঁচতে শিখতে হয়েছে। অপররের ধ্বংস ও হত্যা প্রয়াসের মধ্যে মানুষের পশুত্ব প্রমাণিত হয়, মনুষ্যত্ব নয়– একথা ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে মানতে হয়েছে বারবার। মানুষ আসলে নিজেই নিজকে ঠিকমত চেনে না এবং এটাই তাঁর মূল সংকট; আবার এটাই মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথ। অর্থাৎ মানুষের মূল সংকটই হল নিজেকে উন্মোচিত করার সংকট আর এই সংকট-উত্তরণের আগুন তাঁর কাছেই আছে। গ্রিক মিথে যাকে বলা হয়েছে 'প্রমিথিয়ান ফায়ার', সেই মনুষ্যত্বই হল মানুষী সত্তার সেই আগুন যা মানুষকে আত্মপরিচয়ের গভীরে গিয়ে নিজেকে জানতে পথ দেখায়। মানুষের মনের মৃত্যুকীট তাকে হননপ্রবৃত্তিতে উৎসাহিত করে, উপযুক্ত বিদ্বেষ বা

ঘৃণার পরিবেশ পেলে সংঘাত-দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্ররোচিত করে, আবার একসময় নিজকেই নিঃশেষ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু এটি কেবল মানবসত্তার সংকোচনের দিক; প্রসারণের দিকও আছে; ছফা লিখেছেন–

> মানুষ তার সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে বিজ্ঞানের সাধনায়, দার্শনিক প্রতীতীর উপলব্ধিতে অপর মানুষের সঙ্গে সংযোগ এবং সম্প্রীতির পথ প্রসারিত করে। আধুনিক পৃথিবীর ধারণা এই বিকশিত মানবতার মধ্যে থেকেই জন্মলাভ করেছে। (ছফা, ২০০৮জ:১৫২)

সুতরাং অপরের বিনাশের মধ্যে নিজের বাঁচার সম্ভাবনা খোঁজার চেষ্টা সৃষ্টির বিপরীতমুখী কর্মকাণ্ড যা ঈশ্বর সাধনারও বিপরীত। 'মানুষ তাঁর কল্পনার শ্রেষ্ঠাংশ দিয়ে ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত হয়েছে' (ছফা, ২০০৮জ :১৫৩), তাই মানুষের ঈশ্বর ধারণ করার ক্ষমতাটিকে খুব বড় করে দেখেন ছফা এবং মনে করেন মানুষ স্বয়ং ঈশ্বর কিন্তু মানুষের অন্তঃকরণ যদি ঈশ্বরের নিবাস হয়, তাহলে মানুষের কাছে ঈশ্বরের নামে কিছু প্রত্যাশা করতে হবে। যে-ঈশ্বরের আবাস মানুষের হৃদয় তার কাছে মানবতা ও মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার দাবিই সর্বাধিক।

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 'মূলত মানুষ' প্রবন্ধেও একই সাধনাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন আহমদ ছফা; বর্ণনা করেছেন মানুষের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের ঈশ্বরভাবনার স্বরূপসন্ধানে। জৈবিক সংগঠনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যাধার মানুষ। মানুষের অস্তিত্বের ঘোষণা, আত্ম-আবিষ্কার, প্রজন্মান্তরে বংশবিস্তার, অভাব-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রোগ-শোক-হতাশা-নিষ্ঠুরতা অতিক্রম-ক্ষমতা, ঈশ্বরচেতনার উদ্ভব, শিল্প-সাহিত্য ও দর্শন সৃষ্টি এক অপার বিস্ময়। মানুষের ঈশ্বরচিন্তাকে অমরতাভাবনার সমার্থক উল্লেখ করে ছফার বক্তব্য-

> মানুষকে যা কিছু অনন্তের ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তা মানুষের মহত্ব এবং অনন্যত্বকে খর্ব করে, খাটো করে। মানুষ ধর্মের আবিষ্কার করে অনন্তের মধ্যে তার অবস্থানের একটা সামঞ্জস্য নির্মাণ করেছে। যখন ধর্ম অনন্তের উপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষ ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধিতা করেছে। এক বিশ্বাস বর্জন করে অন্য বিশ্বাসকে বরণ করে নিয়েছে। ধর্ম বিশ্বাস হোক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সংগঠন হোক, যেদিক থেকেই নৈতিক বন্ধন তার চলমানতার পথে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষ বিদ্রোহ করেছে। বিদ্রোহ করার অধিকার, গতানুগতিকতাকে মেনে না নেবার অধিকারই মানুষের চলার পথের সবচাইতে বড় পাথেয়।(ছফা, ২০১১:১১৬)

অর্থাৎ মানুষই ঈশ্বর। নিজের ভেতরের ঐশ্বরিক সত্তাকে জাগ্রত করতে পারার মধ্যেই মানুষী সত্তার মুক্তি। এক অনন্তের বোধ ও তৃষ্ণা মানুষকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ক্রমাগত পরিবর্তন স্রোতের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ যেভাবে ঈশ্বরভাবনায় উপনীত হয় তার নানাপথ নানান মত থাকতে পারে। ছফা মনে করেন–

> যে পিতামাতা আমাকে আপনাকে জন্ম দিয়েছে, যাঁরা আমাকে আপনাকে লালন পালন করেছেন, যে সমস্ত মানুষের সুখস্মৃতি আমি আপনি ধারণ করে থাকি, আমি আপনি যে সমস্ত মানুষকে জানি, যাদের জানি না– শুধু অস্তিত্ব অনুভব করি, আমি আপনি যখন থাকব না, সেই সময়ে যে সমস্ত মানুষ মানুষি প্রাণের কলরবে এই পৃথিবীকে ভরিয়ে রাখবে বলে ধরে নিয়েছি, সবকিছু মিলিয়ে অনন্তজীবী এক বিমূর্ত মানুষের স্মৃতি আমার চেতনায় আসন নিতে চায় এবং সেটাকেই আমরা ঈশ্বর মনে করি। (ছফা, ২০১১:১১৪)

তাই ছফাকে অনুসরণ করে বলা যায়, মানুষ নিজেই নিজের আলোকবর্তিকা, নিজেই নিজের রহস্য উন্মোচনে সবচেয়ে বড় অভিযাত্রী। মানুষের আত্মআবিষ্কারের ঘোষণাই সভ্যতার আলোকবর্তিকা। মানুষের সৃজনসত্তায় গভীর আস্থাবান ছফা আরও সুনিশ্চিতভাবে তাঁর বিশ্বাসকে প্রকাশ করেন নিচের উদ্ধৃতিতে–

> আমার অভীষ্ট বিষয় মানুষ, শুধু মানুষ। মানুষই সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত মূল্যচিন্তা সমস্ত বিজ্ঞান বুদ্ধির উৎস। সবকিছুই উচ্ছৃত হয়েছে মানুষের ভেতর থেকে। ধর্ম বলুন বিজ্ঞান বলুন শিল্পসাহিত্য দর্শন যা-ই বলুন না কেন, মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতাই সবকিছুর জন্ম দিয়েছে। (ছফা, ২০১১:১১৪)

আহমদ ছফার অনুধ্যানে মানবতাই আরাধ্য ধর্ম, প্রেমধর্মই সকল মানবিক মূল্যবোধের সর্বশ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ। ছফা-মানসের এই সূত্র ধরে আমরা লক্ষ্য করি ছফার সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিচিন্তার বিশেষ স্থান অধিকার আছে মানবতাবাদ ও প্রেমধর্ম। তাঁর কয়েকটি সংশ্লেষ থেকে বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে।

'স্মরণ : দীনেশচন্দ্র সেন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক বাংলা ও বাঙালির আত্মা সন্ধানের তুলনা করে ছফা বাঙালির লোকায়ত ইতিহাসে হৃদয়ধর্মের প্রাধান্যের কথা লিখেছেন –

> বঙ্কিম নির্ভর করেছেন সংস্কৃত সাহিত্য, ব্রাক্ষণ্যবাদ, গীতা,বেদ– এ। সমস্ত জিনিসের ওপর এগুলোর ভেতর থেকেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার উপাদান তিনি বের করে এনেছিলেন। কিন্তু দীনেশবাবুর সন্ধানের প্রক্রিয়াটি ছিল ভিন্নরকম। তিনি শাস্ত্র নয়, সন্ধান করেছিলেন সমাজ। ধর্ম নয়, তাঁর উপজীব্য ছিল মানুষ। সে মানুষ হিন্দু না মুসলমান এটা তার ধর্তব্যের বিষয় ছিল না। লোকায়ত জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে যে মর্মমধু তিনি আহরণ করেছিলেন, তার মর্যাদা এবং গুরুত্ব বঙ্কিমের মত অত দার্ঢ্য নিয়ে দাঁড়াতে না পারলেও গভীরতা অনেক গুণে বেশি। বাংলার পল্লীসমাজ, বাংলার লোকসাহিত্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি–এ সমস্ত জিনিসকে তাঁর মত এত হৃদয় দিয়ে কেউ গ্রহণ করেনি। তাঁর এই যে অনিদ্র অন্বেষণ, এর পেছনে একটা বিশ্বাসের আগুন ছিল। বঙ্কিম তাঁর প্রচণ্ড প্রতিভার প্রভাবে হিন্দু সমাজকে যে গোটা বাঙালি জাতীয়তার প্রেম থেকে সরিয়ে নিয়ে একটি উল্টো ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন, তার প্রতিবাদ করাই ছিল দীনেশ সেনের মূল লক্ষ্য। (ছফা, ২০০৮ঙ:২২৪)

বঙ্কিমের হিন্দু ব্রাক্ষণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক চিন্তার বিপরীতে দীনেশ চন্দ্র সেনের মানবতাবাদী চিন্তাধারাকেই ছফা সমাজের জন্য প্রকৃত কল্যাণকর বলে মনে করেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করে দীনেশ চন্দ্র কেবল মানুষকেই প্রধান বলে বিবেচনা করেছেন এবং বাংলায় সাধারণের প্রেমধর্মকেই তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছিলেন। 'শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ তুলনামূলক আলোচনাতেও বঙ্কিমের সাম্প্রদ্রায়িক বিদ্বেষ ভাবাপন্ন চিন্তার বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ ও প্রেমধর্মকেই বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা বলে গণ্য করেন ছফা। এভাবে, 'নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ' প্রবন্ধে নজরুলের মানবতাবাদী ভাবধারাকেই বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যাদর্শ বলে বিবেচনা করেন ছফা। এ প্রসঙ্গে 'অমৃতভাণ্ড : মাইজভাণ্ডার' প্রবন্ধের আলোচনাও ছফা-মানসের এই বিশেষ দিক উন্মোচনে সহায়ক বলে আমরা মনে করি।
এ প্রবন্ধে সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে ছফা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মাইজভাণ্ডারকে বিশ্লেষণ করেছেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের নতুনত্বে। উদারনৈতিক ধর্মসাধনায় চিশতিয়া ও কাদেরিয়া পন্থার সম্মিলনে সৃষ্ট মাইজভাণ্ডারের মাধ্যমে উপমহাদেশে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারাই সমৃদ্ধ হয়েছে– 'ধর্মীয় বদ্ধমত এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর পথ মাইজভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন' (ছফা, ২০০৮খ:২৬২)। ধর্মের সঙ্গে প্রেম ও আনন্দের সংযোগ ঘটিয়ে এর একটি 'ইতিবাচক অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছে'। ছফা এই অন্তর্নিহিত শক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

> ধর্মের সঙ্গে যদি আনন্দ সাধনার সংযোগ না ঘটে তাহলে ধর্ম বিধি-নিষেধের ছককাটা মৌমাছিতন্ত্রের রূপ নেয়। মাইজভাণ্ডার ধর্মের সঙ্গে আনন্দ ও রস চর্চার সংযোগ ঘটিয়ে ধর্মের একটি ইতিবাচক অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছে। সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল বলেই ইসলাম একটি নতুন জীবনাবেগ নিয়ে জীবনের নতুন মহিমা উর্ধ্বে তুলে ধরেছে, তা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নয়, কিন্তু সম্প্রদায়কে কখনো প্রধান করে তোলে না। (ছফা, ২০০৮খ:২৬৩)

মাইজভাণ্ডার সাধকের উদার মানবতাবাদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে উপমহাদেশের ভাবসাধনার আরেক বৈপ্লবিক দর্শন বৈষ্ণবরস-সাধনা এবং এর ফসল বৈষ্ণব গীতিকবিতার ধারার। মাইজভাণ্ডার সাধকেরা সরাসরি সঙ্গীত সাধনা না করেও সঙ্গীতের যে বিপুল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন তা আমাদের সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। তাদের আধ্যাত্মিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ গানগুলো যে কেবল ভাবের নতুন জগত উন্মোচন করেছে তা নয় এতে যে সুর সংযোজিত হয়েছে তাও সৃষ্টি করেছে এক নতুন ধারার। এসব বিশ্লেষণ থেকে আমরা সামাজিক সংস্কার ও

সমাজ-বিপ্লবের জন্য সকল ধর্মের সকল মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও প্রেমের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছফা-মানসের উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারি।

কিন্তু মৌলবাদ এ সকল উদার-মানবিকতা ও কল্যাণচিন্তাকে সংকীর্ণ পথে প্রবাহিত করে। মানুষের প্রসারিত জীবনচেতনাকে প্রতিবন্ধকতায় নিস্প্রাণ গতিহীন করে তোলে। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত 'সেই কুয়াশা সর্বনেশে' প্রবন্ধে মৌলবাদের স্বরূপ উন্মোচন করে ছফা লিখেছেন,'মৌলবাদ বলতে আমি সেই জিনিসটাই বুঝি যা অতীতকে আগামীর পথে স্থাপন করতে চায়। অর্থাৎ মানুষ সব সময়ে সামনে যায়। সঠিক প্রেক্ষিতটা তার সামনে স্পষ্ট নয় বলেই সে অতীতকে টেনে আনতে চায়' (ছফা, ২০১১:১৬৭)। আর তখনই জন্ম নেয় মৌলবাদ। মানুষ যখন তার আগামী তথা ভবিষ্যত সম্পর্কে কোনো রূপরেখা বা প্রেক্ষিত চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় তখনই মৌলবাদের সূচনা হতে পারে। মৌলবাদীর দৃষ্টি ইতিহাসের উল্টাপথে; এমনকি সে যখন ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা বলে তখনও। ছফা আরও উল্লেখ করেন 'মানুষ সবসময় সামনে যায়। যখন সে মনে করছে সে অতীতকে ফিরিয়ে আনছে তখনো সে সামনে যাচ্ছে। কিন্তু অতীত ফিরে আসে না। এই সত্যটি দর্শনগতভাবে যারা মানে না তারাই হল মৌলবাদী' (ছফা, ২০১১:১৬৭)। সুতরাং অতীত ফিরে আসা সম্ভব নয় এই সহজ সত্যটি অনুধাবনে যারা ব্যর্থ হয় তারাই মৌলবাদী। মৌলবাদী কেবল ধর্ম নয়, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন সবকিছুকেই আঁকড়ে ধরে নির্বিবাদে অবস্থান করতে পারে। মৌলবাদ প্রতিরোধের উপায় সততা ও দৃঢ়চিত্ত উদারচিন্তা। আমাদের দেশের প্রগতিশীল বলে পরিচিত কতিপয় ব্যক্তি বা পত্র-পত্রিকা সবসময় মৌলবাদকে আক্রমণ করেন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকেন। তারা মৌলবাদ দমনের লক্ষ্যে এসব করলেও, ছফা মনে করেন, এতে বরং মৌলবাদের ধ্বংসশক্তি ও দাহক্ষমতা আরো বেড়ে যায়। বরং মৌলবাদকে আক্রমণের সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র হল প্রগতিশীলতা লালন ও প্রচার করা। প্রগতিশীলতাকে সংস্কৃতির লবণ আখ্যা দিয়ে ছফা লিখেছেন–

> একটা জাতির আকাঙ্ক্ষা তার শিল্প-সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। সমুদ্রের জলে যেমন লবণ থাকে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যদি প্রগতিশীলতার লবণ না থাকে, যে ভঙ্গিতেই প্রচার করা হোক না কেন, আসলে সেগুলো মৌলবাদের সহায়ক ভূমিকাই পালন করে থাকে। (ছফা, ২০১১:১৬৮)

সুতরাং মৌলবাদ বিরোধিতার নামে আত্মপ্রচার নয়, ছফার মতে 'মৌলবাদকে প্রতিরোধ করার প্রকৃষ্ট পন্থা হল মানুষকে সঠিকভাবে চিন্তা করতে শেখানো। মানুষ সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারলে মৌলবাদ পরাজিত হতে বাধ্য' (ছফা, ২০১১:১৬৮)। 'এইসব ভদ্রলোক' প্রবন্ধে ছফা মৌলবাদকে প্রতিরোধের জন্য যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার চাষ করতে বলেছেন–

> মৌলবাদের প্রধান চরিত্র লক্ষণ হল যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস। মৌলবাদ রোখার সবচাইতে বড় হাতিয়ার হল যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার চাষ করা। মানুষকে সংস্কৃতিবান এবং চিন্তাশীল করতে পারলেই মৌলবাদকে বাধা দেয়ার সব চাইতে বড় কাজটি করা হয়। (ছফা, ২০০৮ঙ:১৬১)

ছফা মনে করেন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে মৌলবাদ প্রতিরোধ যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ। পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অনুভব করলে মৌলবাদ জন্ম নিতে পারে না।

কিন্তু কার্যত ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা পক্ষবিস্তার করেছে, মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের পরও বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকশিত না হয়ে মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা প্রসারের পিছনে স্বাধীনতা পরবর্তী সকল সরকারের দুর্বলতা, দায় ও পৃষ্ঠপোষকতার ইতিবৃত্ত ছফার বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশে মৌলবাদের বিস্তারে ঘটেছে কেবল রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের অসাধুতা-অযোগ্যতায় নয়, আন্তর্জাতিক পটপরিবর্তনের পরিচর্যায়ও। একদিকে পশ্চিমা দেশগুলোর নীতিগত অবস্থানের কারণে মুসলিম বিশ্বে নিরাপত্তাবোধের অভাব তীব্রতর হওয়ায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িকতার প্রাবল্য ও

মৌলবাদের বিস্তার ঘটছে যার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশেও দেখা যাচ্ছে বলে ছফা উল্লেখ করেছেন 'সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রবন্ধে। ছফা লিখেছেন –

> আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, ইরান, মিশর এই সকল মুসলিম দেশে মৌলবাদের উত্থান বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। বাংলাদেশ মুসলমান প্রধান দেশ হওয়ায় মুসলিম জগতের চলমান ঘটনা থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না। কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়ে। আরো একটি বিষয় অবশ্যই স্পষ্ট করা প্রয়োজন। সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙন, কম্যুনিজমের ভরাডুবি এবং সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় একগুচ্ছ মুসলিম রাষ্ট্রের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো পৃথিবীতে তাদের প্রভুত্বমূলক আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করেছে। পশ্চিমা তাত্ত্বিকরা বলেছেন, আগামীতে পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে যদি অন্যকোন শক্তির সংঘাত বাঁধে তাহলে প্রথম সংঘাতটি বাঁধবে ইসলামের সঙ্গে এবং দ্বিতীয় সংঘাতটি হতে পারে কনফুসিয়াসপন্থী চীনের সঙ্গে। পশ্চিমা শক্তিগুলো ইসলাম ধর্মের প্রতিরোধ ক্ষমতা খর্ব করার জন্য দুনিয়াজোড়া নানা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মুসলিম দেশগুলোতে এক ধরনের ধর্মীয় পুনরুত্থান জেগে উঠছে, বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। এই সামাজিক রূপান্তরটা এত চুপিসারে ও নীরবে ঘটছে যে, কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে তার প্রভাব অস্বীকার করা অসম্ভব নয়। (ছফা, ২০০৮চ:১৭৬)

বাংলাদেশের রাজনীতির বিমানবিকীকরণই মৌলবাদ সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া সকল রাজনৈতিক দল মিলে রাজনীতিকে চরম-দক্ষিণপন্থী অক্ষে ঠেলে দিয়েছে বলেও ছফার অভিযোগ। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে অসাংবিধানিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন হয় এবং সামরিক শাসনের ছত্রছায়ার মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধানের মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাদ দিয়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোর একটি সাম্প্রদায়িক রূপ দেখা দেয়। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে জাতীয় জীবনে অন্যান্য ধর্মের মানুষকে অস্বীকার করা হয়। এ ঘটনায় মুক্তিযুদ্ধে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু ও অপরাপর ধর্মগোষ্ঠী নিক্ষিপ্ত হয় চরম হতাশায়। স্বাধীনতা তাদেরকে যে আশায় উজ্জীবিত করেছিল পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন তাদেরকে সেখান থেকে বিপুল হতাশায় নিক্ষেপ করে। রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণায় তাঁরা মানসিকভাবে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করতে সামরিক সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলে ছফা বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার দুরভিসন্ধির সমালোচনা করেন। তাঁর বিশ্লেষণ ও জিজ্ঞাসায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়–

> মৌলবাদীরা বাংলাদেশের জন্মের বিরোধিতা করেছে, মুক্তিযুদ্ধে দখলদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছে। মৌলবাদীরা সর্বোতোপায়ে চেষ্টা করেছে আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম পরাজিত হোক। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়েও তারা কলঙ্কজনক ভূমিকার জন্য দুঃখ বা অনুতাপ প্রকাশ করেনি। এখনো প্রকাশ্যে বলতে কসুর করে না, তারা পাকিস্তানের সপক্ষে যুদ্ধ করে কোন অন্যায় করেনি। পাকিস্তান ভেঙে গেলেও পাকিস্তানের আদর্শে একটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টি করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। সরকারের কাছে মৌলবাদীদের ভীতিটাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। আর লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, কত মা সন্তান বিসর্জন দিলেন, স্ত্রী, স্বামী, পিতা-পুত্র, সেকথাটি একবারও মনে এল না এটাই সবটাইতে আশ্চর্যের। মৌলবাদীরা প্রবল হয়ে উঠেছে, সেজন্য দেশের সরকার মুক্তিযুদ্ধটি পাশ কাটিয়ে মৌলবাদী অবস্থান গ্রহণ করলেন। বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা টিকিয়ে রাখবে, নাকি মৌলবাদের প্রেরণা? (ছফা, ২০০৮জ:১১৭)

এক্ষেত্রে ছফা ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ দিয়েছেন, যেখানে সাংবিধানিকভাবে পাঁচটি ধর্মকে জাতীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

আহমদ ছফা বাংলাদেশের মুসলমানের আচরিত বিশ্বাসের মধ্যে থেকেই একটি উন্নত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আশা করেছিলেন। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরকে রাজনীতি সচেতন করে পরিবর্তনের ধারায় যুক্ত করা, মাদ্রাসায় কৃৎকৌশল ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগকেও তিনি এই বিপ্লবের পথে যাত্রা বলেস মনে করেছিলেন [১০৬]। মুসলমান সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও জড়তাকে সমাজের ভেতর থেকেই পরিবর্তনের সূত্রে বাঁধার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এজন্য বাহিরের চাপ বা বলপ্রয়োগের চেয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষার কার্যকারিতা

সবচেয়ে বেশি বলে মনে করেন ছফা। অন্ধ সংস্কার তা হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মের মধ্যে হলেও নির্মূল করার পক্ষে তিনি। তা না হলে প্রতিটি ধর্মের মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারবে না এবং অসাম্প্রদায়িক, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজগঠন করাও সম্ভব হবে না। কারণ যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব মানুষে মানুষে ভেদাভেদ-হিংসা-বিদ্বেষ দূর করতে পারে তার মূল কথাই হল, কেবল মানুষ হিসেবে মানুষের স্বীকৃতি। মানবতার মাহাত্ম্যই এই সাংস্কৃতিক জাগরণের মন্ত্র।

১৯৭১ সালের প্রকাশিত 'সিকি শতাব্দীরও কম সময়ে' প্রবন্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালির অংশগ্রহণের পেছনে ক্রিয়াশীল চেতনা ও ঐতিহাসিক পটভূমির বর্ণনা পাওয়া যায়। আহমদ ছফা ধর্মের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ গঠনে বাঙালির স্বপ্নকে, পাকিস্তান সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে, ইতিবাচক অর্থেই চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে বিভাগপূর্বকালে 'ধর্মই ছিল বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক চালিকাশক্তি' যা 'ধর্মের নামে অপরিশোধিত আবেগ' (ছফা, ২০০৮গ:১৫২) হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে ধাবিত হয়।[১০৭] এর ব্যর্থতাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন বাঙালির ওপর পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর ক্রমাগত শোষণের পরিণতি হিসেবে– জাতিগত বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে সোহরাওয়ার্দীর যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থাকে তিনি বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনের পথে প্রথম জোরালো পদক্ষেপ মনে করেন–

> বাংলার জনগণের এই ধর্মনিরপেক্ষ জোরাল মনোভাবের কারণেই জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পৃথক নির্বাচন প্রথা রদ করে যুক্ত-নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে পেরেছিলেন। যুক্তনির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা পাকিস্তানের দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। পাকিস্তান আধা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, কিন্তু যুক্তনির্বাচন ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অনুসৃত পদ্ধতি। রেলগাড়ির লাইনের উপর যেমন গরুর গাড়ি চলতে পারে না, তেমনি আধা ধর্মভিত্তিক একটি দেশেও যুক্তনির্বাচন ব্যবস্থা চলতে থাকলে ধর্মীয় বন্ধনের আলগা পেশিগুলো আরো আলগা করে দিত। কেউ অনুধাবন করেননি, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রবর্তিত এ ব্যবস্থা পাকিস্তানের ভিত্তিমূলে বিরাট একটি নীরব আঘাত। (ছফা, ২০০৮গ:১৫৭)

যেহেতু বাঙালির সংগ্রাম অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য, গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রত্যয়ে আস্থাশীল ছফা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই উচ্চারণ করেন– 'গণতন্ত্র এবং ধর্ম পরস্পরবিরোধী প্রতিজ্ঞা, কখনো একসঙ্গে চলতে পারে না' (ছফা, ২০০৮গ:১৫১)।

৪.২.১৫

সংস্কৃতির সাথে ভাষার সম্পর্ক আত্মিক। কারণ ভাষার মধ্য দিয়েই একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, আচরিত বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দৈনন্দিন আবেগ-অনুভূতি, প্রাত্যহিক সংরাগ-সংক্ষোভ, সর্বোপরি তার সকল সৃজনশক্তি ও লৌকিক-অলৌকিক জীবনদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ভাষাই সেই জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির সবচেয়ে দীপ্যমান চিহ্নায়ক। ভাষা জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচারে আধুনিক রাষ্ট্র বলতেও ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রকেই বোঝায়; যদিও ভাষাই সেক্ষেত্রে একমাত্র উপাদান নয়। সুতরাং ভাষার শরীরে সংস্কৃতির ঐশ্বর্য কোনো-না-কোনোভাবে রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের প্রতিফলন– এই সত্যটি বাঙালি জাতি তাঁর হাজার বছরের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পদে পদে উপলব্ধি করেছে। এই ভূ-খণ্ডের নির্যাতিত কৌম-জনগোষ্ঠীর প্রাকৃত ভাষার ওপর আর্যরা তাদের ভাষিক আগ্রাসন চালিয়েছে শতশত বৎসর ধরে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যাঁতাকলে পড়ে ম্লেচ্ছদের ভাষা কোনো তন্ত্র-মন্ত্রে প্রবেশাধিকার পায়নি– না রাজতন্ত্র, না পুরোহিততন্ত্র। আবার সেই একই নির্যাতিত জনগোষ্ঠী রাজশক্তির পরিবর্তনে কখনও আরবি-ফারসি আবার কখনও ইংরেজি ভাষাকে স্বাগত জানিয়েছে বা জানাতে বাধ্য হয়েছে। সমষ্টির সচেতন প্রয়াস ভাষার গায়ে ধারণ করেছে সমস্ত চিহ্ন– কখনও রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায়, কখনও মনের স্বতঃস্ফূর্ততায়, কখনও ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিচালনে, কখনও নেহাত জাগতিক প্রয়োজনের তাগিদে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাংলার মধ্যযুগের সামন্তসমাজে ব্যতিক্রম

উদাহরণ হিসেবে 'বাণিজ্যে বসতেঃ লক্ষ্মী'র সমাদর ছিল। বাঙালির ভাষাচর্চায় সেই প্রভাবও অনেকটা নিভৃতেই পড়েছে। এসবের উদাহরণ দিয়ে আহমদ ছফা একটি উপপত্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন– বাঙালির জাতিগঠনের ইতিহাসে সবেচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাববিস্তারী উপাদানের নাম বাংলা ভাষা।

ভাষা একটি সামাজিক শক্তি। ভাষার গায়ে রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের চিহ্ন পড়ে, সংস্কৃতির পালাবদল তথা রূপ-রূপান্তরও অঙ্কিত হয়। যেহেতু অবধারিতভাবে এসকল পরিবর্তন বা বিবর্তনের সাথে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটও জড়িত থাকে, সে কারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপন-প্রণালীতে ভাষার বহুমুখী প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। আহমদ ছফা জাতির জীবনে ভাষার গুরুত্ব বোঝাতে লিখেছেন–

> ভাষা একটি জাতির নানামুখী অভিজ্ঞতার ফলিত প্রকাশ। যে জাতির অভিজ্ঞতা যত সীমিত তার ভাষাও তত দুর্বল। আর যে জাতির মানস এবং বস্তুগত অভিজ্ঞতা যত সমৃদ্ধ তার ভাষাও তত বেগবান এবং শব্দ সম্ভারে ধনবান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটা জাতির জাগতিক উন্নতি অবনতির সঙ্গে ভাষার একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে ভাষাকে একটা জাতির রক্তবাহী ধমনী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। (ছফা, ২০০৮খ:১৮৮)

তাই ছফা তাঁর প্রিয় বাঙালি মুসলমানের শিকড় সন্ধান করেছেন ভাষার ধমনী বেয়ে। বাঙালি মুসলমান এই শক্তি প্রথম উপলব্ধ করতে চেয়েছিল পুথি রচনার মাধ্যমে। তার প্রথম আত্মপরিচয় অন্বেষণের সূচনা পুথিসাহিত্য। 'বাঙালি মুসলমানের মন' প্রবন্ধে ছফা এই সূচনার ভিত্তি সম্পর্কে জানিয়েছেন–

> বাঙালি সমাজের যে শ্রেণীটি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করার দরুন, তাদের মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটেছিল, সেই শ্রেণীটিতেই ছিল পুঁথিসাহিত্যের আদর সীমাবদ্ধ। তাঁরাই এর লেখক, পাঠক এবং সমঝদার। (ছফা, ২০০৮ক:৯৫)

বাঙালি মুসলমানের অবগুণ্ঠিত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার হৃৎস্পন্দন প্রথম অনুভব করেছিল পুথি লেখকরাই। কিন্তু 'নতুন শিল্পাদর্শের চেহারা, জীবনের মূল্যচেতনা, অতীত ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জন সম্বন্ধে তাদের মনে কোন পরিচ্ছন্ন ধারণা না থাকায় তারা হিন্দুদের সৃষ্ট সাহিত্যই অন্ধ অনুকরণ করেছেন' (ছফা, ২০০৮ক:৯৬)। নতুন সামাজিক চাহিদার জবাব দিতে গিয়ে তারা যেসব অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি করেছেন তার কারণও একই।
ভাষার গায়ে এই নবগঠিত সামাজিক আকাঙ্ক্ষার চিহ্নই বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের বিপুল মিশ্রণ। এই চাহিদায় সাড়া দিতে গিয়ে মুসলমান সাহিত্যিকদের যে মানসিক সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল ছফা তার সংক্ষিপ্ত ছক এঁকেছেন–

> আসলে তা ছিল বেহেশতের ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। যখন দেখা গেল আরবি হরফে বাংলা লিখেও সমাজে চালু করা যায় না তখন পুঁথিলেখকরা সবান্ধবে পরবর্তী পন্থাটা অনুসরণ করতে থাকলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার আরবি-ফার্সি শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। জনগণ তাঁদের এই ভাষাটিকে গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু কোন্ জনগণ? এঁরা ছিলেন সেই জনগণ সংস্কৃত ভাষা যাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবি অজানা, ফার্সির নাম শুনেছেন এবং উর্দুভাষা কানে শুনেছেন মাত্র। (ছফা, ২০০৮ক:১০০)

পুথি রচয়িতাদের এই লড়াই রাজনৈতিক আলোড়ন থেকে শক্তি সঞ্চয় করে একই সাথে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতকে বিপুলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রয়াস হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে, কোনো পরিণতির পথে ধাবিত হয়নি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে সমাজবিকাশের গর্ভে। ছফা সেই চেষ্টাই করেছেন ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে' প্রবন্ধে। বর্ণিত সময়ে বাংলা ভাষায় নানাবিষয়ে বইপুস্তকের স্বল্পতা বা সর্বক্ষেত্রে বাংলা চর্চার সীমাবদ্ধতার কারণ, ছফার মতে, ভাষার মর্মবেগের সাথে সামাজিক চাহিদা ও বিকাশের দূরত্ব। কোনো জ্ঞান বা বিদ্যা অনিবার্য সামাজিক চাহিদার পর্যায়ে না এলে সমাজে তার চল হয় না। ইংরেজ আমলে ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতি টিকিয়ে রাখতে 'বৃটিশ মনোভাবাপন্ন' মানুষ সৃষ্টির জন্য ইংরেজি-শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন ছিল, বাংলা ভাষায় শিক্ষার্জন

গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বাংলা ভাষা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও মূল্যচিন্তা নিয়ে বিকশিত হয়েছিল। কারণ সেই একই শ্রেণি তার বিকাশের স্বার্থে ও সামাজিক প্রয়োজনে পরিবর্তন সূচিত করেছিল। কিন্তু সেটাও সীমিত হতে বাধ্য, কারণ, ছফা লিখেছেন –

> যে শ্রেণিটির হাতে ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করে তাঁরা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাদের শাসন কায়েম রাখার জন্য যতদূর জাতীয় ভাষাসমূহের বিকাশ সাধন প্রয়োজন তার বাইরে একচুল অগ্রসরও হতে পারেন না। জনগণের চাহিদা যতই তীক্ষ্ণ হোক না কেন। (ছফা, ২০০৮খ:১৮৯)

কিন্তু মধ্যযুগে আরবি-ফারসির ছিল জাগতিক-আধ্যাত্মিক দুই দিকের উপযোগিতা। তবে তা দুই শ্রেণির মানুষের কাছে। একটি সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণি তা হিন্দু বা মুসলিম যা-ই হোক যারা ক্ষমতাকেন্দ্র অটুট রাখার স্বার্থে আরবি-ফারসির চর্চা করতো, অপরটি কৃষক-তাঁতি-জেলের মতো প্রান্তিক পেশাজীবী সাধারণ মুসলমান অর্থাৎ তথাকথিত নিম্নশ্রেণি যারা মূলত বাংলা ভাষী কেবল ধর্মীয় ভাষা হিসেবে সীমিতক্ষেত্রে আরবি বা ফারসির সাথে পরিচিত ছিল। তাই একটি পশ্চাৎপদ, নির্যাতিত শ্রেণির মাধ্যমে ভাষা সামাজিকভাবে প্রচলিত হলেও যে শিক্ষিত শ্রেণির সক্রিয়তায় ভাষার গায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিকাশচিত্র উৎকীর্ণ হয় তাদের আনুকূল্য এই আরবি-ফারসি-মিশ্রিত বাংলা সেই সময় পায়নি। মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমানের এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশটির কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক সক্ষমতা ছিল না, আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা বাংলা গদ্যের লিখিত রূপ দেয়ার উদ্যোগকালে অগ্রসর হিন্দু সমাজের মানসিকতায় প্রতিফলিত হয়েছিল সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার চিত্র, অগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজ তখনও ইংরেজি শিক্ষা এমনকি বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রেও পশ্চাৎপদ। রেভারেন্ড জেমস লঙ-কে উদ্ধৃত করে অমলেন্দু দে-র বর্ণনা থেকে জানা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পরিস্থিতি–

> খুব সঙ্গত কারণেই মুসলমানেরা আরবি ও ফারসি ভাষার জন্য গর্ব অনুভব করেন। এই দুটো ভাষা মুসলিম ধর্মের ও শাসনের বাণীবাহক এবং তাঁদের মহান ঐতিহ্যের ধারক ছিল। এই বিষয়ে তাঁদের অনুভূতি তখনও খুব প্রখর ছিল। তাঁরা একথাও মনে রাখেন, মুসলমানেরাই তো ফারসিকে দেশ শাসনের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা করেন। তাই বাংলাদেশে যখন বাংলা ভাষা বাঙালির জাতীয় ভাষারূপে বিকশিত হয় এবং ফারসিকে স্থানচ্যুত করতে থাকে, তখন শিক্ষিত মুসলমানেরা তা সহজে মেনে নিতে পারেননি। যেহেতু সকল জাতিই মায়ের ভাষা অনুসরণ করে, সেজন্য তাঁদের পক্ষে বাংলা ভাষার অগ্রগতি রোধ করা অসম্ভব ছিল। তাই এই সময়ে শিক্ষিত মুসলমানেরা আরবি-ফারসি শব্দ মিশিয়ে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক বাংলা ভাষা গঠনে উদ্যোগী হন। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি নির্ভর এই ভাষা ও সাহিত্য তাঁদের পৃথক সত্তা বজায় রাখতে সহায়ক হবে, এই ছিল তাঁদের আশা। একেই 'মুসলমানী বাংলা' বলা হয়। (অমলেন্দু, ২০১৪:৯০-৯১)

অন্যদিকে নিম্নশ্রেণির সাধারণ মুসলমানের জন্য 'মুসলমানী বাংলা'য় রচিত সাহিত্য এই শ্রেণিকে দ্রুত সাম্প্রদায়িকভাবে সচেতন করে তুলছে এটিও জেমস লঙ লক্ষ্য করেন; সুকুমার সেনও একই কথাই লিখেছেন–

> 'ইসলামি' বাঙ্গালায় লেখা বইগুলি অধিকাংশই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়, শিক্ষিত মুসলমান পাঠকের জন্যও নয়। বিমিশ্র শ্রমিক ও কৃষকের অবসরবিনোদনের জন্য রচিত হইত। তবুও কোন কোন রচনা তুচ্ছ করিবার নয়। (সুকুমার, ১৯৭৫:৫৪৯)

কিন্তু সুকুমার সেন যাকে 'ইসলামি বাঙ্গালা' বলেছেন তার রূপটি কেমন তা জানা প্রয়োজন–

> সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা অনেকে হিন্দুস্থানীকে দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহার করিতেন। এই কারণে মুসলমান লেখকদের রচনার ভাষা সাধারণ সাধুভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তবুও তাঁহাদের ভাষাকে ইসলামি বাঙ্গালা বলিতে পারি না। ইংরেজ আমলে শুরু হইতে কলিকাতার মজদুর মুসলমানদের ব্যবহার্য গ্রন্থে যখন আরবি-ফারসির সঙ্গে বাঙ্গালার ও হিন্দীর মিশ্রণ খুব ঘন হইয়াছিল তখনকার সেই গ্রন্থ ভাষাই যথার্থ 'এছলামি বাঙ্গালা'। (সুকুমার, ১৯৭৫:৫৪৯)

সুকুমার সেনের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কথিত সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের 'মুসলমানী বাংলা' এবং নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের 'এছলামি বাঙ্গালা' ভাষায় আরবি-ফারসি বা হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণ লক্ষণীয়ভাবে পৃথক ছিল।

'এছলামি বাঙ্গালা' রূপটি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বা সমাজের নেতৃশ্রেণির মুসলমানদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিল না, আদরণীয় ছিল পুথি-সাহিত্যের সমঝদার নিম্নবিত্ত সাধারণ মুসলমান তথা সমাজের প্রান্তিক পেশাজীবী শ্রেণির নিকট। যদি পুথি সাহিত্যের রচয়িতাগণ বেহশতের ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের আধ্যাত্মিক সুখ উদযাপনের জন্য বাংলা ভাষার গায়ে খুব ঘন করে আরবি-ফারসি-উর্দু খোদাই করে থাকেন, তাহলে এর শ্রোতাদের লক্ষ্যও যে কাব্যরস আহরণ ছিল না সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ইংরেজ আমলের গোড়ায়, এই সমাজের সদস্যদের আরবি বা ফারসির মতো বিদেশি ভাষা পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করে সেটিকে আধুনিক চৈতন্যস্রোতে প্রবাহিত করার জন্য 'না ছিল শক্ত আর্থিক ভিত্তি না ছিল সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ' (ছফা, ২০০৮ক:১০০)। রাজানুকূল্যের তো কোনো কারণই নেই। একটি ভাষার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে তা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না একথা যেমন সত্য তেমনি একথাও অনস্বীকার্য যে–

> ভাষা হল সামাজিক মানুষের জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ রূপ। সেই সমাজের সমষ্টিগত জীবন যখন সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করবে, ভাষা আপনা আপনিই সমৃদ্ধির পথে ধাবিত হবে। সামাজিক জীবনে উন্নতির চেষ্টা না করে শুধুমাত্র ভাষাকে মাজা-ঘষা করে উন্নত করার প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত খাবার এবং ব্যায়ামের বদলে রুজ-পাউডার ইত্যাদি মেখে শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধির অপচেষ্টার মত অর্থহীন। (ছফা, ২০০৮খ:১৯৮)

আমরা জানি, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও কলকাতা ও হুগলি মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা চালুর উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল মূলত পূর্ব বাংলার মুসলমান ছাত্রদের বিরোধিতায়, যেখানে তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওয়াহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী চিন্তাভাবনা সাধারণ মুসলমান সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতির ও বিকাশের পথে পাহাড়সমান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু স্বঘোষিত নেতৃত্বে থাকা উর্দু-ফারসিভাষী অবাঙালি মুসলমান এবং ক্ষেত্রবিশেষে সুযোগসন্ধানী বিত্তবান বাঙালি মুসলমাদের গোষ্ঠীস্বার্থে আঘাত হানতে পারেনি। আহমদ শরীফ রচিত 'আঠারো উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে দু-একটি ধারণার পুনর্বিবেচনা' প্রবন্ধে এই দুই শ্রেণির মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জানানো হয়েছে–

> স্বজাতির রাজত্ব হারানোর ক্ষোভজাত কিংবা ওয়াহাবী ফরায়েজী আন্দোলন প্রসূত ইংরেজ বিদ্বেষ তেমন কেজো ছিল না প্রতীচ্য বিদ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে। এসব আলোচনাকালে আমরা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অংশ বিহার-ওড়িশার মুসলিমদের অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনা করি না। আর এ-ও মনে রাখি না যে, বাঙলাদেশে মুসলিমরা সামাজিক-আর্থিক-নৈতিক-শৈক্ষিক প্রভৃতি সর্ব ব্যাপারে দুই পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তায় বাস করত। একদল ছিল বিদেশি উর্দুভাষী ধনী-মানী ফরাসি-আরবি শিক্ষিত অভিজাত মুসলিম, গাঁয়ে এসব পরিবার ছিল দুর্লভ, তুর্কি-মুঘল আমলের প্রশাসনকেন্দ্রে ও বন্দর এলাকায় ছিল (এবং এখনো আছে) এদের নিবাস। এরা সংখ্যায় নগণ্য বটে, কিন্তু ধন-মান-বিদ্যাবলে বাঙালির স্বঘোষিত ও ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃত নেতারা ছিলেন এদেরই গোষ্ঠীভুক্ত। কৃত্রিম কাঞ্চন কৌলিন্যে দেশজ কিছু মুনশী-মোল্লা-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-খোন্দকার-উকিল-হাকিম পরিবার অভিজাতরূপে স্বীকৃত ছিল, তবে উর্দুভাষীর কাছে হীনমন্যতায় ভুগত ও পাত্তা পেত না বলে এরা কখনো নেতৃত্ব দাবি করেন নি। এর অভিজাতবর্গের মধ্যে শিক্ষা ঐতিহ্য ছিল। ব্রিটিশ আমলে এরাই গোড়া থেকে ইংরেজি পড়া শুরু করে। (শরীফ, ২০০১:১৬৭)

শেষোক্ত শ্রেণিতে মীর মশাররফ হোসেন(১৮৪৭-১৯১২), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯–১৯৩৩), মোজাম্মেল হক (১৯৬০-১৯৩৩), আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) প্রমুখ নাম আমাদের কাছে সুপরিচিত। মুসলমান সমাজের অন্যদিকে ছিল–

> গোটা বাঙলাদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে সে-সব আতরাফ-আজলাফ নামে অবজ্ঞাত নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবিত্তের এবং নিঃস্ব মুসলিম ছিল, তারাই ছিল সমাজে শতকরা নব্বই জন। যদিও সব গাঁয়েই দু-একজন স্বাক্ষর লোক মিলত, তবু সাধারণভাবে বলা যায় তাদের মধ্যে লেখাপড়ার কোনো ঐতিহ্য ছিল না। যেমন ছিল না তাদের জ্ঞাতি তাঁতি-হাড়ি-ডোমা-বাগদি-কেওট-চাঁড়াল-কামার-কুমোর-বারুই-তেলী প্রভৃতির মধ্যেও। শিক্ষার ঐতিহ্য থাকলে এরা ইংরেজি ও ইংরেজ-বিদ্বেষবশে ইংরেজি বিদ্যা গ্রহণ না করলেও বাঙলা, ফারসি বা আরবি তো শিখত। কিন্তু এদের মধ্যে– এদের জীবনে কোনো প্রকার সাক্ষর শিক্ষার আভাসমাত্র মেলে নি। আজো যে পরিবার নিরক্ষর– তা স্মরণাতীত কাল থেকেই ছিল নিরক্ষর। (শরীফ, ২০০১:১৬৭)

সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী, সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী বা নওয়াব আব্দুল লতিফের মতো বাঙালি-অবাঙালি মুসলিম নেতৃশ্রেণির কাছে শতকরা নব্বইভাগ প্রান্তিক মুসলমান কেবল তাঁদের অভিজাততন্ত্র অক্ষুণ্ন রাখার উপকরণ এবং সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ ছড়ানোর উর্বর ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই ১৮১৭ সালে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে ইংরেজি-বাংলা পাঠ্যবই রচনার কাজে সংস্কৃত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রাধাকান্ত দেবের সাথে মৌলবি করম হোসেন, মৌলবি আব্দুল ওয়াহেদ এবং মৌলবি মহম্মদ আমিনুল্লাহ নামে তিনজন মুসলিম যুক্ত থাকায় অথবা স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানের ব্রিটিশ সরকারের নানা আনুকূল্য পাওয়ায় কথিত সেই আজলাফ-আতরাফ মুসলমানের জীবনযাত্রায় কোনো হেরফের হয়নি। মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমের বিখ্যাত পংক্তি 'যেসব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সেসব কাহার জন্ম নির্ণএ ন জানি'র শব্দে শব্দে বাংলা ভাষার প্রতি কবির প্রগাঢ় ভালবাসাই শুধু প্রকাশিত হয়নি, এ ভাষার অবজ্ঞাকারীদের প্রতি অন্তর্নিহিত ক্ষোভ ও মর্মবেদনার কথাও ধরা পড়েছে। যেমন অজানা আশংকার কথা পাই সপ্তদশ শতাব্দীর কবি শেখ মুত্তালিবের কাব্য 'কিফয়িতুল মুসল্লীন' কাব্যের নিচের উদাহরণে–

> আরবিতে সকলে না বুঝে ভালমন্দ।
> তেকারণে দেশিভাষে রচিনু প্রবন্ধ ॥
> মুসলমানী শাস্ত্রকথা বাঙালা করিলু।
> এই পাপ হইল মোর নিশ্চয় জানিলু ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে উল্লেখিত পরিস্থিতির নাটকীয় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ছফা-বর্ণিত সেই জনগণের মানসজগতে কোনো বিপ্লবও সাধিত হয়নি, 'সংস্কৃত ভাষা যাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবি অজানা, ফার্সির নাম শুনেছেন এবং উর্দূভাষা কানে শুনেছেন মাত্র।' এভাবে আরও অনেক তথ্যসংশ্লেষ থেকে বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত, তথাকথিত অভিজাত ও অগ্রসর মুসলমান সমাজের চরম ঔদাসীন্যের দীর্ঘ পরিচয় দেয়া যায়। মোট কথা, বাংলা ভাষার একটি আধুনিক লেখ্যরূপ বিনির্মাণে 'এছলামী বাংলা'র প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভেদচিন্তার পরিবর্তে শ্রেণিগত অনগ্রসরতা ও সক্ষমতার অভাবই প্রধান বিবেচ্য বলে আমরা মনে করি। ছফা অবশ্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একথার যাথার্থ স্বীকার করেছেন। ইউরোপে রেনেসাঁর পর থেকে রিফরমেশন-এর সময় পর্যন্ত ধর্মের মানববাদী ব্যাখ্যা তুলে ধরার উদাহরণ দিয়ে ছফা দেখিয়েছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের ধর্ম ও সমাজচিন্তার মধ্যেও ইসলাম ধর্মের এমন মানববাদী ব্যাখ্যার উদ্ভব প্রয়োজন ছিল। কারণ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রাগসর কিন্তু ভাবগত দিক দিয়ে চূড়ান্ত পশ্চাদমুখী ওয়াহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলনের প্রভাবে মুসলমান সমাজের অন্ধকার ও বিচ্ছিন্নতা আরো ঘনীভূত হয়। ছফা লিখেছেন–

> মুসলমানদের মধ্যে যে সকল লেখক বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখালেখি করছিলেন, একদিকে ব্রিটিশ এবং অন্যদিকে নবজাগ্রত হিন্দু সমাজ, এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে তাঁরা রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে অতীত মুসলিম গৌরব রোমন্থন করছিলেন। মোল্লা এবং পিরেরা মুসলিম সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন। শরিয়ত পুঙ্খানুরূপে পালন করা হল কি না, সেটাই ছিল মুসলিম সমাজের ধ্যানজ্ঞান। (ছফা, ২০১১:১০৮)

এ অবস্থায় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো অথবা নিদেনপক্ষে উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদের মতো একজন ধর্ম ও সমাজসংস্কারকের অভাব অনুভব করেছিলেন ছফা। সেটি সম্ভব হয়নি সামাজিক কারণেই। পরবর্তীকালে বাঙালি অভিজাত মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে একজন সৈয়দ আমির আলীর আবির্ভাব ঘটলেও বাংলা ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল না।

একটি গতিশীল আধুনিক সমাজসংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের অজ্ঞতা ও নেতৃত্বহীনতা, মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা এবং চূড়ান্তভাবে 'ফিলিস্তিন' মানসিকতার[১০৮] মধ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফোর্ট উইলিয়াম

কলেজের পণ্ডিতগণ সংস্কৃত-ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানের সহায়তায় বাংলাভাষার লিখিত রূপের জন্য একটি কৃত্রিম ভাষারীতি নির্মাণ করেন। ইতোপূর্বে বর্ণিত প্রেক্ষাপটের সাথে এ বিষয়ে আহমদ ছফার চিন্তাধারা মিলিয়ে দেখলে ইতিহাসের একই পাঠ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভাসিত হয়। 'নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ' প্রবন্ধ থেকে ছফার বক্তব্যের একাংশ উল্লেখ করা যায়–

> আধুনিক ভাষার যে বিকশিত রূপ আমরা ব্যবহার করে থাকি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত অভিধান ঘেঁটে এই ভাষার প্রাথমিক রূপরেখাটি তৈরি করেছিলেন। এই ভাষাটিই নানারূপ পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যদিও পরবর্তীকালে ভাগীরথী-তীরের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার একটা সুন্দর সংশ্লেষ ঘটেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী-তীরবর্তী জনগণের ভাষার সংযোগ-সমন্বয়, মিলন-বিরোধের ইতিহাসই আধুনিক বাংলা ভাষার ইতিহাস। প্রতিভাধর এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্য-সাধকদের চেষ্টা-প্রযত্ন এবং শ্রমের মধ্য দিয়ে এই ভাষাটি ভাব-চিন্তা, অনুভব-বিভব ধারণ করার উপযোগী হয়ে উঠেছিল, তাও প্রতিষ্ঠিত সত্য। তথাপি স্বীকার করতেই হবে, তামাম বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পেছনে একটি মুখ্য এবং অগ্রগণ্য কারণ বর্তমান ছিল; আর সেটি হলো শহর কলকাতার ভাষাটিই মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার কল্যাণে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর চেপে বসতে পেরেছিল। (ছফা, ২০১১:১০১)

উদ্ধৃতিতে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট একটি ভাষারূপ 'চেপে বসা'র তীর্যক ইঙ্গিত আছে তবে ছফার দ্বিমত নেই যে, বাঙালি মনীষীবৃন্দের সৃষ্টিশীলতার গুণে এই ভাষাই ভারতবর্ষের সবচেয়ে আধুনিক ও অপূর্ব প্রকাশক্ষমতা সম্পন্ন ভাষা হিসেবে বিশ্বমানবের স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়েছিল যে 'ইসলামী' বা 'এছলামী' কিংবা 'মুসলমানি' বাংলায় অথবা ভারতচন্দ্রের 'যাবনী মিশাল' ভাষায় সেটি ইতিহাসের পাদপ্রদীপে তথা সমাজের অন্তঃস্রোতে চলে যাওয়ায় এই অবলোপনের কথা ছফা লিখেছেন–

> বাঙলা দেশে মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পরে, ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাতে আরবী-ফার্সী ইত্যাদি শব্দ এসে মিশে যাচ্ছিল এবং ভাষার একটি নতুন চেহারা দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। ভাষাকে নদীর সঙ্গে যদি তুলনা করতে হয়, মেনে নিতে হবে এটা একটা উল্লেখ করার মত বাঁক। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার আরেকটা বাঁক সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা আররি ফারসি শব্দ সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত অভিমুখী একটি ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁদের সে প্রয়াস সবটুকু ফলবতী হয়নি। কিন্তু যে ঝোঁক এবং প্রবণতা তাঁরা ভাষার শরীরের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। যদি পলাশীর বিপর্যয় না ঘটত, আজকের দিনে বাংলা ভাষার অন্যরকম একটি বিকশিত রূপ হয়তো আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। তবে 'যদি' আর 'কিন্তু' নিয়ে তো আর আলোচনা চলে না, যা ঘটেছে তা-ই সত্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ থেকে বাংলা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। (ছফা, ২০১১:১০১)

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর মতো পণ্ডিতগণও পলাশীর যুদ্ধের পরিণতিকে 'যদি' 'কিন্তু'র সাপেক্ষতায় ফেলে 'পুঁথির ভাষাই বাংলা ভাষা হত' বলে 'মুসলমানি বাংলা'র অপার সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করায় সাম্প্রদায়িক আচরণকেই দায়ী করেছিলেন। তবে অশ্রুকুমার সিকদার মনে করেন–

> মুসলমানি পুথির ভাষা বাংলা বইয়ের ভাষা হত না, যাকে ভারতচন্দ্র 'যাবনী মিশাল' ভাষা বলেছেন, সেই ভাষা হয়তো হত। অর্থাৎ বর্তমানে বাংলায় আরবি-ফারসি শব্দ শতকরা যত ভাগ থাকে, তার চেয়ে বেশি থাকত। (অশ্রুকুমার, ২০১৪:২২৮)

যাঁদের এই পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা, আমরা জানি, পলাশীর যুদ্ধের পর কতিপয় ঐতিহাসিক কারণে সেই মুসলমান অভিজাত শ্রেণি ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁরা আপৎকালীন সময়ে কোনো সামাজিক নেতৃত্ব নির্মাণ করার দায়িত্ব নিতে পারেননি দুটি কারণে– প্রথমত সাধারণ মুসলমানের সাথে তাঁদের সামাজিক ও শ্রেণিগত দূরত্ব, দ্বিতীয়ত ভাষাগত ব্যবধান। পলাশীর যুদ্ধের পরিণতি যা-ই হোক অবাঙালি অভিজাত নেতৃশ্রেণির সাথে সাধারণ মুসলমানের দুস্তর ব্যবধান ও ভাষাগত শুচিবায়ু দূর করে অবাঙালি উর্দুভাষীদের বাংলা গদ্যের কাঠামো বিনির্মাণে

নেতৃত্ব দেয়ার মতো কোনো উপায় বা বাস্তবতা সেসময়ে উপস্থিত ছিল না এই সত্যটি অনুধাবন না করলে আধুনিক বাংলা লেখ্য ভাষার প্রস্তুতিপর্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তি কাটানো দুরূহ।

নতুন সৃষ্ট শহর-কলকাতার ভাষাটির ব্যবহার ছিল সীমিত পরিসরে, বিস্তৃত জনজীবনে এই ভাষার তেমন কোনো প্রভাব ছিল না। এর একটি কারণ শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা। বাংলাভাষা প্রেমিকদের অনেকে কট্টর ব্রিটিশপ্রেমিকও ছিলেন। আহমদ ছফা লিখেছেন–

> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের রথী-মহারথীদের পর্যন্ত ব্রিটিশের প্রতি অন্ধ মোহ কখনো দূরীভূত হয়নি। বস্তুত তাঁরা একদিকে বাংলাভাষার মারফত শিক্ষাদানের কথা বলে নিজ দেশের জনগণ এবং সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করতেন, অন্যদিকে তাদের স্থিতি এবং বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনীয়তাও কায়মনোবাক্যে স্বীকার করতেন। এ দুটো ছিল পরস্পরবিরোধী ধারণা। বাঙালি মধ্যবিত্তের হাতে যে আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির নবজন্ম ঘটেছে, তার বিস্তৃতিও ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বলয় ভেদ করে বৃহত্তর জনসাধারণকে স্পর্শ করতে পারেনি। শুধু ভাষা এবং সাহিত্য নয়, শুধু সংস্কৃতি এবং আর্থিক ভিত্তি নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত কোন স্বদেশ হিতৈষণামূলক এবং জনকল্যাণধর্মী কোন কর্মসূচিই সেই শ্রেণীটার গণ্ডী ভেদ করে সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। (ছফা, ২০০৮খ:১৯০,১৯১)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বর্ণ হিন্দুদের নবজাগরণ বা পুনর্জাগরণকালে প্রখ্যাত সমাজসংস্কারকগণ ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য-স্বদেশ সম্পর্কে তাঁদের মতামত প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে নতুন সৃষ্ট ভাষাটি ব্যবহার করেছিলেন। সামাজিক চাহিদার সাথে নতুন ভাষার যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় দ্রুত এর বিকাশ ঘটতে থাকে। 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে' প্রবন্ধে ছফা লিখেছেন–

> যেহেতু বাংলাভাষার মাধ্যমে তাঁরা কতিপয় সামাজিক অনাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন, তাই ভাষাটিকে জনগণের বোধগম্য সরল এবং বক্তব্য প্রধান করে নিতে হয়েছিল, যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, বিচার করে দেখতে পারে এবং তাদে ন্যায়-অন্যায় বোধ জেগে ওঠে। সেদিন তাঁরা এক ঈশ্বরের আরাধনা, সহমরণ প্রথা নিবারণ, বিধবার বিয়ে দেয়া ইত্যাদি সংস্কারমূলক নানাবক্তব্য বাংলাভাষার মাধ্যমে টেনে এনেছিলেন। তার বাইরে যাবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। কেননা তা করলে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা তাঁদের করতে হত। ঐতিহাসিক কারণে তাঁদের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ প্রকারে অসম্ভব। পরবর্তীকালে বাংলাভাষা এবং সংস্কৃতির যেটুকু শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, তাও হয়েছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের বাহন হওয়ার ফলে। (ছফা, ২০০৮খ:১৯৯)

যে ঐতিহাসিক কারণের কথা বলা হয়েছে সেটিও আমাদের অজানা নয়–ব্রিটিশ শাসনকাঠামোর সান্নিধ্যে থাকা সুবিধাভোগী শ্রেণিটির পক্ষে তখন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উন্মেষবিহীন একটি অসংহত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সাথে নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না আবার শ্রেণির স্বার্থ ও সুবিধাজনক নিশ্চিন্ত অবস্থান ত্যাগ করার মতো সংকটও তাদের ছিল না। আরও একটি কারণ ছিল– বাংলাভাষী, বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী, আধুনিক শিক্ষার দুয়ার যাঁরা স্বেচ্ছায় বা আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কখনও মাড়ায়নি, তাঁরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল পুথিসাহিত্যে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ যে ভাষাকে পারস্পরিক সম্পর্কের যোগসূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সেটি জনগোষ্ঠীর ভেতর ফল্গুস্রোতের মতো আরেকটি সমান্তরাল ভাষারীতি তৈরি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন সকলেই আরবি-ফারসি মিশ্রিত একটি স্বতন্ত্র বাংলাভাষারূপের কথা উল্লেখও করেছেন। তারপরও হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজ-সংস্কৃতির নানাবিধ প্রতিক্রিয়াশীলতা, সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা, সক্ষমতা-দুর্বলতা, উৎসাহ-অনীহা, সামাজিক অগ্রসরতা-পশ্চাৎপদতা ইত্যাদি বৈপরীত্য-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে এবং 'যদি' 'কিন্তু' এড়িয়ে যে ইতিহাস লিখিত হল তা অশ্রুকুমার সিকদারের ভাষায় পড়লেও খুব ভিন্ন মনে হয় না–

> ইংরেজ আমলের মুদ্রণের যুগের বাংলাভাষা গড়ে উঠল ফোর্ট উইলিয়মের কলেজের পণ্ডিতদের হাতে। তাঁদের হাতে পড়ে বাংলায় ইতিপূর্বে নিত্য ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ যাবনিক শব্দ বাংলা থেকে নির্বাসিত হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর এমনকি বিংশ শতাব্দীর বাংলা অভিধান সংকলনে এইসব শব্দ খুব কম স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন ঘটল। গড়ে উঠল যেন দুই

রকমের বাংলা। উইলিয়ম কেরি ১৭৯৪ সালে সাটক্লিফ্‌কে একটি পত্রে লিখেছিলেন, দুটো স্বতন্ত্র বাংলাভাষা সারা দেশে কথিত হয় 'The Bengali, spoken by the Brahmins and the higher Hindoos, and the Hindoostani spoken by the Musalmans and lower Hindoos; it is a mixture of Bengali and persian.' উচ্চবর্ণের হিন্দুর ব্যবহৃত বাংলাই হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্যের ভাষা। তাছাড়া এই নতুন কালপর্বে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠল ইংরেজি শিক্ষিতদের হাতে। ইংরেজ তাদের হাত থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে এই কারণে, ধর্মের হানি হতে পারে এই ধারণার বশবর্তী হয়, দারিদ্র্যের কারণে, বাঙালি মুসলমান ইংরেজি-চর্চায় পিছিয়ে থেকেছে। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় যেহেতু গ্রহণ করল হিন্দুরা, আর ইংরেজি-জানাদের হাতেই যেহেতু গড়ে উঠল আধুনিককালের বাংলা সাহিত্য, সেই কারণে মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক এলাকার বর্ণহিন্দুরাই হলেন এই বাংলা সাহিত্যের নির্মাতা। বাংলাভাষার প্রতি মুসলমান সমাজের অনাগ্রহও এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। বাংলার প্রতি মুসলমান সমাজের এই অনাগ্রহের কারণ সবিস্তারে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রফিউদ্দিন আহমেদ তাঁর 'The Benglai Muslims 1871-1906' গ্রন্থে। সেই অনাগ্রহের প্রধান কারণ আশরাফ-আতরাফ বিভাজন। ১৮৭২ সালে জনগণনা অনুসারে মাত্র ১.৫২% ভাগ মুসলমান বহিরাগত আফগান বা মোগল অভিজাত বলে দাবি করেছেন। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় উর্দুভাষী মুসলমানই ছিল মুসলিম সমাজের নেতা। এই আশরাফদের বাংলাভাষা কেন, বাঙালি মুসলমান সম্বন্ধেও ছিল নিঃসংকোচ ঘৃণা। এই আভিজাত্যগর্বীদের একজন প্রশ্ন করেছেন, `How can we learn Bengali? Can Bangla-fangla be the language of the aristocratic Muslims?' তারা বাংলাভাষাকে মুসলমানের উপযোগী ভাষা মনে করত না, বাংলাভাষাকে মনে করত মূর্তিপূজক হিন্দুভাষা। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের মতো একজন বাঙালি গ্রন্থকারও মনে করতেন বাঙালি মুসলমানদের ভাষা বাংলা হওয়ায় বঙ্গীয় মুসলমানদের সর্বনাশ হয়েছে, তারা 'জাতীয়তাবিহীন, নিস্তেজ, দুর্বল ও কাপুরুষ' হয়ে গিয়েছে। বাংলাভাষী মুসলমানগণও একটু বিত্তশালী হয়ে উঠলে এই উর্দুভাষী আশরাফদের অনুকরণ করত। (অশ্রুকুমার, ২০১৪:২২৮-২৯)

এতসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষা-সংস্কারের উদ্যোগে বাঙালি মুসলমান সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ বা সরব প্রতিবাদ কতটুকু সম্ভব তা বিচার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকলে ক্রমশ কলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষাটি গ্রহণ করতে শুরু করে। তবে এই গ্রহণের স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ছফা –

> পাছে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পাঠকেরা উপহাস করতে পারেন, এই হীনম্মন্যতা থেকেই কি মুসলমান লেখকরা আপন সমাজে, পরিবারে, সংসারে সচরাচর ব্যবহৃত আরবি-ফার্সী শব্দসমূহ তাঁদের রচনায় যতটা সম্ভব পরিহার করতেন? (ছফা, ২০১১:১০৪)

তবে এমন সন্দেহের পক্ষে কোনো প্রামাণ্য তথ্য না দিয়ে, তিনি নিজেই উত্তর দিয়েছেন–

> মুসলমান লেখকরা অবশ্য কোলকাতাকেন্দ্রিক ভাষারীতি গ্রহণ করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। দুনিয়ার সব দেশেই ভাষার সর্বাধুনিক বিকশিত রূপটিকেই তাঁদের লেখার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন লেখকরা। মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক নেতা বলে স্বীকৃত লেখক-কবিরা তাই করেছিলেন। (ছফা, ২০১১:১০৪)

পুথি সাহিত্য বা আরবি-ফারসি-উর্দু-মিশ্রিত বাংলাভাষা যদি বাংলারই একটি বিশেষ ফলিত রূপ হয় তাহলে শহর-কলকাতা ও পণ্ডিতদের সংস্কৃতায়নের ফলে সৃষ্ট বাংলা রূপটিকেও আরেকটি ফলিত রূপ বলা যায় (ছফা, ২০১১:১০৪)। বাঙালি মুসলমান শহর-কলকাতার ভাষারূপের সাথে অনেকগুলো ঐতিহাসিক কারণে দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর প্রতিভা বিচ্ছুরণের সূচনাকে বিলম্বিত করেছিল। হয়তো এ কারণেই বাংলা গদ্যের চেয়ে ছন্দোবদ্ধ পদ্যে বাঙালি মুসলমানের স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি। যেহেতু আধুনিক বাংলা চলিত রূপটি শহুরে শিক্ষিত মানুষের চর্চিত ভাষা তাই বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে তথা সারা বাংলায় এর প্রভাব ছিল খুবই সীমিত, যার ফলে লোকসাহিত্যের চর্চায় বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষাই সগৌরবে গৃহিত হচ্ছিল, এখনও হচ্ছে।

৪.২.১৬
ভাষার নামে দেশ, ভাষার নামে জাতি– বাংলাদেশ ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র। জাতীয় রাষ্ট্র এবং ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রকে প্রায় অভিন্ন বলে ধরে নেয়া যায়। তাই জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় রাষ্ট্র এক দৃঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ– ইতিহাসের বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়। আমরা জানি, উপমহাদেশের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তিনটি প্রধান ঘটনা দ্বারা বিভাজিত। তা হল, ইতিহাসের তিন পর্বে আর্য, মুসলিম ও ইংরেজদের শাসন। এই তিন শাসনপর্ব একাধারে উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চাপিয়ে দিয়েছে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন ভাষা, নতুন সংস্কৃতি।

ভাষার প্রসারের পেছনে সব সময় ক্রিয়াশীল থেকেছে অথবা থাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রা। ফলে ভাষার গতিপথ অনুসরণ করে একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ইতিহাস উন্মোচিত হতে পারে। উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষার ওপর ভিনদেশি ভাষার ছাপ বহিরাগতদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনই প্রমাণ করে। ‘পৃথিবীর কোন দেশে কোন ভাষার মানুষ বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত অপরের ভাষা গ্রহণ করেনি– সে ভাষা যত সুন্দর হোক না কেন’(ছফা, ২০০৮খ:২১৬)– না মুসলমানের ভাষা, না দেবতার ভাষা; না আরবি না সংস্কৃত। আর্যদের সংস্কৃতি এবং ভাষা উপমহাদেশের আদিবাসী দ্রাবিড়দের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় আবার মুসলমানরাও সংস্কৃত বা স্থানীয় কোনো ভাষা গ্রহণ না করে একই জনগোষ্ঠীর ওপর পার্সিভাষা চাপিয়ে দেয়। দুটি সংস্কৃতিই পশ্চিম দিক থেকে অস্ত্র হাতে অশ্বারোহে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল উপমহাদেশের সর্বত্র। এই দুই বিদেশাগত ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের সামাজ্যবাদী কাঠামো ও কৌলিন্য ছেড়ে সাধারণের স্তরে নেমে আসতে পারেনি। কারণ বিজিত এবং বিজয়ীদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে চারিত্রিক অসমতা এতটাই প্রবল ছিল যে তা আপোস-অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে এদের এক ধরনের বিরোধ বা ব্যবধান সবসময়ই ছিল। ছফার ভাষায়–

> উক্ত সংস্কৃতি দুটি কখনো তাদের সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো বদলে নতুন গণরূপ লাভ করতে পারেনি। জনগণ সব সময়ে সংস্কৃতভাষার প্রতি ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা এবং আরবি বিশেষ করে পার্সি ভাষার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করেছে। (ছফা, ২০০৮খ:২১৭)

এরপর ব্রিটিশ শাসনের কাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য হল, এ দেশের ধর্মীয় জীবন নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হয়নি। তার ছিল কোনো রকম ‘ঘোরপ্যাঁচ ছাড়া শাসন এবং শোষণ করার উদ্দেশ্য, কোন রকমের ধর্মনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তাকে কখনো পেয়ে বসেনি’ (ছফা, ২০০৮খ:২১৮)। ব্রিটিশরা পূর্বদিক থেকে উপমহাদেশে প্রবেশ করে এবং বাংলায় প্রথম ইংরেজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকাল ধরে কলিকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। তাই বাংলা এবং বাঙালিরা প্রথম ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন ও আধুনিক চিন্তা-চেতনা-মননের সংস্পর্শে আসে। বাংলায় নবযুগের সূচনা হয়। ভাষার গায়েই প্রথম সেই চিহ্ন ফুটে ওঠে। বাংলা ব্যাকরণ রচনা, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যের সূচনা, উপন্যাস তথা সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার মধ্যে বাঙালি আত্মপরিচিতি ফুটিয়ে তোলে। ‘সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলাই একমাত্র ভাষা যা বিদেশাগত তিনটি সংস্কৃতি প্রবাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে নিজস্ব প্রাণ সম্পদে বলীয়ান হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে’ (ছফা, ২০০৮খ:২১৯)। ফলে উপমহাদেশের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা উদ্বোধনের জন্য বিকাশমান, সমৃদ্ধ ও সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও বাংলার ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটতে পারেনি। কারণ বাঙালি মনীষা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার লক্ষণ ও সম্ভাবনা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এ সম্ভাবনা উদিত হলেও তা সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে মিলেমিশে হারিয়ে গিয়েছিল।[১০৭]

কালান্তরে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদও দুই ধারায় বিভক্ত হয়েছিল। ছফার মতে, ভারতের মুসলমানদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি এবং মহাত্মা গান্ধীর রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রায় সমার্থক (ছফা, ২০০৮খ:২১৭)। তাই ছফা মনে করেন, যদি ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে রাজ্য চিহ্নিত করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শে একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা যেত তাহলে হয়তো ভারত বিভাগ ঠেকানো যেত। একথা সর্বজনবিদিত যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল যে শ্রেণি তা ব্রিটিশদেরই সৃষ্ট এবং প্রতিপালিত। ব্রিটিশ নির্দেশিত পথেই তারা অগ্রসর হয়েছিল। ভাষাভিত্তিক যে জাতীয়তা তখন সম্ভব ছিল, অখণ্ড বাংলার ক্ষেত্রে যা ক্ষীণ স্বরে উচ্চারিতও হয়েছিল তা-ই সার্থকতা লাভ করল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধতে শুরু করে– পরিণতি পায় মুক্তিযুদ্ধে। বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলন পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাতীয়তার চেতনা জাগ্রত করে। ছফা কেবল ভারতের আসাম ও অন্ধ্র প্রদেশের উল্লেখ করলেও পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও পখতুন প্রদেশেও একই ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সে সময়। ছফা স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে–

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা হাতে নাতে প্রমাণ করেছে, আদতে ভাষা এবং সংস্কৃতির সংগ্রাম জাতীয়তার সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়। ভাষাগত অধিকারের দাবিতে এর প্রারম্ভিক অভ্যুত্থান ঘটলেও পরিধি অনেকদূর প্রসারিত। অর্থনীতির মধ্যেই নিহিত তার আসল কার্যকারণ সম্পর্ক। ভাষা এবং সংস্কৃতির দাবি অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের পূর্বশর্ত। (ছফা, ২০০৮খ:২২১)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সে-পথ হেঁটেই অর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিক মুক্তিই ছিল তার লক্ষ্য। ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানেই অর্থনৈতিক শোষণের পথ প্রশস্ত করা। আহমদ ছফা এ প্রসঙ্গে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলের উল্লেখ করে তাদের অর্থনৈতিক শোষণমুক্তির আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন, যার ভিত্তি ভাষা ও সংস্কৃতি।

বাঙালি মুসলমানের সামাজিক উন্নতির লক্ষণ মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে উদ্ভূত হওয়ার দৃশ্যমান সফলতা আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর। শ্রেণিগত কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোচিত সময়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করা অসম্ভব ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই তা সম্ভব হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলায় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যশ্রেণির উদ্ভবে, ঐতিহাসিক বাংলা-ভাগের আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়ায়। তবে বিভাগোত্তরকালে অনুকূল পরিবেশে পূর্ব-বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার সাথে লেখ্যভাষার দূরত্ব কমিয়ে এনে সর্বসাধারণের উপযোগী ভিন্নরকম একটি প্রমিত ভাষা নির্মাণের ব্যর্থতার জন্য ছফা সরাসরি বাংলাদেশে বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনুকরণপ্রিয়তা ও উদ্ভাবনীক্ষমতার অভাবকে দায়ী করেছেন। তারা 'বর্তমানের কর্তব্য তামাদির খাতায় রেখে ইসলামের নামে ভাষার মূল কাঠামোটি নষ্ট করা ছাড়া' আর কোনো প্রয়াস গ্রহণ করেননি (ছফা, ২০০৮খ:১৯৪)। এমনকি বাংলাভাষার ওপর সরকারি আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া-প্রতিবাদে কলকাতার সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণকেও ছফা সেই শহর-কলকাতার ভাষাটিকেই 'অসময়ে পুনর্জীবন দান' মনে করেন, যার জন্য দায়ী সেই মধ্যশ্রেণিটি।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রকাশিত 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে' প্রবন্ধে ছফা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে প্রমিত বাংলার স্বকীয় রূপ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং প্রচলিত রূপটি কলকাতাকেন্দ্রিক বলে তা বর্জনীয়।[১১০] এর প্রেক্ষাপট বিবেচ্য। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে লেখক-বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-পেশাজীবীর মধ্যে জাতীয় জাগরণের নানামুখী পরিকল্পনা পল্লবিত হতে থাকে। স্ফিত হতে থাকে হৃদয়নিংড়ানো মমতায় স্বাধীন দেশকে গড়ে তোলার আবেগ। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালুর বিষয়টি নতুন করে প্রাণ পায়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আজন্ম-লালিত আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে তা রাজনীতির পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করে তোলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে সর্বস্তরে ব্যবহারের সংকট ও সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় না রেখেই বাংলা চালু

করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা দেখা দেয় এক শ্রেণির রাজনীতিক-আমলা-সুধিজনের মধ্যে; অবশ্য প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রাপ্তির বদৌলতে। ফলে দেখা দেয় বাড়াবাড়ির বিপত্তি। একশ্রেণির সুবিধাবাদী রাজনীতিক, চাটুকার ও উৎপীড়ক-কর্মী, যাদের কর্মকাণ্ডকে আহমদ ছফা 'স্বাধীনতার অপজাত সংকট' বলে আখ্যা দিয়েছেন, সরকারের মন্ত্রীদের নানা অসৎ পরামর্শ দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল। বাংলাভাষার প্রতি মমতার আতিশয্যে ভাষার সর্বনাশই তারা ডেকে এনেছিলেন। সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, যেমন- অনুশীলনযোগ্য পাঠ্যপুস্তকের অভাব বা কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী বাংলার সীমিত চর্চা, না থাকায় এ পদক্ষেপ কার্যত এমন অসুবিধার সৃষ্টি করে যাকে আহমদ ছফা বলেছেন 'লাঠি মেরে বাংলা চালানো'। এক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারোপযোগিতা এবং জনসাধারণের ভাষিক সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি অপরাজনীতির চাপে উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

বাংলাভাষা জাতীয় ভাষা হিসেবে বিকশিত হতে না পারার অন্যতম কারণ, ছফার মতে, শিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষা, তথা মান বাংলাভাষা এবং সর্বসাধারণের স্তরে মুখের ভাষার পার্থক্য। তাই ছফার এই মন্তব্য শ্লেষাত্মক হলেও উপেক্ষণীয় নয় যে, 'বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষ বর্তমানে যে বাংলা ভাষাটি ব্যবহার করেন, তা তাঁদের মুখের ভাষা নয়। লেখাপড়া শিখে লায়েক হলে এই বাংলাভাষাটি তাঁদের মুখে আপনিই এসে যায়' (ছফা, ২০০৮খ:১৯৪)। জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির সাথে ভাষার উন্নয়ন বা বিকাশ সম্পর্কিত। জাতির অভিজ্ঞতা, সমাজের সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক অভিরুচি ও সৃজনশীলতার সুষম বিকাশের সাথে সাথে গড়ে ওঠে ভাষার শক্তি। ছফার ভাষায়– 'জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে জাতীয় ভাষার বিকাশের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। আবার জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি বলতে জাতির সঙ্গে সম্পর্কশীল নানকিছুরই সুষম বিকাশ বোঝায়' (ছফা, ২০০৮খ:১৮৯)। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ জাতির ভাষা কখনও সমৃদ্ধ হতে পারে না। এসবই ঔপনিবেশিক খণ্ডিত মানসিকতার ফল; ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে এর লালন-পালন। তাই বাংলাভাষার দীনতা ঘুচাতে হলে প্রথমে এই ঔপনিবেশিক মানসিকতার অবসান ঘটিয়ে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে গণমুখী রূপ দিতে হবে বলে মনে করেন ছফা (ছফা, ২০০৮খ:২০২)। সামাজিক দীনতা ঘুচাবার কর্ম পদ্ধতিও এর সাথে সম্পর্কিত। তবে এসব উদ্যোগ ও কর্মসূচি সবই একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। কেবল একটি সমন্বিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিপ্লবই পারে এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। ছফার ভাষায়–

> প্রকৃত গণমুখী শিক্ষা, বাংলাভাষার মাধ্যমে সকল স্তরে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান, সকল সরকারি বেসরকারি কর্মে মাতৃভাষার ব্যবহারের জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন অপরিহার্য। সেই আন্দোলনের লক্ষ্য হবে সকল শোষিত এবং নির্যাতিত মানুষকে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান, অতীতের ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ বাংলাদেশের মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং বিদেশি শোষকদের স্থলে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদী শক্তির সহায়তায় স্বদেশি শোষকরা শাসন করে যাচ্ছেন, সেই শ্রেণীভিত্তিক সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলা এবং শোষিত মানুষদের সাংস্কৃতিক চেতনার মান উন্নত করে তাদের সামনে একটি সমৃদ্ধ সমাজের ছবি তুলে ধরা; যাতে করে এই পচা ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলার জন্য শরীরে মনে পূর্ণ প্রস্তুতি তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন। (ছফা, ২০০৮খ:১৯৫)

মানুষের আকাঙ্ক্ষার কাছাকাছি না গেলে ঔপনিবেশিক বা আধা-সামন্ত সমাজকে যেমন আধুনিকতা-বোধে উদ্দীপ্ত করা যায় না তেমনি পুঁজির সাম্রাজ্যবিস্তারী আগ্রাসনকে প্রতিহত করে নির্যাতিত-পীড়িত শ্রমজীবীকে উন্নত জীবনচেতনায় জাগানোও যায় না। অর্থাৎ সাধারণের আকাঙ্ক্ষার সমীপবর্তী হতে গেলে চাই সাধারণের ভাষায় ভাব বিনিময়। আহমদ ছফার বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি–

> সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতার স্পর্শে যেমন অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে, তেমনি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সৃষ্টিশীলতাও অনেক আপাত কঠিন এবং জটিল জিনিসকে সহজ, উপলব্ধি গোচর করে তোলে, তবে সে আন্দোলনটি হওয়া চাই বহতা নদীর মত। জনগণের চাহিদার সঙ্গে, তাদের সমস্যার সঙ্গে, তার সমাধানের সঙ্গে আন্দোলনের সংযোগ নিবিড় হওয়া চাই।...জনগণের মুখের ভাষার নিকটবর্তী করে বাংলাভাষাকে নতুনভাবে বিন্যাস করার মানেও এই যে

> জ্ঞান সৌন্দর্য এবং বিদ্যার জগৎকে তাঁদের দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসা। যাতে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন, জ্ঞানে তাঁদের অধিকার থাকা উচিত। তাঁদেরও সৌন্দর্যপ্রীতি রয়েছে, তাঁরাও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। কম শ্রমে কম ব্যয়ে তাঁরা যাতে ঐ সকল আয়ত্ত করতে পারেন সে ব্যবস্থা করা। তাঁদের জ্ঞান, বিদ্যা এবং সৌন্দর্য চর্চার পথে হাজার হাজার বছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলে যে কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে সেগুলোকে সমূলে উৎখাত করা। (ছফা, ২০০৮খ:১৯৭)

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের বাংলাদেশের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চাকে ছফা দুটি দলে চিহ্নিত করেছেন– একদলে আছেন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষ, অপরদলে আছেন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দুদলের রুচি ও ধরন আলাদা। প্রথম দলের মুখের ভাষা আদিম যুগের মৌখিক বাংলা, যা এখনও বাংলাদেশের সর্বত্র আঞ্চলিক বিভিন্নতা নিয়ে মানুষের মুখে মুখে চলছে। তবে কলকাতার কথ্যভাষাকে যারা বাংলাদেশে নিয়ে এসেছেন তারা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং এই ভাষাকেও ইসলামের নামে বা আঞ্চলিক ভাষার নামে জবরদস্তি সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণের মুখের ভাষার কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। ইসলামের নামে আরবি, ফারসি শব্দকে অহেতুক প্রাধান্য দিয়ে অথবা ঢাকা-চট্টগ্রাম-বরিশালের আঞ্চলিক ভাষার গালাগালকেও মুখের ভাষার নামে তুলে আনা বা প্রাণচাঞ্চল্যহীন স্থবির ভাষাকে ইট-পাথরের মত ভাষার গায়ে বয়ে বেড়ানো– এ সবই ছফার মতে ঐতিহ্যের নামে ভাষার ওপর অত্যাচার (ছফা, ২০০৮খ:১৯৬)। ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মুখে উচ্চারিত ভাষা স্বমহিমায় আধুনিক রূপ নিয়ে জাতীয় ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে এমন আশার কথা জানিয়ে ছফা লিখেছেন– 'জনগণের মুখের ভাষাকে আধুনিক রূপ দান করার অর্থে বোঝাতে চাই তাতে আধুনিক চৈতন্য স্রোত প্রবাহিত করানো।' এ ভাষা শহর কলকাতার কথ্য বাংলা নয়, আবার 'ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশালের পল্লীঅঞ্চলে ব্যবহৃত গালাগাল দেয়ার ভাষা'ও নয়।

বাংলাদেশে একটি সার্বভৌম ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বাঙালি জাতিগঠনের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় ভাষা গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা আহমদ ছফা প্রকাশ করেছেন। কারণ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে এবং পরবর্তীকালে নব্য-উপনিবেশী শোষণের জাঁতাকলে যে মানুষ খর্ব ও কৃশ হয়ে গেছে তাকে স্বাধীনসত্তার অহমিকায় দাঁড় করাতে প্রয়োজন শক্তিশালী ভাষার; যে ভাষা সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, ধারণ করতে পারে সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার বর্ণালি। ভাষা 'জাতির চিন্ময় সত্তাকে ধারণ করে, জাতীয় জাগরণের প্রথম স্পন্দনও ভাষার শরীরে অনুভূত হয়' (ছফা, ২০০৮খ:১৯৫), তাই ভাষাকেই প্রথম জাগাতে হয় সকল বৈষম্য আর পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে, হাতিয়ার হিসেবে। সমাজ ও সংস্কৃতির মতো ভাষাও বাংলাদেশের সমাজবদলের হাতিয়ার হিসেবে অবদান রাখতে পারে বলে ছফা বিশ্বাস করতেন। তাই ভাষার সক্ষমতা অর্জনকেও ছফা সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামো ঔপনিবেশিক আর্থকাঠামোরই সৃষ্টি এবং ভাষাদেহেও সেই ঔপনিবেশিক নির্ভরতা প্রবহমান। উপনিবেশিতের সংস্কৃতির ওপর উপনিবেশক যে আধিপত্য বিস্তার করে ভাষাই সে চিহ্ন বহন করে থাকে। তাই একযোগে ভাষার সবগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে ঔপনিবেশিকতা তথা দাসত্বের চিহ্নগুলো মুছে ফেলাই স্বাধীন জাতির প্রথম কর্তব্য। এটিও একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সুবর্ণরেখা। যেখান থেকে পুরো সমাজ এবং অর্থনীতির খোল-নলচে বদলে দিয়ে এক নতুন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতির উত্থান ঘটবে।

৪.৩. সাহিত্যভাবনা

সাহিত্যচর্চা করা আহমদ ছফার সাময়িক খেয়ালখুশি, আত্মপ্রকাশ বা প্রতিষ্ঠার মোহ, জীবিকা কোনোটা থেকেই উদ্ভূত বা তাড়িত নয়। তাঁর সাহিত্যভাবনা মানুষ ও সমাজের কল্যাণের জন্য এবং অবশ্যই রাজনীতি প্রভাবিত–সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস।[111] সাহিত্য তাঁর কাছে সমাজে 'উঠে আসা'র মধ্য থেকেই প্রাপ্ত সমাজবদলের হাতিয়ার এবং 'একটা ব্রত'(ছফা, ২০০৮গ:৩১৫)। তাঁর হয়ে ওঠার ব্যাপ্তি ইতিহাস-ঐতিহ্য-সময় সমবায়ে এক পূর্ণাঙ্গ জীবনচর্যা। এমনকি গ্যেটের *ফাউস্ট* অনুবাদ করার পেছনেও জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের বাসনা তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল (ফরহাদ, ২০১০:৩০৮)। আত্মপরিচয়ের শিকড় সন্ধান করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের গভীর, ঐতিহ্যের বর্ণময়তা এবং সময়ের প্রবহমানতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নিজকে 'মেইন স্ট্রিমের' লেখক বলেছেন তিনি (ছফা, ২০০৮ঙ:৪৩৯-৪০)। এই 'মেইন স্ট্রিম' বলতে তিনি আবহমান বাংলার নির্যাতিত কৃষকসমাজকেই যে বোঝাতেন, একাধিক লেখা ও কথোপকথনে সে বিষয়টি উঠে এসেছে।[112] লালন-কবীরের গানকেও একই কারণে বাঙালির চিন্তার প্রধান ধারার অন্তর্ভুক্ত বলে ছফা মনে করেন।[113] শুধু তাই নয়, অনুসন্ধানের আরও গভীরে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে, সমাজে পতিত ও অচ্ছুৎ বলে নিগৃহীত তথাকথিত তপসিলী সম্প্রদায়ও 'সাক্ষাৎ বাঙালি' বা 'আসল বাঙালি' (ছফা, ২০০৮ছ:২৫৩)। এমনকি এই নির্যাতিত সম্প্রদায় ইতিহাসের আরেক নির্যাতিত গোষ্ঠী বাঙালি মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনেও সমর্থন দিয়েছিল। এই সামষ্টিক নির্জ্ঞানের মেলবন্ধনের অনেকগুলো ঐতিহাসিক-সামাজিক কার্যকারণসূত্র রয়েছে।[114] সেই সূত্র ধরে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানই ইতিহাসের সেই নির্যাতিত গোষ্ঠী যারা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে টিকে থাকায় বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। আহমদ ছফা এই পরিচয়কে সর্বান্তঃকরণে ধারণ করেন। কারণ তিনি মনে করেন জাতির কল্যাণ চিন্তা করতে হলে সেই সত্তাটিকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। তবে, সর্বোপরি মানুষই ছফার আরাধ্য। বাংলাদেশের সাহিত্যকে তিনি ভূ-প্রাকৃতিক কারণেই স্বতন্ত্র বিবেচনা করেন, আদর্শ মনে করেন মাওলানা মনিরুজ্জামান-জসীমউদ্দীন-আলাউদ্দিন খাঁ-সুলতান-অদ্বৈতমল্ল বর্মণের অবদানকে। কৃষকসমাজ থেকে উঠে এসে সমাজের উপরিকাঠামোতে অবদান রাখার মধ্যে যে দায়বদ্ধতা মহৎ সাহিত্যিকের থাকে ছফা আমৃত্যু তা থেকে বিচ্যুত হননি।

'সাহিত্য সমাজের দর্পণ'– মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের এই প্রতিষ্ঠিত নীতিতে নিষ্ঠাবান ছফার সাহিত্যভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সমাজ ও মানুষ। তাই তাঁর লেখা প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা এমনকি গানেও সাহিত্যের জনকল্যাণমুখিতা বা সর্বজনীনতা পাঠকের বোধ ও বোধি উভয়কেই আন্দোলিত করে। ছফা একাধারে সাহিত্য-সমালোচক এবং সাহিত্য-ঐতিহাসিক[115]। সাহিত্য সমালোচনায় তিনি লেখক ও পাঠক উভয়ের জন্য শিক্ষণীয় পর্যবেক্ষক। আর সাহিত্য-ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর বিশ্লেষণ সমাজ সংগঠনের গভীরে; উৎপাদনব্যবস্থা-উৎপাদক এবং অপরাপর অংশসমূহের সম্পর্ক-সংঘাতের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে। তাই নিছক সাহিত্যচর্চা বা সাহিত্য-সমালোচনা ছফার উদ্দেশ্য নয়– উপায়; জীবনসাধনার ব্যঞ্জনা এবং সামগ্রিকতা সন্ধান করার উপায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গবেষণা,অনুবাদ, গ্রন্থের ভূমিকা, সমালোচনা, সাময়িকী বা দৈনিকের সম্পাদকীয় কলাম, ভাষণ, সাক্ষাৎকার, কথোপকথন– যেভাবেই তিনি আত্মপ্রকাশের বা মতামত প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন সাক্ষ্য রেখেছেন তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির, একটুই বিচ্যুত হননি লক্ষ্য থেকে। সেই লক্ষ্য কোনো-না-কোনোভাবে সমাজ-রাজনীতি-মানুষ-দেশ। মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বে সাহিত্যের উপযোগ, উদ্দেশ্যমুখিতা, সমাজঘনিষ্ঠতা, বিষয়মুখ্যতা, শ্রেণিস্বার্থ ও সংগ্রাম যেভাবে প্রাধান্য পায় ছফার সাহিত্যভাবনা ও বিচারে আমরা এগুলোরই প্রতিফলন দেখি। গণসাহিত্য এবং জাতীয়সাহিত্যকে একটি ঐতিহাসিক-স্বাতন্ত্র্যসূচক ভিত্তিতে স্থাপন করার প্রয়াস তার সাহিত্য-ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্যের একটি কাঠামো

প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল তাঁর প্রথম থেকেই। মুক্তিযুদ্ধের আগে 'গণসাহিত্য' সম্পর্কে তার ভাবনা স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সাহিত্য নির্মাণ ও জাতীয় সংস্কৃতির মুক্তির লক্ষ্যে স্বপ্ন-সন্ধানী হয়েছিল। কেবল সাহিত্যচর্চার মধ্যে নিজকে আবদ্ধ রাখা তাঁর স্বভাব নয়, শেষাবধি তিনি আসলে সাহিত্যকর্মী– দেশ ও মানুষের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।

৪.৩.১.

পাকিস্তানের ধর্মীয় রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেও বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে গণমুখী করার জন্য গণসাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন ছফা 'গণসাহিত্য প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে। বিশ্লেষণ করেছেন গণসাহিত্য সৃষ্টিতে লেখক-শিল্পীর ভূমিকা ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত বাঙালির উত্তাল গণআন্দোলন যখন ক্রমশ মুক্তিযুদ্ধের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল তখনই শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সেই স্বাধীকার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। ছফা এ সময়কেই পূর্ববাংলার গণসাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণের জন্য উপযুক্ত সময় মনে করেছেন। কারণ সমাজবাস্তবতা, সামাজিক আন্দোলন ও সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার কথা বিধৃত হয় যে-সাহিত্যে তা-ই গণসাহিত্য । গণসাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন উন্নত আদর্শ, সরলতা ও সততায় উজ্জীবিত একদল লেখক যারা জীবনের গভীরতা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে জাতিকে ধারণা দিতে সক্ষম। চারদিকের অসুস্থতা ও নেতিবাচক পরিবেশের মধ্যেও দুরূহ সাধনায় ব্রতী হয়ে সুস্থ জীবনচেতনায় মানুষকে শিক্ষিত করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। এজন্য একজন গণসাহিত্য কর্মীকে বিজ্ঞানসম্মত আপেক্ষিকতায় পরীক্ষা করতে হয় নিজের বিশ্বাসগুলো, জীবনের সত্যে উপনীত হতে হয় তাঁকে; তা না হলে তাঁর বিশ্বাস বা আদর্শ কোনোটাই সাধারণের কাজে আসতে পারে না। ছফা মনে করেন, 'আদর্শ হল সামাজিক জীবনকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখার ফল, জীবনের ভেতর থেকেই গজিয়ে উঠে। বাইর থেকে চাপিয়ে দেয়া কিছু নয়' (ছফা, ২০১১:৪৫)। অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামের সাহিত্যই গণসাহিত্য এবং সমাজজীবন থেকে গড়ে ওঠা আদর্শই গণসাহিত্যের ভিত্তি , তবে সতর্ক থাকতে হবে –'স্থিরীকৃত একটা মতবাদের সঙ্গে জনতাকে তৃতীয় শ্রেণীর মিস্ত্রীর মতো পেরেক দিয়ে ঠুকে মুহুর্মুহু বালখিল্যরূপে আপ্লুত হয়ে জনতার জয়ধ্বনি করলে গণসাহিত্য রচিত হবে এমন প্রত্যাশা করা নিতান্ত অবাস্তব, উদ্ভট এবং হাস্যকর' (ছফা, ২০১১:৪৭)।

সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রচিত সাহিত্য অথবা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যারা জীবন-জীবিকার জন্য কঠিন সংগ্রামে নিয়োজিত, তাদের জীবনভিত্তিক সাহিত্য রচনার তাগিদ ছফার। কারণ, জীবনের চেয়ে সত্য কিছু নেই আর সেই জীবন গণমানুষের জীবন–

> জীবন শুধু কতিপয় বার্ণিশ করা রেডিওকে কান ভাড়া দেওয়া ভদ্রলোকের নয়, আরো মানুষ আছে যারা সংখ্যায় অনেক। তাদের জীবনে উপাদানের অভাব নেই। মানবিক উপাদান, তাদের চরিত্রে যতবেশি সুলভ ভদ্রলোকের জীবনে ততবেশি দুর্লভ। কেননা জীবনের সত্যিকারের কর্তব্য সংগ্রাম, তারা জীবিকার খাতিরে হলেও করে যাচ্ছে। ভাড়া দেওয়া নিশ্চিন্ত নয় তাদের জীবন। (ছফা, ২০১১:৪৭)

দেখা যায়, সাহিত্যচর্চার শুরুতেই সাহিত্য নির্মাণ ও বিচারে আহমদ ছফা দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ। তিনি বিষয়নিষ্ঠ এবং উদ্দেশ্যমুখি; বৈজ্ঞানিক আপেক্ষিকতা ও সংশয়বাদী লেখকও তাঁকে বলা যায়। সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের প্রধান শর্ত। কারণ ভাষা সামাজিক মানুষের সৃষ্টি কিন্তু সমাজ ও মানুষ দুই-ই পরিবর্তনশীল। আবার ব্যক্তিচৈতন্য ও সমাজচৈতন্য পরস্পর নির্ভরশীল। তাই সমাজকাঠামোর পরিবর্তন ঘটলে সাহিত্য বদলে যাওয়াই স্বাভাবিক। এভাবে সমাজের ভিত্তি থেকে প্রেরণা বা উপাদান উপরিকাঠামোর মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং তদ্বারা সৃষ্ট গণসাহিত্য সমাজসংগঠনের ভিত্তি তথা সাধারণ মানুষকে বিপ্লব-ধারায় প্রশিক্ষিত করে। ছফা-মানসে মার্কসবাদের প্রভাব যেমন জ্বলজ্বলে সত্য, ধর্মের প্রভাবও তেমনি অকুণ্ঠ; দুটোর সমন্বয়ে

একটি সমৃদ্ধ ধারা তিনি বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে আশা করেছিলেন, নিজে চেষ্টাও করেছিলেন। সাহিত্যে এমন বৈপ্লবিক চেতনা বিকাশের জন্য উপযুক্ত প্রতিবেশ মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়ে বাংলাদেশের সমাজে উপস্থিত থাকলেও তাকে সর্বাত্মকভাবে ব্যবহার করা যায়নি। কারণ, ছফার মতে, গণসাহিত্যের ভিত গড়ে তোলার জন্য আমাদের লেখক-শিল্পীদের যথার্থ প্রস্তুতি ছিল না। লেখকদের অবক্ষয়ী চিন্তা ও চিন্তার সংকীর্ণতা, বুদ্ধি ও মনীষার শূন্যতা, একমুখিনতার অভাব, 'সাহিত্যের অফিসার' (ছফা, ২০১১:৪৬) হওয়ার বাসনা, আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি কারণে বিরাজ করছিল এক অসুস্থ পরিবেশ যা গণসাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী নয়। অন্যদিকে বিদেশি তত্ত্ব ও সাহিত্যের অনুকরণ এবং মতবাদ-মতাদর্শের দাসত্ব দু-য়ে মিলে গণসাহিত্য সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন হয় সমাজ ও জীবনের মধ্য থেকে অভিজ্ঞতা-জ্ঞান-অভ্যাস দিয়ে গড়ে ওঠা মহৎ আদর্শের লেখক যারা গণসাহিত্য সৃষ্টির দুর্গম অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন। ছফার নির্দেশনা নিচের উদ্ধৃতিতে–

> মতের সঙ্গে পথের, আদর্শের সঙ্গে কর্মপন্থার সংযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। পথ বস্তুত একটাই আছে জীবনের সেটা চরম পথ। এ চরম পথে চলতে হবে যারা গণসাহিত্য করবেন তাঁদের। কথা উঠতে পারে, এ চরম পথ কেন? যেহেতু বাক্যের মোড়কে প্রাণের প্রকাশকে ঢেকে রাখা চলবে না। অভিযানের কাছে মস্তিষ্ক বন্ধক দেওয়া চলবে না। নন্দনতত্ত্বের খাতিরে জীবনের প্রকাশকে কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন করা চলবে না। শুধু প্রাণের গভীরে খনন করে প্রাণের হীরে-মোতিকে প্রাণের সামনে তুলে ধরতে হবে। (ছফা, ২০১১:৪৭)

কিন্তু তেমন আভিযাত্রিক গড়ে ওঠার আগেই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সমগ্র জাতি। যে বৈপ্লবিক প্রেরণাজাত গণসাহিত্য নির্মাণ ছফার আকাঙ্ক্ষা ও চর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তা-ই স্বাধীনতা-উত্তরকালে পরিবর্তিত আকাঙ্ক্ষা ও সমাজবাস্তবতায় 'জাতীয় সাহিত্য' নির্মাণের স্বপ্নে পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নতুন সমাজ ও বিপ্লবী সাহিত্য দেখতে চেয়েছিলেন ছফা। জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবন ও জাতির মননশীলতার ধারক-বাহক। জাতিগত আবেগ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রকাশ এবং জাতিগত আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটে জাতীয় সাহিত্যে। রাজনৈতিক পরাধীনতার সময়ে যে আবেগ সুপ্ত অবস্থায় থাকে, সামাজিক মুক্তি আন্দোলনে সেটাই আবেগের তীব্রতায় জ্বলে ওঠে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ সেই আবেগের ঘরে আগুন দিয়ে বাংলাদেশের বাঙালিদেরকে আরও একবার আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে মীমাংসাসন্ধানী করে তোলে। প্রথমবারের অগ্নিপরীক্ষা ছিল ১৯৪৭।

৪.৩.২

আহমদ ছফা মুক্তিযুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশের সাহিত্যকে চারটি কালক্রমিক পর্বানুসারে বিশ্লেষণ করেছেন—

এক. বিভাগপূর্বকাল,

দুই. বিভাগোত্তরকাল থেকে ভাষা আন্দোলনের পূর্ববর্তীকাল,

তিন. ভাষা-আন্দোলন পরবর্তীকাল থেকে আইয়ুবের সামরিক শাসনের পূর্ববর্তীকাল এবং

চার. সামরিক শাসনকাল থেকে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত।

'সংস্কৃতির জীয়নকাঠি' প্রবন্ধে আহমদ ছফা বিভাগ পরবর্তীকাল থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাসসহ সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন-পরিবীক্ষণ ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষা-আন্দোলন পরবর্তীকালে বাঙালির জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে বাঁক পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার আভাস পাওয়া যায় এবং জাতীয় সাহিত্যের রূপরেখা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ছফা মনে করেন, বাঙালি মুসলমান সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎকর্ষ ও সৃষ্টিশীলতার বিচারে বাঙালি হিন্দুদের চেয়ে

ঐতিহাসিক কারণেই বেশ পিছিয়ে আছে। তাছাড়া বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চায় প্রারম্ভিককালে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাবল্য ও তারল্য বেশি থাকায় তা জগৎ ও জীবনের অনেক সমস্যাকেই ধারণ করতে পারেনি। তবে হিন্দু মনীষীরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুসরণে যুক্তিবাদিতার যে বীজ বাংলা সাহিত্যে বপন করেছিলেন মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তা দেরিতে হলেও সঞ্চারিত হয়েছিল। বাঙালি মুসলমানদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ ও সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং নজরুলের হীনম্মন্যতাবোধমুক্ত আত্মপ্রকাশকে বিভাগপূর্বকাল তথা প্রাথমিক যুগের বড় প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য করেছেন ছফা।

ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শাসন-মুক্ত হওয়ার পূর্বেই হীনম্মন্যতাবোধমুক্ত, গতিশীল সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন মুসলিম মনীষীগণ, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আব্দুল ওদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, হুমায়ুন কবীর তাদের পথিকৃৎ। কিন্তু বিভাগ পরবর্তীকালে এই সাহিত্যিকদের একাংশ, যারা বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পাকিস্তানে চলে আসেন, তাদের সৃষ্টিশীলতায় বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতির সাথে বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণের দ্বন্দ্বই তাঁদের কর্মকুশলতায় বাধা হয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেসময়। কারণ 'পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পদে পদে বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশ ব্যাহত করেছে। ঐতিহ্যের কোল থেকে সবলে ছিনিয়ে এনেছে বাংলার সংস্কৃতি এবং সকল সময় চেয়েছে একটি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক খাতে গোটা জাতির চেতনা প্রবাহিত হোক' (ছফা, ২০০৮গ:১৬৫)। এরই অংশ হিসেবে বিভাগপূর্বকালের সফল সাহিত্যিক ও মনীষীগণ এই ঐতিহাসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে একরকম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। বিপরীতপক্ষে, পূর্ব বাংলার বাঙালির এই নব্য-উপনিবেশকালে পাকিস্তানি শাসকদের দুরভিসন্ধি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে বিনির্মিত সুবিধাবাদিতার মেরুকরণ থেকেই জন্ম নেয় তথাকথিত পাকিস্তানবাদী সাহিত্য এবং 'তমুদ্দুন'-এর। এসময় জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনে এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও বাদ দেয়ারও প্রস্তাব তুলেছিলেন এক শ্রেণির বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী।

ভাষা-আন্দোলন বাংলাদেশের সাহিত্যকে নিজেদের দিকে তাকাতে শিখিয়েছে। নবীন লেখকরা জগৎ ও জীবনকে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যে অলংকৃত করার মানসে 'ইসলামী আদর্শের ফানুসের মায়া কাটিয়ে তাঁদের গ্রামীন-জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার কথা নিজেদের ভাষায়, অনুভূতির রসে জারিত' করে বলতে শুরু করায় সৃষ্টিমুখর তরঙ্গপ্রবাহে নতুন উচ্ছলতা দেখা দিল। সাহিত্য হয়ে উঠল অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ। ছফার বর্ণনায় ভাষাআন্দোলন-পরবর্তী এই আবেগমথিত সময়ের সাহিত্য-প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়–

> বাংলাদেশের বুক চিরে এই উৎস উষ্ণ আবেগে ঝলকিয়ে উঠেছে তরুণদের শোণিত শিরায়। তা ধারাল, তেজোময় সংস্কারের প্রতি বিক্ষুব্ধ এবং আবেদনের দিক দিয়ে মানবিক। বাংলাদেশের বেদনার খনি ও সম্ভাবনার প্রত্যাশা থেকেই এই সাহিত্যের উৎপত্তি। দীর্ঘদিনের অভ্যেসে রপ্ত করা রুচির রেশমি মসৃণতা এই সাহিত্যে অনুপস্থিত বললেই চলে, অন্যদিকে আবার ইসলামী অনুশাসনের মহিমা-কীর্তনের কোন সজ্ঞান প্রয়াস নেই। এ সাহিত্যে হাটের মানুষ, ঘাটের মানুষ, মাঠের মানুষ আসর জমিয়েছে। তাই বলে কলকাতার কোনরকম অনুকরণও একে বলা চলে না। এই জিনিস আবহমান কালের বাংলার সংস্কৃতির স্তন্যরসে পুষ্ট। এ সাহিত্যে মুসলিম সমাজ-জীবনের ছায়াপাত আছে, ইসলাম কিংবা অন্য ধর্মবোধের প্রতি অন্ধ আনুগত্য কদাচ চোখে পড়ে। (ছফা, ২০০৮গ:১৭০-১৭১)

তবে ভাষা-আন্দোলন থেকে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক বিলোড়ন সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন প্রাণাবেগ ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করলেও তাতে প্রজ্ঞা ও সুস্থিরতা বলিষ্ঠ রূপ পায়নি; তরল আবেগ প্রশমিত হয়ে মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের স্তরে পৌঁছাতে আরো সময়ের প্রয়োজন ছিল বলে ছফা মনে করেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরতে পরতে বাঙালির মুক্তিপিপাসা ছয়ের দশকে সামরিক সরকারের বিধিনিষেধের কবলে পড়ে নিষ্প্রাণ হতে থাকে। এমন প্রত্যাশাহীন, চিন্তাহীন, স্বপ্নহীন, বেদনাহীন এ সময় ছিল অনির্দেশ্য ধূ-ধূ মরীচিকার রাজত্ব। কিন্তু সামরিক শাসনের বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা ও কূটচাল সত্ত্বেও এমন পরিস্থিতি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি কারণ 'তলায় তলায় ইতিহাস কাজ করে যাচ্ছিল' এবং ভাষা আন্দোলনের অভিঘাতে 'দশের মন তৈরি হয়ে গিয়েছিল' (ছফা, ২০০৮গ:১৭৬)। প্রতিবাদী সমাজের ভাবাবেগের

তীব্রতা আত্মার গভীরে প্রোথিত শিকড় থেকে জাতিসত্তার স্বরূপটি টেনে বের করে আনে। একদল কবি-প্রাবন্ধিক -কথাসাহিত্যিক দায়িত্বশীলতার সাথে সার্থকভাবে এ কাজটি করেছেন।

যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীন বাংলাদেশের উপরিকাঠামোর চারিত্র্য নির্মাণকল্পে প্রধান কর্তব্য ছিল ভিত্তিকে সুসংগঠিত করা, এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ। প্রয়োজন ছিল জাতীয়তার বৈশিষ্ট্যগুলো নিরূপণে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা-পর্যালোচনা ও প্রতর্ক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই প্রশ্ন যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে ব্যর্থ হওয়ায় জটিলতা ঘনীভূত হয়। কিন্তু ব্যাপক ও রক্তাক্ত জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি বলে পরিচিত, তারা কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কারণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই প্রশ্ন ছফাকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই আন্দোলিত করে। কিন্তু এমন জিজ্ঞাসা যতটা রাজনৈতিক-আবেগিক তার চেয়ে বেশি ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক–দ্বান্দ্বিকও বটে। বিজয়ী জাতির পরিচয়-গর্বে প্রশ্নটি সাময়িকভাবে চাপা পড়লেও ইতিহাসের দায় এড়াতে পারেনি। ১৯৭৫-এ শেখ মুজিবর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক চার নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর বিষয়টি আবারও জ্বলজ্বলে প্রশ্নের আকার নেয়। ছফাও অনুসন্ধানী হয়ে ওঠেন বাঙালির মননচর্চার ইতিহাস ও স্বাতন্ত্র্য সন্ধানে।

মার্কসীয় সমাজবীক্ষণ অনুসরণ করে ছফা দেখেছেন, বাঙালির ইতিহাসের নানা গতিপথের মধ্যে একটি নির্যাতিত-বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সবসময়ই ছিল যারা ক্ষেত্রজ হয়েও ইতিহাসের কোনো পর্বেই কোনো অধিকার ভোগ করতে পারেনি। এই জনগোষ্ঠী বারবার ধর্ম পরিবর্তন করেছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে, কিন্তু ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাদেরই একটা অংশ যারা সর্বশেষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আত্মরক্ষায় অথবা নতুন জীবনাভিজ্ঞতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, ছফার মনোযোগ সেই জনগোষ্ঠীর মননচর্চার ইতিহাস সন্ধানে। উল্লেখ্য, বাঙালির জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিকাশ বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সমবায়ী-সচেতন অংশগ্রহণ হিসেবে ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে প্রমাণিত। তবে বাঙালির শিল্প-সাহিত্যচর্চার বিকাশ পর্বে বাঙালি মুসলমানের অসম্পৃক্ততা, অনগ্রসরতা ও ঐতিহ্যিক টানাপোড়েন ছফাকে এ বিষয়ে গভীরভাবে জিজ্ঞাসু করে তোলে। এর কার্যকারণ সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন তিনি, এবং উদ্ঘাটন করেন ইতিহাসের এক ভিন্নতর পাঠ। তাঁর 'বাঙালি মুসলমানের মন' গ্রন্থে এই আত্মানুসন্ধানের ইতিহাসাশ্রয়ী বিশ্লেষণ বিধৃত রয়েছে।

পুথি সাহিত্যই বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য রচনার প্রথম সচেতন প্রয়াস। পুথি রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান আত্মপরিচয় অন্বেষণের সূচনা করেছে। নতুন ধর্ম গ্রহণ করার কারণে বাঙালি সমাজের একটা অংশের মানসজগত বদলে যেতে থাকে 'তাদের মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটে'; সেই 'শ্রেণীটিতেই ছিল পুথিসাহিত্যের আদর সীমাবদ্ধ। তাঁরাই এর লেখক, পাঠক এবং সমঝদার' (ছফা, ২০০৮ক:৯৫)। রাজসভার কবিদের বৈদগ্ধ ও পাণ্ডিত্য ছিল, ছিল না সামাজিক আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার। জনগণের জীবনধারার সমতলে এসে সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাহিত্য রচনা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নবগঠিত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার হৃৎস্পন্দন অনুভব করেছিল পুথি লেখকরাই। সামাজিক আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভের পেছনে সাহস বা নির্ভরতা যুগিয়েছিল মুসলিম রাজশক্তির ক্ষমতারোহণ। অবশ্য এ ক্ষমতা প্রধানত বিদেশিদেরই হস্তগত ছিল। এ সমাজ-দেহে ছিল দীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনা ও বর্ণাশ্রম প্রথার যাতাকলে পিষ্ট হওয়ার দগদগে ঘা, দেব-দেবীর পূজারিদের অত্যাচারের দুঃসহ স্মৃতি আর ছিল বারবার ধর্মপরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট শূন্যতা। ফলে নতুন ধর্মে দীক্ষিত নতুন সমাজকে তারা সত্বরই নিজস্ব নায়ক, বীর বা কাহিনী উপহার দিতে চেয়েছেন। আমীর হামজা, রুস্তম, ইমাম হাসান, হযরত আলীসহ আরো অনেকে এ তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু 'নতুন শিল্পাদর্শটির চেহারা কি রকম হবে, জীবনের কোন্ মূল্যচেতনার বাহন হবে, অতীতে কতদূর গ্রহণ করবে, কতদূর বর্জন করবে, সে সম্বন্ধে তাদের

মনে কোন পরিচ্ছন্ন ধারণা ' (ছফা, ২০০৮ক:৯৬) না থাকায় তারা হিন্দুদের সৃষ্ট সাহিত্যই অন্ধ অনুকরণ করেছেন। নতুন সামাজিক চাহিদার জবাব দিতে গিয়ে তারা যেসব অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি করেছেন তার কারণও তা-ই; 'উপলব্ধির বদলে বিক্ষোভ, পরিচ্ছন্ন চিন্তার বদলে ভাবাবেগই তাদের শিল্পদৃষ্টিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছে' (ছফা, ২০০৮ক:৯৬)। মুসলমান সাহিত্যিকদের যখন এই অবস্থা তখন হিন্দুদের রচিত সাহিত্যে সঙ্গত কারণেই মানসিক পরিস্রুতি ও পরিপক্ব কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যায়–

> পুঁথিসাহিত্য হল দুটি পাশাপাশি সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে মুসলমান জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে তারই প্রতিফলন। মুসলমান জনগণের মত হিন্দু জনগণও আরেকরকমভাবে এই সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিয়েছেন। (ছফা, ২০০৮ক:৯৩)

দোভাষী-পুথির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের বিপুল মিশ্রণ মুসলমান সাহিত্যিকদের যে মানসিক অবস্থাকে নির্দেশ করে সে সম্পর্কে ছফা যথার্থই বলেন–

> আসলে তা ছিল বেহেশতের ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। যখন দেখা গেল আরবি হরফে বাংলা লিখেও সমাজে চালু করা যায় না তখন পুঁথিলেখকরা সবান্ধবে পরবর্তী পন্থাটা অনুসরণ করতে থাকলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার আরবি-ফার্সি শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। জনগণ তাঁদের এই ভাষাটিকে গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু কোন্ জনগণ? এঁরা ছিলেন সেই জনগণ সংস্কৃত ভাষা যাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবি অজানা, ফার্সির নাম শুনেছেন এবং উর্দূভাষা কানে শুনেছেন মাত্র। (ছফা, ২০০৮ক:১০০)

সেদিক থেকে দো-ভাষী পুথি সাহিত্যিকগণ একাধারে জনগণের শিল্পী এবং শিক্ষক। তাই নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে পুথিসাহিত্যের বিশেষ মূল্য না থাকলেও বাঙালি মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় এর মূল্য অপরিসীম। যারা বর্ণ-হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত, ব্রাহ্মণ্যবাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং সংস্কৃত-আরবি-ফারসি ভাষার আভিজাত্যে অপাংক্তেয় তাঁরাই পুথি সাহিত্যের লেখক-পাঠক-সমঝদার। পুথি সাহিত্যের বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই প্রকারান্তরে হিন্দু-ঐতিহ্যের অপভ্রংশ। তাই বলা যায়– 'মুসলমান রচিত পুঁথি সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীলতা আসলে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতারই সাহিত্যিক রূপ' (ছফা, ২০০৮ক:৯৭)।

বিভাগপূর্ব ও অব্যবহিত পবরর্তীকালে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির নামে যে সর্বাত্মক প্রয়াস চলছিল তা আসলে ধর্মীয় উন্মাদনা ব্যবহার করে পাকিস্তানবাদী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্যোগ। এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্রে স্থাপন করেই বাংলাদেশের সাহিত্য সত্যিকার জাতীয়তাবাদী চরিত্র ধারণ করতে থাকে। ছফার সাহিত্যদর্শে ভাষা-আন্দোলন থেকে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এজন্য তিনি পাকিস্তানবাদী জাতীয় সাহিত্যের চিন্তা পরিহার করে স্পষ্টভাষায় 'পূর্ব বাংলা'র জনগণের সাহিত্য নির্মাণের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। বাঙালির ধারাবাহিক সাহিত্যচর্চার ইতিহাসের ভেতর থেকেই সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের জন্য জাতীয় সাহিত্যাদর্শ গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায় আহমদ ছফার আলোচিত প্রবন্ধগুলোতে। এই অন্বেষণ অব্যাহত দেখতে পাই তার দুটি বিশ্রুত প্রবন্ধ 'বাংলার সাহিত্যাদর্শ' ও 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'-এর মধ্যেও।

'বাংলার সাহিত্যাদর্শ' প্রবন্ধে ছফা মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতা থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য-ঐতিহ্যের যুগস্রষ্টা প্রতিভাসমূহের বিশিষ্টতা ও মৌল-ভিত্তি আলোচনা করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ভিত্তি, শ্রেণিস্বার্থ ইত্যাদি বিবেচনায় আলোচিত মনীষীগণ ক্রমান্বয়ে যে সাহিত্যাদর্শকে পূর্ণতা দিয়েছেন তার রূপ-রীতি ব্যাখ্যা করেছেন ছফা। শিল্প-সাহিত্য প্রাণ পায় একটি গতিশীল সমাজব্যবস্থায়, তুর্কি আগমনের পূর্বে বাংলার সামন্তসমাজে যার অভাব ছিল প্রকট। তুর্কি মুসলমানদের বাংলায়

আগমন যে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে তার প্রভাবে একদিকে ভঙ্গুর সামন্ত-সমাজব্যবস্থায় রোপিত হয় বিনাশের বীজ, অন্যদিকে প্রবল সামাজিক বিলোড়ন সৃষ্টিশীলতার নিস্তরঙ্গ জলস্তরে সূচনা করে প্রকম্পন, পরিবর্তনস্রোতে ভেসে যায় সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন সমাজ-লালিত গণমানুষের মানসিক নৈরাজ্য। সৃষ্টি হয় বৈষ্ণবসাহিত্যের অমৃতভাণ্ডার, মঙ্গলকাব্যের অনুষ্ঠানধর্মী রূপরসময় জগত। মুসলমানদের আগমনের ফলে বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক-ভাষিক এবং ভাবজগতে যে গভীর আন্দোলন সূচিত হয় তা বিবর্ণ হওয়ার আগেই বৃটিশ শাসনের বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক আগ্রাসন সমাজ থেকে সামন্ত প্রভুদের শেষ ঝাণ্ডাগুলোও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বুর্জোয়াশক্তি স্থান দখল করে সামন্তশক্তির। এই বিবর্তন সমাজদেহে যে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে নবপ্রাণ-নবজাগরণসূচিত করেছিল তারই ফলশ্রুতিতে বাংলার উর্বর ভূমিতে একে একে জন্ম নিয়েছে কালজয়ী প্রতিভা রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আহমদ ছফা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এই ক্রমিক ঘটনা অনুসরণ করে পৌঁছে যান মধুসূদন-প্রতিভার মূল অন্বেষণে, কারণ শৈশবেই তিনি ভালবেসেছিলেন কবি মধুসূদনকে।

৪.৩.৩.

বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিকে ছফা যেভাবে চিহ্নিত করেছেন তা হল, বাংলা সাহিত্য একটি সামন্ত সমাজব্যবস্থালালিত ও ধর্মীয় সংস্কারাবদ্ধ জীবনচেতনা থেকে বুর্জোয়া সমাজকাঠামোর অপেক্ষাকৃত উদার মানবতাবাদী ধারার দিকে প্রবাহিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনের উপজাত হিসেবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন অধ্যয়নের আলোকে নবগঠিত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণিবাহিত ইউরোপীয় রেনেসাঁস এক্ষেত্রে কাজ করেছে প্রভাবক হিসেবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্যায়ে সমাজসংস্কারের সূত্র ধরে বাঙালি মনীষায় জাগ্রত সৃজনশীলতার প্রাবল্য শুধু যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সূচনা করল তা নয়, বাঙালি-মননে উন্নত চেতনা গড়ে তুলতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করল। পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কারের আঙ্গিকে উপমহাদেশেও জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্যে ভাষা-সংস্কৃতির অভিন্নতা-সঞ্চারিত এক মিশ্র জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। এতে একদিকে বঙ্গভঙ্গের মতো রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উপপ্লব বাংলা ও বাঙালির স্বতন্ত্র জাতীয়চেতনার উন্মেষ ঘটায় আবার বঙ্কিম-নির্দেশিত ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাও বিস্ফোরিত হয় সমগ্র উপমহাদেশে।

রেনেসাঁস্নাত জীবনচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মধুসূদনের মানবতাবাদী সৃষ্টিসম্ভারে। 'বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর যথার্থ প্রতিনিধি' এবং 'নবযুগের অগ্রদূত' আখ্যা দিয়ে মধুসূদনের সৃষ্টিকর্মের বুর্জোয়া চরিত্র বা লক্ষণকে চিহ্নিত করেছেন ছফা–

> মাইকেল ছিলেন চূড়ান্তভাবে বিপ্লবী। তাঁর কল্পনা এ্যাসিডের মত যখন প্রাচীন কাব্যের চরিত্রগুলো স্পর্শ করেছে তাদের ধর্মের লৌহবর্ম খসে পড়েছে, রক্ত-মাংসের সৌন্দর্য নতুন দীপ্তিতে ঝলকিত হয়ে আরেকটি উজ্জ্বল জগতের স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছে। ... ... তাঁরা আর ধর্মীয় মতের বাহন রইলেন না। রাবণ, ইন্দ্রজিত, প্রমিলা এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের সাহসী এবং প্রেমোন্মত্ত নায়িকারা আধুনিক পোশাকে আধুনিক জগতে পদার্পণ করলেন। এটা পুরনো বোতলে নতুন সুরা নয়, বরঞ্চ বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রেম, কাম, দম্ভ এসবকে জীবনে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হল। (ছফা, ২০০৮খ:২০৫)

ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী উপমহাদেশে প্রবেশ করে সাহিত্য ও শিক্ষাবিস্তারের ফলে। তাই মধ্যবিত্ত এবং পুঁজি এ-দুয়ের অপরিণত বিকাশ সত্ত্বেও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলিত প্রকাশ দেখা দেয় সমাজসংস্কার ও সাহিত্যচর্চায়। মধুসূদনের মধ্যে তার সবটাই মূর্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আহমদ ছফার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> নতুন সাহিত্যাদর্শের গতিশীলতা সমাজ আদর্শের মধ্যে একটা সংঘাত বাধিয়ে তুলল। একটি মানববাদী সাহিত্যাদর্শ সৃজনে মাইকেল পুরোপুরি তাঁর যুগের কাছে ঋণী ছিলেন না। এর গৌরব তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকেই দিতে হয়। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সর্ব প্রথম বিশ্বজনীন মানুষ। (ছফা, ২০০৮খ:২০৬)

কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে এই চেতনা আবার ভিন্ন গতিপথ পায়। মানবতাবাদী ধারাটি সংকুচিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতার আদর্শ প্রসারিত হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোতে, ছফার ভাষায়, 'মজ্জাগত হীনমন্যতাবোধ' থেকে 'এক ধরণের আর্যামীর ভড়ং' নির্মাণ করতে চেয়েছেন, যা মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কল্যাণ কামনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল (ছফা, ২০০৮খ:২০৮)। মানবতাবাদী আদর্শ, জাতীয় আদর্শ সবকিছুই তিনি হিন্দু ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসের মধ্যে সীমিত করে ফেললেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা বিভক্ত হওয়ার মূল কারণ হিসেবে দায়ী করে আহমদ ছফা লিখেছেন–

> গোঁড়া সংস্কারান্ধ মনের নরম পলিতে তিনি যে বিষের বীজ বপন করেছিলেন কালে তাতে ফল ফলতে আরম্ভ করে। তিনি চাইলে আরো ভালভাবে আপন সম্প্রদায়ের সেবা করতে পারতেন। তাঁর সে যোগ্যতা এবং প্রতিভা ছিল। বস্তুত তিনি জাতির বন্ধু হওয়ার চাইতে শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম তো মূলত শিল্পী। গানের পাখির গুরুমশায় হওয়া চলে না। তাঁর শিক্ষা তাঁরই সম্প্রদায়কে ঘৃণা বা বিদ্বেষের পথে পরিচালিত করেছে। পরবর্তী ইতিহাস তা প্রমাণিত করেছে। সম্ভবত বাংলা বিভক্ত হওয়ার মূল কারণ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (ছফা, ২০০৮খ:২০৯)

মার্কস-এঙ্গেলস-বস্তুবাদ-বিজ্ঞান-মানবতাবাদ কিছুই বঙ্কিমকে সন্ন্যাসবাদ প্রচার থেকে বিমুখ করতে পারেনি। উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনার জাগরণে রূপ দিয়েছেন। তথাপি ছফা বঙ্কিমকেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনীষীদের একজন মনে করেন। ছফা মনে করেন, বঙ্কিমের মধ্যে বাঙালির খণ্ডিত ইতিহাসবোধ কাজ করেছিল মূলত তিনটি কারণে– ব্রিটিশশক্তির বিভক্ত করে শাসন করার নীতি, সংস্কারাবদ্ধ হিন্দুমনের প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং মুসলমান সমাজের জাড্য (ছফা, ২০০৮খ:২০৭)। বঙ্কিম-প্রতিভার এই সংকীর্ণতা বাংলা সাহিত্যের মানবতাবাদী ধারাকে বাধ্য করেছিল একটি সংকীর্ণ গতিপথে আত্মরক্ষা করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে সেই শীর্ণ ধারাটি আবার সতেজ প্রবাহিনী হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িকতার যে অন্ধকার বঙ্কিম অবলীলায় ছড়িয়েছেন তা সাহিত্যের শোণিত থেকে দূর করতেই রবীন্দ্রনাথকে জীবনভর সংগ্রাম করতে হয়েছে। তিনি বংশানুক্রমিক ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে থেকেও তাতে স্বকীয়তা যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন সব মানুষের অন্তরের সাযুজ্য। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আস্থা বাধ্য-বাধকতামুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর মতে, ঈশ্বর একটি সুন্দর ধারণা–পুলকিত বিশ্বাসবোধ; অধিক কিছু নয়। (ছফা, ২০০৮খ:২১০)

এক সুনিয়ন্ত্রিত অথচ প্রসারিত ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– দেশ, জাতি ও ধর্মের শ্রেষ্ঠাংশ অবলীলায় আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন, অনায়াসে অতিক্রম করেছিলেন কুসংস্কার ও হীনমন্যতা– ঠিক বঙ্কিমের বিপরীত মাত্রায়। অন্তরের শুভ কামনা এবং ভগবৎ চেতনার যুগল নির্দেশনায় শক্তিমান রবীন্দ্রনাথকে 'মানববাদী' আখ্যা দিয়েও ছফা বর্ণনা করেন রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা–

> কিন্তু মানববাদীরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সরল বিশ্বাসই হল তাঁর যাদুকাঠি। তিনি বিশুদ্ধ ধ্যানের মধ্যেই নির্বাণ কামনা করেন। কিন্তু বিশ্বাস এবং ধ্যান কাউকেও বেশিদূর নিয়ে যেতে পারে না। তিনি মঙ্গলের পূজারী এবং সে কারণে জগৎ-সংসার ছেঁকে মঙ্গল টেনে বের করে আনবেন বলে ভরসা রাখেন। (ছফা, ২০০৮খ:২১১)

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো থেকে স্বাধীন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রবেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বসংঘাতসংকুল পরিবেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির গতিপথও জটিল ও বহুধাবিভক্ত হতে বাধ্য। তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও সামন্ত মানসিকতার সমন্বয়[১১৬] সত্ত্বেও তার মাধ্যমেই আবার বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধারার জয়-জয়কার ঘোষিত

হতে দেখি। আর বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য সাহিত্যিক যে বিদ্বেষ বিষ ছড়িয়েছিলেন তা-ও রবীন্দ্রনাথের মঙ্গল ও মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের মাধ্যমে দূরীভূত করার চেষ্টা চলে। এই প্রয়াসের সর্বোত্তম প্রকাশ দেখা যায় কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে। যে সমাজ প্রশান্ত শ্রেয়োচেতনার রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছিল, ত্রিশের বুদ্ধি ও তত্ত্বশাসিত কবিকূলকে সে-ই একই সমাজ গড়ে তোলেনি। ছফা খুব সংক্ষেপে এর পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন–

> সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা স্বাধীনতার বেদীতে তাঁদের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন করছিলেন। রক্ত দান, প্রাণ দেয়া-নেয়ার রোমাঞ্চে গোটা যুগ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আগের কবি, লেখক এঁরা ছিলেন শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি। এই সামাজিক উপপ্লবে কোন ভাষায়, কোন সুরে কথা কইতে হয় তাঁরা জানেন না। তাই সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তাঁদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।(২০০৮খ:২১২,২১৩)

বাংলাদেশের জাতীয়সাহিত্য সৃষ্টিতে এবং বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চার রূপরীতি অনুধাবনে কাজী নজরুল ইসলামকে বিভিন্নভাবে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করার প্রয়াস ছফার মধ্যে দেখা যায়। নজরুল-সাহিত্যের অনেক সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার উল্লেখ[১১৭] করেও বিশেষত ইসলামি ভাবধারার সাহিত্য রচনা, ভাষা-ব্যবহার, অসাম্প্রদায়িক ভাবধারা নিয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতির দূরত্ব কমানো, গণমানুষের সাহিত্য সৃষ্টিতে নজরুলের যুগান্তকারী ভূমিকাকে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যভাবনার ক্ষেত্রে অনন্য সংযোজন বলে মনে করেন ছফা। নজরুল-প্রতিভাকে 'ভাববিপ্লবের মশালচি' বা 'মহান বর্বর' যেভাবেই অভিহিত করা হোক না কেন 'তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কবিতার ভরকেন্দ্রের পালাবদল ঘটে– কবিতা গজদন্ত মিনার ছেড়ে রাজপথে নেমে এল এবং সামাজিক শক্তির অংশ হিসেবে স্বরূপ প্রকাশ করল। সমাজের নির্যাতিত মানুষেরা কবিতায় স্বীকৃতি পেল, কাজী নজরুলের কবিতা তাঁদের ভাগ্যলিপি হয়ে দেখা দিল' (ছফা, ২০০৮খ:২১৩)। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেসব সাধারণ মানুষ আশ্রয় পেয়েছিল তারা আইডিয়ার জগতে নির্মিত। কিন্তু নজরুলের সাধারণ মানুষ রক্তমাংশের এবং সমকালবাহিত। যে সামাজিক সমন্বয়, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও মানবতাবোধ ছিল রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা সেখানেই নজরুলের শুরু। ফলে নজরুলের কবিতা হয়ে উঠলো হিন্দু এবং মুসলিম সমাজ-অভিজ্ঞতা, ইতিহাসচেতনা এবং জীবনবোধের সুসমন্বয়। যাঁরা 'প্রতীচীর আদর্শে আধুনিক বাংলা কবিতা ঢালাই করেছেন' (ছফা, ২০০৮খ:২১৪), যাঁরা সমাজ-বিপ্লবের কথা বলতে চেয়েছিলেন অথবা 'যাঁদের স্বপ্ন এবং বিশ্বাস ইসলামি আদর্শের পুনর্জীবনের মধ্যে প্রোথিত' তাঁরা সবাই নজরুলের ভাব ও ভাষায় যার-যার মতো মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন (ছফা, ২০০৮খ:২১৩)। একটি জাতীয় গণচেতনার প্রশ্নে বঙ্কিম যেখানে সাম্প্রদায়িকতার উপরে যেতে পারেননি, নজরুল সেক্ষেত্রে আশ্চর্য অসাম্প্রদায়িক। দু'জনের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের সর্বমানবতাবাদী দীক্ষার অনির্বাণ আলো।

সুতরাং বাংলাদেশের সাহিত্যাদর্শ, আহমদ ছফার বিশ্লেষণে, একটি উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধারার দিকে প্রবাহিত হয়েছে যাঁর নবীনতম 'আদর্শ নির্মাতা' এবং 'শেষতম শ্রেষ্ঠ কবি' কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল একাধারে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সৈনিক আবার নির্যাতিত গণমানুষের মুক্তিকামী বলিষ্ঠ স্বর। তাই সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য যে আহ্বান বঙ্কিমের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প বলে বিবেচ্য তা নজরুলের ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িকতা বা সকল ধর্মমতের সুসমন্বয়–চেতনায় মুক্তির মশাল জ্বেলে বিপ্লবের ডাক। ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার বিবেচনা করলে নজরুলের দ্বৈততা আছে, দ্বৈধতা নেই।[১১৮] ছফাও 'নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ' প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যাদর্শে নজরুলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত পুথির ভাষা নজরুলের মধ্য দিয়েই ভিন্নরকম পূর্ণতা পেয়েছে। বাংলাভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ মোহিতলাল বা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ছিল প্রকরণ-নিরীক্ষায় চমক সৃষ্টি করা। কিন্তু নজরুলের কাছে এটি ছিল ঐতিহ্যিক-ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধ, তাঁর অস্তিত্বের গভীর থেকে উঠে আসা স্বতঃস্ফূর্ত বাগভঙ্গিমা। তিনি কাব্যভাষা নির্মাণেও মুসলমান রচিত পুথিসাহিত্যের

দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাই নজরুল যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে সৃষ্ট বাংলাভাষার চেয়ে খানিকটা ভিন্ন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী তীরবর্তী জনগণের ভাষার সংযোগ-সমন্বয়ে উদ্ভূত শহর কলকাতার যে ভাষা তা-ই সংবাদপত্র, মুদ্রণযন্ত্র, পাঠ্যপুস্তক এবং প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর চেপে বসতে পেরেছিল বলে মনে করেন ছফা। তবে বাঙালি মনীষীদের অপূর্ব সৃষ্টিশীলতায় এই ভাষাই বিশ্বমানবের স্বীকৃতি অর্জন করে। মুসলমান সমাজের শিক্ষিতজন, কবি-লেখক সকলেই এ ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু এই ভাষার সাথে জনগণের মুখের ভাষার দূরত্ব কখনও ঘোচেনি।

বাংলায় মুসলমান শাসনে বাংলা ভাষার শরীরে যে পরিবর্তন দেখা দেয় পুথিসাহিত্য তার চিহ্ন বহন করছে। এটিকে ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বাঁক হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতগণ এই গতিপথটি সম্পূর্ণ রুদ্ধ করেন, ভাষার শরীর থেকে আরবি-ফারসি শব্দ বর্জন করে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত-অভিমুখী একটি ভাষা হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। এই সচেতন প্রয়াস ভাষার স্বাভাবিক সামাজিক চর্চার পরিপন্থী। কাজী নজরুল ইসলাম অবরুদ্ধ সেই ভাষাকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলে মনে করেন ছফা। নজরুল পুথি লেখেননি, তবে পুথিসাহিত্যের প্রাণের আগুনটুকু গ্রহণ করেছিলেন; তার জীর্ণ কঙ্কাল বহন করেননি। তাই নজরুল সাহিত্যে পুথিসাহিত্যের জীবাশ্ম দৃষ্টিগোচর হলেও সেই ভাষা-কাঠামো খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুথি লেখকেরা বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা উজ্জ্বল করে দেখার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ ভাষারীতি তৈরি করেছিলেন। নজরুল স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী এই মুসলিম সমাজটিকে বাঙালি সমাজেরই অংশ হিসেবে প্রমাণ করার জন্যই ওই ভাষা ব্যবহার করেছিলেন (ছফা, ২০১১:১০৫,১০৬)। নজরুলকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কৃতিত্ব ছফা দিয়েছেন তা-হল– 'নজরুল ইসলাম, ইসলাম ধর্ম এবং বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যবর্তী ঐতিহাসিক ব্যবধানটুকু যথাসম্ভব কমিয়ে আনার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন' (ছফা, ২০১১:৪৭)। বাঙালি মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ, ধর্মচিন্তার সাথে সংস্কৃতিচিন্তার সমন্বয়সাধন না-করতে পারা। ধর্মের মানবতাবাদী চিন্তাধারার চেয়ে অজ্ঞ মোল্লাতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তায় মুসলমান সমাজ আচ্ছন্ন ছিল বেশি। মানবতাকে ভিত্তি করে ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কাজটিও নজরুল সার্থকতার সাথে সম্পন্ন করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যকে গণমানুষের জীবন-সংলগ্ন সাহিত্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস ছফার সাহিত্যভাবনার মূল প্রেরণা। গণসাহিত্যের প্রতি নজরুলের অঙ্গীকারকেও বিপ্লবী ভাবাদর্শের সহায়ক বলে মনে করেন ছফা। বাংলা সাহিত্যে শোষিত, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকা ও সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য রচনার প্রথম চেষ্টা লক্ষ করা যায় নজরুলের বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' গল্পে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় কখনও কখনও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়ে সাহিত্য রচনার আশা ব্যক্ত করলেও তা বাস্তবে রূপ পায়নি। তবে রুশ বিপ্লবের অভিঘাতে বাংলা সাহিত্যেও শোষিতের জন্য সাহিত্য, বিপ্লবের জন্য সাহিত্য, সমাজবদলের জন্য সাহিত্য রচিত হতে থাকে। এই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে স্থান দিলেন সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষদেরকে যারা শুধু পোশাকে সাধারণ নয়, এমনকি কথাও বলে নিজেদের ভাষায়, 'ভদ্রলোকের ব্যবহৃত শুদ্ধ বাংলাভাষায় নয়।' এটিকে বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি বৈপ্লবিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করে ছফা লিখেছেন–

> বাংলা সাহিত্যে ভুখা নাঙ্গা শোষিত মানুষের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার পক্ষে যে একটি নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ধারা সৃষ্টি হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন তার প্রথম পুরোহিত। কিন্তু নজরুল ইসলামের সৃষ্টি দীর্ঘদিন সে পথে প্রবাহিত হয়নি। সে যুগের হাওয়ার মধ্যে এমন কিছু উপাদান ছিল, মার্কসবাদে পুরোপুরি আস্থাশীল নন এমন অনেক কবি-সাহিত্যিক গণজাগরণের পক্ষে কলম ধরেছেন। (ছফা, ২০০৮ছ :৪০০)

তাই সাহিত্যকে সমাজ বদলের বা বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য মার্কসবাদে দীক্ষিত লেখক-শিল্পী গোষ্ঠী যখন সংহত বলয় সৃষ্টি করেছিলেন তাতে নজরুল সরাসরি যুক্ত না থেকেও চিন্তার ঐক্যে ছিলেন একাত্ম। সেসময় আরো অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে মার্কসবাদে অঙ্গীকারাবদ্ধ না থেকেও সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ ও বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। শোষিত মানুষের বেদনার কথা সাহিত্যে তুলে আনতে তারা ছিলেন নিবেদিত।

৪.৩.৪.

প্রথম মহাসমর-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার অনির্দেশ্যতায় শিল্প-সাহিত্যে ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ-অবক্ষয়-বিচ্ছিন্নতা প্রবলভাবে প্রচলিত মূল্যচেতনা ও সৌন্দর্যচিন্তার স্থান দখল করে নিতে থাকে। বাংলাসাহিত্যও এর প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। ইউরোপবাহিত আধুনিকতার পতাকা হাতে আবির্ভূত ত্রিশের কবিকূল বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের অবসান ঘটিয়ে যে আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন তা সর্বাংশে আহমদ ছফার সাহিত্যাদর্শের সমধর্মী নয়। ব্যক্তির পচন-ক্ষয়-বিনষ্টির মধ্যে সমাজের উত্তরণ-সম্ভাবনাকে বিসর্জন দেয়া ছফার সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথে ও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তের চিত্তবৃত্তি ও জীবনাচার বাংলা কবিতায় যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা ছফাকে হতাশ করেছে। এমনিতেই ছফা-মানস মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতি বিরূপ তবে তা কতখানি গভীর তা হুমায়ুন কবির রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *বংলার কাব্য*-এর ছফা-রচিত ভূমিকা থেকে উদ্ধার করা যায়–

> উত্তররৈবিক সাহিত্যে মধ্যবিত্তেরই প্রাধান্য। এ শ্রেণীটির সঙ্গে দেশের মাটির কোন সংযোগ নেই। এ শ্রেণী মানবিক চেতনার বদলে স্নায়ুবিক যন্ত্রণাকেই বেশি দাম দেয়। সহজ স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতির বদলে মধ্যবিত্ত সুলভ নানা প্রবণতার চটকদার মোড়ক নির্মাণেই এ শ্রেণীর সাহিত্য প্রয়াস নিঃশেষিত হয়। সচেতনভাবে যাঁরা অনুভব করেন, তারা মন এবং আবেগের কাছ থেকে সায় পান না। সে কারণে তাদের সাহিত্য বক্তব্যের স্তর থেকে সাহিত্যের ব্যঞ্জনায় কদাচ উন্নিত হয়। সে যুগটি এখনো চলছে বাঙলা-সাহিত্যে। মধ্যবিত্তের বিকৃত ক্ষুধা এবং ততধিক বিকৃত ভোগলালসার বিবরণই হালের বাঙলা-সাহিত্য।
> (ছফা, ২০০৮ছ:৪০৫)

উদ্ধৃতিতে বর্ণিত 'হালের বাংলা সাহিত্য' কালের দিক থেকে ষাট দশকের সাহিত্যধারাকে নির্দেশ করে। পূর্ব বাংলার সাহিত্যে যখন 'পরাবাস্তবতার জ্বর একশ তিন ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে' জাতীয় সাহিত্য গঠনের আশা তখনও ছফা-মানসে দীপ্যমান। এ প্রসঙ্গে ষাটের দশকে ঢাকার সাহিত্যাঙ্গনে আহমদ ছফার আবির্ভাব নিয়ে ফরহাদ মজহারের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে–

> আহমদ ছফা আধুনিক বা স্মার্ট হবার লোভে কাতর হল না। সে টের পেয়ে গিয়েছিল ত্রিশ দশকীয় আধুনিকতা তার সাধনার বিষয় নয়, বরং তার বাসনা বিদ্যাসাগর হবে। বুদ্ধদেব বসুর শার্ল বোদলেয়ার নামক কলকাত্তাইয়া চরিত্রের অনুসরণে বেশ্যাবাড়ি যাওয়া আর মদ খাওয়া ছিল তখন আধুনিকাতা। (ফরহাদ, ২০০৩:৩১৩)

এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের সাহিত্যের আদর্শ নিজেরা গড়ে তোলার স্বপ্ন মুক্তিযুদ্ধের বৈপ্লবিক আঘাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালি জাতির হাজার বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-সম্ভাবনা পরিণত হয় ঐতিহাসিক সত্যে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকদের মন ও মনীষা স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্যেও অপরিবর্তিত আবেগ নিয়ে বিমিশ্র বৌদ্ধিক চর্চায় মিশে গিয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারাকে জাতীয় সাহিত্যের স্রোত থেকে বিযুক্ত করার প্রয়োজনেই জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির কাঠামো গড়ে তোলা আবশ্যক ছিল সে-সময়। স্বাধীন জাতির জন্য স্বাধীন সংস্কৃতি সৃষ্টির আবেগমথিত প্রয়াসে সাহিত্য জগতেও ঘটে নতুনত্বের উদ্বোধন। জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা পুনর্বার উজ্জীবিত হয়, বিশেষ করে সমাজ পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে এ নিয়ে প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। আহমদ ছফা পাকিস্তানবাদী সাহিত্যাদর্শের বিপরীতে বাঙালির জাতীয় সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উচ্চারণ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের আগেই,

স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি একই উৎসাহ নিয়ে জাতীয় সাহিত্যের জন্য সামাজিক প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক নিরীক্ষায় মনোযোগী হন। 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' তাঁর সেই সমাজ-পর্যবেক্ষণের ভাষ্য।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সামাজিক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেই একটি সাংস্কৃতিক জাগরণের সম্ভাবনা স্ফটিকায়িত হচ্ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলাদেশের তৎকালীন সাহিত্যিকদের যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল তাঁরা তা পালন করেননি বলে মনে করেন ছফা। এর কারণ উপমহাদেশের সকল অমীমাংসিত প্রশ্নের উৎসস্থল ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের মধ্যে নিহিত। আমাদের অজানা নয় যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরপরই একটি 'সাংস্কৃতিক এলিট' শ্রেণি সৃষ্টি হতে থাকে। ইসলাম, ইসলামি রাষ্ট্র, মুসলিম জাতীয়তা ইত্যাদি বিষয় রাষ্ট্রীয় দর্শনের সাথে সংগতি বিধান করে মনোহর ভাষাভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করার দক্ষতায় তাদের প্রতিভা ছিল নিয়োজিত। ফলে পশ্চিমা শোষক শ্রেণির পক্ষে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে ভাবতে হয়নি। কিন্তু এদেশের সাধারণ মানুষ ভুল করেনি বলেই তারা ভাষার প্রশ্নে একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এ জাতির প্রাণশক্তিকে চিনিয়ে দিল। কিন্তু এই সংগ্রামের ফলভোগী হলেন আবার সেই কবি-সাহিত্যিকরাই যারা পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতিকে বাংলার ওপর চাপিয়ে দিতে শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে নানা সুবিধা ভোগ করেছিলেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর তাঁরাই যখন দেশের শিল্প-সাহিত্যের শিরোভাগে অভিভাবক হয়ে বসলেন তখন স্বভাবতই সাহিত্যের মাধ্যমে জাতির মানসগঠনের বৈপ্লবিক চিন্তার অপমৃত্যু ঘটল। তিরোহিত হল সাংস্কৃতিক জাগরণের সম্ভাবনাও। এই বন্ধ্যাত্ব যা পাকিস্তানবাদী একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীর নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা ও সচেতন অপচর্চায় পক্ষ বিস্তার করেছিল, কবি-সাহিত্যিক-অধ্যাপক-সাংবাদিকদেরকে গ্রাস করল ব্যাপকভাবে। ছফার ভাষায় 'গর্ভিণী নারীর মত' যাঁরা জাতির গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠার ভ্রূণকণা অন্তর্লোকে ধারণ করেন[১১৯], জাতির ভবিষ্যতকে অঙ্গুলি নির্দেশে পথ দেখান সেই সাহিত্যিকরা যদি মার্কিন দূতাবাসের পছন্দমত সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রচারণার উদ্দেশ্যে রচিত বইয়ের অনুবাদ করে, তাঁদের বিলিয়ে দেয়া ডলার ভাগাভাগি করে নিতে তৎপর থাকেন তাহলে বিপ্লবী সাহিত্যের সম্ভাবনা তো ধুলিস্মাৎ হয়ই উপরন্তু সাহিত্যিকগণও সমাজে অসম্মান-অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়েন। বাংলদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সাহিত্যচর্চায় আত্মস্বার্থের ক্ষুদ্রতায় জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়ার এমন নজির প্রচুর। আহমদ ছফা আরো প্রকটভাবে এদেরকে চিহ্নিত করলেন–

> এটা খুবই দুঃখের কথা যে আমাদের সংস্কৃতির যাঁরা শ্রদ্ধেয় লোক বলে খ্যাত– অনেকেই মার্কিনী অর্থের বিনিময়ে মানসিক দাসত্ব করেছেন এবং তা আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণ-সংগ্রামের বিপক্ষে গেছে। আমেরিকান দূতাবাসের সহজ টাকা না পেলে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মানসিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতেন। তা আমাদের শিল্প-সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মোচন করত। আর অনূদিত বইগুলো মার্কিনীরা জ্ঞান বিতরণের ছল করে স্কুল-কলেজে এবং সাধারণ পাঠাগারসমূহে বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের গণ-সংগ্রাম বিরোধী বই অধিক পাঠের ফলে আমাদের জনগণের চেতনা, চিন্তা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। (ছফা, ২০০৮চ:১৯৯)

আহমদ ছফা তাঁর সাহিত্যবোধের সাথে সমাজ-রাজনীতি একাকার করে সর্বত্র আবিষ্কার করলেন এক গভীর ক্ষত। দেখলেন কীভাবে রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্রমশ পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষকে ফাঁকি দিয়ে ভোটযুদ্ধ জয় এবং অধ্যাপক-লেখক-সাংবাদিকের বিলাস-বিনোদনের কক্ষপথে আবর্তিত হতে থাকল। এসময় সামরিক-শাসক আইয়ুব খান বুদ্ধিজীবীদের আলাদা একটি শ্রেণি তৈরি করলেন যারা বাড়ি-গাড়ি, বেতন বা আর্থিক সুবিধা, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদির বিনিময়ে আত্মবিক্রয়ের পথে প্রলুব্ধ হলেন অথবা করতে বাধ্য হলেন। আইয়ুব খান সবক্ষেত্রেই একশ্রেণির সুবিধাবাদী শিক্ষক-লেখক-সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রেণি গড়ে তুললেন যাঁদের চিন্তাশীলতা ও প্রগতিশীল ভূমিকার প্রতি দেশের মানুষ আস্থা পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁরা ক্রমাগত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে আত্মোন্নয়নের সৌধ গড়ে তুলেছিলেন। প্রেস ট্রাস্ট, ফিচার সিন্ডিকেট, লেখক সংঘ ইত্যাদি নামের চক্রান্তে দাউদ পুরস্কার, আদমজী পুরস্কার, ন্যাশনাল ব্যাংক বা হাবীব ব্যাংক পুরস্কার নামের বিক্রয়মূল্যে নির্ধারিত হত আনুগত্য ও পদলেহনের মাত্রা। আহমদ ছফার মতে এভাবে 'লেখক সংঘ, বিএনআর, রেডিও, টেলিভিশন

ইত্যাদির মাধ্যমে কতিপয় ব্যক্তি যে শুধু নষ্ট হয়েছে তা নয়– এসবের মাধ্যমে আইয়ুব খান একটি যুগের বিবেককে হত্যা করেছে, চিন্তাকে কলুষিত করেছে। তরুণ সমাজের সামনে শ্রদ্ধা করার মতো কোন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তখন ছিল না...। কাউকে শ্রদ্ধা করতে না পারা যে কত বড় অভিশাপ একমাত্র ভুক্তভোগীই উপলব্ধি করতে পারেন' (ছফা, ২০০৮চ:২০৪)। অর্থাৎ সাহিত্যের মাধ্যমে যখন মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে সমগ্র জাতির মানসিক নৈকট্য স্থাপিত হওয়ার কথা, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে মানবতা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর কথা তখন সাহিত্য জাতির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হওয়ার পরিবর্তে কণ্ঠরোধ করেছিল। যে কবি-সাহিত্যিক-শিক্ষকদের দায়িত্ব ছিল বিশ্ববাসীর কাছে জাতির সম্ভাবনা ও ভবিষ্যতকে বিমুগ্ধ কল্পনার বর্ণিল আলোকচ্ছটায় বা স্বপ্নময় আগামির রঙীন চিত্রপটে তুলে ধরা, তারাই নিতান্ত সুবিধাভোগীর কাতারে গিয়ে ছফার ভাষায় 'মুখে স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু করেছেন উল্টো' এমনকি যে-মার্কিনিদের টাকায় বাংলাদেশে গণহত্যার গুলি কেনা হচ্ছিল সেই টাকায় বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত ছিলেন (ছফা, ২০০৮চ:২০৬)।

বাঙালি জাতির সামনে সুযোগ এসেছিল তাঁর পরিচয়-চিহ্ন থেকে পরাধীনতা ও ঔপনিবেশিকতার সমস্ত ক্ষতকে মুছে ফেলার। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাগ্রে। সাহিত্যেও স্বাধীন দেশের শক্ত-সমর্থ নীতি ও আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন আশা করা হয়েছিল। প্রয়োজন ছিল রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে নতুন সেতুবন্ধ রচনা করে সমাজকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা। আহমদ ছফা আশা করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শের ভিত্তিতে সমাজের সকল ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যেও একটি বিপ্লবীচেতনার অঙ্কুরোদ্গম ও প্রসার ঘটবে। কারণ তা না হলে পুরনো ধ্যান-ধারণাকে সমূলে উৎপাটন সম্ভব নয়। এটাকে রেনেসাঁর সামাজিক পশ্চাদভূমিও বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁও এভাবেই সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে শিক্ষিতশ্রেণির বিদ্রোহরূপে দেখা দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এই জাগরণের প্রতিফলন এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এই রেনেসাঁর মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে নতুন মূল্যচিন্তা তথা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রসার লাভ করেছিল তা বলা যায় না। ফলে সাহিত্যের অভাবনীয় সাফল্য একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মুষ্টিবদ্ধ সাফল্য হয়েই রইল বলে ছফা মনে করেন। সেই সাফল্যও আবার বৃটিশ-নির্দেশিত পথেই অর্জিত এবং তাতে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি–

> হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের মনে তাঁদের ভাবধারা সমানভাবে প্রেরণা জাগানোর কথা দূরে থাকুক, শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বমানুষকেও জ্ঞানের ভোজে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আহ্বান করতে পুরোপুরি ধর্ম বহির্ভূত হলেও তার চেহারাটি ধর্মীয় এবং আকারটি সাম্প্রদায়িক। সুতরাং বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁকে বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের নব জাগরণ বলা নানাদিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত। রামমোহন রায়ের শিষ্যদের মধ্যে কেউ নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলেন সত্যি সত্যি, সে রকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-বিস্তার এবং সমাজ-সংস্কার প্রয়াস তাঁর আপন গণ্ডির মধ্যেই সীমিত ছিল। (ছফা, ২০০৮চ:২১২)

অবশ্য ছফা স্বীকার করেন যে, রিভাইভালিজম, রেনেসাঁ, জাগরণ[১২০] যা-ই বলা হোক না কেন, এর ফলে বাঙালি মনীষার বুর্জোয়া মানবতাবাদে উত্তরণ সহজতর হয়েছিল– যার চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অসম্পূর্ণ রেনেসাঁর অন্তত দেড়শ বছর পর, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে একটি মুক্ত পরিবেশে মুক্ত চিন্তার আনুকূল্যে বাঙালিরা আশা করতে পারে যে, বাংলাদেশের সাহিত্য তার নিজস্ব পরিচয়ে গড়ে উঠবে, সকল শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদহীন নতুন সমাজ সৃজনের লক্ষ্যে। অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান কবিয়ালের মুখে *ময়মনসিংহ গীতিকা* বা *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* যেমন আবৃত্ত হয়েছে তেমনি *মনসামঙ্গল* ও সাধারণের মনোরঞ্জন করেছে। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা না-পেলেও জীবনের গভীর থেকে উঠে এসেছে বলে

এগুলো আজো হৃদস্পন্দনে ভরপুর, মানুষের ভালবাসা আর মুগ্ধতায় আবৃত। এমন সাহিত্যই পারে সাংস্কৃতিক জাগরণকে সম্ভাব্য করে তুলতে। জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কহীন বা মানুষের বৃত্তি বা জীবনাভিজ্ঞতার সমীপবর্তী নয় এমন সাহিত্য কখনো সমাজতান্ত্রিক আদর্শ-লালিত সমাজ বিনির্মাণে সাহায্য করতে পারে না। কেবল কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্য রচনা করা সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ কোনো সাহিত্যিকের লক্ষ্য হতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নবগঠিত সমাজের সাহিত্য বাংলার চিরকালের বিদ্রোহী-আত্মাকে ধারণ করতে পারত যদি জাগ্রত চিত্ত লেখক-কবি জাতির সংগ্রাম ও সাধনাকে আবেগে ধারণ করতে পারতেন। প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছে বাংলা সাহিত্য। বাংলার সাহিত্যের যাঁরা মনীষী, বিশ্ববিশ্রুত তাঁরা সামাজিক আন্দোলনকেই সাহিত্যে উপজীব্য করেছিলেন। আমাদের সাহিতের প্রাণ তাই বিদ্রোহের মধ্যে–
‘বাঙালির প্রথম প্রামাণ্য ছন্দোবদ্ধ বাণী বৈদিক নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় বদ্ধমতের বিরুদ্ধে সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের নতুন জীবনবোধের প্রেরণাময় ধ্বনি। তেমনি সামাজিক বিদ্রোহ মুখিয়ে তুলেছে বৈষ্ণব গীতিকার প্রেমময় আর্তি। ‘ময়মনসিংহ গীতিকা’, ‘মঙ্গলকাব্য’ সর্বত্র– বিদ্রোহ এক সমাজ আদর্শের বদলে আরেক সমাজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিদ্রোহ তাবৎ বাঙালির শিল্প সৃজনলোকে রক্তবাহী শিরার মত প্রসারিত’ (ছফা, ২০০৮চ:২২০)। আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে প্রচলিত সমাজ, ধর্ম এবং লোকাচারের বিরোধিতা করেই। রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত এইসব নাম একঝাঁক বিদ্রোহীর জীবনালেখ্যই আমাদের মানসপটে প্রতিবিম্বিত করে। এঁদের প্রত্যেকের সাহিত্যই প্রতিবাদের ভাষারূপ–

> বাংলার গৌরবময় সাহিত্য স্রষ্টাদের সৃষ্টি থেকে যদি সামাজিক বিদ্রোহ, নতুন মানবিক মূল্যমান প্রতিষ্ঠার বিদ্রোহ আলাদা করে ফেলা হয় তাহলে কি বাংলাভাষা বিশ্বের সমৃদ্ধ ভাববাহী ভাষাপুঞ্জের আসন থেকে রাতারাতি প্রাদেশিক ভাষা হয়ে দাঁড়ায় না? রামমোহনের ধর্মীয় এবং সামাজিক মতবাদ ছাড়া তাঁর সাহিত্যের কতটুকু মূল্য? বিদ্যাসাগরের সৃষ্টিকর্ম থেকে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ছেঁকে আলাদা করে যদি ফেলা হয়, তাহলে তো তিনি টোলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে দাঁড়ান। রামমোহনের ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্লব বাদ দিলে অমন সূর্য-সঙ্কাশ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের গর্ব বাঙালি কিভাবে করত? ভারতের জাতীয় আন্দোলনের জান দেয়া-নেয়ার মহৎ খেলা এবং রুশ-বিপ্লবের অভিনব জঙ্গী মানবতার ডাকাতিয়া বাঁশির ডাকেই তো কাজী নজরুলের কণ্ঠ নিনাদিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় যে তীব্র আবেগ বিচ্ছুরিত হয়েছে, যে কূল ছাপানো ভালবাসা লহরিত হয়েছে তা কি প্রচলিত সমাজকে ভেঙে-চুরে নতুন করে বানানোর, নতুন মানব সম্বন্ধ রচনার ঐকান্তিক হার্দ্য প্রয়াস নয়? (ছফা, ২০০৮চ:২২০)

বাঙালি মুসলমানের জন্য আদর্শায়িত জাতীয় সাহিত্যের শিকড় প্রোথিত বাংলাদেশের পলল-মৃত্তিকায়। ভারত-বিভক্তির আগেই এ সত্য উপলব্ধি করে বাংলা সাহিত্যকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিবঙ্গের ভূ-রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশের ভিন্নতা ও গুরুত্বে বিবেচনা করার চিন্তাসূত্র স্থাপন করেছিলেন হুমায়ুন কবির ‘বাঙলার কাব্য’ গ্রন্থে। তার সমর্থনে আহমদ ছফা লিখেছেন–

> পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জীবনচেতনা, বৈরী নিসর্গই কাব্যের শরীরকে অধ্যাত্মবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছে– পক্ষান্তরে পশ্চিম-বাঙলার প্রকৃতির মধ্যে যে জীবনভোলানো মায়া-মরীচিকা তা কাব্যের প্রাণেও মাখিয়ে দিয়েছে অতীন্দ্রিয়তার আমেজ। (ছফা, ২০০৮ছ:৪০৪)

বস্তুত ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সাহিত্যচর্চা বিবেচনার যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি *বাঙলার কাব্য*-এ পাওয়া যায়, তা ছফার চিন্তাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। তিনিও বাংলাদেশের সাহিত্যাদর্শ নিরূপণে বাঙালির মানসালোকের ঐতিহাসিক বিবর্তনধারা এবং সামাজিক সম্পর্কসূত্র থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-নজরুলসাহিত্য মূল্যায়নে আমরা ছফার এমন দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ পাই যা আরও স্পষ্ট গভীর হয়েছে ‘নতুন করে তিতাস পাঠ’ প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে আহমদ ছফা পূর্ববর্তী ধারার সাথে যুক্ত করেছেন বাংলাদেশের প্রাচীন কৌমসমাজের গভীর থেকে উঠে আসা মানুষ ও সমাজের জীবনচিত্র অবলম্বনে

রচিত *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসকে। শুধু এ অঞ্চল মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতিই নয়, ভাষারীতিকেও শিল্পিতভাবে প্রয়োগ সম্ভব তা অদ্বৈত মল্লবর্মণ সার্থকতার সঙ্গে প্রমাণ করছেন।

৪.৩.৫

বাঙালি মুসলমান কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আধুনিক জীবনদৃষ্টি বাঙালি মুসলমান সমাজের যত গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল তা অভিনব হলেও ছফা মনে করেন যে, বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় তাঁর লেখায় গুরুত্ব পায়নি। ফলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সামগ্রিকভাবে একটি ভূ-খণ্ডের সমাজজীবনের রূপকার হতে পারেননি। তাছাড়া তাঁর রচনার প্রত্যক্ষতার অভাবকেও চিহ্নিত করেছেন ছফা। সেদিক বিবেচনায় বাঙালি-বাংলাদেশের ভূমি ও জীবনব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এদেশের মানুষের জীবনধারার পরিচয়বাহী কোনো সাহিত্যকর্মকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে হলে অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের নাম আসে সর্বাগ্রে। ওয়ালীউল্লাহ্‌ এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ ভিন্নভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যে উন্মুক্ত-পর্যালোচনা (ডিসকোর্স[১২১]) নির্মাণ করেছেন তাকে একসূত্রে সংগ্রথিত করলে এ-অঞ্চলের তথা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের চালচিত্র পাওয়া যায়। বস্তুত আহমদ ছফা দুজনের রচনারীতি ও জীবনদৃষ্টির তুলনা করে বাংলা উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যের সমালোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিসকোর্স বা পর্যালোচনা উন্মুক্ত করেছেন, তা-হল, বাংলাদেশের সমাজ-বিবর্তনে শ্রেণি-বিভাজনের উত্থান ও সামন্তসমাজের ভেতরের ভাঙা-গড়ার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কসূত্র। প্রান্তিক পেশাজীবী ও গণমানুষের জীবনাচারকে সাহিত্যের মাধ্যমে বাস্তবতার নিরিখে তুলে ধরার মার্কসবাদী সাহিত্যবিচার পদ্ধতিতে একই ভাবে 'প্রতিটি শ্রেণির শিল্পদর্শন স্বতন্ত্র' বিবেচনা করা হয়।[১২২] বরাবরই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্যাতিত কৃষক-শ্রমিক-মজুরের শ্রেণিসংগ্রামকেই এই ভূখণ্ডের মানুষের ঐতিহাসিক বাস্তবতা বলে মনে করেন আহমদ ছফা। তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর চেয়ে অদ্বৈতমল্ল বর্মণকেই বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্যধারার স্রষ্টা মনে করেন তিনি। ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে অপ্রত্যক্ষতা এবং বাস্তবানুগ চরিত্রের অভাবের অভিযোগ করেন ছফা। এই তুলনা-প্রতিতুলনা গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, বাঙালি মুসলমানের উপন্যাসচর্চায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্থান বিশিষ্ট। কিন্তু ছফা এক্ষেত্রে যুগপৎ বাংলাদেশের ও বাংলা ভাষার সাহিত্যসম্ভারকে বিবেচনায় নিয়েছেন, জাতীয় সাহিত্যের সর্বজনীনতার বিচারে। সাহিত্যের গুণগত উৎকর্ষ বিচার না করে সামাজিক নির্যাস যাচাই করাই এক্ষেত্রে ছফার বিবেচনাকে প্রভাবিত করেছে বলা যায়। তাই, এ বিচারে, ওয়ালীউল্লাহ্‌-অদ্বৈতের মতো ইলিয়াসও এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও ইলিয়াসের তুলনা-প্রতিতুলনায় ইতিহাস ও সমাজের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ছফা । এর কারণ *খোয়াবনামা*-র সময়কাল ও বাংলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের প্রেরণা-পুস্তক বলে কথিত বঙ্কিমের *আনন্দমঠ* এর সময়কাল একই শুধু নয়, আধুনিক বাঙালি জাতির বিকাশের জন্যও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর, ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল। ইংরেজের হাতে তখন রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা, দেশ শাসনের প্রশাসনিক ক্ষমতায় ঠুঁটো জগন্নাথ নবাব-জমিদারগণ, খরা-অনাবৃষ্টিতে যেবছর ব্যাপক ফসলহানি হয়েছিল সেবছরই কোম্পানী রাজস্ব আদায় করেছিল সর্বোচ্চ। ফলাফল, দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল এক তৃতীয়াংশ মানুষ। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা স্পৃহা ও প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাসে ফকির মজনু শাহ ও সন্ন্যাসী ভবানী পাঠক পরিচালিত অনন্য বিদ্রোহের সময়ও এটি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের সত্যকে উপেক্ষা করে এই বিদ্রোহ থেকে ফকির মজনু শাহকে বাদ দিয়ে রচনা করলেন *আনন্দমঠ*। ইতিহাসে কী ঘটে গেছে এই চিন্তার চেয়ে ভবিষ্যতে তিনি কী প্রতিষ্ঠা করতে চান সেটাই বঙ্কিমের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছিল বলে মনে করেন ছফা। কিন্তু

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বঙ্কিমের এই অনবধান থেকে বেরিয়ে ইতিহাসের পরম্পরাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই লিখলেন *খোয়াবনামা*।

উপন্যাসকে 'সোশ্যাল ডিসকোর্স' আখ্যা দিয়ে ঔপন্যাসিকের কর্তব্য সম্পর্কে ছফার অভিমত– 'যে সমাজে মানুষ বাস করে সে সমাজের মানুষ যে পরস্পরের সঙ্গে চিকন-মোটা নানারকম সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ সেই সম্পর্কগুলো যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করাই হল উপন্যাস লেখকের আসল কাজ' (ছফা, ২০০৮ছ:১৯৪)। বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও অধিকারকে সামাজিক সত্যে রূপায়িত করার গৌরব বঙ্কিম নিতে পারেননি। তাই ছফা একে 'ফলস ডিসকোর্স' আখ্যা দিয়ে ইলিয়াসকেই এই গৌরবময় সামাজিক 'ডিসকোর্স' রচনার কৃতিত্ব দিতে চান। এ জন্য বিভিন্ন মুসলমানি পুথি থেকে আয়ত্ত করে একটি স্বকীয় ভাষারীতিও নির্মাণ করেছিলেন ইলিয়াস। ইংরেজ শাসনামলের পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ 'জোর করে যাবনী-মিশাল শব্দ বাংলাভাষা থেকে খেদিয়ে বিদায় করে সেই ফাঁক সংস্কৃত শব্দ দিয়ে পূরণ করতে তৎপর হয়ে উঠলেন' (ছফা, ২০০৮ছ:১৯৬)।[১২৩] ছফা মনে করেন, পুথির ভাষাকে কথাসাহিত্যের সাথে সমন্বিত করার মাধ্যমে একটি 'ভাষাভিত্তিক ডিসকোর্স'ও ইলিয়াস তৈরি করেছিলেন। তাছাড়া খোয়াবনামা উপন্যাসের মাধ্যমে একটি নতুন 'রাজনৈতিক ডিসকোর্স' নির্মাণের চেষ্টার কথাও বলেছেন ছফা যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তেভাগা-আন্দোলনকে প্রতীক ধরে হিন্দু-মুসলমান-জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে শোষিতের ঐক্যের মাধ্যমে একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের সম্ভাবনা যে-রাজনৈতিক অঙ্গীকারে পূরণযোগ্য সে দিকেই ইলিয়াসের দুর্বলতা। এতে হয়তো অবজেক্টিভিটি বা প্রত্যক্ষতা ক্ষুণ্ন হয়ে ইচ্ছা পূরণের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু মহৎ সাহিত্যে এমন উদাহরণ বিরল নয়। তাছাড়া 'ভদ্র শ্রেণির লোকদের মেকী ভণিতা কিংবা দারিদ্র্যবিলাস অথবা রাজনৈতিক তাগিদে বানিয়ে তোলা কোন কাহিনী' রচনা যিনি করেন না তিনিই প্রকৃতপক্ষে সমাজজীবনের অকৃত্রিম রূপকার (ছফা, ২০০৮ছ:১৯১)।

৪.৩.৬

'সাহিত্যের সবগুলো মাধ্যমের মধ্যে একমাত্র কবিতাই হল সবচাইতে স্পর্শকাতর' এবং 'ভয়ঙ্কর জিনিস' আর 'প্রাণে কবিতার বীজ প্রবিষ্ট হলে অবশ্যই কবিতা লিখতে হয়' (ছফা, ২০১১:২১৫)। চারটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে আহমদ ছফার কবিতাকে মনে করেন 'ইস্পাতের গুণ' বিশিষ্ট শিল্প। শব্দের জন্মান্তর ঘটিয়ে নিজের একক ভাবনার সঙ্গে জাতি ও বৈশ্বিক ভাবনার সংযোগসাধন করে সার্থক ও মহৎ কবিতা লিখিত হয় (ছফা, ২০০৮গ :২৪৫)। কিন্তু বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের 'ভাবের ঘরে চুরি করার' ফাঁকি তাঁর মনোযোগ এড়ায়নি। উপরন্তু সেই ফাঁকির গহ্বর চিহ্নিত করতে নিজেই কবিতা চর্চায় মনোনিবেশ করেন। যদিও ক্যাব্যসংগ্রহের 'ভূমিকা'য় দাবি করেছেন তিনি কবিযশপ্রার্থী কখনও ছিলেন না (ছফা, ২০১১:২১৫,২১৬)। ত্রিশের পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কবিদের সমাজবাস্তবতার প্রতি উদাসীনতা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে 'এলিট-মাস দূরত্ব' সৃষ্টি করেছিল তা চূড়ান্ত বিচারে বাংলা সাহিত্যের জন্য ইতিবাচক হয়নি বলেই ছফা মনে করেন।[১২৪] তাই স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্যাদর্শে নজরুল-জীবনানন্দ-জসীমউদ্‌দীন-বাহিত কবিতাধারাকেই তিনি বরণীয় মনে করতেন। জটিল-দুর্বোধ্য কবিতার চেয়ে, বাংলার মাটি ও মানুষের সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গিই ছফার প্রিয়। সহজ-সরল প্রকাশ এবং আমাদের সমাজজীবনের মর্মমূল থেকে উঠে আসার কারণে আব্বাস উদ্‌দীনের গান, জয়নুলের চিত্রকলা এবং বুলবুল চৌধুরীর নৃত্যকলাকেও ছফা গণমানুষের জীবনপ্রণালী থেকেই উদ্ভূত বলে মনে করেন। আবার এ-ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে–

> ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের মানসে কর্ষণে ঘর্ষণে এবং অনুশীলনে যে জীবনবোধের উন্মেষ এবং বিকাশ, এঁদের অবস্থান তার চাইতে অনেক দূরে। বুদ্ধির চাইতে আবেগ, চিন্তার চাইতে সংবেদনা, রীতির চাইতে স্বতঃস্ফূর্ততার দোলা, অনুশীলনের চাইতে সহজ প্রকাশের প্রবণতা এদের অনেক গুণে বেশি। (ছফা, ২০০৮ক:১৫৯)

এক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের নায়ক বা নায়িকার দ্রাবিড়ীয় সৌন্দর্যের মধ্যে ভারতচন্দ্র বা কালিদাসের কাব্যের নায়িকার সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যাবে না, 'এ সৌন্দর্য বিচারের নয় বোধ করার, বাইরের নয় ভেতরের। এ তর্ক করার নয় মেনে নেয়ার। ... এ সুন্দর সুন্দরীরা শুরু থেকে আমাদের ইতিহাস আলো করেছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। আমাদের উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত, কোন ঔপনিবেশিক শক্তির সহায়তা যারা কস্মিনকালেও করেনি অথচ ঔপনিবেশিকতার যাঁতাকলে হাজার হাজার বছর ধরে পিষ্ট হয়ে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুন্দর পেলব বৈশিষ্ট্যসমূহকে অনাদর করতে শিক্ষা করেছে, জসীম উদ্‌দীনের কবিতা তার প্রথম শিল্পিত প্রতিবাদ' (ছফা, ২০০৮ক:১৬১)। তাঁর শক্তি অনুশীলিত বা পরিশীলিত সৌন্দর্যের প্রকাশে নয়, স্বতঃস্ফূর্ততার সহজ সৌন্দর্যে, কবিতায় আঙ্গিকের চেয়ে ভাবের দ্যোতনা ছফার আরাধ্য।

উপন্যাসের মতো কবিতা-সমালোচনার ক্ষেত্রেও ছফা তুলনামূলক বিচারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। জীবনানন্দের কবিতায় লোকজ শব্দের ব্যবহারকে জসীমউদ্‌দীনের কবিতার সাথে তুলনা করে ছফার ভাষ্য– জসীমউদ্‌দীনের তুলনায় জীবনানন্দের প্রখর ইতিহাসবোধ, নির্মোহ বিজ্ঞান দৃষ্টি ছিল। জসীমউদ্‌দীন ঐতিহ্যগতভাবে যে লোকজ শব্দাবলী পেয়েছেন তা-ই নির্মোহ সারল্যে কবিতায় তুলে এনেছেন, মননের শক্তিতে তাতে বিশ্বব্যাপিতা দিতে পারেননি। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ লোকজ ঐতিহ্যে আধুনিক চৈতন্যস্রোত প্রবাহিত করেছেন। যেমন *রূপসী বাংলা* কাব্যগ্রন্থে লোক-কৃষ্টি, লোক-ঐতিহ্য, লোক-ভাষা ব্যবহার করলেও এর কাব্যিক চেতনা ও প্রাণটি আধুনিক জীবনবোধজারিত। এ কাব্যে তিনি যে নিসর্গের জগতে বিচরণ করেছেন তাতে তিনি বসবাস করেন কিন্তু 'চেনা জগতকেও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, নিসর্গের পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে প্রসারমানতা দিতে দিতে একেবারে ধূসর কুয়াশার জগতে' নিয়ে গেছেন তিনি শুধু তাই নয় এর সাথে ইতিহাসকে যুক্ত করে তাতে গভীর প্রবহমানতা দিয়েছেন (ছফা, ২০০৮খ:২২৭)। তবে জীবনানন্দ দাশ যেখানে বিপ্লবের সহযোদ্ধা সেখানেই ত্রিশের বুদ্ধি-শাসিত কবিদের তুলনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য, তাঁর প্রতি ছফার সমর্থনও সেখানে–

> কোন প্রচলিত লোকবিশ্বাস অসংশয়ে তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না, কোন হুজুগে মেতে উঠার যোগ্যতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। কোন প্রবল সংস্কারের সপক্ষে বিপক্ষে কোনও পক্ষে দাঁড়াবার মত মানসিকতা তাঁর ছিল না। তিরিশের যুগের কাব্যিক চেতনার সাধারণ লক্ষণ কি সংস্কার ভেদে নতুন সংস্কার নির্মাণ। স্বভাবজ কারণেই তাতে গা ঢেলে দিতে তিনি অপারগ ছিলেন। এর বিপরীতে একটা পথ ছিল– সেটা বিপ্লবের–। (ছফা, ২০০৮খ:২২৭)

এ বিপ্লব সমাজে ও জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ক্রমাগত নতুনত্বের ব্যঞ্জনাতে আস্থা রেখে তা রূপায়ণের বিপ্লব। জীবনানন্দ সেই বিপ্লবের পথে হাঁটতে গিয়েই হয়েছেন লোক-ঐতিহ্যবিহারী। কারণ তাতে কৃত্রিমতা নেই। তিনি ইতিহাসাশ্রয়ী কারণ তা মানুষকে সত্য শিক্ষা দেয়, মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি। পরিবর্তমান ও বিকাশমান পৃথিবীর যাবতীয় ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে কবিতাকে তিনি প্রতিস্থাপিত করেছেন। তাই জীবনানন্দ দাশ 'অনুভবের কবি'। এ সম্পর্কে আহমদ ছফার এক ভিন্নধর্মী বিশ্লেষণ–

> যে নিসর্গ তিনি অনুভবে ধরতে চেয়েছেন কবি স্বয়ং তার মধ্যে বাস করেছেন, যে ইতিহাসবোধ সহানুভূতির স্পর্শে জীবন্ত করেছেন তা তাঁর আপন মাতৃভূমির ইতিহাস। এই ইতিহাসের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে সম্পৃক্তিও অতি নিবিড় ও অতি গভীর। (ছফা, ২০০৮খ:২২৮)

আহমদ ছফার জীবনানন্দ-বিশ্লেষণ এক ভিন্নতর তাৎপর্যে উন্নীত। তাঁর মতে, বাংলাদেশের গণ-যুদ্ধে জীবনানন্দের কোমল মানসসন্তানের দামাল হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে জাতি এক নতুন অনুভবের মুখোমুখি হয়েছিল। যে রূপসী বাংলা কবির চিন্ময় জগতের আর্কেডিয়ার মতো স্বর্গের দীপ্তিতে প্রকাশমান তা তিনি কৃষিভিত্তিক জনপদের ইতিহাস

খুঁড়ে বের করেছেন; তাকেই যেন রূপ দিতে, গড়ে তুলতে জীবনপণ সংগ্রামে নেমেছিল সেই স্বপ্নাভিলাষী সন্তানেরা। ছফা মনে করেন–

> তাঁর অনুভূতি লোকশ্রুত সোনার বাংলার জগত থেকে স্বকালের ঘাটে আছড়ে পড়েছে। এই অনুভূতি এই বোধ তাঁকে বাংলাদেশে নতুন পরিচয়ে চিহ্নিত করেছে। এই অকৃত্রিম অনুভূতির গুণেই তাঁর বেদনার কোমল সন্তান বাংলাদেশের গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। (ছফা, ২০০৮খ:২২৯)

এই দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নতর এবং অভিনবও বটে। জীবনানন্দ-সমালোচকদের প্রচল অভিধায় একান্তই বেদনাবোধের কবি, নির্জনতার কবি বা অনুভবের কবি জীবনানন্দ দাশকে তিনি বিচার করেছেন বাংলাদেশের গণসংগ্রামের প্রক্ষেপে– বিজ্ঞান ও দার্শনিক প্রতীতি যাঁর কবিতাকে আধুনিক চৈতন্য দান করেছে; যিনি কবিতার সাফল্য-ব্যর্থতার চেয়ে জীবনের গভীর অনুভবকে নির্লিপ্ত প্রকাশে মগ্ন ছিলেন।[১২৫]

৪.৩.৭

ছফা রাজনীতি করতে চেয়েছিলেন, একসময় রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, মানুষের সেবা করার লক্ষ্যে। জীবনের অন্তিম সময়গুলোতেও দূরে থাকতে পারেননি রাজনীতির ভাবনা থেকে। এ বিষয়ে তার মন্ময় ভাবচিন্তনের শব্দরূপ 'সাহিত্য ও রাজনীতি' প্রবন্ধ। ছফার ভাষায় রাজনীতি ও সাহিত্যের মিল-অমিল–

> ভেতর থেকে হয়ে ওঠ এটাই সাহিত্যের দাবি। সাহিত্য নির্দেশ দেয় না। ভেতরে একটা প্রণোদনার সৃষ্টি করে। কিন্তু রাজনীতিকে নির্দেশ দিতে হয়, এটা কর, ওটা কর। নির্দেশ দিতে না পারলে রাজনীতি চলে না। সাহিত্যের ব্যাপারে নির্দেশ অচল। কোন অবস্থাতেই নির্দেশ দিয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। (ছফা, ২০০৮ছ:৪২৩)

রাজনীতির ধারাবাহিকতা না থাকলে সমাজ টিকে থাকতে পারে না। অন্যদিকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে সাহিত্যের প্রয়োজন নেই কিন্তু সাহিত্য মানুষের মন ও চিন্তার স্বাধীনতা চর্চার পথ প্রসারিত করে বলেই মানুষের মানুষী সত্তার পরিচয় গড়ে তুলতে পারে–

> সাহিত্য এবং রাজনীতি উভয়ের মৌল উৎস মানুষ। মানুষ হলেও সাধনার পদ্ধতি ভিন্নরকম। রাজনীতি নির্দেশ দেয়, মান্য করতে বাধ্য করে। অনেক সময় স্বাধীনতা হরণ করে। সাহিত্য ভেতর থেকে প্রাণিত করে, মানবিকতার বোধটি প্রশস্থ করে, স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার বোধটি চাঙ্গা করে তোলে এবং কোন রকমের বাধ্য-বাধকতার বিরোধিতা করে। (ছফা, ২০০৮ছ:৪২৫)

কিন্তু সাহিত্য ও রাজনীতির সম্পর্ক বৈরী নয়। রাজনীতির সাথে সম্পর্ক ছাড়াই যেমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে আবার রাজনীতির সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেও উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এমন উদাহরণও ইতিহাসে আছে। আবার ইতিহাসে এমন সময়ও পাওয়া যায় যখন রাজনীতি ও সাহিত্য সময়ের প্রয়োজনে একই অভীষ্ট লক্ষ্যে যাত্রা করেছে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে। সাহিত্য প্রথার দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তির কথা গভীর বিশ্বাসের সাথে বলে যায়, রাজনীতি প্রথার দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তির পথে চালিত করতে পারলেও আরেক প্রথায় মানুষেকে বেঁধে ফেলে। মানুষ তার জীবন ধারণের উপায় সহজ করার জন্য পদ্ধতি নির্মাণ করে, কিন্তু তার অন্ত্য-সত্তা কখনো পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না। রাজনীতি মগ্ন থাকে সাম্প্রতিকতার মধ্যে কিন্তু সাহিত্য অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। কলুষতা, অশুদ্ধতা এবং গরলতা এসবের মধ্যেও সাহিত্যকে নিষ্কলুষ বিশুদ্ধতার কথা বলতে হয়, ছড়াতে হয় অমৃত। চিন্তার স্বাধীনতায় প্রহরীর ভূমিকা পালন করাই সাহিত্যিকের কাজ। এভাবে ছফা-মানসে সাহিত্য ও রাজনীতির এক পরিপূর্ণ মেলবন্ধন ঘটেছে বলে আমরা মনে করি। নতুন প্রজন্মের সাহিত্যিকদের মধ্যেও এই সচেতনতা প্রত্যাশা করেন তিনি কারণ 'নতুন প্রজন্মের মধ্যে পলিটিক্যাল ডেসটিনি না থাকলে, পলিটিক্যাল গোল ক্লিয়ার না থাকলে, শিল্প-সাহিত্য তার প্রধান ভিকটিম হয়' (ছফা, ২০০৮জ:৪২০)। আরও

প্রত্যাশা করেন সাহিত্যে দেশ ও দেশের জনগণের জীবনপ্রবাহের প্রতিফলন।সেখান থেকে প্রাণরস আহরণ না করলে সাহিত্যে সজীবতা আসে না।

আহমদ ছফা বাঙালি মুসলমানের সামষ্টিক চৈতন্যকে সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেন। সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ একসূত্রে গাঁথা এবং অবিচ্ছেদ্য। বাংলা সাহিত্যের সর্বজনীন মানবিক ঐতিহ্যের সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে ছফা পৌঁছে যান প্রাচীন বাংলার ভূমিপুত্রদের মুখে উচ্চারিত চর্যাপদ, বৈষ্ণবগীতি, কবীরের দোঁহা, লালনের পদে। বাঙালির সাহিত্যচর্চার সঙ্গে এই ধারার সমবায়ী সংবেদনে জন্ম নিয়েছে উদার মানবতাবাদী ধারার। কিন্তু বুর্জোয়া-মুৎসুদ্দি নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তের চাপে ক্রমাগত তার বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে আপোষকামিতার পথ বেছে নেয়ায় বাংলার লোকায়ত সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের সংস্কারমূলক চৈতন্যে নাড়া দিতে পারেনি। বিপরীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাবে ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে গড়ে ওঠে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি। এই নতুন সাহিত্যের জন্য যে নতুন ভাষাকাঠামোর প্রয়োজন হয়েছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির বিপুল অংশগ্রহণে তা সংস্কৃতানুসারী বাংলার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সুনিশ্চিতভাবে, বাঙালি মুসলমানদের এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকাই ছিল না। অবশ্য বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণ ছাড়া আধুনিক সাহিত্যের যে বীজতলা তৈরি হয়েছিল তার সমান্তরালে মুসলমানের পশ্চাৎপদ, অবিকশিত ও অকেলাসিত আবেগনির্ভর পুথি সাহিত্যের কদর কোনো অংশে কম ছিল না। যদিও তা শিল্পমান ও গুণবিচারে বাঙালি হিন্দু-রচিত সাহিত্যের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি।[১২৬] তবু এর মধ্যেই পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যসোপানের প্রকৃত পরিচয় নিহিত বলে মনে করেন ছফা অবশ্য তিনি পুথি সাহিত্যের ভাষা গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন মূলত ভাষিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য, আদর্শিক বিবেচনায় নয়। তাঁর মতে, এটি বাঙালি মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যসন্ধানের প্রথম সচেতন প্রয়াস।

উনিশ শতকে বাঙালির রেনেসাঁ বলে খ্যাত কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বুদ্ধিবৃত্তিক নবজাগরণকে ছফা খুব সীমিতভাবে বাঙালি হিন্দুর জাগরণ বা 'হিন্দু রিভাইভালিজম'বলে চিহ্নিত করেছেন।[১২৭] অবশ্য ছফা স্বীকার করেন যে, এই জাগরণের ফলে বাঙালি মনীষার বুর্জোয়া মানবতাবাদে উত্তরণ সহজতর হয়েছিল যার চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনায়। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অবদান স্বীকার করেও মুসলমান-সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা আরও অনেক সমালোচকের মতো ছফাকেও ব্যথিত করেছিল।[১২৮] তাঁর সামন্ত-স্বভাব সম্পর্কেও ছফা সন্দেহমুক্ত হতে পারেননি। অন্যদিকে রবীন্দ্র-অনুরাগীদের একদেশদর্শিতাকে উপহাস করেছেন– 'রবীন্দ্রনাথ অর্ধেক গাঁজা, অহিফেন, অর্ধেক বিপ্লব। ... রবীন্দ্রনাথ অর্ধেক শান্তি, ভগবান, জীবনদেবতা, ফুল, চাঁদ, পাখি ইত্যাদি নিয়ে লিখেছেন। অর্ধেক লিখেছেন ঐ শান্তি ভঙ্গকারীদের নিয়ে। অর্থাৎ যারা খেতে পায় না, কাজ পায় না, সংসারে বোঝা হয়ে থাকে, তাই বিপ্লব খুঁজে বেড়ায়' (ছফা, ২০০৮ছ:৩৪১)। এমতাবস্থায় নিরন্ন সর্বহারা, শ্রমজীবী মানুষ, বিদ্রোহ, বিপ্লব এসবের মধ্যে যাদের বাস কিংবা যারা এই শ্রেণির প্রতিনিধি তাদেরকে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে না দেয়ার মধ্যেই মধ্যবিত্ত চেতনার অহং। এটি আলোচনায় প্রাধান্য পায় না বলেই রবীন্দ্র-প্রভাববলয় থেকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে গড়ে ওঠা ত্রিশের সাহিত্যচর্চাও কৃত্রিমতা-বর্জিত নয় বলে ছফাকে আকর্ষণ করেনি (ছফা, ২০০৮গ:৩৫৯)। জীবনানন্দ দাশের 'মর্বিডিটি'[১২৯], মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহির্জগতে-মনোজগতে বিশ্বাসের দ্বৈরথ[১৩০], সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেবের ব্যক্তিসর্বস্বতা ও অবক্ষয়চর্চা বিপ্লবী সাহিত্যাদর্শে অগ্রহণযোগ্য, একটি শোষণমুক্ত, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী চেতনাসমৃদ্ধ জাতীয় সাহিত্যের জন্য অকার্যকর; সুতরাং ছফার কাছেও অনাদৃত। একই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *আনন্দমঠ* উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উপনিবেশ-বিরোধী যে জাতীয়তার বীজ বপন করেছিলেন আহমদ ছফা তাকে ভ্রান্ত এবং খণ্ডিতই শুধু বলেননি, তাঁর বিবেচনায় ইতিহাসের এই বিকৃতি বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটিয়েছেন। *খোয়াবনামা* উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে আবার ঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়া আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রতি তার অনুরাগ তাই

সহযোদ্ধাপ্রতিম। আহমদ ছফা সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য যে সাহিত্যাদর্শের রূপরেখা অঙ্কণ করেছেন তা সমাজের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবনাচার, সংগ্রাম ও সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত; যে গভীরতায় মানুষের জীবিকা ও জীবনধারনের উপায়সমূহ সুকুমার বৃত্তির সাথে অত্যাবশ্যকীয় সম্পর্ক অনুযায়ী নিরূপিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষকে, তার মাধ্যমে বৃহত্তর বাঙালি জাতিকে অতঃপর বিশ্বমানবকে ইতিহাস থেকে তুলে এনে শক্তসমর্থ মেরুদণ্ডের ওপর ঋজু ভঙ্গিমা দিতেই ছফার সর্বাত্মক চেষ্টা;[১৩১] সাহিত্যকে খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনাভিজ্ঞতার সন্নিকটে নিয়ে যাওয়াই তাঁর অভীষ্ট। এই মানদণ্ডে জয়নুলের আবহমান বাংলার কৃষক পূর্ণতা পায় এস.এম. সুলতানের কৃষকের পেশির সাথে মাটির সঙ্গমে[১৩২], রাজসভার ধ্রুপদ-সঙ্গীত সাধারণ মানুষের কাতারে মিশে যায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গীতসাধনার মাধ্যমে[১৩৩]; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শাস্ত্রানুগত বাঙালির তুলনায় গভীরতা পায় দীনেশচন্দ্র সেনের প্রেমধর্মে আবৃত লোকায়ত বাঙালি।[১৩৪]

৪.৩.৮

মার্কসবাদ বিপ্লবের সহায়ক শক্তি হিসেবে সাহিত্যের গণসম্পৃক্ততা ও সামাজিক উপযোগিতা বিচার করে। মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিকগণ বলেন সর্বহারার সাহিত্যের কথা—ছফা বরাবরই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের তথা কৃষকশ্রেণির জন্য সাহিত্য রচনার কথাই বলেছেন। তাছাড়া সাহিত্যের সাথে সমাজের সম্পর্ক, সমাজের প্রতি সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতা, সমাজপরিবর্তনের সাহিত্যের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় মার্কসবাদী সাহিত্যসমালোচকের বিবেচনা করতে হয় বিধায় তাকে হতে হয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নিবিড় অনুসারী। আহমদ ছফা ইতিহাস ও সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্টস্থানীয় লেখকদেরকে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর চিন্তায় বৈপ্লবিক সাহিত্য ও জাতীয় সাহিত্য যুগপৎ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সাহিত্যকে প্রকার এবং প্রকরণে বাঁধলে সৃজনশীলতার স্বতঃস্ফূর্ত গতিবেগ স্তিমিত হয়। তাই শিল্পী ও সাহিত্য উভয়কেই হতে হবে স্বাধীন। ছফা এমন এক 'স্বাধীন সাহিত্য'[১৩৫] চেয়েছিলেন যা জাতীয় সংস্কৃতির মুক্তি অর্জনে সাহায্য করতে পারে, কলকাতার ভাষা-সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত থেকে বিকশিত হতে পারে, এমনকি বাংলাদেশের ক্ষমতাকেন্দ্রিক যাবতীয় দুষ্কৃতি ও নির্লজ্জ সুবিধাবাদকে উপেক্ষা করতে পারে।

মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক গিওর্গি লুকাচকে উদ্ধৃত করে সাঈদ-উর রহমান জানাচ্ছেন, যথার্থ বাস্তববাদী রচনার তিনটি বিশেষত্ব– 'বস্তুজগতের বিশ্বস্ত উপস্থাপনা, জীবনসংগ্রামের মাধ্যমে রচিত মানবিক বাস্তব জগতের প্রতিফলন এবং সে-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানব প্রকৃতির যে-নতুন সত্য উদ্ভাসিত হয়–তার পরিচর্যা।'[১৩৬] সুতরাং শুধু বস্তুর প্রতিফলন নয় সত্যের উদ্ভাসও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক বা সাহিত্যসমালোচক সবসময় বিষয়কেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তথাপি আধার বা আঙ্গিকের শৈলীকে অবমূল্যায়ন করেন না। কারণ সমাজবাস্তবতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বস্তুভারাক্রান্ত রচনা সৃষ্টি করাও সাহিত্যিকের লক্ষ্য নয়। তার সাথে কল্পনার সমস্বত্ব মিশ্রণ না হলে বুদ্ধির সাথে আবেগের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। মাওৎ সে তুং যেমন বলেছেন– 'আমাদের দাবি হচ্ছে রাজনীতি ও শিল্পকলার একতা, বিষয় ও আঙ্গিকের একতা, বিপ্লবী রাজনৈতিক বক্তব্য ও শিল্পরূপের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ খুঁতহীনতার একত্ব। রাজনৈতিকভাবে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, শিল্পগুণবিহীন রচনার কোন শক্তি নেই।'[১৩৭] – অনেকটা এরকমই ছফার আদর্শ। সাহিত্য বিবেচনায় তিনিও রাজনীতি ও শিল্পকলার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। ব্যক্তি বা সমাজের বিকাশের মধ্যে মার্কসবাদের তত্ত্ব সন্ধান না করে সেটিকে ব্যবহার করেছেন উপকরণ হিসেবে। সহজ ভাষায় সাধারণের বোধগম্য যুক্তিতে গণসাহিত্যের ভাবাদর্শই প্রকাশ করেছেন তিনি। সাহিত্যের বিষয় যেখানে গণমানুষ বা সমাজের মঙ্গলচিন্তা থেকে দূরে সেখানে আঙ্গিকের চমৎকারিত্ব ছফাকে আকর্ষণ করে না। বিষয় অনুযায়ী আঙ্গিক নির্ধারিত হওয়াই মহৎসাহিত্যের লক্ষণ। তবে মহৎ সাহিত্যের

'প্রাণশক্তি' 'রহস্যময় শক্তি' 'মাগফেরাত' যাই বলা হোক না কেন, মায়াবাদী এক ক্ষমতায় ছফার গভীর আস্থা ছিল,[১৩৮] আস্থা ছিল সাহিত্যের ইস্পাত-গুণের[১৩৯] ওপর। তাই ছফার সাহিত্যভাবনা আবহমান বাংলার প্রতিবাদ-সংগ্রামমুখর জনতার স্বাধীন জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ; প্রগতিশীল, মানববাদী ও সামগ্রিকতা-সন্ধানী; একান্তভাবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের শিকড়সংলগ্ন।

৪.৪

আহমদ ছফার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যভাবনা আবর্তিত হয়েছে নির্যাতিত ও অত্যাচারিত মানুষের কল্যাণ চিন্তাকে কেন্দ্র করে। তাঁর পুরো রাজনীতি-ভাবনা, জীবনাচরণ ও কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁকে মূল্যায়ন বা উপস্থাপন করা অসংগত যা ছফার জ্ঞানভাষ্য[১৪০] অনুধাবনের জন্য বিভ্রান্তিকরও হতে পারে। এই বিপদের কারণ সম্পর্কে ফরহাদ মজহারের যুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ–

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা এবং একটি জনগোষ্ঠীর বিকাশের সমস্যা তিনি [আহমদ ছফা] নানাদিক থেকে ভেবেছেন। সেই ভাবনার মধ্যে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সৃষ্টিশীল ও প্রায়োগিক দুটো দিকই তাঁর মন অধিকার করে রাখত। তাঁর রচনা মাত্রই রাজনৈতিক। সেটা উপন্যাসই হোক, কিম্বা হোক কবিতা বা প্রবন্ধ। সাহিত্যিক শখে তিনি *ফাউস্ট* অনুবাদ করতে বসেননি। গ্যেটে তাঁর রচনা দিয়ে একটি ভাবুক কিন্তু সুশৃঙ্খল জাতির বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই প্রকার ভবিষ্যৎ নির্মাণের বাসনা আহমদ ছফার মধ্যে ষোলো আনা বর্তমান ছিল। কী করে এই বাসনাকে তিনি নিজের জীবনাচরণে ও লেখালিখিতে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন ? কী ছিল আমদের 'জাতি' ভাবনা?, রাষ্ট্রচিন্তা? 'বাঙালি মুসলমান' নামক ধারণাটির অর্থ ও তাৎপর্য কী? এমন নয় যে এইসব প্রশ্নের উত্তর ছফা দিয়ে ফেলেছেন, তাঁকে কোট করলেই ল্যাঠা চুকে। এইসকল নানান প্রশ্ন আমাদের ভবিষ্যতে ভাবাবে। ফলে তাঁর নাম আশ্রয় করে আমাদের ঝোলায় আরও অনেক সংগ্রহ বাড়তে থাকবে। অনেক ঝাড়াপোঁছার কাজ এখনও বাকি আছে আমাদের। তাঁর গৌরব এখানেই যে তিনি এমন একটা অবস্থা তৈরি করে দিয়ে গেছেন যে এইসকল প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে আমাদের আর গত্যন্তর নেই। (ফরহাদ, ২০০৩:৩০৮)

সমাজের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত শ্রমজীবী অসহায় মানুষদের জীবনমান উন্নয়ন ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে জীবনের অন্যতম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে ছফা রাজনীতি আর সাহিত্যচর্চার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। কারণ উভয়ের প্রাণরস নিহিত মানুষের মানবীয় চেতনা ও সমাজের সুষম বিকাশের মধ্যে। শোষণের বিপক্ষে যেখানেই গণমানুষের সম্ভাবনা সেখানেই ছফার উচ্চকিত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। প্রতিবাদ যার প্রবণতা, বিপ্লবী মতবাদ যাকে আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে জাতীয়তাবাদী বলা যায় না, অথচ ছফা জাতীয়তাবাদেরই সৃষ্টি; সেখানেই লালিত কিন্তু জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার প্রতি সজাগ বলেই প্রতিস্পর্ধী। বরং মার্কসবাদী সমাজবিপ্লবই হোক বা ধর্মীয় ফরায়েজি-ওয়াহাবি আন্দোলনই হোক, সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতি-শোষকের অস্তিত্ববিনাশী শক্তিমত্তা ছফার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। নব্বইয়ের দশকে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে ছফা পুরোদস্তুর বুর্জোয়া অর্থনীতি ও রেনেসাঁসের সমর্থক হয়েও, এমনকি বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্ভব বললেও, সমাজে 'বিপ্লবের প্রয়োজন কখনও বাসি হয় না' এ বিশ্বাস থেকে কখনও সরে আসেননি কারণ বিপ্লবের জন্য মার্কসবাদী হওয়া অপরিবহার্য নয় বলেই তার অভিমত। মার্কসবাদী ট্রটস্কির মতো মূলধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মত-পথ তিনি সমর্থন করতেন। তাঁর গুরু প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাককে যেমন তিনি 'ট্রটস্কিয়াইট এম্যাং দ্য মুসলিম লীগারস' অভিধায় ভূষিত করতেন (ছফা, ২০০৮ক:২০২) আহমদ ছফাকেও একইভাবে 'ট্রটস্কিয়াইট এম্যাং দ্য কমিউনিস্ট' বলা যায়। কমিউনিজম থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন[১৪১], তার মতের সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল, কিন্তু তাতে আত্মসমর্পণ করেননি কখনও কারণ 'ভাত খাও-ঘুরো-ফিরো, কিন্তু কথা বলতে পারবা না' নীতি ছফার পছন্দ নয়– তিনি বাধামুক্ত স্বাধীন কামনার সন্তান (ছফা, ২০০৮ঙ:৪১৯)। কবীর-লালনের বাউল মতকে পরাজিতের দর্শন মনে করলেও এতে তাঁর গভীর আত্মনিয়োগ ছিল, কিন্তু তাতে 'শুয়ে থাকা'ও ছিল স্বভাব-

বিরোধী (ছফা, ২০০৮গ:৩৩২)। বার্ট্রান্ড রাসেলের সংশয়বাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, সবকিছু উল্টে-পাল্টে দেখা ও বিনাপ্রশ্নে মেনে না নেয়ার বিজ্ঞান-চেতনা তিনি সেখান থেকে অর্জন করেছেন কিন্তু জীবনের গভীরতর তাৎপর্য নিরূপণে রাসেল তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে ছফা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিলেন গ্যেটের জীবনদর্শন দ্বারা। গ্যেটের মধ্যে মানবতা, ধর্মচিন্তায় সর্বজনীনতাবোধ, মরমী চেতনা, প্রাচ্যের সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ এবং গঙ্গা-যমুনার ধারার মতো প্রাচ্য-পাশ্চাত্য যৌথ সংস্কৃতিপ্রবাহ-চেতনা ছফাকে অনুপ্রাণিত করেছে বিশ্বপরিসরে ভাবতে। তবে সবকিছুর উর্ধ্বে মনে রাখা প্রয়োজন, পাশ্চাত্য জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি ছফার কোনো মোহমুগ্ধতা ছিল না। কেবল নিজের সমাজ ও সময়ের জ্ঞানপর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করতে তিনি পাশ্চাত্য চেতনাবিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন। মানুষকে ভালবাসার মধ্যে, অপরের মুক্তির মধ্যে, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের মধ্যে 'সৃষ্টির লবণ'এর মতো মিশে থাকায় অথবা 'ক্ষুধার্তের মুখে রুটি'র[১৪২] মতো আত্মার তৃপ্তির কাজে লাগা যায়– 'সকলের মধ্যে আমি আছি আমার মধ্যে সকলে আছে' এমনভাবনার মধ্যেই ছফা জীবনের তাৎপর্য খুঁজে পান। এই জীবনদর্শনে ভাববাদের প্রচ্ছায়া থাকলেও বৈরাগ্য নেই। মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতার সাথে ধর্মীয় অধ্যাত্মচেতনার সাংগীতিক সমন্বয়ে মুগ্ধ হয়ে মাইজভাণ্ডারী তরিকায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন ছফা (আরেফীন, ২০০৪:১৩)। প্রকৃতপক্ষে, ছফা কোনো মতবাদ বা আদর্শের মধ্যে নিজকে গণ্ডীবদ্ধ রাখেননি; সবকিছু অতিক্রম করে তিনি বিদ্রোহী আপন কক্ষপথ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, যে কোনো বদ্ধমতের বিরুদ্ধে। তিনি নিজেই বলেন –'কোন ইজম আমার কাছে গ্রাহ্য নয়, প্রতিবাদ হচ্ছে আমার প্রবণতা' (ছফা, ২০০৮ঙ:৪২০)।

বাঙালি মুসলমানের সংগ্রামী ও প্রতিবাদী স্বভাবকে তার অন্যতম সম্পদ মনে করে একটি আত্ম-নির্ভরশীল জাতি পরিচয়ে গর্বিত হতে পারাই ছফার সকল ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে। ছফার আমৃত্যু বিশ্বাস ছিল বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবোধই পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মূল প্রেরণা, তাই স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে জীবনের শেষাবধি, সামগ্রিক অর্থে বাঙালির চেয়ে সাম্প্রদায়িক অর্থে বাঙালি মুসলমানের স্বাজাত্যবোধকেই ছফা অধিকতর প্রক্ষেপিত করেছেন। নির্যাতিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে মূলস্রোত ধরে সেই সংগ্রামে বিজয়ী বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে তিনি অভিমত দিয়েছিলেন, 'বাঙালির জাতির প্রধান ধারা আমরাই ধারণ করছি' (ছফা, ২০০৮গ:৩৭১)। আবার তাঁর প্রিয় বাঙালি মুসলমান সমাজের সামষ্টিক চৈতন্যের নানা দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে সেসব নিয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হতেন না ছফা। বাঙালির শিল্প-সাহিত্যচর্চা, রাজনীতি ও সামাজিকতার গভীর থেকে আহৃত বোধ তাঁকে শিখিয়েছে, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংগ্রামী জীবনচেতনাই সার্থকভাবে বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত; সমাজের ভেতর থেকে প্রতিবাদের সংস্কৃতি গড়ে না উঠলে সাংস্কৃতিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়[১৪৩]।

আহমদ ছফা জাতির মর্মমূল স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন, তাতে ব্যর্থ হলেও তার একটা আলাদা মূল্য আছে বলে মনে করেন ছফা, কারণ– মামুলি সার্থকতার চাইতে মহৎ ব্যর্থতার মূল্য অনেক বেশি (ছফা, ২০০৮গ : ৩৫৩)। তাই জীবনব্যাপী গৃহিত অজস্র সামাজিক উদ্যোগ ও কর্মসূচি অস্থির সামাজিক ও ব্যক্তিক টানাপোড়েনে পরিণতিসম্ভাবী না হলেও আহমদ ছফা হতোদ্যম হতে জানতেন না। ছফা এক অক্লান্ত ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মী; একই সাথে নিরলস উদ্যোগী সমাজকর্মী এবং সার্বক্ষণিক সংস্কৃতিসেবী। পারিবারিক জীবনের সাথে ব্যক্তিজীবন ও জীবিকার সমন্বয়হীনতা তাঁকে কখনও মানসিক সুস্থিরতা দেয়নি। অথচ সমকালের চিন্তাজগতে বিশেষত তারুণ্যের বৈপ্লবিক চেতনায় আহমদ ছফা ছিলেন এক তীব্র উদ্দীপনার উৎস। একথা লিখলে অত্যুক্তি হয় না যে, জাতির মর্মমূল সন্ধানের অভিযান সুনিশ্চিতভাবে একটি প্রতিক্রিয়াপ্রবণ-যাত্রা যা বহু গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। তবে এই প্রতিক্রিয়া সবক্ষেত্রে অন্ধ-তামসিকতা বা অনগ্রসরতায় ফিরে যাবার তৎপরতা নয়, যাকে ছফা বলেছেন 'সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার অংশ' সেরকম। তিনি আত্মপরিচয়ের মর্মমূলকে পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো কিংবা বৃটিশ শাসনের মৃত্তিকাস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক ঐতিহাসিক নির্যাতিত জাতিগোষ্ঠীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষার

বিশালতায় স্থাপন করেছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই উপনিবেশ-বাহিত তিরিশি আধুনিকতা অথবা বাঙালি মুসলমানের প্রগতিচিন্তার প্রথম জোটবদ্ধ বহিঃপ্রকাশ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' জ্ঞানচিন্তাও তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা-কেন্দ্রিক বর্ণ-হিন্দু মধ্যবিত্তের জ্ঞান-জাগরণ, ছফার শব্দে যা 'হিন্দু রিভাইভালিজম', তা-থেকে নির্যাতিত বাঙালি মুসলমান এমনকি নিম্নবর্ণের বাঙালি হিন্দুর চিন্তাচেতনাও যে ঐতিহাসিক-সামাজিক অবস্থানের প্রতিক্রিয়াশীলতায় পৃথক বিবেচিত হতে বাধ্য তা আহমদ ছফার চেয়ে এতটা স্পষ্ট করে কেউ চিহ্নিত করেনি। পুঁথি সাহিত্যিকদের প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের যে প্রতিক্রিয়াশীলতা উন্মোচন করেন তা থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও মুক্ত নন। আহমদ ছফার অধিকাংশ প্রবন্ধই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াজাত, তাঁর ভাষায়, 'মুভমেন্টের ইমপালস'[১৪৪] থেকে উত্তেজনার বশে একটানা লিখিত। তাঁর 'বাঙালি মুসলমানের মন', 'বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র', 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' রচনার উদাহরণ টেনে ড. সাঈদ-উর রহমানও একথা উল্লেখ করেছেন, তবে ছফার মানসিক অস্থিরতা, উদ্দেশ্যহীন বিক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যেও এক গভীর সংগতি আবিষ্কার করেছেন তিনি, লিখেছেন –

> ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশেও নবজাগরণের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। ক্ষমতাসীনরা সৃষ্টিশীল, দূরদর্শী নেতৃত্ব দিতে পারলে সীমিত আকারেও নবজন্মকে সার্থক করে তোলা যেত এদেশে। বিচ্ছিন্নভাবে কতগুলো মানুষ নববসন্তের অগ্রদূত কোকিলের কুহুরব শুনতে পেরে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন আহমদ ছফা। তাঁর স্বভাবের চিরন্তন ছটফটানি, অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য, সর্বগ্রাসী উন্মুখ মনোভাব সহস্র কিশলয় মেলেছিল নববসন্তের দূতের আগমনে। (সাঈদ, ২০০৩:৭৪,৭৫)

আহমদ ছফার অধিকাংশ লেখা সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত বলেই উদ্দেশ্যমূলক। কোনো-না কোনো প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে রচিত এবং প্রতিক্রিয়ামুখ্য। অনেক বিষয় সম্পর্কে ভিন্নমত, বিতর্ক, প্রতিক্রিয়া আজও চলছে– প্রতিষ্ঠিত বিতর্ক বা জ্ঞানভাষ্য তো রয়েছেই। যেমন– বাংলাভাষার প্রমিতায়ন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা, ফারাক্কা নিয়ে রাজনীতি, ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক, পার্বত্য শান্তিচুক্তি, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিস্তার, জাতীয়তাবাদ– ইত্যাদি জিজ্ঞাসা বা বিতর্ক রীতিমত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছফার প্রবন্ধে বিশেষত ভারত, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ অনুষঙ্গের পৌনপুনিক ব্যবহার এই ধারার আলোচনায় প্রতিক্রিয়াশীলতার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। রাজনীতির ময়দান, মুক্তিযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা, আন্তর্জাতিক কূটনীতি, আঞ্চলিক-বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, নদী, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাঁধ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, উপজাতি সংকট, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বইমেলা এমনকি মুরগির ডিম, রসগোল্লাসহ সকল প্রসঙ্গে কোনো না-কোনোভাবে হয় আওয়ামী লীগ নয়তো ভারতকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন ছফা। এই প্রতিক্রিয়াশীলতা কখনও কখনও ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্রতি মৃদু সমর্থনের ইঙ্গিতও দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ছফা 'মোল্লা-মাওলানাদের ক্ষেপিয়ে তোলা'র ব্যাপারে বিভিন্ন লেখায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ করে যারা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, মৌলবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার তাদের তীব্র সমালোচনা পাওয়া যায় ছফার লেখায়। কারণ ছফা যুক্তির চাষাবাদকেই মৌলবাদকে পরাজিত করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা মনে করতেন– বক্তৃতা-বিবৃতি নয়। অথচ মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার-কল্পে উভয়ের মুখোমুখি অবস্থানের ফলে সৃষ্ট বিতর্ককে ছফা বিজ্ঞানের পক্ষে 'বেহুদা উল্টা-পাল্টা' বিতর্ক মনে করেন (ছফা, ২০০৮ছ:৩৭২)। ড. আহমদ শরীফকে ছফা অনুরোধ করেছিলেন মোল্লা-মাওলানাদের 'বকাবকি' না করতে; এই দেশের মূল সমস্যা তারা নয় এমন যুক্তি দিয়ে (ছফা, ২০০৮ঘ:২২৫)। আবার শওকত ওসমানকে তিনি পছন্দ করতেন না ঐ 'বেহুদা মুসলিম সমাজের উপর আঘাত করার একটি অযৌক্তিক প্রবণতা'র জন্য (ছফা, ২০০৮ঘ:১৬০)। মোট কথা, ধর্মীয় মৌলবাদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় ছফা তাঁর অনেক লেখাতেই বিরক্তি ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও এই পদ্ধতি সংস্কারের ব্যাপারে মাদ্রাসার ভেতর থেকেই পরিবর্তনের তাগিদের বিকল্প নেই বলে মনে করতেন ছফা। শুধু তাই নয়, মাদ্রাসা শিক্ষার যে সাম্রাজবাদ-বিরোধী ঐতিহ্য রয়েছে তাকে সামাজিক বিপ্লবের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তিও মনে করতেন তিনি [১৪৫]।

ইসলামকে বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের প্রতিবাদ করাই ছিল ছফার অবস্থান। বাংলাদেশে একশত ভাগ মুসলমান থাকলেও সেক্যুলার বাংলদেশের চ্যালেঞ্জ তিনি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বাঙালি মুসলমানের সামনে। আবার 'মুসলিম বাংলা'র সমর্থকদের ব্যাপারেও প্রসন্ন তিনি ছিলেন না কখনও। সেক্যুলার বাংলা আর মুসলিম বাংলার বিরোধ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন বলেই শেখ মুজিবর রহমান নিহত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি স্বাধীনতা-বিরোধী ও দক্ষিণপন্থীদের কক্ষপথে চলে যাওয়া নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ছিল বরাবর। নব্বইয়ের পর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জামায়াত-এ ইসলামির অনুপ্রবেশের কারণে ছফার এই উদ্বেগ আশঙ্কায় রূপ নেয়। কিন্তু আহমদ ছফার এসব অবস্থান ও চিন্তাকে দুই বিরোধীগোষ্ঠীই যার যার পক্ষে টানার চেষ্টা করেছেন এবং কোনো কোনো রাজনীতি বিশ্লেষক সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন, কেউ হয়তো মৌলবাদকেই ছফার দার্শনিক পরিণতি বলে রায় দিয়েছেন। ছফার এই জ্ঞানভাষ্যের সবচেয়ে উদ্বেগজনক ব্যবহার হল, 'কোনো কোনো লেখকের কাছে আহমদ ছফাও টেম্পোরারি হাইড আউট। অচিরেই তাঁরা স্বরূপে আবির্ভূত হবেন এবং আহমদ ছফার সেক্যুলার বাংলাদেশের স্বপ্ন তছনছ করে দেবেন' (ইমতিয়ার, ২০০৩:৩৫২) এমন আশঙ্কা বা সুযোগ নেই তা নিশ্চিত করা যায় না।

বাঙালি পরিচয়ের মাহাত্ম্য এবং তজ্জাত 'ইউটোপিয়া'র কথা উচ্চারণ করেও ছফা ধর্ম-সাম্প্রদায়িক পরিচয়কেই এগিয়ে রাখতে উৎসাহী। বাঙালিকে বাঙালি পরিচয়েই বাঁচতে হবে অন্য কোনো পরিচয় নয়– এটা অনিবার্যতা, কিন্তু বাঙালি হওয়ার চেষ্টা অথবা মুসলমান পরিচয় 'খুঁচিয়ে বের করা'র প্রয়াস উভয়ই বর্জনীয়; বাংলাদেশে 'ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন রাজনীতির ভবিষ্যত নেই' এমন উপপত্তি যেমন ছফার রচনায় পাওয়া যায় আবার মুক্তিযুদ্ধকে জাতির মা হিসেবে আখ্যা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া বাঙালি জাতির অস্তিত্ব নেই এবং মুক্তিযুদ্ধ কোনো ধর্মীয় পরিচয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না এমন বক্তব্যও ছফার রচনা ও সাক্ষাৎকারে দুর্লভ নয়। আবার 'একটি সেক্যুলার সমাজ ছফার কাঙ্ক্ষিত হলেও মুসলমান-হিন্দুর সাংস্কৃতিক দূরত্বকে ঐতিহাসিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তিনি; 'দেশে একজন হিন্দু না থাকলেও সাম্প্রাদায়িক মোল্লাদের নিয়ে আমরা বাঁচতে পারব না' বলে সাফ জানিয়ে দেন। যদিও ছফা নিজেকে মনে করতেন একই সঙ্গে বাঙালি ও মুসলমান, তবে মুসলমান পরিচয়টিকে যতটা না ধর্মীয় তার চেয়ে বেশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থে ব্যবহার করতেন বলে মনে করেন মোরশেদ শফিউল হাসান (মোরশেদ, ২০০২:৫৩)। নিজের সম্প্রদায়কে 'ওউন' করার যুক্তি দিলেও আত্মপরিচয় অন্বেষণের সূত্রে এই প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদ্ধাবন ছফা-চিন্তাকে বাউল ও সুফি-দর্শন থেকে আরো পেছনে বুদ্ধের বাণী পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়। ধর্মীয় ভাববিশ্বের মধ্যে বৈষ্ণব-বাউল-সুফি মতবাদের আত্মতত্ত্ব-অন্বেষা তাঁর চিন্তার জগত নিয়ন্ত্রণ করেছে। বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ তত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি এতটাই আপ্লুত ছিলেন যে একসময় বৌদ্ধও হতে চেয়েছিলেন। মোট কথা যা কিছু মানুষের মনকে পরিশুদ্ধ করে, সুন্দরের চেতনায় উদ্ভাসিত করে চিন্তাকে করে ঊর্ধ্বমুখী তাঁর মধ্যেই তিনি আশ্রয় খুঁজেছেন।[১৪৬]

নিজেকে পুরোপুরি সাত্ত্বিক মনে না করলেও আহমদ ছফা নিষ্কাম কর্মের মধ্যেই আনন্দময়তা খুঁজে পেতেন । কিন্তু তাই বলে অহিংসনীতি ছফার নয়, কারণ ছফা মনেপ্রাণে বিপ্লবে আস্থাশীল। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা তাঁর তরুণ বিপ্লবী বন্ধুদের মতো 'শ্রেণিসংগ্রাম সত্য, হিংসা বাস্তব' এই নীতি তাঁকেও চালিত করেছে নির্যাতিতের পক্ষে শোষকের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ানোর সংগ্রামে। ফরহাদ মজহার এ সম্পর্কে যথার্থ লিখেছেন–

> গান্ধীর কাছ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিগুলো 'অহিংসবাদ' গ্রহণ করেছে। আহমদ ছফা গ্রহণ করেছে তার প্রায়োগিক তাৎপর্য। কার্ল মার্কসের কাছ থেকে বিপ্লবীরা 'হিংসা ইতিহাসের ধাত্রী' এই শিক্ষাটাই গ্রহণ করেছে, কিন্তু ছফা গ্রহণ করেছে মার্কসের মানবেতিহাসের আনন্দময় প্রতিশ্রুতি। (ফরহাদ, ২০০৩:৩০৯-১০)

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছফা সন্ধান করছিলেন আরও নিবিড় অনুষঙ্গ, আরও গভীর তাৎপর্য— বাঙালির কৌমসমাজের মর্মমূল থেকে জাত প্রেমধর্ম। সমাজের ভেতর যা-কিছু থেকে মানবতা, মানবপ্রেম, প্রেমধর্ম বিচ্ছুরিত হয় তাতেই আহমদ ছফার আগ্রহ। তাঁর প্রবন্ধ বা উপন্যাস থেকে এই সারার্থ সহজেই উদ্ধার করা যায়, কথোপকথনে আরও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে সে কথা – 'নিজের ব্যক্তিগত দর্শন বলতে আমি বুঝি মানুষকে ভালবাসা। ... রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে, ম্যাকসিমাম মানুষ যেন তার সবটুকু অধিকার উপভোগ করতে পারে' (ছফা, ২০০৮গ:৩৯৫)। এই অনড় বিশ্বাস থেকেই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন পরিবার-পরিজনসহ অমানবিক অবহেলা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়নের শিকার ফররুখ আহমেদ ও হুমায়ুন আহমেদকে সহায়তা করার জন্য, লেখক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের মৌনতার বিরুদ্ধে একাই প্রতিবাদের উচ্চকণ্ঠ বংশীবাদক হতে। শেষ উপন্যাস *পুষ্প, বৃক্ষ ও বিহঙ্গপুরাণ*-এ ছফার উপলব্ধি এক সামগ্রিক জীবনদর্শনে উপনীত, এর শেষ অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক–

> মানুষের মতো কর্তব্য পালন করার জন্য আমার মানুষের কাছে ফিরে না গিয়ে উপায় কী? আমি বৃক্ষ নয়, পাখি নয়, মানুষ। ভালো হোক, মন্দ হোক, আনন্দের হোক, বেদনার হোক আমাকে মানুষের মতো মানুষের সমাজে মনুষ্যজীবনই যাপন করতে হবে। মনুষ্যলীলার করুণ রঙ্গভূমিতে আমাকে নেমে আসতে হবে। তথাপি আমার জীবন আমি একেবারে অর্থহীন মনে করিনে। আমার প্রাণে পুষ্পের আঘ্রাণ লেগেছে, জীবনের একেবারে মধ্যবিন্দুতে বৃক্ষজীবনের চলা অচলায় ছন্দদোলা গভীরভাবে বেজেছে; বিহঙ্গ জীবনের গতিমান স্পন্দন বারবার আমার চিন্তা চেতনা অসীমের অভিমুখে ধাবমান করেছে। এই পুষ্প, এই বৃক্ষ-তরুলতা, এই বিহঙ্গ আমার জীবন এমন কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছে, আমার মধ্যে কোনো একাকীত্ব, কোনো বিচ্ছিন্নতা আমি অনুভব করতে পারিনে। সকলে আমার মধ্যে আছে, আমি সকলের মধ্যে রয়েছি।
> (ছফা, ২০০৮খ:৮৪)

উত্তর-উপনিবেশী জ্ঞানপর্যালোচনায় অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে মূলানুসন্ধী চিন্তা ও সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধী ঐতিহ্যসূত্রের। এক্ষেত্রে ছফার চিন্তার সাযুজ্য ও সম্পর্ক নিরূপণে ফরাসি উপনিবেশিত তাত্ত্বিক ও বিপ্লবী ফ্রান্জ ফানোঁ উল্লেখিত কতিপয় বাস্তবতা ও কর্তব্য-জ্ঞানের প্রতি আমরা মনোযোগ নিবদ্ধ করবো;

প্রথমত–

> জনগণের দারিদ্র্য, জাতীয় নিপীড়ন এবং সংস্কৃতির ওপর নিষেধাজ্ঞা একই বস্তু। এক শতাব্দীর ঔপনিবেশিক আধিপত্যের পর যে সংস্কৃতি আমরা লাভ করি, তা শুধু নিয়ম-নীতির আতিশয্য; যা পাই তা হচ্ছে সংস্কৃতির তলানী এবং মমী। জাতীয় বাস্তবতার নিশ্চিহ্নকরণ এবং জাতীয় সংস্কৃতির মৃত্যু-চিৎকার পারস্পরিক নির্ভরতায় একে অপরের সাথে সংযুক্ত। এ-জন্যই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কালে এ-সব সম্পর্কের অগ্রগতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
> (ফানোঁ, ২০০৬:১৭২)

দ্বিতীয়ত–

> আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই চান যে, আপনার দেশ অবনতি বা নিদেনপক্ষে দোমনা-ভাব এবং অনিশ্চয়তা এড়িয়ে চলুক, তাহলে আপনাকে অবশ্যই জাতীয় চেতনা থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার পদক্ষেপ নিতে হবে। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের তৈরি এবং জনসাধারণ কর্তৃক পূর্ণোদ্যম এবং উপলব্ধির সাথে গৃহীত কোনো কর্মসূচি ভিন্ন কোনো জাতিরই অস্তিত্ব টেকে না। অনুন্নত দেশের সাধারণ পটভূমিতে জাতির উদ্যোগকে সর্বদা বিন্যাস্ত করতে হবে। নারী-পুরুষের পেশীতে এবং বুদ্ধিমত্তায় সর্বদা ক্ষুধা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং অসচেতনতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উন্মাদনা বিদ্যমান থাকতে হবে। (ফানোঁ, ২০০৬:১৪৭)

ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় অন্তত উপরের দুটি ক্ষেত্রে কর্তব্য প্রণয়নে ফানোঁর ব্যাখ্যা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর সমাজবাস্তবতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আহমদ ছফা তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রতিভার গুণে জাতীয় সংস্কৃতি বিনির্মাণ ও জাতীয় কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একসময় তা-ই করতে চেয়েছিলেন। এজন্য প্রধান প্রতিবন্ধক ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত, এলিট শ্রেণির প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার বিরুদ্ধে সংগ্রামেও নেমেছিলেন ছফা, যা ফানোঁও একইভাবে চিহ্নিত করেছিলেন।[১৪৭] সেই সংগ্রাম মৃত্যুর আগ-পর্যন্ত থেমে থাকেনি। পার্থক্য কেবল ছফা পাকিস্তানি নব্য-উপনিবেশবাদী পরিস্থিতি থেকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে

জাতীয় চেতনার কথা লিখেছেন, অন্যদিকে ফানোঁর বাস্তবতা ছিল উপনিবেশ থেকে মুক্তির সংগ্রাম। নিশ্চিতভাবেই উত্তর-উপনিবেশী বাস্তবতায় স্বাধীনতা শুধু ভৌগোলিক বা স্থানিক নয়, ব্যক্তির মুক্তি অর্জন এবং ইতিহাসের নির্যাতিত-নিষ্পেষিত একটি জাতির জন্য ঐতিহাসিক দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করা। ছফা মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতায় জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সাহিত্য গঠন, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পথ তৈরি করতে গিয়ে বিউপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর বাঙালি মুসলমান-প্রপঞ্চ এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। প্রাচীন পুঁথির ইসলামি বাংলা পুনর্গঠন; লোকায়ত জীবন থেকে 'বাঙালিয়ানা'র সংজ্ঞা নির্ধারণ; বাউল-বৈষ্ণব-সুফিমতে অনুরাগ; ইতিহাসে 'অচ্ছুৎ' প্রান্তজনভাবনা এবং সেসূত্রে দীনেশচন্দ্র সেন-জসীমউদ্দীন-আল মাহমুদের ভাবজগতের কৌমসমাজবাহিত গ্রামীণ জীবনাচারের প্রতি আত্মীয়তা উপলব্ধি; 'তিতাস একটি নদীর নাম' বা 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের প্রাণশক্তি বাঙালির যৌথঅবচেতনে একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ ও ইতিহাস নির্মাণের সম্মিলিত প্রক্রিয়ায় আস্থা — এমন আরও অনেক উপাদান আহমদ ছফার চিন্তাজগতে যে-প্রভাববলয় তৈরি করেছিল এবং যে-সূত্রে তা গ্রন্থিত ছিল সেটাকে আমরা স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী মানুষের নিজস্ব শিকড় সন্ধানের প্রয়াস বলতে পারি। এক আলাপচারিতায় ছফার নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণিত একটি প্রতীকী চিত্র এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক–

> নিজের অবস্থান শক্ত করার জন্য অর্থাৎ পশ্চিমা শিক্ষিত ... এই যে কি বলা হয় এদেরকে, এই যে প্রিটেনশাস পশ্চিমা ধারার শিক্ষিত লোকরা, যখন তারা সংস্কৃতির এই চেহারাটা তাদের অধিকার প্রসারিত করতে চেষ্টা করল বলতে থাকল, তখন আমার সংস্কৃতি কোনটা? আমাকে দেখতে হল, চিন্তা করতে হল। হায় ! রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম বঙ্কিম ওনারা একটা অংশ ফিলাপ করেছেন। যেটা হচ্ছে জলের মধ্যে শিকড়ের মত গাছের। অন্য যে অংশটা আছে সেটাকে, আমি যদি দাঁড়াতে চাই আমার জায়গায়– তখন আমার শেকড়গুলোকে আমাকে ধরতে হবে। সে ধারার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লালন এবং লালন নয় শুধু– সেটা আরো অন্যান্য যে ধারা উপধারাগুলো আছে, সেগুলোর সঙ্গে আমাকে একটা আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। (ছফা, ২০০৮ঙ:৪৪০)

উত্তর-উপনিবেশী চিন্তকগণ বি-উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার জন্য নিম্নবর্গের ইতিহাস সন্ধানের প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কারণ উপনিবেশক কেন্দ্র হলে উপনিবেশিতের মধ্যে নিম্নবর্গের প্রান্তজনই ভাষা ও সংস্কৃতির মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার লড়াইয়ে সবচেয়ে সফল। উপনিবেশকের ভাষায় 'নেটিভ' বা 'ভূমিপুত্র' বা 'আন(Other)' -এর এই প্রতিরোধী শক্তিই বিউপনিবেশায়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য-সমাজ ও সংস্কৃতিভাবনায় আহমদ ছফা বাঙালির প্রতিরোধী স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানে সবচেয়ে সফল ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি নির্যাতিত এবং অত্যাচারিতের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস-ঐতিহ্য ও নিজস্বতা অনুসন্ধান করেছেন। বক্ষ্যমান আলোচনা থেকে আরও স্পষ্ট হয়েছে যে, আহমদ ছফা মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতায় বাংলাদেশের সামাজিক প্রবণতাসমূহ যেভাবে সনাক্ত করেছেন তার সাথে তুলনা করা যায় ফ্রান্‌জ ফাঁনোর উত্তর-উপনিবেশী পরিস্থিতি বর্ণনার। ফয়েজ আলম ফানোঁর *রেচেড অব দ্যা আর্থ* -থেকে উত্তর-উপনিবেশী পরিস্থিতির যে চিত্র এঁকেছেন তার অংশবিশেষ উল্লেখ করা যায়–

> উত্তর-উপনিবেশী পরিস্থিতিতে ধর্মীয়, সম্প্রদায়গত বা সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা এমনকি মৌলবাদও অনেক ক্ষেত্রে উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; উপনিবেশকের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ অথবা নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি উদাসীনতা বা তাকে অপকৃষ্ট জ্ঞান করার প্রবণতা জাতির মননে মিশে যায়; সবচেয়ে ভয়াবহ হল, দীর্ঘকালের পরাধীনতা উপনিবেশিতের মনস্তত্ত্বে এত গভীর ছাপ ফেলে যে উপনিবেশকের সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব মনে হয়। (ফয়েজ, ২০০৬:১৯-২১)

আহমদ ছফা কতটা গভীরভাবে এই পরিস্থিতি অনুধাবন করেছিলেন তা উপরের বিশ্লেষণ থেকে ধারণা করা যায়। স্বাধীনতা-উত্তর নতুন বাস্তবতায় আহমদ ছফা স্বাধীনতাযুদ্ধ, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সংস্কৃতি অথবা জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, জাতিসত্তা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অভিমত তুলে ধরে বাংলাদেশে এই

ধারার জ্ঞানপর্যালোচনার সূচনাতে স্বতন্ত্রভাষ্য যোগ করেছেন যা অদ্যাবধি বাংলাদেশের উত্তর-উপনিবেশী চিন্তাচর্চার ভিত্তিমূল গণ্য করা যায়।[১৪৮]

প্রতিষ্ঠান-বিরোধী, আপোসহীন সাহিত্যিক আহমদ ছফা সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে অবিচল সংগ্রামী। তাঁর ‘সার্চলাইটে’র মতো সংক্ষিপ্ত অথচ লক্ষ্যভেদী মন্তব্যশক্তি (মেজবাহ, ২০০৩:১৫৭), মূল্যায়নের প্রখর অন্তর্দৃষ্টি এবং ‘সবচেয়ে দূরবর্তী সম্ভাবনা সবচেয়ে সহজ কথায় বলতে পারার ক্ষমতা’ (সলিমুল্লাহ, ২০০৩:৩২২) বাংলাদেশের সাহিত্যজগতে ও চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা দান করেছে। সমকালে বিভিন্ন সামাজিক আলোচনা-পর্যালোচনায় বিভিন্ন বিষয়ে ছফার চিন্তার সাথে অনেকের স্পষ্ট মতভেদ এমনকি মতবিরোধও দুর্লক্ষ্য নয়। সামাজিক জ্ঞান-পর্যালোচনায় লেখককে অংশগ্রহণ করতে হয় বলে বিশ্বাস করতেন ছফা। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা ছফা-মানসের অস্থিরতা ও লক্ষ্যহীনতার প্রতিফলনও এসব বিতর্কে পাওয়া যায়। তবে এসব বিভেদ-বিতর্ক থেকে গ্রহণ-বর্জনের ভিত্তিতে কোনো সমাধান বা সিদ্ধান্ত আশা করা যায় না। এই দ্বন্দ্ব টিকে থাকে, সমাজের অগ্রগতির শর্ত পূরনের দোহাই দিয়ে। এসব দ্বন্দ্বে কেউ ভারত বা পাকিস্তানের কোর্টে খেলে মজা পায় কিন্তু ছফা ‘বাংলাদেশের কোর্ট ছাড়া অন্য কারো কোর্টে জীবন গেলেও খেলতে রাজি নন’। মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ, ভারত, শেখ মুজিবের ভূমিকা নিয়ে ছফার অবস্থান প্রশ্নাতীত হয়তো নয়, কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিকে বিএনপি-আওয়ামী লীগের শত্রুর অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করার জন্য যে ঋজু মেরুদণ্ড প্রয়োজন তা আহমদ ছফার যথার্থই ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই[১৪৯]। ইতিহাসের ‘করুণ বীর’ শেখ মুজিবের অস্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছফা বাংলাদেশের ইতিহাসের অসম্পূর্ণ জন্ম-প্রক্রিয়া অবলোকন করেছিলেন। আর ইতিহাসের মধ্য থেকেই আরেক ইতিহাস-জন্মের ধাত্রী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তাঁকে এমন রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হতে হয়েছে যার ভয়াবহতা, অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা থেকে তিনি কখনও মুক্ত ছিলেন না। এর ফলশ্রুতিতে আমরা পাই এমন এক সময়ের ভাষ্য যখন ‘রক্ত দিয়ে চিন্তা করতে হয়’, যখন চিৎকারই প্রতিবাদের ভাষা। এমন অমসৃণ পথ কেটে সামনে অগ্রসর হওয়ার মধ্যেও বিপ্লবের সম্ভাবনা উঁকি দেয়। ছফার চিন্তা এমন এক পথ ধরে অগ্রসর হয় যা একই সাথে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা এবং সমাজের দ্বান্দ্বিকতা উভয়ই দেখতে পায়; আমাদেরকে সতর্ক করে আরেকটি জাগরণ, আরেকটি যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে ইতিহাসের দায় মিটিয়ে জাতিকে মুক্ত করার নতুন সংগ্রামে ব্রতী হতে।

টীকা

[১] আহমদ ছফার জন্ম ৩০ জুন, ১৯৪৩ সালে চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার গাছবাড়িয়া গ্রামে। মৃত্যু ২০০১ সালের ২৮ জুলাই, ঢাকায়। বাবার নাম হেদায়েত আলী ওরফে ধন মিয়া, মায়ের নাম আছিয়া খাতুন। প্রথম স্ত্রী আসমা খাতুনের মৃত্যুতে আহমদ ছফার বাবা আছিয়া খাতুনের সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনের আবদ্ধ হন। ছফা তাদের দ্বিতীয় সন্তান। আহমদ ছফা তাঁর সাহিত্যসাধনায় বড়(সৎ) মা আসমা খাতুনের গর্ভজাত একমাত্র ভাই আব্দুল ছবির অনুপ্রেরণার কথা তাঁর স্মৃতিচারণে অনেকবার উল্লেখ করেছেন। আহমদ ছফার বড় এক বোন ইছলাম খাতুন, ছোট এক বোন বিলকিস খাতুন। নিজের মা আছিয়া খাতুনের গর্ভে তাঁর আরও এক বোন 'সুখ' শিশু বয়সেই মারা যায়। ছফার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু হয় তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ গাছবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

[২] আহমদ ছফা রচিত লেখা ও প্রদত্ত সাক্ষাৎকার 'আমার লেখালেখির গোড়ার কথা' (২০০৮গ:২৩৩-৩৫), 'রোগশয্যায় বিরচিত' (২০০৮ঘ:২১২) এবং 'আমি একটা ইতিহাসের ভেতর থেকে উঠে এসেছি' (২০০৮গ:৩০৭-০৯) থেকে তাঁর গ্রামের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতা ও উদারতার উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়– আহমদ ছফার বাবা হেদায়েত আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর গ্রাম গাছবাড়িয়ায় একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৃতীয় শ্রেণিতে (আনুমানিক ১৯৫২ সালে) পড়ার সময় ঘটনাচক্রে তাঁর বাবার আয়োজনে এক জুম্মার নামাজ শেষে সেই মসজিদের সমাবেশের সামনে ছফাকে 'রামের পিতৃভক্তি' নামে স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে হয়েছিল– এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করে কতটা অসাম্প্রদায়িক, উদার সমাজে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। বিষয়টি অনুধাবন করেই ছফা স্বীকার করেছেন, বর্তমান বাস্তবতায় এমন ঘটনা ঘটলে তা 'রক্তারক্তি' বা 'খুন-খারাবির' মত পরিণতি ডেকে আনত।

এছাড়া 'শতবর্ষের ফেরারি:বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধে ছফার মন্তব্য –'বাংলাদেশের যে অঞ্চলটিতে আমার জন্ম, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন রকম তিক্ততা ছিল না। যে কারণে হিন্দুতে-হিন্দুতে, মুসলমানে-মুসলমানে ঝগড়া বিবাদ মনোমালিন্য ঘটে থাকে, একই কারণে হিন্দুতে-মুসলমানেও ঘটত' (ছফা, ২০০৮ঙ:৩৫৮)।

[৩] চারজন সাহিত্যপ্রেমিক ও বিশিষ্ট শিক্ষকের স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন আহমদ ছফা। বিভিন্ন লেখায় এই সম্মানিত শিক্ষকদের নামের বানানে ভিন্নতা থাকলেও এঁরা যে একই ব্যক্তি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এঁরা হলেন– শিবপ্রসাদ সেন [শিবু বাবু] , মাওলানা আবু সৈয়দ [আবু সায়ীদ], মৌলভি মুহম্মদ এছহাক [মোহাম্মদ ইসহাক] এবং সারদাশঙ্কর তালুকদার। আহমদ ছফার বিভিন্ন লেখায় শৈশবে তাঁর শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষকদের সম্পর্কে জানা যায়। তন্মধ্যে 'রোগশয্যায় বিরচিত' রচনা থেকে ছফার শৈশবের বেড়ে ওঠার পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

এক সাক্ষাৎকারে আহমদ ছফা তাঁর শিক্ষক মোহাম্মদ ইসহাক সম্পর্কে জানিয়েছেন – 'উনি নিজে লেখালেখি করতেন। কবিতা লেখার জন্য খুব একটা ইয়ে ছিল, এবং তিনি নিজে মিল দিতে পারতেন না, ওই মিলটা আমাকে দিয়ে দেওয়াতেন এবং লুকিয়ে রাখতেন ওটা।' একই সাক্ষাতে সারদাশঙ্কর তালুকদার সম্পর্কে বলেছেন – 'উনি আমাকে প্রভাবিত করেছেন। গাছের প্রতি এবং পাখির প্রতি মমতাটা আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি।' (ছফা, ২০০৮গ:৩০৯)

[৪] 'রোগশয্যায় বিরচিত' আত্মজীবনীতে ছফা এমন পারিবারিক অনটন ও দায়িত্ব-শৃঙ্খলের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন- 'বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর অন্য কোনো পুরুষ না থাকাতে আমি পরিবারের দিকে তাকাতে বাধ্য হই। তখন ১৯৬৭ সাল। বাড়িতে খাবার নেই। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মামলা, সকলে হতাশায় জর্জর, দীর্ঘদিনের একটি পুরনো পরিবার ধ্বসে যাচ্ছে, কেউ আনন্দ করছে, কেউ আন্তরিকভাবে বেদনা অনুভব করছে। আমি জীবনে পারিবারিক দায়িত্ব পালন করিনি, আমাদের সম্পত্তিগুলো কোন কোন জায়গায় আছে তাও ভাল করে জানতাম না। তাছাড়া বিশেষ একটা উপলক্ষে আমার বিদেশ যাওয়ার কথা হচ্ছিল। এই ধরনের একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বিশাল একটা পরিবারের দায়িত্ব, যার সদস্য সংখ্যা ষোলজন।' গ্রামে পারিবারিক ঐতিহ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনতে ছফার চিন্তা ছিল সার্বক্ষণিক। ভ্রাতুষ্পুত্র নূরুল আনোয়ারকে লেখা একাধিক চিঠিতে পরিবার নিয়ে ছফার আবেগ-পরিকল্পনা-দুশ্চিন্তা-স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা বারবার প্রকাশিত হয়েছে।

[৫] লেখালেখিতে অনুপ্রেরণা প্রসঙ্গে ছফা তাঁর বড় ভাইয়ের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন 'রোগশয্যায় বিরচিত' রচনায়- 'ছোটবেলা থেকেই আমি অল্প-স্বল্প লেখালেখি করতাম। এ জন্য পাড়ার মানুষ আমাকে ঠাট্টা করত, ভ্যাঙ্গাত। আমার এই ভাইটি তাদের সঙ্গে মারামারি করত এবং অনেক সময় নিজে জখম হত। সন্ধ্যা অন্ধতার কারণে বেশিদূর লেখাপড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি *পদ্মাবতী, শহীদে কারবালা, সয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামানের* নির্বাচিত অংশ মুখস্থ গান করে পড়তেন। আমাদের চট্টগ্রামের বিরাট একটা অংশ মনে করত 'আলাওল' শব্দের অর্থ কবি। কেউ কবিতা লিখতে চেষ্টা করলে লোকে ঠাট্টা করে বলত অমুকের ছেলে আলাওল বনার চেষ্টা করছে। আমার বড় ভাই মনে করতেন আমি একজন সত্যিকারের আলাওল। যেসব লোক আলাওল হয়, তারা সামান্য নয়, একেকজন নবী পয়গম্বরের মত মানুষ। (ছফা, ২০০৮ঘ:২১৪)

[৬] ছফা গাছবাড়িয়া স্কুলে থাকতেই আরও অনেক কবিতা লিখেছিলেন এবং তার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতাও ছিল। এসব কবিতা পুড়িয়ে ফেলার ঘটনা বর্ণনা করে ছফা জানিয়েছেন- 'সেই সময়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছিলাম। সেটাও একটা দুঃখের ব্যাপার; সেই কবিতাগুলো থাকলে আজকে 'প্রভাত সঙ্গীত', 'শৈশব সঙ্গীত' কবিতাগুলোর মত হত। আমি বাংলা ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হওয়ার সময় ড. মনিরুজ্জামানকে

দেখিয়েছিলাম। উনি বললেন যে কিছু হয়নি। তখন এগুলো জ্বালিয়ে ফেলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার প্রফেসর বলেছেন কিছু হয়নি! তাঁর লেখা ছাপা হয়, এটা বিশ্বাস করে আমি কবিতাগুলো জ্বালিয়ে ফেলেছি। এটাও আমার জীবনের বড় লস।' (ছফা, ২০০৮গ:৩০৯)

[৭] এক সাক্ষাৎকারে আহমদ ছফা বলেছিলেন 'আমার নিজের ধারণা আমি একটা ইতিহাসের ভেতর থেকে উঠে এসেছি।' এর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, ইতিহাসের যে বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভেতর থেকে তিনি উঠে এসেছেন; তাঁরা তাঁর এলাকারই লোক। যেমন – মনিরুজ্জামান ইসালামাবাদী, জে এম সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ওই এলাকার লোক ছিলেন। (ছফা, ২০০৮গ:৩১৬)

[৮] আহমদ ছফা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে তাঁর অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন স্মৃতিচারণে। যেমন *রোগশয্যায় বিরচিত* রচনায় লিখেছেন–

> আমার পিতার কাছে আমি আরও একটা বিশেষ কারণে ঋণী। আমাদের এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মতৎপরতা শুরু হলে তিনি ঝুঁকি নিয়ে আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহিত করতেন।(ছফা, ২০০৮ঘ:২১২)

[৯] এ নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে ছফা বলেছেন—

> একবার কলেজে থাকার সময় আমরা ক'জন মিলে বিপ্লবী লোকনাথ বলের বাড়িটা ভাড়া করেছিলাম। দোতলা মাটির বাড়ি। উনি তো মেয়র ছিলেন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ওয়ান অফ দ্যা মেইন ক্যারেক্টারস। তখন আমাদের ইচ্ছে হল আমরা একটা কিছু করি। তখন চট্টগ্রামের এ অঞ্চল স্বাধীন করার সহজ রাস্তা হচ্ছে রেললাইন তুলে দেয়া; কর্ণফুলির এই পাড়ে। এবং আমরা তুলে দিলাম। ....চট্টগ্রাম স্বাধীন হয়ে গেল; এইটা বিপ্লবীদের আদর্শ। তখন পরদিন, প্রায় পাঁচ শ' মিলিটারি এসে স্যার আশুতোষ কলেজ ঘেরাও করল। আমার বন্ধুরা চলে গেল সব ইন্ডিয়াতে। অনেকেই এখনও ফিরেনি । (ছফা, ২০০৮গ:৩১৭)

[১০] আহমদ ছফার পূর্বপুরুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর দুই পুরুষ আগেও পেশা কৃষি এবং ব্যবসা ছিল বলে জানা যায়। তবে আর্থিক স্বচ্ছলতার আশায় আহমদ ছফার বাবা এবং চাচা মোরশেদ আলী কৃষিকাজ ছাড়াও কাঠের কাজ করতেন। তবে ছফার পিতা হেদায়েত আলীর ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল প্রখর। তিনি মওসুমে আগাম সব্জি চাষ করে ও পাহাড়ের ছন নিলামে তুলে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন বলে ছফা তাঁর স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'রোগশয্যায় বিরচিত'-তে উল্লেখ করেছেন। বাবার দানশীলতা ও পরহিতব্রত সম্পর্কে একই লেখায় ছফা জানিয়েছেন-

> আমার পিতা পরের হিতে জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। আমাদের অঞ্চলে তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেছিলেন। তিনি মানুষের পানি খাওয়ার জন্য পুষ্করিনী খনন করেছিলেন। রাস্তা-ঘাট এবং পুল-সাঁকো ইত্যাদি করে তিনি নির্মল আনন্দ অনুভব করতেন। যদিও লেখাপড়া করার বিশেষ সুযোগ তাঁর ঘটেনি, তথাপি তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের জমিতে মসজিদ এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি আমাদের অঞ্চলে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমি সে বিদ্যালয়ের তৃতীয় ব্যাচের ছাত্র। আমার পিতার অনেক গরিব ছাত্রের স্কুলের পরীক্ষার ফিস গোপনে পরিশোধ করতেন। এমন কি আমাদের চরমতম অর্থনৈতিক সংকটের সময়ও গরিব ও এতিম ছাত্রদের বাড়িতে এনে জায়গির রাখতেন। (ছফা, ২০০৮ঘ:২১০)

[১১] এ প্রসঙ্গে আহমদ ছফার ভ্রাতুষ্পুত্র নূরুল আনোয়ারের ভাষ্য ছফা-মানসের একটি বিশেষ দিক উন্মোচনে সহায়ক হতে পারে–

> ছফা কাকার এক পূর্ব-পুরুষ আল্লাহর সাধনা করতেন। তাঁর নাম ছিল আজিজ ফকির। তিনি চিরকুমার ছিলেন। ছফা কাকার বাড়ি থেকে তিন মাইল পুবে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে তিনি বাস করতেন। ... আমার ধারণা, এ সাধক পুরুষটির প্রভাব ছফা কাকার ওপর কোনো না কোনোভাবে পড়েছিল। আমার বিশ্বাস, তাঁর বৈরাগ্যভাব, চিরকুমার থাকার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন এটা পূর্ব-পুরুষের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন। আমি যখন মিরপুরের বাসায় তাঁর সঙ্গে থাকতাম, দেখতাম তিনি পাহাড়ে ছুটে যাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন। কেন জানি না, ছফা কাকা নিজেকে একজন আজিজ ফকির কিসিমের লোক ভাবতে পছন্দ করতেন।

নূরুল আনোয়ারের এ ভাষ্যের প্রতিফলন ছফার জীবনাচরণে দুর্লক্ষ্য নয়। ছফা নিজেকে আউলিয়া বলে বন্ধুদের কাছে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন যদিও তিনি জানতেন তাঁর পক্ষে আউলিয়া হওয়া সম্ভব নয়। (ফরহাদ, ২০০৩:৩১৫) ছফার ডায়েরিতে বা ছফা সম্পর্কে একাধিক স্মৃতিচারণে নূরুল আনোয়ারের এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। দেখুন- মোরশেদ-সোহরাব (২০০৩)।

[১২] আহমদ ছফা আত্মমুগ্ধ ও প্রকাশোন্মুখ লেখক। যেসব ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি স্মৃতিচারণ বা মূল্যায়ন করেছেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মমুগ্ধ স্মৃতিচারণ। অনেকক্ষেত্রে যা আত্মপ্রচারের পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য আত্মপ্রচারকে তিনি দূষণীয় বা নিবৃত্ত করার মত বিষয় বলে মনেও করতেন না, এটা তাঁর চরিত্রের আত্মবিশ্বাসের অংশ বলে প্রতিভাত হয়েছে। ছফার আত্মমুগ্ধতাকে আত্মপ্রেমের মত ভাবসম্পদের পর্যায়ে বিবেচনা করে মুহম্মদ নূরুল হুদা লিখেছেন –

> আত্মপ্রেম যে-কোন শিল্পীর এক শনাক্তযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এমনকি সবচেয়ে নির্লোভ বা নৈর্ব্যক্তিক মানুষটিও এই জীবগুণ থেকে বিচ্যুত নয়। কিন্তু সচেতন শিল্পীর আত্মপ্রেম তাঁকে ব্যক্তিত্ববোধের ঊর্ধ্বে একধরনের সর্বপ্রেমে উন্মুক্ত করে। বাংলার বাউল সম্প্রদায় বা সুফিসমাজের মধ্যে এই প্রবণতাটি সহজলক্ষ্য। আজীবন অকৃতদার ও প্রাতিষ্ঠানিকতা-বিবর্জিত আহমদ ছফার আত্মপ্রেমও এই নিরিখে বিচার্য। (নূরুল, ২০০৩:৩১৮)।

সম্পর্কে ছফার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকা মোরশেদ শফিউল হাসান *ছফা ভাই:আমার দেখা আমার চেনা* গ্রন্থে জানিয়েছেন –

> নিজের লেখা নিয়ে কথা বলতে ছফা ভাই সবসময় ভালোবাসতেন। এ-ও বোধহয় এক ধরনের নার্সিসিজম। নিজের প্রতিটি নতুন রচনার ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মুগ্ধ, অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত। তুলনায় সমসাময়িক এমনকি পূর্বসুরি অনেকের কাজকেও তিনি এক কথায় নাকচ করে দিতেন বা ঊনমূল্য জ্ঞান করতেন' (মোরশেদ ২০০২:৪৬,৪৭)।

এই বিষয়টি ছফা চিত্তের এক অন্তর্গূঢ় প্রতিক্রিয়াশীলতা। তিনি এটাকে বলতেন 'কন্সপিরেসি অব সাইলেন্স'। শিল্পী এস. এম. সুলতানের কাজের স্বীকৃতির ব্যাপারে সমাজের উঁচুতলার মানুষের এমন নীরবতাকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করে নাসির আলী মামুনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ছফা (২০০৮:৪৬৭) বলেছিলেন–

> আমি তো কৃষকের ছেলে। একটা কৃষকের ছেলেকে যখন এই ভদ্রলোকের সন্তানেরা, এইভাবে কন্সপিরেসি অব সাইলেন্স দিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে, ইফ আই ডু নট ব্রেক ইট টুডে, সেম টু দিস কাম টু মি অলসো। কারণ আমি নয়, যে-কোন চাষার ছেলে উঠে আসতে চাইবে এখান থেকে, তারা একই রকমের ষড়যন্ত্র এখানে পেশ করবে।

একই কারণে বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত পাওলো ফ্রেইরির 'পেডাগজি অব অপ্‌রেস্‌ড' গ্রন্থটি তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

আহমদ ছফার প্রবল আত্মবিশ্বাসের ছাপ তাঁর ব্যক্তিজীবনে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধে, সাক্ষাৎকারেও এই পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়। প্রবল আত্মবিশ্বাস কখনও কখনও একরোখা, অনমনীয় ঔদ্ধত্যে পর্যবসিত হওয়ার কারণে ছফা নানাভাবে ঘনিষ্ঠজনদের বিরাগভাজন হয়েছেন এমন উদাহরণও কম নয়। তাঁর এই চারিত্র্যধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন ছফা, ১৯৭৩ সালের ২০ মার্চ ডায়েরির পাতায় তিনি লিখেছেন–'আমি যে জেদি, একগুঁয়ে এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মানুষ তা কোন সময়ে ভুলতে পারিনে কেন' (ছফা, ২০০৮ক:২৮৮)। ছফা খ্যাতি-যশ বা প্রচারবিমুখ ছিলেন তা বলা যায় না। তবে প্রতিষ্ঠার মোহ ও ক্ষমতা এই দুটি বিষয় তার স্বভাব-বিরুদ্ধ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিত্ববিসর্জন বা সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণের মানুষ নন ছফা; এ কাজটিকে ভীষণভাবে ঘৃণা করতেন তিনি। নিজেকে লেখক বলতেই গর্ব বোধ করতেন; লেখকের প্রতি যে-কোন আপমান-অবহেলা ছফার মনঃপীড়ার বিষয় (ছফা, ২০০৮ছ:৪৮০)। এ ব্যাপারে একধরনের দায়বদ্ধতাও তাঁর মনে কাজ করত। অনেক প্রথিতযশা লেখক-বুদ্ধিজীবীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা তিনি যেমন পেয়েছেন, তেমনভাবে অপরকেও বিশেষ করে তরুণ লেখকদের প্রতিও বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতার হাত। তাঁর বিস্তৃত সামাজিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল, ছিল বিরল ব্যক্তিত্ব-সান্নিধ্য-ভাগ্য।

ছফা-চরিত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাঁর প্রবল আত্মসম্মানবোধ। তাঁর আত্মসম্মানবোধ ব্যক্তিগত সীমানা ছাড়িয়ে জাতিগত সম্মান- চেতনায় পর্যবসিত হয়েছিল। নিজের নামের বানান পরিবর্তনের ঘটনা থেকে শুরু করে পত্রিকায় লেখা-ছাপানো উপলক্ষে তাঁর প্রবল আত্মসম্মানবোধের পরিচয় বিভিন্ন ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে একাধিক লেখায় তিনি বাঙালি মুসলমানের আত্মচেতনা ও অহংকারের মূলে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন মূলত জাতিগত সম্মানবোধের অনুভব থেকে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাজনৈতিক কারণে ভারতের প্রতি তাঁর এক ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপ্তি পেলে এ বিষয়টি এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট করেছিলেন –

> ভারতের প্রতি আমার ঘৃণাবোধ নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত আমাদের সাহায্য করেছিল। সেজন্য ভারতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত, এটা অনুভব করি। কিন্তু ব্যাপার হল ভারত সব ব্যাপারে তার আগ্রাসী চেহারাটা এমনভাবে প্রকাশ করে, প্রতিবাদ না করাটাই কাপুরুষতা। আমার দেশে আমি স্বাধীন এটা অনুভব করতে চাই। ভারতীয় হস্তক্ষেপের কারণে সেটা সম্ভব হয় না। আমাদের সংস্কৃতির ওপর সীমান্তের ওপার থেকে এমন চোরাগোপ্তা এবং প্রকাশ্যে হামলা চালানো হয় প্রতিবাদ না করলে নিজের দেশের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।... বাইরে থেকে এসে আমার মাথার ওপর দিয়ে গদা ঘুরিয়ে যাবে; প্রাণ থাকতে সহ্য করব না। আমি কোনভাবে ছোট হব না। (ছফা, ২০০৮গ:৩৬৯)

উদ্ধৃতির শেষ বাক্যের 'আমি' যেন আর ব্যক্তি আহমদ ছফা নেই, বাংলাদেশের সমগ্র বাঙালি-সমাজের কণ্ঠস্বর। ব্যক্তির মধ্যে প্রবল আত্মসম্মানবোধ জায়মান থাকলেই কেবল সামষ্টিক চৈতন্যকে আত্মস্থ করে এমন ঘোষণা দেয়া সম্ভব।

আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ-র (২০০৩) বেশ কয়েকটি স্মৃতিচারণমূলক পর্যালোচনায় ব্যক্তিগত সম্পর্কের আলোকে ছফা-চরিত্রের বিভিন্ন দিক বর্ণিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি ছফার সাহচর্যপ্রাপ্ত অধিকাংশ লেখকই উল্লিখিত বিষয়গুলোতে অভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

[১৩] এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু মানসের কথিত নবজাগরণের অগ্রসর মনীষার সর্বগ্রাসী উচ্চাভিলাষকে ছফার আকাঙ্ক্ষার সাথে তুলনা করে সাঈদ-উর রহমানের মন্তব্য স্মরণযোগ্য-

> ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশেও নবজাগরণের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। ক্ষমতাসীনরা সৃষ্টিশীল, দূরদর্শী নেতৃত্ব দিতে পারলে সীমিত আকারেও নবজন্মকে সার্থক করে তোলা যেত এদেশে। বিচ্ছিন্নভাবে কতগুলো মানুষ নববসন্তের অগ্রদূত কোকিলের কুহুরব শুনতে পেরে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন আহমদ ছফা। তাঁর স্বভাবের চিরন্তন ছটফটানি, অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য, সর্বগ্রাসী উন্মুখ মনোভাব সহস্র কিশলয় মেলেছিল নববসন্তের দূতের আগমনে। ছফার অপমৃত্যু আসলে আমাদের জাতির অপমৃত্যুকেই মনে করিয়ে দেয়। (সাঈদ, ২০০৩:৭৫)

[১৪] সাজ্জাদ শরীফকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ছফা তাঁর ব্যক্তিজীবনে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও এসব ধর্মের অন্তর্ভাষ্য থেকে নিম্নবর্গের উৎক্ষেপ আত্মস্থ করা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন– 'জিনিসটা আসলো আমরা যখন গ্রো করছি, তখন স্কুলে থাকার সময় ধর্মীয় যে ইন্টার-রিলিজিয়াস ফেস– এটা আমার ক্ষেত্রে পারিবারিকভাবে ঘটে গেছে' (ছফা, ২০০৮গ:৩৮৩)।

[১৫] এ প্রসঙ্গে ছফার স্মৃতিচারণ 'রোগশয্যায় বিরচিত' প্রবন্ধে লিখিত হয়েছে। দেখুন– আহমদ ছফা (২০০৮ঘ:২১২)।

[১৬] 'ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে, দাড়ি গোঁফ ওঠেনি' এমন বয়সে ছফা কমিউনিস্ট লিডারদের সঙ্গে তাঁর অবস্থান নিয়ে যে 'এনকাউন্টার ফেস' করেছেন তা থেকে সহজেই অনুমেয়, যুক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা তিনি শৈশবের রাজনৈতিক চর্চার মধ্য দিয়েই অর্জন করেছিলেন। দেখুন– ছফা ২০০৮গ:৩৮৩।

[১৭] এই স্মৃতিচারণ পাওয়া যায় *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত প্রবন্ধ* শীর্ষক গ্রন্থের 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া কতিপয় বিবেচনা' প্রবন্ধে। বিস্তারিত– আহমদ ছফা (২০০৮ঙ:২৮৭)।

[১৮] আহমদ ছফার প্রথম প্রকাশিত লেখা 'অপূর্ব বিচার' নামে একটি গল্প। ১৯৬৩ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন (তৎকালীন ইসলামিক একাডেমি) কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহেদ আলী সম্পাদিত 'সবুজ পাতা' পত্রিকার প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশিত হয়। ছফা তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশের সুখস্মৃতির বিস্তারিত লিপিবদ্ধ রেখেছেন 'অনিঃশেষ ঋণ' (ছফা, ২০০৮ঘ:১৭৪) নিবন্ধে। পরবর্তীকালে অধ্যক্ষ মিন্নাত আলী গল্পটি নিজ নামে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করলে আহমদ ছফা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়ের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিয়ে তিন হাজার টাকা রয়্যালিটি আদায় করেছিলেন।(ছফা, ২০০৮গ:৩১০) ঘটনাটি আহমদ ছফা-চরিত্রের তীব্র আত্মসম্মানবোধ ও অনমনীয় অধিকার সচেতনতার প্রমাণ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। তবে আহমদ ছফার প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ 'কর্ণফুলির ধারে' দৈনিক *সংবাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই লেখাটি রণেশ দাশগুপ্তের পরামর্শ ও উৎসাহে ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন ছফা। রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর এক মাসের বেতনের টাকা সম্মানী হিসেবে ছফাকে দিয়েছিলেন 'কর্ণফুলির ধারে' লেখার জন্য। এই লেখার স্মৃতিচারণ ছফা করেছেন 'রণেশ দাশগুপ্ত:একজন প্রেমে পড়া মানুষ' নিবন্ধে (২০০৮ঘ:১৪৩-৪৫)। তবে আহমদ ছফার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে ভিন্ন তথ্য দিয়ে নূরুল আনোয়ার *ছফামৃত* -তে লিখেছেন–

> *সূর্য তুমি সাথী*কে আহমদ ছফার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু আমার জানা মতে, তার আগে তিনি আরও একটি বই লিখেছিলেন এবং তা প্রকাশিতও হয়েছিল। বইটির নাম ছিল *বরুমতির আঁকে বাঁকে*। বইটি আমাদের এলাকায় বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এখনও বইটি অনেকের মুখে মুখে। বরুমতি নদীর দু'পাড়ের মানুষ নিয়ে বইটি রচিত হয়েছিল। বর্তমানে বইটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ছফা কাকাকে আমি বইটির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছিলাম, আপনি *বরুমতির আঁকে বাঁকে* নামের একটি বই লিখেছিলেন। মনে পড়ে? তিনি একগাল হেসে জবাব দিলেন, লিখেছিলাম তো। কিন্তু সে তো আগের কথা। এ রকম লেখা খুঁজলে আহমদ ছফার অনেক পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে বইটির প্রকাশকালীন-পাঠকদের সূত্রে তথ্যোদ্ধার করে শামসুল আরেফীন (২০০৪:৩২,৩৩) জানিয়েছেন, *বরুমতির আঁকেবাঁকে* প্রকাশিত হয় ১৯৬৫/৬৬-র আগে, ছফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার অল্প পূর্বে বা পরে। ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম নাজিরহাট কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাই নিশ্চিত করা যায় 'বরুমতির আঁকেবাঁকে'র প্রকাশকাল ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে। বস্তুত বরগুইনি বা বরুমতি নদীর তীরে আহমদ ছফার গ্রাম দক্ষিণ গাছবাড়িয়া অবস্থিত এবং ছফার শৈশব-কৈশোরের ওপর এই নদীর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। প্রকাশনার দিক থেকে আহমদ ছফার দ্বিতীয় গ্রন্থ রুশ উপন্যাস 'তানিয়া'র অনুবাদ; প্রকাশকাল বাংলা সন আশ্বিন ১৩৭২ বা ১৯৬৫। তবে নিজের লেখা মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের দিকে আহমদ ছফার দ্বিতীয় গ্রন্থ *সূর্য তুমি সাথী;* প্রকাশকাল ১৯৬৭।

[১৯] 'রণেশ দাশগুপ্ত : একজন প্রেমে পড়া মানুষ' নিবন্ধে ছফা *কর্ণফুলীর ধারে*'র রচনার বিষয় সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রেক্ষাপট জানিয়ে লিখেছেন–

> এক সময়ে আমার ওপর পুলিশের হুলিয়া ছিল। আমি গ্রেফতার এড়াতে কলেজের পড়াশুনা ছেড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে গিয়েছিলাম। চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের জন্য গভীর জঙ্গল থেকে ট্রাকযোগে কাটা বাঁশ ছড়ি পর্যন্ত বয়ে আনার প্রয়োজনে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে রাস্তা কাটা হত। যেহেতু প্রতিবছরই বাঁশ সংগ্রহের জন্য নতুন নতুন জায়গা বেছে নেয়া হত, সেই কাটা বাঁশ বয়ে আনার জন্য নতুন নতুন রাস্তাও কাটা হত। পাঠান এবং পাঞ্জাবি ঠিকাদার সরকারের কাছ থেকে এই সকল রাস্তা তৈরির দায়িত্ব পেয়ে যেত। এই ঠিকাদারেরা বাংলাদেশের নান জায়গা থেকে অধিক টাকার লোভ দেখিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যেত। পাহাড়ে ঝুপড়ি ঘর তৈরি করে এইসব শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করত। রাস্তা বানানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করত এবং নামমাত্র মজুরি দিত। শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের অন্ত ছিল না। আমি অত্যন্ত নিকট থেকেই এই অবর্ণনীয় লোমহর্ষক অত্যাচার দেখেছি। আমি ঠিক করলাম এই দাস শিবিরের কাহিনীটাই লিখে ফেলি। (ছফা, ২০০৮ঘ:১৪৪)

[২০] 'কর্ণফুলীর ধারে' দৈনিক সংবাদ প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে, 'লেখক সাহিত্যিকদের একটা প্রতিবাদমঞ্চে সমবেত হওয়া প্রয়োজন' দৈনিক *আজকের কাগজ*-এ প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে ছফার মৃত্যুর কিছুদিন আগে।

[21] রাজনীতির ঐতিহ্যগত ধারণা রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন, সরকার, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইত্যাদি চলকসমূহের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে এই ধারণা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। রাজনীতি এখন রাষ্ট্রনির্দেশিত না হয়ে সমাজ নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়। সমাজের যে কোন স্তরে মানুষের পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ, বাস্তব কর্মকাণ্ড, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় রাজনীতির চলক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ অরাজনৈতিক বিষয়ের মধ্যে রাজনীতি। এর চর্চায় জন্ম নেয় রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের। বিস্তারিত– অমল কুমার (১৯৯৮:১০-১৭)।

[22] দেখুন– আহমদ ছফা (২০০৮ক:৯৫-৯৬)।

[23] দীনেশ চন্দ্র সেনের *বৃহৎ বঙ্গ* থেকে উদ্ধৃত করে আহমদ শরীফ লিখেছেন স্বাধীন সুলতানী আমলে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বা চাপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিতান্ত অনিচ্ছায় রৌরব নরকে যাওয়ার ভয় সত্ত্বেও 'ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বা' অর্থাৎ জনসাধারণের ভাষায় 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি' অনুবাদের ফলে হিন্দুসমাজে শিল্প-সাহিত্য চর্চায় ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এভাবে 'একদিকে মুসলমান ধর্মের প্রভাব, অপরদিকে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্মপ্রচার– এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মনে নবভাব জাগ্রত হইল। শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তাজগতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল' (শরীফ, ২০০১:১২৮)।

[24] তুর্কি খলিফার রাজত্ব রক্ষার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মুসলমানদের গড়ে তোলা খিলাফত আন্দোলনকে আহমদ ছফা 'অবৈজ্ঞানিক, দেশ বহির্ভূত এবং না-ধর্মী আন্দোলন' আখ্যা দিয়েছিলেন (ছফা, ২০০৮চ:২৩৬)। তাছাড়া ছফা বরাবরই অঞ্চল বহির্ভূত রাজনৈতিক অন্ধ আনুগত্যের তীব্র সমালোচক।

[25] 'বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন ষোল শতক থেকেই মুসলমানরচিত নবীকাহিনী, শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায়; আরবি ও শাস্ত্রশিক্ষাও বাঞ্ছিত সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। (শরীফ, ২০০১:২০৪)

[26] এ বিষয়ে ছফা বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন, বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তার উদ্ধৃতি রয়েছে। তবে *বাংলাভাষা: রাজনীতির আলোকে* প্রবন্ধে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর কথিত জাগরণকে সেই শ্রেণিস্বার্থের বিপরীত বলে উল্লেখ করেছেন, যে শ্রেণি আন্দোলনের সূচনা করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকেন্দ্রিক ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি মধ্যশ্রেণির মধ্যে যে নবজাগরণ সূচিত হয় তাদের উদ্যোগ বা নেতৃত্বে ছিল সামন্তসমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। আহমদ ছফা জানিয়েছেন, এটি ছিল শ্রেণিচেতনা বা শ্রেণিস্বার্থের বিপরীত স্রোত। তাই এই তথাকথিত সামাজিক উপপ্লবের কোন রাজনৈতিক সম্ভাবনা বা পরিণতি ছিল অবাস্তব। রামমোহন-দ্বারকানাথ-অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর সামাজিক সংস্কারব্রতের বাইরে গিয়ে জাতীয় জাগরণের মাধ্যমে বৃহত্তর রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের প্রচেষ্টা করেননি, ইংরেজ সরকার বা শাসকগোষ্ঠিকে আস্থায় রেখেই তারা একটি সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। কারণ ছফার ভাষায়–

> শ্রেণীগত কারণে সেদিন সে আন্দোলনের সূত্রপাত করা অসম্ভব ছিল। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা তখনো সংহত হয়নি এবং তার মধ্যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটেনি। স্বভাবতই ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক শাসনকাঠামোর আওতায় থেকে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকুই তাঁরা করেছিলেন। (ছফা, ২০০৮খ:১৯১)

[27] *জাগ্রত বাংলাদেশ*, *নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ*, *বাঙালি মুসলমানের মন*, *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* ইত্যাদি প্রবন্ধ-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

[28] 'বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লব' প্রবন্ধের প্রেক্ষপট : ১৯৭৩ সালে ফরাসি অর্থনীতিবিদ রেনে দুমোঁ বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে এদেশের গ্রাম-গঞ্জ ঘুরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক পরিকল্পনা প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন। সেখানে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সরকারি ঘোষণা ও কর্মসূচির সমালোচনা করে তিনি যা মত রেখেছিলেন তার সংক্ষেপ এই রকম– বাংলাদেশে রাশিয়া বা ভারতের আঙ্গিক ও পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার বাস্তবতা নেই। কারণ যন্ত্রশিল্পের প্রসার না হওয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত শ্রমিক শ্রেণি এদেশে বিকশিতই হয়নি, এমনকি একটি শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণিও গড়ে ওঠেনি। দৃঢ়ীভূত শ্রমিক শ্রেণি এবং একটি বৃহৎ বঞ্চিত সর্বহারা গোষ্ঠী ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই সফল হবে না। তাই বাংলাদেশকে মনোযোগ দিতে হবে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা কাটিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠনে। মনোযোগ দিতে হবে উৎপাদনের বিপ্লবের ভিত্তিকেন্দ্র কৃষির দিকে। বাংলাদেশের বাস্তবতা চীন বা ভিয়েতনামের নিকটবর্তী। বিশাল জনগোষ্ঠীকে কর্ম ও জীবনবাদে উদ্দীপিত করে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে যন্ত্রশিল্পনির্ভর সমাজবিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়াই বাংলাদেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

[29] দেখুন– আহমদ ছফা (২০০৮গ:২১৭)।

[30] বিস্তারিত– 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শোভাযাত্রা' প্রবন্ধে আহমদ ছফা (২০০৮ঙ:২২৯)।

[31] ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত *নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ* গ্রন্থের ভূমিকায় আহমদ ছফা জানিয়েছেন, গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি জন্ম নিয়েছে তাঁর 'মুখ থেকে কলম থেকে নয়'। প্রবন্ধগুলি ১৯৯৩ এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৯৫ এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে লিখিত।

[32] ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের উঁচুবিত্ত শ্রেণি এবং সমাজবিপ্লব প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে ছফা লিখেছেন– 'বিপ্লবের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, একথা মোটেও সত্যি নয়। সমাজে যখন বৈষম্য বিরাজমান থাকে, যখন অন্যায়-অবিচার চলে, দারিদ্র্য এবং হতশ্রী প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে সমাজে প্রাণধারণের ক্ষীণতম সম্ভাবনাও রোধ করে দাঁড়ায়; তখন কি সমাজের ভেতর থেকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে' (ছফা, ২০০৮জ:১৩৯)?

৩৩ 'সেন্স অব বিলংগিং' শব্দটি ছফা কেবল জাতীয় বুর্জোয়ার নীতি হিসেবে নয়, জাতির এলিট বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ও অধিকারবোধ এমনকি সাধারণ মানুষের দেশপ্রেম হিসেবেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। দেখুন– 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' (দ্বিতীয় খণ্ড), 'আহমদ ছফা বললেন' (ছফা, ২০০৮গ:৩৯০)

৩৪ স্বাধীনতার পর আইনটির শিরোনাম সংশোধন করে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' রাখা হয় । স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষয়ক্ষতি ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পুরস্কার 'অর্পিত' শব্দটি, ছফার ভাষায়, 'একমাত্র এ শব্দটিই হিন্দুসম্প্রদায়ের অর্জন'। আইনটি বাতিল না করে 'ভাষার হেরফের ঘটিয়ে চাতুর্যপূর্ণভাবে' আইনটি বহাল রাখার মুখ্য কারণ, ছফার লিখেছেন – 'এ আইন চালু থাকার কারণে আমাদের দেশের এক শ্রেণির মানুষ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে। অনেকেই জোর করে, জাল দলিল করে, ভয় দেখিয়ে হিন্দুসম্প্রদায়ের লোকদের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। এ আইনটি রদ করা হলে তাদের সেই অন্যায়ভাবে অধিকার করা সম্পত্তি ফেরত দিতে হয়।' (ছফা, ২০০৮ঘ:২৫৫))

৩৫ আহমদ ছফা শ্লেষ যুক্ত করে লিখেছেন 'প্রিয় ধারণা' যার মূল কথা 'হিন্দুরা এদেশকে আপন মনে করে না' এবং 'ওখানে একটা পাকা ব্যবস্থা হলেই তারা প্রথম সুযোগে ভারতে চলে যাবে' (ছফা, ২০০৮জ:১১৯)। তবে বিভাগোত্তর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয় দেশেই বিষয়টি পারস্পরিক। একই' প্রিয় ধারণা' ভারতে থেকে যাওয়া মুসলমানদের সম্পর্কে সেখানকার হিন্দুদের মনে জাগ্রত ছিল আবার বাংলাদেশের হিন্দুদের দেশত্যাগ নিয়ে ভারতের হিন্দুদের মধ্যে যে 'প্রিয় ধারণা' তারও বর্ণনা ছফা দিয়েছেন– 'পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগুরু হিন্দুসমাজের একাংশ মনে করে বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু নর-নারী মুসলমানদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।' (ছফা, ২০০৮:১১৯) এই সামষ্টিক স্বজ্ঞা থেকে উভয়দেশের সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু মনস্তত্ত্বের দুটি বিশেষ দিক, অস্তিত্বসংকট ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, বিকশিত হয়।

৩৬ এ প্রসঙ্গে ছফা লিখেছেন– 'আওয়ামী লীগ বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের ঘুসঘুস-ফুসফুস প্রচারণার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের উপায়ও তাদের [আওয়ামী লীগ সরকারের] হাতে ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যের বদলে গুজবই সে সময়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল' (ছফা, ২০০৮জ:১২০-২১)।

৩৭ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে বংশগত বা পারিবারিক ক্ষমতাই নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায় যা সামন্তযুগীয় চর্চা। আহমদ ছফা এক সাক্ষাৎকারে প্রফেসর আনিসুর রহমানের শব্দ ব্যবহার করে একেই 'মহারাজা কালচার' বলে উল্লেখ করেছিলেন। দেখুন– (ছফা, ২০০৮গ:৪১১-১২)।

৩৮ ছফা বাঙালিকে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করতে উৎসাহ বোধ করতেন, বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারে তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। ১৯৯৪ সালে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ছফা বলেছেন– 'বাঙালি মুসলমানেরা এ দেশের মাটির আসল সন্তান। তারা প্রভুত্বকামী আর্যদের সঙ্গে যেমন সম্পর্কিত নয়, তেমনি আগ্রাসী তুর্কী তাতার, ইরানী তুরানীদেরও কেউ নয়। শুরু থেকেই বাঙালি মুসলমান একটা নির্যাতিত মানবগোষ্ঠী' (ছফা, ২০০৮গ:৩৫৮)। এক্ষেত্রে আহমদ শরীফের বক্তব্যের সাথে ছফার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনিও বাঙালিকে নির্জিত, বিজিত, নির্যাতিত ইত্যাদি বিশেষণে উল্লেখ করেছেন অনেকবার।

৩৯ বাংলায় ইসলামিকরণের বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য দেখুন–

Eaton, Richard M. 1993, The rise of Islam and the Bengal Frontier: 1204-1760, University of California Press, London.
Link: http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/।

৪০ অন্যকথায় জীবনবাদী বা দেহাত্মবাদী। বিস্তারিত– আহমদ শরীফ (২০০১:৩৩-৩৫, ৪৫-৪৬, ৫১, ৬০-৬১)।

৪১ আহমদ শরীফ (২০০১:৫১) লিখেছেন–'বাঙালির রক্তসঙ্কর জাতি। বিভিন্ন গোত্রীয় রক্তের আনুপাতিক হার অবশ্য আজো অনির্ণীত। তবু প্রমাণে-অনুমানে বলা চলে শতকরা সত্তরভাগ অস্ট্রিক, বিশভাগ ভোট চীনা, পাঁচভাগ নিগ্রো এবং বাকি পাঁচভাগ অন্যান্য রক্ত রয়েছে বাঙালি ধমনীতে।' অন্যত্র লিখেছেন– 'আমাদের শতকরা সত্তর ভাগ অস্ট্রিক, পঁচিশ ভাগ মঙ্গোল এবং বাকি পাঁচভাগ হাবসী, তুর্কি, মোঘল, আফগান, ইরানি ইত্যাদি সঙ্করক্তের' (শরীফ, ২০০১:৮২)।

৪২ আর্যপূর্ব যুগের একটি সর্বজনীন ভাষা বা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক গোত্রীয় ভাষা চালু ছিল বলে মনে করা হয়। এই ভাষাকেই ঐতরেয় আরণ্যকে 'বয়াংসির বুলি' বা আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে 'অসুর ভাষা' বলা হয়েছে। (শরীফ, ২০০১:১২১)

৪৩ তারা সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, খাসিয়া, গারো ইত্যাদি নামে নিজেদের স্বতন্ত্রসত্তা আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। (শরীফ, ২০০১:১২১)

৪৪ উদাহরণস্বরূপ – হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আবদুল মমিন চৌধুরী, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামানের নাম উল্লেখ করা যায়।

৪৫ আহমদ শরীফ লিখেছেন– 'বাঙালি ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করে নানা সম্প্রদায়ের রূপ লাভ করেছে বটে, কিন্তু কখনো সে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব ছাড়তে পারেনি। ফলে বহিরাগত প্রতিটি মতবাদ এখানে এসে নতুন রূপ লাভ করেছে। নতুন চরিত্র নিয়েছে। বাঙালী রূপ নিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম এখানে মহাযানী-দেহতত্ত্বে ও দেব-ভাবনায় অবসিক্ত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম গীতি-স্মৃতি-সংহিতা বিরুদ্ধ লৌকিক দেব-পূজায় রূপায়িত, ইসলামও লোকায়ত রূপ পেয়ে পরিবর্তিত। এখানে এসে সব শাস্ত্রই বাঙালী চেতনার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।' (শরীফ, ২০০১:৭৯)

[৪৬] ছফা নিজেই বৌদ্ধ ও বাউল দর্শনের অনুরাগী এবং একসময় বৌদ্ধ হতে চেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধের কিছু চিন্তা কবীরের মাধ্যমে বাহিত হয়ে লালনের গানে টিকে আছে বলে মনে করেন তিনি। (ছফা ২০০৮গ:৩৭১) অবশ্য এই দর্শনকে পরাজিতদের দর্শন এবং সাব-কালচার বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন ছফা (২০০৮জ:৪৩০)। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম-সামাজিকতা আজ পর্যন্ত বাঙালির অবচেতনে যেভাবে টিকে আছে তার অনেক উদাহরণ ও বিশ্লেষণ আহমদ শরীফ দিয়েছেন। বিস্তারিত– আহমদ শরীফ (২০০১:৮৬, ১২০-১২৩)।

[৪৭] বিস্তারিত– আহমদ শরীফ (২০০১:১৮-১৯, ৩২-৩৪, ৪৩-৪৭)। প্রবন্ধের নাম যথাক্রমে 'বাঙলা ও বাঙালি', 'বাঙালির সংস্কৃতি', 'বাঙালির মৌলধর্ম' ।

[৪৮] দেখুন– আহমদ ছফ (২০০৮ক:৯৭) ও (২০০৮গ:৩৫২)।

এই মতটি সর্বজনগ্রাহ্য নয়। কারণ দশম শতাব্দীতে আরব বণিকদের সাথে সমুদ্রপথে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের, বিশেষত নোয়াখালি ও সন্দ্বীপ অঞ্চলের ব্যবসায়িক যোগাযোগ যে ছিল তার প্রমাণ ইতিহাসেই রয়েছে। সেদিক থেকে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার রাজনৈতিক আগ্রাসনের অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছিল এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এটি ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ইসলামীকরণের জন্য দৃশ্যমান ক্ষুদ্র অঞ্চল হলেও বাঙালি জনগোষ্ঠী বিবেচনায় সামান্য নয়। তাছাড়া ছফা যে বাঙালি মুসলমানের মূলানুসন্ধান করেছেন তারা শহরাঞ্চলের ধর্মান্তরিত মুসলমান জনগোষ্ঠী নয়, গ্রামাঞ্চলের নির্যাতিত-বঞ্চিত কৃষক-তাঁতি-জেলে যাদের 'নিরাপদ আর্থিক ভিত্তি' ছিল না (ছফা, ২০০৮ক:৯৮)। মমতাজুর রহমান তরফদারের সমর্থন নিয়ে ড. আবদুল মমিন চৌধুরী অবশ্য এক্ষেত্রে আরও যুক্ত করেছেন – 'মুসলমানদের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার যে অংশগুলোতে বৌদ্ধদের অবস্থিতি হিন্দুদের পাশাপাশি ছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা ও উদারতার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল সেই অংশগুলোতে ব্যাপকভাবে ইসলামে ধর্মান্তর হয়েছে। উত্তর বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ববাংলায় এই অবস্থা বিরাজমান ছিল, পশ্চিম বাংলায় নয়' (মমিন, ২০০৯:১৪৯)। আরও দেখুন–

Eaton, Richard M. 1993, The rise of Islam and the Bengal Frontier: 1204-1760, University of California Press, London.
Link: http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/

[৪৯] দেখুন– আহমদ শরীফ (২০০১:৫১), অজয় রায় (২০০৫:৪৬)

[৫০] দেখুন– Eaton, Richard M. (1993)|

[৫১] মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ সিন্ধু* আলোচনা প্রসঙ্গে পুথি লেখকদের এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে প্রথম উদ্ঘাটন করেছিলেন মুনীর চৌধুরী, তিনি একে 'ইতিহাস তো দূরের কথা, অলৌকিকতার সীমাকেও অতিক্রম' করে যাওয়ার মত বিষয় মনে করেছেন। বিস্তারিত– মুনীর চৌধুরী (১৯৬৫:৪৭)

[৫২] পুথির ভাষা দো-ভাষী অর্থাৎ আরবি-ফারসি-মিশ্রিত বাংলা হওয়ার পেছনেও শ্রেণিবিভক্ত সমাজের শোষণ-নিপীড়নের ইতিহাস বিধৃত। ইসলাম প্রচারের সাথে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবি ভাষা অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রবেশ করলেও রাজভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল ফারসি। অন্যদিকে পুঁথিলেখকদের সামনে অগ্রসর শিল্পাদর্শ হিসেবে ছিল সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য যা এমনকি হিন্দু সমাজেও দেবভাষাজ্ঞানে সাধারণের অনধিগম্য ছিল। অর্থাৎ উভয় সমাজেই শিক্ষিত ও উচ্চবর্ণের মানুষের ব্যবহারের ভাষা ছিল সংস্কৃত ও ফারসি। স্বাতন্ত্র্যগর্বী মুসলমান আরবি-ফারসি-সংস্কৃত সমন্বয়ে উর্দু ভাষা সৃষ্টি করলেও ফারসি-উর্দু কোনটিই ছফার সংজ্ঞায়িত বাঙালি মুসলমানের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। কারণ 'এ দুটির একটিকেও পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করার জন্য একটি সমাজের পেছনে যে শক্ত আর্থিক ভিত্তি এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ থাকা প্রয়োজন ছিল দুটির কোনটিই তাঁদের ছিল না' (ছফা, ২০০৮ক:১০০)। এমনকি আংশিকভাবে আয়ত্ত করাও ছিল দুরূহ কারণ, বাংলার আমজনগণের সঙ্গে উর্দু-ফারসি জানা শাসক নেতৃশ্রেণির সামাজিক মেলামেশার উল্লেখযোগ্য কোন সুযোগও ছিল না। তবুও বাঙালি মুসলমান আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষা তালিম নিয়ে অন্তত মনোজগতে শ্রেণি-অবস্থানের উত্তরণ ঘটানোর যে চেষ্টা করেছিল আরবি হরফে লেখা পুঁথি তার প্রথম প্রমাণ। বেহেশতের ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের মনোভাব তো ছিলই। কিন্তু জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বাংলার সাথে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ মিশিয়ে কাব্য রচনা শুরু করলেন পুথি সাহিত্যিকগণ। বাঙালি মুসলমান সমাজে এই ভাষাটি আদৃতও হয়েছিল, দোভাষী পুথির উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি তারই প্রমাণ। আদৃত হওয়ার কারণ, এই জনগণের জন্য এক সময় সংস্কৃত ভাষা নিষিদ্ধ ছিল; আরবি তাদের অজানা, ফারসি ভাষার নাম শুনেছেন এবং উর্দুভাষা কানে শুনেছেন মাত্র (ছফা, ২০০৮ক:১০০)। তাই বাঙালি মুসলমানের পুথি রচনার প্রয়াসে ভাষার গায়ে খোদাই করা সাম্প্রদায়িক অন্ধ অনুরাগ ও শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে।

সুকুমার সেন এর মতে – অষ্টাদশ শতাব্দে স্বাধীন সুলতানী আমলের পূর্ব থেকেই বাঙালি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বাংলা শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে এবং মুসলমান লেখকদের মধ্যে আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলা ব্যবহারের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সে সময়, ধর্মীয় বা দৈনন্দিন কাজে, বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসির শব্দের প্রবেশ অবারিত ছিল বলে জানিয়েছেন সুকুমার সেন। তাঁর ভাষায়– 'হিন্দুস্থানীভাষী ও বাঙ্গালাভাষী মুসলমানের সামাজিক ও গার্হস্থ্য মিলনে কোন রকম জাতিপাঁতির দুস্তর বাধা ছিল না। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা অনেকে হিন্দুস্থানীকে দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহার করিতেন। এই কারণে মুসলমান লেখকদের রচনার ভাষা সাধারণ সাধুভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তবুও তাঁহাদের ভাষাকে ইসলামি বাঙ্গালা বলিতে পারি না। ইংরেজ আমলের শুরু হইতে কলিকাতার মজদুর মুসলমানদের ব্যবহার্য গ্রন্থে যখন আরবী-ফারসীর সঙ্গে বাঙ্গালার ও হিন্দীর মিশ্রণ খুব ঘন হইয়াছিল তখনকার সেই গ্রন্থ ভাষাই যথার্থ "এছলামি বাঙ্গালা" (সুকুমার, ১৯৭৫:৫৪৯)।'

তবে লক্ষণীয় পার্থক্য হল ' "ইসলামি" বাঙ্গালায় লেখা বইগুলি অধিকাংশই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়, শিক্ষিত মুসলমান পাঠকের জন্যও নয়। বিমিশ্র শ্রমিক ও কৃষকের অবসরবিনোদনের জন্য রচিত হইত। তবুও কোন কোন রচনা তুচ্ছ করিবার নয়। অনেক রচনায় প্রচুর পদ অথবা গান সন্নিবিষ্ট আছে। সে সব গানের মধ্যে ভালো রচনা নিতান্ত দুর্লভ নয়' (সুকুমার, ১৯৭৫:৫৪৯)।

[৫৩] মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড এবং দার্শনিক জ্যাক লাকাঁকে উদ্ধৃত করে সলিমুল্লাহ খান লিখেছেন, ব্যক্তি-মানুষের যেমন স্বপ্ন, তেমনি জাতির জীবনে তার রূপকথা। পুথির জগৎ ও বিষাদ-সিন্ধুর জগৎ যদি আমরা রূপকথা জ্ঞানে পড়ি তো মুনীর চৌধুরীর জিজ্ঞাসা জলের মধ্যে লবণের মতন মিশে যায়। স্বপ্নের যেমন নিজস্ব গঠনবিধি, রূপকথারও তেমন চলনরীতি। জাক লাকাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের তথাকথিত যুক্তিনিষ্ঠ ভাষাও স্বপ্ন আর রূপকথার গঠনরীতির ব্যতিক্রম নয়। স্বপ্নে, রূপকথায়, ভাষায় যে পুনরাবৃত্তি ঘটে তা ব্যক্তির বা জাতির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ফল নয়– এক ধরনের ইচ্ছাপূর্ব বা ইচ্ছাতিরিক্ত বাধ্যবাধকতার ফসল। (সলিমুল্লাহ, ২০১০:৪৩)

[৫৪] প্রবন্ধটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক প্রথম গ্রন্থ *জাগ্রত বাংলাদেশ*-এর অন্তর্ভুক্ত, প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে ১৯৭১ সালে। আহমদ ছফা তখন কলকাতায়।

[৫৫] ২১শে ফেব্রুয়ারিকে বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় হিসেবে চিহ্নিত করে বদরুদ্দীন উমরের মন্তব্য প্রসঙ্গে ছফা এ উক্তি করেছিলেন সাজ্জাদ শরীফের সাথে এক সাক্ষাৎকারে।

[৫৬] ২০০১ সালে প্রকাশিত 'বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র' প্রবন্ধেও ছফা ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে শুধু 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার লড়াই' না বলে 'পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ারও লড়াই'ও বলতে চেয়েছেন (ছফা, ২০০৮:১৮১)। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'ভারতীয় দৃশ্যপট: নকশালবাড়ি ও আমরা বাঙালি' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদেও তিনি লিখেছেন–'রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং মৃত্যুবার্ষিকী প্রতি বছর ঘটা করে পালিত হলেই বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে গেল মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কেননা বর্তমান বাংলাদেশ সাবেক পাকিস্তানেরই অংশ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি না হলে আজকের বাংলাদেশ সৃষ্টি হত না' (ছফা, ২০০৮ছ:২৬০)। বারবার এ বিষয়টিকে ব্যক্ত করার প্রবণতা থেকে অনুমিত হয় যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির রাষ্ট্রগঠনকে ছফা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাঙালির সজ্ঞান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেখতে চান। বাঙালিই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল তাই 'পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন' হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাও বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই, ধারণা করা যায় এই প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠিত করতেই 'পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না' এমন প্রপঞ্চের পক্ষে ছফা অনড় অবস্থান নিয়েছিলেন। এই বিতর্ক কতটা গুরুত্ব অর্জন করেছিল তা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের প্রত্যুত্তর থেকে অনুধাবন করা যায়–

> পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হত না। এ কথা সত্য। তেমনি ইংরেজরা এ দেশে না এলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতো না, মুঘলদের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানি ব্যবসা ও লুট করার সনদ পেয়েছিল, তাই মুঘলরা না এলে ইংরেজ আসতো না। এভাবে ক্রমান্বয়ে পেছন দিকে গিয়ে ইতিহাসের কতকগুলো সত্যের কার্য-কারণ নির্দেশ করা যায়, কিন্তু তাতে সেসব সত্যের তাৎপর্য নির্ণীত হয় না। পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না– তা সত্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, তা এই যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও দার্শনিক তত্ত্ব অস্বীকার করতে পেরেছিল বলেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্ভবপর হয়েছিল। সুতরাং কেবল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার মধ্যে বাংলাদেশের উন্মেষের সম্ভাবনা না দেখে পাকিস্তানের বিলয়ের মধ্যেই বাংলাদেশের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করা অনেক বেশি সমীচীন। (আনিসুজ্জামান, ২০০৫:২০৪)

[৫৭] বিস্তারিত – তারেক ফয়সল (১৯৮৭:১১৮)।

[৫৮] পূর্ব বাংলায় প্রথম প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার নির্বাচনী ঐক্যের সূচনা হিসেবে যুক্তফ্রন্ট গঠনে বামপন্থী নেতৃত্বের ভূমিকার বর্ণনা পাওয়া যায় কামরুদ্দীন আহ্‌মদের লেখায়। বিস্তারিত– কামরুদ্দীন আহ্‌মদ (২০০২:১১১)।

[৫৯] ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় বামপন্থী রাজনীতির কর্মপন্থা ও পরিচালন কীভাবে তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করেছিল তার বর্ণনা পাওয়া যাবে তালুকদার মনিরুজ্জামানের পূর্বোক্ত গ্রন্থে। দেখুন– তালুকদার মনিরুজ্জামান (২০০৭:১৮)।

[৬০] প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে কেমব্রিজ থেকে প্রবন্ধ আকারে, পল আর. ব্রাস ও মার্কাস এফ. ফ্রান্ডার সম্পাদিত *Radical Politics in South Asia*-গ্রন্থে।

[৬১] 'আওয়ামী লীগের পেছনে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের শ্রেণিস্বার্থের তাগিদে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন, বাংলাদেশ যদি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছয়দফা দাবি আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য, কারবার তেজারতি, চাকরি-বাকরিতে পশ্চিম-পাকিস্তানি মধ্যবিত্তের সমান সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪২)।

[৬২] আহমদ ছফা লিখেছেন–'উনিশ শ' বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন এবং উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ফলাফল ভারতীয় প্রচারমাধ্যম এবং পত্র-পত্রিকা ফলাও করে প্রচার করেছিল। এই প্রচারণার মধ্যে কোন এক দেশের অবহেলিত অঞ্চলের জনগণ যে সংগ্রাম করে আপন ভাষায় কথা বলার অধিকার অর্জন এবং আরো নানা দাবি-দাওয়া আদায় করে নিচ্ছে, তার চাইতে অধিক কিছু ছিল।

পাকিস্তানের ভাঙ্গনের বীজটি অঙ্কুরিত হতে দেখে তারা উল্লসিত হয়েছিল। সেই মনোভঙ্গিটুকুও প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪৭)।

[৬৩] বাঙালির প্রাণের দাবি ছয় দফাকে ভারতের বাণিজ্যিক সুবিধা ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থচরিতার্থের দাবি বলেছেন ছফা। বস্তুত সাম্রাজ্যবাদ- বিরোধী বামপন্থীদের কোন কোন পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হয়েছিল। যেমন, ছয় দফায় পাট শিল্পের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ দাবিকে ছফা বলেছেন ভারতীয় স্বার্থরক্ষার দাবি– 'ভারতের কয়লার বিনিময়ে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পাট আমদানি করতে পারলে চট শিল্পের মত ভারতের একটি বুনিয়দি শিল্পের সঙ্কটের সহজ সমাধান হয়ে যায়'(ছফা, ২০০৮ঙ:২৪৮)। আবার '[বাংলাদেশে] অনতিদূর ভবিষ্যতে ভারতের শিল্পজাত পণ্যের বাজার গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও হেলায় উড়িয়ে দেয়া যায় না' এমন (ছফা, ২০০৮ঙ:২৫৫)।

[৬৪] আরও দেখুন– 'সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' (২০০৮চ:১৬২-১৬৪), 'বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র'(২০০৮জ:১৮৫)

[৬৫] ভারত থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হওয়ার এই প্রেক্ষিতকে ছফা তার ক্ষোভ-জর্জর শব্দে নানাভাবে চিত্রিত করেছেন– যেমন 'খুনি, জল্লাদ ইয়াহিয়া বাহিনীর হাতে মারের পর মার খেয়ে উলঙ্গ অসহায় রিক্ত অবস্থায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল'; আবার 'উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের মোকাবেলায় টিকতে না পেরে আমাদের সংগ্রাম বারবার পিছু হটে শেষ যাত্রায় ভারতে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে' (ছফা, ২০০৮ছ:১৫৪)।

[৬৬] এ প্রসঙ্গে ছফার অনুমান– বাংলাদেশের ভিতর মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে থাকা একটি মুক্তাঞ্চল থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হলে এবং 'যুদ্ধটা সরাসরি বাঙালিদের সঙ্গে বাংলাদেশের মাটিতে হলে বাংলাদেশি জনগণের মনেও ভিন্নরকম প্রতিক্রিয়া হত। মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের আগ্রাসী যুদ্ধ মনে করে অনেক দেশপ্রেমিক নাগরিকও এ যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। সেটা ঘটতে পারত না' (ছফা, ২০০৮ছ:১৫৪)।

[৬৭] প্রবন্ধগুলোর নাম – 'শেখ মুজিবুর রহমান', 'তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান', 'শেখ মুজিব : ইতিহাসের নিরিখে'।

[৬৮] 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা' প্রবন্ধে ছফা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন– 'বাংলাদেশে একটি নতুন জাতি জন্মলাভ করার সংগ্রাম, কিন্তু তার ধাত্রীর কাজ করছিল ভারতের শাসক কংগ্রেস। শেকসপিয়র সরণিতে প্রায়-অন্তরীণ আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভা ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র।' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৫১) আবার 'শেখ মুজিবুর রহমান' প্রবন্ধে এই ধাত্রীর কাজের যৌক্তিকতা ও বাস্তবতাকে সমর্থন করে ছফা লিখেছেন 'বাংলাদেশের জন্মপ্রক্রিয়ায় ভারত তার স্বার্থ ছিল বলেই ধাত্রীর কাজ করেছে, একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশটি ইতিহাসের কোন্ পর্যায়ে এক ধরনের না এক ধরনের স্বার্থ ছাড়া অন্য দেশের প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেছে' (ছফা, ১৯৮৯:১১)? একই প্রবন্ধের অন্যত্র – 'কংগ্রেসের সুচতুর প্রচারণার দরুণ বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামকে ভারতীয় জনগণ এভাবে বুঝেছেন যে জিন্নাহ্র দ্বি-জাতিতত্ত্ব মিথ্যা হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানের ভাঙ্গন আসন্ন হয়ে উঠেছে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশি জনগণ যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে তা মূলত কংগ্রেসের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামেরই অসমাপ্ত পর্যায়। তাই সেখানে ভারতীয় কংগ্রেস নায়কদের ইমেজসমূহ বাংলাদেশে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় জনগণের একটি মুখ্য অংশ পঁচিশে মার্চের পূর্ব থেকেই আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিবুর রহমন এবং বাংলাদেশ– এই তিনটি বিষয় ছিল কংগ্রেস সরকারের হাতে ভারতীয় জনগণের চোখে ধূম্রজাল সৃষ্টি করার মোক্ষম হাতিয়ার। কারণ তখন ভারতের রাজ্যে রাজ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছিল' (ছফা, ২০০৮ঙ:২৫০)। অভিন্ন বক্তব্য পাই 'শেখ মুজিবুর রহমান'-১ ও ২, 'সাম্প্রতিক ভাবনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' ইত্যাদি প্রবন্ধেও।

আহমদ ছফা ভারতীয় কংগ্রেসকে আওয়ামী লীগের সকল রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও কৌশলের পথপ্রদর্শক বলে মনে করেন। এমনকি, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা' প্রবন্ধে ছফার ভাষ্য – [শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ]'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশবিরোধী ইমেজগুলো অতীতের গর্ভ থেকে তুলে এনে ঝালিয়ে রঙ চড়িয়ে ঈষৎ পরিবর্তন করে নতুনভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। এই কারণেও ভারতীয় জনগণ তাঁকে চোখে দেখার আগেই একেবারে অতিমানব বলে বিশ্বাস করে ফেলে।'

এভাবে শেখ মুজিবের 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব পাওয়া এবং তাঁর 'মুজিবকোট' বলে কথিত পোশাকও কংগ্রেসের দেখিয়ে দেয়া পথে আওয়ামী লীগের যাত্রা বলেই মনে করেন ছফা। (ছফা, ২০০৮ঙ:২৪৯) অথচ মুক্তিযুদ্ধ কালে রচিত 'জাগ্রত বাংলাদেশ' প্রবন্ধে ছফার মূল্যায়ন 'শেখ মুজিবুর রহমান শুধু ভাবী প্রধানমন্ত্রী কিংবা দলীয় প্রধান নন, তিনি বাংলায় ঔপনিবেশিক শোষণ নিরসনের জাতীয় প্রতীকও বটে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জাতীয় দাবি আদায়ের প্রধান সেনাপতি বলেই তিনি অবিসংবাদিত নেতৃপদে বৃত হয়েছেন' (ছফা, ২০০৮গ:১৪৮)। তাছাড়া পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী রচনা থেকেও এ বিষয়ে ছফার অবস্থান জানা যায়।

[৬৯] বিস্তারিত– মঈদুল হাসান (২০১০:৭৫, ৭৮-৮৬)।

[৭০] 'শেখ মুজিবুর রহমান' প্রবন্ধে ছফা লিখেছেন '[শেখ মুজিবুর রহমান] বৃটিশ বিরোধী টুটাফাটা ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপজীব্য বলে ধরে নিয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণি যাদের অধিকাংশই শুরুতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের পর্যন্ত বিরোধিতা করেছিলেন তারাই শেখ মুজিবের চারপাশে জুটে সমস্ত পরিবেশটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো' (ছফা, ১৯৮৯:১৯,২০)। শুধু তা-ই নয়, ছফা মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের ভাবমূর্তি ও আন্দোলনের কর্মসূচিও কংগ্রেসের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি হয়েছিল এবং এর কারণ ছিল ভারতীয় জনগণ বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি

জনগোষ্ঠীর কাছে এই যুদ্ধকে 'কংগ্রেসের বৃটিশবিরোধী সংগ্রামেরই অসমাপ্ত পর্যায়' হিসেবে প্রতিভাত করা। দেখুন–আহমদ ছফা (২০০৮ঙ:২৪৮-২৫০)।

যে মধ্যশ্রেণির নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী লীগ তার দোদুল্যমানতা ও সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে ঝুঁকি এড়ানোর শ্রেণি-চরিত্রের কারণে এমন পরিস্থিতিতেও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ না করে আলোচনায় সময়ক্ষেপণ করেছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এমন অভিযোগ বারবারই করেছেন ছফা। এর কারণ ব্যাখ্যা করে 'শেখ মুজিবুর রহমান' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন –

> বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যে ভারতের নিজস্ব যুদ্ধে পরিণত হলো তার পেছনে যে কারণটি সক্রিয় তা হলো শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন মধ্যশ্রেণিভুক্ত আওয়ামী লীগের শ্রেণিচরিত্র। বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলধিতল মন্থিত করে নতুন ভুখণ্ড জেগে ওঠার মতো প্রতিরোধের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের নীচের দিকের সামাজিক স্তরসমূহ ঠেলে উপর দিকে উঠে এসেছে। এই জাগরিত জনসংখ্যা এই নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা, দর্শন করে শেখ মুজিব আশান্বিত হওয়ার চেয়ে অধিক আতঙ্কিতই হয়েছিলেন। কারণ শেখ মুজিব তার শ্রেণির দম কতোদূর, লক্ষ্য কোথায়, এদের নিয়ে কতোখানি যেতে পারবেন জানতেন। এই সংকটপূর্ণ সময়ে একচুল এদিক ওদিক হলে কাঁচের তৈজসপত্রের মতো নেতৃত্ব খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে, তিনি সে বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। (ছফা, ১৯৮৯:২১)

[৭১] এই যুক্তি থেকেই ছফা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা 'ভারত চায়নি, রাশিয়া চায়নি' এমন উপপত্তিতে পৌঁছেছিলেন বলে মনে হয়। দেখুন– বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের অনুচ্ছেদ ৩.২।

[৭২] ১৯৯৯ সালে কলকাতার *স্বাধীন বাংলা* সাময়িকীর জন্য দেয়া সাক্ষাৎকারে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে উত্থাপিত এক প্রশ্নের জবাবে ছফা বলেছেন– 'রুশ বিপ্লবের সময় স্ট্যালিন এবং ট্রটস্কির ভূমিকা নিয়ে লাখ লাখ পাতা লেখা হচ্ছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির এত বড় ঘটনা, সেটা নিয়ে মতদ্বৈততা, বিতর্ক এসব থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। একাত্তরের যুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠ ঘটনা। কিন্তু এখানে সবাই মিথ্যে বলছেন কেন? মিথ্যেকে পুজো করছেন কেন? এর একমাত্র কারণ মিথ্যে বললে এখানে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়' (ছফা, ২০০৮জ:৪১৮)।

[৭৩] ছফার এই বক্তব্যের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ আব্দুল করিমের মতের একাত্মতা লক্ষ্য করে সলিমুল্লাহ খান লিখেছেন 'উপজাতি কি বস্তু? বাঙালিকে জাতি ধরেই মাত্র উপজাতি। উপজাতির সংজ্ঞাই কি এই নয় যে, তারা বাঙালি নয় বলেই উপজাতি? বাঙালি ও অবাঙালি মিলে যদি একটা মহাজাতি হয় মন্দ হয় না।' তবে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন 'তার আগে উপজাতিকে একই সঙ্গে উপজাতি ও বাঙালি দুই সনদ দেওয়া কি ঠিক' (সলিমুল্লাহ, ২০১০:১২১)?

[৭৪] 'সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' (২০০৮চ:১৬০-৬১) ও 'বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র' (২০০৮জ:১৮২-৮৩) প্রবন্ধে ছফার ভাষ্য উল্লেখ্য–স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াসকে আরো অনিশ্চিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছিল একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী। 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' রচনার পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে অনেকগুলো স্বার্থান্বেষী বিতর্কের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন আহমদ ছফা–যেমন জাতীয়তার প্রশ্নে বাঙালি না বাংলাদেশি?, 'জয় বাংলা' না 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'?, 'জল' না 'পানি'? 'স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি' না 'বাঙালি জাতির জনক' ইত্যাকার বিদ্বেষসৃষ্টিকারী বিতর্ক। ছফা স্পষ্টভাষায় এসব বিতর্ক সৃষ্টি ও চালু রাখার জন্য একশ্রেণির স্বার্থন্বেষী বুদ্ধিজীবীকে দায়ি করেছেন। 'জয় বাংলা' শব্দজোড়ের ঐতিহাসিক ভিত্তি ও তাৎপর্যকে অকপটে বিবৃত করেন ছফা। জানিয়েছেন, বাঙালি ও বাংলাদেশি উভয় পরিচয়ের মধ্যে যেমন কোন বিরোধ নেই তেমনি বাঙালিত্ব ও মুসলমানিত্ব একটি অপরটিকে বাতিল করে না। জল বা পানি শব্দের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সন্ধান করা নেহাত অজ্ঞতাপ্রসূত কারণ 'পানি' শব্দটিই বরং সংস্কৃত এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, 'পানি'ই ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং এই বিরোধও মূর্খতার নামান্তর। ছফা মনে করেন, সমস্ত বাংলাদেশিকে একটি জাতীয়তার মধ্যে সমবেত করতে পারার ব্যর্থতা থেকেই এসব বিরোধপূর্ণ প্রতীকের জন্ম হয়েছে।

[৭৫] সলিমুল্লাহ খান মনে করেন, ছফা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনা' অর্থে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' শব্দটি ভুল প্রয়োগ করেছেন বা তিনি 'সমঝে' উঠতে পারেননি। এর ফলে মুক্তিসংগ্রাম চেতনাগত দিক থেকে ছোট হয়ে পড়েছে। (সলিমুল্লাহ, ২০১০:১৩২)

[৭৬] একই ভাষা-ভাষী মানুষ একরাষ্ট্র গঠনের উপযুক্ত না-ও হতে পারে এমন যুক্তি দিয়ে 'সাম্প্রতিক বিবেচনা' প্রবন্ধে ছফা সতর্ক করেছেন 'ভাষার ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করার সময় ভাষার সীমাবদ্ধতা কথাটিও স্মরণে রাখা প্রয়োজন'-কারণ সকল বাংলাভাষী জনগণ এক রাষ্ট্রের অধিবাসী নয়। একইভাবে ধর্মকে এককভাবে গুরুত্ব দিতে গেলেও একই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে। (ছফা, ২০০৮জ:১৮৩)

[৭৭] ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'সংগ্রামী ছাত্রসমাজের' পক্ষে যে এগার দফা দাবি প্রচার করা হয় তার অন্তত দুটি (৫ ও ১০) দফায় ছিল পরোক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি-প্রভাবিত দাবি। যেমন- ব্যাংক-বীমা, পাটব্যবসা ও বৃহৎ শিল্পসমূহ জাতীয়করণ এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের সাথে সহযোগিতা-চুক্তি বাতিল ইত্যাদি এছাড়া একটি দফায় ছয়দফার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতো ছিলই।

[৭৮] বিস্তারিত– আহমদ ছফা (২০০৮ঙ:২৭২-৭৪)

[৭৯] 'বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আসল শত্রু জাতীয়তাবাদ নামক মতাদর্শ। এই জাতীয়তাবাদের ছায়াতলেই বিকশিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও হানাহানি। এই প্রস্তাব মহাত্মা আহমদ ছফার অন্যতম আবিষ্কার' (সলিমুল্লাহ, ২০১০:১০০)।

[৮০] মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'স্বাধীনতা:জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধে লিখেছেন –

জাতীয়তাবাদীদের সাম্প্রদায়িকতা থেকে অনেক কিছু শিখবার আছে; কেননা তা জাতীয়তার ক্রটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সম্প্রদায়বহুল দেশে সাম্প্রদায়িকতা না থাকলে জাতীয়তা বিশুদ্ধতর হতে পারে না, তাতে প্রতিপত্তিশালী সমাজের রং লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের গায়ে বিশেষ সম্প্রদায়ের রং লাগতে না দিয়ে আদর্শ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করলে সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা মন্দীভূত হবার সম্ভাবনা। সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়তার সত্যনিষ্ঠা পরীক্ষা করে। তাই জাতীয়তাকে একদিকে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, অপরদিকে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে– তার ভিতরে প্রকৃতপক্ষে কোনো গলদ আছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। এ তাঁরা করতে পারবেন যদি তাঁরা মনে করেন, জাতীয়তার আদর্শ অতীতে নেই, ভবিষ্যতে– তা এখনো সৃষ্ট হয় নি, আমাদের প্রতিভার অপেক্ষায় আছে। (মোতাহের, ২০০৯:১৩৫)

[৮১] 'শেখ মুজিবুর রহমান' প্রবন্ধে ছফার অভিমত– 'শেখ মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদ জাতীয় মধ্যশ্রেণির জাতীয়তাবাদ। যেটি সমাজের শোষিত শ্রেণি নয়– ক্ষুদে শোষক শ্রেণি, বড়ো শোষক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংযোগ তার প্রত্যক্ষ নয়। পাকিস্তানী শোষকদের মাধ্যমেই তার লেনদেন চলছিল' (১৯৮৯:১২)।

[৮২] 'শতবর্ষের ফেরারী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধে আহমদ ছফা বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি উপন্যাসের সাথে বিপ্লবের প্রায়োগিকতা তুলনা করে লিখেছেন– 'আনন্দমঠ'কে যদি কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর সঙ্গে তুলনা করা হয়, 'কৃষ্ণচরিতের' তুলনা করতে হবে ডাস ক্যাপিটালের সঙ্গে। আনন্দমঠে বঙ্কিম যে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রণধ্বনিটি উচ্চারণ করেছেন এবং কৃষ্ণচরিতে সেই হিন্দুরাষ্ট্রের একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন। (ছফা, ২০০৮ঙ:৩৭১)

[৮৩] ছফা আরও দেখিয়েছেন যে, ইসলামের ইতিহাস থেকেও ধর্মরাষ্ট্রের অনুপ্রেরণা আহরণ করেছিলেন বঙ্কিম । ছফার ভাষায় 'বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের একটি আধুনিক চরিত কথা, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের দিকে লক্ষ রেখে রচনা করার প্রাক্কালে খুব সম্ভবত হযরত মুহম্মদ (স) এর জীবনী খুব মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছিলেন।' এবং 'কৃষ্ণচরিত রূপায়ণে হযরত মুহম্মদের জীবন-চরিত বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকখানি সহায়তা করছে'। 'কৃষ্ণচরিত'-এর সাথে বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধের তুলনা দিয়ে ছফা উল্লেখ করেছেন, এই দুটি গ্রন্থ একটি অপরটির পরিপূরক। (ছফা, ২০০৮ঙ:৩৭৭-৭৮)

[৮৪] ১৯৮৯ সালে রচিত 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' দ্বিতীয় খণ্ডে ছফা লিখেছেন– 'উনিশ শ' পঁচাত্তরের পট-পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্ররূপটির মধ্যে অনেকগুলো মৌলিক ব্যয় পরিবর্তন এবং রূপান্তর ঘটে গেছে। একটু একটু করে ধর্ম আবার উঠে এসেছে। ধর্মতান্ত্রিক চেতনা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাকে নানাদিক থেকে জখম করার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে এবং জটিল হয়ে পড়েছে, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে' (ছফা, ২০০৮জ:৩৪০)।

[৮৫] একই প্রস্তাবনা ছফা আরও কয়েকবার ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে উপস্থাপন করেছেন।

[৮৬] ১৯৭২ সালে *দৈনিক গণকণ্ঠ* পত্রিকায় ১৭টি কিস্তিতে প্রকাশিত হয় 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'। ১৯৯৭ সালে 'সাম্প্রতিক বিবেচনা' শিরোনামে দীর্ঘ ভূমিকা যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন, বদরুদ্দীন উমর ও ড. আহমদ শরীফ।

১৯৪৮ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তির জগতে সংঘটিত আলোড়ন-স্থবিরতা, কৃতি-বিকৃতি, অন্ধত্ব-লেজুড়বৃত্তি এবং বহু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাপ্রবাহের সমাজঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুনবিন্যাস' প্রবন্ধ। আবার ১৯৭২ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পরবর্তী পঁচিশ বৎসরের কালগত ব্যবধানে বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে পুরাঘটিত ও ঘটমান সংস্কার-সংক্রমণ, আবর্তন-পরিবর্তনকে ছফা মূল প্রবন্ধের সাথে একত্রিত করে 'সাম্প্রতিক বিবেচনা' আকারে সংগ্রথিত করেছেন।

উল্লেখ প্রয়োজন যে, দুটি সংস্করণই পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে রাষ্ট্রপরিচালনায় আসীন আওয়ামী লীগ-সরকারের অনধিক এক বৎসরের স্থায়িত্ব কালে রচিত ও প্রকাশিত।

[৮৭] যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সকল শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-জাতির মানুষকে নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গুরুত্ব উল্লেখ করে 'সাম্প্রতিক বিবেচনা' ভূমিকাংশে ছফা লিখেছেন–

বাংলাদেশে যে নতুন রাষ্ট্রসত্তাটি জন্ম নিয়েছে, তার যে দাবি সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই অঞ্চলের সংখ্যাগুরু অধিবাসী মুসলমান। শুধুমাত্র ধর্মের বন্ধনকে মান্য করে দেড় হাজার মাইল দূরবর্তী একটি অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে এক রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস সম্ভব নয় বলেই নতুন একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে এবং রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হিসেবে ধর্মের স্থান থাকতে পারে, সেই প্রত্যয়টা খারিজ করে দিয়েছে। তারপরেও একটা প্রশ্ন মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠী যাদের বেশিরভাগ দরিদ্র এবং নিরক্ষর, তাদের জন্য নতুন সমাজের প্রয়োজনে ধর্মের অভিভাবকত্বহীন একটা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশের সকল ধর্মের এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নির্মাণ করার চ্যালেঞ্জটা যখন সামনে এল, দেখা গেল বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের তার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা, প্রস্তুতি, মেধা এবং মানসিকতা কোনটাই নেই। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে একটি সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর প্রয়োজন সবচাইতে অধিক ছিল। একটি সর্বব্যাপ্ত জাগরণ, নতুন মানসিকবোধের উদ্বোধন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক একটি উত্থানের ঢেউ লেগে শিল্প, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের কোন শাখা হৃদ্য, সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। পাকিস্তান আমলে যে সকল ব্যক্তি, পাকিস্তান সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ভেতর থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি কখনো ক্ষীণ, কখনো জোরাল সমর্থন ব্যক্ত করার চেষ্টা করতেন, স্বাধীন বাংলাদেশে

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা একটা নিরাপদ অবস্থান পেয়ে গেলেন। দেশটির সংস্কৃতির অভিভাবক নতুন ব্রাহ্মণের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় আত্মতুষ্টি এবং তোষামোদের এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করলেন, বাঙালি জনগোষ্ঠীর মুক্তি-সংগ্রাম তরঙ্গ তার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠল না। কৃষক, মজুর, দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিক আত্মত্যাগ করেছে, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন চিহ্নই তাঁদের চিন্তা-চেতনায় স্থান করে নিতে পারেনি। তাঁরাও বাঙালির রাষ্ট্র, বাঙালি জনগণের কথা বলতেন কিন্তু সেগুলো বিমূর্ত ধারণার অধিক কিছু ছিল না। বাস্তবে যে বাঙালি জনগণ প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম সম্ভাবিত করেছে, সেই হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান জনগণকে এক সূত্রে বেঁধে একটি সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তোলার স্বপ্ন কখনো তাঁদের মনে সঞ্চারিত হয়নি। (ছফা, ২০০৮চ:১৭০,১৭১)

[৮৮] যদিও পরিবর্ধিত সংস্করণে তিনি দাবি করেছেন যে, তিনি আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন 'বাংলাদেশের তৎকালীন সমাজের বাস্তব অবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শের ফাঁকা বুলির মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ এত অধিক ছিল যে এক বছর সময়ের মধ্যেই আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল, এ জিনিস চলবে না, চালানো যাবে না। একটা বিপত্তি ঘনিয়ে আসছে' (ছফা, ২০০৮চ:১৫৯)।

[৮৯] ছফা এসব প্রচারণার কিছু নমুনা দিয়েছেন, তাঁর ভাষায়–'তাঁরা মসজিদ এবং মাদ্রাসাসমূহকে তাদের কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করতে থাকলেন। ওয়াজ মাহফিল, ধর্মীয় জলসা, নবীর জন্ম-মৃত্যু তারিখ দশ-পনের দিনব্যাপী সিরাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকলেন। পাকিস্তান যতদিন টিকে ছিল সমাজের ভেতর থেকে এই ধরনের ধর্মীয় জিগির কখনা উত্থিত হতে দেখা যায়নি।' এভাবে ধর্মীয় আয়োজনের আড়ালে মানুষের কাছে তাদের বক্তব্য ছিল –'ভারত পাকিস্তানকে হটিয়ে গোটা বাংলাদেশটা দখল করে বসেছে। এই দেশে মুসলমানদের ধন, প্রাণ, ঈমান কিছুই নিরাপদ নয়।' শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামীর অনেক পলাতক সদস্য 'সঙ্ঘবদ্ধভাবে জোরালো প্রচার চালাতে আরম্ভ করেন। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য লন্ডন অফিসটি ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যের সকল শ্রেণির মানুষদের বোঝাতে থাকেন যে বাংলাদেশে ইসলাম সত্যি সত্যি বিপন্ন। ভারতের হিন্দুরা বাংলাদেশ দখল করে ফেলেছে। বাংলাদেশে অনেকগুণ বেশি ইসলামকে জীবিত রাখতে হলে সেখানে গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র মসজিদ এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।' তাই ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের পঁচিশ বছরে দেশে যত পরিমাণে মসজিদ মাদ্রাসা তৈরি হয়নি, বাংলাদেশ আমলের পঁচিশ বছরে তার চাইতে অনেকগুণ বেশি মসজিদ মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে। বিস্তারিত– আহমদ ছফা (২০০৮চ:১৭৪, ১৭৫)।

আরও গুজব-অপপ্রচার সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করে তুললো–'মুসলিম বাংলার সমর্থকরা মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ধর্মীয় সভাগুলোতে ফিসফিস করে বলতে আরম্ভ করলেন, ভারত পাকিস্তানকে হটিয়ে গোটা বাংলাদেশটা দখল করে বসেছে। এই দেশে মুসলমাদের ধন, প্রাণ, ঈমান কিছুই নিরাপদ নয়' (ছফা, ২০০৮চ:১৭৪)।

[৯০] 'বঙ্গভূমি আন্দোলন রাষ্ট্রধর্ম মুক্তিযুদ্ধ : বাংলাদেশের হিন্দু ইত্যাকার প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে ছফা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ডিমরালাইজেশন' প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতার পরবর্তী হিন্দুমানসের ধ্যান-ধারণা একরকম নয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে সম্পন্নহিন্দুদের বেশিরভাগ এক দেশে বাস করলেও সব সময় ভারতে চলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন এবং উপযুক্ত সময়টির অপেক্ষা করতেন। .... স্বাধীনতার পরে হিন্দু মানসিকতার এই দ্বিমুখীনতার অবসান ঘটানোর একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্যগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। অধিকারের ব্যাপারে এতকাল যারা টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করেননি, হঠাৎ করে সব ব্যাপারে মুখ খুলতে আরম্ভ করেছেন' কারণ 'স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় আর্থিক দিক দিয়ে সর্বস্বান্ত হলেও তাদের একটা সাময়িক তৃপ্তিবোধ ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁরা আর দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক নন। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে তাঁদের একটা অধিকার জন্মে গেছে। মুক্তিযুদ্ধে রক্ত দিয়ে, প্রাণ বিসর্জন করে সে অধিকার তাঁরা আদায় করেছেন।' কিন্তু সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে 'দক্ষিণপন্থীদের, বামপন্থীদের জোর প্রচারণা আওয়ামী লীগ ভারতের কাছে দেশ বেচে দিয়েছে' এবং সঙ্গে দুর্ভিক্ষ-অনাচার-দুর্নীতির বাস্তবতা যুক্ত হওয়ায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একাংশ 'হিন্দুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা উচ্চারণকেও ভাল চোখে দেখতে পারেননি।' এই সাম্প্রদায়িক অংশ সমাজের অধিকাংশ মানুষকে সাম্প্রদায়িক ভেদ-সংঘাতের দিকে পরিচালিত করে সফল হয়েছিল। ফলে হিন্দুবিরোধিতা ভারত-বিরোধিতার সমার্থক হয়ে দাঁড়াল। জাতীয়তাবোধকে নানাসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার কোন গঠনমূলক উদ্যোগ না থাকায় এসময় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার তেজ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল বলে ছফা লিখেছেন। (ছফা, ২০০৮জ:১১৩-১৫)

[৯১] চিত্তরঞ্জন সুতার এবং ড. কালিদাস বৈদ্যর নেতৃত্বে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলনে ছফা পার্শ্ববর্তী দেশের হিন্দু মৌলবাদীদের ইন্ধনের ইঙ্গিত দিলেও 'মুসলিম বাংলা' গঠনের তৎপরতায় পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা ও বাংলাদেশের চীনপন্থী রাজনীতিকদের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করেননি। তবে ধর্মযুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে ছফার অভিমত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর যুক্তি, তালেবানদের পক্ষে যুদ্ধ করতে বাংলাদেশের মুসলমানদের যদি মাদ্রাসায় অস্ত্র-প্রশিক্ষণ নেয়া যায়, তাহলে হিন্দু ছাত্রদের কেন অনুরূপ কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া যাবে না। ছফা আরও মনে করেন 'মুসলমানেরা যদি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে পারে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অত্যাচারের শিকার হওয়ার চাইতে সাম্প্রদায়িকভাবে সংগঠিত প্রতিবাদ রচনা করা অনেক পুরুষোচিত কাজ।'

বিস্তারিত – 'বঙ্গভূমি আন্দোলন রাষ্ট্রধর্ম মুক্তিযুদ্ধ : বাংলাদেশের হিন্দু ইত্যাকার প্রসঙ্গ' (২০০৮জ:১২২), 'সাম্প্রতিক বিবেচনা' (২০০৮চ:১৭৮-১৮০)।

Dhaka University Institutional Repository

[৯২] এরই ফল, ফজলুল হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট সরকার। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে বামপন্থীরা শাসকগোষ্ঠীর বিপক্ষে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করার জন্য জনমত সংগ্রহের অভিযান আরম্ভ করে দিয়েছিল। এমনকি আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টে বামপন্থীদের কোন প্রতিনিধিত্ব না রাখতে চাইলেও বামপন্থীরা পূর্ববাংলার দাবি-দাওয়ার বাস্তবায়িত করার জন্য এই জোট গঠনের উদ্যোগ থেকে সরে আসেনি। (কামরুদ্দীন, ২০০২:১১১)

[৯৩] নকশালবাড়ি আন্দোলনের উদ্ভব উপমহাদেশের রাজনৈতিক পটপ্রবাহের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। বাংলাদেশের রাজনীতির সাথেও এই আন্দোলন সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে একাত্তরের আগেই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতামূলক মনোভাব গ্রহণের সোভিয়েত নীতির প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে রাশিয়া-চীন দ্বিধাবিভক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন রুশপন্থী-পিকিংপন্থী মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে যায়। এসময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাওৎ সে তুং- অনুসৃত কৃষিবিপ্লব সফল করার লক্ষ্যে শ্রেণিশত্রু নিঃশেষ করার সহিংস পন্থা নির্ধারণ করে বিপ্লবী চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সমাজবিপ্লবের তারুণ্যদীপ্ত আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। পশ্চিবঙ্গের নকশালবাড়ি এই আন্দোলনের উৎসস্থল বলে এটি পরিচিতি পায় নক্‌শাল আন্দোলন নামে এবং খুব দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত ‘ভারতীয় দৃশ্যপট:নক্সাল ও আমরা বাঙালি’ প্রবন্ধে ভাষ্য অনুযায়ী নকশাল রাজনীতি উদ্ভবের কারণ উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং বুর্জোয়া অর্থনীতির সংকটের মধ্যে নিহিত বলে মনে করেন আহমদ ছফা। তিনি এ রাজনীতির অগ্নিগর্ভ তারুণ্যনির্ভর বৈপ্লবিক পন্থায় সমাজপরিবর্তনের আলোড়নকে সমর্থন করেন, তাদের অঞ্চল বহির্ভূত রাজনৈতিক আনুগত্য বা সন্ত্রাস-নির্ভরতাকে মনে করেন ‘বিপ্লবের একটা দিক মাত্র’। নক্সাল আন্দোলনের ব্যর্থতা, ছফার মতে, সাময়িক এবং এর পুনরুত্থান অদূরভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী–

> ভারতীয় বুর্জোয়ার কিংকর্তব্য অবস্থা এবং বামপন্থী রাজনীতির পাতি-বুর্জোয়া, সুবিধাবাদ, অন্ধ লেজুড়বৃত্তির টানাপোড়নে সমাজের একেবারে অভ্যন্তর থেকেই নক্সাল রাজনীতির জন্ম। নক্সাল রাজনীতির যত ভ্রম-প্রমাদ ঘটে থাকুক-না কেন, তাদের সম্পর্কে একটি সত্যি কথা হল, তারা ইতিহাসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে একটি সামাজিক, রাজনৈতিক সংকটের সামনে বুক ঠুকে দাঁড়াতে পেরেছিল। আগেই বলেছি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তারপরে নক্সাল আন্দোলনের জোয়ার হঠাৎ করে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়, প্রেইরি দাবানলের মত দাউ দাউ বেগে জ্বলে উঠে, অকস্মাৎ একেবারে নিভে যায়। নক্সাল আন্দোলনের উদ্ভব এবং বিলয়ের এই আকস্মিকতা দেখে অনেকে মনে করেছিলেন, ডিরোজিয়ানদের আন্দোলনের মত হয়ত নক্সালদের আন্দোলনও থেমে গেছে। তাঁদের এই পর্যবেক্ষণ যে সত্যি নয় তা প্রমাণিত হতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হবে না। (ছফা, ২০০৮ছ:২০৭)

এই আশাবাদ মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই ছফা লালন করছিলেন। নকশাল রাজনীতির প্রতি ছফার সমর্থন এবং পুনরুত্থানের আশাবাদ বারবারই প্রকাশ পেয়েছে। তবে যে সামাজিক শূন্যতা বা বুর্জোয়া রাজনীতির ব্যর্থতাকে নকশাল রাজনীতির উত্থানের কারণ বলে তিনি মনে করেন তার ব্যাখ্যা আমরা কোথাও পাই না। ধারণা করা যায়, বিভিন্ন রাজ্যে জাতীয়তাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আঘাত ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভাঙনের বহুমুখী সম্ভাবনা তৈরি করার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও ঐক্য বিনষ্ট হয়ে পড়ছিল। ফলে, একটি মাৎসন্যায়ের সম্ভাবনার প্রাক্কালে বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের জন্য নকশাল আন্দোলনের চেতনা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ছফার শব্দে– ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া রাজনীতি এমন একটি সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, প্রচলিত বুর্জোয়া-ব্যবস্থাপনার মধ্যে তার কোন সমাধান ছিল না। বুর্জোয়া শাসন, আইন-কানুন, শৃঙ্খলা, বুর্জোয়া-মূল্যবোধ বিচার-পদ্ধতি যা কিছু একটি সমাজ-ব্যবস্থাকে একটি অক্ষদণ্ডের ওপর স্থিত থেকে তার সবকিছু অকেজো হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় পুঁজির এসব সংকট, কেন্দ্রের সাথে রাজ্যসমূহের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব-দূরত্ব, সমাজে-রাজনীতিতে নানামুখী শূন্যতা থেকে নক্সাল রাজনীতির উপযোগী পরিস্থিতি যে কোন তৈরি হতে পারে।

নকশাল রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতিতেও ব্যাপক আলোড়ন তোলে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যর্থতাকে যিনি শুধু পাকিস্তান রাষ্ট্র নয়, ভারত রাষ্ট্রেরও ব্যর্থতা বলেও বিশ্বাস করেন, সেই ছফার পক্ষে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল করার যে-কোন আন্দোলন সমর্থন করাই স্বাভাবিক তবে বৈপরীত্যের বিষয় হল এই যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির অঞ্চল-বহির্ভূত অন্ধ-আনুগত্যের সমালোচনা করলেও নক্সালপন্থীদের চীনের চেয়ারম্যানকে নিজেদের চেয়ারম্যান বলার রাজনীতি তিনি সমর্থন করে যান।

[৯৪] এন.জি.ও নামে পরিচিত এসব সংগঠনের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজজীবনে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন ছফা। তন্মধ্যে ১৯৮৮ সালে রচিত ‘এনজিওদের নতুন তৎপরতা এবং রাজনৈতিক দলের ভূমিকা’, ‘রাজনীতির দৃশ্যপট : আন্তঃদলীয় প্রেক্ষিত’ এবং ১৯৯৬ সালে রচিত ‘এনজিও প্রসঙ্গে কিছু কথা’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব প্রবন্ধে ছফার বক্তব্য থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাহায্য সংস্থার নামে বিদেশি পুঁজি ও হস্তক্ষেপের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। বিষয়টি সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

আট-এর দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশে রাজনীতিতে দুটি নিয়ন্ত্রক শক্তি এক. এনজিও দুই. সেনাবাহিনী। পরবর্তী এক দশকে এটি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার দাবিদার হয়ে উঠছে। সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজেদের ভূমিকা পাকাপোক্ত করেছিল আগেই, বাকি ছিল এনজিও। তারাও ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজেদের দাবি পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করেছে। এ বন্যা রাজনৈতিক দলগুলোকে অগ্নিপরীক্ষার মুখে নিক্ষেপ করে। বন্যার্তদের অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় সংস্থান, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য দাতা দেশগুলোর অর্থসাহায্য এনজিওর মাধ্যমে বিতরণের প্রস্তাব নড়বড়ে সামরিক সরকার মানতে বাধ্য হয়। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এবং এনজিও কর্মীদের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী

Dhaka University Institutional Repository

এমন কর্মযজ্ঞে রাজনৈতিক দল ও কর্মীদের ভূমিকা না থাকায় তারা সামাজিকভাবে অনেকটাই কোণঠাসা অবস্থায়। সমাজ-বিচ্ছিন্নতা যেকোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের জন্য মারত্মক ক্ষতিকর। অপরপক্ষে বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে পটপরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, নতুন মোড় নেয় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন। রাজনীতিতে বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এনজিওগুলোর ভূমিকা ও গুরুত্ব বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ রাজনীতির দাবিদার বামপন্থীরা এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে বলে ছফার আশঙ্কা। বন্যার কারণে বাংলাদেশের সামাজিক স্থিরতায় যে বিলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তা যাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রগতিশীল শক্তির অনুকূলে না যায় সেজন্য এনজিও-র মাধ্যমে রিলিফ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশের সাহায্যদাতা দেশগুলো। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ছফা আবারও বামপন্থী প্রগতিশীল দলগুলোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংহত ফোরাম বা জোটের আশা করেছেন।

সামরিক সরকারের জনবিচ্ছিন্নতা ও মেরুদণ্ডহীনতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্যের সুযোগে এনজিও-গুলো আপৎকালে জনগণের মধ্যে গিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পালন করবে। পরিনতিতে তারা আমাদেরকে জড়িয়ে ফেলতে পারে নতুন নতুন বাধ্যবাধকতার জালে। তবে ছফা মনে করেন, রাজনৈতিক দলই পারে এসব কূটজাল ছিন্ন করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, সময়ের প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রের স্বপ্ন টিকিয়ে রাখতে। অপরপক্ষে, এক দশকের ব্যবধানে চিত্র পাল্টেছে বহুদূর। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা *অ্যাসলেট অন দ্য পভার্টি অব দ্য ওয়ার্ল্ড* -গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ছফা ব্যাখ্যা করেছেন যে, এনজিওর মাধ্যমে দেয়া অর্থ সাহায্য আসলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আরও বাড়িয়েছে। ৭০ ও ৮০র দশকে বিশ্বব্যাপী এনজিও কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করে কমিউনিজমের প্রসার রোধের জন্য। মূল লক্ষ্য দারিদ্র্য দূর করা নয়, দারিদ্র্যকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বিকাশসাধন করে তৃণমূল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। ১৯৯৬ -এ ছফা লক্ষ করেছেন– বাংলাদেশে পুঁজির বিকাশ দুভাবে ঘটছে। একটি হল লুম্পেন গোষ্ঠীর পুঁজি অর্থাৎ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে ধনী হচ্ছে যা ধ্রুপদী পুঁজিবাদের ঠিক বিপরীত। অন্যটি হল এনজিও-নির্ভর পুঁজি। জাতীয় ধনিকদের মত এনজিওরাও ক্ষমতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কারণ এনজিওগুলো, বিশেষত বড় এনজিও- গুলো, বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসা করছে। কিন্তু জাতীয় ধনতন্ত্রের ওপর যেমন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাদের থাকে দেশ-সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা তেমনটা এনজিওর নেই। তাই তার পুঁজির বিকাশ ঘটেছে দ্রুত। ছফার বিশ্লেষণ–

> এতদিন ধনীক শ্রেণী বাংলাদেশের রাষ্ট্রশক্তির নিয়ামক ছিল। তারা তাদের প্রয়োজনে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগাভাগি করেছে। সাম্প্রতিককালে এনজিও নির্ভর ধনতান্ত্রিক ধারাটি তেজী হয়ে ওঠার ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রে এনজিওগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। এখন এনজিও আমাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। (ছফা, ২০১১:১৫২)

এভাবে এনজিওগুলোকে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করার জন্য সরকারের ওপর দাতাসংস্থাগুলোর চাপ বাড়ছে। তারপরও ছফা মনে করেন, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সমাজের ধনতান্ত্রিক উত্তরণ প্রয়োজন তা এনজিও ধরনের ধনবাদ হলেও। কার্যক্রমের দিক থেকে ছফা বৃহৎ এনজিওর ধনবাদী চরিত্রের চেয়ে ক্ষুদ্র এনজিওগুলোর বিপ্লবী চরিত্রকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ সমাজের ছোট ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধনে ক্ষুদ্র এনজিওগুলোর ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। ছফার মতে, 'এনজিওগুলো যতক্ষণ ক্ষুদ্র থাকে ততক্ষণ অবস্থান থাকে এক একটি আন্দোলনের মত'। কিন্তু বৃহৎ এনজিওগুলোর পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারলে এইসব ক্ষুদ্র এনজিওগুলোর ভূমিকা থেকে সমাজ বঞ্চিত হবে। সেই সঙ্গে বামপন্থী নেতা-কর্মীদের সাংগঠনিক ও মনস্তাত্ত্বিক দূর্বলতার কারণগুলোও চিহ্নিত করেছেন।

[৯৫] 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' কোন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, সমাজবাস্তবতার প্রতিক্রিয়া। এতে মার্কসবাদীদের মত শ্রেণিবিশ্লেষণের চেষ্টা আহমদ ছফা করেননি, সমাজদেহে অসুখের লক্ষণ ও প্রতিকারকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন। ছফা নিজেই ভূমিকাতে লিখেছেন– 'আমি চারদিকে যা ঘটছে খোলা চোখে দেখে প্রতিক্রিয়াগ্রস্ত হয়ে আমার শঙ্কা, সন্দেহ এবং ক্ষোভের অভিব্যক্তি ছাপার হরফে প্রকাশ করেছিলাম। আমি যা লিখেছিলাম, তার একটা বাক্যও আমাকে গবেষণা করে আবিষ্কার করতে হয়নি। আমার চারপাশে যা ঘটছে তা দেখে চারপাশের মানুষের মুখের কথা শুনে আমার বয়ানটুকু তৈরি করেছিলাম।' তাই আবেগের সাথে যুক্তির বোঝাপড়া তাঁকে বারবার করতে হয়েছে। বুদ্ধির সাথে বিবেক ও কল্পনার শিল্পিত আভাস পাওয়া যায় বলেই 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'এ বিশ্লেষণটাই সব নয়; একজন স্বপ্নচারী মানুষের হৃদয়ও এখানে উদ্ভাসিত হয়।

'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রবন্ধের এই মৌলসূত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন যে, ১৯৯৭ সালে গ্রন্থটির সাথে ভূমিকা হিসেবে 'সাম্প্রতিক বিবেচনা' অংশ যুক্ত হয়ে একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে আহমদ ছফা স্পষ্টই বলেছেন যে, মূল রচনাটিতে তিনি সেসময়ের রাজনীতির ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করেননি সংশয়ের কারণে এবং তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতিও বিশ্লেষণের অনুকূল ছিল না। তাই 'সাম্প্রতিক বিবেচনা'তে সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে অতীতের কিছু অস্পষ্টতাকে আরো স্পষ্টতায় বিন্যাস করেছেন, যেমন- সুবিধাবাদী ও পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন–

> পশ্চিম-বাংলা থেকে যে সকল মুসলমান বুদ্ধিজীবী জিন্নাহ্ সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সৃষ্টির আশায় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন, তাঁদেরই একটা অংশ আচকান শেরোয়ানী পাল্টে গলায় খদ্দর ঝুলিয়ে তারস্বরে নিজেদের বাঙালি বলে জাহির

Dhaka University Institutional Repository

করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের এই উচ্চারণগুলো ছিল মেকি ভড়ং সর্বস্ব, একটি নতুন জাতির বিকাশ সম্ভাবিত করার জন্য তাদের পালনীয় কোন ভূমিকা ছিল না। জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করার বদলে তাঁরা বিভেদের বীজই বপন করলেন। (ছফা, ২০০৮চ:১৭১)

আবার রাষ্ট্রকাঠামো ও রাষ্ট্রাদর্শ বিতর্ক বা সংশয়, সাম্প্রদায়িকতার আগ্রাসন, ধনবাদী অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা [যেমন – 'জাতীয় টাকাওয়ালা মানুষেরা যদি সত্যিকার অর্থে জাতীয় বুর্জোয়ার স্থান দখল করতে পারত, একদিক থেকে দেশের জন্য সেটা মঙ্গলকর হত। বুর্জোয়ারা রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করত এটা ঠিক, কিন্তু সমান্তরালে কৃষক, শ্রমিক এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর রাজনীতি আপনিই বিকশিত হয়ে উঠত' (ছফা, ২০০৮চ:১৬৮)] ইত্যাদি সম্পর্কে নতুনতর উপলব্ধি ও অভিমত সংযোজিত হয়েছে 'সাম্প্রতিক বিবেচনা'তে।

[৯৬] 'সাম্প্রতিক বিবেচনা:বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রবন্ধে ছফা লিখেছেন– 'রাজনীতির ক্ষেত্রে যে জিনিসটি ঘটেছে, দেখা গেল সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে আরম্ভ করেছে। পশ্চিম-বাংলা থেকে যে সকল মুসলমান বুদ্ধিজীবী জিন্নাহ্ সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সৃষ্টির আশায় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন, তাঁদেরই একটা অংশ আচকান শেরোয়ানী পাল্টে গলায় খদ্দর ঝুলিয়ে তারস্বরে নিজেদের বাঙালি বলে জাহির করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের এই উচ্চারণগুলো ছিল মেকি ভড়ং সর্বস্ব, একটি নতুন জাতির বিকাশ সম্ভাবিত করার জন্য তাদের পালনীয় কোন ভূমিকা ছিল না। জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করার বদলে তাঁরা বিভেদের বীজই বপণ করলেন' (ছফা, ২০০৮চ:১৭১) ।

[৯৭] প্রায় একই সারকথা ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভূমি আন্দোলন রাষ্ট্রধর্ম মুক্তিযুদ্ধ:বাংলাদেশের হিন্দু ইত্যাকার প্রসঙ্গ' প্রবন্ধেও ছফা লিখেছেন–'শেখ মুজিবের পর মোশতাক। মোশতাকের পর জিয়া। সাম্প্রদায়িকতা সমাজের ভেতর থেকে ম্যানহোল উপচানো ময়লার মত উপচে পড়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাটাকেই আচ্ছন্ন করে ফেলল। সংখ্যাগুরু মুসলিম প্রগতিশীল রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তিসমূহের জন্য ছিল এগুলো বেদনাদায়ক ব্যাপার, হিন্দুদের কাছে এ ছিল প্রাণধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় নিশ্বাসবায়ুর অভাবের মত' (ছফা, ২০০৮জ:১২১)।

[৯৮] 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রবন্ধে ছফা লিখেছেন–'সমাজতন্ত্রের মূলকথা মানুষেকে ভেতর থেকে আত্মশক্তিতে আস্থাশীল করা, সৃজনীশক্তিতে এবং সহযোগিতায় বিশ্বাস করা। মানুষের সৃষ্ট সমস্ত কৃত্রিম বিভেদকে গুঁড়িয়ে ফেলে মানুষে মানুষে মিলনের পথ প্রশস্ত করা; সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মানুষী সত্তা যা সভ্যতার প্রাণবস্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন এবং আপন ক্ষেত্রে স্থিত করা' (ছফা, ২০০৮চ:২৩০)।

[৯৯] স্বাধীনতা-পূর্বকালে, বিশেষত ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নেও ধর্মীয় পরিচয় ও জাতিগত ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিস্তারিত– হুমায়ুন আজাদ (২০০০)।

১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমি আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধসমূহে পূর্ব বাংলার ২০ বৎসরের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এতেও ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জন প্রশ্নে বাস্তবতা এবং আলোচকদের মধ্যে মতবিরোধের চিত্র পাওয়া যায়। দেখুন– সরদার ফজলুল করিম (১৯৬৯)।

[১০০] আহমদ ছফার অগ্রন্থিত ও হারিয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি লেখা পুনরুদ্ধারের পর *হারানো লেখা* (২০১৫) শিরোনামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত 'সমাজ বনাম সুশীল সমাজ বিতর্ক'-নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে ছফা রাজনৈতিক অঙ্গনে 'সুশীল সমাজ' নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান তুলে ধরেছেন। ছফা দুর্নীতিবাজ সরকারি আমলা, বাণিজ্যিক স্বার্থান্বেষী ও সমাজসেবার নামে রাষ্ট্রক্ষমতালোভী এনজিওসমূহ, ড. মুহম্মদ ইউনুস বা ড. কামাল হোসেনের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দেশের রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে এনজিও-র নেতৃত্ব দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। (ছফা, ২০১৫:১২২)

[১০১] রাজনীতিতে ধর্ম-পেশীশক্তি-টাকা এই তিন ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী ছফা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এগুলো ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে 'ছাতা মাথায় নির্মল সেন আমি তাঁকে ভোট দেব' নিবন্ধে লিখেছেন, বাংলাদেশের রাজনীতি দক্ষিণপন্থী বলয়ে প্রবেশ করার কারণে এখানে নির্বাচনে টাকা খরচ করার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে; পাশাপাশি ঘটেছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রসার। অথচ ৮৬ শতাংশ মানুষ যে দেশে কৃষক সেদেশের নির্বাচনে এক শতাংশও কৃষক প্রতিনিধিত্ব নেই। এটি সাধারণ মানুষের জন্য অশুভ এবং বিপদজনক। সমাজে দরিদ্র মানুষের মধ্যেও বিত্তশালী রাজনীতিক দেখার অভ্যাস গড়ে উঠেছে যা আরো বেদনাদায়ক এবং উৎকণ্ঠাজনক পরিস্থিতি। এই পচে যাওয়া রাজনীতির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ– বিত্তহীন অথচ সৎ পরিচয়ে গৌরবান্বিত নির্মল সেনের সাদাসিধা অনাড়ম্বর নির্বাচনী পোস্টার–সেদিকেই আহমদ ছফার সমর্থন।

[১০২] 'মেজর জলিল এবং রাজ্জাকের বিবৃতি'-১৯৮৯ প্রবন্ধে ছফা লিখেছেন–'রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে অর্বাচীন মন্তব্য করতে আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়। কারণ শেষ পর্যন্ত আমাদের তাঁদের ওপরই নির্ভর করতে হবে। দূরদর্শিতা, মূল্যচিন্তা, উদারতাবোধ এসব বিসর্জন দিয়ে সত্যিকারের নেতা হওয়া যায়, এ কুসংস্কার এখনো পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। মানুষের যতরকম হীনতা, স্বার্থপরতা, নষ্টামি এবং সংকীর্ণতা আছে, সব যদি রাজনীতিবিদদের মাথায় সওয়ার হয়ে বসে আমরা দাঁড়াব কোথায় এবং ভরসা করব কিসের ওপর' (ছফা, ২০০৮ছ:৪২২)?

[১০৩] 'ছাতা মাথায় নির্মল সেন আমি তাঁকে ভোট দেব' নিবন্ধে ছফা লিখেছেন, 'বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র দেশে বামপন্থী রাজনীতির অপমৃত্যু এই দেশের ভুখা-নাঙ্গা জনগণের জন্যে সবচাইতে বেদনার সংবাদ নিয়ে এসেছে। বামপন্থীরা ক্ষমতা দখল করতে না পারলেও, রাজনীতিতে তাদের একটা শক্ত অবস্থান না থাকলে রাজনীতি পচে যায়' (ছফা, ২০০৮ঙ:৩১৯)।

আবার 'ধনতন্ত্রের ভবিষ্যত কি' প্রবন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এককেন্দ্রিক ক্ষমতাবিশ্বে সমাজতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে ছফার বক্তব্য-সংক্ষেপ থেকে এ বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গি স্পষ্ট হয়েছে–

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের ফলে দৃশ্যত পৃথিবী এককেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকল্প নেই, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সর্বতোভাবে। কিন্তু এটি অর্ধসত্য পূর্ণসত্য হল পৃথিবী এক কক্ষপথ থেকে আরেক নতুন কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক-দ্বন্দ্ব-স্বার্থ ভিন্নভাবে ভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। পৃথিবীর সংকট-সমস্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও জটিল আকার ধারণ করেছে। এ অবস্থায় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহও তাদের ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমন কোন পথনির্দেশ করে না আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থতেও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে দুনিয়া জুড়ে একটা বিরাট ভাঙচুরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহেরই আছে। (ছফা, ২০০৮ঘ:২৪৪)

[১০৪] ১৯৯৯ সালে কলকাতার *স্বাধীন বাংলা* সাময়িকীর জন্য দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ছফা বলেছেন– 'আধুনিক রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা তা আজ অনেক পাল্টে যাচ্ছে।এক সময় ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হত। তারপর ভাষাভিত্তিক। এখন ইকোলজিক্যাল বা পরিবেশভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণাটা চলে আসছে। বেঙ্গল, আসাম, উড়িষ্যা এ সমস্ত অঞ্চল মিলে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা অনেকেই উড়িয়ে দেননি' (ছফা, ২০০৮জ:৪৩৪)। এছাড়া এ বিষয়টি ছফা তাঁর প্রবন্ধেও উল্লেখ করেছেন।

[১০৫] প্রসঙ্গত 'বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র' প্রবন্ধে ছফার ভাষ্য স্মরণ করা যায়। তাঁর প্রস্তাবনা, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি ভারতীয় উপমহাদেশের কতিপয় বাস্তবতার মধ্যে থেকে জন্ম লাভ করেছে বিধায় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে সমগ্র বাঙালি জাতিসত্তার ও জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে একে গড়ে তুলতে হবে। এই ধারণাটি আধুনিক পরিবেশ রাষ্ট্র বা ইকো-স্টেটএর সমধর্মী। বাংলা ও বাঙালির ঐক্যের কথা ছফার বিভিন্ন রচনা ও সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত হয়েছে যেমন, 'আনুপূর্বিক তসলিমা বৃত্তান্ত' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন–

> আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলা এবং বাঙালির ঐক্যে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বঙ্গবাসী এব বঙ্গভাষী জনগণ একদিন একটি ঐক্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রসত্তার মধ্যে নিজেদের পরিচয় আবিষ্কার করতে সক্ষম তবে। এটা আমার নয়– অনেক বাঙালির মনের গভীরের লালিত স্বপ্ন, ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে আবর্তিত হয়েছে। তথাপি চূড়ান্ত বিপর্যস্ত মুহূর্তেও শরৎ বসু, কিরণ শঙ্কর, আবুল হাশেমের মত মনীষী পুরুষেরা বাঙালির ঐক্যের কথাটি তুলেছিলেন। তাঁরা জয়ী হতে পারেননি। কিন্তু সেই স্বপ্নটি এখনো মরে যায়নি। (ছফা, ২০০৮জ:১০১)

ভারতে কোন 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' তৈরি না হওয়ায় এবং উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া জাতীয়তার প্রভাবে ভারতীয় অঞ্চলগুলো ভাষাগত এবং জাতিগতভাবে আবার পুনর্বিন্যাস্ত হবে এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত আহমদ ছফা বিভিন্ন লেখায় দিয়েছে। এমন ভাবনা থেকেই আহমদ ছফার আশাবাদ প্রসারিত হয়েছে দুই বাংলার ঐক্য প্রক্রিয়ার সম্ভাবনায়। 'ভেবে দেখতে বলি' প্রবন্ধে এজন্য করণীয় সম্পর্কে আভাস দিয়ে ছফা লিখেছেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিম-বাংলার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং দুই বাংলার জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ভিত নির্মাণ করতে হলে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক তৈরি করতে হবে; শুধু তাই নয় এজন্য গৃহিত পদক্ষেপসমূহ হতে হবে 'শর্তমুক্ত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং পারস্পরিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত' । তিনি মনে করেন, দুই বাংলাতেই এমন মানুষ রয়েছে যারা বাঙালি জাতির শত্রু; যারা কখনও চায় না দুই বাংলার মানুষের মধ্যে ঐক্যের ভাব জাগ্রত হোক। বিশেষত 'বাংলাদেশ এবং তার সংস্কৃতি নিজের মত করে বিকশিত হয়ে সমস্ত বাঙালি জাতি এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে আলিঙ্গন করুক, এটা তাঁরা কিছুতেই চান না' (ছফা, ২০০৮ঙ:২১৮)। এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম এবং ছদ্মবেশী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায় আবার পশ্চিমবাংলার জনগণকে বাংলাদেশের সাথে ঐক্যবিরোধী তৎপরতায় বিভ্রান্ত করে। উভয় দেশের খাঁটি বাঙালি মানসিকতার জনগণের উচিত যার যার দেশের সেইসব স্বার্থান্ধ, সাম্প্রদায়িক মানুষগুলোকে চিহ্নিত করা। এসব ভাবনাকেই ছফা 'আকাঙ্ক্ষাপুরণমূলক' বলেছেন।

[১০৬] বিস্তারিত– 'কামরাঙ্গীর চরের মাদ্রাসায় শিক্ষাবিপ্লবের সূচনা', 'মাদ্রাসার ছাত্রদের ভবিষ্যত কি' ইত্যাদি প্রবন্ধ।

[১০৭] আহমদ ছফা মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাঙালির সার্বজনীন গৌরবময় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-মননশীলতাকে প্রেরণা মনে করলেও তাতে সবসময়ই ধর্মের প্রাধান্যকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। ছফার ভাষায়–

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রচিত 'বাংলাভাষা রাজনীতির আলোকে' প্রবন্ধে ছফার আলোচিত বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়–

> ধর্মই ছিল বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক চালিকাশক্তি। কেউ কেউ ধর্মকে বাদ দিয়েও রাজনীতির কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁরা ব্যতিক্রম, তাঁরা বিবেকসম্পন্ন একথা সত্য বটে। কিন্তু সেদিন তাঁরা গণজীবনে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারেননি। একথাটা নিশ্চতরূপে সত্য যে, ধর্মের নামে অপরিশোধিত আবেগ দিয়ে বাংলার মুসলমান পাকিস্তান চাইলেও তাঁরা একটা দীপ্ত ধারার সভ্যতার স্থপতি হতে চেয়েছিলেন, আদর্শ সমাজ নির্মাণ কতে চেয়েছিলেন। ইসলামের নামে লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনতার আবেগের ঘরে আগুন জ্বলে উঠেছিল। এ আবেগ ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নের এক মহান সম্পদ, সমাজ-তরণীকে অভীষ্ট লক্ষে চালনা করবার বাষ্পশক্তি। (ছফা, ২০০৮গ:১৫২)

[১০৮] উন্মুল, উদ্বাস্ত মানসিকতা অর্থে শব্দটি ছফা ব্যবহার করেছেন বাঙালি মুসলমান এবং বাংলাদেশের '৪৭-পরবর্তী মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর মানসিকতা প্রসঙ্গে। (ছফা, ২০০৮ক:১৭৩)

[১০৯] ২০০১ সালে প্রকাশিত *বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র* -গ্রন্থভুক্ত 'বাংলাভাষা বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা' প্রবন্ধে ছফা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, যার সারাংশ নিম্নরূপ–

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' সৃষ্টির পেছনে তৎকালের বিদ্বৎসমাজের চিন্তায় পরোক্ষভাবে যে বিষয়টি ক্রিয়াশীল ছিল তাহল, বাংলাকে সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলা। এ চিন্তার পেছনে মূল লক্ষ্য ছিল সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি শক্তিশালী করা। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাংলা থেকে বৃটিশ-ভারতের রাজধানী সরিয়ে দিল্লী নিয়ে যাওয়াতে বাংলাভাষা সবদিক থেকে গুরুত্ব হারায়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। তবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং তার প্রেরণালব্ধ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ ইতিহাসের কোন এক পর্বে বাঙালি মনীষীদের সেই আকাঙ্ক্ষার ভিন্নরকম বাস্তবায়ন।

[১১০] প্রচলিত প্রমিত বাংলা সম্পর্কে আহমদ ছফার এই মত মৌলিক নয়। আবুল মনসুর আহমদ বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার জন্য একটি ভিন্ন প্রমিত বাংলার প্রস্তাব করেন তাঁর *পাক-বাংলার কালচার* গ্রন্থে (পরবর্তীকালে *বাংলাদেশের কালচার* নামে পুনঃপ্রকাশিত)। প্রকৃতপক্ষে সেই বাংলা তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আঞ্চলিক ভাষা। আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন-'পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকদের সমবেত চেষ্টায় ঢাকায় পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলার ভাষার সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে একটি ঢাকাইয়া কথ্য বাংলা গড়িয়া উঠিবে এবং সেই ভাষাই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা হইবে। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক ডায়ালেক্টের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকায় শান্তিপুরী ডায়ালেক্ট যেমন তাহাদের ভাষিক একতার নিউক্লিয়াস হইয়াছিল আমাদের বিক্রমপুরী ডায়ালেক্ট, তেমনি ঢাকাইয়া ভাষার নিউক্লিয়াস হইতে পারিবে' (মনসুর, ১৯৬২:১৩২)।

[১১১] নিজের সাহিত্যচর্চার কারণ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে ছফার বক্তব্য– 'আমি সাধারণত তিনটি কারণে লিখি। মানুষের কল্যাণ করার উদ্দেশ্য যদি থাকে, তখন লিখি। যদি আর্টিস্টিক কিছু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য থাকে, তখন লিখি। আর যখন কোন কিছু প্রতিবাদ করার ইচ্ছা থাকে, তখন লিখি। (ছফা ২০০৮গ:৩০১)

[১১২] দেখুন– আহমদ ছফার রচনা 'এক সন্ধ্যার আলাপ'(২০০৮গ:৩৫৮); 'প্রসঙ্গ বাঙালি মুসলমান'(২০০৮গ:২৫০) এবং 'আহমদ ছফার সময়' (২০০৮ঙ:৪৩৯-৪০)।

[১১৩] ছফা মনে করেন, গৌতম বুদ্ধের ধারাই বাঙালি মুসলমানের আদিস্রোত। সেসূত্রে 'বাঙালি জতিসত্তা হিসেবে লালনকে আমরা চিন্তায় লালন করি, কারণ গৌতম বুদ্ধের যে চিন্তা, তা কবীরের কাছ থেকে বাহিত হয়ে লালন তা ধারণ করেছেন। লালনের গানগুলোর মধ্যে গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা ও চিন্তা এখনো বেঁচে আছে। অবচেতনে তা আমাদের মধ্যে ভয়ঙ্করভাবে নাড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথও সেখানে একবার প্রণত হয়েছে।' (ছফা, ২০০৮জ:৪৩০) এবং দেখুন– আহমদ ছফা (২০০৮ঙ:৪৪০)।

[১১৪] বিস্তারিত– আহমদ ছফা (২০০৮ছ:২৫৩)।

[১১৫] উদ্ধৃত– সাঈদ-উর রহমান (১৯৮৫: ৬১)। মার্কসবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক আনাতোলি লুনাচারস্কির ব্যাখ্যায় সাহিত্য-সমালোচক এবং সাহিত্য-ঐতিহাসিকের কর্মপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্য হল 'ইতিহাসবিদ সাহিত্যকর্মের উৎসের বস্তুভিত্তিক ব্যাখ্যা দেন, সমাজকাঠামোতে এর অবস্থান দেখান, সমাজজীবনে সাহিত্যের প্রস্তাব ব্যাখ্যা করেন, আর সমালোচকের মূল্যায়নের ভিত্তি সম্পূর্ণতই আঙ্গিক, সামাজিক উপযোগিতা বা ত্রুটির দিক।'

[১১৬] 'বাংলাভাষা:রাজনীতির আলোকে' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে ছফা লিখেছেন 'তিনি ছিলেন একজন মহান সামন্ত, যদিও পরবর্তীকালে বুর্জোয়া গুণপনা প্রশংসা করার মত মানসিকতা অর্জন করেছিলেন।' (ছফা, ২০০৮খ:২১১)

[১১৭] 'বাংলাভাষা:রাজনীতির আলোকে' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে ছফার বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে, '[নজরুল] এমন একজন শিল্পী যাঁকে আবেগসম্পদের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে। কিন্তু অতিরেক আবেগ কখনো সুমিত গদ্যের জন্য ভাল নয়। তাঁর অনিয়ন্ত্রিত আবেগ গদ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে যুক্তিগ্রাহ্যতা কিংবা শৃঙ্খলাবোধ দুয়ের কোনটারই দেখা মেলে না।' (ছফা, ২০০৮খ:২১৪)

[১১৮] বিষয়টি যথার্থ যুক্তি সহযোগে উপস্থাপন করেছিলেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর সুলিখিত 'নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন–'হিন্দু ঐতিহ্য মুসলিম ঐতিহ্য এ দুয়ের সংমিশ্রনের দায়িত্ব মুসলমানেরই, হিন্দুর নয়; কেননা হিন্দুর দুই উত্তরাধিকার নয়, মুসলমানের দুই উত্তরাধিকার। উত্তরাধিকারের ব্যাপকতায় মুসলমান হিন্দুর চেয়ে বড়, মাতৃসম্পত্তি ও পিতৃসম্পত্তি উভয়েরই সে ওয়ারিশ। মুসলমান যদি এই দুই অধিকার স্বীকার করে, তবে তার দ্বারা এর বড় সৃষ্টি সম্ভব– আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মন্থনদণ্ডে মন্থিত করে সে দুই সংস্কৃতিকে এক বিরাট নবসংস্কৃতিতে পরিণত করতে পারে।' (মোতাহের, ২০০৯:১৭৫)

[১১৯] 'সাম্প্রতিক বিবেচনা:বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'-এ ছফা লিখেছেন, 'কবি, সাহিত্যিক, লেখকেরা গর্ভিণী নারীর মত। তাঁরা জাতির গড়ে ওঠার, বেড়ে ওঠার বেঁচে থাকার ভ্রূণকণা অন্তর্লোকে ধারণ করে থাকেন। জাতীয় জীবনে যা ঘটে গেছে অতীতে, তাঁরা ভাবের আবেশে সামনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে ফেলেন– এই-ই হতে যাচ্ছে এবং এই-ই হবে।' (ছফা, ২০০৮চ :২০২)

[১২০] 'নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস' প্রবন্ধে রিভাইভালিজম ও রেনেসাঁর পার্থক্য নিয়ে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য – 'রিনেসাঁস মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের স্বাধীনতা, রিভাইভালিজম অহমিকাবোধ, রিনেসাঁস সাধারণ মনুষ্যপ্রীতি, রিভাইভালিজম বিশেষ জাতির বৈশিষ্ট্যপ্রীতি।' (মোতাহের,২০০৯:১৭৬)

উনিশ শতকে বাঙালির রেনেসাঁ বলে খ্যাত কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বুদ্ধিবৃত্তিক নবজাগরণকে ছফা খুব সীমিতভাবে বাঙালি হিন্দুর জাগরণ বা 'হিন্দু রিভাইভালিজম'বলে চিহ্নিত করেছেন। বিস্তারিত– আহমদ ছফা (২০০৮ঙ:৩৫৩-৪০০) এবং (২০০৮জ:৪১১)।

Dhaka University Institutional Repository

[১২১] 'সোশাল ডিসকোর্স'(Social Discourse) এর পারিভাষিক হিসেবে খুব সীমিতক্ষেত্রে 'সামাজিক পর্যালোচনা' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন ছফা । ছফা 'ডিসকোর্স' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ডিসকোর্স শব্দটি লাটিন 'ডিস্কার্সাস'(discursus) থেকে জাত যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'ছুটোছুটি করা'; মূলত মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত এবং বহুল প্রচলিত। তবে জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও এর বিপুল ব্যাবহার পাওয়া যায়। ডিসকোর্স হল কোন সামাজিক চর্চার তাত্ত্বিক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনা বা চিন্তার পদ্ধতি যা কোন ভাষায় প্রকাশ করা হয়; কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের পরিসীমা বা আওতায় থেকে সবার জন্য উন্মুক্ত আলোচনা বা মতপ্রকাশের একটি পদ্ধতি। তবে ডিসকোর্স কোন বদ্ধমত নয়, যে কোন বিষয়ের একাধিক আনুষ্ঠানিক মত বা বিবৃতির সমন্বয়। ক্ষমতা ও রাষ্ট্র – এই দুটি বিষয়ে ডিসকোর্সের ভূমিকা সর্বাধিক। বিস্তারিত– ফাতেমা-তাসমিন (২০১০:৯৪) অথবা উইকিপিডিয়া (http://en.m.wikipedia.org/wiki/Discourse)। আহমদ ছফা সমাজ ও সাহিত্যের ডিসকোর্সকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একাধিকবার শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

[১২২] এ বিষয়ে প্রখ্যাত মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক আনাতোলি লুনাচারস্কির মন্তব্য স্মরণ্য। মার্কসবাদী সমালোচকের সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যার পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন 'একটি শিল্পকর্ম, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সর্বদা লেখকের শ্রেণিমনস্তত্ত্বকে প্রতিফলিত করে।' আরেক বিশ্রুত মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক প্লেখানভের নিত্যসত্য বলে খ্যাত ব্যাখ্যা লুনাচারস্কির ভাষায় উদ্ধৃত করা যায়–'সমাজের কাঠামোর সঙ্গে একটি শিল্পকর্ম অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মাত্রায় যুক্ত। সেটা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে সমাজের শ্রেণিকাঠামো এবং শ্রেণিস্বার্থের ফলে সৃষ্ট শ্রেণিমনস্তত্ত্বের মত মধ্যবর্তী সংযোগের মাধ্যমে।' আবার ১৯৪২ সালে সাহিত্য-শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনেনের আলোচনা সভায় প্রদত্ত এক ভাষণে মাও সে তুং বলেন, 'শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রতিটি শ্রেণির নিজস্ব রাজনৈতিক ও শৈল্পিক মাপকাঠি রয়েছে। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজের প্রতিটি শ্রেণি অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক মানদণ্ডটিকে প্রথমে এবং শৈল্পিক মানদণ্ডটিকে পশ্চাতে বিবেচনা করে' (সাঈদ, ১৯৮৫:৬২,১১৭,১১৮)। এসব উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, লেখকের মনস্তত্ত্ব ও শ্রেণির মনস্তত্ত্ব অবিভাজ্য।

[১২৩] ইংরেজ আমলে উইলিয়াম কেরি আদর্শ বাংলা গদ্যের নমুনা তৈরির জন্য সংস্কৃত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে নিযুক্ত করেছিলেন। কেরি এক্ষেত্রে মধ্যযুগের পাঠান মুসলমান বাদশাহদের পথ অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। মুসলিম নৃপতিগণ পুরাণ-শাস্ত্র বাংলায় অনুবাদের জন্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ টোল-পণ্ডিতদেরকেই নিযুক্ত করেছিলেন, অনেকক্ষেত্রে বাধ্য করেছিলেন বলেও মত পাওয়া যায়। কারণ বাংলা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভাষায় আঠারো পুরাণ-বেদ-বেদান্ত কানে শোনা রৌরব নরকে যাওয়ার মত পাপ বলে গণ্য ছিল। বলা বাহুল্য, মুসলিম বা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর এই উদ্যোগের সামাজিক প্রভাব ছিল গভীর। দেখুন– দীনেশচন্দ্র সেন (২০১০:১০-১১)।

[১২৪] 'তিরিশের দশকের কবিদের বিষয়ে আমার প্রধান আপত্তি, তাঁরা বাংলা কবিতাকে মূল খাত থেকে স্থানচ্যুত করে একটি সংকীর্ণ খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। এটা বাংলা কবিতার জন্য ভাল হয়নি। অন্য ভারতীয় ভাষায় এরকম এলিট মাস্ দূরত্ব সৃষ্টি হয়নি।' (ছফা, ২০০৮গ:৩৫৯)

[১২৫] 'জীবনানন্দ দাশ:তাঁর কাব্যের লোকজ উপাদান:সাম্প্রতিক নিরিখ' প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের বিশেষত্বকে তাঁর কবি প্রতিভার প্রধান শক্তি বা চমৎকারিত্ব বলে সমালোচকদের মতকে আহমদ ছফা 'একপেশে' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, 'বিজ্ঞান দৃষ্টি এবং দার্শনিক প্রতীতি যা তাঁর কাব্যে ঋষি বাক্যের মত আলোচিত হয়েছে, সে সংযতবাক সিদ্ধপুরুষটির সৃষ্টির অবিনশ্বরত্ব শুধু অলঙ্কার জিজ্ঞাসার উপর ছেড়ে দেয়া একটি ঘোরতর অবিচার বলে মনে করি।' (ছফা, ২০০৮খ:২২৪)

[১২৬] বিভাগপূর্ব ও বিভাগোত্তরকালে আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের প্রবক্তাগণও জোরেশোরে এই আদর্শই প্রচার করতেন। বিস্তারিত— হুমায়ুন আজাদ (২০০০:৪-৬)।

[১২৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত – আহমদ ছফার প্রবন্ধ 'শতবর্ষের ফেরারী: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (২০০৮ঙ) এবং 'স্বাধীন বাংলা সাময়িকীর কলকাতা বইমেলা'৯৯ সংখ্যার জন্য সাক্ষাৎকার' (২০০৮জ:৪১১) ।

[১২৮] বাংলায় মুসলমান রচিত সাহিত্য সম্পর্কে হুমায়ুন কবিরের মূল্যায়নেও ছফা আলোড়িত হয়েছেন। মুসলমান সাহিত্যিকদের অপরিণত মানসিক স্তর ও জীবনাভিজ্ঞতা রূপায়নের ব্যর্থতা ছফাকে বিচলিত ও ব্যথিত করেছে। 'বাঙালি মুসলমানের মন', 'বাংলার সাহিত্যাদর্শ' ইত্যাদি প্রবন্ধ ছাড়াও হুমায়ুন কবিরের রচনার সূত্র ধরে *বাংলার কাব্য* গ্রন্থের ভূমিকাতেও একই হতাশা ব্যক্ত হয়েছে।(ছফা, ২০০৮ছ:৪০৬)।

[১২৯] দেখুন– আহমদ ছফা (২০১১:২০৩)।

[১৩০] দেখুন– আহমদ ছফা (২০০৮গ:৩৮১)।

[১৩১] 'প্রসঙ্গ বাঙালি মুসলমান' প্রবন্ধে ছফা লিখেছেন 'আমি যে সমাজ থেকে এসেছি সে বাঙালি মুসলমান সমাজটিকে যদি ন্যায়-নীতির দিকে, মানবতার দিকে, অসাম্প্রদায়িকতার দিকে এবং বিজ্ঞানদৃষ্টির দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করি, তাহলে আমার কর্তব্য অধিকতর ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারব। বাঙালি মুসলমান সমাজের বাইরে আরো আরো একটি বৃহত্তর বাঙালি সমাজ রয়েছে, তার প্রতিও আমার একটা দায়িত্ব এবং অঙ্গীকারবোধ যেটি আমার পক্ষে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমি ভেবে পাইনে আমার আপন সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা না করলে বৃহত্তর বাঙালি সমাজ কিংবা অধিকতর ব্যাপক অর্থে বিশ্বসমাজের কল্যাণ কি করে আমি সম্পন্ন করতে পারি। আমি আমার সমাজের কল্যাণ এবং উন্নতি কামনা করি, কিন্তু সেটা অন্য সমাজের কিংবা অন্য সম্প্রদায়ের কল্যাণের বদলে নয়।' (ছফা, ২০০৮গ:২৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

[১৩২] 'বাংলার চিত্র-ঐতিহ্য:সুলতানের সাধনা' প্রবন্ধে ছফা জয়নুল আবেদীন এবং সুলতানের চিত্রকর্মের সামাজিক ডিসকোর্স ব্যাখ্যা করেছেন, 'সুলতানের কৃষক জয়নুল আবেদীনের কৃষক নয়। জয়নুল আবেদীনের কৃষকেরা জীবনের সংগ্রাম করে। সুলতানের কৃষকেরা জীবনের সাধনায় নিমগ্ন। তারা মাটিকে চাষ করে ফসল ফলায় না। পেশির শক্তি দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গম করে প্রকৃতিকে ফুলে-ফসলে সুন্দরী সন্তানবতী হতে বাধ্য করে। এইখানে জীবনের সংগ্রাম এবং সাধনা, আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন, আজ এবং আগামীকাল একটি বিন্দুতে এসে মিশে গিয়েছে। সুলতানের কৃষকেরা নেহায়েত মাটির করুণা কাঙাল নয়।' (ছফা, ২০০৮ক:১৬৫)

[১৩৩] দেখুন– আহমদ ছফা (২০০৮ঘ:১১৬,১১৭)।

[১৩৪] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনাসূত্রে ছফা লিখেছেন, 'বঙ্কিম যে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রচিন্তাটি খাড়া করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে দৃঢ় একটি অবস্থান নিয়ে দীনেশ সেন সারাজীবন সাধনা এবং সংগ্রাম দুই-ই করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভর করেছেন সংস্কৃত সাহিত্য, ব্রাহ্মণ্যবাদ, গীতা, বেদ– এ সমস্ত জিনিসের ওপর। এগুলোর ভেতর থেকেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার উপাদান তিনি বের করে এনেছিলেন। কিন্তু দীনেশবাবুর সন্ধানের প্রকৃতিটি ছিল ভিন্নরকম। তিনি শাস্ত্র নয়, সন্ধান করেছিলেন সমাজ। ধর্ম নয়, তাঁর উপজীব্য ছিল মানুষ। সে মানুষ হিন্দু না মুসলমান এটা তার ধর্তব্যের বিষয় ছিল না। লোকায়ত জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে যে মর্মমধু তিনি আহরণ করেছিলেন, তার মর্যাদা এবং গুরুত্ব বঙ্কিমের মত অত দার্ঢ্য নিয়ে দাঁড়াতে না পারলেও গভীরতা অনেক অনেক গুণে বেশি। বাংলার পল্লীসমাজ, বাংলার লোকসাহিত্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি– এ সমস্ত জিনিসকে তাঁর মত এত হৃদয় দিয়ে কেউ গ্রহণ করেনি। তাঁর এই যে অনিদ্র অন্বেষণ, এর পেছনে একটা বিশ্বাসের আগুন ছিল। বঙ্কিম তাঁর প্রচণ্ড প্রতিভার প্রভাবে হিন্দু সমাজকে যে গোটা বাঙালি জাতীয়তার প্রেম থেকে সরিয়ে নিয়ে একটি উল্টো ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন, তার প্রতিবাদ করাই ছিল দীনেশ সেনের মূল লক্ষ্য।' (ছফা, ২০০৮ঙ:২২৩,২২৪)

[১৩৫] পার্টি সাহিত্য ও সর্বহারা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রুশ-বিপ্লবের নায়ক ভি.আই.লেনিন শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।(সাঈদ, ১৯৮৫:১২৬)

[১৩৬] দেখুন– সাঈদ-উর রহমান (১৯৮৫)।

[১৩৭] উদ্ধৃত –সাঈদ-উর রহমান (১৯৮৫:আট)।

[১৩৮] ব্যক্তিগত ডায়েরিতে ছফা লিখেছেন– 'মহৎ সাহিত্যের মধ্যে একটা পবিত্র প্রাণশক্তি সব সময়ই থাকে। এটা এক ধরনের আশ্চর্য রহস্যময় শক্তি। অনেকটা মাগফেরাত বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মত। বেশিরভাগ সমালোচক চোকলা নিয়েই নাড়াচাড়া করে, কদাচিৎ প্রাণশক্তির নাগাল পেয়ে থাকে। অন্তত আমার কাছে এ সত্য স্পষ্ট হয়েছে, সাহিত্যমনা লোকেরা কদাচিৎ মহৎ সাহিত্য উপলব্ধি করতে পারে। বড়জোর তাদের দৌড় উপভোগ পর্যন্ত।' (ছফা, ২০০৮ক:৩০৬)

[১৩৯] 'ইস্পাত কেবল লোহার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, টেক্সই এবং শক্ত তা-ই নয় ইস্পাতের মধ্য দিয়ে লোহার জন্মান্তর ঘটে, ঠিক এভাবেই কবিতার মধ্য দিয়ে জন্মান্তর ঘটে শব্দের।' (ছফা, ২০০৮গ:২৪৫)

[১৪০] স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে যেসব জ্ঞানধারা ক্রিয়াশীল ছিলো তার মধ্যে ছফার জ্ঞানপর্যালোচনাকে একটি শক্তিশালী ধারা উল্লেখ করে ফরহাদ মজহার সেই ধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন – 'সেই ধারা ব্যক্তির মুক্তি আস্বাদন করতে চায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মুক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মুক্তির সম্পর্ক বিচার করতে চায়, সেই সম্পর্কের মহিমা বুঝতে চায়, লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয় হতে চায়। তরুণ বয়সে তার সেই অন্বেষণ অধিকতর পরিণত বয়সে এসে অসাধারণ প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠেছিল' (ফরহাদ,২০০৩:৩১৪)।

[১৪১] 'আবুল হাশিম শ্রদ্ধাঞ্জলি' নিবন্ধে ছফা লিখেছেন– 'আমি একেবারে স্কুল-জীবন থেকে ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টির লোকদের সংস্পর্শে বড় হয়েছি। আমার মানস গঠনে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের অনেকখানি প্রভাব অদ্যাবধি সক্রিয়' (ছফা, ২০০৮ছ:১২৮)।

[১৪২] পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি– 'হে ঈশ্বর আমাকে রুটির মত করে দাও, যেন ক্ষুধার্ত মানুষ আমাকে খেতে পারে। গাছের মত করে দাও, যার তলায় ক্লান্ত পথিক আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। টলটলে জলভর্তি আকাশ পানে কালো চোখ মেলা দিঘী করে দাও, যাতে তৃষ্ণার্ত মনের তৃষ্ণা হরণ করতে পারি' (ছফা, ২০০৮গ :২৪৭)।

[১৪৩] ১৯৯৬ সালে রচিত 'লেখক-সাহিত্যিকদের একটা প্রতিবাদ মঞ্চে সমবেত হওয়া প্রয়োজন' নিবন্ধে ছফা লিখেছেন– 'সমাজের ভেতর থেকে এমন একটি প্রতিবাদের ধারা ক্রীয়াশীল থাকা চাই, যেখানে প্রতিবাদ নেই সেখানে সাংস্কৃতিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রতিবাদহীন সাংস্কৃতিক মরুভূমিতে যে সকল লেখক-সাহিত্যিক সরকারের ধামাধরা লোক হিসেবে নিজেদের প্রভাব টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ চেষ্টা করে সমাজের মানুষের দৃষ্টিতে তারাও দুষ্কৃতকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়'(২০০৮ছ : ৪৪৬)।

[১৪৪] 'বাঙালি মুসলমানের মন' প্রবন্ধটি একরাতে একটুও না থেমে 'মুভমেন্টের ইমপালসে' লিখেছেন বলে জানিয়েছেন ছফা । একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় রচনাটি মনের উত্তেজিত অবস্থায় লিখিত হয়। তৎকালের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাহেবের উপদেষ্টা আবুল ফজলকে সীরাতুন্নবী মাহফিলে যোগ দিতে দেখে ছফার মনে এই প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। কারণ তাঁর ভাষায় 'আবুল ফজল ঘোষিতভাবে নাস্তিক হয়েও ক্ষমতার স্বাদ পেতে না-পেতেই নবীর মহিমাকীর্তনে মেতে উঠেছিলেন'। বাঙালি মুসলমান সমাজে কেন এমন ঘটে, এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের তাড়না থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ছফা 'বাঙালি মুসলমানের মন' রচনা করেন। যদিও 'আবুল ফজল ঘোষিতভাবে নাস্তিক' কথাটি তথ্যানুসারী বা প্রামাণ্য নয়। বিস্তারিত– আহমদ ছফা (২০০৮গ : ৩৮৫)।

[১৪৫] ছফা মনে করেন, শ্রেণি-অবস্থানসূত্রে মাদ্রাসার ছাত্ররা অধিক বিপ্লবী হওয়ার কথা, কিন্তু তারা তা হতে পারছে না কারণ মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনার আবেষ্টনীতে তারা বাঁধা পড়ে আছে। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষিত তরুণদেরকে নিয়েই বিপ্লবের রাজনীতি তথা সমাজপরিবর্তনের রাজনীতি এগিয়ে নিতে আগ্রহী। তাঁর মতে, মাদ্রাসা শিক্ষিত এই বিপুল তরুণদেরকে ছাড়া কোন সামাজিক বিপ্লব বা পরিবর্তন সফল হবে না। ধর্মই যাদের রাজনীতির মূলধন তারাই প্রগতিশীলতার পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের উদ্দেশ্যই পশ্চাদপদ জনগণের কুসংস্কারকে ব্যবহার করে সমাজের ভেতর অনগ্রসর চিন্তা-চেতনাকে বিস্তৃত করা। সামাজিক উচ্চচেতনা এবং ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন মাদ্রাসার ছাত্ররা যদি গ্রামের পশ্চাদপদ মানুষের মধ্যে কাজ করতে পারে তাহলে প্রগতির অন্তরায়কে প্রতিরোধ করা অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করেন ছফা। তাই নতুন করে সমাজবিপ্লবের উদ্যোক্তাদের কাছে মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে সহযাত্রী করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিস্তারিত– 'মাদ্রাসা ছাত্রদের ভবিষ্যত কি' 'কামরাঙ্গির চরের মাদ্রাসায় শিক্ষা-বিপ্লবের সূচনা ' ইত্যাদি প্রবন্ধ।

[১৪৬] 'কখনও কখনও আমার প্রাণ চায় আমি খুব ধর্ম-কর্ম করি। আমি মন্দিরে প্রার্থনা করেছি, গীর্জার প্রার্থনায় অংশ নিয়েছি। বৌদ্ধমন্দিরে প্রার্থনা করেছি। মসজিদ তো বলাই বাহুল্য। আমি ধর্ম বলতে এমন একটা জিনিসকে বুঝি, আমার নিজের অস্তিত্বের চাইতে বড় এবং স্থায়ী একটা ক্রিয়াশীল শক্তি সমস্ত কিছুকে বেষ্টন করে রয়েছে। এই মহাশক্তির প্রতি প্রণিপাত করার মানসিকতা, এটাকেই আমি ধর্ম বলতে চাই। যে উপলক্ষটিকে উদ্দেশ্য করে মানুষের চিন্তা উর্ধ্বগামী হয়, সেই বোধটিকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি' (ছফা, ২০০৮গ:৩৬২)।

[১৪৭] উপনিবেশবাদী বুদ্ধিজীবী অথবা উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীন দেশের চতুর বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদিতা, আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে ফ্রান্জ ফানোঁর (১৯২৫-১৯৬১) বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। উল্লেখ্য, এই আলোচনার সাথে ছফার *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস*-এর যুক্তপঠন খুবই প্রাসঙ্গিক ও কৌতূহলোদ্দীপক। বিস্তারিত – ফ্রান্জ ফানোঁ (২০০৬:৩৬-৪১)।

[১৪৮] বি-উপনিবেশায়ন পদ্ধতি সূচনার দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে *অরিএন্টালিজম*-খ্যাত এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ-কে উদ্ধৃত করে ফয়েজ আলম লিখেছেন– 'সাম্রাজ্যবাদ জাতির অতীতে যা দমন করে এসেছে, চাপা দিয়ে রেখে এসেছে, তা আবিষ্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বি-উপনিবেশায়নের একটা ভিত তৈরি হতে পারে, যেখানে দাঁড়িয়ে পরের পদক্ষেপগুলো নেওয়া যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সাহিত্য, সামাজিক আচার-প্রথা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে হবে' (ফয়েজ, ২০০৬:২২)। এই শ্রমসাধ্য ও উৎসুকী অনুসন্ধানের কাজটিই ছফা করেছিলেন, যা-কে ফরহাদ মজহার 'পাতাকুড়ানি ভূমিকা' নামে অভিহিত করেছেন (ফরহাদ, ২০০৩:৩০৮)।

[১৪৯] এ প্রসঙ্গে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ও প্রত্যাশা সম্পর্কে আহমদ ছফার মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। 'ছাতা মাথায় নির্মল সেন আমি তাঁকে ভোট দেব' নিবন্ধে ছফা যে প্রত্যাশার কথা লিখেছেন তা দেশের সকল জনগণেরই আকাঙ্ক্ষার শব্দরূপ –

> আমি আওয়ামী লীগকে ভয় করি এবং বিএনপিকে পছন্দ করি না। এরশাদকে সমর্থন করার প্রশ্নই ওঠে না। জামায়াতের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। আমি একা নই । আমার দেশের অনেক মানুষ তাদের একটি পছন্দসই দলের অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করে আসছেন, যে দলটিতে ভাল এবং অঙ্গীকারসম্পন্ন মানুষেরা থাকবেন, রাজনীতিকে একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করবেন, সমাজের দরিদ্র জনগণের অবস্থার উন্নতি করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস করে যাবেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করবেন, বেকার সমস্যার সমাধান করবেন, নারীর নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করবেন, কৃষক-শ্রমিক এবং নিম্নবিত্ত মানুষের স্বার্থের দিকে তাদের মনোযোগ কম্পাসের কাঁটার মত হেলে থাকবে, একটি অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন এবং সন্ত্রাসকে অসম্ভব করে তুলবেন। (ছফা, ২০০৮ঙ:৩২০)

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আবুল ফজল, আবদুল হক, আহমদ শরীফ, আহমদ ছফার প্রবন্ধে আলোচিত সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যের কেন্দ্র বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম মমত্ব ও আবেগীয় সংযুক্তি, সেক্যুলার-সমতাভিত্তিক-মানবিক সমাজ, ভাষিক জাতীয়তা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ তাঁদের চেতনার দীপ্তি এবং মানসসম্পদের ঐশ্বর্য। আলোচিত প্রাবন্ধিকগণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আবশ্যকতা স্বীকার করেও সমাজতন্ত্রে, সাম্যবাদে, কমিউনিজমে নিদেনপক্ষে ইসলামি-সমাজতন্ত্রে আস্থাবান ছিলেন কিন্তু কেউ কোনো দলীয় মতবাদ-মেনিফেস্টো বা আদর্শের কর্মী ছিলেন না। দেশ ও দেশের দরিদ্র-নিঃসহায় মানুষকে ভালোবাসা, সমাজের অসংগতি-অবিচার-আশা-সম্ভাবনার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিই ছিল তাঁদের সংবেদনশীল শিল্পীমানসের শক্তি। তাই তারা সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে গণমানুষ, গণসাহিত্যের কথাই বলেছেন।

ভাষাআন্দোলন-পরবর্তী পাঁচ ও ছয়ের দশক বাংলাদেশের মানুষের ঐক্য-সংহতি-প্রেরণা ও মনোবলের মন্ত্র 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর ঐন্দ্রজালিক বিস্তারের কাল। নির্বাচিত চারজন প্রাবন্ধিক সেই অগ্নিগর্ভ সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবুল ফজল তখনই 'জাতির বিবেক'— তরুণের প্রেরণা ও দিকনির্দেশক। নিভৃতচারী কিন্তু নির্ভীক আবদুল হক নামে-বেনামে *সমকাল*-এর পাতায় অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধের জন্ম দিচ্ছেন– রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের প্রারম্ভিক তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিতি তাঁর ছিলই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক আহমদ শরীফও একই কাজ করছিলেন– ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ-বিশ্লেষণের আলোকে জাতিসত্তা ও জাতীয়তার স্বরূপ প্রমাণে নিবিষ্ট বুদ্ধিজীবীর কাজ। আর সদ্য-কৈশোরোত্তীর্ণ তারুণ্য নিয়ে বৈপ্লবিক কর্মোন্মাদনায় আহমদ ছফার অফুরন্ত প্রাণশক্তি যুক্ত হয়েছিল চারপ্রজন্মের বাঙালির জাতীয়তাবোধকে মেধায়-প্রজ্ঞায়-অভিজ্ঞতায় কর্মে-সাহসে ও চেতনার বলিষ্ঠতায় একসূত্রে সংগ্রথিত করতে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবাদী প্রেরণার অঙ্কুরকে ভাষিক-জাতীয়তাবাদ-উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রস্ফুটন পর্যন্ত জাতীয় সংগ্রামের তাত্ত্বিক-ভিত্তি দিয়েছিলেন যে-কজন অক্লান্ত সাহিত্যকর্মী, নির্বাচিত চারজন প্রাবন্ধিক তাঁদের মধ্যে প্রধান।

আলোচিত চারজন প্রাবন্ধিক স্বকাল-পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আধা-সামন্ত সমাজের অবক্ষয় দেখেছেন ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামোর উত্থানের মধ্য দিয়ে, ঔপনিবেশিক সমাজের বিলয় দেখেছেন পুঁজিবাদী সমাজে মধ্যশ্রেণির উত্থানের মধ্যে, মধ্যশ্রেণির বিকাশের বহিঃপ্রকাশ দেখেছেন সামাজিক-আকাঙ্ক্ষার জাতীয় রূপায়ণের মধ্যে। রাধাকান্ত-রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে রেনেঁসার যে স্ফুলিঙ্গ আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদের মতো মনীষীদের চেতনায় প্রজ্জ্বলন করেছিল 'শিখা' তা জ্ঞান-মানবতা-যুক্তির আলো ছড়িয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের বদ্ধমত, অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারানুগত্যের অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিল। আবুল ফজল, আবদুল হকের চেতনার শক্তি সেখান থেকেই সংগ্রহ করেছিল প্রগতির মন্ত্র। আহমদ শরীফ বা আহমদ ছফার চেতনাতেও সেই একই মানবতাবাদের স্ফুলিঙ্গই ছিল ক্রিয়াশীল। প্রত্যেকেই নিজের সমাজের জন্য, সমাজের নিরবচ্ছিন্ন প্রগতি ও উন্নতির জন্য প্রবন্ধ-লেখায় মনোনিবেশ করেছেন, কলাকৈবল্যবাদী ছিলেন না কেউ। ভিন্ন ভিন্ন সময় ও প্রতিবেশের মানুষ হয়েও তাঁরা সবাই বাঙালি মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা, রক্ষণশীলতা ও পশ্চাৎপদতার কারণগুলো চিহ্নিত ও দূর করাকেই ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এজন্য ধর্মীয় গোঁড়ামি, শিক্ষাহীনতা, আত্মসম্মানবোধের অভাব ও ভ্রান্ত-জাতিত্বচেতনাকে দায়ী করেছিলেন চারজনই। তাঁরা কেউ নিজের প্রতিবেশে, কেউ গবেষণার তত্ত্বে কিংবা আচরিত জীবনাভিজ্ঞতায় এই সমাজের অসুস্থতা, বন্ধ্যাত্ব ও অতীতচারিতার কারণগুলো খুঁজে পেয়েছিলেন বলে তাঁদের প্রতিকার পন্থায় রয়েছে ভিন্নতা, তবে সবার উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা-উত্তরকালের সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের আশঙ্কা করেছিলেন সবাই– এটিকে একটি মুক্ত-বিকাশশীল সমাজের আশু বিপদ হিসেবে সনাক্তও করেছিলেন, তবে পরিস্থিতি উত্তরণে কেউ ছিলেন নৈরাজ্যবাদী, কেউ সমন্বয়বাদী, কেউবা সহানুভূতিশীল। তাঁরা স্বকালে স্ব-সমাজের অন্যায়-অব্যবস্থা, দুর্গতি-দুঃশাসন, জড়তা-প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে জোরালোভাবে মত প্রকাশের তাড়নায় বেছে নিয়েছিলেন প্রবন্ধের শক্তিকে। নয়তো *চৌচির* বা *রাঙ্গা প্রভাত*-এর ঔপন্যাসিক আবুল ফজল, *অদ্বিতীয়া* বা *ফেরদৌসী*-র নাট্যকার আবদুল হক, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*-র গবেষক আহমদ শরীফ কিংবা *ওঙ্কার* বা *পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ*-এর ঔপন্যাসিক আহমদ ছফা হতে পারতেন বাংলাসাহিত্যের খ্যাতিমান কবি, ঔপন্যাসিক, অমর নাট্যকার অথবা মননশীল, জ্ঞানসংগ্রাহী গবেষক। কিন্তু সময় ও সমাজের প্রয়োজনে তাঁরা শব্দশিল্পী হওয়ার চেয়ে শব্দসংগ্রামী হওয়াকেই অগ্রগণ্য করেছেন। তাই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা'র আন্দোলনসূচনায় আবদুল হকের যুক্তিনির্ভর প্রতিবাদে সচকিত হয়েছিল পক্ষ-প্রতিপক্ষ সবাই; আবুল ফজলের মানবতন্ত্র সুযোগসন্ধানী, বকধর্মিক-শাসকনির্মিত অচলায়তন ভাঙার মন্ত্র শিখিয়েছিল; আহমদ শরীফের বাংলা ও বাঙালির শিকড় সন্ধানের আলোতে আত্ম-পরিচয়ের ঠিকানা হয়েছিল নিঃসংশয়; আর স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিনষ্ট বিন্যাসে বিপর্যস্ত বাংলাদেশে হতাশ তারুণ্যের উজ্জীবনে আহমদ ছফার বিপ্লবের বীজ অন্বেষণের নিরলস সংগ্রাম চেতনাকে রেখেছিল সজাগ। এই সাময়িক কিন্তু ঐতিহাসিক সামাজিক প্রয়োজনের নিচে চাপা পড়েছিল তাঁদের অনেকগুলি মননশীল সম্ভাবনার ক্ষেত্র। প্রাবন্ধিকের সামাজিক দায়বদ্ধতা তাদেরকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে, পাঁচ ও ছয় দশকে স্বাধিকার আন্দোলনের উত্তাল সময়ে, শিল্প-সাহিত্যবৈরী বিজাতীয় সরকার ও সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বনামে-বেনামে প্রতিবাদী রচনা পত্রস্থ করেছেন, শাসকের সাথে বিরোধে-বিবাদে জড়িয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানেও এঁদের কাউকে ছুটতে হয়েছে। লেখক ও সমাজের জন্য মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যে কতটা জরুরি, চিন্তার স্বাধীনতা কত যে প্রয়োজন তা অনুধাবন করাই নির্বাচিত চারজন প্রাবন্ধিকের সমগ্র জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা– বিশেষত বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে এবং প্রয়োজনে এই উপলব্ধি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হতে পারে।

ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এবং উদার মানবতাবাদী চিন্তার পক্ষে নির্বাচিত প্রাবন্ধিকগণ সোচ্চার ছিলেন তাঁদের সাহিত্যচর্চার শুরু থেকেই। ধর্ম তাঁদের অভিনিবেশের বিষয় হয়েছিল সমাজ ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই। বিশেষত বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতার পথ মসৃণ ও অনিরুদ্ধ রাখতে এবং সংস্কৃতিকে সচল, বহুত্ববাদী, সৌন্দর্যাভিমুখী ও পরিগ্রহণশীল করতে তাঁরা প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন যেসব উপাদানকে তন্মধ্যে ধর্মের অপব্যাখ্যা ও গোঁড়ামিই প্রধান। অবশ্য এই বিবেচনা প্রযোজ্য কেবল বাঙালি মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে। কারণ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ে উদাসীনতা তথা স্বস্থ হতে না পারার ঐতিহাসিক কারণ তাঁর অপরিপক্ব ধর্মবোধ, একথা প্রমাণিত সত্য। আবুল ফজলের 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' থেকে আহমদ শরীফের 'স্বদেশ চিন্তা সংঘ' বা আহমদ ছফার 'লেখক শিবিরের' কাল পর্যন্ত ধর্ম-সাম্প্রদায়িক শক্তিমত্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার জোয়ারে ভাটা পড়েনি। প্রগতির পরীক্ষা দিতে হয়েছিল সবকালেই। সেদিনের লড়াইও ছিল একটি যুক্তিবুদ্ধিশাসিত জ্ঞানভিত্তিক সমাজের জন্য– যেখানে নারীর ব্যক্তিক-সামাজিক অধিকার স্বীকৃত হবে, ধর্মের নামে আচারনিষ্ঠতার বাড়াবাড়ি পরিহার করে নৈতিক-মানবিক দিকগুলো অনুসৃত হবে, অলৌকিকতার বদলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে ইহলৌকিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ঘটবে সৃষ্টিশীলতার বৈচিত্র্যময় উৎসারণ। অর্ধশতাব্দীকাল পরে একালের আহমদ ছফাকেও দেখি একইভাবে একই সংগ্রামের যোদ্ধা হতে। 'শিখা'র সংগঠকদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল, অবিকল সেই অভিযোগ উত্তরকালের নির্বাচিত প্রাবন্ধিকদেরকেও শুনতে হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন বিরোধিতা ও বাধার সম্মুখীনও হয়েছিলেন প্রত্যেকে। কিন্তু তাতে তাঁরা যেমন দমে যাননি, প্রগতির চাকাও থেমে থাকেনি। সমাজ এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতেই প্রগতির দিকে অগ্রসর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মূলগ্রন্থ

আবুল ফজল

১৯৬১। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা*, ইস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা।

১৯৬৫। *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন*, বইঘর, চট্টগ্রাম।

১৯৬৮। *সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

১৯৭৪। *সমকালীন চিন্তা*, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৯৭৪ক। *সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৩৮২। *রচনাবলী (১ম খণ্ড)*, বইঘর, চট্টগ্রাম।

১৯৮০। *সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলী*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

১৯৮৩। *মানবতন্ত্র*, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৯৮৩ক। *লেখকের রোজনামচা*, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৯৮৩খ। *দুর্দিনের দিনলিপি*, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৯৮৫। *শুভবুদ্ধি*, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৯৮৫ক। *রেখাচিত্র*, বইঘর, চট্টগ্রাম।

১৯৯৪। *রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)*, আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৯৯৭। *একুশ মানে মাথা নত না করা*, আগামী প্রকাশনী(দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা।

২০০৮। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

আবদুল হক

১৯৬২। *ক্রান্তিকাল*, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

১৯৬৮। *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ*, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

১৩৮০। *বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বইঘর, চট্টগ্রাম ।

১৩৮১। *সাহিত্য ও স্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৯৮৪। *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৯৯৩। *চেতনার এলবাম এবং বিবিধ প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৯৯৬। *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৫৩-'৯৩)*, নূরুল হুদা সম্পাদিত,ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

২০০৩। *স্মৃতি-সঞ্চয়-১*, সৈয়দ আজিজুল হক (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), সময় প্রকাশন, ঢাকা।

২০১২। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা।

২০১৪। *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব*, মুক্তধারা, ঢাকা।

আহমদ শরীফ

১৯৭৪। *কালিক ভাবনা*, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৯৭৮। *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য*, বর্ণমিছিল, ঢাকা।

১৯৯২। *সংস্কৃতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২০০১। *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, অনন্যা, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৬। *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০০৮। *যুগ-যন্ত্রণা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০১০। *আহমদ শরীফ রচনাবলী- ১*, আহমদ কবির সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০১০ক। *আহমদ শরীফ রচনাবলী- ২*, আহমদ কবির সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০১০খ। *আহমদ শরীফ রচনাবলী- ৪*, আহমদ কবির সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০১১। *কালের দর্পণে স্বদেশ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০১২। *সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।
২০১৩। *আহমদ শরীফ রচনাবলী- ৫*, ড. পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০১৪। *আহমদ শরীফ রচনাবলী- ৬*, ড. পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০১৪ক। *সমাজভাবনা* (ড. নেহাল করিম সংকলিত), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০১৫। *শাস্ত্র, সমাজ ও নারীমুক্তি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০১৬। *আহমদ শরীফ রচনাবলী- ৯*, ড. পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০১৬ক। *আহমদ শরীফ রচনাবলী- ১০*, ড. পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আহমদ ছফা

১৯৮৯। *শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, বুক সোসাইটি, ঢাকা।
২০০০। *আহমদ ছফার প্রবন্ধ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
২০০২। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, সম্পাদনা মোরশেদ শফিউল হাসান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
২০০৮ক। *আহমদ ছফা রচনাবলী ১*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।
২০০৮খ। *আহমদ ছফা রচনাবলী ২*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।
২০০৮গ। *আহমদ ছফা রচনাবলী ৩*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।
২০০৮ঘ। *আহমদ ছফা রচনাবলী ৪*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।
২০০৮ঙ। *আহমদ ছফা রচনাবলী ৫*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।
২০০৮চ। *আহমদ ছফা রচনাবলী ৬*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।
২০০৮ছ। *আহমদ ছফা রচনাবলী ৭*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।
২০১১। *উত্তরখণ্ড*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।
২০১২। *আহমদ ছফা রচনাবলী ৮*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।
২০১৪। *প্রবন্ধ সমগ্র (৩য় খণ্ড)*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।
২০১৫। *হারানো লেখা*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক-গ্রন্থ

অতুল সুর

১৯৭৬। *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

২০০১। *বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

অমল কুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৯৮। *রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

অমলেন্দু দে

২০১১। *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ,*

আজহার ইসলাম

১৯৯৯। *চিরায়ত সাহিত্য ভাবনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান

১৯৯১। *স্বরূপের সন্ধানে*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

১৯৯৯। *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রতিভাস, কলকাতা।

২০১২। *বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য*, জাগৃতি, ঢাকা।

আতিউর রহমান

২০০০। *ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি* (সম্পাদিত), ইউপিএল, ঢাকা।

আনোয়ার পাশা

১৯৮১। *সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল*, আনোয়ার পাশা রচনাবলী (প্রথম খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আফজালুল বাসার

২০০৩। *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি* (সম্পাদিত), (স্বদেশ চিন্তা সংঘ সংকলিত) আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আবুল আহসান চৌধুরী

২০০৭। *আলাপচারী আহমদ শরীফ*, সূচীপত্র, ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক

১৯৮৮। *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুস্তাফা মজিদ ও আফজালুল বাসার

২০০১। *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ* (সম্পাদিত), ইউপিএল, ঢাকা।

আবুল মনসুর আহমদ

১৯৬২। *বাংলাদেশের কালচার*, আহমদ পাবলিশিং, ঢাকা।

আবদুল মমিন চৌধুরী

২০০৯। *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

১৯৭৬। *সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ* (সম্পাদিত), মুক্তধারা, ঢাকা।

আবুল হাসনাত

১৯৮৭। *আবুল ফজল (ব্যক্তিস্বরূপ ও সাধনা)*, মুক্তধারা, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ কবির

২০১৩। *আহমদ শরীফ*, বর্ণায়ন, ঢাকা।

আহমদ শরীফ

২০০১। *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, অনন্যা, ঢাকা।

২০১৪। *রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড* (পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা সম্পাদিত), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

২০১৬। *রচনাবলী-৯ম খণ্ড* (পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা সম্পাদিত), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আহমাদ মাযহার

২০০১। *আবদুল হক*, জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আসহাবুর রহমান

১৯৮৭। *বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (সম্পাদিত), ইউপিএল, ঢাকা।

ইসরাইল খান

২০০৫। *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বংলা সাহিত্য পত্রিকা (১৯৩১-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২০০৬। *আচার্য আহমদ শরীফ* (সম্পাদিত), (স্বদেশ চিন্তা সংঘের পক্ষে) সূচীপত্র, ঢাকা।

উইলিয়াম হান্টার

২০১৩। *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স* (আবদুল মওদুদ অনুদিত), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ

২০০৯। *রিপ্রেজেন্টেশনস্ অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল,* (ভাষান্তর : দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু), সংবেদ, ঢাকা।

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ

২০০২। *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

খোন্দকার সিরাজুল হক

১৯৮৪। *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

খন্দকার ফজলে রাব্বি

১৯৬৮। *বাংলার মুসলমান* (মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গোপাল হালদার

১৯৮০। সংস্কৃতির *রূপান্তর*, মুক্তধারা, ঢাকা।

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১৯৯৮। *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

জয়নাল আবেদীন

২০০৫। *বাংলা বাঙালি বাংলাদেশ* (সম্পাদিত), কালান্তর গোষ্ঠী, ফেনী।

জয়া চ্যাটার্জী

২০১৪। *বাঙলা ভাগ হল (হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭)*, আবু জাফর অনুদিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা।

তালুকদার মনিরুজ্জামান

২০০৭। *বামপন্থী রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দীনেশ চন্দ্র সেন

২০০৬। *বৃহৎ বঙ্গ (১মও ২য় খণ্ড)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২০১০। *হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো

২০১০। *ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড* (অনুবাদ : দুলাল আল মনসুর), সংবেদ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলাম

১৯৯৪। *বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক*, মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায়

১৪১৬। *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ড. পঞ্চানন সাহা

২০১১। *হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নতুন ভাবনা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২০০০। *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

প্রথমা রায়মণ্ডল

১৯৯৬। *আহমদ শরীফ : নির্মোহ চিন্তার প্রতিকৃতি*, প্রতীক বুকস, কলকাতা।

ফকরুল চৌধুরী

২০১১। *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ* (সম্পাাদিত), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

ফয়েজ আলম

২০০৬। *উত্তর-উপনিবেশী মন*, সংবেদ, ঢাকা।

ফ্রান্‌জ ফানো

২০০৬। *জগতের লাঞ্ছিত* (অনুবাদ : আমিনুল ইসলাম ভুইয়া), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৪১৭। *বঙ্কিম রচনাবলী* (যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ

২০১০। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও উত্তরকাল*, অনন্যা, ঢাকা।

মঈদুল হাসান

২০১২। *মূলধারা'৭১*, ইউ.পি.এল, ঢাকা।

মাসউদ ইমরান

২০১০। *ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা* (সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মাহবুব বোরহান

২০০৮। *আবদুল হক : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

২০০৪। *সেরা সুন্দরম্* (সম্পাদিত), ইউ.পি.এল. ঢাকা।

মুস্তাফা মজিদ

১৯৮৭। *মুগ্ধ ও মুক্তদৃষ্টির রবীন্দ্র বিতর্ক* (সংকলিত), ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।

মুস্তাফা মজিদ ও আফজালুল বাসার

২০০১। *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ* (সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

২০০৯। *প্রবন্ধ সমগ* (সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পাদিত), নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

মোরশেদ শফিউল হাসান

২০০২। *ছফা ভাই : আমার দেখা আমার চেনা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

২০০৭। *পূর্ব বাংলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান

২০০৩। *আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ* (সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মো. আব্দুল মান্নান

২০০৮। *আবুল ফজলের প্রবন্ধে সমকালীন ভাবনা*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য

১৪১০। *বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য (১৯২০-১৯৩০)*, পাঠকবন্ধু লাইব্রেরি, ঢাকা।

রমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া ও বিপন চন্দ্র

১৯৭৬। *সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা* (অনুবাদ : তনিকা সরকার), কে.পি বাগচী এন্ড কোং, কলকাতা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

২০১০। *বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)*, জেনারেল পাবলিশার্স, কলকাতা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৩। *বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)*, বইপত্র, ঢাকা।

শামসুল আরেফীন

২০০৪। *আহমদ ছফার অন্দরমহল*, বলাকা, চট্টগ্রাম।

শ্যামলী সুর

২০০২। *ইতিহাস চিন্তার সূচনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ১৮৭০-১৯১২*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

শিখা আরেফিন

২০১৪। *কাজী মোতাহার হোসেন ও সমকালীন বাংলা প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সরদার ফজলুল করিম

১৯৬৯। *আমাদের সাহিত্য* (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২০০২। *দর্শন কোষ*, প্যাপিরাস , ঢাকা।

সলিমুল্লাহ খান

২০১০। *আহমদ ছফা সঞ্জীবনী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সাঈদ-উর রহমান

২০০১। *ওদুদ-চর্চা*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।

১৯৮৫। *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা।

সারোয়ার জাহান

১৯৮৭। *আবুল ফজল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ

২০০০। *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন (১৮১৮-১৮৩৫)*,আইসিবিএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর

২০১০। *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)* (সম্পাদিত), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সুকুমার সেন

১৯৭৫। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০০৫। *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আাকাদেমি, কলকাতা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

১৯৮৩। *উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যকরণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ও কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯৯। *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি : ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট* (সম্পাদিত), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

হায়াৎ মামুদ
১৯৮৫। *অমর একুশে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
হুমায়ূন আজাদ
২০০০। *ভাষা আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি, ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি* (সম্পাদনা– আতিউর রহমান), ইউপিএল, ঢাকা।
হুমায়ুন কবির
১৩৬৫। *বাঙলার কাব্য*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা।
Fanon, Frantz
2008 | *Black Skin, White Masks*, Pluto Press, London.

অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ :

মো. রিজাউল ইসলাম
২০০৫। *আহমদ শরীফ : সাহিত্য-সাধনা ও জীবনদর্শন*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ওয়েব-পাতায় প্রকাশিত বই/ব্লগ :

নূরুল আনোয়ার
ছফামৃত, কিস্তি ১-১০, http://arts.bdnews24.com/?p=2424 .
শুভাশীষ দাশ
ছফাগিরি, http://www.sachalayatan.com/subasish/28660 .
Eaton, Richard M.
1993, *The rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760*, University of California Press, London.
Link: http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/

সহায়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধসমূহ

অজয় রায়
২০০৫। 'বাঙালির আত্মপরিচয় : একটি পুরাবৃত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা', *বাংলা বাঙালি বাংলাদেশ* (সম্পাদনা– জয়নাল আবেদীন), চট্টগ্রাম।
অশ্রুকুমার সিকদার
২০১৪। 'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় ও ভাষাদ্বন্দ্ব', *হালখাতা* (সম্পাদনা– শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত), বাঙালি মুসলমান সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ২০১৪), ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জামান

২০০৫। ‘বাঙলা, বাঙালি ও বাংলাদেশী’, *বাংলা বাঙালি বাংলাদেশ* (সম্পাদনা– জয়নাল আবেদীন), চট্টগ্রাম।

আফজালুল বাসার

২০০১। ‘অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর চিন্তার বিষয়ব্যাপ্তি’, *আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ*, ইউপিএল, ঢাকা।

২০০১ক। ‘পার্থক্যের স্রষ্টা আহমদ শরীফ’, *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, অনন্যা, ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক

১৯৭৬। ‘কালের যাত্রার ধ্বনি’, *সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ* (সম্পাদনা– আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ), মুক্তধারা, ঢাকা।

২০০১। ‘অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব’, *আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ*, ইউপিএল, ঢাকা।

২০০১ক। ‘অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর শিক্ষকতা এবং স্বাজাত্যবোধ ও স্বাদেশিকতা’, *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, অনন্যা, ঢাকা।

২০০৬। ‘আহমদ শরীফ প্রণীত ‘বিচিত চিন্তা’’,‘আহমদ শরীফ : প্রবন্ধে তাঁর চিন্তা ও প্রবণতা’, *আচার্য আহমদ শরীফ*,সূচীপত্র, ঢাকা।

আব্দুল কাদির

১৯৮৭। ‘সাহিত্যচর্চায় আবুল ফজল’, *আবুল ফজল (ব্যক্তিস্বরূপ ও সাধনা)*, মুক্তধারা, ঢাকা।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

১৯৯৪। ‘জীবনবৃত্তান্ত’, *আবুল ফজল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আহমদ শরীফ

২০১৬। ‘সাহিত্যসাধক আবদুল হক’, *রচনাবলী-৯ম খণ্ড*, (পৃত্থিলা নাজনীন নীলিমা সম্পাদিত), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আহমাদ মাযহার

২০১২। ‘ভূমিকা’, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

আহমেদ স্বপন মাহমুদ

২০০৩। ‘প্রেক্ষিত : *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* : আহমদ ছফার সমাজদর্শন’, *আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ* (সম্পাদনা– মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ইমতিয়ার শামীম

২০০৩। ‘আহমদ ছফার বাঙালি, বাংলাদেশ’, *আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ* (সম্পাদনা– মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ইসরাইল খান

২০০১। ‘আশির দশকে ভাষার রাজনীতি ও অধ্যাপক আহমদ শরীফের চিন্তা’, *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, অনন্যা, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ

২০০১। ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’, *ওদুদ-চর্চা* (সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত), কাকলী প্রকাশনী। ঢাকা।

কাজী মোতাহার হোসেন

১৯৮৭। ‘সাহিত্যিক আবুল ফজল’, *আবুল ফজল (ব্যক্তিস্বরূপ ও সাধনা)*, মুক্তধারা, ঢাকা।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

১৯৮৭। ‘আবুল ফজল : প্রবন্ধকার’, *আবুল ফজল (ব্যক্তিস্বরূপ ও সাধনা)*, মুক্তধারা, ঢাকা।

তারেক ফয়সল

১৯৮৭। ‘বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ’, *বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (সম্পাদনা– আসহাবুর রহমান), ইউপিএল, ঢাকা।

নেহাল করিম

২০০১।‘অধ্যাপক আহমদ শরীফের সামাজিক দায়িত্ববোধ’, *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, ইউপিএল, ঢাকা।

প্রথমা রায়মণ্ডল

Dhaka University Institutional Repository

২০০৬। 'আহমদ শরীফের সমাজতন্ত্রের ভুবন', *আচার্য আহমদ শরীফ*, সূচীপত্র, ঢাকা।

ফরহাদ মজহার

২০০৩। 'আহমদ ছফা এবং 'মানুষের মত কর্তব্য' কিম্বা ব্যক্তির মুক্তিতত্ত্ব', *আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ* (সম্পাদনা– মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ফাতেমা তুজ জোহরা শুচি ও তাসমিন হোসেন রিতি

২০১০। 'ডিসকোর্স', *ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা* (সম্পাদনা মাসউদ ইমরান), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ

২০০৩। 'অধ্যাপক আহমদ শরীফের সাহিত্য গবেষণার এক দিক', *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মুহম্মদ নূরুল হুদা

২০০৩। 'আহমদ ছফার মহাজীবন', *আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ* (সম্পাদনা– মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মেসবাহ কামাল

২০০৩। ''ভেতর থেকে ফোটা' একজন আহমদ ছফা', *আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ* (সম্পাদনা– মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মনসুর মুসা

২০০১। 'আমার শিক্ষক আহমদ শরীফ', *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, অনন্যা, ঢাকা।

মাহবুবুল হক

২০০৮। 'ভূমিকা', *নির্বাচিত প্রবন্ধ আবুল ফজল*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক

১৯৮৭। 'আবুল ফজল সংবর্ধনা', *আবুল ফজল (ব্যক্তিস্বরূপ ও সাধনা)*, মুক্তধারা, ঢাকা।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন

১৯৮৭। 'সাহসী আবুল ফজল', *আবুল ফজল (ব্যক্তিস্বরূপ ও সাধনা)*, মুক্তধারা, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম

২০০১। ''রবীন্দ্রভাবনা' : সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতি ও সাহিত্যচিন্তা', *সাহিত্য পত্রিকা*, চুয়াল্লিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০৮, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

রফিক কায়সার

১৯৮৭। 'হোমাগ্নির শেষ শিখা', *আবুল ফজল (ব্যক্তিস্বরূপ ও সাধনা)*, মুক্তধারা, ঢাকা।

সাঈদ-উর রহমান

২০০৩। 'আরেকজন সাহসী মানুষ চলে গেলেন', *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ

২০০৪। 'উনিশ শতকের বাংলাদেশ : মুসলিম মানসে রেনেসাঁ-ভাবনা', *সেরা সুন্দরম্* (সম্পাদনা– মুস্তাফা নূরউল ইসলাম), ইউ.পি.এল., ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

১৯৬৯। 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সাহিত্য', *আমাদের সাহিত্য*, (সরদার ফজলুল করিম সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২০০১। 'আহমদ শরীফের স্বতঃস্ফূর্ত উপচিকীর্ষা', *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ*, ইউপিএল, ঢাকা।

২০০৬। 'কেউ থাকে যুদ্ধে কেউ চলে ভিক্ষায়', *আচার্য আহমদ শরীফ*, সূচীপত্র, ঢাকা।

সেলিনা হোসেন

২০০১ । 'নারী মুক্তির প্রশ্নে দার্শনিক আহমদ শরীফ', *আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ*, ইউপিএল, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক

২০০১। 'আহমদ শরীফের বঙ্কিম-বীক্ষা', *সাহিত্য পত্রিকা*, চুয়াল্লিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০৮, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সৌমিত্র শেখর

২০০৩। 'আহমদ শরীফের নজরুল বিবেচনা প্রসঙ্গে', *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হাবিব রহমান

২০০১। 'আহমদ শরীফের দৃষ্টিতে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'', *সাহিত্যপত্রিকা*, ৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হুমায়ূন আজাদ

১৯৮৭। 'ভূমিকা', *মুগ্ধ ও মুক্তদৃষ্টির রবীন্দ্র বিতর্ক* (মুস্তাফা মজিদ সংকলিত), ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।

২০০০। 'পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষবৃক্ষ', *ভাষা আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি*, ইউপিএল, ঢাকা।

২০০১। 'বামনের দেশে মহাকায়', *আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ*, মুস্তাফা মজিদ ও আফজালুল বাসার (সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

আতিউর-লেনিন

২০০০। 'ভাষা আন্দোলন : পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার', *ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, আতিউর রহমান (সম্পাদিত), ইউপিএল, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার :

আবুল আহসান চৌধুরী

২০০৭। *আলাপচারী আহমদ শরীফ* (আবুল আহসান চৌধুরী গৃহীত সাক্ষাৎকার), সূচীপত্র, ঢাকা।

হুমায়ূন আজাদ

২০০৪। 'পণ্ডিত ও বয়স্ক ও বিদ্রোহী', *সাক্ষাৎকার*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সহায়ক সাময়িকীসমূহ :

হালখাতা ২০১৪। শওকত হোসেন ও শারমিন নিশাত (সম্পাদিত), বাঙালি মুসলমান সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ২০১৪), ঢাকা।

পাক্ষিক চিন্তা ২০০১। ফরহাদ মজহার (সম্পাদিত), বর্ষ ১০, সংখ্যা ৬-৮, ঢাকা।

সাহিত্য পত্রিকা ১৪০৮। সাঈদ-উর রহমান (সম্পাদিত), চুয়াল্লিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাহিত্য পত্রিকা ১৪০৮। এস. এম. লুৎফর রহমান (সম্পাদিত),পঁয়তাল্লিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository